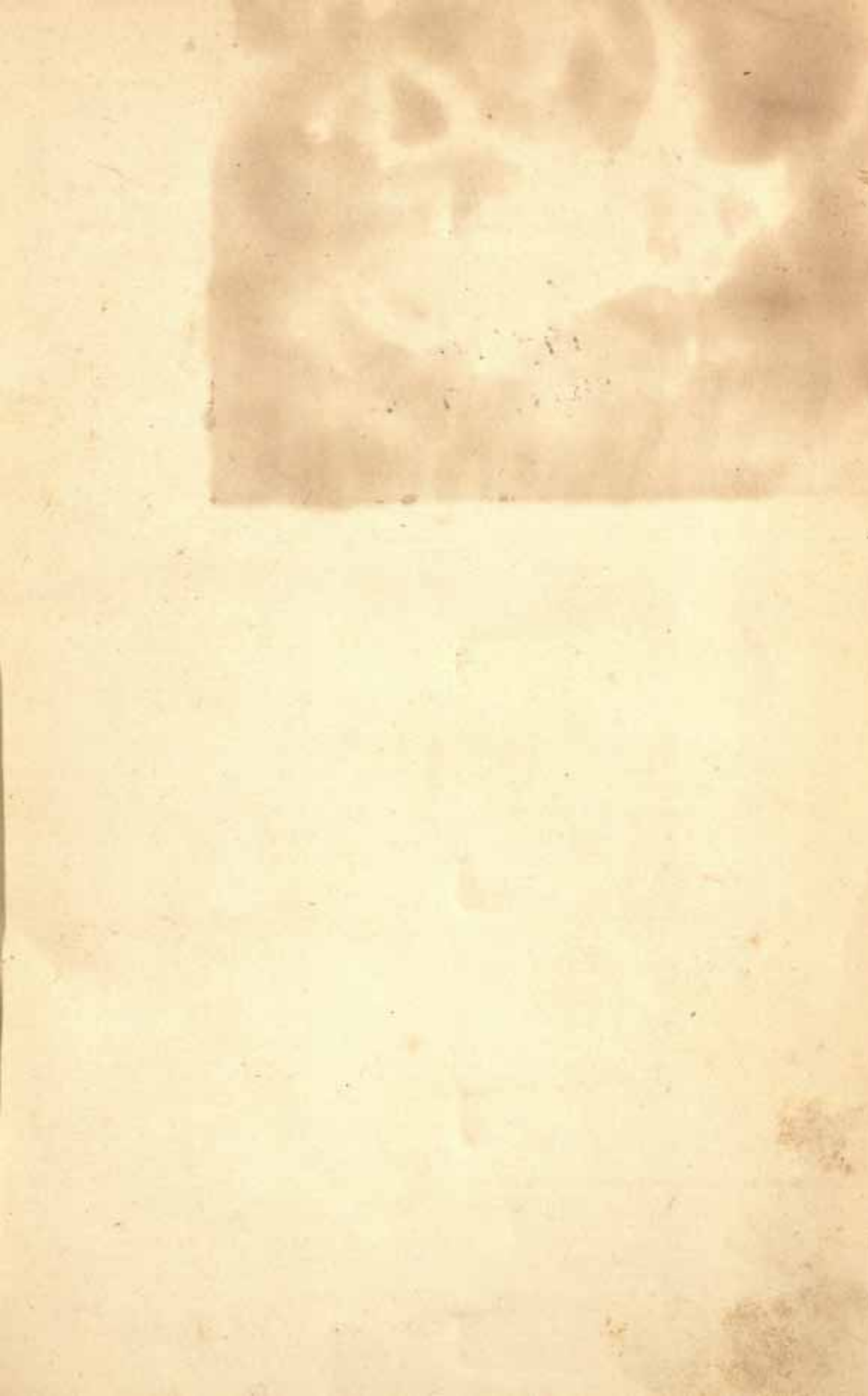


GOVERNMENT OF INDIA
ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL
ARCHÆOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 19840.

CALL No. 181.43/Twr.



GOVERNMENT OF INDIA
ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL
ARCHÆOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. _____

CALL No. _____

D.G.A. 79

সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

Nayaya-darsana

ন্যায়দর্শন

(গৌতমসূত্র) Gautama sutra

বাংলায় স্যায়ন ভাষ্য

ও Vayttsyayana

বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত

Bhasya
with translation

প্রথম খণ্ড

First Part

19840

Phani Bhushan Tarkabagisa

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

D3422



10:

D3445

77/33

কলিকাতা, ২৪৩১ নং আপার সাকুলার রোড,

Calcutta

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

Vandya Sahitya
Parisad Mandir

প্রকাশিত

181.43

বঙ্গাব্দ ১৩২৪

B.S. 1324

Tar

(93)

মূল্য—

সদস্ত পক্ষে—	১০
শাখা-সভার	
সদস্ত পক্ষে—	২১
সাধারণ পক্ষে—	২০

D3422

কলিকাতা,
২৪নং ব্রাহ্মবাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির ঘরে,
ঐতিহ্যচরিত্র প্রকৃত দ্বারা মুদ্রিত।

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 19840.....

Date 22.6.63.....

Call No. 181.43/Tax. 3

ভূমিকা

জ্ঞানদর্শনের পরিচয় ও প্রয়োজনাদি

যে বড় দর্শন পুণ্যভীর্ণ ভারতের অপূর্ণ অধ্যাত্ম-জ্ঞানগৌরবের গৌরবময়, বিশ্বময় বিজয়-পতাকারূপে আজিও দীর্ঘদর্শীকে বিশ্বস্ততার বিচিত্র লীলা দর্শন করাইতেছে, জ্ঞানদর্শন তাহারই অন্ততম দর্শনশাস্ত্র। জীবের পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভে আত্মাদি পদার্থের যে দর্শন বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার চরম কর্তব্য ও পরম কর্তব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, বাহার জন্ত প্রথমে শাস্ত্র-দ্বারা আত্মাদি পদার্থের শ্রবণরূপ উপাসনা, তাহার পরে হেতুর দ্বারা মনন অর্থাৎ যথার্থ অনুমান-রূপ উপাসনা, তাহার পরে নির্দিষ্টাশ্রয় অর্থাৎ ধ্যানাদিরূপ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে^১, জ্ঞানশাস্ত্র ঐ আত্মাদি দর্শনের সাধন-মননরূপ দ্বিতীয় উপাসনা নির্বাহরূপে মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হওয়ায় দর্শনশাস্ত্র নামেও অভিহিত হইয়াছে। আত্মাদি পদার্থের শ্রবণের পরে যুক্তির দ্বারা তাহার যে “দ্রষ্টব্য” বা মনন অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মতরূপে অনুমান, তাহাকে “অবীক্ষা” বলে। এই অবীক্ষা নির্বাহের জন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহা “আবীক্ষিকী” নামে অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী অনুমানকে “অবীক্ষা” বলে, “জ্ঞান”ও বলে। ঐ অবীক্ষা বা জ্ঞানের জন্ত অর্থাৎ উহাতে যে সকল পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, তাহা সম্পাদন করিয়া উহা নির্বাহের জন্ত যে বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ঐ জন্ত আবীক্ষিকী বলে, জ্ঞান-বিদ্যা বলে, জ্ঞানশাস্ত্র বলে; এই আবীক্ষিকী বিদ্যা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্ম-বিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্ম-বিদ্যা। এই আবীক্ষিকী বিদ্যা তর্কের নিরূপণ করিয়াছে, তর্কশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে; এ জন্ত ইহাকে তর্কবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রও বলে। ইহা “জ্ঞান” ও “তর্ক” নামেও উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ অক্ষপাদ মহর্ষি-সূত্রগ্রন্থের দ্বারা এই আবীক্ষিকী বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি ইহার স্রষ্টা নহেন। আবীক্ষিকী বিদ্যা বেদাদি বিদ্যার জ্ঞান বিশ্বস্ততার অমুগ্রহ-দান। মহাভারতে পাণ্ডবা যায়, নীতি, ধর্ম ও সদাচারের প্রতিষ্ঠার জন্ত দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ম্ ভগবান্ শত সহস্র অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি বহু বিষয় এবং জ্যোতি, আবীক্ষিকী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্বিধ বিপুল বিদ্যা দর্শিত হইয়াছে^২। ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্তায়নও বলিয়াছেন যে, প্রামিগণ বা মানবগণকে অমুগ্রহ করিবার জন্ত (ত্রয়ো প্রভৃতি) এই চারিটি বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, বাহাদিগের মধ্যে চতুর্থী এই আবীক্ষিকী জ্ঞানবিদ্যা। শ্রীমদ্-

১। আত্মা বা অগ্নি স্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিবিখ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাস্থনো বা অগ্নে দর্শনেন শ্রবণেন মতা বা বিজ্ঞানেনেবং সর্বং বিদিতম্।—বৃহস্পরণাক। ২। ৪। ২। শ্রোতব্যঃ পুরুষাচার্য্যাত আগমতম্। পশাদাস্তবাস্তবতঃ।—শঙ্করভাষ্য।

২। ত্রয়ো চাবীক্ষিকী চৈব বার্তা চ ভরতবর্ষত। দণ্ডনীতি বিপুল বিদ্যাপ্ত্র নিদর্শিতাঃ।—শঙ্কিপর্ব। ৪২। ৩৩।

ভাগবতে পাণ্ডা যাহ, আত্মিকী, অরী বার্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্বিধ বিদ্যা এবং ব্যাক্তি ও
 প্রণব বিশ্বস্রষ্টার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে^১। তাই বলিয়াছি, আত্মিকী বিদ্যা
 বিশ্বস্রষ্টার অন্তঃপ্রহ-দান। ছানোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে পাণ্ডা যাহ, কোন
 সময়ে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিদ্যা-প্রার্থী হইলে, সনৎকুমার বলিলেন,
 “তুমি কি কি বিদ্যা জান, তাহা অশ্রে বল; তাহার পরে তোমার অজ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ করিব।”
 তত্ক্ষণে নারদ বলিলেন,—“আমি সৃষ্টিবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ষবেদ জানি,
 পঞ্চম বেদ ইতিহাস, পুরাণও জানি এবং ঐ সমস্ত বেদের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রও জানি।
 পিত্রা (শ্রাদ্ধকর), রাশি (গণিত), দৈব (উৎপাতবিদ্যা), নিবি, (মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র),
 বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা (নিকর), ব্রহ্মবিদ্যা [বেদাঙ্গ
 শিকাকলাদি], ভূতবিদ্যা [ভূততত্ত্ব], ক্ষত্রবিদ্যা [ধজুর্বেদ], নক্ষত্রবিদ্যা [জ্যোতিষ], সর্গবিদ্যা
 [গান্ধ], দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ গন্ধযুক্তি নৃত্য-গীত, বাদ্যশিল্পাদি-বিজ্ঞান, এই সমস্তও জানি^২।
 নারদের অধিগত কথিত বিদ্যার মধ্যে যে “বাকোবাক্য” আছে, ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার
 ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রম্”। সংহিতাকার মহর্ষি কাত্যায়ন প্রত্যহ বাকোবাক্য
 পাঠের ফল কীর্তন করিয়াছেন^৩। সংহিতাকার গোতম বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতে বেদাদি
 শাস্ত্রের সহিত বাকোবাক্যে অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন^৪। কোষকার অমরসিংহ আত্মিকী
 শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—“তর্কবিদ্যা”^৫। আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যায়সারে আত্মিকী বিদ্যাকেই
 বাকোবাক্য বলিয়া বুঝা যায়। মহাভারতের সভাপর্কে বহুশ্রুত নারদের বিদ্যার বর্ণনায় নারদকে
 পঞ্চাবয়ব জ্ঞায়বাক্যের গুণ-দোষবেত্তা বলা হইয়াছে^৬। গোতম জ্ঞায়শাস্ত্রোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ববৃত্ত
 জ্ঞায়বাক্যের অহুকুল তর্করূপ গুণ এবং হেতুভাস প্রভৃতি দোষ নারদ জানিতেন। টীকাকার
 নীলকণ্ঠও সেখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতে নারদের পঞ্চাবয়ব জ্ঞায়বিদ্যার পাণ্ডিত্য
 বর্ণিত হওয়ায় ছানোগ্যোপনিষদে বর্ণিত নারদের অধিগত তর্কশাস্ত্রকে পঞ্চাবয়ব জ্ঞায়বিদ্যা বলিয়া

১। আত্মিকী অরী বার্তা দণ্ডনীতিস্বৰূপে চ।

এবং বাস্তবশাস্ত্রসন্ম প্রণবো জ্ঞাত দত্ততঃ—ভূতীয় স্বক ১২।৪৪।

আত্মিকীনাং পূর্বাধিক্সমগোৎপত্তিমাং আত্মিকীকীতি। আত্মিকীকামা হোক্ত-খণ্ডকামাধিবিদ্যাঃ। দত্ততঃ
 হৃদয়াকাশাং—আমিটীকা।

২। সৃষ্টিবেদ ভগবোহধোমি যজুর্বেদঃ সামবেদমাধকরণং চতুর্থং, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমাং, বেদানাং বেদং, পিত্রাঃ,
 রাশিঃ দৈবঃ নিবিঃ বাকোবাক্যসমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্গদেবজনবিদ্যাসমেক-
 ভগবোহধোমি” ৭।১।২।

৩। সাংস্কীরৌরনমস্তুজাভিস্তপ্তর্ষয়েৎ পঠনং। বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চাখহং ১৪শ খণ্ড ১১১

৪। স এ বহুশ্রুতো ভবতি লোকবেদবেদাঙ্গবিদ্যাকোবাক্যোতিহাসপুরাণকুলঃ। ইত্যাদি। অষ্টম অঃ।

৫। আত্মিকী দণ্ডনীতিস্বকবিদ্যাধিবিদ্যাঃ—অমরকোষ। স্বর্গবর্ণ ১৫৫।

৬। পঞ্চাবয়ববৃত্ত বাক্যস্ত গুণদোষবিৎ—সভাপর্ক ৫।৫।

বুঝা যাইতে পারে। কারণ, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ নির্ণয় করিবে, ইহা মহাভারতই বলিয়াছেন^১। অল্প উপনিষদেও বেদাদি বিদ্যার সহিত জ্ঞানবিদ্যারও উল্লেখ দেখা যায়^২। জ্ঞানস্বত্ব-বৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথ “জ্যোতীর্ষমীমাংসা বর্ষশাস্ত্রাণি” এই বাক্যটি স্মৃতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতি ও পুরাণে জ্ঞানবিদ্যা চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত^৩ হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যার পরিগণনায় যে “জ্ঞানবিস্তর” বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞান, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানতত্ত্ব, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। জ্ঞানমঞ্জরীকার মহামনীষী জয়ন্ত ভট্ট ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে গৌতমীয় জ্ঞানবিদ্যাই ঐ জ্ঞানবিস্তর শব্দের দ্বারা পরিগৃহীত, উহাই আত্মিকী। বৈশেষিক ঐ জ্ঞানশাস্ত্রের সমান তত্ত্ব, স্মৃতির বৈশেষিকের আর পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু জ্ঞান না বলিয়া “জ্ঞানবিস্তর” কেন বলা হইয়াছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যিক। পরন্তু মহাভারত বলিয়াছেন,—“জ্ঞানতত্ত্ব অনেক”।^৪ মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন,—বৈশেষিক, জ্ঞান, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু ও সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের ভূমিকায় মহাভারতের ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞান-বৈশেষিকাদির সহিত ব্রহ্মমীমাংসা ও যে অংশবিশেষে জ্ঞানতত্ত্ব, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু গৌতমীয় জ্ঞানবিদ্যা ভিন্ন কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা বিশেষেরও আত্মিকী নামে উল্লেখ দেখা যায়। ভগবানের বহু অবতার দ্বন্দ্বাত্ম্যের অলঙ্কার ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে “আত্মিকী” বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে^৫। দ্বন্দ্বাত্ম্য-প্রোক্ত ঐ আত্মিকী যে কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা, উহা গৌতমীয় জ্ঞানবিদ্যা নহে, ইহা স্বীকার করা যায় না। শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণও উহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “প্রাণতোষিণী” নামক তত্ত্ব-সংগ্রহকার,

১। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সনুপবৃহৎ ২। বিভেদভজ্ঞস্মৃতিভেদো নামগ্ন্যং প্রহরিত্যতি ॥ আদিপর্ব, ১ম অঃ ১৩৭।

২। তৈত্তির্য্যতন্ত্র মহতঃ ভূতন্ত নিঃসৃতিমবৈতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহখর্কবেদঃ শিখা কল্পো বাকরথং নিরুজং হ্রস্বো জ্যোতিসামরনং জ্যোতীর্ষমীমাংসাবর্ষশাস্ত্রাণি ইত্যাদি। সুবালোপনিষৎ ২য় খণ্ড।

৩। পুরাণজ্ঞানমীমাংসা-বর্ষশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং বর্ষস্ত চ চতুর্দশ ॥ রাজবক্ষসংহিতা ১১৩

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা জ্ঞানবিস্তরঃ।

পুরাণং বর্ষশাস্ত্রক বিদ্যাশ্চেতাস্ততুর্দশ ॥

আয়ুর্বেদো যজুর্বেদো সামর্কর্কশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্দশ বিদ্যাঃ স্তুতাদশৈব তু ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৩ অঃ।

৪। জ্ঞান-তত্ত্বাঙ্গনেকানি তৈত্তির্য্যকস্তানি বাসিতিঃ।

হেতুগ্নম-সদাচারৈর্গ্ৰহ্যং তদুপাস্ততাং ॥—শাঙ্খিপর্ব ১২০।২২।

জ্ঞানতত্ত্বানি তাত্ত্বিক-বৈশেষিক-কণিল-পাতঞ্জলানীনি। হেতুভূক্তিঃ, আপমো বেদঃ, সদাচারঃ প্রত্যক্ষং, তৈঃ প্রমাণৈঃ কৃদ্বা ঐতদ্ব্যুৎপত্তির্গ্ৰহ্য উক্তং তদুপাস্ততাং ॥—নীলকণ্ঠ ॥

৫। বহুসংস্রবপত্যং বৃত্তং প্রাণোহননস্বয়দা।

আত্মিকীমলকায়ং প্রহ্লাদাবিভা উচিহান ॥ ভাগবত ১১।২।১১ আত্মিকীং আত্মবিদ্যাং ॥—শ্রীধরস্বামী।

মহা বাঙ্গালী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দত্তাশ্রের-প্রোক্ত আত্মিকিকী ও গৌতম-প্রকাশিত আত্মিকিকী এই উভয়কেই আত্মিকিকী বলিয়া, তন্মধ্যে গৌতম জ্ঞানশাস্ত্রের নিন্দা বিষয়ে গন্ধর্ব্বভট্টের বচনাবলম্বনে অবতরিত পূৰ্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন এবং মহাত্মারতের শাস্তিপক্ষের যে প্লোকের দ্বারা আত্মিকিকীর নিন্দা সমর্থন করা হয়, তাহারও উল্লেখ করিয়া অল্পরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তাহার মীমাংসায় বহু বক্তব্য থাকিলেও তিনি গৌতমীয় জ্ঞানবিদ্যা ও তাহার অব্যয়ন নিন্দিত, ইহা সিদ্ধান্ত করেন নাই; পরন্তু তাহার প্রতিবাদই করিয়াছেন, এই মাত্রই এই প্রসঙ্গে এখানে বক্তব্য। অর্থশাস্ত্রে কোটিল্য সাংখ্যকেও আত্মিকিকীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কথা পরে আলোচনা করিব। শাস্তিপুত্রের মহামনীষী, 'হুতি ও জ্ঞান গ্রন্থের বহু টীকাকার রামামোহন গোস্বামি ভট্টাচার্য্য জ্ঞানসূত্রবিবরণ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রবণের পরে দ্বৈত অর্থ্যং বেদোপনিষ্ট আত্মমনকে আত্মিকা বলে। তাহার নির্বাহক শাস্ত্র আত্মিকিকী, ইহা আত্মিকিকী শব্দের বৌগিক অর্থ। এই অর্থে অস্ত্র শাস্ত্রও আত্মিকিকী হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞানের বলবত্বাবশতঃ এবং উহাতেই আত্মিকিকী শব্দের ভুরি ভুরি প্রয়োগ থাকায় গৌতমীয় জ্ঞান-বিদ্যাতেই আত্মিকিকী শব্দের রুচি কল্পনা করিতে হইবে। অর্থ্যং জ্ঞানশাস্ত্র-বোধ্যক আত্মিকিকী শব্দটি যোগরূঢ়। তাহা হইলে কোন বৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়াই কোন কোন অব্যয়বিদ্যা বা মনন-শাস্ত্রও আত্মিকিকী নামে কথিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার বাংজায়ন আত্মিকিকী শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রথমেই বলিয়াছি, তদনুসারে গৌতম-প্রকাশিত জ্ঞানবিদ্যাই আত্মিকিকী। বাংজায়নও জ্ঞানবিদ্যা ও জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া তাহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। এবং প্রমাণ ও প্রমেয় বলিলেই সকল পদার্থ বলা হয়, আবার পৃথক্ করিয়া সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ কেন বলা হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বাংজায়ন বলিয়াছেন যে, সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ এই চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যার পৃথক্ গ্রন্থান অর্থ্যং অসাধারণ প্রতিপাদ্য। গ্রন্থানের ভেদেই বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি ও আত্মিকিকী, এই চতুর্বিধ বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থান আছে। তন্মধ্যে আত্মিকিকীর গ্রন্থান সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ। উহা আর কোন বিদ্যায় বর্ণিত হয় নাই। উহার জ্ঞানবিদ্যার পৃথক্ গ্রন্থান কেন? উহাদিগের তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন কি? তাহা প্রথম সূত্র-ভাষ্যে বাংজায়ন বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান-বার্ত্তিকে উদ্যোতকর ভাষ্যকারের বক্তব্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি জ্ঞানবিদ্যায় সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিদ্যা হইত না। তাহা হইলে ইহা কেবল মাত্র অব্যয়বিদ্যা হইয়া ত্রয়ীর অন্তর্গত হইত। ফলকথা, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি হইতে চতুর্থী যে আত্মিকিকী বিদ্যার উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, ঐ চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যা গৌতম-প্রকাশিত জ্ঞানবিদ্যা। ঐ বিদ্যা অক্ষপাদের পূর্ব হইতেই আছে। অক্ষপাদ সূত্রগ্রন্থের দ্বারা উহা বিস্তৃত ও প্রণালীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার কর্ত্তা নহেন। ইহাই বাংজায়ন, উদ্যোতকর প্রভৃতি জ্ঞানচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়।

আমরাও দেখিতেছি, মহাদি সংহিতাকার স্বধিগণ বিচার দ্বারা রাজ্য রক্ষার জন্য

রাজাকে দ্রব্য, বার্তা ও দণ্ডনীতির সহিত চতুর্থী বিদ্যা আদীক্ষিকী শিক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন^১।

মহাদি ঋষিগণ যে উদ্দেশ্যে রাজাকে আদীক্ষিকী বিদ্যার আলোচনা করিতে বলিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে উহা যে জ্ঞানবিদ্যা, তাহা বুঝা যায়। কুল্লুকতট্টও মনু-বচনোক্ত আদীক্ষিকীর অন্তরূপ কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। জ্ঞানসুত্রবৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও মনু-কৃত আদীক্ষিকীকে জ্ঞানশাস্ত্রই বলিয়াছেন। মেধাতিথি প্রথমে তর্কবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র ঐতিহ্যিক আদীক্ষিকী বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, মনু-বচনে ‘আত্মবিদ্যা’ আদীক্ষিকীর বিশেষণ। রাজা আত্মহিতকরী তর্কশ্রয়া আদীক্ষিকী শিক্ষা করিবেন। নাস্তিক তর্কবিদ্যা শিক্ষা করিবেন না। বস্তুতঃ মহাদি ঋষিগণ বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রকে অসংশয়িত বলিয়া তাহার অধ্যয়নাদিকে উপপাতকের মধ্যে গণ্য করায়^২ রাজার শিক্ষণীয়রূপে তাঁহাদিগের কথিত আদীক্ষিকীকে নাস্তিক তর্কবিদ্যা বলিয়া বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু নাস্তিক গ্রন্থে “শাস্ত্র” শব্দের জ্ঞান নাস্তিক তর্কবিদ্যাতে আদীক্ষিকী শব্দের গোঁণ প্রয়োগ হইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে তাহা হইয়াছে, ইহা আমরা মেধাতিথির কথার দ্বারাও বুঝিতে পারি এবং মহাদি সংহিতায় বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দা দেখিয়া তদনুসারে মহাভারতেও নাস্তিক তর্কবিদ্যারই নিন্দা বুঝিতে পারি। মূলকথা, মনু-বচনে আত্মবিদ্যা আদীক্ষিকীর বিশেষণ হইলেও ঐ আদীক্ষিকী, জ্ঞানবিদ্যা হইতে পারে। কারণ, জ্ঞানবিদ্যা উপনিষদের জ্ঞান কেবল আত্মবিদ্যা না হইলেও আত্মবিদ্যা। কেবল আত্মবিদ্যারূপ কোন আদীক্ষিকী আদীক্ষিকী শব্দের দ্বারা রাজার শিক্ষণীয়রূপে কথিত হয় নাই, ইহা যাজ্ঞবল্ক্য ও গোতমের বচনের দ্বারাও বুঝা যায়। বিচারের জন্ত, বাদ-প্রতিবাদের জন্ত, যুক্তির দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের জন্ত জ্ঞানবিদ্যায় অভিজ্ঞতা রাজার বিশেষ আবশ্যক। মহাভারতও রাজ-ধর্মবর্ণনায় রাজাকে শব্দ-শাস্ত্রাদির সহিত যুক্তি-শাস্ত্রও জানিতে বলিয়াছেন^৩। শ্রীরামচন্দ্র

১। মৈবিনোভ্যত্রয়ীং বিবাদদণ্ডনীতির শাস্ত্রীং।

আদীক্ষিকীকাত্মবিদ্যাং বার্তারভ্যাস্ত লোকতঃ।—মনুসংহিতা। ৭।৪৩।

যরত্বগোপ্তাধীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।

বিনীতব্রতং বার্তায়াং দ্রব্যাকৈব মনুসংহিতাঃ।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ১।৩১১।

রাজা সর্বক্ষেত্রে ব্রাহ্মণবর্জ্য সাধুকামী

জ্ঞান সাধুবাধী, দ্রব্যং আদীক্ষিকাকান্তিবিনীতঃ।—গোতমসংহিতা। ১১ অঃ।

২। অসম্ভ্রান্তাধিগমনং কৌশিলবাস্ত চ জিহ্বা।—মনুসংহিতা। ১১।৩৩।

অসম্ভ্রান্তাধি চাক্ষুশমিগ্রঃ। যজ্ঞ ন গ্রামাণ বেদা, ন কর্ম স্বলসম্বন্ধমাপদ্যতে।—মেধাতিথি। অতিশ্রুতি-বিরুদ্ধ-শাস্ত্রশিক্ষণং। কুল্লুকতট্ট।

অসম্ভ্রান্তাধিগমনমাকরেদধিকারিতা।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ৩।২৪১।

৩। ব্রহ্মপালনযুক্তস্ত ন কতি লভতে কচিৎ।

যুক্তি-শাস্ত্রকং তে জেহ্য শব্দশাস্ত্রকং ভারতঃ।—অথুশাসন পর্ব, ১৩৪।২৪৮।

উত্তরোত্তর যুক্তিতে বৃহস্পতির স্থায় বক্তা ছিলেন, ইহা বাম্বীকি বর্ণন করিয়াছেন^১। সেখানে বাম্বীকি স্থায়-শাস্ত্রোক্ত পারিতোষিক 'কথা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা রামাহুজের ব্যাখ্যায় ঘরাও বুঝা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ধর্মকীর্ত ও রাজনীতির সহিত আত্মজিকী বিদ্যারও অব্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে^২।

মহাভারতের শাস্তিপর্বে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজাকে বলিয়াছিলেন যে,^৩ বেদান্ত-জ্ঞান-কোবিদ বিশ্ববস্তু গন্ধর্ব্ব আমার নিকটে বেদ বিষয়ে চতুর্বিংশতি প্রশ্ন এবং আত্মজিকী বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেন। আমি তাহার উত্তর দিবার জন্য চিন্তা করিতে একটু সময় লইয়া, সরস্বতী দেবীকে ধ্যান করিয়া পরা আত্মজিকীর সাহায্যে উপনিষৎ ও তাহার বাক্যশেষ অর্থাৎ উপসংহার-বাক্যকে মনের দ্বারা মন্থন করি। হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই চতুর্থা অর্থাৎ ত্রয়োদশী, বার্তা ও দণ্ডনোতি ইহাতে চতুর্থা বিদ্যা আত্মজিকী মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী। এই বিদ্যা তোমাকে বলিয়াছি। বিশ্ববস্তু গন্ধর্ব্ব আত্মজিকী বিষয়ে যে পঞ্চবিংশ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তরে গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্ববস্তু প্রশ্ন যে অত্র কোন আত্মজিকী বিষয়ে নহে, ইহা নীলকণ্ঠেরও স্বীকৃত। তাহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য যে চতুর্থা বিদ্যা

১। ন বিগৃহ্য কথাকচিঃ। উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্বিধাঃ—অদ্যোধ্যাকাণ্ডে ১২।৪২।৪৩।

২। সরস্বতঃ ধর্মকীর্তঃ ধর্ম্মান্ স্মারপথান্ডপথান্।

তথা চাত্মজিকীং বিদ্যাং রাজনীতিকং বড়বিদ্যাং—১০।৪৫।৪৬।

স্মারপথান্ মীমাংসাদীন। আত্মজিকীং তর্কবিদ্যাং।—শ্রীধরস্বামী।

৩। বিশ্ববস্তুস্ততো রাজন্ বেদান্তজ্ঞানকোবিদঃ।

চতুর্বিংশতিশাস্ত্রোক্তোহপুচ্ছঃ প্রশ্নান্ বেদস্ত পার্শ্বিবঃ।

পঞ্চবিংশতিমা প্রশ্না পপ্রচ্ছাত্মজিকীং তদা। ২৭।২৮।

তত্রোপনিষদৈক্যং পরিশেষক্ পার্শ্বিবঃ।

মম্ভূমি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চাত্মজিকীং পরাং ৪৩।

চতুর্থা রাজশার্দূল বিদ্যায়া সাম্পরায়িকী।

উদীরিতা মহা ভুভাং পঞ্চবিংশতিবিজিতাঃ।

এবা তেহাত্মজিকী বিদ্যা চতুর্থা সাম্পরায়িকী ৪৪।

বিদ্যোপেতাঃ ধনঃ কুত্র ইত্যাদি ৪৮।

অক্ষয়হাং প্রজ্ঞানে ইত্যাদি। ৪৫। শাস্তিপর্ব্ব ৩১। অঃ।

শ্রবণমহা স্রজ্য যুক্ত্যা আসোচনমর্থীয়া তৎপ্রদানাত্মজিকীং ২৮।

চতুর্থা, ত্রয়োদশী, বার্তা, দণ্ডনোতিকাপেক্ষা। সাম্পরায়িকী—সোকায়া হিতা ৩৫।

বিদ্যোপেতাঃ ধনঃ আত্মজিকীয়া বিদ্যায়া সহিতাঃ ধনঃ.....বেদবিদ্যা ধনঃ, তাং সোপপত্তিকং সম্পাদ্য শ্রবণমনেন কুহেতি ভাবঃ ৪৮। প্রজ্ঞানে অনিত্যার্থে অক্ষয়হাং পরোক্তাঃ স্রজ্যা অক্ষপাদাভ্যঃ আচাধ্য। অত্র ব্যবহারে যদন্ত-রাক্ষাদি তদেবাব্যয়মিতিভাঃ ৪৫।—নীলকণ্ঠ।

আত্মিকিকর সাহায্যে মনের দ্বারা উপনিষদের মত্বন করিয়াছিলেন, তাহাও যে বিচার দ্বারা, তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের অত্বকুল কোন তর্কবিদ্যা, ইহাও বুঝা যায়। মহাভারতের পূর্কোক্ত স্থলে ঐ আত্মিকিককে চতুর্থী বিদ্যা ও মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী বলিয়া বেদবিদ্যাকে ঐ আত্মিকিকী বিদ্যাবুক্ত করিবে অর্থাৎ বেদবিদ্যার দ্বারা শ্রবণ ও আত্মিকিকী বিদ্যার দ্বারা মনন করিবে, ইহাও বলা হইয়াছে। এবং পরে সাঙ্কোপাদ সমগ্র বেদ পড়িয়াও বেদবেদ্য না বুঝিলে সে ব্যক্তি 'বেদভারহর' এই কথা বলিয়া বেদবাক্য বিচারের আবশ্যকতাও স্থচিত হইয়াছে। এবং জ্ঞায়শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদবাদের অশ্রয়ে মোক্ষলাভ হয় না; মোক্ষ আছে, এই মাত্র বলা যায়। অর্থাৎ বিচার দ্বারা বেদার্থের শ্রবণ আবশ্যক, তর্কের দ্বারা মনন আবশ্যক; নচেৎ কেবল বেদ পড়িলেই মুক্তি হয় না, এই কথাও শাস্ত্রিপর্বে পাওয়া যায়^১। সুতরাং মহাভারতোক্ত ঐ আত্মিকিকী—জ্ঞায়বিদ্যা, যাজ্ঞবল্ক্য উহার সাহায্যে বেদার্থ বিচার করিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যার পূর্কোক্তরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। জ্ঞায়সূত্র-বৃত্তিকার মহামনৌবী বিশ্বনাথও মহাভারতের পূর্কোক্ত "তত্রোপনিষদকৈব" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। বাৎস্তায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য—চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যাকে জ্ঞায়বিদ্যাই বলিয়াছেন। বৈদান্তিক-চূড়ামণি শ্রীহর্ষও নৈষদীয় চরিতে গোতম-প্রকাশিত জ্ঞায়-বিদ্যাকে আত্মিকিকী বলিয়া মোক্ষোপযোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন^২। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় গোতম-প্রণীত জ্ঞায়শাস্ত্রকে আত্মিকিকী নামে উল্লেখ করিয়া সর্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্কীচাৰ্য্যগণের কথার দ্বারাও মহাভারতোক্ত ঐ চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকিকীকে যে তাঁহার গোতম-প্রকাশিত জ্ঞায়বিদ্যাই বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে, মহাভারতের শাস্ত্রিপর্বে ইন্দ্র-কান্ডপ-সংবাদে যে আত্মিকিকীকে 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা নাস্তিক তর্কবিদ্যা। তাহাকে গোতম-প্রকাশিত বেদান্তগত আত্মিকিকী বলিয়া পূর্কোক্ত আচাৰ্য্যগণ বুঝেন নাই। মবাদি সংহিতা ও মহাভারতে বেক্রপে আত্মিকিকী বিদ্যার উল্লেখ আছে এবং মহাভারত সভাপর্বে যে জ্ঞায়বিদ্যায় নারদ মুনির পাণ্ডিত্য বর্ণন করিয়াছেন এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিশ্বাবস্তু যে আত্মিকিকী বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর দিয়াছেন, ইহাও মহাভারত বর্ণন করিয়াছেন, সেই আত্মিকিকী বিদ্যাকে মহাভারত 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন না, ইহাও প্রশংধান করা আবশ্যক।

বস্ততঃ মহাভারত শাস্ত্রিপর্বে ইন্দ্রকান্ডপ-সংবাদে বেদনিন্দক, নাস্তিক, সর্বশকী, বেদবাক্য বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের অক্রমণকারী, কটুভাবী, মুর্থ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঐরূপ ব্যক্তিরই নিন্দা।

১। বেদবাক্য ব্যাপাশ্রিত মোক্ষোৎপত্তি প্রস্তাবিত্ব।

অপেতজ্ঞায়শাস্ত্রের সর্বলোকবিগহিণা।—শাস্ত্রিপর্বে, ২৩৮ অঃ। ৬৯।

২। উদ্দেশপূর্বক্যপি লক্ষণেহপি ক্রিমদ্বিতৈঃ মোক্ষশক্তিঃ পদার্থৈঃ।

আত্মিকিকীঃ বদ্বশনবিসমালীঃ তথা মুক্তিকামা কলিতাঃ প্রতীমঃ। ১০ সর্গ। ৮১

করিয়া, তদ্বারা বৈদিক মত পরিত্যাগপূর্বক নাস্তিক-মতাবলম্বী হইবে না, বৈদিক মার্গেই অবস্থান করিবে, এই উপদেশ করিয়াছেন। ঐ স্থলে যে তর্কবিদ্যার অমুরক্ত হইলে বেদপ্রামাণ্য, পরলোকাদি কিছুই মানে না, নাস্তিকবাদী ও সংশয়বাদী হয়, বেদনিন্দাদি তথাকথিত কার্য্য করে, সেই তর্কবিদ্যার অমুরক্ত হইবে না, অর্থাৎ তাহার মত গ্রহণ করিবে না—ইহাও উপদেশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে নিরর্থক তর্কবিদ্যা বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে^১। মহাভারতের ঐ নিন্দার উদ্দেশ্য বুঝিলে এবং সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিলে ঐ তর্কবিদ্যা যে বার্ষ্পত্য সৃজাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যা এবং তর্কবিদ্যাশ্ব নিবন্ধন তাহাতে আত্মজিকী শব্দের গোণ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদনিন্দক, নাস্তিক, বেদবিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের আক্রমণকারী, কটুভাষী ইত্যাদি কথার দ্বারা মহাভারত ঐরূপ ব্যক্তিকে কোন্ তর্কবিদ্যার অমুরক্ত বলিয়াছেন, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। শেষে অমুশাসন পর্বে ঐ কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে^২ এবং অমুশাসনপর্বে অন্ততঃ যুধিষ্ঠিরের প্রমোদরে ভীষ্মদেব প্রত্যক্ষমাত্র-প্রামাণ্যবাদী নাস্তিকদিগকে হৈতুক বলিয়া নাস্তিকবাদী ও সংশয়বাদী এবং অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন^৩। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন যে, হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যে ব্রাহ্মণ মূলশাস্ত্রদ্বয় শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবজ্ঞা করিবে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুগণ বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন^৪। ভাষ্যকার মেধাতিথি, টাকাকার গোবিন্দরাজ ও

- ১। অহমাস্য পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আত্মজিকীঃ তর্কবিদ্যামমুরক্তো নিরর্থিকঃ।
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সৎস্ব চ হেতুমৎ।
আত্মোক্তি চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণাকোহু চ শিখান্।
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ সূর্যঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তন্তেষাং কলনির্কৃতিঃ শৃগালদ্ব্য মম দ্বিগ্—শাস্তিপর্কঃ। ১৮০।৪৭।৪৮।৪৯।
- ২। অপ্রামাণ্য বেদানাং শাস্ত্রাশাঞ্চাভিলক্ষনং।
অব্যবস্থা চ সর্বত্র এতরাশনমান্বনঃ ১১১।
ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আত্মজিকীঃ তর্কবিদ্যামমুরক্তো নিরর্থিকঃ ১২২।
হেতুবাদান্ ব্রহ্মন্ সৎস্ব বিজ্ঞেতাং হেতুবাদিকঃ।
আত্মোক্তি চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সর্বৈব হি ১৩।
সর্বভিশঙ্কী মূঢ়স্ত বালঃ কটুকবাগপি।
বোদ্ধব্যস্তাৎশস্তাং নরং স্বানং হি তাংবিদ্বঃ ১৪০—অমুশাসনপর্কঃ, ৩৭ অঃ।
- ৩। প্রত্যক্ষং কারণং দৃষ্ট্বা হৈতুকঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ।
নাস্তীত্যেকঃ ব্যবস্তান্তি সত্যং সংশয়মেব চ।
তদ্ব্যবস্তাং ব্যবস্তান্তি বালঃ পান্ডিত্যমানিনঃ। ইত্যাদি। অমুশাসন, ১৬২।৫।৬।
- ৪। যোহবমন্তেত স্তে স্থলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্বিজঃ।
স সাধুভির্কহিচ্ছাদ্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ—মনুসংহিতা, ২।১১।

নারায়ণ মনুসংহিতাও এই হেতুশাস্ত্রকে নাস্তিক-তর্কশাস্ত্র বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য যে কোন তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া, নাস্তিক হইয়া বেদনিন্দা করিলেও সাধুগণ তাহার শাসন করিবেন, ইহাও বেদনিন্দক ও নাস্তিক শব্দের দ্বারা হেতু স্মৃতি করিয়া মনু প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু মনুসংহিতায় নাস্তিক ও আস্তিক বিবিধ হেতুক ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যায়। বাহারা শাস্ত্র না মানিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হেতুবাদবক্তা, তাহারা নাস্তিক হৈতুক। মনু এই হৈতুককেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—“হৈতুকান্ বকন্বীতীংস্চ বাঙ মাজ্জৈণাপি নার্চ্ছয়েৎ”। ৪।৩০। এখানে পাণ্ডু, বকন্বীতি প্রভৃতি নিম্নিত ব্যক্তিগণের সাহচর্য্যবশতঃ হৈতুক শব্দের দ্বারা নাস্তিক হৈতুক-দিগকেই বুঝা যায়। ভাব্যকার মেধাতিথি প্রভৃতিও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাহার পরে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্ত, শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের জন্ত মনু প্রথমে যে মহাপরিষদের বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মনু—বেদজ্ঞ, মীমাংসাতর্কজ্ঞ, নিরুক্তজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত হৈতুক পণ্ডিতেরও উল্লেখ করিয়াছেন^১ এবং ঐ হৈতুক পণ্ডিতকে বেদজ্ঞজ্ঞ পণ্ডিতের পরেই দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। এখানে মেধাতিথি অমুনাদিকুশল পণ্ডিতকে এবং কুলুক ভট্ট শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ জ্ঞায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে হৈতুক বলিয়াছেন। মনু কেবল তর্কী বলিলেও শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ জ্ঞায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে হৈতুক বলিয়াছেন। মনু কেবল তর্কী বলিলেও মীমাংসাতর্কজ্ঞ পণ্ডিতের জ্ঞায় জ্ঞায়তর্কজ্ঞ পণ্ডিতও বুঝা যাইত। তথাপি বিশেষ করিয়া তর্কীর পূর্বে হৈতুক পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়াছেন।^২ তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতির অবিরুদ্ধ জ্ঞায়শাস্ত্র স্মৃতিরকাল হইতেই আছে এবং ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আস্তিক হৈতুক পণ্ডিতও ধর্ম্মতত্ত্বনির্ণয়-পরিষদের অন্ততমরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহা মনুর কথার দ্বারা বুঝা যাইতেছে এবং মনু পূর্বে যে হৈতুকদিগকে অসম্মান্য বলিয়াছেন, তাহারা নাস্তিক হৈতুক, ইহাও বুঝা যাইতেছে। তাহা হইলে মনুসংহিতা ও মহাভারতের পূর্বোক্ত সমস্ত বচনগুলির সমন্বয়ের দ্বারা মহাভারতে বেদপ্রামাণ্য পরলোকাদি-সমর্থক সর্কশাস্ত্রপ্রদীপ গোতম জ্ঞায়শাস্ত্রের নিন্দা নাই, নাস্তিক তর্কশাস্ত্রেরই নিন্দা আছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

বাণ্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায়, স্ত্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন যে,^৩ বৎস! তুমি ত

১। জৈবিন্দো হৈতুকতর্কী নৈকজে। ধর্ম্মপাঠকঃ।

অমুনাদিকুশলঃ পূর্বে পরিবৎ স্ত্রীং দশাবরাঃ—মনুসংহিতা। ১২।১১১।

(হৈতুকঃ) অমুনাদিকুশলঃ। তর্কী অমুনাদিকুশলঃ। মেধাতিথি। (হৈতুকঃ) শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধজ্ঞায়শাস্ত্রজ্ঞঃ।

(তর্কী) মীমাংসাতর্কতর্কবিৎ। কুলুকভট্ট।

২। শব্দ ও লিখিত মুনীও নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে ধর্ম্মনির্ণয়-পরিষদের অন্ততমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা জায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের কথায় পাওয়া যায়। “শব্দলিখিতৌ চ ধর্ম্মবজ্জুঃসামান্যকর্ম্মবিদঃ যদুজ্জ্বলিদ্ ধর্ম্মবিদ্-বাক্যবিদ্ নৈয়ায়িকো নৈষ্টিকো ব্রহ্মচারী পঞ্চায়িরিতি দশাবরা পরিবদিতুচ্চুঃ”।—জায়মঞ্জরী, ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৩। কচ্ছিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।

অনর্থকুশলা জ্ঞেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রেণ মুখোবু বিলম্বানেনু দুর্ধ্ব ধাঃ।

বুদ্ধিমাধীকিকীং প্রাপা নিরর্থং প্রববন্তি তে—অমোধ্যাকাণ্ড। ১।৩০।৩৮।৩৯।

লোকায়তিক ব্রাহ্মণদিগকে সেবা কর না ? পরে কেন তাহাদিগের সেবা করা রামচন্দ্রের অনভি-
 প্রেত, তাহা বলিতে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু তাহারা অনর্থ-কুশল এবং অজ্ঞ হইয়াও
 পণ্ডিতাভিমানী। মুখ্য ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ এবং তন্মূলক ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই
 দুর্ব্বুদ্ধগণ আত্মনিকী বুদ্ধি লাভ করিয়া অনর্থক প্রবাদ করে। এখানে লোকায়তিক ব্রাহ্মণ-
 মাজ্জকেই অনর্থকুশল দুর্ব্বুদ্ধ প্রভৃতি বলিয়া যে নিন্দা করা হইয়াছে, তদ্বারা ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ
 করিয়া নাস্তিক-মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণেরই নিন্দা বুঝা যায়। সুতরাং এখানে আত্মনিকী বুদ্ধি
 বলিতে নাস্তিক-তর্কবিদ্যার অনুরাগাদি মূলক নাস্তিকের বুদ্ধি বা মতবিশেষই বুঝা যায়। টীকাকার
 রামানুজ এখানে চার্বাক-মতাবলম্বীদিগকে প্রথম প্রকার লোকায়তিক বলিয়া জ্ঞান-
 মতাবলম্বীদিগকে দ্বিতীয় প্রকার লোকায়তিক বলিয়াছেন। রামানুজের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা গ্রহণ
 করা না গেলেও পূর্বকালে জ্ঞানশাস্ত্রও যে লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা রামানুজের
 কথায় বুঝা যায়। সুতরাং নৈয়ায়িকদিগকেও রামানুজ লোকায়তিক শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে
 পারিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণে প্রথম শ্লোকে যে লোকায়তিকগণ নিম্ননীরূপে বুদ্ধিস্ত, দ্বিতীয়
 শ্লোকেও তাহারাই “তৎ” শব্দের দ্বারা বুদ্ধিস্ত, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। আত্মিক হৈতুক
 মাজ্জকেই বাত্মীকি ঐক্যে বর্ণন করিতে পারেন না। নাস্তিক হৈতুক সম্প্রদায় গোতম জ্ঞানশাস্ত্র
 হইতে তর্ক শিক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যে নাস্তিক-মতের সমর্থন করিতে পারেন। বাত্মীকি তাহা
 বলিলেও জ্ঞানশাস্ত্রের নিন্দা হয় না। তাহা হইলে অজ্ঞ শাস্ত্রেরও নিন্দা হইতে পারে।
 বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক জ্ঞানবৈশেষিকের আর্থ সিদ্ধান্তের ঐক্যে নিন্দা শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছেন,
 ইহাও বাত্মীকি বর্ণন করিতে পারেন না। পরন্তু শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় হেতুবাদকুশল
 হৈতুক পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞান আত্মিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত সম্মানে নিম্নগণ দেখিতে
 পাই^১। মূল কথা, লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ করিয়া রামায়ণে হৈতুক পণ্ডিত মাজ্জেরই
 নিন্দা হয় নাই। মহাসংহিতায় যেমন হৈতুক শব্দের প্রয়োগ করিয়াই নাস্তিক হৈতুকদিগকে
 অসম্মান্য বলা হইয়াছে, তদ্রূপ রামায়ণেও লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ করিয়া নাস্তিক হৈতুক-
 দিগকেই অসম্মান্য বলা হইয়াছে। তবে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রও লোকায়ত নামে অভিহিত
 হইত, ইহা বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকটে শুনিয়াছি। রামানুজের কথাতো তাহা বুঝা যায়।
 পরন্তু অর্থশাস্ত্রে কোটিল্য তাহার সম্মত আত্মনিকী বিদ্যার মধ্যে লোকায়ত বলিয়াছেন^২। কোটিল্য

১। হেতুপচারকুশলান হৈতুকান্দ বহুশ্রুতান।—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১০৭-৮। হৈতুকান্ তর্কিকান্।—
 রামানুজ।

২। চতুশ্চ এব বিদ্যা ইতি কোটিল্যঃ। তান্ত্রিধর্মার্থো বহুবিদ্যাং তদ্বিদ্যাঃ বিদ্যাঃ। সাংখ্যং বোদ্ধ লোকায়তক
 ইত্যাত্মনিকী। ধর্মার্থো জ্ঞানং। অর্থার্থো বাত্মীয়াঃ। নরান্যৌ দণ্ডনীত্য। বলাকলে চেতাসাং হেতুভি-
 রবীক্ষমাণা লোকস্তোণকরোতি বাসনেত্ভ্যদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, অজ্ঞানাকা-ক্রিয়া-বৈশারদ্য কুরোতি—

প্রতীপঃ সর্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্বকর্মণাং।

আশ্রয়ঃ সর্বধর্মণাং শব্দবাত্মনিকী মত।—অর্থশাস্ত্র।

ছায়শাস্ত্র না বলিয়া লোকায়ত শব্দের দ্বারা বর্হস্পত্য সূত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যাকেই গ্রহণ করিলে তিনি “বিদ্যা” ও “আত্মীকরী” শব্দের যে ব্যুৎপত্তি সূচনা করিয়াছেন এবং আত্মীকরী বিদ্যার যে সকল ফল কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সুসংগত হয় না। সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্ব কশের উপায়, সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া শেষে যে প্রশংসা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তিনি যে ন্যায়শাস্ত্রকেও আত্মীকরীর মধ্যে বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। বাৎস্তায়ন ভাষ্যেও “প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের ঐক্য প্রশংসা দেখা যায়। সুতরাং কোটিল্য লোকায়ত শব্দের দ্বারা ছায়শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। বর্হস্পত্য সূত্রের মত লোকদম্যত—লোকবিস্তৃত। অবিকাংশ লোকই দেখেই আত্মা মনে করে, পরলোকে বিশ্বাস করে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঐ মত লোকসিদ্ধ, ইত্যাদি প্রকার ব্যুৎপত্তি অল্পসারে ঐ মত ও ঐ মত-প্রতিপাদক গ্রন্থ সূচিরকাল হইতে “লোকায়ত” নামে উল্লিখিত দেখা যায়। বাৎস্তায়নের কামসূত্রেও (১২ অঃ, ২৪ সূত্রে) পরলোকে অবিশ্বাসী সংশয়বাদীর “লোকায়তিক” নামে উল্লেখ দেখা যায়। এইরূপ বহু গ্রন্থেই লোকায়তিক ও কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দেরও প্রয়োগ পূর্ব্বোক্ত অর্থে দেখা যায়।^১ কিন্তু ছায়দর্শনের অনেক মত লোকসিদ্ধ। আত্মার কর্তৃত্বাদি সর্ব্ব-লোকসিদ্ধ এবং সকল লোকই তর্ক করে, অনুমান করে, অনুমানের দ্বারা লোকবাত্মা নির্বাহ করে; সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত লোকসিদ্ধ, উহা লোকবাত্মা-নির্বাহক বলিয়া লোকে বিস্তৃত, এইরূপ কোন ব্যুৎপত্তি অল্পসারে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রও ‘লোকায়ত’ নামে অভিহিত হওয়া অসম্ভব নহে। নাস্তিক শাস্ত্রবিশেষেই লোকায়ত শব্দের ভূরি প্রয়োগে লোকায়ত শব্দের ঐ অর্থই প্রসিদ্ধ হওয়ায় পরিবর্তী কালে ন্যায়শাস্ত্র বলিতে লোকায়ত শব্দের প্রয়োগ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাও অসম্ভব নহে। প্রাচীনগণের প্রযুক্ত অনেক শব্দ পরবর্ত্তিগণ সেই অর্থে ব্যবহার করেন নাই, ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ভাষ্যপ্রয়োগের পরিবর্ত্তন সূচিরকাল হইতেই হইতেছে। প্রাচীন কালে বৈশেষিক অর্থে যোগ শব্দেরও প্রয়োগ হইত। হেমচন্দ্র স্বরি যোগ শব্দের অন্যতম অর্থ বলিয়াছেন—‘নৈমায়িক’ (বাচস্পত্য অভিধানে যোগ শব্দ দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন কালে নৈমায়িকগণ যোগ নামেও অভিহিত হইতেন। পরন্তু হরিবংশের কোন লোকে^২ “লোকায়তিকমুখ্য” শব্দ দেখিতে পাই। সেখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রসিদ্ধ অর্থে অনুপপত্তি দেখিয়া লক্ষণা অবলম্বনে

১। লোকায়ত শব্দের পরে তদ্ধিতপ্রত্যয়ে “লোকায়তিক” প্রয়োগের স্থায় “লোকায়তিক” এইরূপ প্রয়োগও হয়, ইহা রামানুজ ও নীলকণ্ঠের বাখ্যানুসারে তাহারিণের সম্মত বুঝা যায়। রামানুজ ও হরিবংশে “লোকায়তিক” এইরূপ পাঠও প্রকৃত হইতে পারে। কোন বহুত্রুত উপাখ্যায় ব্রহ্মশব্দের নিকটে শুনিয়াছি, “লোকায়তি” শব্দের উত্তরে তদ্ধিত প্রত্যয়েই কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা লোকেই বাহারিণের আঘতি, (উত্তরকাল) অর্থাৎ বাহারিণের মতে উত্তরকালীন পরলোক নাই, এইরূপ অর্থে লোকায়তিক বলিতে নাস্তিক। রামানুজে তাহারাই নিশ্চিত।

২। ঐকানানানুসংযোগ-সমবাহ-বিশারদৈঃ।

লোকায়তিকমুখ্যোক্ত শুক্রবুঃ পদবীৰ্ত্তঃ ।—হরিকণ্ঠ, ভবিষ্যতপর্ব্ব, ৬৭ অঃ, ৩০।

অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ লোকায়তিকমুখ্য বলিতে ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ বুঝিলে সেখানে কোন অল্পপত্তি থাকে না এবং সেখানে তাহাই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়। মূলকথা, রামানুজের কথা, কোটিল্যের কথা এবং হরিবংশের শ্লোক চিন্তা করিলে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্র “লোকায়ত” নামেও অভিহিত হইত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। লোকায়ত-শাস্ত্র দ্বিবিধ হইলে, আন্তিক ও নাস্তিক দ্বিবিধ লোকায়তিক হইতে পারে। হরিবংশে লোকায়তিক-মুখ্য বলিয়া আন্তিক লোকায়তিকেরই উল্লেখ হইয়াছে এবং রামায়ণে অনর্থকুশল, অজ্ঞ, দুর্কৃত ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিন্দা করিয়া কথিত লোকায়তিকদিগকে নাস্তিক বলিয়াই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। মহাভারতে বেদনিবন্ধ, নাস্তিক প্রভৃতি বহু বাক্যের দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে। পরন্তু যদি লোকায়তিক শব্দের দ্বারা চার্বাক-মতাবলম্বী ভিন্ন আর কাহাকে বুঝাই না যায়, ন্যায়শাস্ত্রের ‘লোকায়ত’ নামে উল্লেখ কোন কালে হয় নাই বলিয়াই নির্ণীত হয়, অর্থশাস্ত্রে কোটিল্য, বারহস্পত্য ইত্যাদিকেই যদি “লোকায়ত” বলিয়া আত্মনিকীর মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রামায়ণে লোকায়তিক শব্দের দ্বারা নৈয়ায়িকের গ্রহণ অসম্ভব। সুতরাং রামানুজের ব্যাখ্যা কল্পনা-প্রসূত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এ পক্ষেও অর্থশাস্ত্রে আত্মনিকীর মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ নাই, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, কোটিল্যের শেষ কথাগুলি পর্যালোচনা করিলে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা না বুঝিয়া পারা যায় না। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে যোগ শব্দের দ্বারা ন্যায় অথবা ন্যায়বৈশেষিক উভয়ই আত্মনিকীর মধ্যে কথিত হইয়াছে, ইহাই এ পক্ষে বুঝিতে হইবে। এবং অর্থশাস্ত্রে “যোগং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝিতে হইবে। ক্রীবলিঙ্গ “যোগ” শব্দের যে প্রাচীন কালে ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ হইত, তাহা ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায়। হেমচন্দ্র সূরির কথা এবং আরও অনেক জৈন স্ত্রাবের গ্রন্থের দ্বারা ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাৎস্তায়নের “যোগানাং” এই কথার ব্যাখ্যায় তাহা দেখাইরাছি। বাৎস্তায়নের “সাংখ্যানাং যোগানাং” এই প্রয়োগ দেখিয়া কোটিল্যের “সাংখ্যং যোগং” এই প্রয়োগের প্রতিপাদ্য বুঝা যায় (২২৬। ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত বলিতে ন্যায়শাস্ত্র বুঝিলে, যোগ বলিতে কেবল বৈশেষিক অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। আত্মনিকীর মধ্যে যোগশাস্ত্রও কোটিল্যের বক্তব্য হইলে সাংখ্য শব্দের দ্বারাও সাংখ্য-প্রবচন উভয় দর্শনকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কোটিল্য ন্যায়শাস্ত্রকে আত্মনিকী না বলিলে হেতুর দ্বারা জরী, বার্তা, দণ্ডনীতির বলাবল পরীক্ষা করতঃ লোকের উপকার করিতে কোটিল্যের কথিত কোন আত্মনিকী সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহা চিন্তা করা আবশ্যিক। মতান্তরে বিদ্যা ত্রিবিধ, ইহাও কোটিল্য বলিয়াছেন। রামায়ণেও ত্রিবিধ বিদ্যার উল্লেখ আছে। তবে সে কথার দ্বারা আর বিদ্যা নাই, ইহা বুঝা যায় না। সেখানে বিদ্যার পরিগণনা উদ্দেশ্য নহে। মহাভারতেও কোন স্থলে ঐরূপ প্রসঙ্গে ত্রিবিধ বিদ্যারই উল্লেখ দেখা যায়। সে যাহা হউক, কোটিল্য অর্থশাস্ত্রে ন্যায়শাস্ত্রকে কোন বিদ্যার মধ্যে গণ্য করেন নাই, সুতরাং তাহার সময়ে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না বা তাহার আলোচনা ছিল না, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

পরন্তু যে দিন হইতে শাস্ত্রাৰ্গবিচারের আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান জ্ঞায়শাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, কিরূপে বিচার করিতে হইবে, বাদবিচার কাহাকে বলে, সঙ্কল্পের কাহাকে বলে, অসঙ্কল্পের কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিচারকের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় জ্ঞায়শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। বিচারোপযোগী সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ জ্ঞায়শাস্ত্রেরই প্রস্থান। অহুমান-প্রমাণের বিত্ত্ব ও অন্ত্ব হেতু বা হেতুভাসের নিরূপণপূর্ব্বক তাহার সর্বাস এই জ্ঞায়শাস্ত্রেই সম্যকরূপে নিরূপিত হইয়াছে। শাস্ত্রাৰ্গ-নির্ণয়ে অহুমান-প্রমাণের সম্যক জ্ঞানও যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা সর্বসম্মত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অধ্যায়কে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি-পুরাণাদি শব্দপ্রমাণের সহিত অহুমান-প্রমাণেরও উল্লেখ আছে।^১ ভগবান্ মহু ও পূর্ব্বোক্ত পরিবদবর্ণনের পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ব্বাণ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্ররূপ শব্দ-প্রমাণের সহিত অহুমান-প্রমাণকেও সম্যকরূপে বুঝিবেন এবং তাহার পরশ্লোকেই আবার বলিয়াছেন যে, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্র-বিচার করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানেন; যিনি ঐরূপ তর্কের দ্বারা শাস্ত্র বিচার করেন না, তিনি শাস্ত্রগম্য ধর্ম্ম জানিতে পারেন না^২। এখানে মহু-বচনের “তর্ক” শব্দের দ্বারা অনেকে তর্কশাস্ত্র বুঝিয়াছেন। জ্ঞায়শাস্ত্র-বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে জন্ত এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে তাহারও উহাই অভিপ্রেত বুঝা যাইতে পারে। অনেকে ঐ “তর্ক” শব্দের দ্বারা অহুমান-প্রমাণ বুঝিয়াছেন^৩। ভাষ্যকার মেঘাতিথি প্রথমে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়া পরে নীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত তর্কের কথাও বলিয়াছেন। কুল্লুক ভট্ট “নীমাংসাদিত্যয়” বলিয়া প্রমাণ-সহকারী সর্বপ্রকার তর্কই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য “তর্ক” শব্দ পূর্ব্বোক্ত অনেক অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়। অহুমান-প্রমাণ অর্থেও তর্ক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শারীরক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও কোন কোন স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু মহু পূর্ব্বশ্লোকে প্রমাণত্রয়ের কথা বলিয়া পরশ্লোকে ঐ প্রমাণের সহকারী তর্কের কথাই বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ঐ তর্ক জ্ঞায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক পদার্থ। উহা কেবল অহুমান-প্রমাণেরই সহকারী নহে, উহা সকল প্রমাণেরই সহকারী। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ জ্ঞায়দর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝাইয়াছেন এবং নীমাংসাশাস্ত্রোক্ত তর্কও যে জ্ঞায়দর্শনোক্ত তর্কপদার্থ অর্থাৎ যে তর্কের নাম “নীমাংসা”, তাহাও জ্ঞায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত

১। স্মৃতি: প্রত্যক্ষ: ইতিজ্ঞা অহুমানচতুষ্টয়:। এতৈরানিত্যমণ্ডল: সর্বকরেব বিধায়তে ॥ ১, ২।

২। প্রত্যক্ষমহুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগম:।

ত্রয়ং সুবিস্তৃত কাৰ্ণাং ধর্ম্মতত্ত্বমভীপ্সতা ॥

বার্হাৎ ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

বস্তুর্কোবাসুসকলস্তে স ধর্ম্ম: বেদে নেভর: ॥ ১২, ১০৫-৬ ॥

৩। জ্ঞায়দর্শনটীকায় জয়প্রভট্ট মহুভবনোক্ত “তর্ক” শব্দের অর্থ ‘অহুমান’ই বলিয়াছেন। তর্কশব্দ: কেচিদহুমান

প্রমাণভেদে যথা স্মৃতিকার: বার্হাৎ ধর্ম্মোপদেশঞ্চ ইত্যাবি।—জ্ঞায়দর্শনী, ১০৮ পৃষ্ঠা।

তর্ক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা বুঝাইতে সেখানে মীমাংসাতার্যের কারিকাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বরদরাজ ন্যায়দর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত মনু-বচন উদ্ধৃত করায় তিনি মনু-বচনের ঐ তর্ক শব্দের দ্বারা প্রমাণ-সহকারী ন্যায়দর্শনোক্ত উহবিশেষরূপ তর্কই বুঝিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদান্তসূত্রে বেদব্যাং "তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপি" এই কথা বলিয়া পরেই আবার ঐ সূত্রেই বলিয়াছেন যে, যদি বল—অন্য প্রকারে অহুমান করিব, তাহা হইলেও অর্থাৎ অহুমান করিতে পারিলেও সেই অহুমান-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কজন্য জ্ঞান মোক্ষ-সাধন নহে। বেদব্যাং তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, এই কথা বলিয়া শেষে আবার ঐ কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, তর্কমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা নাই, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে লোকব্যাঞ্জার উচ্ছেদ হয়। পরন্তু যদি তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ হয়, অহুমানমাত্রেরই প্রামাণ্য সন্দিক্ত হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রই যে অপ্রতিষ্ঠ, ইহা কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবে? কতকগুলি তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া তদৃষ্টান্তে তর্কের দ্বারাই অর্থাৎ অহুমানের দ্বারাই তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তর্কমাত্রই যদি অপ্রতিষ্ঠ বা সন্দিক্ত-প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠাও তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। শঙ্কর এইরূপ অনেক কথা বলিয়া তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। শেষে বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রমাণসহকারী অনেক তর্কবিশেষও আবশ্যক, সুতরাং তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহাও বলিয়াছেন। ইহা সমর্থন করিতে সেখানে পূর্বোক্ত "প্রত্যক্ষমহুমানক" ইত্যাদি মনু-বচন ছাইট উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে আনন্দগিরি মনু-বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মনু-বচনে ধর্ম শব্দের দ্বারা ব্রহ্মও পরিগৃহীত। অর্থাৎ বিচারের দ্বারা ধর্মনির্ণয়ের ন্যায় ব্রহ্ম-নির্ণয়েও বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, বেদান্তদর্শন বা শারীরক ভাষ্যে তর্কমাত্রকেই অপ্রতিষ্ঠ বলা হয় নাই। পরন্তু শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে অহুমান-প্রমাণ ও প্রমাণ-সহকারী তর্কবিশেষ আবশ্যক, ইহা আচার্য্য শঙ্কর সমর্থনই করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে মনুর কথা তিনিও স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তর্ককে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেহই শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। বিচার দ্বারা বীহারাই শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার সকলেই তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন। বেদব্যাংয়ের বেদান্তবাক্য-মীমাংসাও তর্কই। তাহার অবিরোধী যে সকল তর্ক পূর্বমীমাংসা ও ন্যায়দর্শনে কথিত হইয়াছে, সেগুলি ঐ বেদান্ত-বাক্য-মীমাংসার উপকরণ, ইহা ভাষ্যকার শঙ্কর ও ভামতী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথাতেই ব্যক্ত আছে^১।

১। সম্পূর্ণ বেদান্ত-সূত্রটি এই,—তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্ত্যাহুমানম্বেদমিতি চেষ্টেবমপ্যবিসোক-প্রসঙ্গঃ। ২, ১, ১১।

২। তদ্ব্যবহিকজিহ্বাসোপপাদ্যমুখেন বেদান্তবাক্য-মীমাংসা-তদবিরোধিত্বকোপকরণ্য প্রস্তুতমুচে।—শারীরক ভাষ্য, ১ম সূত্রভাষ্যের শেষ। সূত্রত্যাংপর্য্যমুপসাহরতি তদ্ব্যবহিত। বেদান্ত-মীমাংসা ভাব্য তর্ক এব, তদবিরোধিনশ্চ বেহস্তেহপি তর্ক। অকরমীমাংসায়। স্তায়ে চ বেদপ্রত্যক্ষানি-প্রামাণ্য-পরিশোধনোদ্বিগ্ধজ্ঞান্তে উপকরণং বস্তাঃ সা তথোক্তা।—ভামতী।

বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শব্দপ্রমাণের ভ্রাম সাধ্যঃ সম্বন্ধেও যুক্তি অর্থাৎ অমুমান-প্রমাণকেও আশ্রয় করিয়াছেন। (“যুক্তৈঃ শব্দান্তরাচ্চ । ২।১।১৮ স্বত্র ভ্রষ্টব্য) । বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর আশ্রয় নিত্যত্ব সাধন করিতে শেষে “ভ্রাম্যচ্চ” (৩।৪) ইত্যাদি সম্বন্ধের দ্বারা তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থনের এবং শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার জন্ত সকল আচার্য্যই বহুবিধ তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন। বিচারশাস্ত্রে, দর্শনশাস্ত্রে তর্ক সকলেরই অপরিহার্য্য অবলম্বন। সকলেই হেতু উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। হেতুবাদ পরিত্যাগ করিলে কেহই স্বপক্ষের সমর্থন ও বিজ্ঞাপন করিতেই পারেন না,—তাহা অসম্ভব। “শাস্ত্রযোনিদ্বাং,” “তত্ত্ব সমন্বয়াং,” “ঈক্ষতের্নাশকং” ইত্যাদি বেদান্তস্বত্রের ও হেতু উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ও বলিয়াছেন,—“ব্রহ্মস্বত্রপদৈশ্চৈব হেতু-মদভিকিনিশ্চিতৈঃ” (১০।৫); সেখানে ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“হেতুমদভিযুক্তি-যুক্তৈঃ।” শ্রীধরবামী “ঈক্ষতের্নাশকং” ইত্যাদি বেদান্তস্বত্রের উল্লেখ করিয়াই ঐগুলি হেতুনিশ্চিত, ইহা দেখাইয়াছেন। এখন যদি হেতুর দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হয়, শব্দপ্রমাণেরও সহকারিত্বপে হেতু বা যুক্তি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হেতু কাহাকে বলে, কোন্ হেতুর দ্বারা কোন্ সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কোন্ হেতুর দ্বারা তাহা পারে না, হেতুর দোষ কি, গুণ কি, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক জ্ঞান যে নিত্য আবশ্যক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি, শাস্ত্রে কোথায় কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও সকলকেই বুঝিতে হইবে। উপক্রম, উপসংহার প্রভৃতি বড় বিধ লিঙ্গের দ্বারা বেদের যে তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেও ত তর্কের দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয়। কলকথা, হেতু ও হেতুভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বিচার দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। তাই ভগবান্ মহা ধর্মনির্ণয়-পরিষদে হৈতুক পণ্ডিতকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। হেতু ও হেতুভাসের তত্ত্ব, অমুমান-প্রমাণের তত্ত্ব, তর্কের তত্ত্ব ভ্রাম্যশাস্ত্রেই সম্যকরূপে—সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইয়াছে, ঐগুলি ভ্রামবিদ্যারই প্রস্থান। সুতরাং হেতুর দ্বারা কিছু বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলেই ভ্রাম্যশাস্ত্র অপরিহার্য্য অবলম্বন। তাই পুরাণে এবং বেদের চরণব্যাংহে ভ্রাম্যশাস্ত্র “ভ্রাম্যতর্ক” নামে বেদের উপাঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে^১। আচার্য্য শঙ্করও বেদান্তদর্শনের তৃতীয় স্বত্রভাষ্যে বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে বেদকে বলিয়াছেন—“অনেকবিদ্যাহানোপবৃংহিত”। অনেক অঙ্গ ও উপাঙ্গ বেদের উপকরণ। পুরাণ, ভ্রাম নীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র এবং শিক্ষাকল্পাদি মন্ত্র, এই দশটি বিদ্যাহান অর্থাৎ বেদার্থবোধে হেতু। বেদ এই দশটি বিদ্যাহানের দ্বারা উপকৃত। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি টীকাকার শঙ্করের ঐ কথার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং বেদার্থ-বোধের জন্য সুপ্রাচীন কালেও বেদাঙ্গ ব্যাকরণশাস্ত্রের ন্যায় বেদের উপাঙ্গ ন্যায় শাস্ত্রও আলোচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই এবং যে আকারেই হউক, ন্যায়শাস্ত্র সুপ্রাচীন কালেও ছিল, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। সকল বিদ্যারই পরমাত্মা হইতে প্রবৃতি, ইহা উপনিষদে

১। নীমাংসা-ভ্রাম্যতর্ক উপাঙ্গঃ পরিকীর্তিতঃ ॥—ভ্রাম্যস্বত্রবৃত্তিকারের উদ্ধৃত পুরাণ-বচন। তন্মাত্র সাধনমীতা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। তথা প্রতিগদমহাপং ছন্দো ভাবা ধর্মো নীমাংসা ভ্রাম্যতর্কী ইতুপাঙ্গানি।—চরণব্যাংহ।

বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তন্মধ্যে “সূত্রাণি” এই কথাও পাওয়া যায় (২।৪।১০)। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় “সূত্রাণি ভাষ্যাণি” এই কথার দ্বারা সূত্রের ন্যায় ভাষ্যেরও উল্লেখ দেখা যায় (৩ অ., ১৮৯)। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও ভাষ্যভাষ্যের শেষে অক্ষপাদ শব্দের সম্বন্ধে ভাষ্যশাস্ত্র প্রতিষ্ঠাত হইয়াছিল, এই কথা বলিয়াছেন; অক্ষপাদ শব্দকে ন্যায়শাস্ত্রকর্তা বলেন নাই। ন্যায়-বার্ত্তিকারস্তু উদ্যোতকরও অক্ষপাদ মুনিকে ন্যায়শাস্ত্রের বক্তা বলিয়াছেন, কর্তা বলেন নাই।

পরন্তু বিচারপূর্বক বেদার্থবোধে যেমন ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক, তজ্জপ মুমুকুর শ্রবণের পর কর্তব্য মননে ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ আবশ্যক। কারণ, শাস্ত্র দ্বারা যে তত্ত্বের শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্র বোধ করিবে, অহুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ নির্ণীত তত্ত্বের পুনর্জানিই মনন। শ্রুত তত্ত্বে দৃঢ়শ্রদ্ধা হইবার জন্যই বহু হেতুর দ্বারা ঐ জ্ঞাত বিষয়েও পুনঃ পুনঃ অহুমানরূপ মননের বিধি শাস্ত্রে উপদিষ্ট। (মন্তব্যশোপ-পদ্ধতিঃ)। শ্রবণের পরে মননের দ্বারা ধ্যানাদিই মনন নহে। ধ্যানাদি (নিদিধ্যান) মননের পরে বিহিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির “মন্তব্যঃ” এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্করও বলিয়াছেন—“পশ্চান্মন্তব্যস্তকৃতঃ”। অর্থাৎ শ্রবণের পরে তর্কের দ্বারা মনন করিবে, উপনিষদ্রুত যোগাঙ্গবিশেষ উৎকৃষ্ট তর্কেই মনন বলেন নাই। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বেদান্তব্যাক্যের অবিরোধি অহুমান প্রমাণও শ্রুত বেদার্থজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য অবলম্বনীয়। কারণ, শ্রুতিই তর্ককে সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। এই বলিয়া শেষে “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্করী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ঐ মননের ব্যাখ্যা করিতে যুক্তিবিশেষের দ্বারা বিবেচনাকে মনন বলিয়াছেন এবং ঐ যুক্তিকে বলিয়াছেন—অর্থাৎপত্তি অথবা অহুমান। নীমাংসক-মতে অর্থাৎপত্তি অহুমান-প্রমাণ হইতে ভিন্ন প্রমাণ; সূতরাং বাচস্পতি মিশ্র তাহারও প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়মতে অর্থাৎপত্তি অহুমানবিশেষ। মূলকথা, শ্রবণের পরে অহুমানরূপ মনন সর্বসম্মত। আচার্য্য শঙ্করও তর্কের দ্বারা মনন কর্তব্য বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আত্মবিষয়ে কৃতর্কেরই নিবেদন করিয়াছেন, তর্কমাত্রের নিবেদন করেন নাই। পরন্তু শ্রুতিই যে ঐ বিষয়ে তর্ককে অবলম্বনীয় বলিয়াছেন, ইহাও শঙ্কর বলিয়াছেন। কঠোপনিষৎ দেখানে আত্মাকে “অতর্ক্য” বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—“নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,” সেখানে ভাষ্যকার শঙ্কর ঐ তর্ক শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—শাস্ত্র-নিরপেক্ষ স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা উৎকৃষ্ট কৃতর্ক।

শাস্ত্রদ্বারা আত্মার শ্রবণ (শাস্ত্র বোধ) করিয়াই পরে সেই শাস্ত্র-সম্মতরূপে অহুমানরূপ মনন করিতে হইবে। শাস্ত্রকে অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীন বুদ্ধিবলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। এবং বেদশাস্ত্র-বিরোধি তর্ক—কৃতর্ক। এই সকল সিদ্ধান্ত বেদপ্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়েরই সম্মত। ভাষ্যশাস্ত্রেও উহার বিপরীত বাদ নাই। বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক গোঁতম মতে

১। অতর্ক্যমতর্ক্যঃ প্রবুদ্ধ্যাহুহেন কেবলেন তর্কেণ। নহি কৃতর্কস্ত প্রতিষ্ঠা কচিদ্বিদাতে। নৈবা তর্কেণ প্রবুদ্ধ্যাহুহমারোণ।—কঠ, ১ অ., ২ ব্রহ্মী। ৮-৯। শঙ্করভাষ্য।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ অহুমান ভায়ই নহে, উহা জ্ঞানভাস নামে কথিত; উহা অপ্রমাণ। জ্ঞানস্বত্বকার মহর্ষি গোতম কোন স্থানে কোন বিরুদ্ধ অহুমানের চিন্তা করিয়া “শ্রুতিপ্রামাণ্যচ্চ” (৩।১।২৯) এই সূত্রের দ্বারা ঐ অহুমানের বেদবিরুদ্ধতা সূচনা করতঃ উহার অপ্রামাণ্য সূচনা করিয়া গিয়াছেন। গোতম মতে শ্রুতি অপেক্ষায় যুক্তিই প্রধান, অহুমানের অবিরোধে শ্রুতির প্রামাণ্য, ইহা একেবারেই অসত্য কথা। শ্রুতিসেবক ঋষির ঐরূপ মত হইতেই পারে না। প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অহুমানই অস্বীকা। সেই অস্বীকা নির্বাহের জন্তই আত্মগীকী বিদ্যার প্রকাশ। সুতরাং জ্ঞানদর্শনে মীমাংসা-দর্শনের জ্ঞান বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বাক্যার্থ বিচার হয় নাই। কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্রবক্তা গোতম যে বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল অহুমানের দ্বারাই আত্মাদি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যায় না। বেদপ্রতিপাদিত পদার্থকে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা করিলে ঐ পদার্থে কাহারও সংশয় বা আপত্তি থাকে না। কারণ, ঐ পঞ্চাবয়বের মূলে সর্বপ্রমাণ থাকায় ঐ জ্ঞাননির্ণীত পদার্থ সর্বপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই জন্ত ঐ জ্ঞানকে পরমজ্ঞায় বলা হইয়াছে; উহাই প্রকৃত জ্ঞান। ঐ প্রকৃত জ্ঞানের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞার মূলে সর্বত্রই আগম-প্রমাণ থাকিবে। বেদার্থ বিষয়ে বিবাদ হইলে ঐ পরমজ্ঞায় অবলম্বনে বেদার্থের পরীক্ষা আবশ্যক হয়। গোতমের পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞান নিরূপণের ইহা মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাত বেদার্থের সমর্থন করিতে দার্শনিক আচার্য্যগণ সকলেই অহুমানেরও অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রেও তাহা পাওয়া যাইবে। কেবল অহুমানের দ্বারাও অনেক স্থলে আচার্য্যগণ সকলেই অনেক তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে অহুমান বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহা বৈদিক সম্প্রদায়ের সকলের মতেই অপ্রমাণ। কোন অহুমান বেদবিরুদ্ধ, তাহা নির্ণয় করিতেও পূর্বে বেদার্থ নির্ণয় আবশ্যক। বেদে বহু প্রকারে বহু ত্বর্কোপ তত্ত্বের বর্ণন আছে। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদে সকল সিদ্ধান্তই বর্ণিত আছে। পূর্বপক্ষরূপে সমস্ত নাস্তিক মতেরও উল্লেখ আছে। বেদের সর্বাত্মকই মহর্ষিগণের অধিগত ছিল। যে সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞাতব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যার দ্বারা জ্ঞাপন আবশ্যক। সকল বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ স্মৃতির দ্বারা তাহার জ্ঞাপন ও সমর্থন না করিলে আর কেহ তাহা করিতে পারে না। বেদার্থ স্মরণপূর্বক পুরাণশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, মীমাংসাশাস্ত্র প্রভৃতির প্রণেতা মহর্ষিগণ নিষ্টে, তাঁহারা সকলেই বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সকল বিদ্যাস্থানের দ্বারা বেদ উপকৃত, ইহা আচার্য্য শব্দরের বক্তব্যবিশেষ বুঝাইতে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন^১। মূলকথা, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ জীবের সকল দুঃখের নিদান মিথ্যাজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে রূপা করিয়া নানাপ্রকারে বেদবর্ণিত নানা সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়াছেন। অধিকারাহুসারে

১। “অনেকবিদ্যাস্থানোপকৃতিস্ত”। পুরাণ-জ্ঞানমীমাংসাবয়ো দশ বিদ্যাস্থানানি তৈত্তর্য্য তথা দ্বারা উপকৃতস্ত। তদনেন সমস্ত শিষ্টগনপরিগৃহ্যেণাপ্রামাণ্যশাস্ত্রাপাকৃত। পুরাণাদি-প্রণেতাবো হি মহর্ষয়ঃ শিষ্টাশ্রিত্যতঃ তথা দ্বারা বেদানি বাচ্যক্যৈবত্ববর্ণক্যাবরণোচ্চিষ্টকিঃ পরিগৃহীতো বেদ ইতি।—ভামতী, ৩ পৃঃ।

গুরু ও শাস্ত্র-সাহায্যে বিচার দ্বারা শ্রবণ ও মনন করিলে গুরুপদটি তত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। পরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে অধিকার জন্মে না; সুতরাং পরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য বিবিধ তত্ত্বের বিচারাদি আবশ্যক হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন পূর্বক ধ্যান-ধারণাদির ফলেই চরমজ্ঞেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। সে জ্ঞান মুমুক্শু মাত্রকেই বোগশাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জায়হুজ্জকার মহর্ষি গৌতমও শেষে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই সর্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য, বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিবার জন্য দার্শনিক ঋষিগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বর্ণন করিলেও তাঁহাদিগের মতভেদ দেখিয়া প্রকৃত অধিকারীর শ্রবণ-মননাদি সাধনা আজও উঠিয়া যায় নাই। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-গুলির বিচার ও সমালোচনা হইয়াছে। তাহার ফলে যে, জ্ঞান-রাজ্যের কোনই উন্নতি হয় নাই, তদ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের পথে আজ পর্য্যন্ত কোন লোকই যে অগ্রসর হন নাই, ইহা বলিলে পরম সত্যের অপলাপ করা হইবে। ঋষিগণ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ, আচার্য্যগণ সূত্রির কাল হইতে বহু প্রকারে জ্ঞানরাজ্যের বিপুল বিস্তার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদেরিগের গুরু। সকলের সিদ্ধান্তই তত্ত্বনির্ণায়ক জ্ঞাতব্য। সিদ্ধান্তের ভেদ না থাকিলে বিচার প্রবৃত্ত হয় না; এ জন্য মহর্ষি গৌতম বোধশ পদার্থের মধ্যে সিদ্ধান্তের বিশেষ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ বলিয়া সিদ্ধান্তের ভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। গৌতম অত্র দর্শনের সিদ্ধান্তকেও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। সকল সিদ্ধান্তবাদীই বিভিন্ন প্রকার তর্কের দ্বারা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তকে শ্রোত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বিচারদ্বারা তত্ত্বনির্ণায়ক সে সমস্ত ব্যাখ্যাও আলোচ্য। ন্যায়াচার্য্যগণ বেক্রপে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। এখন প্রকৃত কথা এই যে, মুমুক্শুর তত্ত্ব শ্রবণের পরে বহু হেতুর দ্বারা ঐ তত্ত্বের যে মনন করিতে হইবে, তাহাতে ন্যায়দর্শন সকল সম্প্রদায়েরই পরম সহায়। কারণ, জ্ঞানদর্শনে আত্মার দেহাদি-ভিন্নত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তের মননের হেতু বলা হইয়াছে, তাহা সকল সাধকেরই গ্রাহ্য। আত্মা নিত্য, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপে বহু হেতুর দ্বারা দীর্ঘকাল মনন করিলে পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল প্রভৃতি সিদ্ধান্তে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ঐ সকল সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস সকল সাধকেরই সর্বগ্রাণে আবশ্যক। এইরূপ আরও অনেক সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তের সমর্থন জ্ঞানদর্শনে আছে। জ্ঞানদর্শন যে ঐ সকল মননের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা নির্বিশ্বাস। পরন্তু যে সম্প্রদায় গুরুপদেশ অনুসারে বেক্রপেই যে তত্ত্বের মনন করিবেন, ঐ মননের হেতুজ্ঞান এবং ঐ হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি তাঁহার নিত্যত্বই আবশ্যক। অনুমানরূপ মনন নির্বাহ করিতে হইলে তাহাতে যে সকল জ্ঞান আবশ্যক, তাহা জ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যেই সম্যক লাভ করা যায়। হেতু ও হেতুভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত যথার্থরূপে মনন হইতেই পারে না। সুতরাং বেদের আদেশানুসারে সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই যখন অনুমানরূপ মনন করিতেই হইবে, তখন সেই মনন নির্বাহের জন্য ন্যায়শাস্ত্র সকলেরই আবশ্যক। শ্রবণ-মননের কোনই প্রয়োজন নাই, পরন্তু শাস্ত্র-বিচার ও তর্ক,

ভক্তির পরিপন্থী ; অতরাং ইহা বর্জনীয়, ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নহে। শাস্ত্রানুসারী কোন সম্প্রদায়ই ইহা বলেন নাই ও বলিতে পারেন না। শ্রবণ ও মনন ব্যতীত কেহ উত্তমাদিকারী হইতে পারে না। যে কোন জন্মে শ্রবণ ও মনন করিয়া মহাভগবৎ সকলেই উত্তমাদিকারী হইয়াছেন এবং সকলকেই তাহা করিয়া উত্তমাদিকারী হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবও শাস্ত্রযুক্তি-অনিপুণ ব্যক্তিকেই উত্তমাদিকারী বলিয়া কৃতশ্রবণ ও কৃতমনন ব্যক্তিকেই উত্তমাদিকারী বলিয়াছেন এবং তিনি জিজ্ঞাসু সম্মানিগণকে তাহার অবলম্বিত ঈশ্বর-পরিণাম-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইয়া হেতু ও দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ঐ সিদ্ধান্তে আপত্তি খণ্ডন পূর্বক তর্কবারা নিকর্ষিকাররূপে ঈশ্বরের মনন-পদ্ধতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসাবশতঃই সেখানে বহু বিচার ও তর্ক করেন নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক^১।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণের বাক্য অবলম্বনে অনেক কণার আলোচনা করা গেল। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে ১০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িলে ভ্রায়দর্শনের প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যাইবে। পুনরুক্তি অকর্তব্য বলিয়া এখানে আর সে সকল কথা বলা গেল না।

ভ্রায়দর্শনের অধ্যায়াদি-সংখ্যা

ভ্রায়দর্শনে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহিক আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এক দিবসে যতগুলি সূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাই একটি আহিক নামে কথিত হইয়াছে। দশ দিনে সমস্ত ভ্রায়সূত্র রচিত হওয়ায় দশটি আহিক হইয়াছে। কিন্তু ভ্রায়-সূত্রাকার মহর্ষি সর্বপ্রথমে এক দিবসে যতগুলি সূত্রের অব্যাপনা করিয়াছিলেন, তাহাই আহিক নামে কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। বাচস্পত্য অভিধানে পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচ-স্পতি আহিক শব্দের অস্তুতম অর্থ লিখিয়াছেন, সূত্রগ্রন্থের ভাষ্যের পাদাংশ ব্যাখ্যাবিশেষ। এবং এক দিবসে পাঠ্য, ইহাই ঐ আহিক শব্দের বৌগিক অর্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সূত্রগ্রন্থের অংশবিশেষও আহিক নামে কথিত হইয়াছে। তদনুসারেই তাহার ভাষ্যেরও অংশবিশেষ আহিক নামে কথিত বলিয়া বুঝা যায়। পরে যে দেবীপুরাণের রচন প্রদর্শন করিব, তাহাতে ভ্রায়সূত্রাকার গোতম দশ দিনে প্রথমে শিব্যাগণকে ভ্রায়সূত্র পড়াইয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যাইবে।

পঞ্চাধ্যায়ী ভ্রায়সূত্রই যে মহর্ষি অক্ষপাদের প্রণীত, ইহা ভাষ্যাকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি

১। শাস্ত্রযুক্তি-অনিপুণ দূঢ় শ্রদ্ধা যায়।

উত্তমাদিকারী হিহা তারয়ে সংসার ৪—১৫০ চং, মধ্য, ২২।

২। অবিচিন্তা শক্তিদুক্ত শ্রীভগবান্।

খেচ্ছায় ভগবৎরূপে পায় পরিণাম।

তথাপি অচিন্তা শব্দে হয় অবিকারী।

প্রাকৃত মণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি।

নানা রত্নরাশি হয় চিরামণি হৈতে।

তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃত।

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্তা শক্তি হয়।

ঈশ্বরের অচিন্তা শক্তি ইহা কি বিষয়।

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৭ম পৃ।

আচার্য্যগণ নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে কোন সংশয়েরও সূচনা করেন নাই। কিন্তু এখন কোন কোন ঐতিহাসিক মনীষীর সমালোচনায় ইহাও পাইয়াছি যে, প্রচলিত ভ্রাম-দর্শনের অবিকাংশ সূত্রই পরে অল্প কর্তৃক রচিত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পরে রচনা করিয়া সংযোজিত করা হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতের আলোচনা থাকায়, উহা বৌদ্ধ-যুগে রচিত এবং মূল ভ্রামশাস্ত্র কেবল হেতুবিদ্যা; উহাতে অধ্যায়-বিদ্যার কোন কথাই ছিল না। এই গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই নবীন মতের আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থ-শেষে সমালোচনা দ্বারা সকল কথা বুঝা যাইবে।

পর্যায় ভ্রামদর্শনই মহর্ষি অকপাদের প্রণীত, এ বিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে কোনরূপ মতভেদের চিহ্ন না থাকিলেও ভ্রামসূত্রের সংখ্যা ও অনেক সূত্র পাঠে পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ দেখা যায়। বাৎস্তায়নের পূর্ক হইতেই নানা কারণে ভ্রামসূত্র বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল। বাৎস্তায়ন ভ্রামসূত্রের উদ্ধার করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বাৎস্তায়নের পূর্বেও যে ভ্রামসূত্রের সংখ্যা ও পাঠ লইয়া বিবাদ ছিল, তাহা বাৎস্তায়নের কথার দ্বারাও অনেক স্থানে মনে আসে। যথাস্থানে সে কথার আলোচনা করিয়াছি। বাৎস্তায়ন ভ্রাম-ভাষ্যে ভাষ্যলক্ষণানুসারে প্রথমতঃ সূত্রের ভ্রাম সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করিয়া পরে নিজেই এই নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাকেই বলে “স্বপদ-বর্ণন”। পরে বাৎস্তায়নের এই সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলির মধ্যে অনেক বাক্যকে অনেকে ভ্রামসূত্র-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার প্রকৃত ভ্রামসূত্রেও অনেকে বাৎস্তায়নের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে হস্ত-লিপিত পুথিতে সূত্র ও ভাষ্য কোন চিহ্নাদি যোগ বাতাত লিপিবদ্ধ থাকায় অনেকের ঐরূপ ভ্রম হইয়াছে। সেই ভ্রমের ফলেও ভ্রামসূত্র বিষয়ে কতকগুলি মত-ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। আবার অনেকে স্বমত সমর্থনের জন্তও ভ্রামসূত্রের কল্পনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। ভ্রামসূত্র-বিবরণকার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য চতুর্থাদ্যায়ের সর্বশেষে “তত্ত্বস্ত বাদরায়ণাং” এইরূপ একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া তাহারও বিবরণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার বৎস্তায়ন হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্যন্ত কোন আচার্য্যই ঐরূপ সূত্রের উল্লেখ করেন নাই; ঐ ভাবের কথাই কেহ বলেন নাই। নবীন গোস্বামিভট্টাচার্য্য যে এই সূত্রটি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। তিনি এই সূত্রটি কোন পুস্তকে পাইয়া, উহা নাসূত্র হওয়াই সম্ভব ও আবশ্যক মনে করিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু ঐ সূত্রটি যে পরে কোন পণ্ডিতের রচিত, ইহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। মহর্ষি অকপাদ ভ্রামদর্শনে বলিবেন যে, “যাহা বলিলাম, তাহা তত্ত্ব নহে। তত্ত্ব কিন্তু-বাদরায়ণ হইতে অর্গাং বেদবাস-প্রণীত শাস্ত্র হইতে জানিবে”, ইহা কি সম্ভব? কোন দর্শনকার খয়ি কি এইরূপ কথা বলিয়াছেন বা বলিতে পারেন? গোস্বামি ভট্টাচার্য্যও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা সংগত বোধ না হওয়ায় কষ্ট-কল্পনা করিয়া অল্প প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ঐরূপ ভাব একেবারে যায় নাই। ফলকথা, বহু কারণেই ভ্রামসূত্রের সংখ্যা ও পাঠ বিষয়ে বহু মত-ভেদ হইয়াছে।

প্রাচীন উদ্যোতকরের সময়েও ন্যায়সূত্র-পাঠে মতভেদ ছিল, ইহা তাঁহার বার্তিকে প্রকটিত আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অতিরিক্ত কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ পূর্বক তাহার বৃত্তি করিয়াছেন। ভাব্যাকারের সংক্ষিপ্ত বাক্যমধ্যেও তাঁহার কোন কোন সূত্র দেখা যায়। বিশ্বনাথের পূর্বে উদয়নাচার্য্য বোধসিদ্ধি বা ন্যায়পরিশিষ্ট নামে এবং গঙ্গেশের পুত্র বর্তমান উপাধ্যায় “অবীকানয়-তত্ত্ববোধ” নামে স্তায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছেন। মিথিলেশ্বরস্বরি নবীন বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়-তত্ত্বালোক নামে ন্যায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়া ন্যায়সূত্র-পাঠ নির্ণয়ের জন্য ন্যায়সূত্রোদ্ধার নামে গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছেন। কলকথা, ন্যায়সূত্র-পাঠাদি বিষয়ে সূচিরকাল হইতেই যে নানা মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নানা গ্রন্থের দ্বারা ই বুঝা যায়। এবং তাহার দ্বারা পূর্বকালে স্তায়সূত্র যে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হইয়া বিকৃত ও কলিত হইয়াছিল, ইহাও বুঝা যায়। তাহাতেই সর্বতত্ত্বস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকা নির্মাণ করিয়াও স্তায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠাদি বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া বাইবার জন্ত “স্তায়সূচীনিবন্ধ” রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ গ্রন্থে স্তায়দর্শনের পাঁচ অধ্যায়ে যে যে সূত্রের দ্বারা যে নামে যে প্রকরণ আছে, তাহাও সেই স্থানেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সর্বশেষে আবার সমস্ত সূত্রাদির গণনার দ্বারা ইহাও লিখিয়া গিয়াছেন যে, “এই স্তায়শাস্ত্রে অধ্যায় ৫। আক্ষিক ১০। প্রকরণ ৮৪। সূত্র ৫২৮। পদ ১৭২৬। অক্ষর ৮৩৮৫। বাচস্পতি মিশ্র এইরূপে সমস্ত স্তায়সূত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্ধারণ করিয়া কেন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্মরণ চিন্তা করিয়া দেখুন। স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকাকার সর্বতত্ত্বস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রই যে “স্তায়সূচীনিবন্ধ” রচনা করিয়াছেন, ইহাই পণ্ডিতমহাশয়ের সিদ্ধান্ত। কারণ, স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি স্তায়সূচীনিবন্ধের প্রারম্ভেও দেখা যায় এবং স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে “ইচ্ছামঃ কিমপি পুণ্যং” ইত্যাদি যে চতুর্থ শ্লোকটি আছে, উহা (চতুর্থ চরণ “উদ্যোতকরণবীনাং” এই স্থলে “শ্রীগোতমভূগবীনাং” এইরূপ পরিবর্তন করিয়া) “স্তায়সূচীনিবন্ধে”র শেষে উল্লিখিত দেখা যায় এবং স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার শেষে কথিত “সংসারজলধিসেতৌ” ইত্যাদি শ্লোকটিও স্তায়সূচীনিবন্ধের শেষে দেখা যায়। গ্রন্থারম্ভেও “শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ” এইরূপ কথা রহিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র নামে অস্ত্র কোন পণ্ডিত, ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে তিনি সুবিখ্যাত বাচস্পতিমিশ্রের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকাদি লিপিবদ্ধ করিয়া নিজের পরিচয়-বোধের বিরোধি কার্য্য কেন করিবেন? ঐ সব শ্লোক তাহার নিবন্ধ করিবার কারণই বা কি আছে? অস্ত্র কোন একজন পণ্ডিত “স্তায়সূচীনিবন্ধ” রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শেষে অপর কেহ তাৎপর্য্যটীকাকারের শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনারও কোন কারণ নাই। নিকারণে ঐরূপ কল্পনা করিলে নানা গ্রন্থেই ঐরূপ কল্পনা করা যায়। পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র স্তায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকায় বৈকুণ্ঠ সূত্রপাঠের উল্লেখ করিয়াছেন, স্তায়সূচীনিবন্ধের সূত্রপাঠের সহিত তাহার সাম্য দেখা যায়। ছুই এক স্থানে যে একটু বৈষম্য দেখা যায়, তাহা লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদ-জন্ত, ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। যুক্তিত

তাৎপর্যটীকা গ্রন্থে অনেক স্থলে স্তায়সূত্র পাঠের উল্লেখ দেখাও যায় না (দ্বিতীয়খণ্ডের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য)। আবার মুদ্রিত তাৎপর্যটীকায় লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ কোন কোন স্থলে অনেক অংশ মুদ্রিতও হয় নাই ; ইহাও এক স্থলে ভাষাব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি (২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, তাৎপর্যটীকা গ্রন্থের সহিত স্তায়সূত্রানিবন্ধের কোন বিরোধ নির্ণয় করা যায় না। পরন্তু স্তায়সূত্রানিবন্ধের সূত্রপাঠের সহিত তাৎপর্যটীকার সূত্রপাঠের যে সাম্য দেখা যায়, তাহার দ্বারা তাৎপর্যটীকার বাচস্পতি মিশ্রই যে স্তায়সূত্রানিবন্ধকার, ইহা বুঝা যায়। এই গ্রন্থের টিখনীতে যথাস্থানে তাহা দেখাইয়াছি এবং স্তায়সূত্রপাঠে মতভেদের আলোচনাও করিয়াছি। উদ্যোতকর স্তায়বার্তিককে স্তায়সূত্রগুলির উদ্ধার করিয়াই পরে তাহার নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সর্বত্র তাহার সমস্ত সূত্রপাঠ নির্ণয় করা যায় না। মুদ্রিত বার্তিক গ্রন্থে সূত্রপাঠের বৈষম্যও দেখা যায়। উদ্যোতকর বার্তিকনিবন্ধে অনেক স্থলে “ইহা সূত্র” ইত্যাদি প্রকারে সূত্রের পরিচয় দিলেও অনেক স্থলে ঐরূপ পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু কোন স্থলে সূত্রপাঠে বিবাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের বার্তিকের টীকা করিয়াও শেষে স্বতন্ত্রভাবে স্তায়সূত্রের পাঠাদি নির্ণয়ের জন্য স্তায়সূত্রানিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে সমস্ত স্তায়সূত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী বাচস্পতি মিশ্র ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি ইহাতে প্রাচীন বিশ্ববিখ্যাত বহুশ্রুত মহামনীষী তাৎপর্যটীকার বাচস্পতি মিশ্রের স্তায়সূত্রানিবন্ধই সর্বাপেক্ষা মাত্র। তাই স্তায়সূত্রানিবন্ধানুসারেই সূত্রপাঠাদি গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে স্তায়সূত্রানিবন্ধের সূত্রপাঠেরও সমালোচনা করিয়াছি। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে স্তায়সূত্রানিবন্ধানুসারেই সেই অধ্যায়ের প্রকরণগুলির নাম ও সূত্রসংখ্যা প্রকাশ করিয়াছি। প্রথমখণ্ডের প্রকরণাদি-সংখ্যা এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্তায়সূত্রকার মহর্ষির নামাদি

ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বহু আচার্য্য স্তায়সূত্রকার মহর্ষিকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্তায়সূত্র যে মহর্ষি গোতম বা গোতম মুনির প্রণীত, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ আছে ; বহু গ্রন্থকারও তাহা লিখিয়াছেন। স্তায়সূত্রকার মহর্ষির অক্ষপাদ নামবিষয়ে কোন বিবাদ নাই ; কিন্তু তিনি যে গোতম বা গোতম, এ বিষয়ে বিবাদ আছে। কেহ বলেন গোতম, কেহ বলেন গোতম। গোতম মুনি বলিলে অত্র গোতম মুনিকেও বুঝা যাইতে পারে, এই জন্তই মনে হয়, ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি দূরদর্শী আচার্য্যগণ অক্ষপাদ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন অক্ষপাদ কোন মুনির নামান্তর, ইহা জানিতে পারিলেই স্তায়সূত্রকার মহর্ষির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। অল্পসঙ্কানের ফলে হৃদপুরাণে পাইয়াছি, অহল্যাপতি গোতম মুনির নামান্তর অক্ষপাদ। অহল্যাপতি ঋষি যে গোতম, ইহা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে

১। অক্ষপাদো মহাশৌকী গোতমাখ্যোহভবনমুনিঃ।

পোদারবীসমানোক্ত অহল্যায়ঃ পতিঃ শ্রুতঃ ৪—মহেশ্বরখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, ৫৫ অঃ, ৫ শ্লোক।

পাওয়া যায় এবং তিনি গৌতম নামেই সুপ্রসিদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারতাদি বহু গ্রন্থের গৌতম পাঠ অনুল্ল বলা এবং ঐ সুপ্রসিদ্ধিকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষ নৈষধীয়চরিতে ইন্দের নিকটে চার্বাকের কথা বর্ণন করিতে স্মারশাস্ত্রবক্তা মুনিকে গৌতম নামে উল্লেখ করিয়াছেন^১। চার্বাক স্মারশাস্ত্রবক্তা মুনিকে গৌতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠ বা মহাবৃষভ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, ইহা শ্রীহর্ষ ঐ শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ গৌতম বলিয়াও ঐ উপহাস বর্ণন করিতে পারিতেন। কারণ, গৌতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠের বংশধর, এই অর্থেও গৌতম বলিয়া চার্বাক ঐ ভাবে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীহর্ষ যখন গৌতম নামের উল্লেখ করিয়াই চার্বাকের উপহাস বর্ণন করিয়াছেন এবং “গৌতমং তং অবৈতৌব যথা বিখ্য তথৈব সঃ” অর্থাৎ তোমরা বিচার করিয়াই তাহাকে গৌতম বলিয়া যেমন জান, তিনি তাহাই, এইরূপ কথা বলিয়া ঐ উপহাস বর্ণন করিয়াছেন, তখন শ্রীহর্ষ যে স্মারশাস্ত্রবক্তা মুনিকে গৌতমই বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈষধীয় চরিতের চার্বাকারগণও ঐ শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৌতমের বহু অপত্য বুঝাইলেই পানিনি সূত্রানুসারে গৌতম পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং “গৌতমং” এই প্রয়োগে গৌতমের অপত্য বুঝাও যায় না।

রামায়ণাদি বহু গ্রন্থে আমরা অহল্যাপতি ঋষির গৌতম নামে উল্লেখ দেখিলেও এবং এ দেশে ঐরূপ সুপ্রসিদ্ধি থাকিলেও মিথিলায় তিনি গৌতম নামে প্রসিদ্ধ, ইহাও জানা যায়। বর্তমান দারভান্ডা স্টেশনের ৭ ক্রোশ উত্তরে কামতোল স্টেশন। সেখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে গৌতমের আশ্রম নামে সুপ্রসিদ্ধ একটি স্থান আছে। তত্ত্বতা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কথায় জানা যায়, ঐ আশ্রমেই গৌতম মুনি তপস্তা করিয়া গৌতমী গঙ্গা আনয়ন করেন। তদ্ব্যতীত যে কূপ আছে, তাহা দেবদত্ত কূপ। এক সময়ে গৌতম মুনি পিপাসায় পীড়িত হইয়া দেবগণের নিকটে জলপ্রার্থী হইলে দেবগণ অদূরস্থ কূপকে উদ্ধৃত করিয়া যে দিকে গৌতম ঋষি অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিক দিয়া বক্রভাবে প্রেরণ করেন। এইরূপে কূপ গইয়া দেবগণ জলের দ্বারা গৌতম ঋষিকে পরিতৃপ্ত করেন। ঋগ্বেদসংহিতায় এইরূপ বর্ণন আছে। পূর্বোক্ত গৌতমের আশ্রমের ছই ক্রোশ দূরে “আহিরিয়া” নামে প্রসিদ্ধ অহল্যাস্থান আছে। বর্তমান ছাপরা নগরীর সন্নিহিত গঙ্গাতীরেও অহল্যাপতি গৌতমের অপর আশ্রম ছিল। কিছু দিন পূর্বে মহাশি গৌতমের স্মরণার্থ ঐ স্থানে “গৌতম পাঠশালা” নামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সদাশিব গবর্ণমেন্ট ঐ পাঠশালায় মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কিন্তু

১। মুক্তয়ে যঃ শিলাদ্বায় শাস্ত্রমুচে সচেতসাং।

গৌতমঃ তমবৈতৌব যথা বিখ্য তথৈব সঃ ১৭, ৭৫ ॥

যঃ সচেতসাং চৈতন্যবতাঃ স্বচ্ছন্দোহুভবাতাং শিলাদ্বায় পাণিণ্যবহাজপায় মুক্তয়ে মুক্তিং প্রতিপাদয়িতুঃ শাস্ত্র-
মুচে, স্মারদর্শনঃ নির্মমঃ, যুগং তং স্বয়মেব অসেতা বিচার্যৈষ গৌতমঃ এতন্মান্যং যথা বিখ্য জানীত স এব তদা নান্দ
ইতার্থঃ। স গৌতমো যথা যুগ্মাকং সম্ভতপুত্রা মমণীতার্থঃ। নাম্নং পরং নাম্না গৌতমঃ, কিন্তু প্রকৃষ্টো গোঃ গৌতমো
মহাবৃষভঃ পশুরেব। চার্বাকারঃ।

মিথিলার আশ্রমেই জায়হুজ রচিত হইয়াছে, মিথিলাতেই জায়হুজের প্রথম চর্চা, ইহা মৈথিল পণ্ডিতগণের নানা কারণে বিশ্বাস। (পূর্বোক্ত গৌতমের আশ্রম সম্বন্ধে মৈথিলবার্তা “ভারতবর্ষ” পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ ঋগ্বেদসংহিতায় গৌতম ঋষির কৃপ লাভের কথা আমরা দেখিতেছি। ঐ যন্ত্রের পূর্বমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সাধারণ্য পূর্বোক্তরূপ আখ্যায়িকার বর্ণন করিয়াছেন। রাহুগণ গৌতম ঐ যন্ত্রের ঋষি। কানী সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ধ্যক্ষ বহুদর্শী ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিদ্যোত্তরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় প্রথমে জায়কন্দলীর ভূমিকায়, মৎস্তপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত উশিঙ্গ মহাবীর পুত্র দীর্ঘতমা নামে অন্ধ গৌতমকে জায়হুজকার বলিয়াছিলেন। পরে জায়বার্তিক-ভূমিকায় তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত অজ্ঞাতমূলক বলিয়া নানা কল্পনার আশ্রয়ে রাহুগণ গৌতমকেই জায়হুজকার বলিয়াছেন। তিনি যন্ত্রদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া তাঁহার শাস্ত্রকর্তৃত্ব সম্ভব। দীর্ঘতমা গৌতম অন্ধ, তাঁহার শাস্ত্র-কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। পরন্তু অন্ধের অক্ষপাদত্ব প্রমাণ সহজেও হয় না। রাহুগণ (রাহুগণপুত্র) গৌতম বিদেঘরাজের পুরোহিত ছিলেন, ইহা শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে^১। অহল্যার পুত্র শতানন্দ জনকরাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহা বাণ্যকি রামায়ণেও বর্ণিত আছে। স্তত্রাং রাহুগণ গৌতমই অহল্যাপতি। তাঁহারই পুত্র শতানন্দ। তিনি গৌতম নহেন। শ্রীহর্ষও জায়হুজকারকে গৌতম বলিয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয়ের এই সকল কথা ও শেষ সিদ্ধান্ত “জায়বার্তিক ভূমিকা” পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

দ্বিবেদী মহাশয়ের যুক্তির বিচার না করিয়া এখন এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি ঋগ্বেদাদি-বর্ণিত রাহুগণ গৌতমকেই অহল্যাপতি ও জায়হুজকার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, বিদেঘ-রাজবংশে তাঁহার পুরোহিত্য নিবন্ধন জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দকে তাঁহারই পুত্র বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও তিনি গৌতমবংশীয় বলিয়া তাঁহাকে গৌতম বলিতে হয়। কারণ, বৌদ্ধায়ন, গোত্রপ্রবর্তক সপ্তর্ষির মধ্যে যে গৌতমের নাম (পাঠান্তরে গৌতম) বলিয়াছেন, তাঁহারই দশটি শাখার মধ্যে রাহুগণ সপ্তম শাখা। বৌদ্ধায়ন গৌতমকাণ্ডে (২ অঃ) রাহুগণ ঋষিকেও গৌতম-

১। জিহ্মং যুগ্মদেহবতঃ তথা দিশাহ-

সিচ্চরংসং গৌতমায় ভূকজে।

আগচ্ছন্তমবস্যা চিত্রভানবঃ

কামঃ বিশস্ত তর্পয়ত ধামতিঃ ॥ ১ মঃ ১৪ অঃ ৮২ যুক্ত। ১১।

সাধারণভাষা।—সরতো“হবতঃ” উচ্ছৃতা কৃপাং যন্তাং দিশি ঋষির্গণ্যতি “তথা দিশা” “জিহ্মং” বক্রং তির্ঘাণং “যুগ্মদে” ঘোরিতবস্ত্রঃ। এতৎ কৃপাং নীচা কথ্যাসমেবদ্বাণ্য “ভূকজে” ভূমিতায় “গৌতমায়” তদর্থাৎ “উৎসং” জলপ্রবাহং কৃপাদ্ভুক্ততা “অশিধনং” আহাবেহবানয়নং। এতৎ কৃপা “ইমং” এতৎ স্তোত্রাং ঋষিঃ “চিত্রভানবো” বিচিত্রদীপ্তয়ন্তে মনস্তো “হবস্যা” উদ্বৃশেন রক্ষণেন সহ “আগচ্ছন্তি” তৎসমীপং প্রাপ্নু যন্তি। শাখা চ “বিশস্ত” সেধানিনো গৌতমস্ত “কামঃ” অভিল্যাপঃ “ধামতিঃ” আয়ুসো ধারকৈরুপকৈঃ “তর্পয়ন্তঃ” অতর্পয়ন্তঃ।

২। কিসেদো হ মাধবোহস্মি বৈশ্বানরঃ যুগে বভার। তস্ত গৌতমো রাহুগণকবিঃ পুরোহিত আস। ৪ অঃ। ১৩।

গণের মধ্যে বলিয়াছেন। স্মৃতরাং রাহুগণ ঋষি গোত্রপ্রবর্তক মূল পুরুষ গোতমের অপত্য হওয়ার তিনি গোতম। ফলকথা, রাহুগণ যে গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম নহেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই (“নির্ণয়সিদ্ধ” গ্রন্থের গোত্রপ্রবর-নির্ণয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। স্মৃতরাং তিনি স্মৃক্তদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া গোতম-বংশে তাঁহার প্রাধান্য নিবন্ধন বেদে মূল পুরুষ গোতম নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হয়। পূর্বকালে মূল পুরুষের নামেও প্রধান ব্যক্তির নাম ব্যবহার ছিল। জনক রাজার পূর্বপুরুষ নিমিরাজার পৌত্র জনক প্রথম জনক রাজা ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই রাজা জনক জনক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, ইহা বাণীকি রামায়ণের কথায় বুঝা যায় (আদিকাণ্ড, ৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য)। গোত্রকারী সপ্তর্ষি বসিষ্ঠাদিও পূর্ববর্তী বসিষ্ঠাদির অপত্য বলিয়া গোত্র হইয়াছেন অর্থাৎ বসিষ্ঠাদির অপত্যও বসিষ্ঠাদি নামে গোত্র হইয়াছেন, ইহাও “নির্ণয়সিদ্ধ” গ্রন্থে কথিত হইয়াছে*। এখন যদি রাহুগণ, গোতমবংশীয় হইয়াও পুরোহিত কারণে বেদে গোতম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীহর্ষও ঐ প্রসিদ্ধি অনুসারে এবং বৈদিক প্রয়োগানুসারে তাঁহাকে গোতম বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। নচেৎ গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম মুনি অথবা অজ্ঞ কোন গোতম মুনি জ্ঞানস্বরূপতা, এ বিষয়ে অজ্ঞ কোন প্রমাণ না থাকায় শ্রীহর্ষ তাহা কিরূপে বলিবেন? স্বন্দপুরাণে যখন অহল্যাপতি গোতম মুনিরই অক্ষপাদ নাম পাওয়া যাইতেছে এবং নিখিলা প্রদেশে অহল্যাপতি মুনিই জ্ঞানস্বত্র রচনা করেন, এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কারও তদেন্দীয় এবং এতদেন্দীয় বহু পণ্ডিতের আছে, তখন অজ্ঞ বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত অজ্ঞ কোন গোতম বা গোতম মুনিকে জ্ঞানস্বত্রকার বলা যাইতে পারে না। মহা-মনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বাচস্পত্য অভিযানে অহল্যাপতি মুনিকে গোতমই বলিয়াছেন। তিনি স্বন্দপুরাণের বচনের উল্লেখ করেন নাই। তিনি খেতবাবাহ কল্পে ব্রহ্মার মানস পুত্র গোতমের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই জ্ঞানস্বত্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অক্ষপাদ নামের বা জ্ঞানস্বত্র-কর্তৃত্বের কোন প্রমাণ দেন নাই। পরে পুরোহিত শ্রীহর্ষের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্মৃতরাং তিনি শ্রীহর্ষের শ্লোকানুসারেই জ্ঞানস্বত্রকারকে অহল্যাপতি গোতম বলেন নাই, ইহা বুঝা যায়। বিশ্বকোষেও তাঁহারই কথার অনুবাদ করা হইয়াছে। শ্রীহর্ষের শ্লোকে আরও অনেকেই নির্ভর করিয়াছেন। আমিও তদনুসারে এই গ্রন্থে জ্ঞানস্বত্রকারকে বহু স্থলে গোতম নামে উল্লেখ করিয়াছি। যে কারণেই হউক, শ্রীহর্ষ যখন জ্ঞানস্বত্রকারকে গোতম বলিয়াছেন, তখন তদনুসারে জ্ঞানস্বত্রকারকে গোতম বলা যাইতে পারে। তবে শ্রীহর্ষের ঐরূপ উল্লেখের পুরোহিত প্রকার কারণ বুঝিলে সামঞ্জস্য হয়; অহল্যাপতি মহর্ষির গোতম নামেরও অপলাপ করিতে হয় না, লোকপ্রসিদ্ধিকেও উপেক্ষা করিতে হয় না। বাহাতে সর্বসামঞ্জস্য হয়, সেইরূপ চিন্তা না করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চিন্তাই কর্তব্য নহে।*

১। যদ্যপি বসিষ্ঠাধীনাং ন গোত্রং যুক্তং তথাপি সপ্তর্ষিগণ তদপত্যভাবাৎ তথাপি তৎপূর্বভাবিবসিষ্ঠাধিপত্যেন গোত্রং যুক্তং।—অতএব পূর্বকথাং পরোক্ষাৎ এতদ্ব্যসিদ্ধং। নির্ণয়সিদ্ধ, ২০২ পৃষ্ঠা।

* পরে দেবীপুরাণের কোন কানে পাওয়াছি, “গণা বাচা তময়তি খেদয়তি” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে

গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গৌতমের শিষ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এক সময়ে গৌতমের মতের নিন্দা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর এ চক্রুর দ্বারা উহার মুখ দর্শন করিব না। শেষে বেদবাস্য জ্ঞতির দ্বারা তাঁহাকে প্রশম করিলে তিনি পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ যোগবলে নিজ চরণে চক্ষুঃ সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা বেদবাস্যকে দর্শন করেন। তখন বেদবাস্য অক্ষপাদ নামোন্নেখে তাঁহার জ্ঞতি করায় তিনি তখন হইতে অক্ষপাদ নামে অভিহিত হন। এই প্রবাদের মূলে ঐক্য ঘটনা আছে কি না বা বাঁকিতে পারে কি না, তাহা বুঝিতে পারি নাই। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও বাচস্পত্য অভিধানে (অক্ষপাদ শব্দে) পূর্বোক্ত প্রকার প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা পৌরাণিক কথা। কিন্তু অশেষ-শাস্ত্রদর্শী তর্কবাচস্পতি মহাশয় অশ্রান্ত স্থলে পুরাণাদি গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ করিয়াও ঐ স্থলে ঐ কথা কোন্ পুরাণে আছে, তাহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনিও পূর্বোক্ত প্রবাদানুসারে ঐ কথা কোন পুরাণে আছে, ইহা বিশ্বাস করিয়াই ঐ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রবাদই একেবারে নিমূল হয় না। ঐতিহ্য বা জনশ্রুতির নিরপেক্ষ প্রামাণ্য না থাকিলেও উহার মূল একটা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসার ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, দেবীপুরাণের শুক্ল-নিশুঙ্ক-মখন-পাদে গৌতমের অক্ষপাদ নাম ও ছায়দর্শন রচনার কারণাদি বর্ণিত আছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, রজিপুত্রগণের মোহনের জন্য এক সময়ে নাস্তিক্য মতের প্রচার হয়; তাহার ফলে যোগযজ্ঞাদি বিলুপ্ত হইতে থাকে। তখন দেবগণ শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার আদেশে গৌতমের শরণাগত হন। গৌতম তখন নাস্তিক্য মত নিরাসের জন্য যাত্রা করিলে, শিব শিশুরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নাস্তিক্য মতের অতীকূল তর্ক করিতে থাকেন। সপ্তাহ কাল বিচারে কাহারও পরাজয় না হওয়ায় গৌতম চিন্তিত হইয়া মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন শিব গৌতমকে উপহাস করিয়া বলেন যে, 'হে বেদধর্মজ্ঞ মনে! মেধাবিন্! তুমি এই ক্ষুদ্র নাস্তিক বালক আমাকে পরাজিত না করিয়া কেন মৌনাবলম্বন করিয়াছ? তুমি কিরূপে সেই বৃদ্ধ, লোক-সম্মত, বিদ্বান্ নাস্তিকগণকে মহাযুদ্ধে নিরস্ত করিবে? অতএব শীঘ্র পলায়ন কর। তখন গৌতম মুনি তাঁহাকে

জায়পুত্রকার অক্ষপাদ "গৌতম" নামে এবং গৌতমের বংশজাত বলিয়া "গৌতম" নামেও অভিহিত হইয়াছেন। পূর্বোক্ত অর্থে অক্ষপাদ "গৌতম" নামে অভিহিত হইলেও কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। সে কখনই এই—

গৌরীক্ তদ্বৈব তময়ন্ পরান্ গৌতম উচ্যতে।

গৌতমাত্মজমৈতি গৌতমোহপি স চাক্ষপাৎ ॥

—শুক্লনিশুঙ্কমখনপাদ, ১৩ অঃ

১। ভো মনে বেদধর্মজ্ঞ কিং তুক্ষীমান্ততে চিরং।

মামনির্জিত্য মেধাবিন্ কুদ্রনাস্তিক্যবালকং ॥

কথঞ্চ বিদ্বমো বুদ্ধান্ নাস্তিকান্ লোকসম্মতান্।

বিদেহাসি মহাযুদ্ধে তব পলায়নং মাচিতং ॥

শিব বলিয়া বুদ্ধিগা তাঁহার স্তব করিলে শিব তাঁহার প্রার্থনামুসারে তাঁহাকে ব্যবাহনরূপ দর্শন করাইলেন এবং সাধুবাদ করিয়া বলিলেন যে, তুমি তর্কে কুশল, তুমি ভিন্ন বাদ-যুদ্ধের ঘারা আর কে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে ? আমি তোমার এই বাদের জন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমার নাম ধারণ করিব, তুমি ত্রিনেত্র হইবে। শিব যখন এই সকল কথা বলেন,^১ তখন তাঁহার বাহন বৃষ, নিজ দস্ত-লিখিত প্রমাণাদি ঘোড়শ পদার্থকে প্রদর্শন করতঃ জৃম্বণ করেন। পশ্চাৎ শিবের কৃপা লাভ করিয়া গৌতম মুনি ঐ ঘোড়শ পদার্থের ঈক্ষা অর্থাৎ দর্শন করায় তিনি “আদ্বীক্ষিকী” নামে বিদ্যা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন এবং শিবের আদেশবশতঃ তিনি নাস্তিক্য-মত-নাশিনী ঐ বিদ্যাকে দশ দিনে শিষ্যানিগকে অধ্যয়ন করান। তাঁহার কিছু কাল পরে^২ বেদব্যাস

- ১। সাধু গৌতম ! ভ্রমস্তে তর্কে কুশলো হসি ।
তামুতে বাদযুদ্ধেন কো মাং তোযয়িতুং ক্রমঃ ॥
অনেন তব বায়েন তোমিতোহহং মহামুনে ।
ত্বমাম ধারয়িষ্যামি ত্বং ত্রিনেত্রো ভবিষ্যসি ॥
- ২। ইত্যেকং ব্রহ্মতঃ শস্তোজ্জ্বলন্তে বাহনো বৃষঃ ।
দর্শয়ন দস্তলিখিতান প্রমাণাদীংশ্চ ঘোড়শ ।
শস্তোঃ কৃপামনুপ্রাপ্য বদীকামকরোমুনিঃ ।
তেন চাধীক্ষিকীসংজ্ঞাং বিদ্যাং প্রাবর্তয়ন্ত ক্রিতো ॥
আদেশেন শিবশ্চৈব স শিবান্ বশতিহিনৈঃ ।
পাঠয়ামাস তাং বিদ্যাং নাস্তিক্যমতনাশিনীং ॥
- ৩। ততঃ কালেন কিম্বতা বাসো গুণনিদেশতঃ ।
সমাবৃষ্টো গৃহস্থোহবুদ্ববেদব্যাসানিকোবিনঃ ॥
স তর্কং নিন্দয়ামাস ব্রহ্মহরণোপদেশকঃ ।
তচ্ছ্ৰী গৌতমঃ ক্রুদ্ধো বেদব্যাসং প্রতি স্থিতঃ ॥
প্রতিজ্ঞে চ নৈতাভ্যাং দুগ্ভ্যাং পশ্চামি তদুবাং ।
যঃ শিবো য়েষ্টি বৈ তর্কং চিরায় গুরুসম্মতং ॥
বাসোহপি ভগবাংস্তত্ত গুরোঃ কোপং বিবৃণু চ ।
আবরৌ তরিতপ্তত্র যজ্ঞাতুগৌতমো মুনিঃ ॥
অসকৃদ্বদন্তুদ্বা পাদয়োঃ প্রবিপতা চ ।
প্রসাদয়ামাস গুরং কৃতকৌ নিমিত্তো মদ্রা ॥
প্রসন্নো গৌতমো বাসে প্রতিজ্ঞাং থাকি সংযতন ।
পাদেহি ক্ষেচিয়ামাস দোহক্ষপাধস্ততোহভবৎ ॥”

—সেবীপুরাণ, স্তম্ভনিস্তম্ভমধনপাঠ, ১৬ অঃ ।

সেবীপুরাণের এই অংশ মুক্তি হইয়াছে। নিখিল-শাস্ত্রদর্শী, নানা শাস্ত্রগ্রন্থকার, অক্ষপাধগৌতমবংশধর, ধনামখ্যাত পূজাপাথ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কর মহাশয়কে আমি গৌতমের অক্ষপাধ নামের প্রবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অগ্নুগ্রন্থপূর্বক প্রাচীন পুস্তক হইতে এই ঘটনাক্রম লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি ইহা তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি, অক্ষর পাই নাই। এ অক্ষর তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার মতেও অক্ষপাধগৌতমের অখ্যাপতি গৌতম।

গুরু গৌতমের আজ্ঞানুসারে সমাবর্তনের পরে গৃহস্থ হইয়া ব্রহ্মসূত্রে তর্কের নিন্দা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া গৌতম, বেদব্যাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই চক্র দ্বারা তাহার মুখ বেধিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। বেদব্যাসও গুরু গৌতমের ক্রোধবাক্য পাইয়া শীঘ্র গৌতমের নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া বলেন যে, আমি কুতর্কের নিন্দা করিয়াছি। তখন গৌতম মুনি প্রশম হইয়া পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ নিজ চরণে চক্র ক্ষুণ্ণ করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি অক্ষপাদ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পূর্বোক্ত বচনগুলির প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাই যে গৌতমের অক্ষপাদ নামাদি সঙ্ক্ষে পূর্বোক্ত প্রকার প্রবাদের মূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সূত্রাং ঐ প্রাচীন প্রবাদের মূল পূর্বোক্ত বচনগুলি যে আধুনিক নহে, ইহা বুঝা যায়।* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শিববাক্যে পাওয়া যায়, “সপ্তবিংশ দ্বাপরে জাতুর্কণ্য যে সময়ে ব্যাস হইবেন, সে সময়েও আমি প্রভাসতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া লোকবিশ্রুত যোগীন্দ্রা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমশর্ম্মা হইব। সেখানেও আমার সেই তপোধন পুত্রগণ (চারি শিষ্য) হইবে”। (১) অক্ষপাদ, (২) কণাদ বা কুমার, (৩) উলুক, (৪) বৎস। বায়ুপুরাণেও (পূর্বখণ্ড, ২৩ অঃ) ঐ কথা আছে। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণে অক্ষপাদ প্রভৃতি চারি শিষ্যকেই পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, লিঙ্গপুরাণে (২৪ অঃ) অক্ষপাদ প্রভৃতিকে সোমশর্ম্মার শিষ্য বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায়। তবে লিঙ্গপুরাণে “কণাদ” হলে “কুমার” আছে। অনেকে ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণেও “অক্ষপাদঃ কুমারশ্চ” ইহাই প্রকৃত পাঠ বলেন। সে যাহা হউক, অক্ষপাদনামা তপোধন যে সপ্তবিংশ দ্বাপর যুগের শেষে প্রভাস তীর্থে শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণের দ্বারা জানিতে পারি। পুরাণবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, চতুর্দশ দ্বাপর বা কলিতে^১ সুরক্ষণ ব্যাসের আবির্ভাব হইলে যে গৌতম শিবের অবতাররূপে যোগের উপদেশ করেন, তিনিই আবার সপ্তবিংশ দ্বাপরের শেষে অক্ষপাদ নামে শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে জগতে জ্ঞান প্রচার করেন। বক্তব্যঃ স্বন্দপুরাণে অহল্যাপতি গৌতম মুনিই অক্ষপাদ ও মহাযোগী বলিয়া কথিত। কুন্দপুরাণে তিনি শিবের অবতার বলিয়া কথিত। স্বন্দপুরাণে বহু হলে তাঁহার পরম মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

* গঙ্গেশের পূর্ববর্তী জয়প্ততট ও ভায়মজীর শেষে অক্ষপাদ যে বাদে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা লিখিয়াছেন।

১। সপ্তবিংশতিম প্রাপ্তে পরিকর্ষে ক্রমাগতে। জাতুর্কণ্য যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ ॥ ১৪৯ ॥

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ। প্রভাসতীর্থমাসাদা যোগীন্দ্রা লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫০ ॥

তদ্রূপি মম তে পুত্রো ভবিষ্যন্তি তপোধন্যঃ। অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলুকো বৎস এব চ ॥ ১৫১ ॥

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অশ্বমেধপাদ, ২৩ অঃ।

২। যদা ব্যাসঃ স্বরক্ষণ্য পঠ্যয়ে তু চতুর্দশে। তদ্রূপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি দুর্গান্তিকে ॥

কসে বহ্নিরসঃ শ্রেষ্ঠো গোতমো নাম যোগবিৎ। তদ্বাদ্যভবিষ্যতে পুণ্যং গোতমঃ নাম তদনং ॥

—ব্রহ্মাণ্ড, বায়ুশ্রুত, ২৩ অঃ।

মহাভারতে অহল্যাপতি গৌতমের বহু সহস্র শিষ্যের কথা, প্রিয়তম শিষ্য উল্লঙ্কের উপাখ্যান ও অহল্যার কুণ্ডলানয়ন-বাক্তী বর্ণিত আছে (অশ্বমেধপর্ব, ৫৬ অঃ দ্রষ্টব্য)। দোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে অক্ষপাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বহু পূর্বের আবির্ভূত, ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদির দ্বারা বলা যায়। তবে তিনি কোন্ সময়ে শ্রায়সূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি দোমশর্ম্মার শিষ্য হইয়া প্রভাস ভীর্থেই শ্রায়সূত্র রচনা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। অক্ষপাদ গৌতম দীর্ঘতপা, হৃদীর্ঘজীবী, মহাবোগী। স্বন্দ-পুরাণে তাঁহার নানা স্থানে ভ্রমণাদি ও গৌতমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। তবে মিথিলাতেই সর্বাগ্রে শ্রায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চারস্ত ও নানা শ্রায়গ্রন্থ নির্মাণ হইয়াছে। মিথিলাবাসী গৌতম মিথিলার আশ্রমেই শ্রায়সূত্র রচনা করেন, ইহা পণ্ডিত-সমাজের ধারণা। মৈথিল পণ্ডিত-গণও তাহাই বলেন। কিন্তু যেখানে গৌতম পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রায়সূত্রের রচনা হইয়াছে, ইহাও অনেকের ধারণা। এ সকল বিষয়ে যে এখন প্রকৃত তত্ত্ব নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে, তাহা মনে হয় না।

ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়ন ও বার্তিককার উদ্যোতকর

শ্রায়দর্শন-ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়নের প্রকৃত পরিচয় সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা এখন অতি দুসোধ্য বা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজে শ্রায়দর্শন-ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়ন, মুনি, এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কার ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য-প্রকরণের শেষে বর্ণিত মুনিগণের মধ্যে বাংস্ত্রায়ন নামে মুনিবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেকে ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়নকে পক্ষিল স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তর্কিকরক্ষার প্রারম্ভে বরদরাজের কথা ও টীকাকার মল্লিনাথের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, শ্রায়দর্শন-ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়নের অপর নাম পক্ষিল এবং তিনিও শ্রায়সূত্রকার অক্ষপাদের শ্রায় মুনি^১। বাচস্পতি অভিধানে মহামনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও “পক্ষিল” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—গৌতম সূত্রভাষ্যকার মুনিবিশেষ। তাঁহার প্রকাশিত বাংস্ত্রায়ন ভাষ্যকেও তিনি “বাংস্ত্রায়ন মুনিভূত ভাষ্য” বলিয়া লিখিয়াছেন। দয়ানন্দ স্বামী তাঁহার “ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা” গ্রন্থে শ্রায়দর্শন-ভাষ্যকারকে বাংস্ত্রায়ন মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৬ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন শ্রায়চাৰ্য্য উদ্যোতকর শ্রায়বার্তিকের শেষে ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়নকে “অক্ষপাদপ্রতিম” বলিয়াছেন^২। শ্রায়বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উপমানসূত্র (১৬) ভাষ্য-ব্যাখ্যায় এবং তর্কিকরক্ষাকার বরদরাজ উপমান ব্যাখ্যায় নিজের ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্ত ভগবান

১। অক্ষরপক্ষিলমুনিপ্রভৃতিয়া বর্ণয়ন্তি।—তর্কিকরক্ষা।

অক্ষরপক্ষিলৌ পূজ্যভাষ্যকারৌ।—মল্লিনাথ টীকা।

২। অক্ষপাদপ্রতিমো ভাষ্য বাংস্ত্রায়নো অর্থো।

অক্ষারি মহতন্ত্র শ্রায়ব্যাগেন বার্তিকঃ।

ভাষ্যকার বলিয়া বাংস্ত্রায়নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তार्কিকরক্ষার টাকায় মহামনীষী মল্লিনাথ সেখানে লিখিয়াছেন যে, বরদরাজ ভাষ্যকারের প্রামাণ্য হুচনার জন্ত তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ হুত্রকার অক্ষপাদ এ কথা না বলিলেও ভগবান্ ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়নের কথায় হুত্রকারেরও ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। ফলকথা, উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কথায় স্তায়ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়ন, অক্ষপাদপ্রতিম ভগবান্ পক্ষিল মুনি ও পক্ষিল স্বামী, ইহা আমরা পাইতেছি। এখন বিশেষ বক্তব্য এই যে, বহুশত প্রাচীন মহামনীষী শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্র ষাঁহাকে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তিনি যে বিশেষ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন, ইহা স্বীকার্য। উদ্যোতকর ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত আন্তিক-শিরোমণি মহামনীষিগণকে বাচস্পতি মিশ্র ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ঋষি বা আচার্য্য শব্দর প্রভৃতির স্তায় ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়নকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ষাঁহাকে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতে পারেন না, এমন কোন ব্যক্তিকে কেহ স্তায়ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সে সিদ্ধান্ত বিখ্যাস করিতে পারি না। শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথাকে উপেক্ষা করা যায় না।

এতদেবীয় অনেক বিজ্ঞতম ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রকার কোটিল্যই স্তায়দর্শন-ভাষ্যকার। তাঁহারই অপর নাম বাংস্ত্রায়ন ও পক্ষিলস্বামী। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনে প্রথম কথা এই যে, হেমচন্দ্রসূরী অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে^১ বাংস্ত্রায়নের যে আটটি নাম বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কোটিল্য, চণকায়জ, পক্ষিলস্বামী ও বিষ্ণুগুপ্ত, এই চারিটি নামের দ্বারা বুঝা যায়, কোটিল্যই পক্ষিলস্বামী ও বাংস্ত্রায়ন। পক্ষিলস্বামীই যে স্তায়দর্শন-ভাষ্যকার, ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেক আচার্য্যই লিখিয়াছেন। পক্ষিলস্বামী ও বাংস্ত্রায়ন, কোটিল্য বা চণক্য পণ্ডিতের নামান্তর হইলে তিনিই স্তায়দর্শন-ভাষ্যকার, ইহা বুঝা যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, কোটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে “বিদ্যাসমুদ্দেশ” প্রকরণে আত্মীক্ষিকী বিদ্যার প্রশংসা করিতে শেষে যে শ্লোকটি^২ বলিয়াছেন, ঐ শ্লোকের প্রথম চরণত্রয় স্তায়দর্শনভাষ্যও দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, কোটিল্যই স্তায়ভাষ্যে তাঁহার অর্থশাস্ত্রোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ পরিবর্তন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্তায়ভাষ্যে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণ বলা হইয়াছে, “বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ষিতা”। ঐ চতুর্থ চরণের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে,—কোটিল্য স্তায়ভাষ্যে বলিয়াছেন,—আমি “বিদ্যোদ্দেশে” অর্থাৎ আমার কৃত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের বিদ্যাসমুদ্দেশপ্রকরণে এই আত্মীক্ষিকীকে এইরূপে কীৰ্ত্তন করিয়াছি। তৃতীয় কথা এই যে, অর্থশাস্ত্রের শেষে কোটিল্য শাস্ত্রোক্তার করিয়াছেন, ইহা বর্ণিত

১। বাংস্ত্রায়নে মল্লিনাথঃ কোটিল্যশব্দচাক্ষরঃ।

ত্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোহনুলন্দ নঃ।—মর্ত্ত্যকান্ত। ১১৮

২। প্রবীণঃ সৰ্ববিদ্যানামুপায়ঃ সৰ্বকৰ্ম্মণাঃ।

অ্যাক্ষরঃ সৰ্ববদ্বীপাঃ শব্দদাতীকী মতাঃ।—অর্থশাস্ত্র।

আছে'। তাহার দ্বারা তিনি জ্ঞানস্বত্বের উদ্ধার করিয়াছেন, ভাষা রচনা করিয়া তাহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, হেমচন্দ্রস্বরির শ্লোকের দ্বারা কোটিল্যই জ্ঞানভাষ্যকার, ইহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ, নামের ঐক্যে ব্যক্তির ঐক্য সিদ্ধ হয় না। জ্ঞানভাষ্যকারের জ্ঞান কোটিল্যেরও বাৎস্তায়ন ও পক্ষিলস্বামী, এই নামদ্বয় থাকিতে পারে। পরন্তু তর্কিকরকায় বরদ-রাজের কথা ও মল্লিনাথের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, জ্ঞানভাষ্যকার বাৎস্তায়নের নামান্তর পক্ষিল। সুতরাং "স্বামী" তাহার উপনাম ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। জ্ঞানকন্দলীর প্রারম্ভে "পক্ষিল-শব্দস্বামিনো" এই প্রয়োগের দ্বারাও তাহা মনে হয়। তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি 'পক্ষিল' এই নামের পরে স্বামী এই উপনামের বোলে বাৎস্তায়নকে পক্ষিলস্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। জ্ঞানভাষ্যকার বাৎস্তায়ন পক্ষিলস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইহা বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির কথায় বুঝা যায়। কিন্তু যদি কোটিল্যের নামান্তর "পক্ষিলস্বামী" এবং জ্ঞানভাষ্যকারের নামান্তর "পক্ষিল," ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ নামের দ্বারা জ্ঞানভাষ্যকারকে কোটিল্য বলিয়া গ্রহণ করাও যায় না। বাৎস্তায়ন নামের দ্বারাও কোটিল্যকে জ্ঞানভাষ্যকার বাৎস্তায়ন বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বাৎস্তায়ন এই নাম যদি গোত্রনিমিত্তক নাম হয়, তাহা হইলে অজ্ঞেরও ঐ নাম হইতে পারে। এ সব কথা যাহাই হউক, কোটিল্যই জ্ঞান-ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে পূর্বোক্ত হেমচন্দ্র স্বরির শ্লোক অথবা ত্রিকাংশে পুরুষোত্তমদেবের শ্লোক প্রমাণ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য।

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও জ্ঞানভাষ্যকার ও অর্থশাস্ত্রকার অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কারণ, মঙ্গলাচরণ-শ্লোক প্রভৃতি কোন কোন শ্লোকবিশেষ ব্যতীত ঐরূপ শ্লোকের দ্বারা গ্রন্থকারের অভিন্ন সিদ্ধ হয় না। এক গ্রন্থকার কোন উদ্দেশ্যে অপর গ্রন্থকারের শ্লোকের আংশিক উল্লেখও করিতে পারেন। পরন্তু কোটিল্য জ্ঞানভাষ্য রচনা করিয়া যদি তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকের দ্বারা অর্থশাস্ত্রে আবীক্ষিকীর কীর্তন করিয়াছেন, ইহা বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেন, তাহা হইলে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণে "অর্থশাস্ত্রে প্রকীর্তিতা" এইরূপ কথাই বলিতেন। অর্থশাস্ত্রের "বিদ্যাসমুদ্দেশ" নামক প্রকরণকে বিদ্যোদ্দেশ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, অতি অস্পষ্টভাবে নিজ বক্তব্য কেন বলিবেন? আর যদি "বিদ্যোদ্দেশ" বলিলেই অর্থশাস্ত্রের ঐ প্রকরণটি বুঝা যায়, তাহা হইলে কোটিল্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তিও জ্ঞানভাষ্যে ঐ কথার দ্বারা কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইরূপে এই আবীক্ষিকীর প্রশংসা হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারেন। বস্তুতঃ জ্ঞানভাষ্যকার প্রথমে "সেয়মাবীক্ষিকী" এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণে যে "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা" এই কথা বলিয়াছেন, তদ্বারা বুঝা যায় যে, "বিদ্যোদ্দেশে" অর্থাৎ শাস্ত্রে অথবা প্রভৃতি চতুর্বিধ বিদ্যার যেখানে উদ্দেশ অর্থাৎ নামকথন হইয়াছে, সেখানে এই

আবৌক্ষিকীর কীৰ্ত্তন হইয়াছে। অর্থাৎ এই আবৌক্ষিকী বিদ্যাই শাস্ত্রোক্ত চতুর্বিধ বিদ্যার অন্তর্গত চতুর্থী বিদ্যা, ইহাই ভাব্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। জয়ন্তভট্টের কথাতেও এই ভাব পাওয়া যায়। জয়ন্তভট্ট ভাব্যকারের উক্তি বলিয়া পূর্বোক্ত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ “বিদ্যোদ্যেশে পরীক্ষিতা”। জয়ন্তভট্টের উল্লিখিত পাঠে ভাব্যকারের বক্তব্য বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে চতুর্বিধ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে এই আবৌক্ষিকী বিদ্যা, পরীক্ষিত বা অবধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই জ্ঞানবিদ্যাই যে চতুর্থী আবৌক্ষিকী বিদ্যা, ইহা নিশ্চিত। ভাব্যকার বাৎস্তায়নও পূর্বে জ্ঞানবিদ্যাকে চতুর্থী আবৌক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, ভাব্যকার যে, কোন একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করিতেই পূর্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ ঐরূপ বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য। অর্থাৎ শেষে কোটিল্যের যে শাস্ত্রের উদ্ধার, শাস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের কথা আছে, তদ্বারা তিনি যে জ্ঞানস্বত্বের ভাব্য করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তিনি নানা শাস্ত্র হইতে যে রাজনীতি-সমুচ্চয়ের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের সহিত ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু ঐ শ্লোকের দ্বারা কোটিল্য শাস্ত্রোক্তাদির পরে অর্থাশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং তিনি অর্থাশাস্ত্র রচনার পূর্বে জ্ঞানভাষ্যে “বিদ্যোদ্যেশে পরীক্ষিতা” এই কথা কোন্ অর্থে বলিতে পারেন, তাহাও চিন্তা করা উচিত। অর্থাশাস্ত্রে কোটিল্য নামের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুগুপ্ত নামে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে^১। বিষ্ণুগুপ্তই কোটিল্যের মূখ্য নাম ছিল, ইহা অর্থাশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। মৃত্তারাক্ষস নাটকে কবি বিশাখদত্তের রচনার দ্বারাও তাহা বুঝা যায় (৭ম অঙ্ক দ্রষ্টব্য)। কোটিল্য জ্ঞানভাষ্য রচনা করিলে তিনি অর্থাশাস্ত্রের জ্ঞান বিষ্ণুগুপ্ত নামে অথবা স্বপ্রসিদ্ধ কোটিল্য বা চাণক্য নামে কেন গ্রন্থকার-পরিচয় দিবেন না এবং উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ কেহই তাঁহার প্রসিদ্ধ কোন নামের কোন উল্লেখ করিবেন না, ইহাও বুঝি না। জ্ঞানভাষ্যের শেষে বাৎস্তায়ন নামে গ্রন্থকার-পরিচয় আছে^২। কামহুত্র গ্রন্থেও বাৎস্তায়ন নামে গ্রন্থকার-পরিচয় পাওয়া যায়। কামহুত্রের টীকাকার যশোধর, কামহুত্রকার বাৎস্তায়নের বাৎস্তায়ন ও মল্লনাগ, এই দুইটি নাম বলিয়াছেন। বাৎস্তায়ন তাঁহার গোত্রানিমিত্তক নাম, মল্লনাগ তাঁহার সাংস্কারিক নাম^৩। কোটিল্যই কামহুত্রকার বাৎস্তায়ন, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। কিন্তু কামহুত্রের টীকাকার যশোধর, বিষ্ণুগুপ্ত নামের উল্লেখ না করিয়া মল্লনাগ নামকেই কামহুত্রকার বাৎস্তায়নের সাংস্কারিক নাম বলিয়াছেন; তিনি তাহাকে

১। দৃষ্ট। বিশ্রুতিপত্রিং বহুনা শাস্ত্রেণ ভাব্যকারাণাম্।

স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তকর হুত্রক ভাষ্যক।—অর্থাশাস্ত্রের শেষ।

২। বোহিকপাবনুবিঃ। জ্ঞানঃ প্রভাতাদ্বেবতাং বহুং।

তস্ত বাৎস্তায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবদ্ব্যং।

৩। বাৎস্তায়ন ইতি গোত্রানিমিত্তক নাম, মল্লনাগ ইতি সাংস্কারিকী। ১ অবি, ২ অঃ—১৩ হুত্র-টীকা।

পক্ষিস্বামী বলিয়াও উল্লেখ করেন নাই। অর্থাশাস্ত্রে কোটিল্য স্বমতের উল্লেখ করিতে কোটিল্য নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কামসূত্রে গ্রন্থকারের স্বমতের উল্লেখ করিতে বাৎস্তায়ন নামের উল্লেখ দেখা যায়। অর্থাশাস্ত্র ও কামসূত্রের ভাবারও অনেক বৈষম্য বুঝা যায়। জ্ঞানভাষ্য ও কামসূত্রের ভাবা ও গ্রন্থারম্ভপ্রণালীও একরূপ নহে। কামসূত্রের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ আছে, জ্ঞানভাষ্যের প্রারম্ভে তাহা নাই। ফলকথা, কামসূত্রকার বাৎস্তায়নই জ্ঞানভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। কোটিল্যই জ্ঞানভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ বক্তব্য এই যে, জ্ঞানভাষ্যকার সাংখ্যশাস্ত্রকেও যে চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকিকী বলিতেন, ইহা বুঝিতে পারি না। অর্থাশাস্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্রও চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকিকীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানভাষ্যে আত্মিকিকী শব্দের বিশেষ ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া তদনুসারে জ্ঞানবিদ্যা ও জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া আত্মিকিকী শব্দের অর্থ বিবরণ করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট চতুর্দশ পদার্থকে আত্মিকিকী বিদ্যার প্রধান বলা হইয়াছে। উদ্যোতকর ঐ প্রধানভেদ-বর্ণনায় “সংশ্লিষ্টভেদাছবিধায়িনী আত্মিকিকী” এই কথা বলিয়া আত্মিকিকী বিদ্যার স্বরূপও বলিয়াছেন। জ্ঞানভাষ্যকারও প্রথমে জ্ঞানবিদ্যাকেই চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যা বলিয়া, শেষে “সেবমাত্মিকিকী” ইত্যাদি কথা বলিয়া, “বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা” এই কথার দ্বারা জ্ঞানবিদ্যাই শাস্ত্রোক্ত চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, চতুর্থী আত্মিকিকী বিদ্যা, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কথার পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। ফলকথা, জ্ঞানভাষ্য ও অর্থাশাস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আত্মিকিকী বিদ্যা বিষয়ে মতবৈষম্য নাই, ইহা কোনরূপেই বুঝিতে পারি নাই। বাৎস্তায়ন, উদ্যোতকর, জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি জ্ঞানচর্চাযুগে যে জ্ঞানবিদ্যা ভিন্ন সাংখ্যাদি শাস্ত্রকেও চতুর্থী বিদ্যা আত্মিকিকী বলিতেন, তাহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে কিছুতেই মনে হয় না। এখন যদি জ্ঞানভাষ্য ও অর্থাশাস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আত্মিকিকী বিদ্যা বিষয়েই মতবৈষম্য থাকে, তাহা হইলে অর্থাশাস্ত্রকার কোটিল্যই জ্ঞানভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করা যায় না। ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে উভয় গ্রন্থে আত্মিকিকী বিদ্যা বিষয়ে পূর্বোক্তরূপ মতবৈষম্য আছে কি না, তাহাই সর্বোপায়ে বুঝা আবশ্যক। সুদীর্ঘ উভয় গ্রন্থের কথাগুলি দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন। অর্থাশাস্ত্রে কোটিল্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কোটিল্য যে আত্মিকিকী বিদ্যার মধ্যে জ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখই করেন নাই, এই মতও স্বীকার করিতে পারি নাই। অর্থাশাস্ত্রে “আত্মিকিকী” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে কোটিল্য চিরপ্রসিদ্ধ “আত্মিকিকী” শব্দের প্রয়োগ কেন করেন নাই এবং বাৎস্তায়ন প্রভৃতি জ্ঞানচর্চাযুগে কোটিল্যের জ্ঞান “আত্মিকিকী” শব্দের প্রয়োগ কেন করেন নাই, ইহাও চিন্তনীয়। কোটিল্য পূর্বাচাৰ্য্যগণের মত বর্ণন করিতেও বলিয়াছেন—“আত্মিকিকী”।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যাহারা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং অনেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের সময় বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে খৃষ্টপূর্ববর্তী কোটিল্য যে জ্ঞানভাষ্যকার হইতেই পারেন না, ইহা বলা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন খৃষ্টপূর্ববর্তী অতিপ্রাচীন, ইহাই আনাদিগের বিশ্বাস। বাৎস্তায়ন ভাষ্যের ভাষা পর্যালোচনা

বহু পূর্ববর্তী, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাংস্তায়ন পাণিনিমুখ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২।২। ১৬ স্বত্র-ভাষ্যে)। পাণিনি গৌতম বৃদ্ধেরও পূর্ববর্তী, ইহাও আমাদের বিশ্বাস। কথাসরিংসাগরের উপাখ্যান প্রমাণ নহে। বাংস্তায়ন (৫।২।১০ স্বত্র-ভাষ্যে) মহাভাষ্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত নহে। কারণ, এমন অনেক বাক্য আছে, যাহা স্মৃতির কাল হইতে উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য বহু প্রহসকারই উল্লেখ করিতেছেন। এই বাক্যের প্রথম বক্তা কে, তাহা সর্বত্র নিশ্চয় করা যায় না। পরন্তু বাংস্তায়নভাষ্যে মহাভাষ্যের এই বাক্যও যথাযথ দেখা যায় না। উভয় গ্রন্থে কোন অংশে পাঠভেদ থাকায় বাংস্তায়ন, মহাভাষ্যের বাক্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। (“বৃদ্ধিরাট্টৈচ্” এই স্বত্রের মহাভাষ্যে দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ প্রমাণসমুচ্চর গ্রন্থে বাংস্তায়ন ভাষ্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা নির্কির্বাদে নিশ্চিত। কিন্তু দিঙ্‌নাগের সময় নির্কির্বাদে নিশ্চিত নহে। বিশ্বকোষে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী দিঙ্‌নাগের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু বহুদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় “বৌদ্ধস্তায়” প্রবন্ধে প্রমাণসমুচ্চরকার দিঙ্‌নাগকে কালিদাসের সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষবর্তী বলিয়াছেন এবং উদ্যোতকর স্মারবাণ্ডিকে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম-কীর্তি ও বিনীতসেবের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া উদ্যোতকরকে ধর্মকীর্তি ও বিনীতসেবের সমসাময়িক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষবর্তী বলিয়াছেন। বিশ্বকোষে উদ্যোতকরকে আরও বহু পূর্ববর্তী বলা হইয়াছে। জর্জান পণ্ডিত জ্যেকবির প্রবন্ধে বাংস্তায়নের সময় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং উদ্যোতকরের সময় ষষ্ঠ শতাব্দী নির্দ্ধারিত হইয়াছে জানিয়াছি।^১ বিশেষতঃ ঐতিহাসিকগণ এই সকল মতভেদের বিচার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীরও পূর্ববর্তী, তিনি দিঙ্‌নাগের বেশী পূর্ববর্তী নহেন। এই বিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে “অতিজরতীনাং” এই কথার দ্বারা উদ্যোতকরের বার্তিককে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন^২। স্মার-

১। ১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

* বাংস্তায়ন সম্বন্ধে জর্জান পণ্ডিত জ্যেকবির মত—The results of our researches into the age of the Philosophical Sūtras may be summarised as follows :—“Nayadarsan” and “Brahma Sūtra” were composed between 200 and 450 A. D. During that period lived the old commentators :—Vatsyayana, Upavarsa, the Vṛttikara (Bodha Yana ?) and probably Sabaraswamin.

উদ্যোতকর সম্বন্ধে—He (Uddyotakara) may therefore have flourished in the early part of the Sixth century or still earlier (The dates of the Philosophical Sūtras of the Brahmins by Herman Jacobi.

1911 Vol. 31, Journal of the American Oriental Society).

২। ইচ্ছামঃ কিমপি পূণাং হস্তরকুনিবন্ধ-পঙ্কময়ানাং।

উদ্যোতকর-গবীনাতিজরতীনাং সমুচ্চরণাং।

বার্তিক-তাৎপর্য-পরিণতিতে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের কথাগুলির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায়^১, উদ্যোতকরের বার্তিক বাচস্পতি মিশ্রের সময়েও প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের বহু টীকা হইয়াছিল। কিন্তু কালবশে উদ্যোতকরের সম্প্রদায় বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় সেই সকল টীকা বা নিবন্ধ ‘কুনিবন্ধ’ হইয়াছিল। অর্থাৎ উদ্যোতকরের বার্তিকের যে সমস্ত টীকা যথার্থ টীকা হইতে পারিয়াছিল না। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ত্রিলোচন-নামা অধ্যাপকের নিকটে উদ্যোতকরের বার্তিকের রহস্যবোধক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞানবার্তিক-তাৎপর্য্যটীকা নামে টীকা করিয়া, ঐ বার্তিক গ্রন্থের উদ্ধার করেন। বাচস্পতি মিশ্র যে ত্রিলোচন গুরু উপদেশ পাইয়া, তদনুসারে ভাষ্য ও বার্তিকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকায় (প্রত্যক্ষ সূত্রে) তাঁহার নিজের কথাতেও পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্রের জ্ঞানসূচীনিবন্ধের শেষোক্ত শ্লোকে^২ পাওয়া যায় যে তিনি ৮৯৮ বৎসরে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ “বৎসর” শব্দের দ্বারা বৈক্রম সংবৎ বুঝিলে ৮৪১ খৃষ্টাব্দে এবং শকাব্দ বুঝিলে ৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বুঝা যায়। শেষোক্ত পক্ষই বহুসম্মত। মনে হয়, বাচস্পতি মিশ্র সর্বশেষে জ্ঞানসূচী-নিবন্ধ রচনা করায়, ঐ গ্রন্থের শেষে তাঁহার সময়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও লক্ষণাবলী গ্রন্থের শেষে তাঁহার সময়ের (৯০৬ শকাব্দ) উল্লেখ করিয়াছেন^৩। উদয়নের কিরণাবলী গ্রন্থের প্রথম শ্লোকট লক্ষণাবলীর শেষেও দেখা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য, শ্রীহর্ষের পূর্ববর্তী, ইহাও খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য পাঠে জানা যায়। এখন বক্তব্য এই যে, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষবর্তী হইলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্র, উদ্যোতকরের বার্তিককে “অভিজ্ঞরতীনাং” এই কথার দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থ বলিবেন এবং উদয়নাচার্য্য উদ্যোতকরের সম্প্রদায় লোপ প্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রকার কথা বলিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। এখনও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির জ্ঞানগ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া কথিত হয় না। উদ্যোতকরের বার্তিকের আলোচনায় মনে হয়, তিনি ভট্ট কুমারিল ও ভট্টহরিরও পূর্ববর্তী। জ্ঞানবার্তিকে ভট্টহরির মতের কোন আলোচনা বা ভট্টহরির কোন কথা এবং মীমাংসক মতের

১। নমু চিরন্তনেহ্মিন্ নিবন্ধ মহাজনপরিপূহীতে বহবো নিবন্ধাঃ সম্ভীতি কৃত্তমেনেনাত আহ ইচ্ছাম ইতি। নমু যদি গ্রন্থকারসম্প্রদায়িকিঞ্চেদেন তে নিবন্ধাঃ কথা কুনিবন্ধাঃ? অথ সম্প্রদায়ো বিচ্ছিন্নাঃ? কথা তবাপীয়া বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়্য তাৎপর্য্যটীকা স্থনিবন্ধ ইত্যত আহ অভিজ্ঞরতীনামিতি। উদ্যোতকর-সম্প্রদায়ো হ্রস্ববাঃ যৌবনাঃ ততঃ কালবশাদ্ব্যলিতমিহ, কিম্বান্ন ত্রিলোচনগুরোঃ সকাশাহুপদেশ-রসায়নমাস্মাদিতমমুখ্যং পুনর্নবীভাবায় নীতং ইতি বুজাতে। ন চ কুনিবন্ধ-পঞ্চময়ানাং তদ্বাত্তুচিতিমিতি তদ্বাহুংকুবা স্থনিবন্ধস্থলে সরিবেশনরূপ-সমুচ্চরণমেব সাংস্কৃত-মিতার্থঃ।—তাৎপর্য্য-পরিণতি, ২ পৃষ্ঠা।

২। জ্ঞানসূচীনিবন্ধোহসাংসকারি হুখিয়াঃ মুখে।

শ্রীবাচস্পতিমিশ্রের বৃন্দাবন (১৮৮) বৎসরে।

৩। তর্কাস্বরাজ (৯০৬) প্রমিতেরতীতেষু শকাব্দতঃ।

বর্ষেহুদয়নশত্রে জ্ঞেবাধাঃ লক্ষণাবলীঃ।

আলোচনায় ভট্ট কুমারিলের কথা বা মতের আলোচনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। উদ্যোতকরের উত্থাপিত মীমাংসক মতকে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র জরমীমাংসক মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্লোকবার্ত্তিকে অহুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে কুমারিল নিজ মতের সমর্থনপূর্ব্বক অন্যের মত বলিয়া এই বিষয়ে উদ্যোতকরের সমর্থিত মতটিরও উল্লেখ করিয়াছেন (শ্লোকবার্ত্তিক, অহুমান পরিচ্ছেদ, ৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেখানে টীকাকার পার্থ-সারথি মিশ্র এই মতকে নৈয়ায়িকের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিল কোন অপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মতের উল্লেখ ও সমর্থন করিতে পারেন না। এই মতটি কুমারিলের পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। বাৎস্তায়ন যে এই মতাবলম্বী নহেন, তাহা বহু স্থলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। উদ্যোতকরই অহুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে অস্বাস্ত্য মত ও দিগ্‌নাগের মত খণ্ডন পূর্ব্বক এই নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি (১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভট্ট কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে অহুমান পরিচ্ছেদে দিগ্‌নাগের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। পরন্তু কবি বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হর্ষচরিতে প্রথমে যে বাসবদত্তা কাব্যের অতি প্রশংসা করিয়াছেন, উহা কবি সুবন্ধু-রচিত প্রসিদ্ধ বাসবদত্তা কাব্য, ইহাই পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। এই বাসবদত্তা কাব্য বাণভট্টের পূর্ব্বকই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা স্বীকার্য্য। সুবন্ধু এই বাসবদত্তা কাব্যে উদ্যোতকরের নানোক্ত করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে উদ্যোতকর যে সুবন্ধুর পূর্ব্ব হইতেই দেশে জ্ঞানমত-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও সুবন্ধুর কথায় বুঝিতে পারা যায়। এ সব কথা উপেক্ষা করিলেও বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহারা উদ্যোতকরের বার্ত্তিককে যেরূপ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উদ্যোতকর যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র “অতিজরতীনাং” এই কথা বলিয়া যে বার্ত্তিকের প্রাচীনত্বের ঘোষণা ও তাহার উদ্ধারের প্রয়োজন সূচনা করিয়াছেন এবং বাহার উদ্ধারের জন্ত তিনি ত্রিলোচন গুপ্তর উপাসনা করিয়াছেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিক গ্রন্থের প্রাচীনত্ব বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য ভ্রান্ত ছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

উদ্যোতকর প্রতিজ্ঞা-সূত্রবার্ত্তিকে “বাদবিদ্যি” ও “বাদবিধানটীকা” নামে বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মকীর্ত্তির “বাদজ্ঞায়” নামক গ্রন্থকেই “বাদবিদ্যি” নামে এবং বিনীতদেবের “বাদজ্ঞায়ব্যাখ্যা” নামক গ্রন্থকেই “বাদবিধানটীকা” নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। এই সকল মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। গ্রন্থের প্রকৃত নাম ত্যাগ করিয়া কল্পিত নামে উল্লেখেরও কোন কারণ বুঝি না। উদ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বিনীতদেবের সমসাময়িক হইলে তাঁহার ঐরূপ নাম-ভ্রমেরও কোন কারণ বুঝি না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রচুর

মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সদৃশ নামেও অনেক গ্রন্থ ছিল ও আছে। বিভিন্ন গ্রন্থকারের বিভিন্ন গ্রন্থে বিষয়বিশেষের বিচারে সদৃশ ভাষারও প্রয়োগ হইয়াছে ও হইয়া থাকে। উদ্যোতকরের উদ্ধৃত বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ-সমন্বিত দেখিলেও ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথার উদ্যোতকর, দিগ্‌নাগ ও স্ববন্ধুর গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট পাওয়া যায়। উদ্যোতকরের কথিত “বাদবিধানটীকা” স্ববন্ধুরচিত কোন গ্রন্থের টীকা, ইহা মনে হয়। বাচস্পতি মিশ্র এই স্থলে পূর্বে উদ্যোতকরের উল্লিখিত কোন লক্ষণকে স্ববন্ধুর লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মকীর্তি এই মত সমর্থন করিয়া তাঁহার “জ্ঞানবিন্দু” গ্রন্থে উদ্যোতকরের কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু উদ্যোতকর যে ধর্মকীর্তির কোন গ্রন্থের উল্লেখাদি করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি নাই। মূল গ্রন্থ না পাইলে অথবা কোন প্রামাণিক প্রাচীন সংবাদ না পাইলে তাহা বুঝা যায় না। বাচস্পতি মিশ্র পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিয়া বান নাই। উদ্যোতকর আরও বহু স্থলে বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে “সর্বাভিসময়সূত্র” নামে কোন প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র এই সকল গ্রন্থের কোন পরিচয় দিয়া বান নাই। বহু স্থলে কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের পরিচয়ও দিয়াছেন। ধর্মকীর্তির গ্রন্থ যে তাঁহার বিশেষ অধিগত ছিল, তাহার পরিচয় ভ্রামতী ও তাৎপর্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। দিগ্‌নাগের সমসাময়িক স্ববন্ধু নামে যে প্রধান বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের বাক্য পাওয়া যায়, বাচস্পতি মিশ্র তাহাকেই স্ববন্ধু নামে বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সে বাহাই হউক, মূল কথা, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ববর্তী এবং ভগবান্ বাস্ত্রায়ন খৃষ্ট-পূর্ববর্তী, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এখানে নিজের বিশ্বাসানুসারেই এ সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম। প্রধান ঐতিহাসিকগণের কথা এবং অনুসন্ধান দ্বারা ফলে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা গ্রন্থশেষে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এ পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি পাঠ ও অনুসন্ধানাদি করিয়াছি, তাহাতে নানা মতভেদই পাইয়াছি; কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাই নাই। মতভেদ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের টিপ্পনীর মধ্যেও কোন কোন কথা বলিয়াছি।

ভাষ্যকার বাস্ত্রায়ন কোন দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়েও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। বাস্ত্রায়ন দাক্ষিণাত্য, ইহা অনেকে সমর্থন করেন। বাস্ত্রায়ন ও উদ্যোতকর উভয়েই মৈথিল, ইহাও অনেকে বলেন। ভাষ্য ও বাস্ত্রিকের দ্বারা এ বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করা যায় না। কোন কোন কথার দ্বারা বাহা কল্পনা করা যায় এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহার আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থশেষেও পুনরায় এ সকল বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে।

নিবেদন

ভগবানের রূপায় বহুভাষায় অনুবাদ, বিবৃতি ও টিপসীর সহিত বাংজায়ন ভাষ্য সমেত গ্রাণ-দর্শনের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হইল। বাংজায়ন ভাষ্য বেক্রপ অতি দুর্কোথ গ্রন্থ, তাহা স্বদী-সমাজের অবদিত নহে। মাদৃশ ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রকৃত ব্যাখ্যা দি কার্যে অযোগ্য। তথাপি কতিপয় বিদ্যোৎসাহী সুশিক্ষিত স্নহুৎ ব্যক্তির আন্তরিক উৎসাহের বলেই অতি দুঃসাধসের পরিশ্রম দিয়া আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। স্নদীগণ এই গ্রন্থে আমার প্রচুর ভ্রম-প্রমাদসের পরিশ্রম পাইবেন এবং এই অতি দুঃসাধ্য কার্য সম্পাদন করিতে আমি কাহারও পস্থা অনুসরণ করিতে না পারায় পদে পদে আমার পদস্থলন অবশ্যস্বাভাবী, ইহা জানিয়াও এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার গুরুতর পরিশ্রমের ফলে যদি বাংজায়ন-ভাষ্য-পাঠার্থীদিগের কিঞ্চিৎস্বাভাও সাহায্য হয়, পরিশ্রমের লাভব হয়, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

নানা কারণে বহু স্থলে বাংজায়ন ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য হইয়াছে। পরন্তু প্রচলিত ভাষ্য পুস্তকে বেক্রপে ভাষ্য-সন্দর্ভ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষ্যের সংগতি এবং পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ-সন্দর্ভ এবং প্রশ্ন ও উত্তর-সন্দর্ভের নির্ণয় করাও সর্বত্র সহজে সম্ভব হয় না। এই সমস্ত কারণে বাংজায়ন ভাষ্য আরও অতি দুর্কোথ হইয়াছে। এ জন্ত এই গ্রন্থে ভাষ্য-সন্দর্ভগুলি পৃথকভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে যথামতি চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে মূল ভাষ্য অপেক্ষাকৃত সুবোধ হইবে, আশা করা যায়। উদ্যোতকরের বার্তিক ও বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ ও নানা পাঠভেদের যথামতি পর্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থে ভাষ্য-পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির সম্মত ভাষ্য-পাঠ নির্ণয় করিতে না পারায় প্রচলিত পাঠই গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

প্রাচীন বাংজায়ন ভাষ্যে যে প্রণালীতে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, বর্তমান বহুভাষায় ঐ প্রণালীতে বাক্যপ্রয়োগ হয় না। তথাপি মূলানুযায়ী অনুবাদে অল্পরোধে ভাষ্যের প্রণালীতেই ভাষ্যের অনুবাদ করিতে হইয়াছে। স্বাধীন ভাষায় মূল-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণন করিলে তাহা মূলের অনুবাদ হয় না; তদ্বারা মূলের পদপদার্থ বুঝিয়া, প্রতিপাদ্য বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সাহায্য হয় না। বাংজায়ন ভাষ্যের তাৎপর্যবোধের জ্ঞান বহু স্থলেই শব্দার্থ-বোধও অতি সূকটিন। এ জন্ত অনেক স্থলে অনুবাদে ভাষ্যের শব্দই উল্লেখ করিয়া পরে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং সর্বত্রই বাহাতে অনুবাদের দ্বারা মূল ভাষ্যের বাক্যার্থ-বোধে সহায়তা হইতে পারে, যথাসক্তি সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছি। ভাষ্যকার স্বত্রের জ্ঞান সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা প্রথমে তাহার বক্তব্যটি বলিয়া, পরে আবার নিজেই সেই নিজ বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা ভাষ্যগ্রন্থের লক্ষণ। উহার নাম স্বপদ-বর্ণন। ভাষ্যের ঐ সকল অংশের অনুবাদের পূর্বে সর্বত্র “বিশদার্থ” বলিয়া ঐ সকল ভাষ্য-সন্দর্ভের অনুবাদ করিয়াছি। ঐ সকল ভাষ্যসন্দর্ভকে ভাষ্যকারের স্ববাক্য-

বর্ণন-ভাষা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাষ্যের জায় অল্পবাদেও বহু স্থলে ভাষ্যের প্রণালীতে স্বাক্যবর্ণন বা পূৰ্ব্বোক্ত কথার ব্যাখ্যা করিয়াছি; অনেক স্থলে ভাষ্যের তাৎপর্য বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছি। বহু স্থলে যথাশক্তি সরল ভাষায় অল্পবাদের পরে “বিস্তৃতি”র দ্বারা মূলের প্রতিপাদ্য বিষয়টী বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছি। ছন্দঃ দার্শনিক গ্রন্থের কেবল অল্পবাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে তাৎপর্য বুঝা যায় না। অনেক স্থলে নানাবিধ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াও প্রকৃতার্থ-বোধে প্রতিবন্ধক হয়। বিশেষতঃ বাৎস্তায়নভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্যার্থবোধ বা তাৎপর্য্যবোধ নানা কারণে অতি স্বকঠিন, এই বিশ্বাসে সর্বত্র সংস্কৃত টীকার প্রণালীতে বহুভাষ্য একটি টিপ্পনী প্রকাশ করিয়াছি। টিপ্পনীতে সর্বত্রই স্বত্রকার ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝাইতে এবং বাৎস্তায়ন ভাষ্য বুঝিতে গেলে যে সকল জিজ্ঞাস্তা উপস্থিত হয়, তাহারও যথামতি যথাসম্ভব আলোচনা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন স্মার্তাচার্য্য উদ্যোতকর, বাৎস্তায়নভাষ্যের যে বার্তিক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্মার্তস্বত্রেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উহা স্মার্তবার্তিক নামে প্রসিদ্ধ। উদ্যোতকর বার্তিক গ্রন্থের লক্ষণানুসারে স্বাধীন সমালোচনার দ্বারা বহু স্থলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও মতের খণ্ডন করিয়াছেন এবং নিজে অন্তরূপ স্বত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ত্রিমূহাচম্পতি মিশ্র ও স্মার্তবার্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা নামে উদ্যোতকরের বার্তিকেরই টীকা করিয়া উদ্যোতকরের মত সমর্থন করিতে ভাষ্যকারের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য বাচম্পতি মিশ্রের ঐ টীকারই স্মার্তবার্তিক-তাৎপর্য্য-পরিণতি নামে টীকা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কিয়দংশ-মাত্র মুদ্রিত হওয়ায় সৰ্ব্বাংশ দেখিতে পাই নাই। স্মার্তবার্তিকে উদ্যোতকর এবং তাৎপর্য্যটীকার বাচম্পতি মিশ্র বাৎস্তায়ন ভাষ্যের যে যে স্থলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগের নামোন্মেষে সে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছি। অস্ফুট স্থলে আনার ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র চিন্তার দ্বারা যেমন বুঝিয়াছি, অগত্যা সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছি। বাৎস্তায়ন ভাষ্যের অল্পবাদের সঙ্গে স্মার্ত-বার্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার অনেক অংশের অল্পবাদ করাও কর্তব্য মনে করিয়া টিপ্পনীতে তাহাও যথামতি করিয়াছি। সে জন্তও টিপ্পনী অনেক স্থলে বিস্তৃত হইয়াছে। উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র যে যে স্থলে বাৎস্তায়নের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, আমি সেই সেই স্থলে বাৎস্তায়নের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি এবং অনেক স্থলে উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি গুরুপাদগণের কথা বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যার্থীর জায় স্বধীসমাজের নিকটে অসংকোচে আমার সংশয় জ্ঞাপন এবং অনেক স্থলে সিদ্ধান্তের ভাবে আমার পূৰ্ব্বপক্ষেবই নিবেদন ও সমর্থন করিয়াছি। প্রাচীন গুরুপাদগণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে; মাদৃশ ব্যক্তি তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। আমি প্রাচীনগণের কথা বুঝিতে না পারিয়াই আমার সংশয় ও পূৰ্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া বিদ্যার্থীর জায় স্বধীসমাজে নিবেদন করিয়াছি। স্বধীসমাজ ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিবেন, দেশে প্রাচীন স্মার্ত গ্রন্থের প্রচুর আলোচনা হইবে, বাৎস্তায়নের মতের এবং তাহার ভাষ্যের বিশেষ আলোচনা হইবে, ইহাই আমার আশা ও উদ্দেশ্য। এ জন্ত অনেক স্থলে প্রাচীন ও নব্য নৈমারিকগণের মতভেদেরও যথামতি

আলোচনা করিয়াছি। অনেক স্থলে বাস্তবজ্ঞানভাষ্য ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থব্যাখ্যা করিতেও টিপ্সনীতে আবশ্যক বোধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গভাষায় বিবিধ বিষয়ে অনেক আলোচনার ফলে যদি পাঠকগণের কোন অংশে কোন বিষয়ে কিছু উপকার হয়, ইহাও আমার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত বিবিধ আলোচনা করিতে বাইরা মাদৃশ ব্যক্তির বহু অজ্ঞতা ও ভ্রমের পরিচয় দিতে হইবে জানিয়াও পূর্বোক্তরূপ নানা উদ্দেশ্যে আমি অসংকোচে নানা আলোচনা করিয়াছি। পরন্তু দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ জ্ঞানশাস্ত্র বঙ্গভাষায় বুঝাইতে হইলে সংক্ষেপে তাহা বুঝান অসম্ভব। বিশেষতঃ বাস্তবজ্ঞান ভাষ্যের জ্ঞান অতি দুর্লভ মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সকল কথা বিশেষরূপে বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলা আবশ্যক হয়। এ জ্ঞানও টিপ্সনীতে বহু কথা বলিতে হইয়াছে। কিন্তু দুর্লভ সংস্কৃত টীকার জ্ঞান অনেকে এই গ্রন্থের টিপ্সনীরও সর্বাংশ না পড়িয়া কেবল ব্যাখ্যাংশমাত্রও পড়িতে পারেন। অনেক স্থলে মূল ভাষা ও অনুবাদ না পড়িয়াও কেবল টিপ্সনী পড়িলেও এবং অনেক স্থলে কেবল অনুবাদ ও বিবৃতি পড়িলেও বাহ্যতে ভাষ্যের প্রতিপাদ্য বুঝা যায়, সেইরূপ চেষ্টাও যথাসম্ভব করিয়াছি। সর্বশ্রেণীর পাঠকগণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি যথাসম্ভব এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও নানা কথার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, বঙ্গভাষায় জ্ঞান-দর্শন ও বাস্তবজ্ঞানভাষ্য বুঝাইতে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করিলেও বাহ্যিক এই সকল বিষয়ের কোনরূপ আলোচনা করিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই, তাহাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থে বুদ্ধিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কোন অজ্ঞাত হ্রস্বোদ্যম বিষয় প্রথমে সহজে কেহই বুঝিতে পারেন না। বঙ্গভাষায় জ্ঞানশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেও বিষয়ের হ্রস্বোদ্যমবশতঃ সে ব্যাখ্যাও সর্বত্র সুবোধ হইতে পারে না। সরল ভাষায়, স্বাধীন ভাষায় সহজে জ্ঞানশাস্ত্র বুঝাইবার অনুরোধে জ্ঞানপূর্বক প্রকৃত বিষয়ের অপলাপ বা পরিত্যাগ করা যায় না। পারিভাষিক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অল্প অপ্রসিদ্ধ শব্দের দ্বারা ঐ সকল পারিভাষিক শব্দার্থ প্রকাশও অসম্ভব। এইরূপ নানা কারণে এবং সর্বোপরি আমার অক্ষমতাবশতঃ অনেক স্থলে অনুবাদাদি ইচ্ছা সত্ত্বেও সুবোধ করিতে পারি নাই। মূলানুবাদী অনুবাদ করিতে অনুবাদের ভাষার পূর্ণতা বা সৌষ্ঠব-সাধনেও স্বাধীন ভাবে যত্ন করিতে পারি নাই। পরন্তু এই প্রথম অধ্যায় বিশেষ হ্রস্বোদ্যম বলিয়া এবং এই অধ্যায়ে কঠব্যবোধে অনেক কথার আলোচনা করার অনেক স্থলে এই গ্রন্থে অনেক পাঠকের নিকটে সম্ভবতঃ অতি হ্রস্বোদ্যম বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। আমার প্রথম চেষ্টায় এই প্রথম খণ্ডে আরও অনেক প্রকার ত্রুটি ও ভাষাদোষ প্রভৃতি ঘটিয়াছে, ইহা আমিও বুঝিতেছি। অন্ত্যস্ত খণ্ডে ভাষাসংবাদের দিকে বিশেষ মনোযোগী আছি। আর তিন খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকটে সর্বদা প্রার্থনা এই যে, সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাকে নিজ নিজ অভিমত জানাইবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরমবিদ্যোৎসাহিতার ফলে যে মহান উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত এই গ্রন্থের সৌষ্ঠবসাধন আমার পরম কর্তব্য হইয়াছে, তজ্জন্য আমি সকলেরই অভিমত ও

উপদেশ গ্রহণ করিতে সর্বদা ইচ্ছুক। পাঠকগণ এই গ্রন্থকে নিজের গ্রন্থ মনে করিয়া ইহার সৌষ্ঠবসাধনের জন্ত আমাকে উপদেশ করিলে, তদনুসারে অস্ত্র খণ্ডে এবং গ্রন্থশেবে আমি দোষ সংশোধনে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আর যদি পাঠকগণের উৎসাহের ফলে আমার জীবনে কখনও এই গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ হয়, তবে তখন আমি ইহার সৌষ্ঠবসম্পাদনে বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে পারিব। আমার আর বাহা বাহা বলিবার আছে, তাহা গ্রন্থশেবেই বক্তব্য। ইতি।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪

২৭শে শ্রাবণ

পাবনা

শ্রীকণিভূষণ শর্মা



বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
৮ম সূত্রে—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ-ভেদে শব্দপ্রমাণের দ্বৈবিধ্য কথন, (ভাষ্যে) ঐ সূত্রের প্রয়োজন কথন ও "দৃষ্টার্থ" ও "অদৃষ্টার্থ" শব্দের ব্যাখ্যা	... ১৫৭
৯ম সূত্রে আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের নামোল্লেখরূপ প্রমেয়-বিভাগ ও প্রমেয়ের সামান্য-লক্ষণ সূচনা	... ১৬০
ভাষ্যে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের পরিচয় ও ত্রব্যগুণাদি সামান্য প্রমেয়ের অস্তিত্ব কথন পূর্বক হ্রাসসূত্রে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের প্রমেয় নামে বিশেষ উল্লেখের কারণ কথন, প্রমেয়মধ্যে সূত্রের অনুল্লেখের কারণ কথন	... ১৬১
১০ম সূত্রে ইচ্ছাদি গুণের আত্মলিঙ্গত্ব কথন দ্বারা আত্মার লক্ষণ সূচনা	... ১৬৭
ভাষ্যে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা ও অনাব্যবাহারীর মত খণ্ডন	... ১৬৯
১১শ সূত্রে শরীরের লক্ষণ	... ১৭৬
১২শ সূত্রে ইন্দ্রিয়ের বিভাগ ও লক্ষণ সূচনা ও ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব কথন	... ১৭৭
ভাষ্যে—ইন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ ব্যাখ্যা ও ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব স্বীকারের যুক্তি প্রদর্শন	... ১৭৮
১৩শ সূত্রে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত কথন, ভাষ্যে ঐ সূত্রের প্রয়োজন কথন	... ১৮০
১৪শ সূত্রে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ কথন পূর্বক তাহার লক্ষণ সূচনা	... ১৮০
১৫শ সূত্রে বুদ্ধির লক্ষণ (ভাষ্যে) সাংখ্যমত নিরাস	... ১৮২
১৬শ সূত্রে মনের সাধক উল্লেখ পূর্বক লক্ষণ সূচনা	... ১৮৩
ভাষ্যে সূত্রানুসারে মনের সাধন	... ১৮৪
১৭শ সূত্রে প্রবৃত্তির লক্ষণ	... ১৮৬
১৮শ সূত্রে দোষের লক্ষণ	... ১৮৭
১৯শ সূত্রে প্রেত্যভাবের লক্ষণ, ভাষ্যে প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যা ও অনাদিত্ব কথন	... ১৮৯
২০শ সূত্রে ফলের লক্ষণ	... ১৯৫
২১শ সূত্রে হুৎথের লক্ষণ	... ১৯১
২২শ সূত্রে অপবর্ণের লক্ষণ	... ১৯৩
ভাষ্যে—মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়, এই মতের বিশেষ বিচারপূর্বক খণ্ডন	... ১৯৫—২০১
২৩শ সূত্রে সংশয়ের লক্ষণ ও পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজ্ঞাত পঞ্চবিধ সংশয়ের সূচনা	... ২০৬
ভাষ্যে পঞ্চবিধ সংশয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ	... ২০৮—২১৬
২৪শ সূত্রে প্রয়োজনের লক্ষণ	... ২১৯
২৫শ সূত্রে দৃষ্টাস্তের লক্ষণ	... ২২০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
২৬শ সূত্রে সিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণ ...	২২২
২৭শ সূত্রে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের বিভাগ ...	২২৪
২৮শ সূত্রে সর্বতরঙ্গসিদ্ধান্তের লক্ষণ ...	২২৫
২৯শ সূত্রে প্রতিতরঙ্গসিদ্ধান্তের লক্ষণ ...	২২৬
৩০শ সূত্রে অধিকরণসিদ্ধান্তের লক্ষণ ...	২৩০
৩১শ সূত্রে অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের লক্ষণ ...	২৩২
৩২শ সূত্রে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের বিভাগ ...	২৩৫
ভাষ্য—দশাবয়ববাদের উল্লেখ, ব্যাখ্যা ও খণ্ডন ...	২৩৭
৩৩শ সূত্রে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ ...	২৪৩
৩৪শ সূত্রে হেতুর সামান্ত লক্ষণ ও সাধর্ম্য হেতুর লক্ষণ ...	২৪৮
৩৫শ সূত্রে বৈধর্ম্য হেতুর লক্ষণ ...	২৪৮
৩৬শ সূত্রে উদাহরণের সামান্ত লক্ষণ ও সাধর্ম্যোদাহরণের লক্ষণ ...	২৬৩
৩৭শ সূত্রে বৈধর্ম্যোদাহরণের লক্ষণ ...	২৬৯
৩৮শ সূত্রে উপনয়ের লক্ষণ ...	২৭৮
৩৯শ সূত্রে নিগমনের লক্ষণ ...	২৮২
ভাষ্য—প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বে সর্বপ্রমাণের মিলন কখন ও তাহার হেতু কখন, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন বর্ণন	২৮৬—২৯৮
৪০শ সূত্রে তর্কের লক্ষণ ও তর্কের প্রয়োজন কখন ...	৩০৪
ভাষ্য—তর্কের উদাহরণ প্রদর্শন ...	৩০৫
তর্ক, তত্ত্বজ্ঞান নহে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সহায়, ইহার হেতু কখন ...	৩১৩
৪১শ সূত্রে নির্ণয়ের লক্ষণ ...	৩১৬
ভাষ্য—সাধন ও উপালম্ব, এই উভয়ই নির্ণয়-সাধন হইতে পারে না, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন ও নিরাস এবং নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে, ত্রাণসূত্রোক্ত নির্ণয়- লক্ষণ নির্ণয়মাত্রের লক্ষণ নহে, এই সিদ্ধান্ত কখন ...	৩১৭

দ্বিতীয় আশ্রিক

১ম সূত্রে বাদের লক্ষণ ...	৩২৬
ভাষ্য বাদলক্ষণের ব্যাখ্যা এবং বিশেষণ পদগুলির প্রয়োজন বর্ণন ...	৩২৮
২য় সূত্রে জল্পের লক্ষণ, ভাষ্য জল্পলক্ষণের ব্যাখ্যা, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা কোন পদার্থের সাধন হইতেই পারে না, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন পূর্বক তাহার উত্তর ...	৩৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩য় সূত্রে বিতণ্ডার লক্ষণ	৩৪৬
৪র্থ সূত্রে হেত্বাভাসের বিভাগ	৩৪৯
৫ম সূত্রে সব্যভিচারের লক্ষণ	৩৫৯
৬ষ্ঠ সূত্রে বিকল্পের লক্ষণ	৩৬৯
৭ম সূত্রে প্রাকরণসমের লক্ষণ	৩৭৫
৮ম সূত্রে সাধ্যসমের লক্ষণ	৩৭৯
৯ম সূত্রে কালাতীতের লক্ষণ	৩৮৪
ভাব্যে কালাতীত হেত্বাভাস-লক্ষণের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন, সূত্রের অর্থান্তরের উল্লেখপূর্বক তাহার খণ্ডন	৩৮৪
১০ম সূত্রে—ছলের সামান্ত লক্ষণ	৩৯২
১১শ সূত্রে—ত্রিবিধ ছলের বিভাগ	৩৯৩
১২শ সূত্রে—বাক্‌ছলের লক্ষণ, ভাব্যে বাক্‌ছলের উদাহরণ ও অসম্ভবত্ব সমর্থন	৩৯৪—৪০৭
১৩শ সূত্রে—সামান্ত ছলের লক্ষণ, ভাব্যে—সামান্ত ছলের উদাহরণ ও অসম্ভবত্ব সমর্থন	৪০৪—৪০৬
১৪শ সূত্রে—উপচারছলের লক্ষণ, ভাব্যে—উপচারছলের উদাহরণ ও অসম্ভবত্ব সমর্থন	৪০৯—৪১২
১৫শ সূত্রে—বাক্‌ছল হইতে উপচারছল ভিন্ন নহে, সুতরাং ছল দ্বিবিধ, এই পূর্বপক্ষ	৪১৫
১৬শ সূত্রে—বাক্‌ছল হইতে উপচারছলের ভেদ জ্ঞাপন করিয়া পূর্বসূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের প্রতিবেশ	৪১৬
১৭শ সূত্রে—বাক্‌ছল ও উপচারছলের বিশেষ স্বীকার না করিলে ছলের একত্বাপত্তি কখন	৪১৭
১৮শ সূত্রে—জাতির লক্ষণ	৪১৮
১৯শ সূত্রে—নিগ্রহস্থানের লক্ষণ	৪২২
২০শ সূত্রে—জাতি ও নিগ্রহস্থানের বহুত্ব কখন	৪২৪

ন্যায়দর্শন

বাৎস্তায়নভাষ্য ।

ভাষ্য । প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ

প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং ।

অনুবাদ । প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে প্রবৃত্তির সফলতা হয়, অতএব প্রমাণ ঐ পদার্থের অব্যভিচারী (এবং) সর্বাপেক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যেহেতু গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকে প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সেই প্রবৃত্তিই সফল হয়, অতএব বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাত্ত পদার্থকে যাহা এবং মেরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেইরূপই হয়, কখনও তাহার অন্যথা হয় না এবং সর্বত্রই সর্বাপেক্ষা প্রমাণেরই প্রয়োজন অধিক ।

বিবৃতি । জীব তাহার গ্রাহ্য পদার্থের প্রাপ্তি এবং ত্যাজ্য পদার্থের পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল পদার্থকে যথার্থরূপে না বুঝিয়া অর্থাৎ এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া অথবা এক প্রকার পদার্থকে অন্য প্রকার পদার্থ বলিয়া ভুল বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কখনই সফল হয় না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না । জলার্থী ব্যক্তি তৈলকে জল বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা জলকে তৈল বুঝিয়া তাহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কি সফল হয় ? সেখানে কি তাহার বস্তুতঃ জলের প্রাপ্তি এবং তৈলের পরিত্যাগ হয় ? তাহা কখনই হয় না । যে কোনরূপে উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই এখানে প্রবৃত্তির সফলতা নহে, তাহা ভুল বুঝিয়াও হইতে পারে । কূপের জলকে গঞ্জাজল বুঝিয়া পান করিলেও পিপাসা নিবৃত্তি হয়, কিন্তু গঞ্জাজল বুঝিয়া গঞ্জাজল-লাভের যে প্রবৃত্তি, তাহা সেখানে সফল হয় না । কোন স্থলে ভুল বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইয়া আশাতীত ফললাভও হইতে পারে, কিন্তু সেখানে যাহা বুঝিয়া যাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ-বিষয়ে যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সে প্রবৃত্তি কিন্তু সফল হয় না, কারণ, সেই প্রবৃত্তির বিষয় সেই পদার্থ অথবা সেইরূপ পদার্থ সেখানে থাকে না, তাহা থাকিলে সে বোধ যথার্থই হইত । পদার্থের যথার্থ বোধ হইলেই তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ-বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইয়া থাকে । সুতরাং যে বোধ সফল

প্রবৃত্তির জনক, তাহাকেই যথার্থ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। ঐ যথার্থ বোধ আবার প্রমাণ ব্যতীত হয় না। উহা প্রমাণেরই ব্যাপার, সুতরাং উহার দ্বারা প্রমাণও সকল প্রবৃত্তির জনক। সুতরাং বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ প্রমাণের প্রামাণ্য আছে, তাহা না হইলে প্রমাণ কখনই সকল প্রবৃত্তি জন্মাইত না। ফলকথা, এইরূপ অনুমানের দ্বারা সামান্ত্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। এবং প্রমাণ ব্যতীত যখন কোন পদার্থেরই যথার্থ বোধ হয় না, যথার্থ বোধ না হইলেও পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবৃত্তি সকল হয় না, সুতরাং প্রমাণ সকল প্রবৃত্তির জনক, প্রমাণ যথার্থ অনুভূতির সাধন; অতএব বুঝা যায়, প্রমাণই সর্বোপেক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, সর্বোপেক্ষে প্রমাণেরই অধিক প্রয়োজন, এ জন্ত মহর্ষি গৌতম সর্বোপেক্ষে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

টিপ্পনী। ন্যায়দর্শনের বক্তা মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রের দ্বারা “প্রমাণ”, “প্রমেয়” প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সলাভে আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানসাধনের জন্য তাঁহার এই ন্যায়দর্শন আবশ্যক। নিঃশ্রেয়সলাভে গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক কেন? ইহা পরে ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি গৌতমের ঐ কথার এক সময়ে শূন্যবাদী ও সংশয়বাদী বিরোধী সম্প্রদায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। কারণ, প্রমাণের দ্বারাই যখন সকল পদার্থের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তখন প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান সর্বোপেক্ষে আবশ্যক। প্রামাণ্যই প্রমাণের তত্ত্ব, কিন্তু সেই প্রামাণ্য নিশ্চয়ের কোনই উপায় নাই। বাহা “প্রমাণ” নামে অভিহিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করিব কিরূপে? অনুভূতির সাধন হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, বাহা বস্তুতঃ প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া দার্শনিকগণ বাহাকে বলিয়াছেন “প্রমাণভাস”,—ভ্রমসাধন সেই প্রমাণভাসের দ্বারাও অসংখ্য অনুভূতি হইতেছে। বাহা যথার্থ অনুভূতির সাধন, তাহাকেই প্রমাণ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই অনুভূতি যথার্থ হইল কি না, ইহা নিশ্চয় করিবার উপায় যখন কিছুই নাই, তখন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় কোনরূপেই হইতে পারে না। প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া যথার্থরূপে বুঝিতে না পারিলেও তাহার দ্বারা অন্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব, সুতরাং অসম্ভবের উপদেশক বলিয়া গৌতমের এই শাস্ত্র অনর্থক। আর এক কথা, গৌতম আত্মা প্রভৃতি “প্রমেয়” পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেই মোক্ষলাভের চরম কারণরূপে দ্বিতীয় সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মতে আত্মা প্রভৃতি “প্রমেয়” পদার্থগুলিই প্রধান মোক্ষোপযোগী, তাহা হইলে ঐ “প্রমেয়” পদার্থের সর্বোপেক্ষে উল্লেখ না করিয়া “প্রমাণ” পদার্থেরই সর্বোপেক্ষে উল্লেখ করা তাঁহার উচিত হয় নাই। এই সমস্ত আপত্তি নিরাসের জন্য গৌতমমতপ্রতিষ্ঠাকামী ভাষ্যকার বাৎস্যয়ন ভাব্যারম্ভে বলিয়াছেন;—

“প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদিগ্ৰহং প্রমাণং”

ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের উপায় আছে ; অহুমান প্রমাণের দ্বারাই তাহা নিশ্চয় করা যায়। অহুমানের দ্বারা বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী। “প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী” এই কথা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? বুঝিতে হইবে, প্রমাণ যে পদার্থকে যাহা এবং যে প্রকার বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেই প্রকারই হয়, কখনও তাহার অন্যথা হয় না, অন্যথা হইলে বুঝিবে, তাহা প্রমাণ নহে—“প্রমাণাভাস”। “প্রমাণাভাস” তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে। কারণ, প্রমাণাভাসের প্রতিপাদ্য পদার্থ বস্তুতঃ তাহা নহে অথবা সেই প্রকার নহে। “প্রমাণাভাস” রজ্জ্বকে “সর্প” বলিয়া প্রতিপন্ন করে, কিন্তু রজ্জ্বের বার্থ জ্ঞান হইলে তখন বুঝা যায়, উহা সর্প নহে। প্রমাণাভাস আত্মাকে বিনাশী বলিয়া প্রতিপন্ন করে, কিন্তু আত্মার তত্ত্ব বুঝিলে তখন বুঝা যায়, আত্মা সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ আত্মা অবিনাশী, আত্মা নিত্য। সূত্ররূপে বুঝা যায়, প্রমাণাভাস তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী। প্রতিপাদ্য পদার্থের এই অব্যভিচারিতাই প্রমাণের প্রামাণ্য। এই অব্যভিচারিতার অহুমানই প্রমাণের প্রামাণ্যের অহুমান। ভাষ্যকার “প্রমাণং অর্থবৎ” এই কথার দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই অহুমানে হেতু বলিয়াছেন “প্রবৃত্তিসামর্থ্য”। “সামর্থ্য” শব্দটি প্রাচীন কালে ফলসম্বন্ধ বা সফলতা অর্থেও প্রযুক্ত হইত। প্রাচীনগণ সফল প্রবৃত্তিকে “সমর্থপ্রবৃত্তি” বলিতেন। যে প্রবৃত্তির “অর্থ” কি না বিষয় সমাক, অর্থাৎ বার্থ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহাই “সমর্থপ্রবৃত্তি,” তদ্বিন্ন প্রবৃত্তি বার্থপ্রবৃত্তি, নিফল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির সামর্থ্য বলিতে প্রবৃত্তির সফলতা।* ভাষ্যকারের ঐ কথার ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে—সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব। ভাষ্যকার ঐ হেতুর দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, প্রমাণ যখন সফল প্রবৃত্তির জনক, তখন বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী, অর্থাৎ তাহার প্রামাণ্য আছে। প্রমাণ যদি প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী না হইত, তাহা হইলে কখনই সফলপ্রবৃত্তি জন্মাইত না। যাহা প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে, তাহা সফল প্রবৃত্তির জনক নহে, যেমন “প্রমাণাভাস”। প্রমাণাভাসের দ্বারা বুঝিয়া সেই বস্তুর গ্রহণ বা পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কখনই সফল হইতে পারে না, কারণ, প্রমাণাভাসের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, বস্তুতঃ তাহা অথবা সেই প্রকার বস্তু সেখানে থাকে না। তাহা না থাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ কিরূপে হইবে? তাহা কোন-

* “অর্থবদিতি নিত্যবোধে মতুঃ। নিত্যতা চাব্যভিচারিতা, তেনার্থাব্যভিচারীত্বাৎ। ইয়মেব চার্থা-
ব্যভিচারিতা প্রমাণস্ত, যদ্বৈশকালান্তরাবস্থান্তরাবিসংবাদোৎপত্তিপ্ৰকারোন্তদ্রূপদর্শিতয়োঃ। অত্র হেতুঃ
প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ। যদি পুনরেতদর্থবল্লাভবিষয় সমর্থ্যঃ প্রবৃত্তিমকরিষ্যৎ যথা প্রমাণা-
ভাস ইতি ভাবিতরেকী হেতুঃ, অথবাভাবিতরেকী বা অহুমানস্ত স্বতঃপ্রমাণতরং স্বরূপাণি সম্ভবাৎ”।—ভাষ্যবাস্তিক,
তাত্ত্বপঞ্চাঙ্গিকা।

রূপেই হইতে পারে না। ফলতঃ এইরূপে পূর্বোক্ত প্রকার অনুমানের দ্বারা সামান্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে, ইহাই ভাষ্যকারের প্রথম কথা। “অর্থ” শব্দের দ্বারা বস্তুমাত্র বুঝা গেলেও ভাব্যকার গ্রাহ ও ত্যাজ্য পদার্থকেই এখানে “অর্থ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। ভাষ্যকার নিজেই পরে তাহা বলিয়াছেন। ফলকথা, যাহা গ্রাহ ও নহে, ত্যাজ্য ও নহে, কিন্তু উপেক্ষণীয়, তাহা পদার্থ হইলেও এখানে “অর্থ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। কারণ, উপেক্ষণীয় পদার্থে কোন প্রভুত্বই হয় না; প্রভুতির সফলতার কথা সেখানে বলা যায় না।

হৃদয়দর্শীর আপত্তি হইতে পারে যে, যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ভাষ্যকার সামান্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই অনুমানের প্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইবে? তাহার জন্য আবার অন্য অনুমান উপস্থিত করিলে তাহারই বা প্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইবে? এইরূপে কোন দিনই প্রমাণের প্রামাণ্য-সন্দেহ নিবৃত্ত হইবে না, তবে আর প্রামাণ্য নিশ্চয় করা গেল কৈ? এতদ্বত্তে বক্তব্য এই যে, অনুমান মাত্রই প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। এই যে ঘড়ি দেখিয়া সময়ের অনুমান করিয়া তদনুসারে এখন সর্বদেশে অসংখ্য কার্য্য চলিতেছে, লিপিপাঠে অনুমানের দ্বারা কত কত প্রব্রবর্তার নির্ণয় হইতেছে, গণিতের দ্বারা কত কত ছত্রহ তত্ত্বের অনুমান করিয়া তদনুসারে কত কত কার্য্য নির্বাহ হইতেছে, তুল্যদণ্ডের সাহায্যে ভ্রবোর গুরুত্ববিশেষের অনুমান করিয়া সূচিরকাল হইতে ক্ষয়-বিক্ষয় ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, ভূয়োদর্শনসিদ্ধ অবিসংবাদী সংস্কারসমূহের মহিমায় আরও কত কত অনুমান করিয়া সূচিরকাল হইতে জীবকূল জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, এই সকল অনুমানে কি বস্তুতঃ সর্বত্রই প্রামাণ্য-সংশয় হইয়াছে ও হইয়া থাকে? তাহা হইলে কি সংসার চলিত? অবশ্য অনেক স্থলে প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় এবং জ্ঞানে যথার্থতা-সংশয় হইয়া থাকে, এ জন্য ন্যায়চার্য্যগণ অন্য দার্শনিকের ন্যায় একেবারে “স্বতঃপ্রামাণ্য” পক্ষ স্বীকার করেন নাই। ইহারা “পরতঃপ্রামাণ্য”বাদী। অর্থাৎ ইহাদিগের মতে প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হয়, কারণ, “এই জ্ঞান যথার্থ কি না, ইহা প্রমাণ কি না”, এইরূপ সংশয় বহু স্থলে হইয়া থাকে। প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ হইলে এইরূপ সংশয় কখনও হইত না। কিন্তু অনেক প্রমাণবিশেষের স্বতঃপ্রামাণ্য ন্যায়চার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, তাহা সত্য, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে, সেই সকল প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয়ই হয় না। কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাইয়া এবং কোন নামশূন্য পত্রাদি পাইয়া তাহার অবশ্য একজন লেখক ছিল বা আছে, এই বিষয়ে যে অনুমান হয়, তাহাতে কি কখনও প্রামাণ্য-সংশয় হইয়া থাকে? সংশয়বাদী ইহাতেও সংশয় করিলে পদে পদে সত্যের অপলাপ করিয়া বিনষ্ট হইবেন (“সংশয়াচ্ছা বিনশ্চতি”)।

পরন্তু সংশয়বাদী ইহা স্বীকার না করিলে স্বপক্ষ সমর্থনই করিতে পারেন না। সর্বত্র সংশয়ই তাহার স্বপক্ষ। তিনি যুক্তির দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিবেন, নচেৎ তাহার কথা কে মানিবে? কেবল “সংশয় সংশয়” বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও কেহ তাহা শুনিবে না, কেন

সংশয়, তাহার যুক্তি বলিতে হইবে। “যুক্তি” বলিয়া স্বতঃ কোন একটা পদার্থ নাই। অহুমান প্রমাণ এবং তাহার সহকারী “তর্কে”র প্রচলিত নামই “যুক্তি”। অহুমান মাত্রই প্রামাণ্য-সংশয় করিলে তাহার দ্বারা সংশয়বাদীর পক্ষও নির্ণীত হইবে না। ঐ সংশয়েও সংশয়, আবার তাহাতেও সংশয়, এইরূপই বলিয়া যাইতে হইবে। যুক্তির দ্বারা কিছু স্থির হয় না, সর্বত্র সংশয় থাকে, কোন যুক্তিই প্রতিষ্ঠিত নহে, এরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ, ঐ কথাগুলিও যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিয়াই বলা হইতেছে। পরন্তু সংশয় মনোগ্রাহ। সংশয় হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা যায়। সে মানস প্রত্যক্ষে মনঃ স্বতঃপ্রমাণ। সুতরাং কোন বিষয়ে সংশয় হইলে সংশয় হইয়াছে কি না, এইরূপ সংশয় কাহারই হয় না। সর্বত্র প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা যাইত। যে সকল প্রমাণে বস্তুতঃ প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তাহাতে ভাষ্যাক্ত প্রকারে প্রামাণ্যের অহুমান করিতে হইবে। সেই হেতুতে ব্যভিচার-সংশয় হইলে অহুকুল তর্কের দ্বারা তাহা দূর করিতে হইবে। তাহাতেও ঐরূপ সংশয় হইলে অন্তরূপ অহুমানের দ্বারা এবং অন্তরূপ তর্কের দ্বারা তাহা দূর করিবে। এইরূপে স্বতঃপ্রমাণ অহুমান আসিয়া পড়িলে তখন আর কেহ প্রামাণ্য-সংশয়ের কথা বলিতে পারিবেন না। প্রামাণ্য-সংশয়ের কথা বলিতে গেলেও তাহার কারণ বলিতে হইবে। বিনা কারণে সংশয় হইতে পারে না। সে কারণও প্রমাণসিদ্ধ করিয়া দেখাইতে হইবে। প্রমাণমাত্র প্রামাণ্য-সংশয় করিলে কিছুই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা চলিবে না। ফলতঃ যাহা অসম্ভবসিদ্ধ, তাহা স্বীকার না করিলে, প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিলে সংশয়-বাদীরও নিস্তার নাই। শূন্যবাদীর কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। মূল কথা, কোন স্থলে স্বতঃ, কোন স্থলে অহুমানাদি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। ভাষ্যকার যে অহুমানের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের কথা বলিয়াছেন, ঐ অহুমান স্বতঃপ্রমাণ। উহাতে আর প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। যাহা সফল প্রবৃত্তির জনক, তাহা অবশ্য প্রমাণ। তাহা প্রমাণ না হইলে কখনই সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত না, ইহা বুঝিলে এই অহুমানের উপরে আর প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। কারণ, এই অহুমানের হেতু নির্দোষ বলিয়াই নিশ্চিত। অবশ্য প্রমাণ স্বতঃই সফল প্রবৃত্তির জনক নহে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“প্রমাণতোহর্থপ্রতি-পত্তৌ”, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা পূর্কোক্ত গ্রাহ বা তাজা পদার্থের জ্ঞান হইলে যদি ঐ পদার্থ উপকারী বলিয়া মনে হয়, তবে সংসারীর তাহা পাইতে ইচ্ছা হয় এবং অপকারী বলিয়া মনে হইলে তাহার পরিহারে ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাবশতঃ তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারে প্রবৃত্ত হইলে অন্ত্যস্ত কারণ সবে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার হইয়া থাকে। সুতরাং সেখানে সেই প্রবৃত্তি সফল হয়। এই ভাবে প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনক। “প্রমাণাভাস” সফল প্রবৃত্তির জনক নহে। কারণ, প্রমাণাভাসজন্ম জ্ঞান ভ্রম। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহা পাইতে অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিতাগ হইতে পারে না। বস্তু না থাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার কিরূপ হইবে? সুতরাং সেখানে

প্রবৃত্তি সফল হয় না। যথার্থ জ্ঞানই সফল প্রবৃত্তির জনক। ঐ যথার্থ জ্ঞান প্রমাণ বাতীত হয় না। উহা প্রমাণেরই ব্যাপার। সুতরাং ঐ যথার্থজ্ঞানরূপ ব্যাপারের দ্বারা প্রমাণও সফল প্রবৃত্তির জনক। সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুকিলে যেমন প্রমাণজ্ঞ জ্ঞানের যথার্থতা নিশ্চয় হয়, তদ্রূপ সেখানে প্রমাণেরও ঐ হেতুর সাহায্যে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। তাহা হইলে প্রমাণের দ্বারা প্রমের প্রবৃত্তি পদার্থবর্গের তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব নহে এবং অসম্ভবের উপদেশক বলিয়া মহাবি পোতমের এই স্তায়শাস্ত্র অনর্থকও নহে।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুকিয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তির সফলতার পূর্বে প্রমাণকে সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া নিশ্চয় করা গেল না। সুতরাং তখন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ও হইল না। প্রামাণ্য-নিশ্চয় না হইলেও পদার্থ-নিশ্চয় হইল না। পদার্থ-নিশ্চয় না হইলেও প্রবৃত্তি হইল না। প্রবৃত্তি না হইলে প্রবৃত্তির সফলতা অলীক। সুতরাং কোন কালেই প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের আশা থাকিল না। আপত্তিটা আপাততঃ একটা গুরুতর কিছু মনে হইলেও ইহা গুরুতর কিছু নহে। কারণ, প্রবৃত্তিতে পদার্থ-নিশ্চয় নিয়ত কারণ নহে। পদার্থ-সন্দেহ স্থলেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং হইয়া আসিতেছে এবং পূর্বে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলেও প্রমাণজ্ঞ জ্ঞান হইবার কোন বাধা নাই। প্রমাণের দ্বারা পদার্থ-বোধ হইলে পূর্বেকৃত প্রকারে ইচ্ছাবিশেষ প্রযুক্ত প্রবৃত্তি হইয়া যখন ঐ প্রবৃত্তির সফলত্ব নিশ্চয় করে, তখনই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। পদার্থজ্ঞান এবং প্রবৃত্তির পূর্বে সর্বত্র প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক হয় না। উদয়নাচার্য্য “স্তায়বাস্তিক-তাৎপর্য্যপরিণুক্তি”তে এ কথাটা আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি দ্বিবিধ। ঐহিক ফলের জন্ত এবং পারলৌকিক ফলের জন্ত। পারলৌকিক ফলের জন্ত যে প্রবৃত্তি, তাহাতে পূর্বে প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক। কিন্তু ঐহিক ফলের জন্ত যে প্রবৃত্তি, তাহাতে পদার্থ-নিশ্চয়ও অপেক্ষা করে না এবং প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় দূরে থাকুক, প্রামাণ্য কি, তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন সময়ে পূর্বেও প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইয়া পড়ে, তাহাও সে স্থলে প্রবৃত্তির কারণ নহে। ইহা স্বীকার না করিলে যিনি জয়লাভের ইচ্ছায় প্রামাণ্য খণ্ডন করিবার জন্ত বিচারে প্রবৃত্তি হইতেছেন, তাহার এ প্রবৃত্তি কেন হইতেছে? তাহারও ত জয়লাভ একান্ত নিশ্চিত নহে। সুতরাং পদার্থ-নিশ্চয় না হইলেও প্রবৃত্তি হয়, ইহা উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য্য এবং সত্য।

যেখানে একজাতীয় প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পদার্থ-জ্ঞান হইতেছে, যেমন আমানিগের চকুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ কত প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেখানে প্রথম প্রমাণকে সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুকিলে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া যায়। শেষে তজ্জাতীয় প্রমাণ মাত্রেরই “ইহা যখন তজ্জাতীয় অর্থাৎ সফল প্রবৃত্তিজনক প্রমাণের সজাতীয়,” তখন ইহা অবশ্য প্রমাণ, এইরূপে প্রামাণ্যের নিশ্চয় পূর্বেও হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। প্রমাণমূলক প্রচলিত

ব্যবহারে এইরূপ স্থল প্রচুর। অদৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ও এইরূপে পূর্বেই হইয়া থাকে ; সুতরাং অদৃষ্টকলক পারলৌকিক কার্যকলাপে প্রবৃত্তি হওয়ার বাধা নাই। বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চয়ের কথা এবং প্রমাণ সম্বন্ধে অন্যান্য আপত্তি ও সমাধান মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। যথা-স্থানেই তাহার বিশদ প্রকাশ হইবে।

মহর্ষি সর্বপ্রথমে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার পূর্বোক্ত আদি-ভাষ্যের দ্বারা ইহারও উত্তর দিয়া গিয়াছেন। সে পক্ষে “অর্থবৎ” এই স্থলে “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন এবং ঐ স্থলে “অতিশায়ন” অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় বিহিত। তাহা হইলে “প্রমাণং অর্থবৎ” এই কথার দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষে বুঝা যায়, প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতেও পূর্বোক্ত “প্রবৃত্তিসামর্থ্য”ই হেতু। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা পদার্থ বুঝিয়া প্রবৃত্তি হইলেই যখন প্রবৃত্তি সফল হয় এবং প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থেরই যথার্থ বোধ হয় না, প্রমাণই সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক, “প্রমেয়” প্রভৃতি যাবৎ পদার্থই প্রমাণের মুখাপেক্ষী, তখন বুঝা গেল, প্রমাণ সর্বাপেক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহর্ষি সর্বপ্রথমে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার যে অহুমানের দ্বারা প্রমাণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন, উহাও স্বতঃপ্রমাণ। সকল পদার্থসিদ্ধি বাহার অধীন এবং বাহাই যথার্থ বোধ জন্মাইয়া তদ্বারা জীবের প্রবৃত্তিকে সফল করে, তাহার যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, এ বিষয়ে প্রতিবাদ হইতে পারে না। এইরূপ অহুমানে প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। এইরূপ অনেক প্রমাণের “স্বতঃপ্রামাণ্য” পরতঃপ্রামাণ্যবাদী ন্যায়চার্য্যগণও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটিকা” প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার সংবাদ দিতেছে।

“প্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ জ্ঞান। কেবল প্রতিপত্তি বলিলে প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানও বুঝা যায়, কিন্তু তাহা কোন অহুতানে প্রবৃত্তি জন্মায় না এবং প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হইলেও উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিলে উপেক্ষাই করে, সেখানে গ্রহণও নাই, ত্যাগও নাই, সুতরাং সেখানে তদ্বিষয়ে কোন অহুতান নাই, সেখানে প্রবৃত্তির সফলতার কথা বলা চলে না। তাই কেবল প্রতিপত্তি না বলিয়া বলিয়াছেন “অর্থপ্রতিপত্তি”। “অর্থ” শব্দের দ্বারা যে এখানে গ্রাহ ও ত্যাজ্য পদার্থই লক্ষ্য অর্থাৎ স্বুথ এবং স্বুথের কারণ এবং ত্রুথ ও ত্রুথের কারণ পদার্থবর্গই যে ভাষ্যকারের এখানে “অর্থ” শব্দের অর্থ, এ কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। পরে অনেক বার ভাষ্যকার ঐ অর্থে “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যার জন্ত এবং ভাষ্যের পূর্বাধার সংগতির জন্য কেবল “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে পূর্বোক্ত “অর্থ”ই তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে।

প্রমাণাভাসের দ্বারাও পূর্বোক্ত অর্থপ্রতিপত্তি হয়, কিন্তু সেখানে প্রবৃত্তির সফলতা হয় না। তাই বলিয়াছেন ‘প্রমাণতঃ’। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা এবং প্রমাণ হেতুক। ভাষ্যকার “প্রমাণেন” অথবা “প্রমাণাৎ” এইরূপ কোন প্রয়োগ না করিয়া “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন

কেন? উহাতে কি কোন গুঢ় অভিসন্ধি আছে? আমরা এখন এসব কথার চিন্তা না করিলেও উদ্যোতকর ইহার চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ইহার মধ্যে তিনি ভাষ্যকারের অনেক অভিসন্ধি দেখিয়াছিলেন। এই কথার উদ্যোতকর এখানে বাহা বলিয়াছেন, বাচস্পতি মিশ্র তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে কথামণ্ডলির বিশদ মর্ম্ম এই যে, “প্রমাণতঃ” এই পদটি তৃতীয়া বিভক্তির সকল বচনেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং উহার দ্বারা বিভিন্ন বিভক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এক একটি করিয়া বহু অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কোন স্থলে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা, কোন স্থলে দুই বা বহু প্রমাণের দ্বারা পদার্থ বোধ হয়, এ সিদ্ধান্ত ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন। এখানেও তদনুসারে “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার দ্বারা একমাত্র প্রমাণের দ্বারা অথবা দুই প্রমাণের দ্বারা অথবা বহু প্রমাণের দ্বারা, এই তিনটি অর্থই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু “প্রমাণেন” অথবা “প্রমাণাভ্যাং” অথবা “প্রমাণৈঃ” ইহার কোন একটি বাক্য প্রয়োগ করিলে ঐরূপ অর্থ বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই এবং পক্ষান্তরে পঞ্চমী বিভক্তির সকল বচনেও “প্রমাণতঃ” এই প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। হেতুর্থে পঞ্চমী হইলে উহার দ্বারা বুঝা যাইবে, প্রমাণ অর্থপ্রতিপত্তির হেতু। পক্ষান্তরে ভাষ্যকারের ইহাও বিবক্ষিত ছিল। উদ্যোতকরের এই কথার সমর্থনের জন্য তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণের দ্বারা অর্থপ্রতিপত্তি হয়, এই কথা বলিলেও প্রমাণ অর্থপ্রতিপত্তির হেতু, ইহা বুঝা যায়, তাহা হইলেও হেতুর্থে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা উহা প্রকাশ করিলে উহা শীঘ্র বুঝা যায়। তাহাতে প্রমাণ ও তজ্জন্ত অর্থপ্রতিপত্তি যে একই পদার্থ নহে, ভিন্ন পদার্থ, ইহাও শীঘ্র স্পষ্ট বুঝা যায়। হেতু বলিয়া বুঝিলে তাহার ফলকে হেতু হইতে ভিন্ন বলিয়াই শীঘ্র বুঝা যায়। ভাষ্যকার ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া তাহাও বুঝাইয়াছেন এবং যথার্থ বোধের অন্ত্যস্ত কারক হইতে তাহার করণকারক প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বপ্রথমে তাহার উল্লেখ এবং প্রতিপাদন যুক্তিসূক্ত, ইহা দেখাইবার জন্ত এক পক্ষে করণে তৃতীয়া বিভক্তি-সিদ্ধ “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলকথা, প্রয়োগ-চতুর ভাষ্যকার যেমন “অর্থবৎ” এই স্থলে অনেকাংশে “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া দুইটি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জপ “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন। অন্যরূপ প্রয়োগে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত সকল অর্থ প্রকটিত হয় না। *

কোন পুস্তকে ভাষ্যান্তে “ও” নমঃ প্রমাণায়” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ঐ পাঠ কল্পিত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের মঙ্গলাচরণের কথার কোনই উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু বঙ্গদেশের প্রাচীন মহাদার্শনিক শ্রীধর ভট্ট তাহার ‘জ্ঞান-কন্দলী’র প্রারম্ভে মঙ্গল-বিচারপ্রসঙ্গে জ্ঞান-ভাষ্যকার পক্ষিন্দ্রাবামী ভাষ্যান্তে মঙ্গলবাক্য নিবদ্ধ

করেন নাই, ইহা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার মঙ্গল-বাক্য নিবদ্ধ না করিলেও তিনি গ্রন্থারম্ভের পূর্বে মঙ্গলাহুতান করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীধরভট্ট অমুমান করিয়াছেন। শ্রীধরভট্ট বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি যে ৯:৩ শাকাব্দে “জায়কন্দলী” রচনা করেন, ইহা “জায়কন্দলী”র শেষভাগে তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।*

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ মহর্ষি গোতমের মঙ্গলাচরণ বিষয়ে বিচার করিয়া শেষে নিজের মত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম প্রথম হুত্রে সর্বপ্রথম “প্রমাণ” শব্দের উচ্চারণ করাতাই তাঁহার মঙ্গলাচরণ হইয়াছে। কারণ, “প্রমাণ” বিষ্ণুর একটি নাম। বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে আছে “প্রমাণঃ প্রাণনিলয়ঃ”। আমরা ভাষ্যকারের মঙ্গলাচার বিষয়ে বৃত্তিকারের ঐ কথাটিও বলিতে পারি। কারণ, ভাষ্যকারও সর্বপ্রায়ে “প্রমাণ” শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন। অস্ত্র উদ্দেশ্যে এবং অস্ত্র তাৎপর্যে উচ্চারণ করিলেও বৃত্তিকার মনে করেন, নামের মহিমা যাইবে কোথায়?

ভাষ্য। প্রমাণমন্তুরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ, নার্থপ্রতিপত্তিমন্তুরেণ প্রবৃত্তিসামর্থ্যং। প্রমাণেন, খল্লয়ং জ্ঞাতার্থমুপলভ্য তমর্থমভীপসতি জিহাসতি বা। তস্মৈপ্সা জিহাসাপ্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে। সামর্থ্যং পুনরস্তাঃ ফলেনাভিসম্বন্ধঃ। সমীহমানস্তমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা তমর্থমাপ্নোতি জহাতি বা। অর্থস্তু সূখং সূখহেতুশ্চ, দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ। সৌহৃদ্যং প্রমাণার্থোহপরিসংখ্যেয়ঃ, প্রাণভৃদ্ভেদস্তাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ।

অনুবাদ। প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থবোধ হয় না। অর্থের যথার্থবোধ ব্যতীতও প্রবৃত্তির সফলতা হয় না। এই জ্ঞাতা ব্যক্তি অর্থাৎ সংসারী জীব প্রমাণের দ্বারাই অর্থকে উপলব্ধি করিয়া, সেই অর্থকে পাইতে ইচ্ছা করে অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। প্রাপ্তির ইচ্ছা অথবা ত্যাগের ইচ্ছায় প্রণোদিত সেই জীবের সমীহা অর্থাৎ তদ্বিষয়ে যে প্রবৃত্তি বিশেষ, তাহা “প্রবৃত্তি” এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় অর্থাৎ তাহাকেই প্রবৃত্তি বলে। এই প্রবৃত্তির “সামর্থ্য” কিন্তু ফলের সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভাষ্যে “প্রবৃত্তিসামর্থ্য” শব্দের দ্বারা প্রবৃত্তির সফলতা বুঝিতে

* “অসত্যপি নমস্কারে জায়মীমাসোভাষ্যোঃ পরিদমাপ্তবান্”। “ন চ জায়ম্ বাসোভাষ্যকারীভ্যাং ন কৃতো নমস্কারঃ কিন্তু তত্রানুগনিবন্ধঃ”। “যদিমো পরমাপ্তিকো পক্ষিঃশব্দবদ্যমিনো নাপুতিষ্ঠত ইত্যাস্তাবননিবন্ধঃ”—(জায়কন্দলী)

“আসৌদক্ষিণরাচার্যঃ যিজ্ঞানঃ ত্বরিকশ্রমাম্।

ত্বরিত্বস্তিরিতি গ্রামো ত্বরিশ্রেষ্ঠিব্যবহারঃ”।

“আদিকন্দশোভরনবশতশাকাব্দে জায়কন্দলী রচিতা”।

হইবে। সমীহমান অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবর্তমান জীব সেই অর্থকে (পূর্বোক্ত অর্থকে) পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ সেই অর্থকে প্রাপ্ত হয় অথবা ত্যাগ করে। “অর্থ” কিন্তু সুখ ও সুখের কারণ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভাষ্যে “অর্থ” শব্দের দ্বারা সুখ ও সুখের কারণ-রূপ গ্রাহ্য পদার্থ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণরূপ ত্যাজ্য পদার্থই বুঝিতে হইবে। যাহা গ্রাহ্যও নহে, ত্যাজ্যও নহে, কিন্তু উপেক্ষণীয় পদার্থ, তাহা ঐ “অর্থ” শব্দের দ্বারা ধরা হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিগণের অথবা প্রাণিবৈচিত্র্যের নিয়ম না থাকায় অর্থাৎ যাহা একের সুখ বা সুখের কারণ হয় অথবা দুঃখ বা দুঃখের কারণ হয়, তাহা অল্প সকল প্রাণীরও সেইরূপই হয়, এমন নিয়ম না থাকায়, সেই এই “প্রমাণার্থ” অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন পূর্বোক্ত সুখদুঃখাদি অনিয়ম্য, (তাহার নিয়ম করা যায় না) অর্থাৎ যাহা সুখের কারণ, তাহা সকলেরই সুখের কারণ, ইত্যাদি প্রকার নিয়ম নাই। প্রমাণের প্রয়োজন সুখদুঃখাদি কোন নিয়মবদ্ধ নহে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার ভাষ্যলক্ষণানুসারে এখানে তাঁহার পূর্বোক্ত ভাষ্যের পদবর্ণন করিয়াছেন। নিজের কথার নিজের ব্যাখ্যা করাই স্বপদবর্ণন। উহা ভাষ্যের একটা লক্ষণ। ভাষ্য কাহাকে বলে, এ জন্ত প্রাচীনগণ বলিয়া গিয়াছেন,—

“স্বত্বার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ স্বত্বানুসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ” ॥

পরশরপুরাণে ১৮ অধ্যায়ে এইরূপ ভাষ্যলক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা কোন পুস্তকে দেখা যায়। স্বত্বের ভাষ্য হইলে সেখানে স্বত্বানুসারী পদসমূহের দ্বারা স্বত্বার্থ-বর্ণন থাকিবেই এবং স্বপদ-বর্ণনও থাকিবে। কিন্তু আদিভাষ্যে কেবল স্বপদ-বর্ণনরূপ ভাষ্য-লক্ষণই সম্ভব। তাহাতেই আদিভাষ্যের ভাষ্যত্ব নিষ্পত্তি হয়। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্রও ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত সন্দর্ভকে “আদিভাষ্য” নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

“প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ” অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত অর্থপ্রতিপত্তি হয় না, এখানে ‘প্রমাণ’ শব্দ আছে বলিয়া অর্থের যথার্থ বোধ হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম-জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু যথার্থ বোধ প্রমাণের দ্বারাই হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা তাঁহার আদিভাষ্যের “প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ” এই কথার তাৎপর্য ও সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথার্থ বোধ প্রবৃত্তিকে সফল করে, ভ্রম-জ্ঞান তাহা করে না। ঐ যথার্থ বোধ যখন প্রমাণেরই কার্য এবং প্রবৃত্তির সফলতা সম্পাদনে প্রমাণেরই ব্যাপার, তখন উহার দ্বারা প্রমাণ সফল প্রবৃত্তিজনক। সূত্রোক্ত প্রমাণ অর্থের অবাভিচারী এবং নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহাই ভাষ্যকারের

তাৎপর্য্য এবং ঐ কথাটি না বলিলে প্রমাণাভাস হইতে প্রমাণের বিশেষ বলা হয় না। তাহা না বলিলেও প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন হয় না।

“সোহয়ং প্রমাণার্থঃ” ইত্যাদি ভাষ্য পড়িলে বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণার্থ অর্থাৎ ভাষ্যকার যাহাকে “অর্থ” বলিয়াছেন, সেই স্বথ-হুঃখাদি অসংখ্য ; কারণ, প্রাণিগণ অসংখ্য। তাৎপর্য্য-টীকাকারের কথায় বুঝা যায়, উদ্যোতকের পূর্ব্ব বা সমকালে কেহ কেহ ঐ ভাষ্যের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিতেন। কিন্তু উদ্যোতক ঐ ব্যাখ্যা থণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, স্বথ-হুঃখ প্রভৃতি “অর্থ” এক একটি গণনার অসংখ্য হইলেও ভাষ্যকার স্বথ, স্বথহেতু এবং হুঃখ ও হুঃখহেতু, এই চারি প্রকারে তাহার বিভাগ করিয়া সংখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুতরাং “প্রমাণার্থ অসংখ্য”—ইহা ভাষ্যার্থ নহে। পরন্তু ঐ অর্থে ভাষ্যকারের হেতুটিও সঙ্গত হয় না, ঐ কথা বলিবারও কোন প্রয়োজন নাই। তবে ভাষ্যার্থ কি ? উদ্যোতক বলিয়াছেন—প্রমাণের প্রয়োজন স্বথ-হুঃখাদি অনিয়ম, ইহাই ভাষ্যার্থ। ভাষ্যে “প্রমাণার্থঃ” এই স্থানে “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন। চন্দনবিষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন বা ফল স্বথ, কণ্টকবিষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন বা ফল হুঃখ। ইহার নিয়ম নাই, কোন প্রাণীর পক্ষে ইহার বিপরীত। উষ্ট্র কণ্টক প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহা ভক্ষণ করিয়া স্বথ ভোগই করে। ময়ূষ্মাদি তাহাতে হুঃখানুভবই করে। যাহা একের স্বথহেতু, তাহা অস্ত্রের হুঃখহেতু। স্বথ হুঃখ কাহারও স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে সকল পদার্থই সকলের স্বথকর হইত। অস্বাভাবিক হইলে তাহা কাল্পনিক পদার্থ হইয়া পড়ে, তাহা প্রমাণের প্রয়োজন হইতে পারে না, এই আশঙ্কা নিরাসের জন্তই ভাষ্যকার “সোহয়ং প্রমাণার্থঃ” ইত্যাদি ভাষ্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্বথ-হুঃখ স্বাভাবিক না হইলেও কাল্পনিক নহে ; উহা নৈমিত্তিক। নিমিত্তের ভেদ ও বৈচিত্র্যাবশতঃ তাহার ভেদ ও বৈচিত্র্য হয়। জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসমূহের বৈচিত্র্যাবশতঃ যাহা একের স্বথ বা স্বথের কারণ, তাহা অস্ত্রের হুঃখ বা হুঃখের কারণ হইতেছে। তাই হেতু দেখাইয়াছেন—“প্রাণভূতভেদস্তাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ”। ভাষ্যে “অপরিসংখ্যেয়” বলিতে এখানে অসংখ্য নহে ; উহার অর্থ অনিয়ম। “প্রাণভূতভেদস্য” এই কথার দ্বারা প্রাণিগণের যে ভেদ অর্থাৎ বৈচিত্র্য, ইহাও ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ প্রাণিগণের যে ভেদ, কি না—বৈচিত্র্য, তাহার নিয়ম না থাকায় স্বথ-হুঃখাদি অনিয়ম। যাহা অনিয়মকারণ-জন্ত, তাহা সমস্তই অনিয়ম, এইরূপ সামান্যাত্মমানের দ্বারা ইহা নিশ্চিত আছে।

ভাষ্য। অর্থবতি চ প্রমাণে প্রমাতা-প্রমেয়ং-প্রমিতিরিত্যর্থবন্তি ভবন্তি। কস্মাৎ ? অগতমাপায়েহর্থস্থানুপপত্তেঃ। তত্র যস্যোপ্সাদ্জিহাসা-প্রযুক্তস্ত প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা। স যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণং। যোহর্থঃ প্রমীয়তে তৎ প্রমেয়ম্। যনর্থবিজ্ঞানং সা প্রমিতিঃ। চতস্রস্বেবশ্চিদাত্ত তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে।

অনুবাদ। প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়াতেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি ইহারা সমীচীনার্থ হয়। অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে—প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই “প্রমাতা,” “প্রমেয়,” “প্রমিতি,” ইহারা সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। [প্রশ্ন] কেন ? [উত্তর] যে হেতু প্রমাণের অভাবে অর্থের যথার্থ বোধ হয় না। তন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছা ও তাগের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া যাহার প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির যথার্থ বোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে “প্রমাতা” বলে। সেই প্রমাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে, তাহাকে “প্রমাণ” বলে। যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাকে “প্রমেয়” বলে। পদার্থবিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহাকে “প্রমিতি” বলে। এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের অব্যভিচারী চারিটি প্রকার [প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি] থাকিতে তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তাহা গ্রাহ্য মনে হইলে গ্রহণ করিতেছে, ত্যাজ্য মনে হইলে ত্যাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে হইলে উপেক্ষা করিতেছে। গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্ত্বের পর্যাবসান হইতেছে।

বিবৃতি। প্রমাণ পদার্থের অব্যভিচারী, ইহা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? বুঝিতে হইবে, প্রমাণ যে পদার্থকে যেক্রমে, যে প্রকারে প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ ঠিক সেইরূপ, সেই প্রকারই হয়, কখনও তাহার অন্তথা হয় না। প্রমাণভাসের দ্বারা পদার্থবোধ হইলে সেখানে এইরূপ হয় না। প্রমাণ বখন পদার্থের অব্যভিচারী, তখন “প্রমাণে”র দ্বারা যে ব্যক্তির বোধ হইয়াছে, সেই “প্রমাতা” ব্যক্তি এবং সেই বোধের বিষয় “প্রমেয়” পদার্থ এবং সেই যথার্থ বোধরূপ “প্রমিতি”—এই তিনটিও প্রমাণের দ্বারা পদার্থের অব্যভিচারী। কারণ, প্রমাণ বাতীত কখনই প্রমিতি হয় না। প্রমাণ দ্বারা প্রমিতি হইলে সেখানে প্রমাতা এবং প্রমেয়ও থাকিবে। তাহা হইলে প্রমাণ পদার্থের অব্যভিচারী বলিয়াই “প্রমাতা,” “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি”ও পূর্বোক্তরূপে পদার্থের অব্যভিচারী এবং ঐ চারিটি প্রকার ঐরূপ বলিয়াই তত্ত্ববোধ হইতেছে। নচেৎ তত্ত্ববোধ কোনরূপে হইত না। যে পদার্থ যেক্রমে এবং যে প্রকার, তাহাকে ঠিক সেইরূপে এবং সেই প্রকার বুঝিলেই তত্ত্ব বুঝা হয় এবং শেষে গ্রহণ অথবা ত্যাগ অথবা উপেক্ষার দ্বারাই সেই তত্ত্বের পর্যাবসান হয়। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া হয় গ্রহণ করে, না হয় ত্যাগ করে, না হয় উপেক্ষা করে। জগতে এই পর্যাপ্তই তত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণের কার্য চলিতেছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার আদিভাষ্যে প্রমাণকেই অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারের গুণ্ডি অনুসারে “প্রমাতা,” “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি” এই তিনটিও ত অর্থের অব্যভিচারী, ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“অর্থবত্তি চ প্রমাণে” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণ

অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াই প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি ইহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়; কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে পদার্থের যথার্থ বোধ হয় না। প্রমাণ দ্বারা যথার্থ বোধ হইলেই সেখানে “প্রমাতা”, “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি” থাকে। এ জন্ত তাহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়। সূত্ররূপ উহাদিগের মধ্যে প্রমাণই প্রধান, তাই তাহাকেই আদিভাষ্যে অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছি এবং তাহাতেই “প্রমাতা”, “প্রমেয়” ও “প্রমিতি”কে প্রমাণের জ্ঞায় অর্থের অব্যভিচারী বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও পূর্বের জ্ঞায় নিত্যযোগ অর্থ মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন, ঐ স্থলে প্রশস্ত্যার্থে “মতুপ্” প্রত্যয় বিহিত। প্রমাতা প্রভৃতি অর্থবান্ হয়, কি না—সমীচীনার্থ হয়। ইহাতেও ফলে অর্থের অব্যভিচারী হয়, ইহাই তাৎপর্য্য হইবে। আদিভাষ্যে পক্ষান্তরে প্রমাণ নিরতিশয়প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহা বলা হইয়াছে, সে পক্ষেও এখানে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও “অর্থ” শব্দের প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে এবং অতিশায়নার্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। সে পক্ষের ভাষ্যার্থও “পক্ষান্তরে” বলিয়া অহুবাদে বলা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ তত্ত্বজ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বারা জীবের প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতে প্রমাতা প্রভৃতিও নিরতিশয়-প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতিও প্রয়োজন বিষয়ে প্রমাণের জ্ঞায়ই সমর্থ।

ভাষ্যে “অন্ততমাপারে” এই স্থলে “অন্ততম” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রমাণাদি চারিটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রকরণানুসারে এখানে উহার দ্বারা প্রথমোক্ত “অন্ততম” প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। প্রমাণের প্রাধান্ত সমর্থনের জন্তই ভাষ্যকার ঐ হেতু বলিয়াছেন। সূত্ররূপ “অন্ততম” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত “প্রমাণ”রূপ বিশেষ অর্থই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধি।

প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তাহা যদি সূত্রসাধন বলিয়া বুকে, তবে গ্রহণ করে; কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ গ্রহণ করিতে না পারিলেও গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। হৃৎ-সাধন বলিয়া মনে হইলে তাহা ত্যাগ করে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাতে ত্যাগের যোগ্যতা থাকে এবং সূত্রসাধনও নহে, হৃৎসাধনও নহে, ইহা বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তত্ত্বের এই পর্য্যন্তই হয়। সূত্ররূপ গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্যতা এবং ত্যাগ বা ত্যাগযোগ্যতা এবং উপেক্ষাই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি, উহাই তত্ত্বের পর্য্যবসান। প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম বোধ হইলেও পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রহণাদি হয় বটে, কিন্তু সে গ্রহণাদি তত্ত্বের পর্য্যবসান নহে। প্রমাণাভাসের দ্বারা তত্ত্বের বোধ হয় না; সূত্ররূপ সেখানে তত্ত্বের গ্রহণাদি হয় না। তত্ত্বের গ্রহণাদিতে “প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি” আবশ্যক। ঐ চারিটি থাকতেই পূর্বোক্ত প্রকার তত্ত্ব পরিসমাপ্তি হইতেছে। জীব-জগতে প্রমাণাভাসের আধিপত্য প্রচুর হইলেও প্রমাণ একেবারে নির্লিপিত হয় নাই। প্রমাণের দ্বারা চিরকালই বহু বহু তত্ত্ববোধ এবং ঐ তত্ত্বের পূর্বোক্ত

পরিসমাপ্তি হইতেছে এবং হইবে। অনেক ভাষ্য-পুস্তকেই “অর্থতত্ত্বং পরিসমাপাতে” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ভাষ্যকারের পরবর্তী প্রশ্নভাষ্য দেখিয়া এবং বার্তিকাদি দেখিয়া এখানে “তত্ত্বং পরিসমাপাতে” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠই আছে। জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতেও “তত্ত্বং পরিসমাপাতে” এইরূপ কথাই দেখা যায়। ভাষ্যে “অর্থবতি চ” এই স্থলে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “অর্থবতি চ” এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা “অর্থবত্যেব”। অবধারণ অর্থ এবং হেতু অর্থে “চ” শব্দের প্রয়োগ বহু স্থানে দেখা যায়। এই ভাষ্যেও বহু স্থানে ঐরূপ প্রয়োগ আছে। সেগুলি লক্ষ্য করা আবশ্যিক।

ভাষ্য। কিং পুনস্তত্ত্বং ? সতশ্চ সদ্ভাবোহসতশ্চাসদ্ভাবঃ। সৎ সদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) তত্ত্ব কি? অর্থাৎ পূর্বে যে তত্ত্ব পরিসমাপ্তির কথা বলা হইল, সে তত্ত্বটি কি? (উত্তর) সৎ পদার্থের অর্থাৎ ভাব পদার্থের সম্ভাব এবং অসৎ পদার্থের অর্থাৎ অভাব পদার্থের অসম্ভাব। বিশদার্থ এই যে, “সৎ” অর্থাৎ ভাব পদার্থ “সৎ” এইরূপে অর্থাৎ “ভাব” এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়। এবং “অসৎ” অর্থাৎ অভাব পদার্থ অসৎ এইরূপে অর্থাৎ অভাব এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়।

বিস্তৃতি। যে পদার্থ বাহ্য এবং যে প্রকার, ঠিক সেইরূপে সেই প্রকারে জ্ঞায়মান সেই পদার্থকে “তত্ত্ব” বলে। পদার্থ বিবিধ, ভাব ও অভাব। ভাব পদার্থকে অভাব বলিয়া এবং অভাব পদার্থকে ভাব বলিয়া বুঝিলে সেখানে তাহা তত্ত্ব হইবে না। স্মরণ্য সেখানে তত্ত্ব বুঝাও হইবে না। ফলতঃ কোন পদার্থই তাহার বিপরীত ভাবে বুঝিলে তাহা সেখানে তত্ত্ব হয় না।

টিপ্পনী। শ্রোতৃবর্গের অবধান এবং বিশদবোধের জন্ত স্বয়ং প্রশ্নপূর্বক উত্তর দেওয়াই প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বকথিত তত্ত্ব কি, ইহা বলিবার জন্ত নিজেই এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন।

“তস্য ভাবঃ” এই অর্থে “তত্ত্ব” শব্দটি নিম্পন্ন। ঐ তত্ত্ব শব্দের অন্তর্গত “তৎ” শব্দটির প্রতিপাদ্য “সৎ” ও “অসৎ” পদার্থ। “সৎ” বলিতে ভাব পদার্থ, “অসৎ” বলিতে সৎ ভিন্ন অর্থাৎ ভাব ভিন্ন পদার্থ। ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থকেই অভাব পদার্থ বলে। “নাস্তি” এইরূপে বোধের বিষয় হয় বলিয়াই অভাব পদার্থকে “অসৎ” পদার্থ বলা হয়। “অসৎ” বলিতে এখানে অলৌক নহে। বাহার কোন সত্তাই নাই, বাহ্য অলৌক, তাহা পদার্থ হইতে পারে না। বাহ্য প্রমাণ-

সিদ্ধ, তাহাই পদার্থ। তাহা “ভাব” ও “অভাব” এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রমাণ বাহাকে ভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাই ভাব পদার্থ। বাহাকে অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহা অভাব পদার্থ। ভাব পদার্থে যে ভাবসাধক প্রমাণের বিষয় আছে, তাহাই উহার “সম্ভাব” বা ভাবত্ব। অভাব পদার্থে যে অভাবসাধক প্রমাণের বিষয় আছে, তাহাই উহার “অসম্ভাব” বা অভাবত্ব। ঐ “সম্ভাব”ই সংপদার্থের তত্ত্ব এবং ঐ “অসম্ভাব”ই অসং পদার্থের তত্ত্ব এবং উহাই যথাক্রমে ভাব ও অভাব পদার্থের স্বরূপ। উহার বিপরীত-রূপে ভাব ও অভাব বুলিলে সেখানে ভাব ও অভাবের তত্ত্ব বুঝা হয় না। ভাষ্যে “সং ইতি” এবং “অসং ইতি” এই দুই স্থলে “ইতি” শব্দের প্রকার অর্থ। অর্থাৎ সং পদার্থকে “সং” এই প্রকারে এবং অসং পদার্থকে “অসং” এই প্রকারে বুলিলেই তত্ত্ব বুঝা হয়। ফল কথা, যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম, তাহাই তাহার তত্ত্ব, সেইরূপে সেই পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেই পদার্থকেও তত্ত্ব বলা হয়; প্রাচীনগণ তাহাও বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার প্রথমতঃ ভাব ও অভাব পদার্থের প্রমাণসিদ্ধ ভাবত্ব ও অভাবত্বকে তত্ত্ব বলিয়া শেষে ঐ ভাব ও অভাব পদার্থকেও “তত্ত্ব” বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত ভাবত্ব ও অভাবত্ব রূপ প্রকৃত ধর্মরূপে জ্ঞায়মান হইলেই ভাব ও অভাব সেখানে তত্ত্ব হইবে। অভাবত্বরূপে ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে অথবা ভাবত্বরূপে অভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেখানে উহা তত্ত্ব হইবে না, এই কথা বলিবার জন্যই প্রথমতঃ ভাষ্যকার ভাব ও অভাবের প্রকৃত ধর্মরূপ তত্ত্বটি বলিয়াছেন। ঐরূপ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ভাব পদার্থ এবং বিশেষ বিশেষ অভাব পদার্থেরও বাহার যেটি প্রমাণসিদ্ধ প্রকৃত ধর্ম, সেইরূপে তাহারা জ্ঞায়মান হইলেই তত্ত্ব হইবে, ইহা ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। ফল কথা, যে পদার্থের যেটি তত্ত্ব, সেইরূপে জ্ঞায়মান সেই পদার্থকেও ভাষ্যকার এখানে “তত্ত্ব” বলিয়াছেন। ভাষ্যে “সতত্চ” এবং “অসতত্চ” এই দুই স্থলে দুইটি “চ” শব্দের দ্বারা পদার্থস্বরূপে ভাব ও অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থই প্রদান, ইহা সূচিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ অপ্রধান নহে। ভাব পদার্থের ন্যায় অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। পরে ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

“যথাত্মতমবিপরীতং” এই স্থলে “অবিপরীতং” এই কথাটি “যথাত্মতং” এই পূর্ব-কথারই ব্যাখ্যা। প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থে এইরূপ স্বপদবর্ণন এবং অহুব্যাখ্যা আছে। স্বপদবর্ণন ভাষ্যের একটি লক্ষণ। বিশদ বোধের জন্যই প্রাচীনগণ ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতেন। এই ন্যায়ভাষ্যে বহু স্থানেই এইরূপ ভাষা আছে। সূত্রান্ত অমুবাদের ভাষাও সেখানে ঐ প্রণালীতে হইবে। এ কথাটা মনে রাখিলে আর পুনরুক্তি-দোষের কথা মনে আসিবে না।

ভাষ্য। কথমুত্তরস্ব প্রমাণেনোপলব্ধিরিতি,—সত্যুপলভ্যমানে তদনুপলব্ধে প্রদীপবৎ। যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহমাণে তদিব যন্ন গৃহতে তন্মাস্তি, যন্তত্ববিষয়াদিদমিব ব্যজাস্তত বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি। এবং প্রমাণেন মতি গৃহমাণে তদিব যন্ন গৃহতে তন্মাস্তি, যন্তত্ববিষয়াদিদমিব

ব্যক্তাস্থত বিজ্ঞানভাবান্নাস্তীতি । তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তীতি । সচ্চ খলু ষোড়শধা ব্যুৎপাদ্যেদ্যতে ।

অনুবাদ । (প্রশ্ন) উত্তরটির অর্থাৎ ভাব ও অভাব নামে যে দ্বিবিধ তত্ত্ব বলা হইল, তন্মধ্যে পরবর্ত্তী অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় কিরূপে ? (উত্তর) যে হেতু যেমন প্রদীপের দ্বারা সৎ পদার্থ অর্থাৎ কোন ভাব পদার্থ উপলভ্যমান হইলে তাহার অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থটি সেখানে নাই, সেই পদার্থটির উপলব্ধি হয় না । বিশদার্থ এই যে—যেমন কোন দর্শক কর্তৃক প্রদীপের দ্বারা দৃশ্য পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার জ্ঞায় বাহা অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থ জ্ঞায়মান হইতেছে না, তাহা নাই, যদি থাকিত, (তাহা হইলে) ইহার জ্ঞায় অর্থাৎ এই দৃশ্যমান পদার্থের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত, তদ্বিষয়ে জ্ঞান না হওয়াতে (তাহা) নাই, অর্থাৎ দর্শক ব্যক্তি প্রদীপের সাহায্যে এইরূপে অভাবের উপলব্ধি করে । এইরূপ প্রমাণের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার জ্ঞায় যে পদার্থ অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইতেছে না, তাহা নাই । যদি থাকিত, (তাহা হইলে) ইহার জ্ঞায় অর্থাৎ জ্ঞায়মান ভাব পদার্থটির জ্ঞায় জ্ঞানের বিষয় হইত, জ্ঞান না হওয়াতে (তাহা) নাই, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণের দ্বারা অভাবেরও উপলব্ধি করে । অতএব এইরূপে (প্রদীপের জ্ঞায়) ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণ অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে । ভাবপদার্থও (মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রে) ষোড়শ প্রকারেই সংক্ষেপে বলিবেন ।

টিপ্পনী । বাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাকে পদার্থ বা তত্ত্ব বলা যায় না । অভাবকে তত্ত্ব বলিলে তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে হইবে । কিন্তু অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হইবে কিরূপে ? বাহা অভাব, তাহার কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে ? অনেক সম্প্রদায় তাহা মানেন নাই । এ জন্য ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্নপূর্ব্বক প্রমাণের দ্বারা যে অভাবেরও উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন । ভাষ্যকারের কথা এই যে, অভাব প্রমাণসিদ্ধ । যে প্রমাণ ভাব পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রমাণ বা তজ্জাতীয় প্রমাণই অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে । অভাব বৃত্তিতে আর কোন উপায়ান্তর আবশ্যক হয় না । অভাব সকলেই বুঝে । ভাবিয়া দেখিলে এবং তর্কের অনুরোধে সত্যের অপলাপ না করিলে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে প্রদীপকে প্রমাণের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । কারণ, প্রদীপ সর্বলোকসিদ্ধ । সাধারণ লোকেও প্রদীপের দ্বারা ভাবের ন্যায় অভাবেরও নির্ণয় করে ; গৃহ হইতে তত্ত্ব বহির্গত হইলে বালকও প্রদীপের সাহায্যে কোনটি আছে এবং কোনটি নাই, ইহা বুঝিয়া থাকে । বাহা থাকে, তাহাই দেখে, বাহা থাকে না, তাহা

দেখে না, তখন তাহা “নাই” বলিয়াই বুঝে। এই “নাই” বলিয়া যে বুঝা, ইহাই অভাবের বোধ। এ বোধ সকলেরই হইতেছে। সুতরাং এই বোধের অবশ্য বিষয় আছে। ঐ বোধের যাহা বিষয়, তাহারই নাম অভাব পদার্থ। যাহা যথার্থ বোধের বিষয়, তাহাকে পদার্থ বলিতেই হইবে। প্রমাণসিদ্ধ বলিতেই হইবে। “নাই” বলিয়া বস বোধ হয়, সবগুলিই ভ্রম বলা বাইবে না। বাসগৃহে “সর্প নাই,” শবার “বিষ্ঠা নাই” ইত্যাদি প্রকার অভাব বোধগুলি কি সর্বত্রই ভ্রম? বস্তুতঃ ভাবের ন্যায় অভাবেরও বোধ হইতেছে। তবে অভাব ভাবপরতন্ত্র, সুতরাং ভাষ্যোক্ত প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমরা ঘটাদি ভাব পদার্থ দেখিয়া সেখানে তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমাদিগের ঐরূপ পরিচিত অন্য পদার্থ না দেখিলেই বুঝি, এখানে তাহা নাই, থাকিলে অবশ্যই দেখিতাম। কারণ, দেখিবার অন্য কোন কারণের এখানে অভাব নাই। ফলকথা, প্রদীপের ন্যায় ভাব, পদার্থের প্রকাশক প্রমাণই সেখানে অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে।—অভাব প্রমাণসিদ্ধ; সুতরাং অভাবকে “তত্ত্ব” বলিতেই হইবে।

অভাব প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব হইলে পদার্থ-গণনার মহর্ষি গোতম কেন তাহার উল্লেখ করেন নাই, তাহার প্রথম সূত্রোক্ত বোড়শ পদার্থের মধ্যে ত “অভাব” নাই? এই আশঙ্কা হইতে পারে। এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—“সচ্চ খলু বোড়শা ব্যুত্থমুপদেক্যতে”। ভাষ্যকারের কথার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য এই যে, মহর্ষি গোতম মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থগুলিকে সংক্ষেপে বোড়শ প্রকারে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার বক্তব্য; তাহার মধ্যে অর্থাৎ ঐ ভাব পদার্থগুলি বলিতে বাইরা তিনি মোক্ষোপযোগী অভাব পদার্থও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য বর্ণন করিতে বাইরা উদ্যোতকর এখানে প্রথমে বলিয়াছেন যে, “তত্র স্বাতন্ত্র্যোপাসদভেদান প্রকাশন্তে ইতি নোচ্যন্তে”। অর্থাৎ অভাবের স্বতন্ত্র ভাবে (ভাব ব্যতিরেকে) জ্ঞান হইতে পারে না। তাহার অভাব এবং যে অধিকরণে অভাব, তাহার জ্ঞান ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে অভাবের জ্ঞান হয় না, এই জন্ত মহর্ষি অভাবকে পৃথকভাবে বলেন নাই। ভাব পদার্থ বলাতেই তাহার অভাব পদার্থ বলা হইয়াছে। এ পক্ষে ভাষ্যে “সচ্চ খলু” এই স্থলে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “খলু” শব্দের দ্বারা আবার ঐ অবধারণ স্পষ্ট করা হইয়াছে। “সচ্চ খলু” এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা “সদেব খলু”। অর্থাৎ ভাবপদার্থই বলিয়াছেন।

ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপৰ্য্য সংগত হয় না বুঝিয়া উদ্যোতকর পরে যাহা বলিয়াছেন, তাৎপৰ্য্য-টীকাকার তাহার তাৎপৰ্য্য বর্ণন করিয়াছেন—“অথবা কথিতা এব যেথাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সোপযোগি, যে তু ন তথা ন তেবাং প্রপঞ্চোহল্পপনুজ্ঞানভাবপ্রপঞ্চ ইব বক্তব্যঃ”। অর্থাৎ মহর্ষি অভাব পদার্থও বলিয়াছেন। যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই সকল পদার্থই তিনি বলিয়াছেন। নিঃশ্রেয়সের অল্পপযোগী অনেক ভাবপদার্থও তিনি যেমন বলেন নাই, তদ্রূপ নিঃশ্রেয়সের অল্পপযোগী অভাব পদার্থও তিনি বলেন নাই। এ পক্ষে “সচ্চ খলু বোড়শা” এই ভাষ্যে “চ” শব্দের অর্থ সমুচ্চয়, “খলু” শব্দের অর্থ অবধারণ।

“সচ্চ” সদপি “যোড়শধা থলু” যোড়শধৈব—এইরূপে ভাবা ব্যাখ্যা করিলে বুঝা যায়, সংপদার্থও অর্থাৎ ভাবপদার্থও সংক্ষেপে যোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন। “সচ্চ” এই স্থলে “চ” শব্দের দ্বারা অভাবেরও সমুচ্চর হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহর্ষি ভাবপদার্থ বলিতে যাইয়া অভাব পদার্থও বলিয়াছেন, ভাবপদার্থও সেই সেই ব্যক্তিরূপে বলা অসম্ভব। সবগুলি মোক্ষোপযোগীও নহে, এ জন্ত যোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সেই যোড়শ পদার্থের বিশেষ বিভাগে নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অভাব পদার্থগুলিও তিনি বলিয়াছেন। যেমন প্রেমের মধ্যে “অপবর্গ” অভাবপদার্থ। প্রয়োজনের মধ্যে হুঃখাভাব অভাব পদার্থ। এইরূপ আরও অনেক অভাব পদার্থ বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য “তাৎপর্য্য-পরিভুক্তি”তে তাহা বিশদ বুঝাইয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রাচীনদিগের এখানে মীমাংসা এই যে, মহর্ষি গৌতম মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলিই বলিয়াছেন, মোক্ষের অনুপযোগী ভাবপদার্থগুলির দ্বারা ঐরূপ অভাব পদার্থগুলিও তাঁহার বক্তব্য নহে, তাই তিনি সেগুলি বলেন নাই। সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থও সংক্ষেপে যোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন, তাঁহার কোন কোন পদার্থের বিশেষ বিভাগে মোক্ষোপযোগী অভাব পদার্থেরও উল্লেখ হইয়াছে। যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় মোক্ষলাভে আবশ্যিক, সেই সকল পদার্থকেই প্রাচীনগণ মোক্ষোপযোগী বলিয়াছেন। কণাদোক্ত পদার্থগুলি মহর্ষি গৌতমের সম্মত হইলেও তন্মধ্যে যেগুলি অতি পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী, মহর্ষি গৌতম সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। কণাদোক্ত প্রেমেরগুলিও যে গৌতমের সম্মত, ইহা ভাব্যকার ও উল্লেখকরও বলিয়াছেন (৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ অভাব পদার্থ মহর্ষি গৌতমের সম্মত, ইহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে তাঁহার নিজের কথ্যেই পাওয়া যায়। মহর্ষি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অভাব পদার্থকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম মোক্ষোপযোগী পদার্থের উল্লেখ করিলে ঈশ্বর প্রভৃতি মোক্ষোপযোগী পদার্থের যোড়শ পদার্থের মধ্যে কেন উল্লেখ করেন নাই? প্রাচীনগণ এ সকল কথার কোন অবতারণা করেন নাই। গৌতমোক্ত পদার্থগুলির পরিচয়ের পরে এ সকল কথা বুঝিতে হইবে। তবে এখানে এইটুকু বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, মহর্ষি গৌতম তাঁহার দ্ব্যয়বিভাগ জগতের সমস্ত পদার্থেরই বিশেষ উল্লেখ করিবেন, ইহার কোন কারণ নাই। তিনি যে ভাবে যে সকল অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মোক্ষোপায়ের যে সকল অংশের বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার দ্ব্যয়বিদ্যার “প্রস্থান” অনুসারে সেই ভাবে যে সকল পদার্থ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী, তিনি সেই সকল পদার্থেরই বিশেষ উল্লেখ করিবেন। সুতরাং তিনি তাহাই করিয়াছেন। যথাস্থানে ক্রমে ইহা পরিষ্কৃত হইবে। (দ্বিতীয় সূত্রভাষ্য-টীকানী দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যে “বুঢ়ং” এই কথার ব্যাখ্যা “সংক্ষেপতঃ”।

ভাষ্য । তাসাং খল্লাসাং সন্নিধানাং

সূত্র । প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-
সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেতুভাস-
চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধি-
গমঃ । ১ ।

অনুবাদ । সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী এই ভাব পদার্থেরই প্রকার—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেতুভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান, ইহাদিগের অর্থাৎ এই ঘোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয় ।

টিপ্পনী । যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাফাৎ অথবা পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই ভাবপদার্থের ালটি প্রকার মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন । ভাষ্যকারও পূর্ব-
ভাষ্যে এই বোড়শ প্রকার ভাব পদার্থের উপদেশের কথাই বলিয়াছেন । এখন মহর্ষিসূত্রের উল্লেখপূর্বক তাহা দেখাইবার জন্য “তাসাং খল্লাসাং সন্নিধানাং” এই সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষিসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভাষ্যকারের ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রস্থ ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বাক্যের যোজনা করিতে হইবে । তাহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত । এইরূপ বহু স্থলেই ভাষ্যসন্দর্ভের সহিত সূত্রের যোজনা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত আছে । সূত্রস্থ প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্যন্ত বোড়শ পদার্থ “সন্নিধানাং” অর্থাৎ ভাব পদার্থের প্রকার । এবং ঐ প্রকারগুলি সকলেই সাফাৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী । “তাসাং খলু” এই কথার দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন । “তাসাং খলু” এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা “তাসামেব” । অর্থাৎ পূর্বে যে মোক্ষোপযোগী ভাব-
পদার্থ বোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিবেন বলিয়াছি, সেই মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থের প্রকারগুলিই এই । এখানেই সূত্রের উল্লেখপূর্বক সেইগুলি দেখাইয়াছেন, তাই আবার বলিয়াছেন—“আসাং” । ফল কথা, এইগুলির তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, ইহাই মহর্ষি প্রথম সূত্রে বলিয়াছেন ; কেন হয়, কেমন করিয়া হয়, তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে । এবং এই বোড়শ পদার্থের সামান্য ও বিশেষ পরিচয় মহর্ষি নিজেই বলিবেন ।

ভাষ্য । নির্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ । সর্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ ।
প্রমাণাদিনাং তত্ত্বমিতি শৈথিল্যকৌ ষষ্ঠী । তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্বাধিগম
ইতি কর্মণি ষষ্ঠ্যো । ত এতাবস্তো বিভ্রমানার্থাঃ । এযামবিপরীত-
জ্ঞানার্থমিহোপদেশঃ । সৌহার্দ্যমনবয়বেন তদ্বার্থ উদ্দিষ্টো বেদিতব্যঃ ।

অনুবাদ। নির্দেশে অর্থাৎ পরবর্তী প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ সূত্র ও বিভাগ-সূত্রে যেরূপ বচন (একবচন, বহুবচন) আছে, তদনুসারে (এই সূত্রে) বিগ্রহ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের বাসবাক্য করিতে হইবে। (এং) সর্ব পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস। প্রমাণাদির তত্ত্ব এই স্থলে শৈথিল্য বৃদ্ধি অর্থাৎ সম্বন্ধে বৃদ্ধি। তত্ত্বের জ্ঞান, নিঃশ্রেয়সের অধিগম, এই দুই স্থলে দুই বৃদ্ধি কর্যে বিহিত। সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থ এতগুলি অর্থাৎ বোড়শ প্রকার, ইহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞানের জন্য এই শাস্ত্রে উপদেশ হইয়াছে। সেই এই তত্ত্বার্থ অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রপ্রতি-পাদ্য মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলি এই সূত্রে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিক্ত অর্থাৎ নামোল্লেখে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে জানিবে।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রের অর্থ বুঝিতে প্রথমতঃ কি সমাস, তাহা বুঝিতে হইবে। “প্রমাণের যে প্রমেয়, তাহার যে প্রয়োজন,” ইত্যাদিরূপে যজ্ঞীতংপূর্ব্ব সমাস বুঝিব? অথবা “প্রমাণ হইয়াছে প্রমেয় যাহার” ইত্যাদিরূপে বহুব্রীহি বা অস্ত্র কোন সমাস বুঝিব? ভাষ্যকার বলিয়াছেন—দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিবে, অস্ত্র সমাস বুঝিলে প্রকৃতার্থ বোধ হইবে না। এবং দ্বন্দ্ব সমাস সকল সমাস হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ কেন, তাই বলিয়াছেন—“সর্বপদার্থপ্রধানঃ”। দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে সকল পদার্থই প্রধান থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবে সবগুলি পদার্থই প্রধানরূপে বুঝির বিষয় হয়। এখানে বহুব্রীহি বা কর্মধারয় হইলে অর্থসিদ্ধি হয় না। যজ্ঞীতংপূর্ব্ব হইলেও হয় না। পরন্তু তাহাতে সর্বশেষবর্তী “নিগ্রহস্থানে”রই প্রাধান্য হয়; সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসই এখানে বুঝিতে হইবে।

দ্বন্দ্ব সমাস হইলে তাহার বাসবাক্য কিরূপ হইবে? “প্রমাণানি চ প্রমেয়ানি চ” ইত্যাদি প্রকারে হইবে, অথবা “প্রমাণঞ্চ প্রমেয়ঞ্চ” ইত্যাদি প্রকারে হইবে, এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়া-ছেন যে, প্রমাণাদি পদার্থের নির্দেশসূত্রে অর্থাৎ যে সকল সূত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ অথবা বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সূত্রে যেরূপ বচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ করিয়াই বাসবাক্য করিতে হইবে। প্রমাণ-বিভাগসূত্রে (তৃতীয় সূত্রে) “প্রমাণানি” এইরূপ প্রয়োগ আছে, সুতরাং এই সূত্রে দ্বন্দ্ব সমাসের বাসবাক্য “প্রমাণানি” এইরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এবং প্রমেয়-বিভাগসূত্রে (নবম সূত্রে) “প্রমেয়ং” এইরূপ প্রয়োগ থাকায় বাসবাক্যে ঐরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ “সংশয়সূত্র” প্রভৃতি লক্ষণসূত্রে যেখানে একবচন আছে, বাসবাক্যে সেই সব স্থলে একবচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। অস্ত্রও ঐরূপ বচনই প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাষ্যকারের কথায় ইহাই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু উদয়নাচাৰ্য্য প্রভৃতি ঐরূপ বুঝেন নাই। তাৎপর্য্য-পরিভুক্তিতে উদয়ন বলিয়াছেন যে, “নির্দেশ” বলিতে কেবল বিভাগ। কোন পদার্থ কত প্রকার, ইহার নাম “নির্দেশ”। কোন সূত্রে তাহা সংখ্যাবোধক শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। কোন সূত্রে তাহা না বলিলেও অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা ঐ বিভাগ বুঝা গিয়াছে। সেইগুলি “অর্থনির্দেশ”। তদনুসারে সেখানে

বচন গ্রহণপূর্বক বাসবাক্যে সেই বচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সংশয়সূত্রেও অর্থ পর্যালোচনা করিয়া সংশয় ত্রিবিধ বা পঞ্চবিধ, ইহা বুঝা গিয়াছে, সুতরাং সেখানে সূত্রে “সংশয়ঃ” এইরূপ একবচনান্ত প্রয়োগ থাকিলেও বাসবাক্যে “সংশয়াঃ” এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগই করিতে হইবে। এবং “দৃষ্টান্ত” লক্ষণসূত্রে “দৃষ্টান্তঃ” এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও, দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ বলিয়া বাসবাক্যে “দৃষ্টান্তৌ” এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে “নির্দেশ্য নাই”, সেখানে লক্ষণসূত্রে যে বচন প্রযুক্ত আছে, তদনুসারেই বাসবাক্য করিতে হইবে। উদয়ন তাঁহার মতের যুক্তিও বলিয়াছেন। নবীন বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রাচীনদিগের এই বচন-কলহে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাসবাক্যে বচন লইয়া মারামারি কেন? যা বাক্যের বচনের দ্বারা কি প্রমাণাদি পদার্থের বহুবচন নির্ণয় হইবে? এখানে সর্বত্র প্রথম উপস্থিত একবচনের প্রয়োগ করিয়াই দ্বন্দ্ব সমাসের বাসবাক্য করিতে হইবে, তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহা বৃত্তিকার বিখ্যাতের স্বাধীন মত—নবীন মত।

প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্যন্ত যোলটি পদার্থের যে তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এইরূপই সূত্রার্থ। সুতরাং “প্রমাণ.....নিগ্রহস্থানানাং” এই স্থলের যজ্ঞী বিভক্তির অর্থ সধক। তত্ত্বের সহিত উহার অর্থ। এই সধকার্থ যজ্ঞীকেই “শৈবিকী যজ্ঞী” বলে। “উক্তাদন্ত্যং শেষঃ” ইহাই শেষের লক্ষণ। অর্থাৎ কর্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি কারকার্থ তির সধক অর্থকেই ব্যাকরণে “শেষ” বলা হইয়াছে। এই শেষার্থে বিহিত যজ্ঞীকে “শৈবিকী” বলা যায়। ঐ যজ্ঞী সধকের সহিত সমাসের একদেশার্ণের অর্থ হয় হইতে পারে। যেমন “চৈত্রস্ত দাসভার্যা”, “রামস্ত নামমহিমা” ইত্যাদি। “তত্ত্বজ্ঞান” এবং “নিঃশ্রেয়সাধিগম” এই দুইটি বাক্য যজ্ঞীতৎপুরুষ সমাস। সুতরাং উহার বাসবাক্যে দুই স্থলেই যজ্ঞী বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। ঐ যজ্ঞী “কৃত্বপ্রত্যয়” বোলে কর্ম্মে বিহিত হইবে। উহার অর্থ কর্ম্মত্ব, সুতরাং উহা “শেষ” নহে, এ জন্ত উহা “শৈবিকী যজ্ঞী” নহে। তত্ত্বকে জানাই তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সকে লাভ করাই “নিঃশ্রেয়সাধিগম”। সুতরাং জ্ঞানের কর্ম্মকারক “তত্ত্ব”। “অধিগম” অর্থাৎ লাভের কর্ম্মকারক “নিঃশ্রেয়স”। নিঃশ্রেয়স জন্মিলে তাহা লাভ করিতে আর প্রবৃত্তান্তর আবশ্যক হয় না। বাহা নিঃশ্রেয়সের সাধন, তাহাই নিঃশ্রেয়স লাভের সাধন, ইহা সূচনা করিবার জন্তই মহর্ষি কেবল নিঃশ্রেয়স না বলিয়া “নিঃশ্রেয়সাধিগম” বলিয়াছেন। এই কথাটি বৃত্তিকার বিখ্যাতের কথা।

প্রচলিত বাংলাভাষা পুস্তকে “চার্বে দ্বন্দ্ব সমাসঃ” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু পরম-প্রাচীন উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র “সর্বপদার্থপ্রধানঃ” এইরূপ পাঠের উল্লেখ করায় মূলে সেই পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। “চার্বে” অর্থাৎ চকারের অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস, ইহাই পূর্বোক্ত পাঠের অর্থ। চকারের অর্থ ভেদ। এখানে প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থবর্গের মধ্যে অনেকগুলি ফলতঃ অভিন্ন পদার্থ থাকিলেও প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের ভেদ থাকায় দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। ঐরূপ ধর্ম্মীর ভেদ না থাকিলেও ধর্ম্মের ভেদ থাকিলে দ্বন্দ্ব

সমাস হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। যেমন “হরিহরৌ”। হরি ও হরে বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও হরিহর ও হরহর-ধর্মের ভেদ থাকাতেই ঐরূপ বস্তু সমাস হইয়াছে। ভাষ্যে “অনবয়বেন” এই স্থলে “অবয়ব” শব্দের অর্থ অংশ। “অনবয়বেন” ইহার ব্যাখ্যা “সাকলোন”।

ভাষ্য। আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানামিঃশ্রেয়সাধিগমঃ, তচ্চৈত-
দুত্তরনুত্রেণানুত্তত ইতি। হেয়ং তস্য নির্বর্তকং, হানমাত্যস্তিকং,
তন্ত্রোপায়োহধিগম্য ইত্যেতানি চত্বার্ব্যর্থপদানি সম্যক্ বুজ্জা নিঃশ্রেয়স-
মধিগচ্ছতি।

অনুবাদ। আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়েরই তত্ত্বজ্ঞান জন্ম মোক্ষ লাভ হয় অর্থাৎ মহর্ষি গোতম আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে “প্রমেয়” বলিয়াছেন, তাহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ (চরম কারণ)। সেই এই কথাও পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা (মহর্ষি) পশ্চাৎ বলিয়াছেন। (১) “হেয়” অর্থাৎ দুঃখ, সেই দুঃখের নিষ্পাদক অর্থাৎ হেতু অবিজ্ঞা, তৃষ্ণা, ধর্ম, অধর্ম, প্রভৃতি, (২) “আত্মাস্তিক” হান অর্থাৎ সেই দুঃখের আত্মাস্তিক নিবৃত্তির সাধন তত্ত্বজ্ঞান, (৩) তাহার “উপায়” অর্থাৎ ঐ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শাস্ত্র, (৪) “অধিগম্য” অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লভ্য মোক্ষ, এই চারিটি (হেয়, হান, উপায়, অধিগম্য) “অর্থপদ” অর্থাৎ পুরুষার্থস্থান সম্যক্ বুঝিয়া মোক্ষ লাভ করে।

টিপ্পনী। অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি যে বোড়শ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির তত্ত্বজ্ঞানই কি মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ? তাহা কিরূপে হয়? “জন্ম,” “বিতণ্ডা,” “ছল” প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানও মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ হইবে কিরূপে? ভাষ্যকার এই প্রশ্ন মনে করিয়া মহর্ষির প্রকৃত তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে বলিয়া গিয়াছেন যে, আত্মা প্রভৃতি যে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে মহর্ষি “প্রমেয়” নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বোড়শ পদার্থের মধ্যে এগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। অস্তগুলির তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নিষ্পাদক, এ অস্ত তাহা মোক্ষের পরম্পরা কারণ, অর্থাৎ কোন কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ, কোন কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরায় মোক্ষলাভে আবশ্যক এবং পরোক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইতে কতকগুলি পদার্থের সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত মোক্ষলাভে আবশ্যক, এ জন্ম মহর্ষি প্রথম সূত্রে এক কথায় প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন। তন্মধ্যে “প্রমেয়” নামক পদার্থগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ। কারণ, তাহাই মোক্ষপ্রতিবন্ধক মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ সাধন করে। মহর্ষি

গোতমের এই সিদ্ধান্ত বা এই তাৎপর্য্য কিরূপে বুঝা যায়? প্রথম সূত্রে ত একরূপ কথা কিছু নাই? এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ইহা অনুবাদ করিয়াছেন, অনুবাদ করিয়াছেন অর্থাৎ পশ্চাৎ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং তাৎপর্য্যটীকাকার “তচ্চৈতৎ” ইত্যাদি ভাষ্যের অবতারণায় বলিয়াছেন যে, আত্মাদি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানের কি কোন অদৃষ্ট শক্তি আছে? বাহার দ্বারা তাহা মোক্ষ জন্মাইবে? এইরূপ প্রশ্ন নিরাসের জন্তই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রে পশ্চাৎ বলিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মাদি প্রেমের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার কেমন করিয়া মোক্ষ সাধন করে, ইহার যুক্তি দ্বিতীয় সূত্রে স্থচিত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যোক্ত “অনুত্তরে” এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার কেবল পশ্চাৎকথন বলিলেও মহর্ষি কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকে “অনুবাদ” বলিয়াছেন। ঐরূপ শব্দ পুনরুক্তি ও অর্থ পুনরুক্তি—এই উভয়েই “অনুবাদ”। ঐরূপ সপ্রয়োজন পুনরুক্তি দোষ নহে, পরন্তু উহা আবশ্যক হইয়া থাকে। মনে হয়, ভাষ্যকার এই অনুবাদের কথাই এখানে বলিয়াছেন। প্রথম সূত্রের দ্বারা যখন আত্মাদি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানকেও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় বলা হইয়াছে, তখন দ্বিতীয় সূত্রে আবার তাহার সূচনা কেন? এতদ্বারা ভাষ্যকার পূর্বেকৃত সপ্রয়োজন পুনরুক্তিরূপ অনুবাদের কথা বলিতে পারেন। অর্থাৎ মহর্ষি প্রয়োজনবশতই ঐরূপ পুনরুক্তি করিয়াছেন, উহা তাঁহার অনুবাদ। ঘোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্মা প্রভৃতি “প্রেমের” পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা বলাই সেখানে মহাবির প্রয়োজন। উহা বলা নিতান্ত আবশ্যক; এ জন্তই পুনরায় প্রকারান্তরে বিশেষ করিয়া উহা বলিয়াছেন।

মহর্ষি যে দ্বিতীয় সূত্রে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রেমের পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণরূপে সূচনা করিয়াছেন, উহা কেবল মহর্ষি গোতমেরই কথা নহে, মোক্ষবাদী আচার্য্য মাত্রেরই উহা সম্মত, এই কথা বলিবার জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—“হেয়ং” ইত্যাদি। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথাগুলির ঐরূপই মূল তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। আত্মাত্মিক হৃৎখ নিবৃত্তিই সকল অধ্যাত্মবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন। সর্বমতে হৃৎখই “হেয়”। সুতরাং যেগুলি ঐ হৃৎখের হেতু, তাহাও “হেয়”। হৃৎখের হেতু পরিত্যাগ করিতে না পারিলে হৃৎখকে কখনই ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং সেগুলিও হেয় এবং হৃৎখের হেতু বলিয়া সেগুলিকেও বিবেচক জ্ঞানিগণ হৃৎখমধ্যেই গণ্য করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই হৃৎখের হেতুগুলিকে হৃৎখ বলিয়া ধরিয়া লইয়া একবিংশতি প্রকার হৃৎখ বলিয়াছেন। ঐ একবিংশতি প্রকার হৃৎখের আত্মাত্মিক নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি হইল। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম যে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার “প্রেমের” পদার্থ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শরীর হইতে হৃৎখ পর্য্যন্ত দশটিই হেয়। তন্মধ্যে শরীরাদি নয়টি হৃৎখের হেতু বলিয়া হেয়। যাহা হেয়, মুমুক্শুর তাহা সম্যক বুঝিতে হইবে, এ কথা মোক্ষবাদী সকল আচার্য্যই স্বীকার করেন। হেয়কে যথার্থরূপে না বুঝিলে তাহার পরিত্যাগ অসম্ভব। যদি কেহ হেয়কে গ্রাহ্য বলিয়া

বুকে, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে কি তাহার প্রবৃত্তি হয়? ঐরূপ হেয়কে উপাদেয় বলিয়া বুঝিতেই ত বত অনর্থ ঘটিতেছে। ফল কথা, “হেয়” পদার্থগুলিকে যথার্থরূপে না বুঝিলে মোক্ষের আশা নাই। মহর্ষি তাহাদিগকে শরীর প্রভৃতি দশ প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তাহার পরে মুমুকুর “অধিগন্তব্য” অর্থাৎ লভ্য মোক্ষ। আত্মা উহা লাভ করিবেন। মহর্ষি-কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রেমের মধ্যে এই দুইটি উপাদেয়। আত্মার উচ্ছেদ কাহারই কামা নহে। সেরূপ মুক্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না এবং তাহা সম্ভবও নহে এবং মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, এই জন্ত আত্মা ও মোক্ষ এই দুইটি উপাদেয় পদার্থ। ফলতঃ “হেয়” এবং “উপাদেয়” ভেদে মহর্ষি দ্বাদশপ্রকার প্রেমের পদার্থ বলিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব সাংক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষ অসম্ভব, মোক্ষবাদী কোন আচার্য্যেরই ইহাতে বিবাদ নাই। শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ ঐ সিদ্ধান্তে পণ্ডিতের বিবাদ থাকিতেই পারে না। ঐরূপ “অধিগন্তব্য” মোক্ষ এবং হেয় শরীরাদি দশ প্রকার প্রেমের একেও পূর্বোক্ত যুক্তিতে সম্যক্ বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের তত্ত্বসাংক্ষাৎকার করিতে হইবে। মোক্ষ বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান থাকিলে মোক্ষের আশা সূদূর-পর্যন্ত। এবং পূর্বোক্ত ছুংথের কিসের দ্বারা নিবৃত্তি হয়, আত্মাস্তিক নিবৃত্তি হয়, তাহাকেও সম্যক্ বুঝিতে হইবে, তাহাকেই বলিয়াছেন “আত্মাস্তিক হান”। “হীয়তেহেনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বাহার দ্বারা ছুংখাদি ত্যাগ করা যায়, সেই তত্ত্বজ্ঞানকে বলা হইয়াছে “হান”। আত্মাস্তিক ছুংখ নিবৃত্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে বলিবার জন্তই বলা হইয়াছে “আত্মাস্তিক হান”। সেই তত্ত্বজ্ঞানের “উপায়” শাস্ত্র। তাহাকেও সম্যক্ বুঝিতে হইবে। যাহা মোক্ষের সাধন, সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপায়ে মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে মোক্ষের আশা করা যায় না। ফল কথা, নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে হইলে “হেয়”, “হান”, “উপায়” ও “অধিগন্তব্য” বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহা সকল আচার্য্যেরই স্বীকার্য্য। এবং অন্ত্যস্ত বিদ্যাসাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে হইলেও “হেয়”, “হান”, “উপায়” ও “অধিগন্তব্য” এই চারিটিকে সম্যক্ বুঝিতে হয়। উহা সকল বিদ্যাতেই আছে। ভাষ্যকার এখানে পূর্বোক্ত চারিটিকে “অর্থপদ” বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটাকাংকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি”^১। পুরুষের যাহা প্রয়োজন, তাহা পুরুষার্থ, তাহা পূর্বোক্ত ঐ চারিটিতেই অবস্থিত। ঐ চারিটিকে সম্যক্ না বুঝিলে পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। ফল কথা, ঐ কথাগুলির দ্বারা ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির দ্বিতীয় সূত্রের মর্ম্মার্থই সূচনা করিয়াছেন। “হেয়”, “হান”, “উপায়” ও “অধিগন্তব্য” এই চারিটি “অর্থপদ”কে সম্যক্ বুঝিলে মহর্ষি-কথিত প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানই হইবে। উহাদিগের ব্যাখ্যা উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা-ভূমারই লিখিত হইল।

মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে

১। অনুসন্ধিৎসু এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত “শ্রায়বাস্তিক-তাৎপর্য্যটাকাংকারিত্তি” দেখিবেন। প্রচলিত তাৎপর্য্যটাকাংগ্রে এখানে অনেক অংশ মুদ্রিত হয় নাই।

এবং এ স্থানের অগ্রান্ত কথ্য দ্বিতীয় সূত্রবাখ্যাতেই দৃষ্টব্য। এখন এই সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের অর্থ কি, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্তোক্তকরের তাৎপর্য-বাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যদিও “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা ইষ্ট মাত্রই বুঝা যায় এবং প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞান সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সেরই সাধন হয়, তথাপি মহর্ষিসূত্রে যখন আত্ম প্রকৃতি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানের কথা রহিয়াছে, তখন অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্গই এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত। দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স তাঁহার অভিপ্রেত হইলে তিনি অগ্রান্ত সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথাও বলিতেন। কারণ, সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই কোন না কোন দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের সাধন হইয়াই থাকে। ফলকথা, তাৎপর্যটীকাকার উক্তোক্তকরের এইরূপ তাৎপর্যই বর্ণন করিয়াছেন। তাৎপর্য-পরিশুদ্ধিতে উদঘনাচার্য্যও বাচস্পতি মিশ্রের বাখ্যা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন উক্তোক্তকরের যথাস্থত বার্তিকের দ্বারা কিন্তু এখানে এইরূপ তাৎপর্য নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, নিঃশ্রেয়স বিবিধ;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। আত্মাদি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞান-জন্তই অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্গ লাভ হয়। প্রমাণাদি অস্ত্র পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান-জন্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। অবশ্য প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞানের ফলে আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞান হইবে, ইহা তিনিও বলিয়াছেন। এবং অপবর্গ ভিন্ন ইষ্ট মাত্রই তাঁহার মতে দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স, সুতরাং অপবর্গ-সাধন তত্ত্বজ্ঞানাদিকেও কেবল তিনি দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বলিয়া এখানে বলিতে পারেন। মহর্ষি সর্ববিধ এবং সমস্ত নিঃশ্রেয়সই প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা বলিয়াছেন, এ কথা উক্তোক্তকরও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তাৎপর্যটীকাকার উক্তোক্তকরের তাৎপর্য বর্ণন করিতে বাইরা বরং ইহার বিকল্প কথাই বলিয়াছেন। প্রাচীন গুরুপাদগণ বাহাই বলুন, আমাদিগের কিন্তু মনে হয়, মহর্ষি গোতম তাঁহার জ্ঞানবিশ্বায় প্রথম সূত্রে সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সকেই “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে “অচতুরাদি” সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দটি ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এই “নিঃশ্রেয়স” শব্দের অপবর্গ অর্থে ভূরি প্রয়োগ থাকিলেও কলাপ মাত্র অর্থেও^১ মহাভারতাদি গ্রন্থে অনেক প্রয়োগ দেখা যায়। “নিঃশ্রেয়স” শব্দ অভীষ্ট মাত্রেরই বোধক, এ কথা তাৎপর্যটীকাকারও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিঃশ্রেয়সের কথা বলিয়া অপবর্গ ভিন্ন অগ্রান্ত কলাপকেও “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করিয়াছেন। “জয়ী”, “বার্তা” ও “দণ্ডনীতি” বিশ্বায় নিঃশ্রেয়স কি, তাহা উক্তোক্তকর সেখানে বলিয়াছেন। এখন “নিঃশ্রেয়স” শব্দ যদি অভীষ্ট মাত্রের বোধক হয় এবং বিশেষতঃ অপবর্গের বোধক হয়, তাহা হইলে মহর্ষি-সূত্রস্থ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা পরম-প্রয়োজন অপবর্গও বুঝিব, আবার গৌণ প্রয়োজন কলাপমাত্রও বুঝিব, তাহা হইলে প্রমাণাদি

ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গ-লাভের উপায় এবং অন্যান্য সর্ববিধ অভীষ্ট লাভেরও উপায়, ইহাই মহর্ষি গৌতমের প্রথম হস্তের তাৎপর্যার্থ বৃত্তিতে পারি। অন্যান্য বিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়সলাভে যে ন্যায়বিজ্ঞা আবশ্যক, প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে সকল বিজ্ঞার ফল-লাভেই আবশ্যক, এ কথা ভাষ্যকার প্রভৃতিও বলিয়াছেন। ন্যায়বিজ্ঞা সর্ববিজ্ঞার প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায়, সর্বধর্মের আশ্রয়, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার প্রমাণাদি পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানকে সর্ববিধ নিঃশ্রেয়স-লাভেই উপায় বলেন নাই কি? তবে যে সেখানে ভাষ্যকার ন্যায়বিজ্ঞার অপবর্গকেই “নিঃশ্রেয়স” বলিয়াছেন, তাহা এই ন্যায়বিজ্ঞার অধ্যাত্ম অংশ ধরিয়া; এ জনাই সেখানে ন্যায়বিজ্ঞাকে অধ্যাত্মবিজ্ঞা বলিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়বিজ্ঞা অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইলেও উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে, এ কথাও ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকারের মতেও ন্যায়বিজ্ঞার দুইটি অংশ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তন্মধ্যে অধ্যাত্ম অংশ ধরিলে তাহার ফল অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স। অন্য অংশ ধরিলে অন্যান্য সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিজ্ঞার ফল। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার মোক্ষের সাফাৎ কারণ, তজ্জনা ঐ প্রমেয় পদার্থগুলির যথাশাস্ত্র মনন করিতে হইবে এবং সেই অপরিপক্ক তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিতে হইবে। এ জন্য প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান তাহাতে আবশ্যক। তাহা হইলে বলা যায়, সাফাৎ ও পরম্পরায় প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মহর্ষি অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় বলিয়াছেন। আবার প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সর্ববিজ্ঞা-সাধ্য, সর্বকর্মসাধ্য, সর্ববিধ দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বা অভীষ্ট লাভের উপায়, এ কথাও মহর্ষি প্রথম হস্তের দ্বারা বলিয়াছেন, নচেৎ ন্যায়বিজ্ঞা সর্ববিজ্ঞার প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায়, এ কথা ভাষ্যকার কোথাও পাইলেন? এবং তিনি উহা বলেন কিরূপে? কলকথা, মহর্ষি নানার্থ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার বিভিন্নার্থের স্মৃচনা করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। আরও মনে হয়, মহর্ষির “নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” এই স্থলে “অধিগম” শব্দের “লাভ” অর্থের ন্যায় “জ্ঞান” অর্থও এক পক্ষে মহর্ষির বিবক্ষিত। “অধিগম” শব্দের লাভ অর্থের ন্যায় জ্ঞানও অর্থ আছে, সে অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায়, প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে নিজের এবং দেশের ও দশের “নিঃশ্রেয়স” অর্থাৎ কল্যাণকে বুদ্ধিলা লওয়া যায়। সেও ত ঠিক কথা। মহর্ষি যে এক পক্ষে তাহাও বলেন নাই, ইহাই বা কি করিয়া বুদ্ধিব?

যদি তিনি এখানে কেবল অপবর্গের কথাই বলিতেন, তাহা হইলে “অপবর্গ” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই কেন? এবং “অধিগম” শব্দেরই বা প্রয়োজন কি? মহর্ষি অপবর্গ বুঝাইতে অস্তান্ত সকল হস্তেই “অপবর্গ” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, “নিঃশ্রেয়স” শব্দটি আর কোথাও প্রয়োগ করেন নাই এবং অপবর্গের কথাই আর কোথাও অপবর্গের অধিগম বলেন নাই,

১। দার্শনিক অধিগমে জ্ঞান অর্থও “অধিগম” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—“ততঃ প্রত্যকৃতেতনাধিগমোপাধ্বরাভাবশ্চ”।—যোগতত্ত্ব ১২২।

কেবল অপবর্ণ শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” বলিয়া পরেই আবার দ্বিতীয় সূত্রেই বলিয়াছেন “অপবর্ণঃ”; ইহার কি কোন গূঢ় অভিপ্ৰায় নাই? যদি বলা যায়, প্রথম সূত্রে সৰ্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সের কথা এবং নিঃশ্রেয়সজ্ঞানের কথা, আর দ্বিতীয় সূত্রে কেবল অপবর্ণেরই কথা, তাহা হইলে ঐরূপ প্রয়োগ যথার্থ সার্থক হইতে পারে। কারণ, ঐরূপ নানার্থ প্রকাশ করিতে হইলে “নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” এইরূপ ভাষা প্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই। কেবল অপবর্ণ বুঝাইতে মহর্ষি মুক্তি প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগও করিতে পারিতেন। ফলতঃ ভাষাকার যেমন আদিভাবের দ্বারা নানার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সূত্রকারও প্রথম সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার নানার্থ সূচনা করিয়াছেন, ইহা বলিতে কোন বাধক দেখি না, বরং সাধকই দেখিতে পাই। সূত্রে নানার্থের সূচনা থাকে, এ কথা প্রাচীনগণও বলিয়া গিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, তাৎপর্যটীকাকার প্রভৃতি গুরুবর্গ নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা যে অপবর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, সেই অংশেই প্রথম সূত্রের সহিত দ্বিতীয় সূত্রের সম্বন্ধ এবং অপবর্ণই স্মারবিজ্ঞার মুখ্য প্রয়োজন এবং তাহাতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান সাফাৎ ও পরম্পরায় আবশ্যক, ইহাও মহর্ষির কথা। পরন্তু অজ্ঞাত নিঃশ্রেয়সের লাভে এবং তাহার জ্ঞানেও প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, এইটো মহর্ষির প্রথম সূত্রে নিজের কথা, ইহাই বলিতে চাই।

তাৎপর্যটীকাকার যে বলিয়াছেন, মহর্ষি সূত্রে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থগুলির উল্লেখ করায় এবং আরও অন্যান্য সকল পদার্থের উল্লেখ না করায় মহর্ষিসূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা কেবল অপবর্ণই বুঝিতে হইবে, এ কথাটা বুঝি নাই। কারণ, কেবল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিজ্ঞার ফল বলিতেছি না, অপবর্ণই ইহার মুখ্য প্রয়োজন। ইহা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিজ্ঞা, এ কথা ভাষাকারও বলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং মোক্ষ ইহার মুখ্য প্রয়োজন হইবেই, ইহাতে মোক্ষোপযোগী পদার্থেরই উল্লেখ করিতে হইবে, দৃষ্টমাত্র নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অর্থাৎ মোক্ষের অমুপযোগী পদার্থের উল্লেখ ইহাতে করা যাইবে না, সুতরাং মহর্ষি মোক্ষোপযোগী পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এ কথা ত পূর্বে তাৎপর্যটীকাকারও বলিয়াছেন। সেই মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানে সৰ্ব্ববিধ দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সেরও লাভ হয়, এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। কারণ, সৰ্ব্ববিজ্ঞাসাধ্য নিঃশ্রেয়সলাভেই এই ন্যায়বিজ্ঞা নিতান্ত আবশ্যক, সুতরাং সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথা না বলাতে মহর্ষি “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সকে লক্ষ্য করেন নাই, অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্ণই তাহার অভিপ্ৰেত, ইহা কি করিয়া বুঝা যায়? আর আত্মা প্রভৃতি পদার্থের উল্লেখ থাকাতোই যে আর ইহার মোক্ষ ভিন্ন কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই বা কি করিয়া বুঝা যায়? অবশ্য মুখ্য প্রয়োজন আর কিছু নাই, অধ্যাত্মবিজ্ঞার অপবর্ণ ভিন্ন আর কোন মুখ্য প্রয়োজন হইতেই পারে না, কিন্তু স্মারবিজ্ঞা ত উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে? মূল কথা, প্রবাসাদি পদার্থের যথাসম্ভব জ্ঞান সংসারীর সর্বদা সৰ্বত্র যথাসম্ভব ইষ্ট সাধন করিতেছে এবং অনিষ্ট নিবারণ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যে

সুচিতকাল হইতে (১) প্রমাণের দ্বারা সর্বদা সর্বদেশে (২) প্রমেয় বুঝা হইতেছে এবং অভিলষিত প্রমেয় সাধনের জন্ত প্রমাণের অথেষ্টে ছুটাছুটি হইতেছে, (৩) “সংশয়” হওয়ায় বিচারের (৪) “প্রয়োজন” হইতেছে, আবার কোন্টি প্রয়োজন, কোন্টি প্রয়োজন নহে, ইহা বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা হইতেছে, (৫) দৃষ্টান্ত দেখিয়া (৬) সিদ্ধান্ত বুঝা হইতেছে এবং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কত সিদ্ধান্ত সমর্থন করা হইতেছে, প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রভৃতি (৭) (অনয়ন) প্রয়োগ পূর্বক পরের নিকটে প্রকৃত বক্তব্যটির প্রকাশ ও সমর্থন হইতেছে, অনেকে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির নাম না জানিয়াও উহার প্রয়োগ করিতেছেন, বিস্তৃত (৮) তর্কের সাহায্যে (৯) নির্ণয় হইতেছে, সভা-সমিতি রাজধান্যাদিকরণ প্রভৃতিতে, কোথায়ও কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে (১০) বাদ এবং অনেক স্থানে জিগীষাবশতঃ (১১) জল্প ও (১২) বিতণ্ডা করা হইতেছে, অপর পক্ষের যুক্তি খণ্ডনকালে “এ হেতু হেতুই নহে, ইহা দৃষ্ট হেতু,” অথবা “এই হেতুতে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না” ইত্যাদি কথা বলিয়া (১৩) “হেত্বাভাস” প্রদর্শন করিতেছে, প্রকৃত কথা প্রকাশের জন্ত অথবা দুরভিসন্ধিবৃত্ত বাদীকে নিরস্ত করিয়া আশ্রয়কার জন্ত কত (১৪) ছল করা হইতেছে, বাদিনিরাস প্রয়োজন হওয়ায় আরও কত অসদ্ব্তর (১৫) (জাতি) করা হইতেছে, আবার অসদ্ব্তর জানিয়া তাহার উপেক্ষাও করা হইতেছে, (১৬) নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিয়া পরাজয় ঘোষণা হইতেছে, পরাজয়ে অনেক সময়ে তত্ত্ব নিশ্চয়ও হইতেছে। এ সবগুলি কি গোতমোক্ত প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের প্রকাণ্ড গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই হইতেছে না? কোন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি কি এই বোড়শ পদার্থের গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া এক দিনও জীবন যাপন করিতে পারেন? এবং উহাদিগের দ্বারা কি সমাজের কোন কার্য্যই হইতেছে না? ভাবিয়া বুঝিলে এবং সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে, উহারা লোকবাক্সা নির্লীহ করিতেছে। প্রমাণাদি পদার্থের যথাসম্ভব তত্ত্বজ্ঞান তদ্বাচ্যেবী ব্যক্তির সর্বদাই যথাসম্ভব উপকার করিতেছে, ষাটার মুক্তি কামনা নাই, মুক্তির কথা যিনি ভাবিতেও পারেন না, তাঁহারও অভিলষিত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের জন্ত ঐ জ্ঞান সর্বদাই আবশ্যক হয়। ভগবান্ মহু এই জন্তই অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সর্ববিধ কলাণ-লাভেই আবশ্যক এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত কলাণ কি, দেশের ও দেশের কলাণ কি এবং তাহা কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লওয়া যায় এবং বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা যায়, এই জন্ত রাজাকে অধীক্ষিকী বিদ্যা শিক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, রাজার যে বিচার করিয়া, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া, তদনুসারে বিধান করিতে হইবে, দেশের ও দেশের কলাণ বুঝিতে হইবে, তাহার উপায় বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। কলকথা, গোতমোক্ত প্রমাণাদি পদার্থবর্গের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তদ্বারা বহু বহু দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ করে এবং উহার সাহায্যে শ্রতিবোধিত আত্মাদি পদার্থের মনন সম্পাদন করিয়া মোক্ষ-মন্দিরের তৃতীয় সোপান নিদিধ্যাসনে বসিয়া আত্মাদি প্রমেয় তত্ত্ব সাক্ষাৎকারপূর্বক অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স পরম প্রয়োজন অপবর্গ লাভ করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করে—করিতে পারে।

ভাষ্য । তত্র সংশয়াদীনাং পৃথগ্‌বচনমর্থকং ? সংশয়াদয়ো হি যথা-
সম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তত্বস্তো ন ব্যতিরিচ্যন্ত ইতি । সত্যমেতৎ,
ইমান্ত চতস্রো বিজ্ঞাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ প্রাণভূতানন্তু গ্রহায়োপদিষ্টান্তে,
যাসাং চতুর্থীয়মাদ্বৈক্ষিকী বিজ্ঞা, তস্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ,
তেষাং পৃথগ্‌বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিজ্ঞানাত্মমিয়ং স্মৃৎ যথোপনিষদঃ ।
তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্‌ প্রস্থাপ্যতে ।

অনুবাদ । (পূর্ববপক) তন্মধ্যে অথবা সেই পূর্বোক্ত সূত্রে সংশয় প্রভৃতি
পদার্থের অর্থাৎ “সংশয়” হইতে “নিগ্রহস্থান” পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থের পৃথক্‌
উল্লেখ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া উল্লেখ নিরর্থক ? কারণ, সংশয় প্রভৃতি (সূত্রোক্ত
চতুর্দশ পদার্থ) যথাসম্ভব “প্রমাণ”সমূহ এবং “প্রমেয়”সমূহে অন্তর্ভুক্ত থাকায়
(প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে) অতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ নহে । (উত্তর) এ কথা
সত্য, কিন্তু “পৃথক্‌প্রস্থান” অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট এই চারিটি বিজ্ঞা
(“ত্রয়ী,” “নগুনীতি,” “বাস্তা,” “আদ্বৈক্ষিকী”) প্রাণীদিগকে অনুগ্রহ করিবার
জন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, যে চারিটি বিজ্ঞার মধ্যে এই “আদ্বৈক্ষিকী” (জ্ঞায়বিজ্ঞা)
চতুর্থী । সংশয় প্রভৃতি অর্থাৎ প্রথম সূত্রোক্ত “সংশয়” প্রভৃতি “নিগ্রহস্থান”
পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ সেই জ্ঞায়বিজ্ঞার “পৃথক্‌প্রস্থান” অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাত্ত ।
তাহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ বাতীত এই জ্ঞায়বিজ্ঞা উপনিষদের জ্ঞায় কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা
হইয়া পড়ে । সেই জন্ত (মহর্ষি গোতম) সংশয় প্রভৃতি পদার্থবর্গের দ্বারা (এই
জ্ঞায়বিজ্ঞাকে) পৃথক্‌ প্রস্থাপিত অর্থাৎ অস্ত্র বিজ্ঞা হইতে বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট
করিয়াছেন ।

টিপ্পনী । পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে “প্রমাণ” পদার্থ থাকিলেও
প্রমাণত্বরূপে প্রমাণের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, প্রমাণত্বজ্ঞান বাতীত প্রমেয় ত্বজ্ঞান হইতেই
পারে না, এ জন্ত প্রমাণের পৃথক্‌ উল্লেখ আবশ্যক, কিন্তু সংশয় প্রভৃতি সূত্রোক্ত চতুর্দশ পদার্থের
পৃথক্‌ উল্লেখের প্রয়োজন কি ? মহর্ষি “প্রমাণ” এবং “প্রমেয়” পদার্থ বলিয়াছেন, তাহার
পরিভাষিত দ্বাদশ প্রকার “প্রমেয়” ভিন্ন আরও অনেক প্রমেয় আছে, সে সমস্ত প্রমেয়ও তিনি
মানেন, সুতরাং সংশয়াদি পদার্থগুলি ঐ সকল প্রমাণ ও প্রমেয়েই অন্তর্ভুক্ত থাকায় অর্থাৎ
তাহারাও যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ হওয়াতে ঐ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে কোন
অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ নহে, তবে আবার তাহাদিগের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন ? অবশ্য
সংশয়াদি পদার্থকে কেবল “প্রমেয়ে” অন্তর্ভুক্ত বলিলেও প্রকৃত স্থলে কোন ক্ষতি ছিল

না। ভাষ্যকার পরে আর প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলেনও নাই, কিন্তু এখানে এক সঙ্গে সংশয়াদি সকল পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা বলিতে যাইয়া নিজ বাক্যের নূনতা পরিহারের জন্য প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথাও বলিয়াছেন। উহাদিগের মধ্যে কোন পদার্থ যদি প্রমাণেও অন্তর্ভূত থাকে, তবে তাহা না বলিলে নিজ বাক্যের নূনতা হয়। কোন পদার্থ প্রমাণেও অন্তর্ভূত আছে, প্রাচীনগণ ইহার বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তবে উদ্যোতকর “নির্ণয়” পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের কারণ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—“অন্তান্তর্ভাবঃ প্রমাণেষু প্রমেয়েষু বা”। ভাষ্যকারের মতেও “নির্ণয়” পদার্থ যেমন “প্রমেয়,” তদ্রূপ “প্রমিত,” তদ্রূপ “প্রমাণ”ও হয় (তৃতীয় সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভাষ্যকার “নির্ণয়” পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াও প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলিতে পারেন। “অবয়ব” শব্দপ্রমাণ হইলে তাহাকেও প্রমেয়ের ন্যায় প্রমাণেও যথাসম্ভব অন্তর্ভূত বলা যায়। কিন্তু উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই তাহা বলেন নাই। সংশয়াদি পদার্থগুলি প্রত্যেকেই মহর্ষি-কথিত প্রমাণ ও প্রমেয়ে অন্তর্ভূত নহে, তাই বলিয়াছেন—“যথাসম্ভবং”। যথাস্থানে এই অন্তর্ভাবের কথা বুঝিতে হইবে।

উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয়াদি পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, এক কথা সত্য; কিন্তু ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্তা ও আদীক্ষিকী এই চারিটি বিজ্ঞা জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ মহু রাজার শিক্ষণীয় বলিয়াও এই চারিটি বিজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন।

“দ্বৈবিজ্ঞেভ্যস্ত্রয়ীং বিজ্ঞাদণ্ডনীতিকং শাস্তীং।

আদীক্ষিকীকায়বিজ্ঞাং বার্তারস্তাংশ্চ লোকতঃ ॥” ৭।১৪৩।

মনুজ এই চারিটি বিদ্যার পৃথক্ পৃথক্ “প্রস্থান” আছে। তাৎপর্যটীকাকার লিখিয়াছেন—“প্রস্থানং ব্যাপারঃ,” অর্থাৎ এখানে প্রস্থান শব্দের অর্থ ব্যাপার। প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যুৎপাদন বা বোধ-সম্পাদনই বিজ্ঞার ব্যাপার, তাহাকে বলে বিদ্যার প্রস্থান। আবার প্রস্থান শব্দটি কণ্ঠপ্রত্যয়ে নিম্পন্ন হইলে অর্থাৎ বিদ্যা বাহাকে প্রস্থিত বা বোধিত করে, এই অর্থে নিম্পন্ন হইলে, ঐ প্রস্থান শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—বিদ্যার—সেই অসাধারণ প্রতিপাদ্য। কারণ, বিদ্যা সেই প্রতিপাদ্যেরই ব্যুৎপাদন বা বোধ সম্পাদন করে। “পৃথক্ প্রস্থানবিজ্ঞা” বলিলে সেখানে “প্রস্থান” শব্দের দ্বারা পূর্কোক্ত ব্যাপার বুঝিতে হইবে। কোন পদার্থকে “প্রস্থান” বলিলে সেখানে “প্রস্থান” শব্দের দ্বারা অসাধারণ প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। পূর্কোক্ত চারিটি বিজ্ঞার এই প্রস্থান-ভেদেই ভেদ হইয়াছে। তন্মধ্যে “ত্রয়ী”র প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য অগ্নিহোত্র হোমাদি। “দণ্ডনীতি”র প্রস্থান স্বামী, অমাত্য প্রভৃতি। “বার্তা”র প্রস্থান হলশকটাদি। “আদীক্ষিকী”র প্রস্থান সংশয়াদি পদার্থ। যদি এই আদীক্ষিকীতে সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিজ্ঞা হইতে পারে না। ইহাকে “ত্রয়ী”র মধ্যে গণ্য করিতে হয়, “বার্তা” বা “দণ্ডনীতি”র মধ্যে গণ্য করা অসম্ভব। সুতরাং পূর্কোক্ত বিজ্ঞা চারিটি হয় না, উহারা তিনটি হইয়া পড়ে। তাই

বলিয়াছেন—“অধ্যাত্মবিজ্ঞামাত্রমিহ সাং”। জ্ঞানবিজ্ঞা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইয়া পড়ে। পূর্বোক্ত মহাবচনে “আত্মবিজ্ঞা” “আত্মিকী”রই বিশেষণ। প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি চরমকরে তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বাংস্যায়নও তাহাই বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে, ইহা ভাষ্যকার বাংস্যায়ন না বলিয়া পারেন না। ফলকথা “জ্ঞানী” প্রকৃতি অস্ত্র বিজ্ঞার প্রস্থান হইতে জ্ঞানবিজ্ঞার প্রস্থান-ভেদ থাকায় ইহা ঐ অস্ত্র বিজ্ঞা হইতে ভিন্ন, ইহা জ্ঞানী নহে, ইহা চতুর্থী বিজ্ঞা, ইহা জানাইবার জ্ঞান এবং ঐ সংশয়াদি পৃথক্ প্রস্থানগুলির বিশেষরূপে বোধ সম্পাদনের জ্ঞান মহর্ষি উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়াদি পদার্থগুলির পৃথক্ উল্লেখ না করিলে তাহার পৃথক্ভাবে ব্যুৎপাদন কিরূপে হইবে? জ্ঞানসংশয়াদি পদার্থের ব্যুৎপাদনই যে জ্ঞানবিজ্ঞার ব্যাপার; এই ব্যাপার-ভেদেই জ্ঞানবিজ্ঞার অস্ত্র বিজ্ঞা হইতে ভেদ হইয়াছে এবং ভেদ বুঝা গিয়াছে। সুতরাং মহর্ষি সংশয়াদি পদার্থবর্ণের দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞাকে পৃথক্ ব্যাপারবিশিষ্ট করায় উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, ইহা অনর্থক হয় নাই। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। তত্র নানুপলক্ষে ন নির্ণীতেহর্থৈ জ্ঞায়ঃ প্রবর্ততে, কিং তর্হি? সংশয়িতেহর্থৈ। যথোক্তং “বিমৃশ্চ” পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়” ইতি। বিমর্শঃ সংশয়ঃ, পক্ষপ্রতিপক্ষৌ জ্ঞায়প্রবৃত্তিঃ, অর্থাবধারণং নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানমিতি। স চায়ং কিং স্বিদिति বস্তুবিমর্শমাত্রমনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ প্রমেয়েহস্তর্ভবমেবমর্থং পৃথগ্ভ্যতে।

অনুবাদ। তন্মধ্যে—অজ্ঞাত পদার্থে জ্ঞায় প্রবৃত্ত হয় না, নিশ্চিত পদার্থে জ্ঞায় প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) সন্দিগ্ধ পদার্থে জ্ঞায় প্রবৃত্ত হয়। যথা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন—“সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণ নির্ণয়”। (১ অঃ, ৪১ সূত্র)। “বিমর্শ” বলিতে সংশয়, (সেই সূত্রে) পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে জ্ঞায়প্রবৃত্তি। অর্থাবধারণ বলিতে নির্ণয়, তত্ত্বজ্ঞান। ইহাই কি? অথবা ইহা নহে? এইরূপে পদার্থের বিমর্শ মাত্র কি না—অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সেই এই (জ্ঞায়াজ্ঞ) সংশয় “প্রমেয়ে” অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত জ্ঞানপদার্থে অন্তর্ভূত হইয়াও এই জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

বিস্তৃতি। যে পদার্থে কাহারও কোনরূপ সংশয় হয় নাই, তাহা লইয়া কাহারও বিবাদ হয় না। তাহা লইয়া বিবাদ করিলে মধ্যস্থ ব্যক্তির তাহা শুনে ন। নিরর্থক পাণ্ডিত্য প্রকাশ নিরপেক্ষ মধ্যস্থ-সমাজে কখনও আদৃত হয় না। বিভিন্নবাদীর কথা শুনিয়া মধ্যস্থ-

গণের সংশয় হইলে তাঁহারা কোন পক্ষেরই অনুমোদন করিতে পারেন না, সুতরাং মধ্যস্থগণের সংশয় নিরাসের উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষ-সাধনের যত্নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ ইহাকেই বলে জ্ঞায়প্রবৃত্তি। সংশয় ব্যতীত ইহা ঘটে না। সুতরাং সংশয় ইহার মূল, এ জ্ঞায়বিদ্যার সংশয় পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, সংশয় প্রভৃতি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ জ্ঞায়বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান, অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। এ জ্ঞায়বিদ্যার উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যক, নচেৎ জ্ঞায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ সংশয়াদি পদার্থ জ্ঞায়বিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য কেন হইয়াছে, জ্ঞায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যাই কেন নহে, ইহা বুঝাইতে হইবে। এ জ্ঞায় ভাষ্যকার এগন হইতে ঐ সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের যথাক্রমে প্রত্যেকটিকে ধরিয়া এবং প্রকৃত বক্তব্য সমর্থনের জ্ঞায় উহাদিগের অনেকের স্বরূপ বর্ণন করিয়া জ্ঞায়বিদ্যার উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংশয়ের কথাই প্রথম বক্তব্য। কারণ, সংশয়ই উহাদিগের মধ্যে প্রথম। তাই “তত্র” এই কথার দ্বারা সংশয়কেই নির্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ তন্মধ্যে সংশয় এইরূপ। পরবর্তী “সংশয়” শব্দের সহিত উহার যোগ করিতে হইবে।

যে পদার্থ একবারে অজ্ঞাত, তাহাতেও জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয় না, যাহা নির্ণীত, তাহাতেও জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয় না। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, যাহা সামান্ততঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত, তাহাতেই জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয়। পূর্বতকে জানি, কিন্তু তাহাতে বলি আছে কি না, এইরূপ সংশয় হইতেছে, সুতরাং সামান্ততঃ নির্ণীত হইলেও বিশেষরূপে অনির্ণীত হইতে পারে। যেক্ষেপে যাহা অনির্ণীত, সেইরূপেই তাহাতে সংশয় হয়। সেইরূপে সন্দিষ্ট সেই পদার্থেই জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয়, সংশয় না হইলে তাহা হয় না, সুতরাং সংশয় জ্ঞায়ের স্বরূপ। এ কথা মহর্ষি নিজেও বলিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জ্ঞায় ভাষ্যকার মহর্ষির নির্ণয়লক্ষণ সূত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সূত্রে “বিশৃঙ্খল” এই কথার দ্বারা সংশয় পাওয়া গিয়াছে। কারণ, সংশয়কেই মহর্ষি “বিশৃঙ্খল” বলিয়াছেন এবং ঐ সূত্রে যে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দ আছে, উহার দ্বারা সেখানে জ্ঞায়প্রবৃত্তিই বুঝিতে হইবে, উহাই সেখানে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দের লাক্ষণিক অর্থ (নির্ণয়সূত্র দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ মহর্ষির নির্ণয়সূত্রের দ্বারাও সংশয় জ্ঞায়প্রবৃত্তির মূল, ইহা প্রকটিত আছে, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল তাৎপর্য্য। সংশয়ের পরে জ্ঞায়প্রবৃত্তি, তাহার দ্বারা পদার্থের অবধারণ, ইহাই সূত্রার্থ। বিপরীতভাবে পদার্থবিধারণ মহর্ষির “নির্ণয়” পদার্থ নহে, তাই ভাষ্যকার ঐ নির্ণয়ের পুনরুপাখ্যা করিয়াছেন “তত্ত্বজ্ঞান”। এখন মূল কথা এই যে, সংশয় জ্ঞানপদার্থ, মহর্ষিকথিত দ্বাদশবিধ ধর্মের পদার্থের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ থাকায় জ্ঞানস্বরূপে সংশয়েরও উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সংশয়ের বিশেষ জ্ঞান হয় না। সংশয় জ্ঞায়প্রবৃত্তির মূল, সুতরাং জ্ঞান্য, জ্ঞানে উহার বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, সেই জ্ঞানই আবার বিশেষ করিয়া, পৃথক্ করিয়া জ্ঞায়বিদ্যার সংশয় পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য নির্ণয় মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে, মধ্যস্থহীন “বাদ”

বিচারেও নির্ণয় হয়, সেখানে কাহারও পূর্বের সংশয় নাই, মহাবির নির্ণয়সূত্রেও নির্ণয় মাত্র পূর্বের সংশয়ের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু নির্ণয়মাত্র সংশয়পূর্বক না হইলেও বিচার সংশয়পূর্বকই। ভাষ্যকারও এখানে সেই তাৎপর্য্যে সংশরকে জ্ঞায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়াছেন। যথাস্থানে এ সকল কথার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। অথ প্রয়োজনং, যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনং, যমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা কৰ্ম্মারভতে। তেনানেন সৰ্ব্বৈ প্রাণিনঃ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ। তদাশ্রয়শ্চ জ্ঞায়ঃ প্রবর্ততে।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ সংশয়ের পরে প্রয়োজন (পৃথক্ উক্ত হইয়াছে) যাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলে। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ কৰ্ম্ম আরম্ভ করে (তাহাই প্রয়োজন)। সেই এই প্রয়োজন কর্তৃক সর্বপ্রাণী, সর্বকৰ্ম্ম এবং সর্ববিজ্ঞা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ সর্বত্রই প্রয়োজন আছে, প্রয়োজনশূন্য কিছুই নাই। এবং “তদাশ্রয়” হইয়া অর্থাৎ সেই প্রয়োজনের আশ্রিত হইয়া “জ্ঞায়” প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ প্রয়োজন ‘জ্ঞান’ ব্যতীত কোথায়ও জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয় না।

টীকান্নী। “সংশয়ের” পরে “প্রয়োজন” পৃথক্ উক্ত হইয়াছে কেন, এতদন্তরে ভাষ্যকার “প্রয়োজনে”র স্বরূপ বর্ণন পূর্বক বলিয়াছেন যে, সমস্তই প্রয়োজনবাপ্ত, প্রয়োজনশূন্য কিছুই নাই; সর্ববিদ্যা এবং সর্ব কৰ্ম্ম যখন প্রয়োজনবাপ্ত, তখন সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব কৰ্ম্মের উপায় এই জ্ঞানবিদ্যার “প্রয়োজন” বিশেষরূপে ব্যুৎপাদ্য। পরন্তু “প্রয়োজন”ও সংশয়ের ন্যায় “ন্যারে”র অঙ্গ। প্রয়োজন না বুঝিলে জ্ঞায়প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং জ্ঞানবিজ্ঞায় প্রয়োজন বিশেষরূপে ব্যুৎপাদ্য, তাই তাহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। ভাষ্যে “তদাশ্রয়শ্চ” এখানে “তৎপ্রয়োজনং আশ্রয়ো বস্তু” এইরূপে বহুব্রীহি সমাসে উহার অর্থ “তদাশ্রিত”। উদ্যোতকর বলিয়াছেন—“যেমন পণ্ডিত রাজাশ্রিত, তদ্রূপ জ্ঞায় প্রয়োজনের আশ্রিত। প্রয়োজনের আশ্রয় বলিয়াছেন—উপকারকত্ব। প্রয়োজনজ্ঞায়ের আশ্রয় অর্থাৎ উপকারক কেন? এতদন্তরে বলিয়াছেন যে, জ্ঞায়ের দ্বারা বস্তু পরীক্ষার মূলই প্রয়োজন। “প্রযুক্ত্যতেহনেন”, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বুঝা যায়, বাহ্য জীবের প্রবৃত্তির প্রযোজক, তাহাই প্রয়োজন। ভাষ্যকার প্রথমতঃ “প্রয়োজন” শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি সূচনার সহিত প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহারই ফলিতার্থ বর্ণন করিয়া পুনর্য্যাক্ষা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে প্রাণ্য পদার্থের জ্ঞায় তাজ্য পদার্থও “প্রয়োজন”। কারণ, তাজ্য পদার্থকে ত্যাগ করিবার জন্তও জীব কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, সুতরাং প্রাণ্য পদার্থের জ্ঞায় তাজ্য পদার্থও কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির প্রযোজক। এইরূপ প্রবৃত্তির প্রযোজককেই তিনি প্রয়োজন বলিয়াছেন। কারণ, “প্রয়োজন” শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। এই

জন্তই ভাষ্যকার আদিভাষ্যে তাজা পদার্থকেও “অর্থ” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। তাজা পদার্থও “তাগ” করিবার জন্ত অর্থ্যমান হয়, সুতরাং তাহাও “অর্থ”।

মহাবি-কথিত আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার “প্রমেদে”র মধ্যে অনেক “প্রয়োজন” পদার্থ বলা হইয়াছে, পরম প্রয়োজন “অপবর্গ”ও তাহার মধ্যে বলা হইয়াছে। সুখ প্রভৃতি প্রয়োজন পদার্থ বিশেষ কারণে তাহার মধ্যে বলা না হইলেও সেগুলিও প্রয়োজন বলিয়া মহাবির স্বীকৃত। সুতরাং সামান্য প্রমেদের মধ্যে সেগুলি থাকায় সামান্যতঃ প্রয়োজন পদার্থ প্রমেদে অন্তর্ভূত, ইহা বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এখানে ঐ অন্তর্ভাব ও পৃথক্ উক্তিবোধক কোন সন্দর্ভ না বলিলেও তাহার বক্তব্য চিন্তা করিয়া তাহা এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, এখানে ভাষ্যকারের অজ্ঞান হানের দ্বারা পৃথক্ উক্তিবোধক সন্দর্ভ ছিল। সে পাঠ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুধীগণ ইহা ভাবিয়া দেখিবেন।

ভাষ্য। কঃ পুনরয়ং ন্যায়ঃ ? প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ, প্রত্যক্ষা-
গমাশ্রিতমনুমানং, সাহচর্য্যিকা, প্রত্যক্ষাগমাত্ম্যামৌক্ষিতস্যাদীক্ষণমদীক্ষা,
তয়া প্রবর্তত ইত্যাদীক্ষিকী, ন্যায়বিজ্ঞা ন্যায়শাস্ত্রং। যৎ পুনরনুমানং
প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়ভাসঃ স ইতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই ন্যায় কি ? অর্থাৎ পূর্বের সংশয় ও প্রয়োজনকে যে
ন্যায়ের অঙ্গ বলা হইয়াছে, সে ন্যায় কাহাকে বলে ? (উত্তর) সমস্ত প্রমাণের দ্বারা
অর্থাৎ সর্বপ্রমাণমূলক প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের অর্থাৎ সাধ্য
সাধন হেতুপদার্থের পরীক্ষা ন্যায়। ফলিতার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী
অনুমান প্রমাণ, অর্থাৎ ঐরূপ অনুমান প্রমাণই পূর্বের “ন্যায়” নামে কথিত হইয়াছে।
তাহা “অদীক্ষা,” অর্থাৎ ঐরূপ অনুমানকেই অদীক্ষা বলে। প্রত্যক্ষ ও আগম-
প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের অদীক্ষণ অদীক্ষা, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা
কোন পদার্থকে বুঝিয়া পরে যে অনুমানের দ্বারা আবার তাহাকে বুঝা হয়, সেই
অনুমানপ্রমাণকে “অদীক্ষা” বলা যায়। সেই অদীক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধে
সমস্ত জ্ঞাতব্য বর্ণনার জন্ত প্রবৃত্ত (প্রকাশিত) হইয়াছে, এ জন্ত “আদীক্ষিকী”
“ন্যায়বিজ্ঞা,” “ন্যায়শাস্ত্র,” অর্থাৎ পূর্বোক্ত অদীক্ষা বা ন্যায়ের নিমিত্ত প্রকাশিত
হইয়াছে বলিয়াই এই বিজ্ঞাকে “আদীক্ষিকী” বলে, “ন্যায়বিজ্ঞা” বলে, “ন্যায়শাস্ত্র”
বলে। যাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ অথবা শব্দপ্রমাণের বিরুদ্ধ অনুমান, তাহা ন্যায়ভাস
(অর্থাৎ তাহা ন্যায় নহে)।

টিপ্পনী। অনুমান প্রমাণ সামান্যতঃ দ্বিবিধ; স্বার্থ এবং পরার্থ;—যেখানে নিজে বুঝিবার
জন্য অনুমানকে আশ্রয় করা হয়, সেই অনুমান স্বার্থ; যেখানে প্রতিবাদীকে নিজের মতটি

বুঝাইবার জন্য অহুমানকে আশ্রয় করা হয়, সেই অহুমান পরার্থ। এই পরার্থানুসারে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের দ্বারা নিজের মতের প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে। যেমন কোন বাদী পক্ষতে বহি আছে, ইহা অহুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিবাদীকে বুঝাইতে গেলে প্রথমে বলিবেন—(১) “পক্ষতো বহিমান্” অর্থাৎ পক্ষতে বহি আছে, বাদীর এই বাক্যের নাম “প্রতিজ্ঞা”। তাহার পরে ঐ বাক্যার্থ সমর্থনের জন্য হেতুবাক্য বলিবেন (২) “ধূমাৎ” অর্থাৎ বিশিষ্ট ধূম ইহার হেতু। বাদীর এই বাক্যের নাম “হেতু”। তাহার পরে বিশিষ্ট ধূম থাকিলেই যে সেখানে বহি থাকে, ইহা বুঝাইতে তৃতীয় বাক্য বলিবেন (৩) “যো নো ধূমবান্ স বহিমান্ যথা মহানসং” অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি থাকে, যেমন পাকগৃহ। বাদীর এই বাক্যটির নাম “উদাহরণ”। তাহার পরে ঐরূপ ধূম যে পক্ষতে আছে, ইহা বুঝাইবার জন্য বাদী চতুর্থ বাক্য বলিবেন (৪) “তথাচ ধূমবান্ পক্ষতঃ” অর্থাৎ পক্ষতে সেই প্রকার ধূমবিশিষ্ট। বাদীর এই বাক্যটির নাম “উপনয়ন”। তাহার পরে উপসংহারের দ্বারা পূর্বোক্ত সকল বাক্যের ফলিতার্থ বুঝাইবার জন্য বাদী পঞ্চম বাক্য বলিবেন—(৫) “তস্মাৎ ধূমাৎ পক্ষতো বহিমান্” অর্থাৎ অতএব ধূম হেতুক পক্ষতে বহি আছে,—বাদীর এই বাক্যের নাম “নিগমন”। (অবয়ব প্রকরণে ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

স্বার্থানুসারে প্রতিজ্ঞাদি বাক্য-প্রয়োগ নাই। এবং গুরুশিষ্য প্রভৃতির ‘বাদ’-বিচারেও সর্বত্র উহাদিগের প্রয়োগ নাই। ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হইতে পারে (বাদমুক্ত দ্রষ্টব্য)। যথাক্রমে প্রযুক্ত পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যসমষ্টিকেও “ন্যায়” বলা হইয়াছে। পরে ভাষ্যকারও তাহা বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য ঐ শ্রাব্যবাক্যের এক একটি অংশ, এ জন্য উহাদিগকে ন্যায়ের ‘অবয়ব’ বলা হইয়াছে। মহর্ষি গোতম এই ন্যায়ের পাঁচটি ‘অবয়ব’ বলিয়াছেন, এ জন্য গোতমোক্ত ন্যায়কে “পঞ্চাবয়ব” ন্যায় বলে। ভাষ্যকার পূর্বে সংশয় ও প্রয়োজনকে ন্যায়ের অঙ্গ বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ শ্রাব্য বলিতে কি বুঝিব? এইরূপ প্রশ্ন হইবেই,—এ জন্য ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা হেতু-পরীক্ষাই এখানে ন্যায়। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্য নিজে প্রমাণ না হইলেও উহাদিগের মূলে প্রত্যঙ্গাদি চারিটি প্রমাণ আছে। কেন আছে, কিরূপে আছে, ইহা যথাস্থানে (নিগমনমুক্ত-ভাষ্যে) দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার এখানে “প্রমাণৈঃ” এইরূপ বহুবচনান্ত প্রমাণ শব্দের দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া যে অহুমান প্রমাণ উপস্থিত করা হয়, তাহাই হেতুর পরীক্ষা। যে হেতুর দ্বারা কোন সাধা সাধন করা হয়, সেই হেতুটি পরীক্ষিত হইলেই তাহার দ্বারা সেখানে সাধাসিদ্ধি হইয়া যায়। পঞ্চাবয়বের দ্বারা সাধ্যের পরীক্ষা অর্থাৎ সাধাসিদ্ধিকে ন্যায় বলিলে ফলকেই ন্যায় বলা হয়, তাহাতে সাধা-সিদ্ধি ন্যায়ের ফল হয় না। বস্তুতঃ উহা ন্যায়েরই ফল হইবে, এ জন্য তাৎপর্যাটিকারকার এখানে ভাষ্যোক্ত ‘অর্থ’ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন হেতু। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের, কি না—হেতু পদার্থের পরীক্ষাই ন্যায়। সাধাসিদ্ধি তাহার ফল। কোন সাধা সাধনের জন্য

কোন হেতু পদার্থ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত অহুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিলে ঐ হেতু পরীক্ষিত হয়। সুতরাং ঐ অহুমান-প্রমাণই হেতুপরীক্ষা এবং উহাই এখানে ন্যায় অর্থাৎ অহুমান প্রমাণরূপ গ্রাহ্যই পূর্বে বলা হইয়াছে, ইহাই ভাব্যকারের উক্তরের তাৎপর্যার্থ। সে কিরূপ অহুমান-প্রমাণ ? ইহা বলিতে বহুবচনাস্ত “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কথা বলিয়া ভাব্যকার জানাইয়াছেন যে, যে অহুমান-প্রমাণ বাধিত হয় না, এমন অহুমানই ন্যায়। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব দ্বারা অহুমান প্রদর্শন করিলে সে অহুমান কখনও বাধিত হয় না। কারণ, ঐ পঞ্চাবয়বের মূলে সর্বপ্রমাণ থাকে, সুতরাং সেই স্থলীর অহুমান-প্রমাণ অস্তিত্ব প্রমাণের অবিরুদ্ধ হইবেই। তাহা হইলে ঐ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে অহুমান অন্য প্রমাণের অবিরুদ্ধ, তাহাই ন্যায়। যে অহুমানে পঞ্চাবয়ব প্রযুক্ত হয়, তাহাই ন্যায়, ইহা বুঝিতে হইবে না, তাহা হইলে গুরুশিষ্যাদির বাদবিচারে যেখানে পঞ্চাবয়বপ্রয়োগ হয় নাই, সেই স্থলীয় অহুমান ন্যায় হইতে পারে না। ভাব্যকার পরেই তাঁহার পূর্বকথার এই ফলিতার্থ বা তাৎপর্যার্থ নিজেই বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অহুমান ন্যায়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতুপরীক্ষা বলিতে অহুমান-প্রমাণ বুঝিবে এবং “পঞ্চাবয়বের” দ্বারা এই কথা হইতে প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত, এইরূপ তাৎপর্যার্থ বুঝিবে। “প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত” ইহার অর্থ—প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের অবিরোধী। উদ্যোতকরও ঐ কথার ঐ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাব্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত গ্রন্থকে “অবীক্ষা”ও বলে। “অহু” শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। বাহার দ্বারা পশ্চাৎ টেকণ কি না—জ্ঞান হয়, তাহাকে “অবীক্ষা” বলা যায়। যেখানে প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া শেষে বিশেষ জ্ঞানের জন্ত অথবা দৃঢ়তর জ্ঞানের জন্ত অথবা প্রতিবাদীকে মানাইতে মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্তির জন্য অহুমান-প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়, সেখানে ঐ অহুমানকে “অবীক্ষা” বলা যায়। বস্তুতঃ ভাব্যকার “অবীক্ষা” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন যে, “অবীক্ষা” হইলে তাহা প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী অহুমানই হইবে, সুতরাং “অবীক্ষা” শব্দের অর্থও “গ্রাহ্য”। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সর্বত্র থাকে না; কিন্তু তাহার ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনার দ্বারা প্রকৃতার্থ নির্ণয় করা যায় এবং করিতে হয়। পরন্তু প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মূলে সর্ব প্রমাণ থাকে, ভাব্যকারের এই সিদ্ধান্তানুসারেও ভাব্যকার এখানে “অবীক্ষা” শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে পারেন এবং তদনুসারে তাঁহার পূর্বোক্ত “গ্রাহ্য”কে “অবীক্ষা” বলিতে পারেন। সর্বত্র অহুমের পদার্থটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা পূর্বে বুঝিতে হইবে; নচেৎ সেখানে অহুমান “অবীক্ষা” হইবে না, ইহা কিন্তু ভাব্যকারের তাৎপর্য্য নহে। ঐ কথার দ্বারাও তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে যে, বাহ্য প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী অহুমান, অর্থাৎ বাহ্যকে পূর্বে “গ্রাহ্য” বলিয়াছি, তাহাকেই “অবীক্ষা” বলে। ভাব্যকার “আবীক্ষিকী” শব্দের দ্বারা যে এই গ্রাহ্য-বিদ্যাকে বুঝা যায় এবং তাহাই বুঝিতে হইবে, ইহা বলিবার জন্তই শেষে “অবীক্ষার” কথা তুলিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত গ্রন্থকেই “অবীক্ষা” বলিয়াছেন, ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাখ্যা

করিয়া “অবীক্ষা” শব্দের পূর্বোক্ত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং পূর্বোক্ত “জ্ঞান”ই ভাষ্যকারের মতে “অবীক্ষা” শব্দের প্রকৃতার্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা “জ্ঞান”, তাহাই “অবীক্ষা” এবং তাহাই “পরীক্ষা” বা হেতুপরীক্ষা, এখানে এ সবগুলিই একার্থ, ইহাই ভাষ্যকারের কথা। পূর্বোক্ত অহুমানরূপ ন্যায়কেই “অবীক্ষা” বলে এবং ঐ অবীক্ষার নির্বাহক শাস্ত্র বলিয়াই জ্ঞানশাস্ত্রকে “আবীক্ষিকী” বলে, “ন্যায়বিদ্যা” বলে। কোষকার অমর সিংহও বলিয়াছেন—“আবীক্ষিকী তর্কবিদ্যা”। “তর্ক” শব্দও পূর্বোক্ত “ন্যায়” অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যকার যে প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাণের অবিরুদ্ধ অহুমানকেই পূর্বে “ন্যায়” বলিয়াছেন, “অবীক্ষা” বলিয়াছেন, ইহা তিনি শেষে সুস্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষ কথাটি এই যে, যে অহুমান প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ, তাহা “ন্যায়ভাস”। যাহা “ন্যায়” নহে, কিন্তু ন্যায়সদৃশ, ন্যায়ের মত প্রতীত হয়, তাহাই “ন্যায়ভাস” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অহুমানই “জ্ঞানভাস”। সেখানেও ভ্রম অহুমিতি হয়, এ জ্ঞান তাহাতেও “অহুমান” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা যথার্থ অহুমিতি জন্মায় না, এ জন্য তাহা প্রমাণ নহে, সুতরাং তাহা “ন্যায়”ও হইবে না, তাহার নাম “ন্যায়ভাস”। ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারা তিনি যে প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অহুমানকেই পূর্বে “ন্যায়” বলিয়াছেন, ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরোধ নিজে বুঝিলে বা কেহ বুঝাইয়া দিলে “ন্যায়ভাস” স্থলে আর অহুমিতিই জন্মে না, কিন্তু তৎপূর্বে ভ্রম অহুমিতি হইয়া থাকে, তখনও সেই অহুমান “ন্যায়ভাস”। বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অহুমান, তাহা সকল অবস্থাতেই “ন্যায়ভাস”। বাদী ও প্রতিবাদীর অহুমানদ্বয়ের মধ্যে একটি হইবে “ন্যায়”, অপরটি হইবে “ন্যায়ভাস”। দুইটি অহুমানই কখনও প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ হইয়া একেবারে নির্দোষ হইতে পারে না। কারণ, দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম কখনও একাধারে প্রমাণসিদ্ধ হইবে না, সুতরাং উভয় পক্ষের অহুমানের মধ্যে একটি বস্তুতঃ “ন্যায়ভাস”ই হইবে, একটি ন্যায় হইবে; প্রকৃত মধ্যস্থ তাহা বুঝাইয়া দিবেন। মধ্যস্থের মতাম্বসারেই সেখানে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইবে। বাদ-বিচারে মধ্যস্থ আবশ্যক হয় না। সেখানে গুরুপ্রভৃতি বিচারকই উহা বুঝাইয়া দিবেন। মূল কথা, কেহ বুঝাইয়া না দিলেও এবং নিজে বুঝিতে না পারিলেও বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অহুমান, তাহা কোন দিনই “ন্যায়” হইবে না, তাহা “ন্যায়ভাস”। এখন এই “জ্ঞানভাসের” উদাহরণ বুঝিতে হইবে। কেহ অগ্নিকে অহুক্ষ বলিয়া বুঝাইবার জ্ঞান যদি বলেন—“বহিরহুক্ষঃ কার্যদ্ব্যং” অর্থাৎ অগ্নি যখন কার্য্য, তখন তাহা উক্ষ নহে, যাহা যাহা কার্য্য অর্থাৎ জ্ঞান পদার্থ, সে সমস্তই অহুক্ষ, যেমন জ্বলাদি, সুতরাং অগ্নিও কার্য্য বলিয়া উক্ষ নহে—অহুক্ষ। এখানে এই অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলিয়া “জ্ঞানভাস”। অগ্নির উক্ষতা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যে সমস্ত কারণে ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই দূরত্বাদি কোন দোষ ঐ স্থলে নাই। সুতরাং ঐ স্থলে অগ্নিস্থিরের দ্বারা অগ্নির উক্ষতা-বিষয়ে যথার্থ প্রত্যক্ষই জন্মে, প্রতিবাদীও ইহা

অস্বীকার করিতে পারেন না, অগ্নিস্পর্শে হস্তদাহ তাঁহারও হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলীয় অহুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ। সুতরাং উহা “জ্ঞায়” নহে—উহা “জ্ঞায়াতাস”। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অহুমান হইতে প্রবল বলিয়া অহুমানকে বাহত করে। আপত্তি হইতে পারে যে, কোন স্থলে অহুমান-প্রমাণের দ্বারাও ত প্রত্যক্ষ বাধিত হয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অহুমান হইতে প্রবল বলা যায় কিরূপে? যেমন আমরা আকাশে চন্দ্ৰের যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ করি, গণিতের সাহায্যে অহুমান প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, চন্দ্ৰের পরিমাণ ঐরূপ নহে, চন্দ্ৰের পরিমাণ উহা হইতে অনেক বড়; সুতরাং ঐ স্থলে প্রত্যক্ষই অহুমানের দ্বারা বাধিত হয়, প্রাচীনগণও এতদ্বারা এইরূপ আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, দূরত্ব-দোষবশতঃ চন্দ্ৰের পরিমাণ-বিষয়ে আমাদের যথার্থ প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অহুমান-প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না। চন্দ্ৰের একটা পরিমাণ আছে, এই প্রত্যক্ষ যথার্থই হয়, কিন্তু আমরা তাহা দূরত্ববশতঃ যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভ্রমই করি। দূরত্বাদি দোষবশতঃ প্রত্যক্ষ ভ্রম হইয়া থাকে, ইহা সর্বসম্মত। সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায়—অহুমান প্রবল হইবেই। প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকটে অহুমান চিরকালই দুর্বল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অহুমানকে চিরকালই বাহত করে, সর্বত্রই বাহত করে, এই কথাই বলা হইয়াছে। আমরা দেখকে আত্মা বলিয়া যে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভ্রম। কেন ভ্রম, তাহা বুঝিবার অনেক উপায় আছে, সুতরাং ঐ স্থলে অহুমানাদি প্রমাণ প্রবল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলে তাহা অহুমানাদি হইতে প্রবল। বহুিতে উচ্চতার প্রত্যক্ষ উভয় মতেই যথার্থ, সুতরাং ঐ স্থলে অহুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ায় “জ্ঞায়াতাস” হইবে। এখানে আর একটি আপত্তি এই যে, বাদী অগ্নিতে অহুমানের অহুমান করিতে হেতু বলিয়াছেন—কার্য্যত্ব। কার্য্যত্ব অহুমানের বাস্তবিকতা অর্থাৎ কার্য্যত্ব থাকিলেই তাহা অহুমান হইবে, এমন নিয়ম নাই; সুতরাং বাদী ঐরূপ অহুমান বলিতেই পারেন না, উহাতে প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষ প্রদর্শন অনাবশ্যক। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি এই কথা লইয়া বহু বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শেষ কথা এই যে, যদিও এখানে কার্য্যত্ব হেতু বাস্তবিকতা, কারণ, অগ্নি বা ঐরূপ তেজঃপদার্থে কার্য্যত্ব থাকিলেও অহুমান নাই—ইহা সত্য; কিন্তু যত বেলা ঐ প্রত্যক্ষ-বিরোধ প্রদর্শন না করা যাইবে, তত বেলা বাদীকে ঐ বাস্তবিক মানান যাইবে না। বাদী বলিবেন—আমি অগ্নি ও ঐরূপ তেজঃপদার্থে অহুমান স্বীকারই করি, বাস্তবিকতা কোথায়? সুতরাং প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষই প্রথমে দেখাইতে হইবে। অর্থাৎ ঐ কার্য্যত্ব হেতু ঐ স্থলে হেতু নহে, উহা “বাধিত” নামক হেত্বাতাস, ইহাই প্রথমে বলিতে হইবে, তাহার দ্বারাই ঐ অহুমান দূষিত হইলে আর শেষে বাস্তবিকতা প্রদর্শন করা অনাবশ্যক, এ জন্ত তাহা আর করা হয় না, প্রত্যক্ষ-বিরোধই দেখান হয়। উদয়নাচার্য্য এই সকল কথা উপসংহারে “তাৎপর্য্যপরিভুক্তি”তে বলিয়াছেন—“নহি মৃতোহপি মাধ্যতে”। প্রত্যক্ষ বিরোধের দ্বারাই যে অহুমান বাহত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার বাস্তবিকতা প্রদর্শন অনাবশ্যক। মৃতকেও আবার কে মারিতে যায়?

সুবিধাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অহুমানের পূর্বোক্ত উদাহরণ ঠিক হয় না বলিয়া অল্প একটি উদাহরণ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“অশ্রাবণঃ শব্দঃ কার্যদ্বাং ঘটাদিবৎ” অর্থাৎ কেহ যদি অহুমান করেন যে, শব্দ অশ্রাব্য, যেহেতু শব্দ কার্য, যেমন ঘটাদি, তাহা হইলে ঐ স্থলীয় অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। দিঙ্নাগের অভিপ্রায় এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ; যিনি ঐরূপ অহুমান করিবেন, তিনিও শব্দ শ্রবণ করেন, তিনিও প্রতিবাদীর কথা এবং নিজের কথাগুলি তখনও গুণিতেছেন, সুতরাং শব্দকে অশ্রাব্য বলিয়া অহুমান করিতে তিনি পারেন না, ঐ স্থলীয় অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। “জ্ঞায়বার্তিকে” উদ্যোতকর এবং “শ্লোকবার্তিকে” ভট্ট কুমারিণ দিঙ্নাগের প্রদর্শিত এই উদাহরণকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার বলিয়াছেন যে, শব্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও তাহার শ্রাব্যতা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে? শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধবিশেষই শব্দের শ্রাব্যতা, ঐ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ শ্রাব্যতার প্রত্যক্ষ হয় না। শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ না হইলে অশ্রাব্যতার অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাকে অহুমান করা হইবে, তাহারই অভাব যদি সেখানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয়, তবেই সেই স্থলীয় অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলা যায়। দিঙ্নাগের প্রদর্শিত স্থলে শব্দের অভাব অহুমানের নহে। সুতরাং শব্দ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও শব্দের অশ্রাব্যতার অহুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না, উহা অল্প প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইবে। বহিতে উন্ময় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং তাহাতে উন্ময়ের অভাব অহুমান করিতে গেলে, তাহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অহুমান হইবে। অতএব পূর্বোক্ত সেই স্থলীয় অহুমানই প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অহুমানের উদাহরণ; ঐরূপ অল্প স্থলেও উহার উদাহরণ দেখিবে। দিঙ্নাগের প্রদর্শিত উদাহরণ ভ্রম-কল্পিত, উহা ঠিক নহে।

মনে হয়, দিঙ্নাগ শ্রাব্যতাকে প্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়াই ঐরূপ উদাহরণ বলিয়াছিলেন। শব্দগত “জ্ঞাতি”বিশেষই শ্রাব্যতা, অথবা ঐরূপ জ্ঞাতি না মানিলে শ্রবণেন্দ্রিয়-জ্ঞাত প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রবণই শ্রাব্যতা, “শব্দকে শ্রবণ করিতেছি” এইরূপে ঐ শ্রবণ মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ নহে। কিন্তু তাৎপর্যটাকার কাত্যায়নের হত্র উক্ত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, “শ্রাব্যতা” বলিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয়, তখন তাহার সম্বন্ধও অতীন্দ্রিয় হইবে, সুতরাং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধরূপ শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে,—এই অভিপ্রায়েই উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতীন্দ্রিয়, অতএব ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে। এখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দরূপ বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষকেই উদ্যোতকর ইন্দ্রিয়বৃত্তি বলিয়াছেন।

শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমান, যথা—

কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন—“নরশিরঃ কপালং শুচি, প্রাণাজ্ঞাতং, শব্দবৎ”, অর্থাৎ মরা

মানুষের মাথার খুলি পবিত্র, যেহেতু তাহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শব্দ। কাপালিকের তাৎপর্য এই যে, শব্দ যেমন মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইয়াও সর্বমতেই শুচি, তদ্রূপ মরা মানুষের মাথার খুলিও শুচি। কারণ, তাহাও প্রাণীর অঙ্গ। উদ্যোতকের পূর্ব হইতেই কাপালিক সম্প্রদায় এইরূপে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতেন, তাহারাও নিজ মতাম্বসারে প্রমাণাদি অবলম্বনে বিচারপটু ছিলেন, ইহা উদ্যোতকের কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

দুর্গাশূন্ত কাপালিকের মরা মানুষের মাথার খুলিকে শুচি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এত আগ্রহ কেন? তাহার শুচিত্ব-বিষয়ে এত দৃঢ় বিশ্বাসই বা কেন? এতদ্বারা কাপালিকগণ বাহা বলিতেন, তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কাপালিকগণ বৈদিক সম্প্রদায়কে বলিতেন যে, কেবল শাস্ত্র হইতেই ধর্মাদি নির্ণয় হয় না, অনিন্দিত আচার হইতেও ধর্মাদি নির্ণয় হয়, ইহা তোমরাও স্বীকার করিয়া থাক। তোমাদিগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যদিগের যেমন “আত্মনৈবুক” প্রভৃতি কর্ম অনিন্দিত আচার বলিয়া শ্রেয়স্কররূপে অহুষ্ঠিত হয়, উহা তাহাদিগের অনিন্দিত আচার বলিয়াই ধর্ম বলা হয়, তদ্রূপ আমাদেরও মরা মানুষের মাথার খুলিতে পান-ভোজনাদি ব্যবহার-পরম্পরা অনিন্দিত আচার বলিয়া উহাতে আমরা প্রত্যবার মনে করি না, পরন্তু উহা আমাদের ধর্ম। উদয়নাচার্য্য “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি”তে এখানে বলিয়াছেন যে, যদি বৈদিক সম্প্রদায় বলেন যে, বাহা সার্বজনিক ব্যবহার, তাহা প্রমাণ হইতে পারে—যেমন কন্যাবিবাহে পুরস্বীকরণের আচার। কিন্তু দেশবিশেষে তোমাদিগের অহুষ্ঠিত আচার প্রমাণ হইবে কেন? এই জন্তই কাপালিকগণ দাক্ষিণাত্যদিগের আচারকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচার যেমন সার্বজনিক না হইয়াও অনিন্দিত আচার বলিয়া ধর্ম, তদ্রূপ আমাদের ঐ আচারও অনিন্দিত বলিয়া ধর্ম। আমাদের আচারকে নিন্দিত বলিলে দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচারকেও আমরা নিন্দিত বলিব, উহা নিন্দিত বলে, এমন লোক আরও খুঁজিলে মিলিবে, সুতরাং আমাদের আচারকে নিন্দিত বলিতে যাইরা লাভ হইবে না। দাক্ষিণাত্যদিগের “আত্মনৈবুক” কর্ম কি? এ সম্বন্ধে “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি”র “প্রকাশ” টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—“কেহ বলেন, গোময়ময়ী দেবতা গঠন করিয়া দুর্গাদির দ্বারা অর্চনা পূর্বক তাহাতে জাতিত্ব করনাই দাক্ষিণাত্যদিগের “আত্মনৈবুক”। কেহ বলেন,—মঙ্গল বারে দধি মছনা কেহ বলেন,—এক মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক মুষ্টি করিয়া তড়ুল কোন ভাণ্ডে তুলিয়া রাখিয়া মাসান্তে তদ্বারা দ্ব্যত্যাগে একখানা পিষ্টক নির্মাণ করিয়া তদ্বারা দেবতার পূজা করাই দাক্ষিণাত্যদিগের “আত্মনৈবুক”। ফল কথা, মৈথিল বর্দ্ধমানও দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচারটা কি, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া যাইতে পারেন নাই। “জৈমিনীয় শ্রায়মালাবিস্তরে” “হোলাকাধিকরণে” পাওয়া যায় যে, করঞ্জক প্রভৃতি স্থাবর দেবতার পূজাই “আত্মনৈবুক”। এই সব কথাগুলি চিন্তাশীল অহুসন্ধি-মুগ্ধ ভাবিবার বিষয় বলিয়াই লিখিত হইল।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, কাপালিকগণের পূর্বোক্ত অহুমান শ্রুতিমূলক মবাদিশ্রুতিরূপ শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া “ছায়াভাস”। মরা মানুষের মাথার খুলির অশুচিহ্নই শাস্ত্রসিদ্ধ, সূত্ররাং কোন হেতুর দ্বারাই তাহার শুচিহ্নের অহুমান হইবে না। কেহ উহাতে অহুমান প্রদর্শন করিলে তাহা হইবে “ছায়াভাস”। কাপালিকগণ বলিতেন যে, আমরা শ্রুতিশ্রুতি প্রভৃতি কোন প্রমাণ মানি না, আমরা আমাদের শাস্ত্রকেই প্রমাণ বলিয়া মানি। এতদ্বারা বৈদিক সম্প্রদায় কাপালিকদিগের শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সমর্থন এবং শ্রুতিশ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতেন। উল্লেখ্যতর এখানে শেষে বলিয়াছেন যে, মরা মানুষের মাথার খুলিকে যদি তোমরা শুচি বল, তবে অশুচি বলিবে কাহাকে? বিষ্ঠা প্রভৃতির অশুচিহ্ন ত আমাদের শ্রুতি শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধ, তোমরা ত সে সকল শাস্ত্র মান না। যদি বল, অশুচি কিছুই নাই, আমরা সবই শুচি বলি, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি বলিবে? যদি অহুমান-প্রমাণের দ্বারাই সমস্ত পদার্থের শুচিহ্ন সাধন কর, তবে দৃষ্টান্ত বলিবে কাহাকে? গোময়, শব্দ প্রভৃতিকে দৃষ্টান্ত বলিতে পার না, কারণ, তাহাদিগের শুচিহ্ন বিষয়ে প্রমাণ দিতে হইবে। তদ্বিষয়ে শ্রুতিশ্রুতি প্রভৃতি বাহ্য প্রমাণ আছে, তাহা ত তোমরা মান না। ফলকথা, সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া অহুমান করিতে গেলে তৎপূর্বে কোন পদার্থ শুচি বলিয়া উভয় পক্ষের সিদ্ধ থাকে না; কারণ, তুমি বাহ্য শুচি বলিবে, আমি তাহা অশুচি বলিয়া বসিব। দৃষ্টান্তট অহুমানের পূর্বে উভয়বাদীর নির্বিশ্বাস সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ প্রতিবাদীর নিকটে অহুমান প্রদর্শন করা যায় না। কাপালিকগণ যেমন শ্রুতি-শ্রুতি মানেন না, বৈদিক সম্প্রদায় সেইরূপ কাপালিকের শাস্ত্র মানেন না; সূত্ররাং অহুমানের দ্বারা সমস্ত পদার্থের শুচিহ্ন সাধন করিতে গেলে তৎপূর্বে কোন পদার্থই শুচি বলিয়া উভয়বাদীর নির্বিশ্বাস সিদ্ধ না থাকায়, কাপালিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন না; সূত্ররাং তাহার অহুমান প্রদর্শন অসম্ভব।

গল্পের “তত্ত্বচিন্তামণি”র ছায়াভাস-সামাজ্য-নিরুক্তির “দীধিত”তে রঘুনাথ শিরোমণি পূর্বোক্ত অহুমানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে ঐরূপ অহুমান হইতেই পারে না। কারণ, ঐ স্থলে ঐ অহুমান অপেক্ষায় বিরোধী শাস্ত্র-প্রমাণ বলবত্তর। বলবত্তর কেন? ইহা বুঝাইতে সেখানে দীধিতের টীকাকার জগদীশ বলিয়াছেন যে, ঐ অহুমানে শুচিহ্নরূপ সাধ্য-প্রসিদ্ধি প্রভৃতি একমাত্র শাস্ত্রের অধীন। সূত্ররাং ঐ অহুমানটি শাস্ত্রাধীন। তাহা হইলে ঐ অহুমান হইতে শাস্ত্রই সেখানে বলবৎ প্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অহুমানকারী যে শব্দকে শুচি বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রকেই তিনি প্রথমে আশ্রয় করিয়াছেন। শব্দের শুচিহ্ন তিনি প্রতিবাদীকে শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝাইবেন? প্রতিবাদী যদি বলিয়া বসেন যে, শব্দও মৃত প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া অশুচি, তাহা হইলে অহুমানকারী শাস্ত্রেরই শরণাপন্ন হইবেন। তাহা হইলে শাস্ত্রই তাহার ঐ অহুমানের মূলভূত। সূত্ররাং তিনি

১। “নারং স্পৃষ্টং হি সবেহং ব্রাহ্মণং বিপ্রো বিস্তুযাত।

অচমোহ তু নিগ্রেহঃ গামালভ্যাকর্মীক্য বা।—মহাংহিতা, ৭।

ঐ স্থলে শাস্ত্রকে বলবৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। যদিও অহুমান অপেক্ষায় আগ্রবাক্য-রূপ শব্দ-প্রমাণ সর্বত্রই প্রবল, কারণ, তাহাতে ভ্রমের সম্ভাবনাই নাই, অহুমানে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে, তথাপি যিনি তাহা মানেন না, তিনিও পূর্বোক্ত অহুমানে শব্দকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতে যখন শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিবেন, তখন তজ্জাতীয় শাস্ত্রাস্তরকেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং তাহার ঐ অহুমানের মূলভূত শাস্ত্রের সজাতীয় বলিয়া মরা মানুষের মাথার খুলির অন্তর্ভুক্তবোধক শাস্ত্র তাহার মতেও বলবত্তর, সুতরাং সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ অহুমান হইতেই পারে না। এইরূপ অস্ত্রপ্রকার শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ অহুমানও ভ্রান্ত্যভাস হইবে। প্রত্যক্ষের দ্বারা শব্দ-প্রমাণও অহুমান অপেক্ষায় প্রবল বলিয়া তদ্বিরুদ্ধ অহুমান কখনও ভ্রান্ত হইবে না।

অহুমান-বিরুদ্ধ অহুমানকে ভ্রান্ত্যভাস ভ্রান্ত্যভাস বলেন নাই কেন? এতদ্ব্যতীত উদ্বোধন-কর বলিয়াছেন যে, একত্র দুইটি বিরুদ্ধ অহুমানের সমাবেশ হইতে পারে না, এজন্য অহুমান অহুমানবিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, একই সময়ে পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি বিরুদ্ধ অহুমান হইতে পারে না। কারণ, দুইটি অহুমানই যদি তুল্যশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহার কোনটিই অহুমিতি জন্মাইতে পারে না, সেখানে উভয় পক্ষের সাধ্য ধর্ম্ম বিঘ্নে সংশয়ই জন্মে। সেখানে দুইটি অহুমানই তুল্যশক্তি বলিয়া একটি অপরটিকে বাধা দিয়া অহুমিতি জন্মাইতে পারে না। একটি দুর্ব্বল এবং অপরটি প্রবল হইলেই প্রবলটি দুর্ব্বলটিকে বাধা দিতে পারে। যেমন প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণ অহুমান অপেক্ষায় প্রবল বলিয়া অহুমানকে ব্যাহত করে, সুতরাং সেই স্থলেই অহুমানকে ভ্রান্ত্যভাস বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্বোধনকরের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদি কোন অহুমান পূর্ব্ববর্ত্তী অস্ত্র অহুমানকে অপেক্ষা করিয়াই উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে অহুমান বিরুদ্ধ হইয়াও ভ্রান্ত্যভাস হইতে পারে। যেমন কেহ ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অহুমান করিতে গেলে পূর্ব্বের তাহাকে ঈশ্বর-সাধক অহুমান-প্রমাণকে আশ্রয় করিতে হইবে, নচেৎ ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অহুমান বলা যাইবে না। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অহুমান করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মী অসিদ্ধ হইলে তাহাতে অহুমান হইতে পারে না। কেহ আকাশ-কুহ্মে গন্ধের অহুমান করিতে পারেন কি? সুতরাং ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অহুমানকারীকে বলিতে হইবে যে, আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু ঈশ্বর কর্ত্তা নহেন, ইহাই আমার সাধ্য। তাহা হইলে ঐ অহুমান অহুমানবিরুদ্ধ বলিয়া ভ্রান্ত্যভাস হইবে। কারণ, ঐ অহুমানকারী ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অহুমান করিতে পূর্ব্বের ঈশ্বর-সাধক যে অহুমানকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই অহুমান ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছে। ঈশ্বরসাধক অহুমানের দ্বারা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং ঈশ্বর মানিয়া তাহাতে কর্তৃত্বাভাবের অহুমানে সেই কর্ত্তৃত্বসাধক অহুমান অপেক্ষিত হওয়ায়, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী অহুমান প্রবল, সুতরাং পরবর্ত্তী কর্ত্তৃত্বাভাবের অহুমান তাহার দ্বারা ব্যাহত হইবে। উহা অহুমানবিরুদ্ধ অহুমান হইয়া

শ্রায়াভাস হইবে। ভাষ্যকার কিন্তু ইহা বলেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় ইহাই বলা যায় যে, যদিও ঐক্য কোন স্থল হয়, তাহা হইলে সেখানে শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়াই শ্রায়াভাস হইবে, অমুমান-বিরুদ্ধ বলিয়া আবার অন্য প্রকার শ্রায়াভাস বলিবার কোন প্রয়োজনই নাই। যেমন তাৎপর্যটীকাকারের প্রদর্শিত ঐশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অমুমান শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়াতেই শ্রায়াভাস হইতে পারিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—“বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস্ত গোপ্তা,” স্মৃতরাং ঐশ্বরে কর্তৃত্বাভাব শ্রুতি-বাধিত। উহার অমুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ।

উপমান প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়াও শ্রায়াভাস হইতে পারে, তবে সেখানে উপমান প্রমাণের মূলভূত শব্দ-প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়াতেই শ্রায়াভাস হইবে। উপমান-বিরুদ্ধ বলিয়া আর পৃথক কোন শ্রায়াভাস বলিবার প্রয়োজন না থাকায় ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। উদ্বোতকর প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। শ্রায়াভাস হইলেই হেতুভাস সেখানে হইবেই, এ জ্ঞান মহাশি হেতুভাসের কথাই কেবল বলিয়াছেন, ন্যায়াভাস নাম করিয়া কিছু বলেন নাই। (হেতুভাস-প্রকরণ দৃষ্টব্য)।

ভাষ্য। তত্র বাদজল্পৌ সপ্রয়োজনৌ বিতণ্ডা তু পরীক্ষ্যতে। বিতণ্ডয়া প্রবর্তমানো বৈতণ্ডিকঃ। স প্রয়োজনমনুযুক্তো যদি প্রতিপত্তে, সৌহৃদ্য পক্ষঃ সৌহৃদ্য সিদ্ধান্ত ইতি বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপত্তে নাযং লৌকিকো ন পরীক্ষক ইত্যাপত্তে।

অনুবাদ। সেই (পূর্বোক্ত) শ্রায়াভাসে বাদ ও জল্প (বাদ নামক এবং জল্প নামক বক্ষ্যমাণলক্ষণ দ্বিবিধ বিচার) সপ্রয়োজন, অর্থাৎ বাদ ও জল্পের প্রয়োজন সর্বসিদ্ধ। কিন্তু বিতণ্ডাকে (বিতণ্ডা নামক বক্ষ্যমাণলক্ষণ-বিচারকে) পরীক্ষা করিতেছি;—অর্থাৎ বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকায় বিতণ্ডা সপ্রয়োজন, কি নিস্প্রয়োজন, তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করিতেছি।

বিতণ্ডার দ্বারা প্রবর্তমান ব্যক্তি বৈতণ্ডিক, অর্থাৎ যিনি বিতণ্ডা নামক বিচার করেন, তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলে। সেই বৈতণ্ডিক যদি (তাঁহার বিতণ্ডার) প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেইটি ইহার পক্ষ, সেইটি ইহার সিদ্ধান্ত, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে (নিস্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদীর মতে) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ যাঁহারা বলেন, বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ নাই, স্মৃতরাং বিতণ্ডায় স্বপক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, বিতণ্ডা কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডনমাত্র, তাঁহাদিগের মতে যে বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের পক্ষ স্বীকার করেন অর্থাৎ স্বপক্ষসিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা নিজেই বলেন, তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না।

আর যদি স্বীকার না করেন অর্থাৎ বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়াও তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছু স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইনি লৌকিকও নহেন, পরীক্ষকও নহেন অর্থাৎ বোদ্ধাও নহেন, বোধয়িতাও নহেন, ইহা আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ বাঁহার অপক্ষ নাই, সুতরাং অপক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলিলে সভ্য-সমাজে উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষিত হইয়া পড়েন।

টিপ্পনী। সংশয়ের পরে প্রয়োজনের কথাই চলিতেছে। প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি স্বত্রোক্ত পদার্থগুলিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাষ্যকার বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার কথা তুলিলেন কেন? ভ্রমবশতঃ এখানে এইরূপ একটা গোল উপস্থিত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। ভাষ্যকার প্রয়োজন ব্যাখ্যায় বলিয়া আসিয়াছেন যে, সর্ব সন্দেহ, সর্ব বিজ্ঞা প্রয়োজনবাস্তব, অর্থাৎ নিশ্চয়োজন কিছুই নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের পূর্বের বা সমকালে এক সম্প্রদায় বিতণ্ডাকে নিশ্চয়োজন বলিতেন। যদি বিতণ্ডা বস্তুতঃ নিশ্চয়োজনই হয়, তাহা হইলে সমস্তই সপ্রয়োজন—ভাষ্যকারের এই পূর্বকথা মিথ্যা হয়। এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে বিতণ্ডার নিশ্চয়োজনত্ব পক্ষের অসম্ভব দেখাইয়া তাঁহার সপ্রয়োজনত্ব পক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। ফলকথা, “তত্র বাদজ্ঞানো” ইত্যাদি ভাষ্য পূর্বোক্ত “প্রয়োজন” ব্যাখ্যারই অঙ্গ। বাদ ও জল্পের প্রয়োজন পরীক্ষা না করিয়া বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা কেন? এই প্রশ্ন নিরাসের জন্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্ব সর্বসম্মত, তাহা বিবাদের কোন বিষয় নাই। কিন্তু বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ আছে, সুতরাং মধ্যস্থগণের সংশয় নিবৃত্তির জন্ত তাহার পরীক্ষা করিতেছি। কেবল তত্ত্ব জিজ্ঞাসাবশতঃ গুরু-শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, তাহার নাম বাদ। জিগীষাবশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপনাদি করিয়া যে বিচার করেন, তাহার নাম জল্প। জিগীষু আত্মপক্ষের সংস্থাপন না করিয়া কেবল পরপক্ষ সংস্থাপনের খণ্ডন করিলে, সেই বিচারের নাম বিতণ্ডা। যথাস্থানে ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বিতণ্ডার যখন বৈতণ্ডিকের আত্মপক্ষের সংস্থাপন নাই, তখন বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষই নাই, পক্ষ থাকিলে বৈতণ্ডিক অবশ্য তাহার স্থাপনা করিতেন। যাহার স্থাপন করা হয় না, তাহাকে পক্ষ বলা যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে, বৈতণ্ডিকের অপক্ষ নাই, বিতণ্ডা কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন মাত্র। বৈতণ্ডিকের যদি অপক্ষ না থাকে, তাহা হইলে বিতণ্ডার অপক্ষ-সিদ্ধিরূপ প্রয়োজন অসম্ভব। তৎ-নির্ণয় বিতণ্ডার প্রয়োজন হইতে পারে না। কারণ, তৎ-নির্ণয় উদ্দেশ্যে বিতণ্ডা করা হয় না, ইহা সর্বসম্মত। বৈতণ্ডিকের অপক্ষ না থাকিলে পর-পরাজয় বিতণ্ডার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, অপক্ষ রক্ষার জন্তই পর-পরাজয় আবশ্যক হইয়া থাকে এবং তাহা করিতে হয়; নিরর্থক বিদেহ-বশন্তঃ পরপরাজয় বিচারকের প্রয়োজন বলিয়া সভ্য-সমাজ কোন দিনই অহুমোদন করেন না। কেহ নিজের কোন মতসিদ্ধি উদ্দেশ্য না রাখিয়া কেবল পর-পরাজয় বা তর্ক-কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি বা প্রতিভা প্রদর্শনের জন্ত বিচার করিলে মধ্যস্থগণ “এ নিরর্থক বিচার,” এই কথাই বলিয়া

থাকেন। সুতরাং যিনি বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষই নাই বলেন, তিনি বাধ্য হইয়া বিতণ্ডাকে নিস্প্রয়োজন বলিবেন, প্রাচীন কালে এক সম্প্রদায় তাহাই বলিতেন, এ কথা উদ্ধৃতকরও লিখিয়া গিয়াছেন।

আবার বিতণ্ডা শব্দের (“বিতণ্ডাতে ব্যাহৃততে পরপক্ষসাধনমনয়া” এইরূপ) ব্যুৎপত্তি চিত্তা করিলে বিতণ্ডা শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, পরপক্ষ সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বৈতণ্ডিকের বিতণ্ডার প্রয়োজন। এইরূপ অগ্রান্ত যুক্তিতে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা অগ্র সম্প্রদায় বলিতেন। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবশতঃ বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব সন্দিগ্ধ। এ অগ্র ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“বিতণ্ডা তু পরীক্ষাতে”। বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্বে কোন বিবাদ নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। সংশয় বাতীত পরীক্ষার আবশ্যকতা হয় না। বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে মধ্যস্থগণের সংশয় বুঝিয়া ভাষ্যকার এখানে তাহার পরীক্ষা করিয়া সপ্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এখানে তাহা না করিলে অর্থাৎ বিতণ্ডা নিস্প্রয়োজন নহে, ইহা প্রতিপন্ন না করিলে, সৰ্ব্বকৰ্ম্ম, সৰ্ব্ববিজ্ঞা সপ্রয়োজন, নিস্প্রয়োজন কিছুই নাই, তাহার এই পূর্বকথায় আপত্তি থাকিয়া যায়—মধ্যস্থগণের সংশয় থাকিয়া যায়।

ভাষ্যের প্রথমে “তত্র” এই কথার ব্যাখ্যায় উদ্ধৃতকর বলিয়াছেন,—“তন্মিন্ শ্রায়াভাসে”। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অবাবহিত পূর্বে শ্রায়াভাসের কথা থাকতেই বাস্তবিককার ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রায়েও বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন। বাদ ও জল্প স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর একজনের শ্রায়াভাস হইবেই। কারণ, পরস্পর-বিরুদ্ধ দুইটি পদার্থ একই আধারে কখনই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং উভয় বাদীর স্থাপনার মধ্যে একটি হইবে শ্রায়, একটি হইবে শ্রায়াভাস; সুতরাং শ্রায়াভাসে বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন, ইহা বলিলে, শ্রায়েও বাদ ও জল্পকে সপ্রয়োজন বলা হয়। তাহা হইলে উদ্ধৃতকরের ঐ ব্যাখ্যায় ফলতঃ কোন দোষও হয় নাই।

যাহারা বিতণ্ডাকে নিস্প্রয়োজন বলিতেন, তাহারা বলিতেন যে, বিতণ্ডা শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারাও স্বপক্ষসিদ্ধি বিতণ্ডার প্রয়োজন বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিলেই স্বপক্ষসিদ্ধি হয় না। কেহ ধূম হেতুর দ্বারা পক্ষিতে বহি সাধন করিতে গেলে যদি প্রতিবাদী পক্ষিতে ধূম নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলেও তাহার স্বপক্ষ অর্থাৎ পক্ষিতে বহির অভাব তাহাতে সিদ্ধ হয় না। কারণ, ধূম না থাকিলেও পক্ষিতে বহি থাকিতে পারে। এইরূপ এবং পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তির দ্বারা যাহারা বিতণ্ডার নিস্প্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিতেন, তাৎপর্যটীকাকার তাহাদিগকে “নিস্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদী”—এইরূপ আখ্যায় দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত আছে, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিস্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদীর মতে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। কারণ, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ নাই; সুতরাং বিতণ্ডার স্বপক্ষ-

সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই ত তাঁহাদিগের মত। বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষহীন বিচারকেই তাঁহারা বিতণ্ডা বলেন, সুতরাং যে বৈতণ্ডিক স্বপক্ষ স্বীকার করেন, তিনি আর তাঁহাদিগের মতে বৈতণ্ডিক হইতে পারিলেন না। যদি বল, তিনি ত অবশ্যই বৈতণ্ডিক হইবেন না, স্বপক্ষ থাকিলে কি আর তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলা যায়? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বৈতণ্ডিক হইবেন কে? যিনি স্বপক্ষ স্বীকার করেন না, তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহার স্বপক্ষ না থাকিলে তিনি নিরর্থক বাক্যবিত্তাস করিবেন কেন? যিনি তাহা করেন, তাঁহাকে বোকা বা বোধহীনতা কিছুই বলা যায় না। যিনি নিশ্চয়োজনে কথা বলেন, তাঁহাকে কোন বিচারকের সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে না, তিনি সভ্য-সমাজে উন্নতের স্তায় উপেক্ষিত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৈতণ্ডিকগণ যখন ঐরূপে উপেক্ষিত নহেন, তাঁহারা বিচারকের আসনে বসিয়া সম্মানে বিচার করিয়া থাকেন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়োজনে কথা বলেন না, তাঁহাদিগের গুণভাবে স্বপক্ষ আছেই, ঐ স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন এবং সেই স্বপক্ষ রক্ষার জন্তই তাঁহাদিগের পরপরাজয় প্রয়োজন। স্বপক্ষ-সিদ্ধি হউক বা না হউক, পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই বৈতণ্ডিক কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডনই করেন, স্বপক্ষের সাধন অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা নিজসিদ্ধান্তটির সংস্থাপন করেন না। সংস্থাপন না করিলে তাহাকে স্বপক্ষ বলা যায় না—এ কথা নিবৃত্তিক; সংস্থাপন না করিলেও যাহা সংস্থাপনের যোগ্য, তাহা স্বপক্ষ হইতে পারে। সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে কি কোন বাদীর পক্ষটিকে তাঁহার স্বপক্ষ বলা হয় না? মূল কথা, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ আছে, স্বপক্ষ-সিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, বিতণ্ডা নিশ্চয়োজন নহে। যাহারা বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ নাই বলিতেন, উদ্যোতকরও তাঁহাদিগের মতের উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—

“ন দুষণমাত্রং বিতণ্ডা, কিন্তু অভ্যুপেতা পক্ষং যো ন স্থাপয়তি স বৈতণ্ডিক উচ্যতে”।

ভাবো “সোহস্ত সিদ্ধান্তঃ” এই অংশ “সোহস্ত পক্ষঃ” এই পূর্বকথারই বিবরণ। অর্থাৎ ঐ স্থলে “পক্ষ” শব্দের দ্বারা সিদ্ধান্তই অভিপ্রেত।

ভাষ্য। অথাপি পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপনং প্রয়োজনং ব্রবীতি, এতদপি তাদৃগেব। যো জ্ঞাপয়তি যো জানাতি, যেন জ্ঞাপ্যতে যচ্চ, প্রতিপদ্যতে যদি, তদা বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপদ্যতে, পরপক্ষপ্রতিষেধ-জ্ঞাপনং প্রয়োজনমিত্যেতদস্য বাক্যমনর্থকং ভবতি।

বাক্যসমূহশ্চ স্থাপনাহীনো বিতণ্ডা, তস্য যদ্যভিধেয়ং প্রতিপদ্যতে সোহস্য পক্ষঃ স্থাপনীয়ো ভবতি, অথ ন প্রতিপদ্যতে প্রলাপমাত্রমনর্থকং ভবতি বিতণ্ডাৎ নিবর্ত্তত ইতি।

অনুবাদ। আর যদি (বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া) পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনকে অর্থাৎ পরপক্ষ-সাধনের দোষ প্রদর্শনকে প্রয়োজন বলেন, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ-পক্ষেও পূর্বোক্ত প্রকার দোষ অপরিহার্য। (কেন, তাহা বুঝাইতেছেন) যিনি বুঝাইবেন, যিনি বুঝিবেন, যাহার দ্বারা বুঝাইবেন (এবং) যাহা বুঝাইবেন অর্থাৎ জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি এবং জ্ঞাপনীয়, এই চারিটি যদি স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে (সেই শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ ঐগুলি স্বীকার করিলে তিনি স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া বসিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজ মতানুসারে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারিলেন না, তাঁহাকে আর বৈতণ্ডিক বলা গেল না।

আর যদি (তিনি পূর্বোক্ত চারিটি) স্বীকার না করেন, (তাহা হইলে) ইহার অর্থাৎ শূন্যবাদী বৈতণ্ডিকের ‘পরপক্ষ প্রতিষেধ জ্ঞাপন প্রয়োজন,’ এই কথা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ শূন্যবাদী যদি কিছুই না মানেন, তাহা হইলে পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপন করিবেন কিরূপে ? তিনি যে ‘প্রতিষেধ’ বলিয়া কোন পদার্থও মানেন না, তবে তিনি কিসের জ্ঞাপন করিবেন ? যাহা নাই, তাহার জ্ঞাপন কখনই হইতে পারে না। সুতরাং শূন্যবাদীর ঐ কথা কেবল কথামাত্র, তাঁহার নিজ মতে ঐ কথার কোন অর্থ হয় না—উহা অনর্থক।

পরন্তু স্থাপনাত্মক অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপনশূন্য বাক্যসমূহ “বিতণ্ডা”। (শূন্যবাদী) যদি সেই বিতণ্ডা-বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বীকার করেন, (তাহা হইলে) সেই প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহার (শূন্যবাদীর) “পক্ষ” অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হওয়ায় স্থাপনীয় হয়। অর্থাৎ বিতণ্ডাবাক্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ বা নিজ সিদ্ধান্ত বলিতেই হইবে। প্রতিবাদী তাহা না মানিলে বৈতণ্ডিককে তাহার সংস্থাপনও করিতে হইবে, সুতরাং শূন্যবাদী তাঁহার বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বীকার করিলে স্বপক্ষ স্বীকার করায় তাঁহার নিজের মতে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না।

আর যদি (তিনি বিতণ্ডা-বাক্যের প্রতিপাদ্য) স্বীকার না করেন, (তাহা হইলে তাঁহার কথা) প্রলাপমাত্র অনর্থক হয়, (তাঁহার কথাগুলির) বিতণ্ডাও নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাহার কোন প্রতিপাদ্য নাই, তাহা বাক্যই হয় না, বাক্য না হইলেও তাহা বিতণ্ডা হইতে পারে না, প্রতিপাদ্যহীন কথা প্রলাপমাত্র, তাহার কোন অর্থ নাই

টিপ্পনী। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শূন্যবাদী নামে এক সম্প্রদায় ছিলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে মাধ্যমিক শূন্যবাদের উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং উহাই বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত বলিয়া পরবর্তী অনেক গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়। বুদ্ধদেবের শূন্যবাদের প্রকৃত মত বাহাই হউক, ভট্ট কুমারিল, বাচস্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধমতবিশ্বংসী আচার্য্য-গণ মাধ্যমিকের শূন্যবাদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাহাকে প্রমেয় বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ নাই। কারণ, কোন পদার্থকেই সং বলা যায় না। কারণ, যদি সং হইত, তাহা হইলে চিরকালই থাকিত, একরূপই থাকিত। আবার অসংও বলা যায় না, কারণ, প্রতীতি হইতেছে, অসত্তের প্রতীতি হইতে পারে না। আবার সংও বটে, অসংও বটে—ইহাও অর্থাৎ সং ও অসং এই উভয় প্রকারও বলা যায় না। কারণ, ঐ উভয় রূপ বিরুদ্ধ। সং হইলে তাহা অসং হইতে পারে না, অসং হইলেও সং হইতে পারে না। আবার সংও নহে, অসংও নহে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার, ইহাও বলা যায় না। কারণ, সং না হইলে অসং হইবে, অসং না হইলে সং হইবে। সংও নহে, অসংও নহে—এইরূপ বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত পদার্থ হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রতীতিও হইতে পারিত না। ফলতঃ এই চতুর্নিধ প্রকারই বিচারসহ নহে। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকারও নাই। সুতরাং যখন অপর সম্প্রদায়-সম্মত প্রমেয় সর্বপ্রকারেই বিচারসহ নহে অর্থাৎ বিচারে টিকে না, তখন প্রমেয় নাই। এতাদৃশ শূন্যবাদীর কোন পক্ষও নাই, স্থাপনাও নাই। কারণ, তিনি কিছুই মানেন নাই, তিনি পরপক্ষ প্রতিবেদ জ্ঞাপনের জন্তই বিচার করিয়াছেন। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা ভিন্ন আর কোনরূপ বিচার অন্য সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। কেহ বিচার করিতে আসিলে এই ত্রিবিধ বিচারের কোন বিচারই করিতে হইবে, নচেৎ প্রাচীন কালে বিচার গ্রাহ্য হইত না। সুতরাং শূন্যবাদী নিজেকে বৈতণ্ডিক বলিয়া পরিচয় দিয়াই বিচার করিতে আসিতেন এবং স্বপক্ষহীন বিচারকেই বিতণ্ডা বলিতেন। বিতণ্ডায় স্বপক্ষ থাকা প্রয়োজন হইলে, শূন্যবাদীর বিচার বিতণ্ডা হইতে পারে না, বাদ ও জল্প হওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। এ জন্ত শূন্যবাদী অন্য সম্প্রদায়ের নিকটে বৈতণ্ডিকরূপে গৃহীত হইবার জন্ত বিতণ্ডার লক্ষণ ঐরূপই প্রতিপন্ন করিতেন। মহর্ষি গৌতমের বিতণ্ডা-লক্ষণস্থলেও স্থাপনা শব্দ নিরর্থক বলিতেন। (১ অং, ২ আং, ৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ফলকথা, শূন্যবাদী বলিতেন যে, বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই, সুতরাং স্বপক্ষ-সিদ্ধি বিতণ্ডার প্রয়োজন হইতেই পারে না। তবে নিম্নপ্রয়োজন কিছুই নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করি; পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপনই বিতণ্ডার প্রয়োজন। পরের পক্ষটি প্রতিবিদ্ধ, পরপক্ষের সাধন দূষিত, ইহা পরকে এবং মধ্যস্থদিগকে বুঝানই বৈতণ্ডিকের উদ্দেশ্য।

ভাষ্যকার এই শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ কথা ঠিক পূর্বের কথা না হইলেও সেইরূপই হইয়াছে। কারণ, শূন্যবাদী যদি পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপনের জন্ত বিতণ্ডা করেন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি

এবং জ্ঞাপনীয়, এই চারিটি মানিবেন কি না ? তাহা মানিলে ঐগুলি তাঁহার স্বপক্ষ বা স্বসিদ্ধান্ত-রূপে গণ্য হইল, পরপক্ষ-প্রতিবেদ বাহা তাঁহার জ্ঞাপ্য, তাহা জানাইতে আর বাহা আবশ্যক, তাহাও স্বসিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত হওয়ার পক্ষমধ্যে গণ্য হইল ; সুতরাং তিনি তাঁহার নিজস্বত বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন। “বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন” বলিতে তাঁহাতে তাঁহার নিজস্বত্ব বৈতণ্ডিকের লক্ষণ থাকিল না ; কারণ, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ থাকিলে শূন্যবাদী তাহাকে ত বৈতণ্ডিক বলেন না, তিনি নিজে স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া বসিলে আর বৈতণ্ডিক হইবেন কিরূপে ? এবং তাঁহার শূন্যবাদই বা থাকিবে কিরূপে ?

আর যদি শূন্যবাদী পূর্বোক্ত দোষ-ভয়ে বলেন যে, আমি জ্ঞাপক প্রভৃতি স্বীকার করি না, আমি কিছুই মানি না, তাহা হইলে পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপনই তাঁহার প্রয়োজন, এ কথা তিনি বলিতে পারেন না, ঐ কথা উদ্ভূতপ্রলাপ হইয়া পড়ে। কারণ, প্রথমতঃ কোন বাদী বৈতণ্ডিকের নিকটে ‘এই সাধ্য, এই পক্ষাবয়ব বাক্যের দ্বারা আমি জ্ঞাপন করিতেছি,’ এই ভাবে জ্ঞাপন করিলে, বৈতণ্ডিক সেই জ্ঞাপক ব্যক্তি এবং তাঁহার জ্ঞাপ্য পদার্থ এবং জ্ঞাপনের সাধন পক্ষাবয়ব প্রভৃতি বুঝিয়াই তাহার খণ্ডন করিয়া থাকেন। বৈতণ্ডিক সেখানে ঐগুলি না বুঝিলে অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা না হইলে পরপক্ষ প্রতিবেদ জ্ঞাপন তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে না। আবার তাঁহার নিজের জ্ঞাপ্য যে পরপক্ষ-প্রতিবেদ, তাহাও যদি তিনি না মানেন, তবে তিনি কিসের জ্ঞাপন করিবেন ? বাহা নাই, তাহার কি জ্ঞাপন হইতে পারে ? এবং জ্ঞাপক, জ্ঞাতা ও জ্ঞাপনের সাধন না থাকিলে কি কিছুর জ্ঞাপন হইতে পারে ? ফলতঃ যিনি ঐ সমস্ত কিছুই মানেন না, তিনি পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপন আমার প্রয়োজন, ইহা কখনই বলিতে পারেন না, তাঁহার ঐ কথার কোন অর্থ নাই—উহা অনর্থক। বিপক্ষের সম্বন্ধ জ্ঞাপক প্রভৃতি পদার্থ অবলম্বন করিয়া বিপক্ষের মতানুসারেও তিনি বিপক্ষকে কিছু জ্ঞাপন করিতে পারেন না। কারণ, বিপক্ষ যাহাকে প্রমাণ বলেন, শূন্যবাদী তাহা অবলম্বন করেন না। তিনি বাহা প্রমাণ বলিয়া বিপক্ষের নিকটে উল্লেখ করেন, বিপক্ষ তাহা প্রমাণ বলেন না, তাহা মানেন না, তিনি নিজেও তাহা মানেন না। অন্ততঃ পরপক্ষ-প্রতিবেদ—বাহা তাঁহার জ্ঞাপনীয়, বাহা জ্ঞাপন তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার বিপক্ষের অসম্বন্ধ পদার্থ, তিনিও তাহাকে একটা পদার্থ বলিয়া মানেন না, তিনি যে শূন্যবাদী, তিনি যে কোন পদার্থই মানেন না, সুতরাং বাহা বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয় পক্ষেরই অসম্বন্ধ অর্থাৎ বাহা কেহই মানেন না, তাহার জ্ঞাপন কখনই হইতে পারে না। সুতরাং পরপক্ষ-প্রতিবেদ জ্ঞাপনই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এ কথা শূন্যবাদী কিছুতেই বলিতে পারেন না ; তিনি ঐরূপ বলিলে উদ্ভূতের দ্বারা উপেক্ষিত হইবেন ; সুতরাং তাঁহার স্বপক্ষ স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, নীরব থাকিতে হইবে।

ফলতঃ শূন্যবাদীর বিচার করিতে হইলে তাঁহার জ্ঞাপনীয় পদার্থ তাঁহাকে মানিতেই হইবে, সুতরাং ঐটি তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে এবং জ্ঞাপনের অস্ত্র জ্ঞাপক প্রভৃতি

পদার্থও বাহ্য বাহ্য আবশ্যক, সেগুলিও তাঁহার সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হইবে। তাহা হইলে বিতণ্ডার স্বপক্ষ স্বীকার করিতে হইল এবং ঐ স্বপক্ষ-সিদ্ধিই পরিশেষে বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহাও আসিয়া পড়িল। সুতরাং শূন্যবাদীর নিজ মত টিকিল না, তিনি তাঁহার মতে বৈতণ্ডিক হইতে পারিলেন না। তাহা হইলে শূন্যবাদীর কথাও পূর্বের জায়গায় হইল, শূন্যবাদী বিতণ্ডার প্রয়োজন স্বীকার করায় পূর্বোক্ত “নিম্নপ্রয়োজন বিতণ্ডাবাদী”র মতের সহিত তাঁহার মত ঠিক এক না হইলেও ফলে উহা একরূপই হইল। কারণ, তাঁহার মতেও পূর্বোক্ত দোষ অপরিহার্য, তাই ভাব্যকার বলিয়াছেন—“এতদপি তাদৃগেব”।

শূন্যবাদী বৈতণ্ডিককে লক্ষ্য করিয়া ভাব্যকার আরও একটি দোষ বলিয়াছেন যে, শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক তাঁহার বিতণ্ডা নামক বাক্যসমূহের অবশ্য প্রতিপাদ্য স্বীকার করিবেন। কারণ, প্রতিপাদ্যহীন উক্তি প্রলাপমাত্র, উহা বাক্যই হয় না, সুতরাং বিতণ্ডা হইতে পারে না। যে উক্তির কোন প্রতিপাদ্যই নাই, তাহা প্রলাপ ভিন্ন আর কি হইবে? উহা অনর্থক, শূন্যবাদী ঐরূপ প্রলাপ বলিলে তাহা কেহ শুনিবে না, সভ্য-সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে না। সুতরাং শূন্যবাদী তাঁহার বিতণ্ডাবাক্যের অবশ্য প্রতিপাদ্য স্বীকার করিবেন। শূন্যবাদী বিতণ্ডাবাক্যের দ্বারা তাঁহার বিপক্ষের হেতুকে অসিদ্ধ, অব্যভিচারী, অথবা বিরুদ্ধ—ইত্যাদিরূপে চুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, সুতরাং বিপক্ষের হেতুর অসিদ্ধত্ব প্রত্নতি দোষই শূন্যবাদীর বাক্যের প্রতিপাদ্য। তিনি ঐ প্রতিপাদ্য স্বীকার করিলে ঐগুলি তাঁহার স্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে, এবং বিতণ্ডা-বাক্যের দ্বারা উহা প্রতিপাদন করিলে ফলতঃ উহার সংস্থাপন করাই হইবে, এবং অসিদ্ধত্ব প্রত্নতি যে হেতুর দোষ, ইহাও তাঁহাকে মানিতে হইবে, এবং তাহাও প্রমাণাদির দ্বারা সাধন করিতে হইলে স্বপক্ষের স্থাপনা আসিয়া পড়িবে। ফলতঃ যে ভাবেই হউক, স্বপক্ষের স্বীকার এবং সংস্থাপন আসিয়া পড়ায় শূন্যবাদীর বিচার বিতণ্ডা হইতে পারে না, শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না; সুতরাং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, বিতণ্ডার বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ-স্বীকার আছে। কিন্তু বৈতণ্ডিক বিচারস্থলে প্রমাণাদির দ্বারা তাঁহার সংস্থাপন করেন না, তিনি কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডনই করেন। ফলে স্বপক্ষ সিদ্ধ হউক বা না হউক, পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই তিনি কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করেন। পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই ঐ বিতণ্ডার প্রয়োজন। মূলকথা, বিতণ্ডা নিম্নপ্রয়োজন নহে, সুতরাং সর্বকর্ম, সর্ববিজ্ঞা প্রয়োজন-ব্যাপ্ত, এই পূর্বকথা ঠিকই বলা হইয়াছে।

বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষায় স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য শেষে ভাব্যকার শূন্যবাদীর কথাও তুলিয়াছেন। কারণ, শূন্যবাদী স্বপক্ষ-সিদ্ধিকে বিতণ্ডার প্রয়োজন বলেন নাই, তাঁহার মত খণ্ডন না করিলে ভাব্যকারের বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, স্বপক্ষসিদ্ধিই যে বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তে শূন্যবাদীর প্রতিবাদ থাকিয়া যায়, তাই পরে শূন্যবাদীর মতানুসারে তাঁহার বিচারের বিতণ্ডা খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বে

প্রমাণাদিপদার্থবাদীদিগের মধ্যে বাহার নিপ্রয়োজন-বিতণ্ডাবাদী ছিলেন, তাহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। “তাৎপর্যপরিভুক্তি”র প্রকাশ-টীকাকার বর্দ্ধমান এই কথা স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাতেও সেই ভাবই পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের সন্দর্ভের ভাবেও ইহা বুঝা যায়। উদ্ধৃতকর এবং উদয়নের সন্দর্ভের দ্বারা একই শৃঙ্গবাদীকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার সব কথা বলিয়াছেন, ইহাও মনে আসে। সুদীপণ ঐ সকল গ্রন্থের সর্বাংশ দেখিয়া ইহার সমালোচনা করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সন্দর্ভের দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থ-সন্দর্ভও অতি দ্রুত ভাবগর্ভ, বহু পরিশ্রম ও বহু চিন্তা করিয়া তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে।

ভাষ্যে ‘যেন জ্ঞাপ্যতে যচ্চ’—এই স্থলে ‘যচ্চ’ এই কথার ‘জ্ঞাপ্যতে’ এই কথার সহিতই যোজনা বুঝিতে হইবে। সর্বত্র ‘যৎ’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় শেষে ‘তৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়া “তানি প্রতিপত্ততে যদি” এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে। “প্রতি”পূর্বক “পদ” ধাতুর অর্থ এখানে স্বীকার। এখানে অনেক পাঠান্তরও দেখা যায়। অনেক পুস্তকে ‘যচ্চ জ্ঞাপ্যতে, এতচ্চ প্রতিপত্ততে যদি’, এইরূপ পাঠ আছে। এ পাঠে সহজেই অর্থ বোধ হয়। ভাষ্যের শেষ-বর্তী ‘ইতি’ শব্দটি ‘প্রয়োজন’ পদার্থ ব্যাখ্যার সমাপ্তিসূচক। এইরূপ বাক্যসমাপ্তি সূচনার জন্তও ভাষ্যকার প্রায় সর্বত্র ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এগুলি অনুবাদে গৃহীত হইবে না।

ভাষ্য। অথ দৃষ্টান্তঃ, প্রত্যক্ষবিষয়োহর্থো দৃষ্টান্তঃ, যত্র লৌকিক-পরীক্ষাকাণাং দর্শনং ন ব্যাহন্ততে। স চ প্রমেয়ঃ, তস্মৈ পৃথগ্বেচনঞ্চ—তদা-শ্রয়াবনুমানাগমো, তস্মিন্ সতি স্মাতামনুমানাগমাবসতি চ ন স্মাতাং। তদাশ্রয়া চ স্মায়প্রবৃতিঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন চ পরপক্ষপ্রতিষেধো বচনীয়ো ভবতি, দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষঃ সাধনীয়ো ভবতি। নাস্তিকশ্চ দৃষ্টান্ত-মভ্যুপগচ্ছন্নাস্তিকত্বং জহাতি, অনভ্যুপগচ্ছন্ কিং সাধনঃ পরমুপালভে-তেতি। নিরুক্তেন চ দৃষ্টান্তেন শক্যমভিধাতুং ‘সাধ্যসাধন্যাত্তদ্ব্যবহারী দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ,’ ‘তদ্বিপৰ্য্যয়াদ্বা বিপরীত’মিতি।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্ত, প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ দৃষ্টান্ত। ফলিতার্থ এই যে—যে পদার্থে লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের জ্ঞান অব্যাহত হয় অর্থাৎ যে পদার্থে বোদ্ধা ও বোধয়িতার বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, (তাহা দৃষ্টান্ত)। তাহাও প্রমেয়, সেই দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, অনুমান-প্রমাণ ও শব্দ-প্রমাণ সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত

তাহাদিগের নিমিত্ত । বিশদার্থ এই যে—সেই দৃষ্টান্ত থাকিলে অনুমান ও শব্দ-প্রমাণ থাকিতে পারে, না থাকিলে থাকিতে পারে না, এবং জ্ঞাপ্রবৃত্তি অর্থাৎ পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যরূপ জ্ঞায়ের প্রকাশ সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত তাহার মূল । এবং দৃষ্টান্তের বিরোধের দ্বারা পরপক্ষ-প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষ-সাধনের প্রতিষেধ বচনায় হয় অর্থাৎ বলিতে পারা যায় অথবা দূষিত করিতে পারা যায়, এবং দৃষ্টান্তের সমাধির দ্বারা অর্থাৎ অবিরোধের দ্বারা স্বপক্ষ সাধনীয় হয়, (সাধন করা যায়) এবং নাস্তিক অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় যাহারা পদার্থ-মাত্রকেই যে ক্ষণে উৎপন্ন, তাহার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয় বলেন, তাঁহারা দৃষ্টান্ত স্বীকার করিলেই নাস্তিকত্ব ত্যাগ করেন অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট কোন পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলেই এবং সে জ্ঞাত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকাল পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলেই তাহাদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ ত্যাগ করিতে হয় । দৃষ্টান্ত স্বীকার না করিলে (নাস্তিক) কোন সাধনবিশিষ্ট হইয়া পরকে অর্থাৎ পরপক্ষের সাধনকে প্রতিষেধ করিবেন ?

এবং নিরুক্ত অর্থাৎ পূর্বের যাহার লক্ষণ বলিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা (মহর্ষি) “সাধাসাধর্ম্যাস্তক্ষর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ,” “তদ্বিপর্য়য়াঘা বিপরীতঃ” (এই দুইটি সূত্র ১অং, ৩৬৩৭) বলিতে পারিবেন, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ কি, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলে মহর্ষি পরে যে উদাহরণ-বাক্যের দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন না । কারণ, দৃষ্টান্ত না বুঝিলে সে লক্ষণ বুঝা যায় না ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহার পৃথক্ উল্লেখের কারণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন । প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ-দৃষ্টান্ত—ভাষ্যকারের এই প্রথম কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, দৃষ্টান্তবিষয়ে মূল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ, দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মূলক, এই জ্ঞানই উহার নাম দৃষ্টান্ত । প্রত্যক্ষ পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহা উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে না । কারণ, অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থকেও মহর্ষি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । তাৎপর্য্যটীকারের শেষে বলিয়াছেন যে, ‘প্রত্যক্ষমূলত্বাঘা প্রত্যক্ষো দৃষ্টান্তঃ’ । দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষমূলক, প্রত্যক্ষ স্থলে যেমন দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ দৃষ্টান্তেরও দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না । দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান নির্বিকার ; সেকরূপ না হইলে তাহা দৃষ্টান্তই হয় না ; এই সকল কথা সূচনার জন্যই ভাষ্যকার প্রথমে ঐকরূপ কথা বলিয়াছেন এবং উহারই ফলিতার্থ বর্ণনপূর্বক শেষে মহর্ষি হজ্রাহসারে দৃষ্টান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন । যিনি যে বিষয়ে বিজ্ঞ নহেন, প্রাচীনগণ তাহাকে সেই বিষয়ে বলিতেন ‘লৌকিক’ । যিনি যে বিষয়ে বিজ্ঞ, তাহাকে সেই

বিষয়ে বলিতেন ‘পরীক্ষক’। যিনি বস্তু বিচারপূর্বক অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনিই ত পরীক্ষক। আর যিনি পরীক্ষকের নিকট হইতে বুঝেন, তিনিই লৌকিক। ফলকথা, লৌকিক বলিতে বোঝা, পরীক্ষক বলিতে বোধ্যিতা। এক পক্ষ লৌকিক, অপর পক্ষ পরীক্ষক—এই উভয় ব্যক্তির যে পদার্থে বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হইবে, তাহাই দৃষ্টান্ত পদার্থ, ইহাই স্বজ্ঞকারের তাৎপর্য্যার্থ নহে। কারণ, অনেক পণ্ডিতমাত্র-বেদ্য পদার্থকেও (ময় ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য, পরমাণুর শ্রামরূপের অনিত্যতা প্রভৃতি) স্বজ্ঞকার মহর্ষি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল পদার্থ যিনি বুঝেন, তাহাতে বাহার বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে লৌকিক বলা যায় না। ঐ সকল পদার্থ কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য। স্মরণ্য বুঝিতে হইবে যে, কোন স্থলে লৌকিক ও পরীক্ষকদিগের এবং কোন স্থলে কেবল লৌকিকদিগের এবং কোন স্থলে পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থ বোঝা ও বোধ্যিতার বুদ্ধির অবিরোধের হেতু অর্থাৎ যে পদার্থের উল্লেখ করিলে উভয় পক্ষের মত-বৈবম্য বাইয়া মতের সাম্যই উপস্থিত হইতে পারে, এইরূপ পদার্থ ‘দৃষ্টান্ত’। এইরূপ পদার্থমাত্রই দৃষ্টান্ত—ইহা বুঝিতে হইবে না, দৃষ্টান্ত হইলে তাহা এইরূপই হইবে, ঐরূপ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। (দৃষ্টান্ত-স্বজ্ঞ দ্রষ্টব্য)।

এই দৃষ্টান্ত পদার্থকে ভাষ্যকার প্রমেয় বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত প্রমেয় কিরূপে? মহর্ষি-কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখা যায় না? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। মনে হয়, উদ্যোতকর ইহা মনে করিয়াই এখানে বলিয়াছেন—‘সৌহৃদ্যঃ দৃষ্টান্তঃ প্রমেয়মুপলব্ধি-বিষয়ত্বাৎ’। উদ্যোতকরের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, মহর্ষি গোতম তাঁহার পরিভাষিত আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয়ের মধ্যে যখন বুদ্ধি বা উপলব্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ঐ বুদ্ধির বিষয় পদার্থমাত্রই সামান্য প্রমেয় বলিয়া তাঁহারও সম্মত। যাহা প্রমাণ-জনা উপলব্ধির বিষয়, সামান্যতঃ তাহাকেই প্রমেয় বলা হয়। মহর্ষি বিশেষ কারণে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিলেও সামান্য প্রমেয় আরও অসংখ্য আছে, সেগুলিকে তিনিও প্রমেয় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। উদ্যোতকর ‘নবম-স্বজ্ঞভাষ্য-বার্ত্তিকে’ এ কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারও মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয় ভিন্ন আরও অসংখ্য প্রমেয় পদার্থ আছে, এ কথা বলিয়াছেন (নবম স্বজ্ঞভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এখন যদি উপলব্ধির বিষয় পদার্থ বলিয়া দৃষ্টান্ত পদার্থও মহর্ষি-সম্মত প্রমেয় হয় এবং মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়ের মধ্যেও অনেক দৃষ্টান্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত পদার্থের আর পৃথক্ উল্লেখ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন? এতদ্বন্ধেই ভাষ্যকার দৃষ্টান্তরূপে দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন। সমস্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ মহর্ষির পরিভাষিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যেই আছে; স্মরণ্য উহা প্রমেয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নহে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও তাহা বুঝা যায় না। তাহা

হইলে উদ্যোতকর দৃষ্টান্তের প্রমেয়ত্ববিষয়ে উপলব্ধিবিষয়কে হেতু বলিতে যাইবেন কেন ? বস্তুতঃ সুখাদি 'প্রয়োজন' এবং অনেক 'দৃষ্টান্ত', 'সিদ্ধান্ত' ও 'হেতুভাস' মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়ের মধ্যে নাই, সুতরাং মহর্ষি-কথিত বিশেষ প্রমেয়গুলিতেই সংশয়াদি সকল পদার্থ অন্তর্ভূত আছে, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যেই সে সকল পদার্থ আছে, উহাদিগকে বলাতেই সংশয়াদি সমস্ত পদার্থ বলা হইয়াছে, এ কথা ভাষ্যকার বলিতে পারেন না। কিন্তু ভাষ্যকার প্রথমে পূর্বপক্ষ প্রদর্শনকালে বলিয়া আসিয়াছেন যে, 'সংশয়াদি পদার্থগুলি যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয়-সমূহে অন্তর্ভূত থাকায় উহারা অতিরিক্ত পদার্থ নহে,' সুতরাং বুদ্ধিতে হইবে, ভাষ্যকার সেখানে মহর্ষি-কথিত বিশেষ প্রমেয়গুলিকেই কেবল লক্ষ্য করেন নাই, মহর্ষির সমস্ত উপলব্ধির বিষয় সামান্য প্রমেয়গুলিকেও তিনি সেখানে প্রমেয় শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়, সেই জন্তই ভাষ্যকার সেখানে 'প্রমেয়েষু' এইরূপ বহুবচনান্ত "প্রমেয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষির পরিভাষিত বিশেষ প্রমেয়গুলিই তাঁহার ঐ প্রমেয় শব্দের প্রতিপাদ্য হইলে তিনি একবচনান্ত প্রমেয় শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন। মহর্ষি প্রমেয়সূত্রে (নবম সূত্রে) একবচনান্ত প্রমেয় শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, তদনুসারে ভাষ্যকারও সেইরূপ করেন নাই কেন ? ইহাও ভাবিতে হইবে। ভাষ্যকার মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়বিশেষে অন্তর্ভাবের কথা বলিতে অস্ত্র একবচনান্ত প্রমেয় শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তকে প্রমেয় বলিতে একবচনান্ত প্রমেয় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সে সব স্থলে তাহাই করিতে হইবে। সামান্য প্রমেয় বলিয়া বুঝাইতেও ক্রীবলিঙ্গ একবচনান্ত প্রমেয় শব্দেরই প্রয়োগ করিতে হয়। অবশ্য একবচন বহুবচনাদি প্রয়োগের দ্বারা সর্বত্র বক্তার তাৎপর্য নির্ণয় না হইলেও ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত 'প্রমেয়েষু' এই স্থলে বহুবচনের দ্বারা সামান্য, বিশেষ সর্ববিধ প্রমেয়ই ভাষ্যকারের ঐ স্থলে প্রমেয় শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহা বুদ্ধিতে পারি ; তাহাতে বহুবচনের প্রকৃত সার্থকতাও হয়। তবে ঐরূপ বুদ্ধিবার পক্ষে প্রকৃত কারণ এই যে, সংশয়াদি পদার্থগুলি প্রত্যেকেই মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়ের মধ্যে নাই ; সুতরাং ভাষ্যকার তাহা বলিতে পারেন না। যেগুলি ঐ প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হয় নাই, তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ কর্তব্য। সুতরাং তদ্বিষয়ে অস্ত্র কারণ প্রদর্শন সম্ভব হয় না। আর যদি পূর্বপক্ষ ভাষ্যে বহুবচনান্ত প্রমেয় শব্দের দ্বারা মহর্ষির কণ্ঠোক্ত বিশেষ প্রমেয়গুলি এবং বুদ্ধিরূপ প্রমেয়ের বিষয় বলিয়া সূচিত স্বীকৃত সামান্য প্রমেয়গুলিকে ভাষ্যকার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সংশয়াদি পদার্থগুলি সমস্তই যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয়ে অন্তর্ভূত, এ কথা বলিতে পারেন, অর্থাৎ তাহা হইলে সংশয়াদি পদার্থের কতকগুলি বিশেষ প্রমেয়ে এবং কতকগুলি সামান্য প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হওয়ার উহারা প্রমেয়সমূহে অন্তর্ভূত, এ কথা বলা যায়। মনে হয়, এই তাৎপর্য্যও ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন—“যথাসম্ভবম্”। অর্থাৎ যে প্রকারে অন্তর্ভাব সম্ভব হয়, সেই প্রকারেই অন্তর্ভাব বুদ্ধিতে হইবে। এবং সামান্য প্রমেয়ে

অন্তর্ভূত দৃষ্টান্তাদির পক্ষে পৃথক্ উল্লেখ বলিতে বৃদ্ধিতে হইবে—বিশেষ করিয়া উল্লেখ। অর্থাৎ সেগুলিও যখন সামান্য প্রেমের মধ্যে স্বীকৃত এবং সূচিত, তখন আবার তাহাদিগের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন? আরও কত কত সামান্য প্রেমের আছে, মহর্ষি ত তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই? ইহাই তাৎপর্য।

আরও দেখিতে হইবে, ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তকে কেবল প্রেমের বলিয়াছেন, প্রেমের অন্তর্ভূত,এরূপ কথা এখানে বলেন নাই। কিন্তু “সংশয়”, “অবয়ব”, “তর্ক” প্রভৃতির কথায় সেখানে বলিয়াছেন—প্রেমে অস্তর্ভূত। কারণ, সেগুলি মহর্ষি-কথিত প্রেমেরপদার্থের মধ্যেই আছে, পূর্বে সামান্য প্রেমের ধরিয়া দৃষ্টান্ত প্রভৃতিকেও প্রেমের অন্তর্ভূত বলিলেও এখানে তত দূর বলেন নাই। দৃষ্টান্তের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রেমের, কতকগুলি সামান্য প্রেমের, এই তাৎপর্যো দৃষ্টান্তকে কেবল প্রেমের বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাহার বক্তব্য প্রকাশ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত পদার্থ সংশয়, তর্ক, অবয়ব প্রভৃতির জায় মহর্ষি-কথিত প্রেমের “পদার্থে” অন্তর্ভূত বলিয়া বুলিলে ভাষ্যকার সংশয় প্রভৃতির জায় দৃষ্টান্তকে প্রেমের অন্তর্ভূত, এইরূপ বলেন নাই কেন? উদ্যোতকরই বা দৃষ্টান্ত, প্রেমের কেন—ইহা বুঝাইতে ‘উপলব্ধিবিরহাৎ’ এইরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? সুদীপণ এই সকল কথাগুলি ভাবিয়া ইহার সমালোচনা করিবেন।

দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ উল্লেখ কেন হইয়াছে, ভাষ্যকার তাহার কতকগুলি কারণ বলিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য এই যে, দৃষ্টান্ত অহুমান-প্রমাণের একটা নিমিত্ত, দৃষ্টান্ত ব্যতীত অহুমান-প্রমাণ থাকিতেই পারে না। যে হেতুর দ্বারা যে পদার্থের অহুমান করিতে হইবে, সেই হেতুতে সেই অহুমের পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্ম অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে যেখানে থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই অহুমের পদার্থটি থাকে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার জন্ম দৃষ্টান্ত আবশ্যক, নচেৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হওয়ায় অহুমান হইতে পারে না। এইরূপ শব্দ-প্রমাণেও দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয়। কারণ, সর্বপ্রথম কোন শব্দ শ্রবণ করিলেও শব্দ বোধ হয় না। শব্দ বোধে শব্দ ও অর্থের সংকতরূপ সঞ্চ-জ্ঞান আবশ্যক, তাহাতে দৃষ্টান্ত আবশ্যক। কারণ, লোক সমস্ত পূর্জ্ঞাত পদার্থকেই অপর ব্যক্তিকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে; সুতরাং পূর্ক বোধানু-সারে দৃষ্টান্তের সাহায্যেই শব্দ ও অর্থের সঞ্চ-জ্ঞান হয়, নচেৎ প্রথম শব্দ শুনিয়াই শব্দ বোধ হইত। যে শব্দের যে অর্থ যে কোন উপায়ে পূর্কে বুঝিয়াছি, তদনুসারেই আমরা শব্দ প্রয়োগ করি এবং পূর্কদৃষ্টান্তে পূর্কবৎ তাহার অর্থবোধ করি; সুতরাং দৃষ্টান্ত না থাকিলে শব্দপ্রমাণও থাকিতে পারে না এবং প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বাক্ত জায় দৃষ্টান্তমূলক, দৃষ্টান্ত ব্যতীত ঐ জায় প্রয়োগ হইতেই পারে না, জায়ের তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ বাক্য দৃষ্টান্ত ব্যতীত বলা যায় না। ভাষ্যকার প্রথমে অহুমান-প্রমাণকে দৃষ্টান্তমূলক বলিয়াছেন; সুতরাং পরবর্তী জায় শব্দের দ্বারা পঞ্চাবয়বাক্ত বাক্য-রূপ জায়ই বৃদ্ধিতে হইবে। অহুমানরূপ জায়কে পুনরায় দৃষ্টান্তমূলক বলিলে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে, সুতরাং পরবর্তী জায় শব্দ পঞ্চাবয়বাক্ত বাক্যরূপ জায় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধিতে হইবে। তাৎপর্যটিকারও তাহাই বলিয়াছেন। এবং স্বপক্ষ সমর্থন এবং পরপক্ষ সাধনের

প্রতিবেদে অর্থাৎ খণ্ডনে দৃষ্টান্ত নিতান্ত আবশ্যক। এবং দৃষ্টান্তের বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ক্ষণভঙ্গবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করা যায়। কারণ, ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বস্তু-মাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ এক ক্ষণের অধিক কাল কোন পদার্থই স্থায়ী নহে, সুতরাং তিনি কোন বস্তুকেই দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিতে পারেন না। তিনি যাহাকে দৃষ্টান্ত বলিবেন, তাহা তাহার বলিবার পূর্বে বিনষ্ট হওয়ার, সে পদার্থ তখন আর থাকে না। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলিয়া বুঝান যায় না। দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিলেও ক্ষণভঙ্গবাদী পরমক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত দেখাইতে গেলেও আস্তিকের স্থিরবাদ স্বীকার করিয়া নাস্তিকতা ত্যাগ করিতে হয় (১° স্বত্র দ্রষ্টব্য)। কল কথা, দৃষ্টান্তের বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায়কে নিরস্ত করিতে পারা যায়। তাহাকে নিরস্ত করাও আস্তিকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের আরও একটি হেতু আছে, তাহা অস্ত্র প্রকার; এ অস্ত্র সেই হেতুটিকে শেষে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই শেবোক্ত হেতুটি এই যে, মহর্ষি জ্ঞানের তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ-বাক্যের যে দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, ঐ লক্ষণ দৃষ্টান্ত-বাচিত, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত না বুঝিলে তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত কি, তাহা মহর্ষির পূর্বে বলিতে হয়, তাহা বলিতে হইলেই দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ করিতে হয়। কারণ, উদ্দেশ্য ব্যতীত লক্ষণ বলা যায় না, সুতরাং দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ পূর্বক তাহার লক্ষণ বলিয়া মহর্ষি উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং বলিতে পারিয়াছেন। ঐ দুইটি লক্ষণ-স্বত্র ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদাহরণের অর্থ যথাস্থানেই বিবৃত হইবে। কোন পুস্তকে ‘নিরুক্তে চ দৃষ্টান্তে’, এইরূপ পাঠ আছে। দৃষ্টান্ত নিরুক্ত অর্থাৎ নিরূপিত হইলেই মহর্ষি উক্ত স্বত্রদ্বয় বলিতে পারেন, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে ভাষ্যার্থ।

ভাষ্যে ‘তত্ত্ব পৃথগ্‌বচনক্’,—এই স্থলে ‘চ’ শব্দের অর্থ হেতু। পৃথগ্‌বচনের হেতুগুলি উহার পরেই বলা হইয়াছে। উদয়নের “কুসুমাজলিকারিকা” প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই হেতু অর্থে ‘চ’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অনেক প্রবোধ টীকাকার “চো হেতৌ” এইরূপ কথা অনেক স্থলে লিখিয়াছেন। এই ভাষ্যে অনেক স্থলে ‘চ’ শব্দ এবং ‘যলু’ শব্দ হেতু অর্থে প্রযুক্ত আছে। আবার অবধারণ অর্থেও ‘চ’ শব্দ, ‘যলু’ শব্দ অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত অব্যয়ের দ্বারা অনেক স্থলে অনেক গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়, সে অর্থগুলি না বুঝিলে বাক্যার্থবোধ ঠিক হয় না। এজন্ত ঐ সকল শব্দের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এখানে দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের হেতু উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার শেষে যে ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐ ইতি শব্দের দ্বারাও হেতু অর্থ বুঝা যাইতে পারে, তাহা বুঝিলেও এখানে ক্ষতি নাই। ‘ইতি’ শব্দের ‘হেতু’ অর্থ কোথায় কথিত আছে। এবং অনেক স্থানে এই ভাবেও হেতু অর্থে “ইতি” শব্দের প্রয়োগ আছে। তবে শেষবর্তী “ইতি” শব্দ সমাপ্তিচক্‌ই প্রায় দেখা যায়।

ভাষ্য। অন্ত্যয়মিত্যনুজ্জায়মানোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চ প্রমেয়ঃ, তস্য পৃথগ্বচনং সংস্কৃত্য সিদ্ধান্তভেদেষু বাদজল্পবিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে নাতোহ-
ন্যথেষতি।

অনুবাদ। “এই পদার্থ আছে” এই প্রকারে অর্থাৎ “ইহা” এবং “এইপ্রকার” এইরূপে যে পদার্থ স্বীকার করা হয়, সেই স্বীকৃত্যমান পদার্থ “সিদ্ধান্ত”। সেই সিদ্ধান্তও প্রমেয়। সিদ্ধান্তের ভেদগুলি (মহর্ষি-কথিত চতুর্বিধ সিদ্ধান্ত) থাকিলে “বাদ”, “জল্প” ও “বিতণ্ডা” প্রবৃত্ত হয়, ইহার অন্ত্যায় অর্থাৎ সিদ্ধান্তের ভেদগুলি না থাকিলে প্রবৃত্ত হয় না, এই জন্ম সেই সিদ্ধান্তের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে।

টিপ্পনী। নিশ্চিত শাস্ত্রার্থকে “সিদ্ধান্ত” বলে। উচ্ছোতকর শাস্ত্রার্থনিষ্ঠকে “সিদ্ধান্ত” বলায় উহা “বুদ্ধি” পদার্থ বলিয়া মহর্ষি-পরিভাষিত “প্রমেয়ে”ই উহার অন্তর্ভাব হইয়াছে, এ জন্ম উচ্ছোতকর এখানে সিদ্ধান্তকে “প্রমেয়ে অন্তর্ভূত” এই কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার-স্বীকৃত পদার্থকে সিদ্ধান্ত বলায় তিনি এখানে দৃষ্টান্ত পদার্থের স্থায় “সিদ্ধান্তকে”ও কেবল “প্রমেয়” ইহাই বলিয়াছেন। “দৃষ্টান্ত” পদার্থকে যে ভাবে ভাষ্যকার পূর্ণপক্ষ প্রদর্শনকালে প্রমেয়ে অন্তর্ভূত বলিয়াছেন, “সিদ্ধান্ত” পদার্থকেও সেই ভাবে প্রমেয়ে অন্তর্ভূত বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তমাত্রই যেমন মহর্ষি-পরিভাষিত “প্রমেয়ে”র মধ্যে নাই, সিদ্ধান্ত মাত্রও তজ্জপ মহর্ষি-পরিভাষিত “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে নাই। ঐধর সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, কিন্তু তিনি গোতম-পরিভাষিত “প্রমেয়” পদার্থগুলির মধ্যে নাই। ঐরূপ আরও বহু বহু সিদ্ধান্ত ঐ প্রমেয়ের মধ্যে নাই, সুতরাং “দৃষ্টান্ত” পদার্থের স্থায় “সিদ্ধান্ত” পদার্থও সামান্য প্রমেয় ও বিশেষ প্রমেয়ে যথাসম্ভব অন্তর্ভূত আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা দৃষ্টান্তের স্থলেই বলা হইয়াছে।

মহর্ষি “সিদ্ধান্ত”কে চতুর্বিধ বলিয়াছেন। সেই চতুর্বিধ সিদ্ধান্ত না থাকিলে কোন বিচারই হইতে পারে না। তন্মধ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, মহর্ষি যাহাকে “সর্বসম্মতসিদ্ধান্ত” বলিয়াছেন, তাহা না থাকিলে অর্থাৎ তাহা একেবারেই না মানিলে কিরূপে বিচার হইবে? যদি ধর্ম্মীতে কোন বিবাদ না থাকে, তবে তাহা নিত্য, কি অনিত্য, দ্রব্য, কি গুণ, “পরিণাম”, কি “বিবর্ত্ত”, এইরূপে তাহার ধর্ম্মবিচার হইতে পারে। এবং যাহা কোন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, মহর্ষি যাহাকে “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত” বলিয়াছেন, তাহা না থাকিলে এবং তাহা না জানিলে কিরূপে বিচার হইবে? সকলেই একমত হইলে অথবা কেহ বিরুদ্ধ মত না জানিলে বিচার হইতে পারে না। এইরূপ বিচারে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তেরই বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, তজ্জন্ম মহর্ষি সিদ্ধান্তের বিশেষ করিয়া উল্লেখ এবং তাহার প্রকার-ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন।

এবং বিশেষরূপে না হইলেও সিদ্ধান্তরূপে দ্বৈত প্রভৃতি পদার্থেরও তাহাতে উল্লেখ হইয়া গিয়াছে। অতীত কথা “সিদ্ধান্ত” প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। সাধনীয়ার্থস্ত যাবতি শব্দসমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে তস্ত পঞ্চাবয়বাঃ প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাবয়বা উচ্যন্তে। তেষু প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা, হেতুরনুমানঃ, উদাহরণং প্রত্যক্ষং, উপমানমূপনয়ঃ, সর্বেষামেকার্থসমবায়ো সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি। সোহয়ং পরমো ন্যায় ইতি। এতেন বাদজল্পবিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে, নাতোহন্থথেনি। তদাশ্রয়া চ তদ্ব্যবস্থা। তে চৈতে-
হবয়বাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্তঃ প্রমেয়েহন্তভূতা এবমর্থং পৃথগুচ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। যতগুলি শব্দসমূহে (বাক্যসমূহে) সাধনীয় পদার্থের সিদ্ধি অর্থাৎ বাস্তব ধর্ম পরিসমাপ্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়, সেই বাক্য-সমষ্টির প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, “উদাহরণ”, “উপনয়”, “নিগমন”,—এই পাঁচটি অবয়ব, “সমূহ”কে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া “অবয়ব” বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ পঞ্চ বাক্যসমষ্টির এক একটি অংশ বা বাষ্টি প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য, এ জ্ঞাত তাহাদিগকে “অবয়ব” বলা হইয়াছে।

সেই পঞ্চাবয়বে প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণেরই মেলন আছে। (কিরূপে আছে, তাহা বলিতেছেন) “প্রতিজ্ঞা” শব্দপ্রমাণ, “হেতু” অনুমান-প্রমাণ, “উদাহরণ” প্রত্যক্ষ প্রমাণ, “উপনয়” উপমান প্রমাণ,—সকলের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি অবয়বের এবং তাহাদিগের মূলভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের একার্থসমবায়ো অর্থাৎ একটি প্রতিপাদ্যের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে অথবা উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধিতে সামর্থ্য প্রদর্শন অর্থাৎ পরস্পর সাক্ষাৎকার প্রদর্শক বাক্য “নিগমন”। ইহা সেই পরম “ন্যায়”, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যের সমষ্টি সর্বপ্রমাণমূলক বলিয়া ইহাকে পরম অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধবাদীর প্রতিপাদক “ন্যায়” বলে। এই ন্যায়ের দ্বারা বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা (ত্রিবিধ বিচার) প্রবৃত্ত হয়, ইহার অস্ত্রাণ্য হয় না, অর্থাৎ আর কোনও প্রকারে ঐ বিচার হয় না, কদাচিৎ বাদ-বিচার হইলেও জল্প ও বিতণ্ডা কখনই হয় না এবং তত্ত্বের বাবস্থা অর্থাৎ ইহাই তত্ত্ব, অতীত তত্ত্ব নহে, এইরূপ নিয়ম বা নির্ণয় সেই ন্যায়ের আশ্রিত (ন্যায়ের অধীন)।

সেই এই অবয়বগুলি (প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব) শব্দবিশেষ বলিয়া প্রমেয়ে (মহর্ষি-কথিত প্রমেয় পদার্থে) অন্তর্ভূত হইয়াও এই নিমিত্ত অর্থাৎ ইহাদিগের মূলে সমস্ত প্রমাণ আছে,—ইহারা একবাক্য ভাবে মিলিত হইয়া বিরুদ্ধবাদীকে তত্ত্বপ্রতিপাদন করে, তত্ত্বব্যবস্থা ইহাদিগের অধীন, ইত্যাদি কারণে পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। যেমন পরার্থানুমানকে “জ্ঞায়” বলে, ভাষ্যকার পূর্বে তাহাই বলিয়া আসিয়াছেন, তদ্রূপ ঐ পরার্থানুমান “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি “নিগমন”-পর্যন্ত যে পাঁচটি বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, যথাক্রমে প্রযুক্ত ঐ বাক্য-সমষ্টিকেও “জ্ঞায়” বলে। ভাষ্যকারও এখানে তাহাকে “পরম জ্ঞায়” বলিয়া সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের লক্ষণ মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। পরার্থানুমান স্থলে ঐ “জ্ঞায়” নামক বাক্যসমূহে সাধাসিদ্ধি পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহারই এক একটি অংশ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের দ্বারা সাধনীয় পদার্থের বাস্তব ধর্মবিশেষরূপে নিশ্চিত হইয়া যায়। ভাষ্যে “সিদ্ধি” শব্দের দ্বারা বাস্তব ধর্ম এবং “পরিসমাপ্তি” বলিতে তাহার নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। উক্তোক্তকর ও বাচস্পতি মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। যে ধর্মটি সাধন করিতে ইচ্ছা হইবে, ঐ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীই এখানে সাধনীয় পদার্থ, ঐ ধর্মীতে ঐ ধর্মটি বস্তুতঃ থাকিলেই তাহা ঐ ধর্মীর বাস্তব ধর্ম হয়; ঐ বাস্তব ধর্মের নিশ্চয় অর্থাৎ ধর্মীকে সেই ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয়ই জ্ঞায়ের পরিসমাপ্তি বা চরম ফল।

সমষ্টি থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাষ্টি থাকে; ব্যাষ্টি ব্যতীত সমষ্টি হয় না। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত “জ্ঞায়” নামক বাক্য-সমষ্টির অপেক্ষায় ব্যাষ্টি। তাই ঐ সমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতিকে “অবয়ব” বলা হইয়াছে, অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি, ঐ পঞ্চ বাক্য-সমষ্টির এক একটি ব্যাষ্টি বা অংশ, এ জন্ম উহাদিগকে ঐ বাক্যসমষ্টিরূপ জ্ঞায়েরই অবয়ব বলা হইয়াছে। “অবয়ব” শব্দের দ্বারা একদেশ বা অংশ বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভ্রব্যের উপাদান-কারণকেই “অবয়ব” বলে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য জ্ঞায়-বাক্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, কিন্তু উপাদান-কারণ অবয়বগুলি মিলিত হইয়া যেমন একটি অবয়বী ভ্রব্যকে ধারণ করে, তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য মিলিত হইয়া “জ্ঞায়” বাক্যের প্রতিপাদ্য, একটি বিবক্ষিতার্থের প্রতিপাদন করে, তাই উহারা অবয়ব সদৃশ বলিয়া “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐগুলি অবয়ব সদৃশ বলিয়াই উহাতে “অবয়ব” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বে সকল প্রমাণ আছে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার “প্রতিজ্ঞা”কে শব্দপ্রমাণ, “হেতু”-বাক্যকে অনুমান-প্রমাণ, “উদাহরণ”-বাক্যকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এবং “উপনয়ন”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি বাক্যচতুষ্টয়ই যে প্রমাণ, তাহা নহে, ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের মূলে চারিটি প্রমাণ আছে, সেই মূলীভূত প্রমাণ-

চতুষ্ঠয়ে প্রকাশ করিয়াই, ঐ প্রতিজ্ঞাদি বাক্য বস্তুপরীক্ষায় উপযোগী হয়, উহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বস্তুপরীক্ষায় উপযোগী হয় না, হইতে পারে না; কারণ, ঐরূপ কতকগুলি বাক্যমাত্র কোন তত্ত্বনির্ণয় জন্মাইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে, ঐ বাক্যচতুষ্ঠয় উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্ঠয়েরই ব্যাপার, সেই প্রমাণগুলিই ঐরূপ বাক্যের উত্থাপক হইয়া তত্ত্বনির্ণয় সম্পাদন করে এবং সমস্ত প্রমাণের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যকে “পরম ন্যায়” বলা হয়। ফলতঃ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যগুলিই যে প্রমাণ, তাহা নহে। উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াই উহাদিগকে প্রমাণ বলা হইয়াছে। এবং ঐ পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যসমষ্টিকেই বহুবচনান্ত ‘প্রমাণ’ শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়া পূর্বেও বলিয়া আসিয়াছেন—“প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং জ্ঞায়ঃ।” মূলকথা, ‘প্রতিজ্ঞা’ প্রভৃতি বাক্যে ‘আগম’ প্রভৃতি প্রমাণবোধক শব্দের গোণ প্রয়োগ করিয়াই ভাষ্যকার ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বাক্যচতুষ্ঠয়ের মূলে যখন প্রমাণচতুষ্ঠয় আছে, তখন পঞ্চাবয়ব থাকিলেই সেখানে প্রমাণচতুষ্ঠয় বা সর্বপ্রমাণ থাকিল, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। এইরূপ গোণ প্রয়োগ চিরকাল হইতেই আছে। ভাষ্যকারও গোণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রতিজ্ঞাদি বাক্যই বস্তুতঃ চারিটা প্রমাণ নহে, ইহা ভাষ্যকারের পূর্বকথাতোও ব্যক্ত আছে। কারণ, প্রথমতঃ তিনিও “তেব্ প্রমাণসমবায়ঃ” এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। ‘প্রতিজ্ঞা’ প্রভৃতির মূলে ‘আগম’ প্রভৃতি প্রমাণ আছে কিরূপে? যে জন্ম প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বাক্য বস্তুতঃ আগম প্রভৃতি প্রমাণ না হইলেও একেবারে তাহাদিগকে আগম প্রভৃতি প্রমাণই বলা হইয়াছে? ভাষ্যকার এ প্রশ্নের কোন উত্তর এখানে দেন নাই। নিগমনসূত্রে (৩৯ সূত্রে) ইহার হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই ইহার বিস্তৃত প্রকাশ দ্রষ্টব্য। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটা অবয়ব (বাহাদিগকে সর্বপ্রমাণরূপে ধরা হইয়াছে) একবাক্য না হইলে তাহাদিগের একার্থপ্রতিপাদকতা হয় না, তাই উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধি চাই। পরস্পর সাকাক্ষতাই একবাক্যতা এবং ঐ সাকাক্ষতাই প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-চতুষ্ঠয়ের এবং তাহার মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্ঠয়ের ‘সামর্থ্য’ বলিয়া ভাষ্যে কথিত হইয়াছে। ঐ ‘সামর্থ্য’ বা সাকাক্ষতার বোধের জন্ম ‘নিগমন’-বাক্যকে পঞ্চম ‘অবয়ব’রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। নিগমনসূত্রে এ কথারও বিশদ প্রকাশ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাবয়ববাক্য বাক্যরূপ ‘জ্ঞায়’কে ভাষ্যকার ‘পরম’ বলিয়াছেন। উল্লেখ্যতকর ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি কোন একটা প্রমাণ সর্বত্র বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, তাহাকে মানাইতে পারে না, কিন্তু বাক্য-তাবাপন্ন হইয়া সর্বপ্রমাণ মিলিত হইলে বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকেও মানাইতে পারে, সুতরাং ‘জ্ঞায়’র দ্বারা বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপাদন করা যায়, এ জন্ম জ্ঞায় পরম। পরম—কি না বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তির প্রতিপাদক। তাৎপর্যটাকাঙ্কায় এই কথার সমর্থনে বলিয়াছেন যে, যদিও লৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি কোন একটা প্রমাণও বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে মানাইতে

পারে, কিন্তু আত্মনিত্যত্ব, বেদপ্রামাণ্য প্রভৃতি দৃক্‌হ বিষয়ে পারে না ; এ জন্ত তাহা মানাইতে সৰ্ব্বপ্রমাণমূলক হ্রাসকেই আশ্রয় করিতে হয় এবং সেইগুলি প্রতিপাদন করাই হ্রাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং হ্রাসকে 'পরম' বলা ঠিকই হইয়াছে।

অবয়বগুলি বাক্য, সুতরাং শব্দ। মহর্ষি-কথিত প্রমেয়ের মধ্যে 'অর্থ' বা ইঙ্গির্যার্থ আছে, তাহার মধ্যে শব্দ আছে, সুতরাং 'অবয়ব' মহর্ষি-কথিত প্রমেয়েই অন্তর্ভূত হইয়াছে, তবুও তাহার পৃথক্ উল্লেখ কেন? তাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যে "শব্দবিশেষাঃ সন্তাঃ" এখানে হেতুর্থে শব্দ প্রত্যয় বুদ্ধিতে হইবে।

ভাষ্য। তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো ন প্রমাণান্তরং, প্রমাণানামনু-
গ্রাহকস্তদ্বজ্ঞানায় কল্পতে। তস্মাদাহরণং, কিমিদং জন্ম কৃতকেন
হেতুনা নির্বর্ত্যতে? আহোষ্বিদকৃতকেন? অথাকস্মিকমিতি। এব-
মবিজাততদ্বৈধর্থে কারণোপপত্ত্যা উহঃ প্রবর্ততে, যদি কৃতকেন হেতুনা
নির্বর্ত্যতে হেতুচ্ছেদাদুপপন্নোহয়ং জন্মোচ্ছেদঃ। অথাকৃতকেন হেতুনা,
ততো হেতুচ্ছেদশাসক্যাদনুপপন্নো জন্মোচ্ছেদঃ। অথাকস্মিক-
মতোহকস্মিনির্বর্ত্যমানং ন পুনর্নির্সংবর্তীতি নিবৃত্তিকারণং নোপপদ্যতে,
তেন জন্মানুচ্ছেদ ইতি। এতস্মিন্‌স্তর্কবিষয়ে কস্মিনিমিত্তং জন্মেতি
প্রমাণানি প্রবর্তমানানি তর্কেনানুগৃহ্যন্তে। তদ্বজ্ঞানবিষয়স্য বিভাগাৎ
তদ্বজ্ঞানায় কল্পতে তর্ক ইতি। সাহচর্যমিথস্তূতস্তর্কঃ প্রমাণসহিতো
বাদে সাধনাযোপালম্ব্য চার্হস্য ভবতীত্যেবমর্থং পৃথগ্‌চ্যতে প্রমেয়ান্ত-
র্ভূতোহপীতি।

অনুবাদ। তর্ক প্রমাণসংগৃহীত অর্থাৎ কথিত চারিটি প্রমাণের অন্ততম নহে,
প্রমাণান্তরও নহে, প্রমাণগুলির অনুগ্রাহক (সহকারী) হইয়া তদ্বজ্ঞানের নিমিত্ত
সমর্থ হয়। সেই তর্কের উদাহরণ—এই জন্ম কি অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন
হইতেছে? অথবা নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে? অথবা আকস্মিক
অর্থাৎ বিনা কারণে আপনা আপনিই হইতেছে? এইরূপে অনিশ্চিততত্ত্বপদার্থে
কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবহেতুক তর্ক প্রবৃত্ত হয়। (সে বিরূপ
তর্ক, তাহা দেখাইতেছেন) যদি (এই জন্ম) অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া
থাকে, (তাহা হইলে) হেতুর অর্থাৎ সেই নশ্বর হেতুর উচ্ছেদবশতঃ এই
জন্মোচ্ছেদ উপপন্ন হয়। আর যদি নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে থাকে,

তাহা হইলে হেতুর (সেই নিত্য কারণের) উচ্ছেদ অশক্য বলিয়া জন্মের উচ্ছেদ উপপন্ন হয় না। আর যদি (জন্ম) আকস্মিক হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ (বিনা কারণে) উৎপত্তমান জন্ম আর নিবৃত্ত হইবে না। নিবৃত্তির কারণ উপপন্ন হয় না, সুতরাং জন্মের উচ্ছেদ নাই। এই তর্ক বিষয়ে—জন্ম কৰ্ম্ম-নিমিত্তক অর্থাৎ পূর্বকৃত কৰ্ম্মের ফল ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জন্ম; এইরূপে প্রবর্তমান প্রমাণগুলি তর্ক কর্তৃক অনুগৃহীত অর্থাৎ অযুক্ত নিষেধের দ্বারা যুক্ত বিষয়ে অনুজ্ঞাত হয়। তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ের বিভাগ অর্থাৎ যুক্তায়ুক্ত বিচার করে বলিয়া, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়। সেই এই এবস্তৃত তর্ক, প্রমাণ সহিত হইয়া ‘বাদে’ পদার্থের সাধন এবং উপালম্ব অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডনের নিমিত্ত হয়। এই জন্ম প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও পূংক উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। ‘প্রমাণ’ শব্দের দ্বারা যে চারিট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, ‘তর্ক’ তাহার মধ্যে কেহ নহে, নূতন কোন প্রমাণও নহে। কারণ, ‘তর্ক’ তত্ত্বনিষ্ঠারক নহে; তত্ত্বনিষ্ঠারের জন্ত প্রমাণই প্রযুক্ত হয়। ঐ প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইলে তর্ক, যুক্ততবে প্রবর্তমান প্রমাণকে অনুজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ করে। এই তথ্যেই প্রমাণ সম্ভব, ইহাই যুক্ত—এইরূপে প্রমাণ-সম্ভব-প্রযুক্ত তত্ত্ব-বিশেষের অনুমোদনই তর্কের অনুগ্রহ। এইরূপে তর্কানুগৃহীত হইয়া প্রমাণই তত্ত্ব-নিষ্ঠায় জন্মায়; সুতরাং তর্ক প্রমাণের সহকারী, স্বয়ং কোন প্রমাণ নহে; প্রমাণের সহকারী হইয়াই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায়।

জন্মের কারণ অনিত্য হইলে ঐ কারণের বিনাশ হইতে পারে; সুতরাং মুক্তির আশা আছে। জন্মের কারণ নিত্য হইলে তাহার বিনাশ অসম্ভব; সুতরাং জন্মের উচ্ছেদ অসম্ভব। কারণ, জন্মের কারণ চিরকালই থাকিবে, জন্ম-প্রবাহও চিরকাল চলিবে, মুক্তির আশা নাই। জন্ম আকস্মিক হইলেও তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির কারণ না থাকায় মুক্তির আশা থাকে না।—এই তর্ক বিষয়ে “জন্ম-কৰ্ম্ম-নিমিত্তকং বৈচিত্র্যং” ইত্যাদি প্রকারে প্রমাণগুলি প্রবৃত্ত হইলে তর্ক তাহার সহকারী হইয়া থাকে। প্রমাণের দ্বারা বুঝা গেল, জন্ম কৰ্ম্মজন্ত অর্থাৎ পূর্বকৃত কৰ্ম্মফল—ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-নিমিত্তক,—কারণ, জন্ম বিচিত্র। ইহাতে সংশয় হইলে তর্ক তাহা নিবৃত্তি করে। তর্ক বুঝাইয়া দেয়—জন্ম কৰ্ম্ম-নিমিত্তক, ইহাই যুক্ত। ইহাতেই প্রমাণ সম্ভব। কারণ, উত্তম মধ্যম অধম, দ্বীপুরুষ, সকল বিকল প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা-বিশিষ্ট জন্ম একরূপ কোন কারণজন্ত অথবা কাহারও স্বেচ্ছাকৃত হইতে পারে না, বিনা কারণেও হইতে পারে না। কার্য বিচিত্র হইলে তাহার কারণও বিচিত্র হইবে। সুতরাং পূর্বজন্মের কৰ্ম্মফল, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম এই বিচিত্র জন্মপ্রবাহের কারণ। বিভিন্ন বিজাতীয় কৰ্ম্মফলেই এই বিচিত্র জন্মপ্রবাহ নিম্পন্ন হইতেছে। ঐ কৰ্ম্মফল জন্ত, উহার নাশ আছে। তত্ত্বজ্ঞানাদির দ্বারা উহার একেবারে উচ্ছেদ হইলে জন্মের উচ্ছেদ হইবেই। সুতরাং মুক্তির

আশা সকলেরই আছে। এইরূপে তর্ক, যুক্ত তত্ত্বে প্রবর্তমান পূর্বোক্ত প্রমাণকে অহুজা করিয়া অহুগ্রহ করিল, তখন ঐ তর্কানুগৃহীত ঐ প্রমাণই জন্মকর্মনিমিত্তক এই তত্ত্বনিশ্চয় সম্পাদন করিল। আর সংশয় থাকিল না। মহর্ষির দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, সুতরাং তর্ক তাহাতেই অন্তর্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বনির্ণয়ের জন্ত অনেক সময়ে প্রমাণের সহকারী তর্কের বড় প্রয়োজন হয়,—তাহার বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। তাই বিশেষ করিয়া তাহার পৃথক উল্লেখ হইয়াছে। (তর্কসূত্র দ্রষ্টব্য)

ভাষ্য। নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণানাং ফলং, তদবমানো বাদঃ। তস্মাৎ পালনার্থং জল্পবিতণ্ডে। তাবতো তর্কনির্ণয়ো লোকযাত্রাং বহত ইতি। নোহয়ং নির্ণয়ঃ প্রমেয়ান্তর্ভূত এবমর্থং পৃথগুদ্दिष्ट ইতি।

অনুবাদ। প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের ফল তত্ত্ব-জ্ঞানকে ‘নির্ণয়’ বলে। বাদ (তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথা) সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ নির্ণয় পর্য্যন্ত। সেই নির্ণয়ের রক্ষার জন্ত ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ (আবশ্যক হয়)। সেই এই তর্ক ও নির্ণয় (মহর্ষি-কৃতি পদার্থদ্বয়) লোকযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। সেই এই নির্ণয় প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও এই জন্ত পৃথক উদ্दिष्ट হইয়াছে।

টিপ্পনী। তত্ত্বজ্ঞানমাত্রকে নির্ণয় বলিলে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ জন্ত প্রত্যক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞানও নির্ণয় হইয়া পড়ে। তাই বলিয়াছেন—“প্রমাণানাং ফলম্”। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “প্রমাণানাং” এই বহুবচনান্ত বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যই লক্ষিত হইয়াছে;— কারণ, তাহাতেই তর্কযুক্ত প্রমাণসমূহের মেলন আছে। বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্বক তত্ত্বনিশ্চয়ই “নির্ণয়” পদার্থ। তর্ক সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ফলও নির্ণয় হইবে। মূল কথা—তর্কপূর্বক তত্ত্বজ্ঞান না হইলে তাহা নির্ণয় পদার্থ নহে, ইহাই “প্রমাণানাং ফলং” এই কথার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। মহর্ষিও তর্কের পরই নির্ণয় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন (নির্ণয়সূত্র দ্রষ্টব্য)। বাদি-নিরাস হইলেই “জল্প” ও “বিতণ্ডা”র নিবৃত্তি হয়। কিন্তু নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত “বাদ”-বিচারের নিবৃত্তি নাই। কারণ, “নির্ণয়”ই বাদের উদ্দেশ্য। “জল্প” ও “বিতণ্ডা” এই নির্ণয়কে রক্ষা করিবার জন্তই আবশ্যক হয়। পূর্বোক্ত “তর্ক” ও “নির্ণয়” লোকযাত্রার নির্বাহক। কারণ, লোক সমস্ত বুঝিয়া বুঝিয়া প্রবর্তমান হইয়া তর্ক ও নির্ণয়ের দ্বারা ত্যাগ ত্যাগ করে, গ্রাহ গ্রহণ করে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই “লোক” বলিতে পরীক্ষা-সমর্থ লোকই বুঝিতে হইবে। কারণ, পরীক্ষক ভিন্ন সাধারণ লোক তর্ক করিতে পারে না। এই নির্ণয় জ্ঞান-পদার্থ। সুতরাং প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞান-পদার্থ উল্লিখিত হওয়ায় উহা প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইয়াছে। ভ্রায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, উহা প্রমাণেও অন্তর্ভূত হইয়াছে। কারণ, ঐ নির্ণয় যখন কোন পদার্থ-বিশেষের নিশ্চায়করূপে

উপস্থিত হইবে, তখন উহা প্রমাণ হইবে; তাহা না হইলে উহা প্রমাণের ফলই থাকিবে। প্রমাণক ও প্রমাণ-কদম্ব এবং প্রমাণক ও প্রমেয়ক অবস্থা-ভেদে এক পদার্থে থাকিতে পারে, ইহা পরে (দ্বিতীয়াধ্যায়ে) মহর্ষিস্বত্রেই ব্যক্ত হইবে। নির্ণয়ের পৃথক্ উদ্দেশ্যের কারণ ভাষ্যেই পরিষ্কৃত রহিয়াছে।

ভাষ্য। বাদঃ খলু নানাপ্রবক্তৃকঃ প্রত্যাদিকরণসাধনোহন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবমানো বাক্যসমূহঃ পৃথগুদ্ভিষ্ট উপলক্ষণার্থং। উপলক্ষিতেন ব্যবহারস্তত্ত্বজ্ঞানায় ভবতীতি। তদ্বিশেষো জল্পবিতণ্ডে তত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থমিত্যুক্তম্।

অনুবাদ। অনেক-বক্তৃক অর্থাৎ যাহাতে বক্তা একের অধিক, প্রত্যেক সাধ্য সাধনবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে উভয় পক্ষই স্ব স্ব সাধ্য হেতু প্রয়োগ করেন, একতর সাধ্যের নির্ণয়াবমান অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যের মধ্যে যে কোন সাধ্য নির্ণয়ই যাহার শেষফল, এমন বাক্যসমূহরূপ বাদ উপলক্ষণের জন্ত অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের জন্ত পৃথক্ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। উপলক্ষিতের দ্বারা অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞাত সেই বাদের দ্বারা ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত হয়। তদ্বিশেষ অর্থাৎ সেই বাদ হইতে বিশিষ্ট (কোন কোন অংশে ভিন্ন) জল্প ও বিতণ্ডা তদ্বিশেষ-সংরক্ষণের জন্য পৃথক্ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে, ইহা উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। এক জন বক্তার অথবা শাস্ত্রকর্তার পূর্বপক্ষ, উত্তর-পক্ষ, দ্বন্দ্ব-সমাধান, প্রতিপাদক বাক্যসমূহ “বাদ” নহে; তাই বলিয়াছেন—“নানাপ্রবক্তৃকঃ”। বিতণ্ডার প্রতিবাদী স্বসাধ্য হেতু-প্রয়োগ করেন না; সুতরাং তাহা “বাদ” হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন—“প্রত্যাদিকরণসাধনঃ”। যে কোনরূপে এক পক্ষ নিরস্ত হইলেই “জল্প” কথার সমাপ্তি হয়; কিন্তু একতর সাধ্যের নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত “বাদ” কথার সমাপ্তি হয় না। তাই বলিয়াছেন—“অন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবমানঃ”। সাধ্যকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ উদ্দেশ্য করিয়া হেতু প্রয়োগ করা হয়; এ জন্ত “অধিকরণ” শব্দের দ্বারা (“অধিক্রিয়তে উদ্ভিষ্টতে যৎ” এইরূপ বুৎপত্তিতে) সাধ্য বুঝা যায়। তাই পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে সাধ্য বুঝাইবার জন্য “অধিকরণ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাক্য-সমূহরূপ “বাদ” শব্দপদার্থ বলিয়া মহর্ষি কথিত “প্রমেয়” পদার্থেই অন্তর্ভূত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বাদের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় বলিয়া বাদের বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন; তাই মহর্ষি তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার “বাদে”র পরে এক সঙ্গেই “জল্প” ও “বিতণ্ডার” কথা বলিয়াছেন। “বিশিষ্টোভে ভিত্তিতে” এইরূপ বুৎপত্তিতে এখানে “বিশেষ” শব্দের অর্থ বিশিষ্ট। “জল্প” ও “বিতণ্ডা,”

সংশয় প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞায় বাদ হইতে সর্বথা ভিন্ন নহে। কিন্তু বাদ হইতে বিশিষ্ট। কারণ, উহার “কথা”রই দুইটী বিশিষ্ট প্রকার মাত্র। “কথাত্ত্ব”রূপে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার অভেদই আছে, ইহা সূচনা করিবার জন্তই “তদ্বিমো” না বলিয়া বলিয়াছেন,—“তদ্বিশেষৌ”। জল্প ও বিতণ্ডায় বাদ হইতে বিশেষ কি? এতদ্বস্তরে জ্ঞায়বাস্তবিককার বলিয়াছেন,—“অঙ্গাধিকামঙ্গহানিচ্চ”। “বাদে” ছল, জ্ঞাতি ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই, কিন্তু জল্পে তাহা আছে; সূত্রায় বাদ হইতে জল্পে অঙ্গাধিক্য আছে। জল্পের জ্ঞায় বাদেও উভয় পক্ষের স্থাপনা আছে; কিন্তু বিতণ্ডায় স্বপক্ষ-স্থাপনা না থাকায়, বাদ হইতে অঙ্গহানি আছে। জল্প ও বিতণ্ডা তদ্বিশেষর রক্ষার জন্ত আবশ্যক, ইহা চতুর্থার্থায়ের শেষে মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। সূত্রায় জল্প ও বিতণ্ডার পৃথক্ উল্লেখের কারণ তাহাতেই উক্ত হইয়াছে; তাই বলিয়াছেন—“ইত্যাঙ্কং” অর্থাৎ এ কথা মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। কেহ বলেন—নির্ণয় পদার্থ-ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গতঃ ভাব্যকারই এ কথা বলিয়া আসিয়াছেন; তাই বলিয়াছেন—“ইত্যাঙ্কম্”। ‘জল্পবিতণ্ডে’ এই স্থলে ‘পৃথগুদ্ভিষ্টে’ এইরূপে পূর্বোক্ত বাক্যের লিঙ্গ বচন পরিবর্তন পূর্বক অঙ্গবঙ্গ করিয়া বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। নিগ্রহস্থানেভ্যঃ পৃথগুদ্ভিষ্টো হেত্বাভাসা বাদে চোদনীয় ভবিষ্যন্তীতি। জল্পবিতণ্ডয়োস্ত নিগ্রহস্থানানীতি।

অনুবাদ। হেত্বাভাসগুলি বাদে অর্থাৎ বাদ নামক বিচারে উদ্ভাবনীয় হইবে, এ জন্য (নিগ্রহস্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইলেও) নিগ্রহস্থান হইতে পৃথক্ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। জল্প ও বিতণ্ডাতে কিন্তু (যথাসম্ভব) সকল নিগ্রহস্থানই উদ্ভাবনীয় হইবে।

টিপ্পনী। যাহা ব্যভিচার প্রভৃতি কোন দোষযুক্ত বলিয়া প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর জ্ঞায় প্রতীত হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। মহর্ষি গোতমের মতে এই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ। জ্ঞায়ের দ্বারা তত্ত্ববির্নয় করিতে এই হেত্বাভাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। সূত্রায় জ্ঞায়বিজ্ঞায় হেত্বাভাস অবশ্য উল্লেখ্য। কিন্তু মহর্ষি যখন তাঁহার বোড়শ পদার্থ নিগ্রহস্থানের বিভাগে হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আর হেত্বাভাসের পৃথক্ উদ্দেশের প্রয়োজন কি? এতদ্বস্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাব্যতা সূচনার জন্তই হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। জল্প ও বিতণ্ডার পরাজয়-সূচনার জন্ত সম্ভব হইলে, সর্ববিধ নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায় এবং করিতে হয়। কিন্তু বাদবিচারে সর্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নিষিদ্ধ। তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরু প্রভৃতির সহিত তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশে বাদবিচার করেন। জিজ্ঞাষা না থাকায় তিনি গুরু প্রভৃতি বক্তার অপ্রতিভাদি দোষের উদ্ভাবন করেন না, করিলে সে বিচারের বাদত্ব থাকে না। কিন্তু গুরু প্রভৃতি বক্তা ভ্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্ট হেতুর দ্বারা সাধ্য সাধন করিলে, অথবা কোন অপসিদ্ধান্ত বলিলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য অবশ্য তাহার উদ্ভাবন করিবেন। যাহা সেই

স্থলে তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রতিকূল, তদ্বিজ্ঞান শিখা কখনই তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। (বাদহত্ব দ্রষ্টব্য)। আপত্তি হইতে পারে যে, তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও পৃথক্ উল্লেখ করা উচিত? কারণ, তাহারও হেত্বভাসের জায় বাদবিচারে উদ্ভাব্য। এতদন্তরে তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, হেত্বভাসের পৃথক্ উল্লেখ বাদবিচারে কেবল হেত্বভাসরূপ নিগ্রহস্থানই উদ্ভাব্য, ইহা সূচিত হয় নাই। উহার দ্বারা অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা সূচিত হইয়াছে। কারণ, যে বৃত্তিতে হেত্বভাসের বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা বুঝা যায়, সেই বৃত্তিতে অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা বুঝা যায়। সুতরাং সেগুলির আর পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। হেত্বভাসের পৃথক্ উল্লেখই সেগুলির পৃথক্ উল্লেখের ফল সিদ্ধ হইয়াছে। মূলকথা, যে সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারে তত্ত্বনির্ণয়েরই বাধাত হয়, বাদবিচারে তাহারাই উদ্ভাব্য, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান হেত্বভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া মহর্ষি ইহাই সূচনা করিয়াছেন। প্রথম সূত্রেই ইহা সূচনা করিবার ফল কি? ন্যায়-বাস্তবিকার বলিয়াছেন—“বিজ্ঞাপ্রস্থান-ভেদজ্ঞাপনার্থত্বাৎ।” তাৎপর্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরম্পরায় নিঃশেষের উপযোগী বলিয়া বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডাও বিদ্যা; তাহাদিগের প্রস্থানের অর্থাৎ ব্যাপারের ভেদ বুঝাইবার জন্য ঐরূপ সূচনা আবশ্যক। এই জন্তই “জল্পবিতণ্ডাস্ত নিগ্রহস্থানানি” এই অংশের দ্বারা ভাব্যকার জল্প ও বিতণ্ডাবিজ্ঞার বাদবিজ্ঞার বৈলক্ষণ্য দেখাইয়াছেন। জল্প ও বিতণ্ডার ভেদ সূত্রকার নিজেই দেখাইবেন। অহঙ্কারী জিগীষু অপ্রতিভা প্রভৃতি যে কোন প্রকার নিগ্রহস্থানের দ্বারা পরাস্ত হইলে অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া তদ্বিজ্ঞান হইবে; তখন তাহাকে বাদবিচারের দ্বারা তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। সুতরাং জল্প ও বিতণ্ডার সর্ববিধ নিগ্রহস্থানই উদ্ভাব্য।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ভাব্য ও বাস্তবিকের উল্লেখপূর্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ‘হেত্বভাস’ নিগ্রহস্থান নহে, হেত্বভাস প্রয়োগই নিগ্রহস্থান, এইরূপ নিজ মত প্রকাশ করিয়া সমাধান করিয়াছেন, কিন্তু উল্লেখ্যতর ও ভাব্যকারের তাৎপর্য বাচস্পতি মিশ্র যেক্রপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে বৃত্তিকারের প্রতিবাদ হইতেই পারে না।

ভাষ্য। ছলজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানানাং পৃথগুপদেশ উপলক্ষণার্থ ইতি। উপলক্ষিতানাং স্ববাক্যে পরিবর্জনং ছলজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানানাং পরবাক্যে পর্য্যন্ত্যুযোগঃ। জাতেশ্চ পরেণ প্রযুক্ত্যনানায়ঃ স্তলভঃ সমাধিঃ। স্বয়ংকৃৎকরঃ প্রয়োগ ইতি।

অনুবাদ। ছল, জ্ঞাতি ও নিগ্রহস্থানের পৃথক্ উল্লেখ উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত। (পরিজ্ঞানের ফল দেখাইতেছেন) উপলক্ষিত অর্থাৎ

পরিজ্ঞাত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের নিজের বাক্যে পরিবর্তন (অপ্রয়োগ), পরবাক্যে পর্যায়ুযোগ অর্থাৎ উদ্ভাবন হয়। এবং পরকর্তৃক প্রযুক্ত্যমান জাতির (জাতি নামক অসম্ভবের) সমাধি (সমাক্ উত্তর) স্থূলত হয় এবং স্বয়ংপ্রয়োগ স্থকর হয়।

টিপ্পনী। ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের পরিজ্ঞান অর্থাৎ সর্বতোভাবে জ্ঞান প্রয়োজন। এ জন্য তাহারা প্রমের পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও পৃথক্ উক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের লক্ষণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। উহাদিগের পরিজ্ঞান ব্যতীত ঐগুলি নিজের বাক্যে প্রয়োগ করিবে না, পরের বাক্যে উদ্ভাবন করিবে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। এবং ‘জাতি’নামক অসম্ভবের পরিজ্ঞান থাকিলেই পরপ্রযুক্ত ‘জাত্যন্তর’র সমাক্ উত্তর করিতে পারা যায় এবং স্বয়ং ঐ জাতির প্রয়োগ স্থকর হয়। যদিও স্ববাক্যে জাতির প্রয়োগ নাই, ইহা পূর্বে বলিয়াছেন, তাহা হইলেও যেখানে প্রতিবাদী জাত্যন্তর করিতেছে, বাদী সভ্যদিগকে সেই কথা বলিলেন, সভাগণ প্রশ্ন করিলেন—“কেন? কি প্রকারে ইহা জাত্যন্তর হইল? চতুর্ধিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে ইহা কোন্ট?” সংগণের এই প্রশ্ন নিরাকরণের জন্ত তখন বাদী ঐ ‘জাতি’র প্রয়োগ করিলেন। জাতির পরিজ্ঞান থাকিলেই ঐ স্থলে তাহার জাতি প্রয়োগ স্থকর হয়। তিনি নিজ বাক্যে জাতি প্রয়োগ করিলেন না, ইহা স্থিরই আছে। সুতরাং পূর্বাপর বিরোধ হয় নাই। ফলতঃ জাত্যভিজ্ঞ ব্যক্তিই সভ্যদিগের ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রতিবাদী অসম্ভব করিতেছেন, ইহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ। সুতরাং জাতিরও পরিজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। মূলকথা, সংশয় প্রভৃতি পূর্বোক্ত পদার্থগুলির জ্ঞান ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানও জ্ঞানবিজ্ঞা সাধ্য তত্ত্বজ্ঞানে উপযোগী। সুতরাং ইহারাও সংশয়াদির জ্ঞান জ্ঞানবিজ্ঞার অসাধারণ প্রতিপাদ্য। ভাষাকার সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থের জ্ঞানবিদ্যায় উপযোগিতা বর্ণন করিয়া, ইহারা জ্ঞানবিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য, ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। এখন এই অসাধারণ প্রতিপাদ্যরূপ প্রশ্নানুভেদ জ্ঞাপনের জন্ত সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেরে অন্তর্ভূত হইলেও পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, ভাষাকারের এই প্রথম কথা স্মরণ করিতে হইবে। কারণ, তাহাই মূলকথা। পরের কথাগুলি তাহারই সমর্থনের জন্ত বিশেষ করিয়া অভিহিত হইয়াছে। ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের কথা যথাস্থানেই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। সেয়মায়ীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্বিভজ্যমানা—প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্ষণাম্। আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিজ্ঞোদেশে প্রকীর্ণিতা ॥ তদ্বিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ যথাবিদ্যাং বেদিতব্যং। ইহ ত্বধ্যাত্মবিজ্ঞায়ামাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোহপবর্গপ্রাপ্তিরিতি। ১।

অনুবাদ। প্রমাণাদি পদার্থ কর্তৃক বিভজ্যমান (পৃথক্, ক্রিয়মান) অর্থাৎ প্রমাণাদি পূর্বোক্ত ষোড়শ পদার্থ যে বিভক্তকে অস্ত্র বিভক্ত হইতে পৃথক্, করিয়াছে, সেই এই আত্মীক্ষিকী (স্থায়বিজ্ঞা) বিভক্তার উদ্দেশে অর্থাৎ বিভক্তার পরিগণনাস্থলে সর্ববিজ্ঞার প্রদীপরূপে, সর্বকর্মের উপায়রূপে, সর্বধর্মের আশ্রয়রূপে প্রকৌর্তিত হইয়াছে।

সেই এই তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সলাভ বিজ্ঞানুসারে বৃত্তিতে হইবে। এই অধ্যাত্মবিজ্ঞাতে কিন্তু আত্মাদিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়সলাভ অপবর্গপ্রাপ্তি, অর্থাৎ অস্ত্র বিভক্ত হইতে এই স্থায়বিজ্ঞায় তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সে বিশেষ আছে। ইতি।

টিপ্পনী। উপসংহারে ভাষ্যকার স্থায়বিজ্ঞার শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্ত বলিয়াছেন যে, এমন কোন পুরুষার্থ নাই, যাহাতে এই স্থায়বিজ্ঞা আবশ্যক নহে। এই স্থায়বিজ্ঞা-ব্যাংপাদিত প্রমাণাদিকে অবলম্বন করিয়াই অস্ত্রাস্ত্র বিভক্তা স্ব স্ব প্রতিপাত্ত তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যেই সর্ববিজ্ঞাগর্ভস্থ গূঢ় তত্ত্ব দর্শন করা যায়। তাই সর্ববিজ্ঞার প্রকাশক বলিয়া ইহা সর্ববিজ্ঞার প্রদীপস্বরূপ। ইহা সর্বকর্মের উপায়; কারণ, এই স্থায়বিজ্ঞা-পরিশোধিত প্রমাণাদির দ্বারা ইহা সর্ববিজ্ঞার প্রতিপাত্ত কর্মগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। সাম-দানাদি, ক্রমিবাণিজ্যাদি কর্মে এই স্থায়বিজ্ঞাই মূল। ইহা সর্বধর্মের আশ্রয়। তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ-প্রবর্তনা অর্থাৎ লোককে কর্মে প্রবৃত্ত করা সর্ববিজ্ঞার ধর্ম। সেগুলিও এই স্থায়বিজ্ঞার অধীন। এই বিজ্ঞার সাহায্য লইয়াই অস্ত্র বিভক্তা পুরুষ-প্রবর্তনা করেন। বিমূশ্কারী চিন্তাশীল পুরুষগণ এই স্থায়বিজ্ঞার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিয়াই ক্রেশদাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকার যেরূপ বলিয়াছেন, বিজ্ঞার পরিগণনাস্থলে স্থায়বিজ্ঞা এইরূপেই কৌর্তিত হইয়াছে। স্থায়বিজ্ঞা বেদের উপাঙ্গ বলিয়া পুরাণে কৌর্তিত। “মোক্ধম্বে” ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়া গিয়াছেন যে, “গরীয়সী আত্মীক্ষিকাকে আশ্রয় করিয়া আমি উপনিষদের সারোক্তার করিতেছি”। ভাষ্যকারোক্ত শ্লোকটির চতুর্থ পাদে “বিদ্যোদ্যেশে গরীয়সী” এবং “বিদ্যোদ্যেশে পরীক্ষিতা” এইরূপ পাঠভেদও দৃষ্ট হয়। মহামতি চাণক্য-প্রণীত “অর্থশাস্ত্র” গ্রন্থেও এই শ্লোকটি দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে চতুর্থ পাদে “শব্দদাতীক্ষিকী মতা” এইরূপ পাঠ আছে। চাণক্যই এই স্থায়ভাব্যের কর্তা, ব্যাংসায়ন তাঁহারই নামান্তর—এই মত সমর্থনে চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের ঐ শ্লোকটিও উল্লিখিত হইয়া থাকে।

যদি সর্ববিজ্ঞার উপযোগী “প্রমাণ” প্রভৃতি পদার্থগুলিই এই শাস্ত্রের ব্যাংগাঙ্গ হইল, তাহা হইলে সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা মোক্ষকে এই শাস্ত্রের ফল বলিয়া বুঝা যায় না; কারণ, ব্যাংগাঙ্গ প্রমাণাদি পদার্থের স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া বুঝা যায়, ইহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানে ভিন্ন

ভিন্ন বিজ্ঞানসাধ্য সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই লাভ করা যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়সের অস্তিত্ব বিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়স হইতে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কা মনে করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“তদিতং তত্ত্বজ্ঞানং” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, সকল বিজ্ঞাতেই “তত্ত্বজ্ঞান” এবং “নিঃশ্রেয়স” আছে। অস্তিত্ব বিজ্ঞানসাধ্য সেই সমস্ত নিঃশ্রেয়স হইতে জ্ঞানবিজ্ঞান মুখ্য ফল নিঃশ্রেয়স যে বিভিন্ন হইবে, ইহা সেই সমস্ত বিজ্ঞা ও তাহার ফল তত্ত্বজ্ঞানের স্বভাব পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। মনুজ্ঞ তরী, বার্তা, দণ্ডনীতি এবং আত্মবিকী, এই চতুর্বিধ বিজ্ঞান মধ্যে বেদবিজ্ঞান নাম “জ্ঞানী,” যোগাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, স্বর্গপ্রাপ্তিই সেখানে নিঃশ্রেয়স। কৃষাদি জীবিকা-শাস্ত্রের নাম বার্তা, ভূমাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, কৃষি-বাণিজ্যাদি লাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সাম, দান, ভেদ দণ্ডাদি প্রয়োগ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, রাজাদিলাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। এই সমস্ত বিজ্ঞান প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বভাব পর্যালোচনা করিলেই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স বুঝিতে পারা যায়। তাই বলিয়াছেন—“যথাবিজ্ঞং বেদিতব্যম্।” এবং যদিও প্রমাণাদি পদার্থগুলি সর্ববিজ্ঞান উপযোগী বলিয়া সর্ববিজ্ঞানসাধারণ, কিন্তু আত্মা প্রভৃতি “প্রমের”রূপ অসাধারণ পদার্থের উল্লেখ থাকায়, জ্ঞানবিজ্ঞা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা না হইলেও অধ্যাত্মবিজ্ঞা। তাই বলিয়াছেন—“ইহ ত্বধ্যাত্মবিজ্ঞায়াং” ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্ববিজ্ঞানসাধারণ প্রমাণাদি পদার্থের ব্যুৎপাদক বলিয়া, সর্ববিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভের সহায় হইলেও এবং সংশয়াদি প্রস্থান-ভেদবশতঃ উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা না হইলেও, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলিয়া এবং আত্মনিরূপণরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত বলিয়া, এই জ্ঞানবিজ্ঞা যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞা, তখন ইহাতে আত্মাদি বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেয়স লাভ বুঝিতে হইবে।

এখানে স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার জ্ঞানবিজ্ঞা কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে, এ কথা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন এবং এখানেও প্রথমে জ্ঞানবিজ্ঞাকে সর্ববিজ্ঞান প্রদীপ এবং সর্বকর্মের উপায় এবং সর্বকর্মের আশ্রয় বলিয়াছেন। সর্বকর্মের আশ্রয় বলিতে আমরা সর্বকর্মের রক্ষক বুঝি; উত্তোতকর ও বাচস্পতি অন্তরূপ বুঝিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা তিনি যে সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই জ্ঞানবিজ্ঞান প্রয়োজন বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের ঐ কথার অবতারণায় বলিয়াছেন যে, হজ্রকার মোক্ষকে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রয়োজন বলিয়াছেন, কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এমন কোন প্রয়োজন নাই, যাহাতে জ্ঞানবিজ্ঞা নিমিত্ত নহে—আবশ্যক নহে। সেখানে তাৎপর্য্যপরিণতিতে উদয়ন বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারোক্ত অস্তিত্ব প্রয়োজনগুলি হজ্রকারোক্ত প্রয়োজনের বিরোধী নহে, পরস্পর অল্পকূল। ইহা দেখাইতেই বাচস্পতি হজ্রকারোক্ত প্রয়োজনের অল্পবাদ করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ভাষ্যকার অস্তিত্ব বিজ্ঞান ফল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলিকেও জ্ঞানবিজ্ঞান ফল বলিয়াছেন এবং তাহা সত্য, এ কথা তাৎপর্য্যটীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। উদয়নও

এই বিষয়ের উপসংহারে বাচস্পতির তাৎপর্যব্যাখ্যায় মোক্ষকে প্রধান বলিয়া অস্ত্র বিজ্ঞার দৃষ্ট ফলগুলিকে জ্ঞানবিজ্ঞার গৌণ ফল বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা কেহ না বলিয়া পারেন না। তবে অস্ত্র বিজ্ঞাসাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলিই কেবল ন্যায়বিজ্ঞার ফল নহে, জ্ঞানবিজ্ঞা যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞা, তখন তাহার অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স ফল রহিয়াছে এবং তাহাই প্রধান ফল; সুতরাং ফলাংশেও অস্ত্র বিজ্ঞা হইতে ন্যায়বিজ্ঞার ভেদ আছে। পরন্তু যে বিদ্যার বাহ্য মুখ্য প্রয়োজন, তাহাকেই সেই বিদ্যায় “নিঃশ্রেয়স” বলা হয় এবং তাহার সাক্ষাৎ সাধনকেই সেই বিদ্যায় “তত্ত্বজ্ঞান” বলা হয়। জ্ঞানবিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া তাহার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ এবং তাহার সাক্ষাৎ সাধন আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞান, সুতরাং ভাব্যকার অপবর্গকে জ্ঞানবিজ্ঞার “নিঃশ্রেয়স” বলিয়াছেন এবং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাতে অস্ত্রাস্ত্র নিঃশ্রেয়স জ্ঞানবিজ্ঞার ফলই নহে, এ কথা বলা হয় নাই। অধ্যাত্ম অংশ লইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞার বাহ্য মুখ্য ফল, সেই ফলাংশে অস্ত্রাস্ত্র দৃষ্টফলক বিজ্ঞা হইতে জ্ঞানবিজ্ঞার ভেদ দেখাইতেই ভাব্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। উপনিষদের জ্ঞান “জ্ঞানবিজ্ঞা” যদি কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইত এবং মোক্ষ ভিন্ন আর কোন ফল তাহার না থাকিত, তাহা হইলে ভাব্যকারের ঐ কথার কোন প্রয়োজনও ছিল না। অস্ত্র বিজ্ঞার ফল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলি জ্ঞানবিজ্ঞার ফল বলিয়াই সেই সকল বিজ্ঞার ফলের সহিত জ্ঞানবিজ্ঞার ফলের সম্পূর্ণ অভেদের আপত্তি হয়। এজন্তই ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানবিজ্ঞা যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞা, তখন অপবর্গরূপ মুখ্য ফল থাকায় সে আপত্তি হইবে না; কারণ, সে ফলটী ত আর দৃষ্টফলক অস্ত্র বিজ্ঞার নাই? তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, “জ্ঞানবিদ্যা” বেদের কর্মকাণ্ড, বার্তা এবং দণ্ডনৈতি-বিদ্যার ন্যায় কেবল দৃষ্ট-ফলক বিদ্যাও নহে, আবার উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞাও নহে; কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা, অপবর্গই ইহার মুখ্য প্রয়োজন, অন্যান্ত্র সমস্ত নিঃশ্রেয়স ইহার গৌণ প্রয়োজন; কারণ, তাহা লাভ করিতেও এই জ্ঞানবিদ্যা আবশ্যক। তাহা হইলে জ্ঞানবিদ্যা অস্ত্র সমস্ত বিদ্যা হইতে বিশিষ্ট, এই বিশিষ্ট বিশেষটী আর কোন বিদ্যাতেই নাই। মহর্ষি প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই স্থচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। জ্ঞানবিজ্ঞা মুখ্য ও গৌণ সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই সম্পাদন করে—ইহা যখন সত্যকথা, সর্বস্বীকৃত কথা, তখন মহর্ষি নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা তাহা না বলিবেন কেন? তাহা বলিলে এবং তাহা বুঝিলে অস্ত্র কোন অল্পপত্তিও দেখা যায় না এবং ভাব্যকারও যে সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই গ্রহণ করেন নাই, ইহাও বুঝা যায় না। পরন্তু তিনি যখন সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই জ্ঞানবিজ্ঞা আবশ্যক বলিয়াছেন, তখন সূত্রকারের কথার দ্বারাও তিনি ইহা সমর্থন করিতেন, ইহা বুঝা যায়—ইহা বলা যায়। তবে তিনি অনেক স্থলে যে ‘অপবর্গ’ অর্থেই নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রতিপাত্ত মুখ্য নিঃশ্রেয়স অপবর্গের কথা বলিবার জন্ত, তাহাতে সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা তিনি কেবল অপবর্গই বুঝিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাৎপর্যটীকাকার

স্বতন্ত্র নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা কেবল অপবর্ণের ব্যাখ্যা করিলেও এবং উদয়ন প্রভৃতি তাহার সমর্থন করিলেও ভাষ্যকার যে সৰ্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সেই জ্ঞায়বিজ্ঞা আবশ্যক বলিয়াছেন এবং অজ্ঞাত বিজ্ঞার নিঃশ্রেয়সগুলিও জ্ঞায়বিজ্ঞার ফল বলিয়াছেন এবং তাহা সত্যই বলিয়াছেন—এ কথা ত তাৎপর্যটিকাকার প্রভৃতিও বলিয়াছেন; তবে আর তাহাদিগের স্বতন্ত্র নিঃশ্রেয়সের ব্যাখ্যায় অজ্ঞাত সকল নিঃশ্রেয়সকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অদৃষ্ট-নিঃশ্রেয়স অপবর্ণের প্রতি এত পক্ষপাত কেন? সুধীগণ উপেক্ষা না করিয়া ইহার মীমাংসা করিবেন এবং মহর্ষি অজ্ঞাত অপবর্ণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াও কেবল প্রথম স্বত্রে নিঃশ্রেয়স শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তা করিবেন। মোক্ষ শব্দের বা অপবর্ণ শব্দের প্রয়োগ করিলেও জীবমুক্তি ও পরা মুক্তি তাহার দ্বারা বুঝা যাইত। কেবল জীবমুক্তিও যদি প্রথম স্বত্রে মহর্ষির বক্তব্য হয়, তাহা হইলেও নিঃশ্রেয়স শব্দপ্রয়োগ সার্থক হয় না; কারণ, উহার দ্বারা পরা মুক্তিও বুঝা যায়। তাৎপর্য-কল্পনার দ্বারা জীবমুক্তিমাত্রই যদি বুঝিতে হয়, তবে তাহা মোক্ষ প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে। কণাদস্বত্রেও প্রথমে নিঃশ্রেয়স শব্দই দেখা যায়। * টীকাকারগণ তাহার মোক্ষমাত্র অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও স্বত্ৰকার স্বাক্ষর মোক্ষ প্রভৃতি কোন শব্দের প্রয়োগ করেন নাই; কেন, তাহা ভাবা উচিত। স্বাক্ষর শব্দ প্রয়োগই স্বত্রে করিতে হয়, ইহা স্বত্ৰের লক্ষণে পাওয়ায়। সুধীগণ এ সকল কথাও চিন্তা করিয়া মহর্ষির তাৎপর্য নির্ণয় করিবেন। এখন একবার স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার ভাষ্যরস্তু হইতে এ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রথমেই প্রমাত্ততঃ প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের অনুমান দেখাইয়াছেন। তাহার পরে প্রমাত্তা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি—এই চারিটির স্বরূপ বলিয়া ঐ চারিটি থাকাতেই তত্ত্বপরিসমাপ্তি হইতেছে, এই কথা বলিয়াছেন। শেষে ঐ তত্ত্ব কি, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাব ও অভাবরূপ দুইটি তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং অভাবরূপ তত্ত্বও যে প্রমাণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা বলিয়াছেন। শেষে মহর্ষি ভাব পদার্থের ঘোলটি প্রকার সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এই কথা বলিয়া মহর্ষির কথিত সেই বোড়শ পদার্থ প্রদর্শনের জন্ত মহর্ষির প্রথম স্বত্ৰের অবতারণা করিয়া তাহার সমাস ও বিগ্রহবাক্য এ ১৭ যষ্টী বিভক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশপূর্বক সংক্ষেপে স্বত্ৰের বক্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়াছেন।

শেষে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাংগাং সাধন, ইহা বলিয়া, তাহা কিরূপে বুঝা যায়, ইহা বলিবার জন্ত দ্বিতীয় স্বত্ৰের কথা বলিয়াছেন এবং তাহা বলিবার জন্তই হয়, হান, উপায় ও অধিগম্যতা—এই চারিটিকে ‘অর্থপদ’ বলিয়া তাহাদিগের সমাক্ জ্ঞানে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়, এ কথা বলিয়াছেন।

তাহার পরে স্বত্রে সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন হইয়াছে,

১। স্বাক্ষরমসন্নিধঃ সারবদ্বিত্যতোমুখম্।

অন্ত্যভিমতবদ্যং স্বত্ৰং স্বত্ৰবিদ্যে বিভক্তঃ—পরিশরোপপুরাণ, ১০ অঃ।

এই বিষয়ে পূর্বপক্ষ প্রদর্শনপূর্বক সংশয় প্রতীতি পদার্থ জ্ঞানবিজ্ঞান পৃথক্ 'প্রস্থান' অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য উদ্ভাদিগের ব্যুৎপাদন বা বিশেষরূপে বোধ সম্পাদন করাই জ্ঞানবিজ্ঞান অসাধারণ ব্যাপার, তাহা না করিলে জ্ঞানবিজ্ঞান উপনিবদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইয়া পড়ে; সুতরাং সংশয়াদি পদার্থগুলির বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে ইত্যাদি কথার দ্বারা সামান্যতঃ পূর্বপক্ষের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পরে বিশেষ করিয়া সংশয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অসাধারণ প্রতিপাদ্য কেন, এ বিষয়ে কারণ প্রদর্শনপূর্বক সংশয়ের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে প্রয়োজন পদার্থের স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহারও পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে 'জ্ঞান' কি, এই প্রশ্ন উদ্ভিগ্নাছে, তাহাতে জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়াছেন, জ্ঞানকেই অদ্বীক্ষা বলে, এই কথা বলিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানকেই আদ্বীক্ষিকী বলে, ইহা বুঝাইয়াছেন। জ্ঞানের কথার জ্ঞানভাসু কাহাকে বলে, তাহা বলিয়াছেন। তাহার পরে বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা করিয়া বিতণ্ডা নিস্প্রয়োজন নহে এবং স্বপক্ষসিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই কথা বুঝাইয়াছেন, নিস্প্রয়োজন-বিতণ্ডাবাদী ও শূন্যবাদীর মত খণ্ডন করিয়া বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে যথাক্রমে দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডার সংক্ষেপে স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে নিগ্রহস্থানের মধ্যে হেতুভাসের উল্লেখ থাকিলেও আবার পৃথক্ করিয়া হেতুভাসের উল্লেখের দ্বারা মহাশি কি সূচনা করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছেন। তাহার পরে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়া শেষে আদ্বীক্ষিকী বিজ্ঞান প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন এবং যদিও সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই আদ্বীক্ষিকী বিজ্ঞান প্রয়োজন,—আদ্বীক্ষিকীর সাহায্য ব্যতীত অন্তান্ত বিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় না, তথাপি আদ্বীক্ষিকী—অধ্যাত্মবিজ্ঞা বলিয়া ইহার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্ণ এবং আত্মা দিব্যজ্ঞানই ইহাতে তত্ত্বজ্ঞান। ঐ তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐ অপবর্ণরূপ নিঃশ্রেয়স ইহার মুখ্য ফল বলিয়া ফলাংশেও অন্ত বিজ্ঞা হইতে এই জ্ঞানবিজ্ঞা বিশিষ্ট এবং অন্যান্য বিজ্ঞা-সাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সও এই জ্ঞানবিজ্ঞান গৌণ ফল বলিয়া ইহা কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইতেও বিশিষ্ট। ভাব্যাকার এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রথম সূত্র-ভাষ্যের সমাপ্তি করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষে সমাপ্তিসূচক 'ইতি' শব্দ কোন পুস্তকে দেখা না গেলেও ভাষ্যাকার নিশ্চয়ই ইতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। তিনি বাক্যসমাপ্তি সূচনার জন্যও প্রায় সর্বত্র 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকের প্রথম সূত্রভাষ্য-বার্ত্তিকের শেষে ইতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন—“ইতি সূত্রসমাপ্তৌ।” এখানে উদ্যোতকের পাঠান্তরসারে ভাষ্যকারের পাঠ স্থির করিয়া প্রচলিত কোন কোন পাঠ পরিত্যক্ত হইয়াছে। উদ্যোতকের অনেক স্থলে ভাষ্যকারের পাঠও উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং স্থলবিশেষে উদ্যোত-কের পাঠকেও প্রকৃত ভাষ্যপাঠ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়,—ঐরূপ প্রাচীন সংবাদ ব্যতীত ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের উপায়ই বা কি আছে ?

মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্রার্থ না বুঝিয়া প্রাচীন কালে কোন বিরোধী সম্প্রদায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, গোতমোক্ত “বাদ” হইতে “নিগ্রহস্থান” পর্য্যন্ত পদার্থগুলির জ্ঞান মোক্ষের কারণ হইতেই পারে না। যাহা পর-পরাত্তরের উপায়, যাহাতে অপরকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহা অহঙ্কারাদির কারণ হইয়া মোক্ষের প্রতিবন্ধকই হয়। যাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহাকে কি মোক্ষের কারণ বলা যায়? সুতরাং গোতমের প্রথম সূত্রে যখন “বাদ,” “জ্ঞান,” “বিতণ্ডা” প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের কারণরূপে বলা হইয়াছে, তখন ঐ সূত্রার্থ নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, সুতরাং অগ্রাহ্য। এইরূপ মত প্রকাশ এখনও অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা পুরাতন কথা। উদ্যোতকর মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্র ব্যাখ্যার উপসংহারে পূর্বোক্ত প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, সূত্রার্থ না বুঝিয়াই ঐরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মহর্ষির দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা আত্মাদি “প্রমের” তত্ত্ব সাফাংকারই মোক্ষের সাফাং কারণ, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে এবং প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরায় তাহাতে আবশ্যক, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকার বলিয়াছেন যে, “জ্ঞান,” “বিতণ্ডা” প্রভৃতির জ্ঞানে মুমুকুর অহঙ্কার জন্মে না। কিন্তু উহার দ্বারা মোক্ষ-সাধনের প্রতিবন্ধক অল্প ব্যক্তির অহঙ্কার নিবৃত্তি করা যায়, তজ্জন্ম অনেক অবস্থায় মুমুকুর উহা আবশ্যক হয়, সুতরাং উহা মোক্ষের পরিপন্থী নহে, পরন্তু উহা মোক্ষের অগ্রকূল।

উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী “বাদ,” “জ্ঞান,” “বিতণ্ডা” প্রভৃতির জ্ঞানকে যে অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়াছেন, তাহাও ঠিক বলা হয় নাই। কারণ, যাহাদিগের ঐ সকল পদার্থের কোনই জ্ঞান নাই, তাহাদিগেরও অহঙ্কারাদির উদ্ভব দেখা যায়, আবার তত্ত্বজ্ঞানী প্রকৃত পণ্ডিতের ঐ সকল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অহঙ্কারাদির উদ্ভব দেখা যায় না, তবে আর ঐ সকল জ্ঞানকে অহঙ্কারাদির কারণ বলা যায় কিরূপে?

বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধির উপায়ের অগ্রদূত থাকিলে বিদ্যা বা তর্ক-কুশলতা প্রভৃতির ফলে কাহারও অহঙ্কারাদি বাড়ে না, উহার ফলে যাহার অহঙ্কারাদি বাড়ে, বিবাদপ্রিয়তা জন্মে, জিগীষার যত্না উপস্থিত হয়, সে ত মুমুকুই নহে, প্রকৃত মুমুকু ব্যক্তির উহা দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না, পরন্তু ইষ্টই হয়। আমরা কি কোন তর্ক-কুশল ব্যক্তিকেই ধীর, স্থির, শান্ত দেখিতে পাই না? তর্ক-কুশল হইলেই কি তাহার আর কোন উপায়েই চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না? অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বস্তুতঃ বিদ্যা সকল ক্ষেত্রেই অহঙ্কারের বীজ বপন করেন না, সকলকে লক্ষ্য করিয়াই “বিদ্যা বিবাদার” বলা হয় নাই, তাহা হইলে মহাজনগণ, মুমুকুগণ, ভক্তগণ কোন দিনই বিদ্যার আলোচনা করিতেন না। ভক্তের গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃতও আমরা উত্তমাধিকারীর মধ্যে “শাস্ত্রযুক্তিনিপুণ”^১ ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। ফল কথা, শাস্ত্রযুক্তিনিপুণতা প্রকৃত অবিকারীর কোন অনিষ্ট ত করেই না, পরন্তু তাহার অধিকারের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া

১। শাস্ত্রযুক্তিনিপুণ দুই অর্থাৎ বীর।

উক্তন অবিকারী তিহী তারয়ে সংসার।—চৈ চঃ, মধ্যাণীলা, ২২ পঃ। মহাপ্রভুর নিজের উক্তি।

তাহাকে সর্বদা সর্বতোভাবে রক্ষা করে, তাহার লক্ষ্যের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখে, তাহার শ্রদ্ধাকে সর্বদা দৃঢ় করিয়া রাখে, সুতরাং প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নানা ভাবেই মোক্ষের সহায় হয়। তন্মধ্যে আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ এবং আত্মাদি পদার্থের শ্রবণমননাদিরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান তাহাতে পূর্বে আবশ্যক, তাহাতে আবার প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, এই ভাবে প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মহর্ষি এক সঙ্গে নিঃশ্রেয়সের উপায় বলিয়াছেন। উহার দ্বারা প্রমাণাদি সমস্ত পদার্থের যে কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা স্বজ্ঞার্থ বুঝিতে হইবে না। বাহ্য পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের সাধন, তাহাও ঋষিগণ নিঃশ্রেয়সকর বলিয়া উল্লেখ করিতেন। গীতায় আছে,—

“সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরবৃত্তৌ” ॥ ৫।২।

এখানে “সন্ন্যাস” ও “কৰ্ম্মযোগ” কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মোক্ষসাধন বলা হইয়াছে? তাহা কি হইতে পারে? সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদন করে বলিয়াই তাহাকে নিঃশ্রেয়সকর বলা হইয়াছে। ঐরূপ অতি পরম্পরায়ও বাহ্য মোক্ষে সহায়তা করে, এমন অনেক কৰ্ম্মের উল্লেখ করিয়া “ইহা করিলে আর ভবদর্শন হয় না, ইহা করিলে আর জননী-জঠরে আসিতে হয় না,” এইরূপ কথা বলিতে ব্রহ্মবাদী বাদরায়ণও বিরত হন নাই। ফলকথা, প্রথম শ্রুত্রে “বাদ,” “জন্ম” প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানকে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধন বলা হয় নাই। বোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কি ভাবে কেন মোক্ষসাধন, তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে। দৈর্ঘ্য ধরিয়া দ্বিতীয় শ্রুত্রে কিছু দেখুন। ১।

ভাষ্য। তচ্চ খলু বৈ নিঃশ্রেয়সং কিং তত্ত্বজ্ঞানানন্তরমেব ভবতি? নেতুচ্যতে, কিং তর্হি? তত্ত্বজ্ঞানাৎ।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) সেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্রায়বিদ্যার মুখ্য ফল অপবর্গ কি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হয়? (উত্তর) ইহা বলা হয় নাই, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পরেই মুখ্য ফল নির্বাপন লাভ হয়, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞান হইতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত (দ্বিতীয় সূত্রোক্তক্রমে নির্বাপন লাভ হয়)।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম শ্রুত্রে দ্বারা তাহার শ্রায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, প্রয়োজন এবং তাহা-দিগের পরম্পর সম্বন্ধের সূচনা করতঃ প্রমাণাদি পদার্থের নাম কীর্তন করিয়াছেন, ইহারই নাম “উদ্বোধন”। ঐ পদার্থগুলির “লক্ষণ” বলিয়া শেষে “পরীক্ষা” করিবেন। কারণ, পদার্থের পরীক্ষা ব্যতীত তত্ত্বনির্ণয় সম্ভব নহে। কিন্তু পদার্থের “প্রয়োজন” ও সম্বন্ধের নির্ণয় না হইলেও তাহার লক্ষণ ও পরীক্ষার অবসর উপস্থিত হয় না। “পরীক্ষা” ব্যতীত আবার ঐ প্রয়োজন ও সম্বন্ধের নির্ণয় হইতে পারে না, এ জন্ম মহর্ষি দ্বিতীয় শ্রুত্রে দ্বারা ঐ প্রয়োজন ও সম্বন্ধের পরীক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রুতিটী সিকান্ত-শ্রুতি। পূর্বপক্ষ ব্যতীত সিকান্ত কখন সম্ভব হয় না, এ জন্ম ভাষ্যকার একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াই দ্বিতীয় শ্রুত্রে অবতারণা করিয়াছেন।

পূর্বপক্ষের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, প্রথম সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নির্মাণরূপ অপবর্গই মুখ্য নিঃশ্রেয়স। তাহা তাহার কারণ তত্ত্বজ্ঞান-বিশেষের পরেই জন্মিবে। ইহা অস্বীকার করিলে মহাবীর প্রথম সূত্রের ঐ কথা মিথ্যা হইয়া যায়। মহাবীর প্রথম সূত্রে যে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে মুখ্য নিঃশ্রেয়স অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণরূপে সূচনা করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরেই যদি তাহার কার্য অপবর্গ না হয়, তাহা হইলে মহাবীর তাহাকে সাক্ষাৎ কারণ বলিতে পারেন না, সাক্ষাৎ কারণের পরেই তাহার কার্য হইয়া থাকে। মহাবীর প্রথম সূত্রে অবশ্য কোন তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ বলিয়া সূচনা করিয়াছেন, ঐ চরম কারণ তত্ত্বজ্ঞানবিশেষ জন্মিলে অপবর্গ লাভে আর বিলম্ব হইবে কেন? যদি তাহাই হইল, যদি তত্ত্বদর্শনের পরক্ষণেই নির্মাণ লাভ হইয়া গেল, তাহা হইলে তত্ত্বদর্শীর নিকটে তাঁহার দৃষ্ট তত্ত্ববিষয়ে কোন উপদেশ পাওয়া সম্ভব হইল না, তিনি তত্ত্ব দর্শনের পরক্ষণেই নির্মাণ লাভ করায়, আর কাহাকেও কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না। সূতরাং শাস্ত্র-বাক্যগুলি তত্ত্বদর্শীর বাক্য হওয়া অসম্ভব। তত্ত্বদর্শী ব্যতীত আর সকলেই ভ্রান্ত, আর কাহারও উপদেশ শাস্ত্র বলিয়া মানা যায় না, সূতরাং শাস্ত্র নামে প্রচলিত বাক্যগুলি ভ্রান্তের বাক্য বলিয়া বক্তব্য: শাস্ত্র নহে, তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের আশা করা অসম্ভব। যিনি তত্ত্বদর্শী, অথচ জীবিত থাকিয়া তত্ত্বের উপদেশ করিবেন, এমন ব্যক্তি কোথায় মিলিবে? তত্ত্বদর্শনের পরক্ষণেই যে নির্মাণলাভ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এই পূর্বপক্ষের উত্তর সূচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার “তত্ত্বজ্ঞানং” এই কথার যোগ করিয়া, দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণার দ্বারা তাঁহার উত্থাপিত পূর্বপক্ষের উত্তর জানাইয়াছেন। ভাষ্যকারের শেবোক্ত ঐ কথার সহিত দ্বিতীয় সূত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে।

উত্তরপক্ষের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, মুক্তি দ্বিবিধ,—পরী ও অপরা; নির্মাণ মুক্তিকেই পরী মুক্তি বলে। তাহা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরেই হয় না, তাহা যে ক্রমে হয়, মহাবীর দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা সেই ক্রম বলিয়াছেন। অপরা মুক্তি তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরেই জন্মে, তাহাকেই বলে “জীবনমুক্তি”। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের মহিমায় মুমুক্শুর পূর্বসংকীর্ণিত ধর্ম ও অধর্ম সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু “প্রারব্ধ” ধর্ম ও অধর্ম থাকে, ভোগ ব্যতীত তাহার ক্ষয় নাই। সূতরাং জীবনমুক্ত ব্যক্তি প্রারব্ধ ভোগের জন্ত বত দিন দেহ ভোগ করেন, তত দিন তাঁহার নির্মাণ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—“তাবদেবান্ত চিরং বাবর বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎক্রে”। মুমুক্শু আত্মাদি বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট করিবার জন্ত প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্র হইতে আত্মাদির প্রকৃত স্বরূপের শাস্ত্র বোধ করেন, ইহারই নাম শ্রবণ। তাহার পরে যুক্তির দ্বারা সেই শ্রুত তত্ত্বের পরীক্ষা করেন, ইহারই নাম মনন; ইহা এই জ্ঞানবিদ্যার অধীন, এই জ্ঞানবিদ্যা “প্রমাণের” তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্ত “মংশয়” প্রভৃতি পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছে। গ্রাহ ও ত্যাগ-ভেদে ব্যবহৃত “প্রমেয়” পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞাপনের জন্তই আবার প্রমাণের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছে। প্রমাণের দ্বারা বিচার করিলে বুঝা যাইবে—আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে “আত্মা” ও

“অপবর্গই” গ্রাহ্য, আর দশটি ত্যাজ্য, ঐ দশটি ছঃখের হেতু এবং ছঃখ, এ জন্ত “হেয়”। ছায়-বিদ্যার সাহায্যে মননের দ্বারা আত্মাদি “প্রমেরের” তত্ত্বাবধারণ হইলেও মিথ্যা জ্ঞানজন্ত সংস্কার থাকায়, আবারও পূর্বের ছায় ভ্রম সাক্ষাৎকার করে। দিগ্‌মূঢ় ব্যক্তির সহস্র অনুমানের দ্বারাও পূর্বসংস্কার যায় না। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই মিথ্যা সাক্ষাৎকার বা বিপরীত সাক্ষাৎকার নিবৃত্ত হইতে পারে এবং তত্ত্বসাক্ষাৎকারজন্ত সংস্কারই বিপরীত সংস্কারকে দূর করিতে পারে, ইহা লোকসিদ্ধ, অর্থাৎ লৌকিক ভ্রম স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। যে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার রজ্জুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভ্রম একেবারে যায় না, অস্ত্র কোন আশু ব্যক্তি “ইহা সর্প নহে” বলিয়া দিলেও এবং উপযুক্ত হেতুর সাহায্যে “ইহা সর্প নহে” এরূপ অনুমান হইলেও, আবার অনেক পরে নিকটে গেলে সেই সর্পবুদ্ধি তখনই উপস্থিত হয়; কিন্তু রজ্জুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া গেলে আর ভ্রম ভ্রম হয় না। সেইরূপ আত্মাদি বিষয়ে জীবের ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক, বৈদান্তিক সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত কোন মহাবাক্যজন্ত পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানে উহা বাইতে পারে না, উহা নাশ করিতে হইলে ঐ আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে, হুতরাং তাহার জন্ত মননের পরে ঐ আত্মা প্রভৃতির শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ স্বরূপের ধ্যান-ধারণাদি করিতে হইবে, তাহাতে যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় আশ্রয় করিতে হইবে, তাহাতে ঈশ্বর-প্রণিধানও আবশ্যক হইবে। ঐ ধ্যান-ধারণাদি জন্ত যে মথার্থ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিবে, তাহাই পরে কালবিশেষে আত্মাদির তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মাইবে, উহাই আত্মাদি বিষয়ে চতুর্থ বিশেষ জ্ঞান। উহা হইলে আর তখন মিথ্যা জ্ঞানজন্ত সংস্কারের লেশ মাত্র থাকিবে না। ঐ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মিয়া গেলে আর তাঁহাকে বদ্ধ বলা যায় না, তিনি তখন মুক্ত, তবে সহসা তিনি তখন দেহাদিবিযুক্ত হন না, প্রারম্ভ কর্মফল ভোগের জন্ত তিনি জীবিত থাকেন। সেই তত্ত্বদর্শী জীবমুক্ত ব্যক্তিরই শাস্ত্রবক্তা, তাঁহাদিগের উপদেশই শাস্ত্র। তাঁহাদিগের উপদেশেই শাস্ত্র-সম্প্রদায় রক্ষা ও লোকশিক্ষা অব্যাহত আছে। ফলতঃ নির্লীণ মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হয় না, জীবমুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হইয়া থাকে, হুতরাং কোন দিকেই বিরোধ নাই এবং তত্ত্বদর্শী মুক্ত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্বের উপদেশ পাওয়াও অসম্ভব হইল না। শাস্ত্র এবং এই সকল মুক্তির দ্বারাই মুক্তির পূর্বোক্ত বৈবিধ্য বুঝা গিয়াছে। মহর্ষি দ্বিতীয় স্বত্বের দ্বারা পরা মুক্তির ভ্রম বলিয়াছেন, তাহাতে এবং প্রথম স্বত্বের কথাতে অপরা মুক্তির কথাও পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মা প্রভৃতি প্রমের পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাও দ্বিতীয় স্বত্বের ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সূত্র। ছঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানা-
মুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। ছঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্ম ও অধর্ম), দোষ (রাগ ও ঘেয) এবং মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রমজ্ঞান, ইহাদিগের পরপরটির বিনাশে (কারণনাশে কার্যনাশক্রমে) “তদনন্তর”গুলির অর্থাৎ ঐ

মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি পরপরটির অব্যবহিত পূর্ববগুলির অভাব প্রযুক্ত অপবৰ্গ হয় (নির্ব্যাণ লাভ হয়) অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়, মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে রাগ ও দ্বেষরূপ দোষের নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিতে ধর্ম ও অধর্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিতে জন্মের নিবৃত্তি হয়, জন্মের নিবৃত্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, ইহাই নির্ব্যাণ মুক্তি।

বিবৃতি। বদ্ধ জীবমাত্রেরই দুঃখনিবৃত্তির জন্য ইচ্ছা স্বাভাবিক, একেবারে সংসার ছাড়িয়া দুঃখমুক্ত হইতে সকলের ইচ্ছা না হইলেও দুঃখ কেহ চায় না, আমার দুঃখ না হউক, আমি কষ্ট না পাই, এরূপ ইচ্ছা সকলেরই স্বাভাবিক এবং সে জন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তি ও কৃতি অনুসারে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। দুঃখ কাহারই ভাল লাগে না। যাহা প্রতিকূল ভাবে অর্থাৎ স্বভাবতঃই অপ্রিয় ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা দুঃখ। দুঃখের সহিত সকলেরই স্মৃতিরকাল হইতে পরিচয় আছে, স্মৃতিরূপ তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, ভাষায় তাহার পরিচয় দেওয়াও সহজ নহে। দুঃখের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা দুঃখ এবং তাহার ভোগ অতি সহজ। অনাদি কাল হইতে সকলেই দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং তাহার শাস্তির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে। মূলের খবর নাইলে কাহারই প্রাণে শাস্তি নাই। দুঃখনিবৃত্তির জন্য সকলেরই ইচ্ছা, সকলেরই চেষ্টা, ইহা অস্বীকার করিলে জোর করিয়া সত্যের অপলাপ করা হয়। দুঃখ বলিয়া একটা কিছু না থাকিলে তাহার সহিত অনাদি কাল হইতে নিরন্তর জীবকুলের কখনই এত সংগ্রাম চলিত না। কিন্তু নিরন্তর নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও, দুঃখের সহিত বহু বহু সংগ্রাম করিয়াও যত দিন জন্ম আছে, তত দিন কেহই দুঃখের হস্ত হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে পারিতেছে না। জন্মিলেই দুঃখ, জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি যত বড়ই হউন না কেন, দুঃখকে কেহই একেবারে তাড়াইয়া দিতে পারেন না। দুঃখভোগ সকলকেই করিতে হয়, এ সত্য চিন্তাশীলের অজ্ঞাত নহে। জন্ম হইলে দুঃখভোগ কেন অনিবার্য, সংসারী সর্বদাই দুঃখের গৃহে কেন বাস করেন, ইহাও চিন্তাশীলদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ফল কথা, বদ্ধ জীব দুঃখের কারাগারে নিয়ত বাস করিতেছে, জন্মই তাহাকে দুঃখের সহিত দুঃখের বন্ধনে বাঁধিয়াছে, ইহা ভাবিয়া বুঝিলে অবশ্যই বুঝা যাইবে। মূলকথা, জন্ম দুঃখের কারণ। এই জন্মের কারণ ধর্ম ও অধর্ম। কারণ, ধর্ম ও অধর্মের ফল সুখভোগ ও দুঃখভোগ করিবার জন্যই জীবকে বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কর্মফলানুসারে বিশিষ্ট শরীরাদি-সম্বন্ধই জন্ম। শরীরাদি ব্যতীত ধর্মাদ্বৈতের ফলভোগ হওয়া একেবারে অসম্ভব, স্মৃতিরূপ ধর্ম ও অধর্ম (যাহা শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি-(কর্ম)সাধ্য বলিয়া ‘প্রবৃত্তি’ শব্দের দ্বারাও কথিত হইয়াছে) জীবের শরীরাদি সম্বন্ধরূপ জন্ম সম্পাদন করিয়াই সুখভোগ ও দুঃখভোগ জন্মায়। এই ‘প্রবৃত্তি’র অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্মের কারণ “দোষ”। দোষ বলিতে এখানে “রাগ” অর্থাৎ বিষয়ে অভিলাষ বা আনন্দি এবং “দ্বेष”। এই রাগ ও দ্বেষবশতঃই জীব শুভ ও অশুভ

কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যিনি রাগ-দ্বेष-বর্জিত, তাহার ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই তুল্য, যিনি গীতার ভাষায় “নাভিনন্দতি ন ঘোটি,” তিনি ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট পরিহারের জন্য কোন কর্ম করেন না, তিনি আনন্দের প্রেরণায় কোন সং বা অসং কর্মে লিপ্ত হন না, তিনি বিদ্বৈ-বিদ্বৈর আগায় কাহারও কোন অনিষ্ট সাধন করিতে বান না। এক কথায় তিনি কারিক, বাচিক, মানসিক কোন শুভ বা অশুভ কর্মে আসক্ত নহেন, রাগ ও দ্বেষ না থাকায় তাহার সম্বন্ধে ঐরূপ ঘটিতেই পারে না এবং তিনি কোন কর্ম করিলেও তজ্জন্ত তাহার ধর্ম ও অধর্ম হয় না। মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যার অবিকারে থাকা পর্য্যন্তই কর্ম দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের সঞ্চয় হয়। এই রাগ ও দ্বেষের কারণ “মিথ্যাজ্ঞান”। অনাদিকাল হইতে আত্মা ও শরীরাদি বিষয়ে জীবকুলের যে নানাপ্রকার ভ্রম জ্ঞান আছে, তাহার ফলেই তাহাদিগের রাগ ও দ্বেষ জন্মে। তাহার ঐ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়াছে, যিনি প্রকৃত সত্যের দেখা পাইয়াছেন, তাহার আর রাগ ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না, কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না, মিথ্যাজ্ঞান তাহার কারণ, তাহা মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে কিরূপে হইবে? অনাদিকাল হইতে জীবের নিজ শরীরাদি বিষয়ে অহংকাররূপ মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। ঐ শরীরাদি বিষয়ে আনন্দ-বুদ্ধিরূপ অহংকারের ফলেই তাহার ইষ্ট বিষয়ে আসক্তি এবং অনিষ্ট বিষয়ে বিদ্বৈ জন্মিতেছে এবং আরও বহু বহু প্রকার মিথ্যাজ্ঞান জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে বদ্ধ করিতেছে। এই সকল সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের মহিমায় জীবের রাগ ও দ্বেষ জন্মে। রাগ ও দ্বেষবশতাই শুভ ও অশুভ কর্ম করিয়া জীব ধর্ম ও অধর্ম সঞ্চয় করে, তাহার ফলভোগের জন্য আবার জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিলেই ছুঃখ অনিবার্য্য। সুতরাং বুঝা যায়, যে ছুঃখের তাবী আক্রমণ নিবারণ জন্য জীবগণের এত ইচ্ছা, এত চেষ্টা, এত সংগ্রাম, তাহার মূলই “মিথ্যাজ্ঞান”। সত্যজ্ঞান ব্যতীত এ মিথ্যাজ্ঞান কখনই বাইতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞানের সুদৃঢ় সংস্কার ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞানের কুসংস্কার আর কিছুতেই বাইতে পারে না। রাজুর প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন উপায়েই তাহাতে স্পর্শভ্রম বিনষ্ট হয় না—হইতে পারে না। সুতরাং ছুঃখনিবৃত্তি করিতে হইলে, চিরকালের জন্য ছুঃখভয় হইতে মুক্ত হইতে হইলে তাহার মূল “মিথ্যাজ্ঞান”কে একেবারে বিনষ্ট করিতে হইবে। রোগের নিদান একেবারে উচ্ছিন্ন না হইলে রোগের আক্রমণ একেবারে বন্ধ হয় না, সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে।—সুতরাং সত্যজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। যে বিষয়ে যেরূপ মিথ্যাজ্ঞান আছে, সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত জ্ঞানই “তত্ত্বজ্ঞান”। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে উহা লাভ করিলে পরক্ষণেই মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইবে। তত্ত্বজ্ঞানজন্য সংস্কারে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সংস্কারের উচ্ছেদ হইলেই কারণের অভাবে রাগ ও দ্বেষ আর জন্মিল না। রাগ ও দ্বেষ না থাকায় আর ধর্ম্যধর্ম জন্মিল না, তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় পূর্বসংস্কৃত ধর্ম্যধর্ম বিনষ্ট হইয়া গেল, ধর্ম্যধর্মের অভাবে আর জন্ম হইতে পারিল না, জন্ম না হইলে আর ছুঃখের সম্ভাবনাই থাকিল না, প্রারম্ভ কর্মভোগান্তে বর্তমান জন্মটা নষ্ট হইয়া গেলেই সব গেল, তখনই নির্লীল, তখনই সর্ব ছুঃখের চিরশান্তি।

ভাষ্য। তত্র আত্মাদ্যপবর্গপর্য্যন্তপ্রমেয়ে মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারকং
বর্ততে। আত্মনি তাবমান্তীতি। অনাত্মন্যাত্মেতি, দুঃখে সুখমিতি, অনিত্যে
নিত্যমিতি, অত্রাণে ত্রাণমিতি, সভয়ে নির্ভয়মিতি, জুগুপ্সিতেহভিমত-
মিতি, হাতব্যেহপ্রতিহাতব্যমিতি। প্রবৃত্তৌ—নাস্তি কৰ্ম্ম, নাস্তি কৰ্ম্মফল-
মিতি। দোষেষু—নায়াং দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি। প্রেত্যভাবে—
নাস্তি জন্তুজ্জীবো বা সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেয়াং প্রেত্য চ ভবেদিতি।
অনিমিত্তং জন্ম, অনিমিত্তো জন্মোপরম ইত্যাদিমান্ প্রেত্যভাবোহনন্ত-
শ্চেতি। নৈমিত্তিকঃ সমকৰ্ম্মনিমিত্তঃ প্রেত্যভাব ইতি। দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধি-
বেদনা-সন্তানোচ্ছেদ-প্রতিসন্ধানাভ্যাং নিরাস্তকঃ প্রেত্যভাব ইতি।
অপবর্গে—ভীষ্মঃ খল্লয়ং সৰ্ব্বকার্যোপরমঃ সৰ্ব্ববিপ্রয়োগেহপবর্গে বহু
ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সৰ্ব্বহুখোচ্ছেদমচৈতন্যমমুমপবর্গং
রোচয়েদিতি।

অনুবাদ। * সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত “প্রমেয়” বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান
অনেক প্রকার আছে। (তন্মধ্যে কতকগুলি দেখাইতেছেন।) আত্মবিষয়ে “নাই”
অর্থাৎ আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে (দেহাদিতে) “আত্মা” এইরূপ
জ্ঞান। (এখন শরীর হইতে মনঃ পর্য্যন্ত “প্রমেয়” বিষয়ে সামান্যতঃ কতকগুলি
মিথ্যাজ্ঞান দেখাইতেছেন)।—দুঃখে—সুখ, এইরূপ জ্ঞান। অনিত্যে—নিত্য, এইরূপ
জ্ঞান। অত্রাণে—ত্রাণ, এইরূপ জ্ঞান। সভয়ে—নির্ভয়, এইরূপ জ্ঞান। নিন্দিতে—
অভিमत, এইরূপ জ্ঞান। ত্যাগ্যে—অত্যাগ্য, এইরূপ জ্ঞান। (এখন “প্রবৃত্তি”
প্রভৃতি “অপবর্গ” পর্য্যন্ত প্রমেয়ে বিশেষ করিয়া কতকগুলি মিথ্যাজ্ঞান দেখাইতে-
ছেন)।—প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিষয়ে—কৰ্ম্ম নাই, কৰ্ম্মফল নাই, এইরূপ জ্ঞান।
দোষ অর্থাৎ রাগদ্বेषাদি বিষয়ে—এই সংসার-দোষ নিমিত্তক অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-জন্ম
নহে, এইরূপ জ্ঞান। “প্রেত্যভাব” বিষয়ে (পুনর্জন্ম বিষয়ে)—যিনি মরিবেন
এবং মরিয়া জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব নাই, সত্ত্ব বা আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান।

* আত্মা, শরীর, ত্রাণাদি বহিঃকিঞ্চিৎ, রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্ণব, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ, এই ষাটশব্দ পদার্থকে মহর্ষি প্রবেশ নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। এই প্রমেয় বিষয়ে বহুবিধ মিথ্যাজ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান এবং এই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান। ভাষ্যকার সেই মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা করিয়াছেন।

জন্ম কাৰণশৃংখা,—জন্মের নিবৃত্তি কাৰণশৃংখা ; অতএব প্রেত্যভাব সাদি এবং অনন্ত, এইরূপ জ্ঞান । প্রেত্যভাব নিমিত্ত-জ্ঞাত হইলেও কৰ্ম্মনিমিত্তক নহে, এইরূপ জ্ঞান । * ‘দেহ’, ‘ইন্দ্রিয়’, ‘বুদ্ধি’, ‘বেদনা’ অৰ্থাৎ সূখ-দুঃখ, ইহাদিগের যে সম্ভাৱন অৰ্থাৎ সম্ভাৱিত বা সমষ্টি, তাহাৰ উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান বশতঃ অৰ্থাৎ ঐ দেহাদিৰ এক সমষ্টিৰ নাশের পৰে তত্ত্ৰাতীৰ্য্য অত্ৰ এক সমষ্টিৰ উৎপত্তি হয় বলিয়া, “প্ৰেত্যভাব” নিৰাত্মক অৰ্থাৎ তাহাতে আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান । অপবৰ্গ-বিষয়ে—সৰ্বকৰ্ম্মোপৰতি অৰ্থাৎ যাহাতে সৰ্বকৰ্ম্মোৰ নিবৃত্তি হয়, এমন, এই অপবৰ্গ ভয়ানক । সৰ্ববিপ্ৰয়োগ অৰ্থাৎ যাহাতে সকল পদাৰ্থের সহিত বিচ্ছেদ হয়, এমন অপবৰ্গে বহু শুভ নষ্ট হয়, সূতরাং কেমন কৰিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহাতে সকল সূখের উচ্ছেদ হয় এবং যাহাতে কিছুমাত্ৰ জ্ঞান থাকে না, এমন, এই অপবৰ্গকে ভালবাসিবে ? এইরূপ জ্ঞান (মিথ্যাজ্ঞান) ।

ভাষ্য । এতন্মান্মিথ্যাজ্ঞানাদনুকূলেষু রাগঃ প্ৰতিকূলেষু দ্বেষঃ । রাগদ্বৈষাধিকারাত্মনোৰ্য্যামাৱলোভাদয়ো দোষা ভবন্তি । দোষৈঃ প্ৰযুক্তঃ শৰীৰেণ প্ৰবৰ্ত্তমানো হিংসাস্তেয়প্ৰতিবিক্ৰমৈধুনাত্মাচরতি । বাচাহনৃতপৰুসসূচনাসম্বন্ধানি । মনসা পৰদ্রোহং পৰদ্রব্যভীপ্সাং নাস্তিক্য-ক্ষেতি । সেয়ং পাপাত্মিকা প্ৰবৃত্তিৰধৰ্ম্মায় । অথ শুভা—শৰীৰেণ দানং পৰিত্ৰাণং পৰিচরণঞ্চ । বাচা সত্যং হিতং প্ৰিয়ং স্বাধ্যায়ক্ষেতি । মনসা দয়ামম্পৃহাং শ্ৰদ্ধাক্ষেতি । সেয়ং ধৰ্ম্মায় । অত্ৰ প্ৰবৃত্তিসাধনৌ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ “প্ৰবৃত্তি”শব্দেনোক্তৌ । যথা অন্নসাধনাঃ প্ৰাণাঃ—“অন্নং বৈ প্ৰাণিনঃ প্ৰাণাঃ” ইতি । সেয়ং প্ৰবৃত্তিঃ কুৎসিতস্তাভিপূজিতস্ত চ জন্মনঃ কাৰণং । জন্ম পুনঃ শৰীৰেন্দ্রিয়বুদ্ধীনাং নিকায়বিশিষ্টঃ প্ৰাতুৰ্ভাবঃ । তস্মিন্ সতি দুঃখং । তৎ পুনঃ প্ৰতিকূলবেদনীয়ং বাধনা পীড়া তাপ ইতি । ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখাস্তা ধৰ্ম্মা অবিচ্ছেদেনৈব প্ৰবৰ্ত্তমানাঃ সংসার ইতি । যদা তু তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে

* দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং সূখ-দুঃখ, ইহাদিগের সমষ্টি-বিশেষই জীব । উহা ছাড়া অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই, ইহা বাহ্যৰা বলেন, তাহাদিগকে নৈৱাত্মা-বাদী বলে । তাহাদিগের জ্ঞান এই যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সূখ-দুঃখের এক সমষ্টিৰ উচ্ছেদ হইলে, আর একটি পূৰ্ণোক্ত দেহাদি-সমষ্টিৰ উৎপত্তি হয়, এই ভাবেই সংসার হইতেছে—ইহাৰ মধ্যে নিত্য আত্মা কেহ নাই । কোন নিত্য আত্মাই যে ঐরূপ দেহাদি সমষ্টি লাভ কৰিতেছেন, তাহা নহে, সূতরাং প্ৰেত্যভাব নিৰাত্মক । ভাষ্যকাৰ এই জ্ঞানকে প্ৰেত্যভাব বিষয়ে এক প্ৰকাৰ মিথ্যা জ্ঞান বলিয়াছেন ।

দোষা অপযন্তি । দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি । প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি ।
জন্মাপায়ে দুঃখমপৈতি, দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোহপবর্গো নিঃশ্রেয়স-
মিতি ।

অনুবাদ । (ভাষ্যকার সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া এখন
সূত্রোক্ত “মিথ্যাজ্ঞান,” “দোষ,” “প্রবৃত্তি,” “জন্ম,” “দুঃখ,” এই কয়েকটি পদার্থের
কার্য-কারণ-ভাব এবং ঐ “দোষ,” “প্রবৃত্তি,” “জন্ম” এবং “দুঃখের” স্বরূপ প্রকাশ
করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন ।) এই মিথ্যাজ্ঞান (পূর্ববর্ণিত মিথ্যাজ্ঞান)
বশতঃ অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে ঘেঘ জন্মে । রাগ ও ঘেঘের
অধিকারবশতঃ অসত্য, ঈর্ষ্যা, কপটতা, লোভ প্রভৃতি দোষ জন্মে । দোষকর্তৃক
প্রেরিত জীব প্রবর্তমান হইয়া শরীরের দ্বারা হিংসা, চোঁধ্য এবং নিষিদ্ধ মৈথুন আচরণ
করে । বাক্যের দ্বারা মিথ্যা, পরুষ (কটুক্তি), সূচনা (পর-দোষ-প্রকাশ), অসম্বন্ধ
(প্রলাপাদি) আচরণ করে । মনের দ্বারা পরদ্রোহ, পর-দ্রব্যের প্রাপ্তি কামনা এবং
নাস্তিকতা আচরণ করে । সেই এই পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি অধর্মের নিমিত্ত হয় । অনন্তর
শুভা প্রবৃত্তি (বলিতেছি) । শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ এবং পরিচর্যা আচরণ করে ।
বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় এবং স্বাধ্যায় (বেদ-পাঠাদি) আচরণ করে । মনের
দ্বারা দয়া নিষ্পৃহতা এবং শ্রদ্ধা আচরণ করে । সেই এই শুভা প্রবৃত্তি ধর্মের নিমিত্ত
হয় । এই সূত্রে প্রবৃত্তি-সাধন অর্থাৎ প্রবৃত্তি যাহাদিগের সাধন, এমন ধর্ম ও অধর্ম
“প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । যেমন প্রাণ অন্ন-সাধন অর্থাৎ অন্ন-সাধ্য ।
(বেদ বলিয়াছেন) “অন্ন প্রাণীর প্রাণ” (অর্থাৎ যেমন প্রাণের সাধন অন্নকে অন্ন
প্রাণ বলিয়াছেন, তদ্রূপ মহর্ষি এই সূত্রে ধর্মাদ্বৈতের সাধন প্রবৃত্তিকে ধর্মাদ্বৈত
বলিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্মাদ্বৈত অর্থে প্রবৃত্তি শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন ।) সেই
এই ধর্ম ও অধর্মরূপ প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জন্মের কারণ । “জন্ম” বলিতে,
শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির নিকারবিশিষ্ট প্রাচুর্যব অর্থাৎ উহাদিগের সংঘাতভাবে
(মিলিত ভাবে) উৎপত্তি । সেই জন্ম থাকিলে দুঃখ থাকে । সেই “দুঃখ”
বলিতে প্রতিকূল-বেদনীয় * বাধনা, পীড়া, তাপ । অবিচ্ছেদেই প্রবর্তমান অর্থাৎ
অনাদি কাল হইতে যাহা কার্য-কারণ-ভাবেই উৎপন্ন হইতেছে, এমন সেই এই

* “প্রতিকূল-বেদনীয়”—অর্থাৎ যাহা প্রতিকূল ভাবে, অর্থাৎ ভাল লাগে না—এই ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় ।
“বাধনা”, “পীড়া”, “তাপ”, এই তিনটি দুঃখবোধক পদার্থ শব্দ । ভাষ্যকার “দুঃখ”কে বিপরীতপন্থে বুঝাইবার জন্য ঐ
তিনটি পদার্থ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । অর্থাৎ যাহাকে “বাধনা”, “পীড়া” ও “তাপ” বলে, তাহাই দুঃখ ।

মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি (পূর্বোক্ত) দুঃখ-পর্যন্ত ধর্মই সংসার। যে সময়ে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান-হেতুক মিথ্যাজ্ঞান অপগত হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে (তাহার কার্য) দোষগুলি অপগত হয়। দোষের নিবৃত্তি হইলে “প্রবৃত্তি” (ধর্মাধর্ম) অপগত হয়। প্রবৃত্তির অপায় হইলে “জন্ম” অপগত হয়। জন্মের নিবৃত্তি হইলে দুঃখ নিবৃত্ত হয়। দুঃখের নিবৃত্তি (আত্যন্তিক অভাব) হইলে, আত্যন্তিক অপবর্গরূপ অর্থাৎ পরা মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স হয়।

ভাষ্য। তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্যয়াণ ব্যাখ্যাতং। আত্মনি তাবদন্তীতি অনাত্মন্যনাত্মেতি। এবং দুঃখে নিত্যে ত্রাণে সভয়ে জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যম্। প্রবৃত্তৌ—অস্তি কর্ম, অস্তি কর্মফলমিতি। দোষেষু—দোষনিমিত্তোহয়ং সংসার ইতি। প্রেত্য-ভাবে খল্বস্তি জন্তুর্জীবঃ সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেত্য ভবেদिति। নিমিত্তবজ্জন্ম, নিমিত্তবান্ জন্মোপরম ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোহপবর্গান্ত ইতি। নৈমিত্তিকঃ সন্ প্রেত্যভাবঃ প্রবৃত্তিনিমিত্ত ইতি। সাত্মকঃ সন্ দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধি-বেদনা-সন্তানোচ্ছেদপ্রতিসন্ধানাভ্যাং প্রবর্তত ইতি। অপবর্গে—শান্তঃ খল্বয়ং সর্ববিপ্রয়োগঃ সর্বোপরমোহপবর্গঃ, বহু চ কৃচ্ছং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্বদুঃখোচ্ছেদং সর্বদুঃখাসংবিদমপবর্গং ন রোচয়েদिति। তদযথা—মধুবিষ-সম্পৃক্তাম্রমনাদেয়মিতি, এবং সুখং দুঃখানুযুক্তমনাদেয়মিতি। ২।

অনুবাদ। তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (সে কিরূপ, তাহা নিজেই স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেছেন।) আত্মবিষয়ে “আছে” অর্থাৎ আত্মা আছে, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে (দেহাদিতে) অনাত্মা (আত্মা নহে), এইরূপ জ্ঞান। এইরূপ (পূর্বোক্ত) দুঃখে, নিত্যে, ত্রাণে, সভয়ে, নিন্দিতে এবং ত্যাজ্য বিষয়ে বিবয়ানুসারে (তত্ত্বজ্ঞান) জানিবে। (দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি ইত্যাদি)। প্রবৃত্তি বিষয়ে—কর্ম আছে, কর্মফল আছে, এইরূপ জ্ঞান। দোষ বিষয়ে—এই সংসার দোষজন্তু, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব বিষয়ে—যিনি মরিয়া জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব আছেন, সত্ত্ব বা * আত্মা আছেন, এইরূপ

* “জন্তু” বলিয়া পেয়ে আবার জীব বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। “সত্ত্ব” বলিয়া পেয়ে আবার “আত্মা” বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। ঐ সকল শব্দ প্রাচীন কালে এক অর্থে প্রযুক্ত হইত। বিশদ

জ্ঞান। জন্ম কারণজ্ঞ, জন্মের নিবৃত্তি কারণজ্ঞ; স্মৃতির প্রত্যভাব অনাদি মোক্ষ-পর্যন্ত, এইরূপ জ্ঞান। প্রত্যভাব কারণ-জ্ঞ হইয়া প্রবৃত্তি-জ্ঞ অর্থাৎ ধর্মাদর্শ-জ্ঞ, এইরূপ জ্ঞান। “সাম্বন্ধক” হইয়াই অর্থাৎ প্রত্যভাব দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-সমষ্টির উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান। অপবর্গ বিষয়ে—যাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিয়োগ হয়, যাহাতে সর্বকর্মের নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ শাস্ত (ভয়ানক নহে) এবং (ইহাতে) বহু কর্মকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়; স্মৃতির বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে কেন ভালবাসিবেন না, এইরূপ জ্ঞান। অতএব যেমন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহ্য, তদ্রূপ দুঃখানুযুক্ত সুখ অগ্রাহ্য, * এইরূপ জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান)।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এই কথা বলিয়া নিঃশ্রেয়সই তাঁহার জ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রয়োজন-জ্ঞান ব্যতীত তাহার চর্চার কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, এ জ্ঞান শাস্ত্রকারগণ প্রথমেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হুচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রয়োজন কিরূপে সেই শাস্ত্র-সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ কোন্ যুক্তিতে সেই প্রয়োজনটি সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহা না বলিলে সেই প্রয়োজন হুচনার কোন ফল হয় না। স্মৃতির শাস্ত্রকারের যুক্তির দ্বারা প্রয়োজন পরীক্ষা করা কর্তব্য। যে যুক্তিতে শাস্ত্রকারোক্ত প্রয়োজনটি তাঁহার শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া বুঝা যায়, সেই যুক্তির হুচনাই প্রয়োজনের পরীক্ষা।

অপবর্গ ভিন্ন অস্তান্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন হইলেও, সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। সেগুলি জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন কিরূপে হয়, তাহাতে জ্ঞানবিদ্যার আবশ্যিকতা কি, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ভাষ্যকারও জ্ঞানবিদ্যা সর্কবিদ্যার প্রদীপ, সর্ককর্মের উপায় এবং সর্কধর্মের আশ্রয়রূপে বিদ্যার পরিগণনাত্ত্ব লক্ষিত আছে, এই কথা বলিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু অন্যান্যবিদ্যারূপ জ্ঞানবিদ্যার যাহা মুখ্য প্রয়োজন, প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা মহর্ষি

বোধনের ভিত্তি প্রাচীনগণ ঐক্য একার্থ শব্দের দ্বারা বিবরণ করিয়াছেন। এই ভাষ্যে বহু স্থলেই ঐক্য বিবরণ আছে। স্বপনবর্ণনও ভাষ্যের একটি লক্ষণ।

* সুখ দুঃখানুযুক্ত অর্থাৎ দুঃখের অনুযুক্ত। এই অনুযুক্তবাখ্যা বার্তিককার চারি প্রকার বলিয়াছেন। ১। অনুবদ্য অর্থাৎ অবিনাশ্যব সঞ্চ। যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখ এবং যেখানে দুঃখ, সেখানে সুখ। ইহাই সুখ-দুঃখের অবিনাশ্যব। ২। অথবা সমান-নিমিত্ততাই অনুবদ্য। যাহা যাহা দুঃখের সাধন, তাহাই দুঃখের সাধন। ৩। অথবা সমানোপ-লভ্যতাই অনুবদ্য। যিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন, তিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন। ভাষ্যের সর্কশেষবর্তী ইতি শব্দটি সূত্রের সমাপ্তিবোধক।

বাহাকে মুখ্য প্রয়োজনরূপে হুচনা করিয়াছেন, তাহা কিরূপে এই জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন হয়, বোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কেমন করিয়া অপবর্গরূপ অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের সাধন হয়, ইহা সহজে বুঝা যায় না; ইহা বুঝাইয়া না দিলে ঐ অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজন কেহ বুঝিয়া লইতে পারে না, তাহা না বুঝিলেও উহা জ্ঞানবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন, এ কথা বলিয়াও কোন ফল হয় না। এই জ্ঞান মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথম সূত্রোক্ত জ্ঞানবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা করিয়াছেন। অপবর্গরূপ প্রধান প্রয়োজনই মহর্ষির প্রধান লক্ষ্য, সুতরাং দ্বিতীয় সূত্রেই সেই কথা বলিয়াছেন, তাহাতে পরা মুক্তির ক্রম প্রতিপাদন হইয়াছে এবং আত্মাদি প্রমের পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই যে অপবর্গের সাধন কারণ, ইহা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এইরূপ অনেক তত্ত্বই সূচিত হইয়াছে। হুচনার জন্যই সূত্র। এক সূত্রের দ্বারা অনেক স্থলে বহু তত্ত্বই সূচিত হইয়াছে। সূত্রগ্রন্থের উহা একটি বিশেষত্ব। মহর্ষির দ্বিতীয় সূত্রে সূচিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই মোক্ষসাধন নহে, মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়াই উহা মোক্ষসাধন হয়। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আর কিছুতেই থাকিতে পারে না, ইহা সর্বসিদ্ধ। সুতরাং এই সর্বসিদ্ধ যুক্তিতে বুঝা যায়, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নাশক। তাহা হইলে যে সকল মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেগুলি বিনষ্ট হইলে অবশ্য মোক্ষ হইবে। সংসারের নিদান উচ্ছিন্ন হইলে আর সংসার হইতে পারে না, সুতরাং সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জ্ঞাত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেই তত্ত্বজ্ঞানে যখন ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক, তখন অপবর্গকে ন্যায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বলা যাইতে পারে। ফলতঃ এই ভাবে দ্বিতীয় সূত্রে প্রথম সূত্রোক্ত মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা হইয়াছে।

এই সূত্রে “তত্ত্বজ্ঞান” শব্দ না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির কথা থাকায় তত্ত্বজ্ঞানের কথা পাওয়া গিয়াছে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি আর কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহা সর্বসিদ্ধ। * মিথ্যাজ্ঞান বলিতে অসত্য জ্ঞান, বাহা “তাত্ত্ব” নয়, তাহাকে “তাহা” বলিয়া জ্ঞান; তাহা হইলে বুঝা গেল, বিপরীত ভ্রম জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। কিন্তু এই মিথ্যা জ্ঞান কোন্ বিষয়ে কি প্রকার, তাহা বুঝিতে হইবে। দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞানই এই সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে দোষের নিবৃত্তি হয়, এ কথা এই সূত্রে বলা হইয়াছে। কারণের নিবৃত্তিতেই কার্যের নিবৃত্তি বলা যায়, মহর্ষিও এই সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। মহর্ষি তাহার “প্রমের” পদার্থের মধ্যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন এবং চতুর্থাধ্যায়ে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে “দোষ” বলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে মোহই সকলের মূল, মোহই সকল অনর্গলের নিদান বলিয়া দোষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকট; কারণ, মোহ ব্যতীত রাগ ও দ্বেষ জন্মে না, এ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং সেই মোহই এই সূত্রে “মিথ্যাজ্ঞান,” ইহা বুঝা যায় এবং মিথ্যাজ্ঞানের পৃথক উল্লেখ থাকায় তাহার কার্য রাগ ও দ্বেষই এই সূত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা

* পরে মহর্ষিসূত্রেও এ কথা পাওয়া যায়—“মিথ্যাপলঙ্ঘনবিনাশতত্ত্বজ্ঞানঃ”—ইত্যাদি সূত্র [৪২] ৩৫।

উক্ত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়; ভাষ্যকার প্রভৃতিও তাহাই বুঝিয়াছেন। অবশ্য মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন “সংশয়” প্রভৃতি আরও মোহ আছে, মোহের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারও তাহা বলিয়াছেন, সেগুলিও রাগ ও ঘেব জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেগুলিও নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এখানে বিপরীত নিশ্চয়রূপ মিথ্যা জ্ঞানই মহর্ষির বক্তব্য; কারণ, তাহাই সংসারের নিদান। এখানে মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান মহর্ষির বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বনিশ্চয়। নিশ্চয়ান্বক মোহের বিপরীত জ্ঞানই তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে। সুতরাং “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত নিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞানের নাশকরূপে সূচিত করিবার জন্য মহর্ষি অন্যত্র স্বরাক্ষর “মোহ” শব্দের প্রয়োগ করিলেও এই সূত্রে “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও “বিপর্যয়” বৃত্তির ব্যাখ্যায় “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। (“বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতজ্ঞাপ্রতিষ্ঠাং”—যোগসূত্র। ৮) ভাষ্যকার অন্যত্র মিথ্যাজ্ঞান অর্থে “মোহ” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও করা বাইতে পারে। কারণ, মিথ্যাজ্ঞানও মোহ এবং মোহের মধ্যে মিথ্যা জ্ঞানরূপ নিশ্চয়ান্বক মোহই প্রধান।

সূত্রে যখন “মিথ্যাজ্ঞানে”র নিবৃত্তিতে রাগ ও ঘেব প্রভৃতি দোষের নিবৃত্তিক্রমে মোক্ষলাভের কথা বলা হইয়াছে, তখন যে সকল বিষয়ে বেরূপ মিথ্যাজ্ঞান অনাদিকাল হইতে জীবের রাগ-ঘেবাদির নিদান হইয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত মিথ্যাজ্ঞান, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি চতুর্থাধ্যায়ে বলিয়াছেন—“দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তিঃ” (৪।২।১)। অর্থাৎ যে সকল পদার্থ পূর্বোক্ত দোষের নিমিত্ত, তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইলে অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। শরীরাদি পদার্থে জীবের যে আত্মবোধ বা আত্মবুদ্ধি আছে, তাহাই অহঙ্কার। জীব মাত্রেরই উহা আজন্মসিদ্ধ। মহর্ষি গোতমের মতে উহাই উপনিষদ্রূপ “হৃদয়গ্রন্থি”। উহার নিবৃত্তি করিতে হইলে আত্মা শরীরাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন, এইরূপ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার আবশ্যক। আর কিছুতেই ঐ অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে না। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান হইয়াছে, সেই বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত ঐ মিথ্যাজ্ঞান আর কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না, ইহা লোকসিদ্ধ—সর্বসিদ্ধ। মহর্ষি গোতমোক্ত দ্বাদশ প্রকার প্রমেষের মধ্যে শরীরাদি দশ প্রকার পদার্থ পূর্বোক্ত দোষের নিমিত্ত; এ জন্ত উহাদিগকে “হেয়” বলা হয়। হুংথই হেয় এবং হুংথের নিমিত্তগুলিও হেয়। শরীরাদি দশ প্রকার প্রমেষের মধ্যে একটি হুংথ এবং আর নয়টি হুংথের হেতু; সুতরাং ঐ দশটি হেয় এবং মোক্ষটি আত্মার “অধিগম্য” অর্থাৎ লাভ, জীবাত্মা উহা লাভ করিবে। এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই মহর্ষি গোতম “প্রমেষ” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। ইহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। কারণ, এই সকল পদার্থ-বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান থাকা পর্যন্ত জীবের রাগঘেব থাকিবেই। তন্মধ্যে শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান বাহা সকল জীবের আজন্মসিদ্ধ এবং যাহা সকল মিথ্যাজ্ঞানের মূল, সেই অহঙ্কাররূপ মিথ্যা জ্ঞানবশতঃ জীব নিজের শরীরাদির উচ্ছেদকেই নিজের আত্মার উচ্ছেদ মনে করে। সুখে যিনি বাহাই বস্তু, আত্মার উচ্ছেদ কাহারই

কাম্য নহে। পরন্তু জীব মাত্রই আত্মার উচ্ছেদভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার অনুরূপ বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিবেচন করে। এইরূপ নানাবিধ রাগ-বোধের ফলে জীব নানাবিধ কৰ্ম্ম করিয়া আবারও শরীর গ্রহণ করে। এইরূপ ভাবে অনাদি কাল হইতে জীবের জন্ম-মরণ-প্রবাহ চলিতেছে। ঐ প্রবাহ একেবারে রুদ্ধ করা ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক জুংখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। উহা রুদ্ধ করিতে হইলেও উহার মূল অহঙ্কারকে একেবারে রুদ্ধ করিতে, বিনষ্ট করিতে হইবে এবং জীবের আরও কতকগুলি মিথ্যা জ্ঞান আছে, বাহা আত্মসম্বন্ধ না হইলেও সময়ে উপস্থিত হইয়া জীবের মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয়। পুনর্জন্ম নাই, মোক্ষ নাই, ইত্যাদি প্রকার অনেক মিথ্যা জ্ঞান জীবকে মোক্ষসাধনে অনেক পশ্চাৎ-পদ করিয়া এবং আরও বিবিধ রাগ-বোধের উৎপাদন করিয়া সংসারের নিদান হয়। স্তুরাং সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতীত মোক্ষের আশা নাই। এ জন্ত মহর্ষি গোতম যে সকল পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান, সেই সকল পদার্থকেই দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত করিয়া “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। এই সূত্রে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে মোক্ষের কথা বলায়, সেই আত্মাদি “প্রমেয়”বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই তাহার বুদ্ধিভ্রম, ইহা বুঝা যায়। স্তুরাং ঐ প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাও এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই যখন সংসারের নিদান, তখন প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থ সাক্ষাৎকার তাহা নিবৃত্ত করিতে পারে না। এক বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান অল্প বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকারে কখনই নষ্ট হয় না। স্তুরাং মহর্ষি-কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বুঝা গেল। “হেয়,” “হান,” “উপায়,” “অধিগম্যব্য”—এই চারিটিকে “অর্থপদ” বলে। ইহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকার মোক্ষে আবশ্যক এবং দ্বিতীয় সূত্রে তাহা ব্যক্ত আছে, এ কথা ভাব্যকারও পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন। হেয় কি, তাহা সম্যক্ না বুঝিলে, তাহার একেবারে ত্যাগ হইতে পারে না এবং বাহা “অধিগম্যব্য”, তদ্বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান থাকিলেও তাহা পাওয়া যায় না। সকল মিথ্যাজ্ঞানের মূল অহঙ্কার নিবৃত্তি করিতে না পারিলেও শরীরাদি হেয় পদার্থকে ত্যাগ করিতে পারে না। স্তুরাং ভাষ্যাক্ত চারিটি “অর্থপদকে” সম্যক্ বুঝিতে গেলে আত্মাদি দ্বাদশ “প্রমেয়” সাক্ষাৎকারই করিতে হইবে, ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, মহর্ষির সকল কথা (চতুর্থধ্যায় স্রষ্টব্য) পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনি আত্মাদি “প্রমেয়”বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানকেই সংসারের নিদান বলিয়া ঐ “প্রমেয়” তত্ত্বসাক্ষাৎকারকেই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়াছেন। ভাব্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণও তাহাই বুঝিয়া গিয়াছেন। এ জন্ত ভাব্যকার এখানে মহর্ষি-কথিত আত্মাদি দ্বাদশ “প্রমেয়” বিষয়েই মিথ্যাজ্ঞানের প্রকার বর্ণনা করিয়া সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানগুলির প্রকার দেখাইয়া প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞানের আকার দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ ঐ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানগুলিকেই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখানে একটি বিশেষ প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি গোতম যে প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণরূপে স্থচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কেন? ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান কি মোক্ষের কারণ নহে? ঈশ্বর কি মুমুকুর প্রমেয় নহেন? কেবল গোতমোক্ত প্রমেয় পদার্থের মধ্যেই নহে, প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের মধ্যেই ঈশ্বর নাই, ইহার গূঢ় কারণ কি? মহর্ষি গোতম কি নিরীশ্বরবাদী? অথবা ঈশ্বর মানিয়াও মোক্ষে ঈশ্বরজ্ঞানের কোন আবশ্যকতা স্বীকার করেন না? ভাষ্যকার প্রভৃতি ভাষ্যচার্য্যগণ এ প্রশ্নের কোন অবতারণাই করেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বর প্রসঙ্গে (৪১।১৯২০২১সূত্রে) ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঈশ্বর সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু গোতমোক্ত বোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই কেন, ইত্যাদি কথার কোন অবতারণাই করেন নাই।

ভাষ্যবিদ্যার যথামতি পর্যালোচনার দ্বারা আমার বাহা বোধ হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহার কিছু আভাস দিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি “হেয়”, “অবিগন্তব্য” এবং “অসিদ্ধা” এইগুলি ধরিয়াই দ্বাদশপ্রকার প্রমেয় বলিয়াছেন। তন্মধ্যে মোক্ষ “অবিগন্তব্য”, জীবাত্মা তাহার “অসিদ্ধা”, অর্থাৎ জীবাত্মাই মোক্ষলাভ করেন। শরীরাদি আর দশটি “হেয়”। বাহা চুঃখ, তাহাই ত মুমুকুর হেয় (তাজ্য)। চুঃখের হেতুগুলিও সেই জন্ত হেয়। ঈশ্বর হেয় নহেন, ইহা সর্বসম্মত। গোতম মতে ঈশ্বর মুমুকুর “অবিগন্তব্য”ও নহেন, মোক্ষের “অবিগন্তব্য” অর্থাৎ জীবাত্মাও নহেন। বাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবৈত সিদ্ধান্তের বর্ণনার জন্ত এবং সেই সিদ্ধান্তানুসারে মোক্ষের উপায় বর্ণনার জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরকেই মুমুকুর “অবিগন্তব্য” বলিয়াছেন এবং বলিতে পারেন। শুদ্ধাৰ্থত মতে মোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, জীবাত্মা ও ব্রহ্মে বাস্তব কোন ভেদ নাই, সূতরাং সে মতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবাত্মসাক্ষাৎকার। সে মতে ব্রহ্মের কথা আর জীবাত্মার কথা ফলে একই কথা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেই সে মতে জীবাত্মসাক্ষাৎকার হইল, সর্বসাক্ষাৎকারই হইল। সূতরাং সেই সকল শাস্ত্রে ব্রহ্মের কথাই প্রধানরূপে—বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই সেই সকল শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য। কারণ, সে মতে ব্রহ্মের প্রতিপাদনেই জীবাত্মা ও মোক্ষের স্বরূপ প্রতিপাদন হয়। সে মতেও জীবাত্ম-সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, তবে ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকারই চরম কর্তব্য, এ জন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারই মোক্ষের চরম কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাহারা পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার বাস্তব অত্যন্ত ভেদ পক্ষ অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ বলিতে পারেন না। তাঁহাদিগের মতে মোক্ষ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ, সূতরাং ব্রহ্ম মুমুকুর অবিগন্তব্য নহেন। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মোক্ষই মুমুকুর অবিগন্তব্য অর্থাৎ লভ্য এবং তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্ম সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া অবিগন্তব্য হইতেও পারেন না। কারণ, সিদ্ধ পদার্থে ইচ্ছা হয় না। বাহা অসিদ্ধ, উপায়লভ্য, তাহাই ইচ্ছার বিষয় হইয়া অবিগন্তব্য হইতে পারে। আত্যন্তিক চুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অসিদ্ধ বলিয়া, উপায়লভ্য বলিয়া অবিগন্তব্য হইতে পারে। ঐ মোক্ষপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা হয়। বস্তুতঃ উহা ছাড়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি আর কিছু নাই—বাহা নিত্য-সিদ্ধ, বিশ্বব্যাপী পদার্থ,

তাহার অপ্রাপ্তি অসম্ভব, এ জন্য ব্রহ্মকে “অবিগন্তব্য” বা প্রাপ্য বলা যায় না। মোক্ষবাদী সকল সম্প্রদায়ই মোক্ষকেই জীবের “অবিগন্তব্য” বলিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় মোক্ষকে ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই “অবিগন্তব্য” বলিয়াছেন। সেই মোক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্ম উপাস্ত, ব্রহ্ম ধ্যেয়, ব্রহ্ম জ্ঞেয়, কিন্তু ব্রহ্ম “অবিগন্তব্য” নহেন। ব্রহ্ম অসিদ্ধ নহেন বলিয়াও মোক্ষের উপায়ের দ্বারা লাভ্য নহেন। মহর্ষি গোতম দ্বৈত পক্ষ অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় বলিয়াছেন এবং ন্যায়বিদ্যার “প্রস্থানা” হুসারে মোক্ষোপায়ের কোন অংশবিশেষই বিশেষরূপে বলিয়াছেন, এ জন্য তিনি “প্রমেয়” মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। জীবাশ্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই তিনি “প্রমেয়” বলিয়াছেন অর্থাৎ “হেয়”, “অবিগন্তব্য” এবং “অবিগন্তা” অর্থাৎ যিনি মোক্ষলাভ করিবেন, এই গুলিকেই তিনি “প্রমেয়” বলিয়াছেন। উহাদিগের মিথ্যাজ্ঞানই তাহার মতে সংসারের নিদান। তাহার মতে জীবাশ্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান আর ব্রহ্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান একই পদার্থ নহে। কারণ, জীবাশ্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানকে তিনি অদ্বৈতবাদীর দ্বারা সংসারের নিদান বলিতে পারেন না। ব্রহ্মবিষয়ে আনিদ্ব-বুদ্ধিরূপ অহঙ্কারও জীবের আজন্ম-সিদ্ধ নহে। পরন্তু ব্রহ্মবিষয়ে ভেদবুদ্ধিই অসংখ্য জীবের বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু শরীরাদি পদার্থে আনিদ্ব-বুদ্ধি সকল জীবেরই আজন্মসিদ্ধ। যে সকল জীবের ঈশ্বর বিষয়ে কোন জ্ঞানই নাই, তাহাদিগেরও জন্মাবধি শরীরাদি পদার্থে আনিদ্ব-বুদ্ধি বা ঐরূপ সংস্কার বদ্ধমূল বলিয়া সর্ব-সম্মত। সুতরাং ঐরূপ অহঙ্কারই প্রধানতঃ সংসারের নিদান এবং ভাষ্যোক্ত আরও কতকগুলি মিথ্যাজ্ঞানও জীবের মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হইয়া সংসারের নিদান হইয়া পড়ে। ঈশ্বর-বিষয়ে ঐরূপ কোন মিথ্যাজ্ঞান কাহারও হইলেও যদি তাহার গোতমোক্ত দ্বাদশ প্রকার “প্রমেয়” পদার্থে মিথ্যাজ্ঞান প্রবল না থাকে, তবে উহা মোক্ষসাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয় না। ঈশ্বর না মানিয়াও আত্মিক হওয়া যায়, নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য প্রভৃতি আত্মিক সম্প্রদায়ও মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অনুষ্ঠানের ফলে শেষে তাহাদিগেরও কোন কালে ঐ মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হওয়ায় তাহারাও ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া ঐ মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়াছেন, ইহা কিন্তু আমার বিশ্বাস। ইহারা শুভ অনুষ্ঠান করেন, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাহাদিগের ভ্রম দূর করিয়া থাকেন। ফলকথা, ঈশ্বর বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানকে সংসারের নিদান বলা অনাবশ্যক এবং পূর্বোক্ত প্রকারে উহা সংসারের নিদান হইতেও পারে না। এ জন্য মহর্ষি গোতম ঈশ্বরকে “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। জীবাশ্মকেই প্রমেয় পদার্থের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। জীবাশ্মেরই মোক্ষ হইবে এবং শরীরাদি পদার্থে জীবাশ্মের অহঙ্কার বা আনিদ্ব-বুদ্ধিই মুমুকুর চরমে বিনষ্ট করিতে হইবে। আমি আমার ঐ অহঙ্কার বিনষ্ট করিতে না পারিলে কিছুতেই সংসারমুক্ত হইতে পারিব না। জীবাশ্ম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবাশ্মসাক্ষাৎকার নহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জীবাশ্মসাক্ষাৎকারের জন্য পূর্বে আবশ্যক হয়, সুতরাং উহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ নহে। জীবাশ্মসাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, এ জন্য মহর্ষি গোতম তাহার “প্রমেয়”-পদার্থের মধ্যে জীবাশ্মেরই উল্লেখ

করিয়াছেন, ঈশ্বর বা পরমাশ্রয় উল্লেখ করেন নাই। ফল কথা, ঈশ্বর পক্ষে যে আশ্রয় তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাংক্ষাৎ কারণ, মহর্ষি গোতম সেই জীবাত্মাকেই “প্রমের” মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। গোতমের পরিভাষিত “প্রমের” ভিন্ন আরও অনেক প্রমের আছে, সে সকল প্রমেরও মহর্ষি গোতমের সম্মত। ঈশ্বরও তাঁহার সম্মত। তবে তিনি যে ভাবে মোক্ষোপযোগী পদার্থের গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর প্রভৃতি পদার্থ মোক্ষোপযোগী হইলেও সে ভাবে সে দিক্ দিয়া মোক্ষোপযোগী নহে। মহর্ষি গোতমোক্ত “প্রমের”-পদার্থগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে। তত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত মানস প্রত্যক্ষায়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইতে পারে না। জীব মনের দ্বারাই শরীরাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া বুঝিতেছে, সুতরাং মনের দ্বারাই আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে (“মনসৈবানুজ্ঞেয়ং”)। সুতরাং মনকে সাধনের দ্বারা ঐ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের যোগ্য করিতে হইবে, ঈশ্বর-প্রণিধানাদি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; সে সবগুলি জ্ঞানবিদ্যার “প্রস্থান” নহে; কারণ, জ্ঞানবিদ্যা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, ইহা গীতার জ্ঞান “ব্রহ্মবিদ্যা” বা “যোগশাস্ত্র” নহে। “প্রস্থান”-ভেদেই শাস্ত্রের ভেদ। এক শাস্ত্রের “প্রস্থান” অন্য শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইলে শাস্ত্রভেদ হইতে পারে না। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রেও ন্যায়বিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক বিদ্যার “প্রস্থান”গুলি বিশেষরূপে বর্ণিত হয় নাই, তাহাতে সেই সকল শাস্ত্রের কোন অসম্পূর্ণতাও হয় নাই। যে শাস্ত্রের যেগুলি “প্রস্থান”, সেইগুলিই তাহার বিশেষ প্রতিপাদ্য, অসাধারণ প্রতিপাদ্য। তাহাতে শাস্ত্রান্তরের “প্রস্থান”গুলি বিশেষরূপে বলা হয় নাই, তাহা বলাই উচিত নহে। অন্য শাস্ত্র হইতেই সেগুলি জানিতে হইবে। ঋষিগণ এই প্রণালীতেই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বলিয়াছেন। প্রস্থানভেদে এবং অধিকার-ভেদেই শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে, উপদেশের ভেদ হইয়াছে। মহর্ষি গোতমোক্ত “প্রমের”-তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য পূর্বে ঐ প্রমেরগুলির শ্রবণ ও মনন করিতে হইবে। সেই প্রমের মননের জন্য মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে মুমুক্শু প্রমের পদার্থগুলির মনন করিবেন। মহর্ষি প্রমের-পরীক্ষার দ্বারা (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে) সেই মননের প্রণালী দেখাইয়াছেন। মুমুক্শু ঐ প্রণালীতে আত্মাদি পদার্থের মনন করিবেন এবং যত দিন পর্য্যন্ত লোকসঙ্গ অপরিহার্য থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত বিরুদ্ধবাদী নাস্তিক প্রভৃতির সহিত বাধ্য হইয়া বিচার করিয়া নিজের শ্রবণ-মনন-সকল তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিবেন। অল্প কোন উদ্দেশ্যে কখনও ঐরূপ জল্প বিতণ্ডা করিবেন না। গুরু প্রভৃতির সহিত “বাদ” পর্য্যন্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থগুলি প্রমের-বিচারের অঙ্গ, উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে প্রমেরগুলির মনন এবং নিজের যথার্থ বিশ্বাস রক্ষা করাই মুমুক্শুর কার্য। বিরুদ্ধবাদীদিগের দৌরাভ্যে বৈদিক সিদ্ধান্তে সূচির কাল হইতেই আঘাত পড়িতেছে, অনেক বিচারশক্তিশূন্য ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট হইতেছে, নাস্তিকতা উপস্থিত হইতেছে এবং ঐ দৌরাভ্যের আশঙ্কা চিরকালই আছে ও থাকিবে। এ জন্য ন্যায়বিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি বিচারাস্ত্র “প্রমাণা”দি পদার্থের তত্ত্ব জানিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং আশ্রয়কার

জনা, ধর্ম রক্ষার জন্ত, আত্মিকতা রক্ষার জন্য “জন্ম”, “বিতণ্ডা”, “ছল”, “জাতি” প্রভৃতিরও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। শেষে তিনি * স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, যেমন কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রক্ষার জন্য লোকে কটকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ করিয়া রাখে, তদ্রূপ নিজের আত্মসংলগ্ন তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে “জন্ম” ও “বিতণ্ডা”ও করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রমাণাদি পদার্থের দ্বারা “প্রমের”-মননোপযোগী বিচারার্থ পদার্থ নহেন, এ জন্ত প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের মধ্যেও বিশেষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। তবে বিচারে সিদ্ধান্তরূপে ঈশ্বরের যে জ্ঞান আবশ্যক, তাহা মহর্ষি-কথিত “সিদ্ধান্ত” পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানেই হইবে। ঈশ্বর যখন সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, তখন সিদ্ধান্তের তত্ত্ব বুদ্ধিতে বলাতেই ঈশ্বরকে সিদ্ধান্তরূপে বুদ্ধিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু প্রমের-মননের জন্ত অথবা বাদিনিরাস করিয়া নিজের আত্মসংলগ্ন তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিবার জন্য প্রমাণাদি পদার্থের ন্যায় এবং জন্ম-বিতণ্ডা প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক হয় না, তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক হয় না। তজ্জন্যই মহর্ষি ঐ সকল পদার্থের মধ্যেও ঈশ্বরের বিশেষ উল্লেখ বা সংশ্লিষ্ট পদার্থের ন্যায় পৃথক উল্লেখ করেন নাই। ফল কথা, পূর্বোক্ত প্রকারে যে সকল পদার্থ মোক্ষোপযোগী, মহর্ষি তাহাদিগেরই বোড়শ প্রকারে বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ভাবে যাহারা মোক্ষের উপযোগী নহে, তাহারা অন্য ভাবে মোক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও মহর্ষি সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। কারণ, সেগুলি তাহার ন্যায়বিদ্যায় বক্তব্য নহে। মোক্ষে কত পদার্থ, কত কর্ম উপযোগী অর্থাৎ আবশ্যক আছে, মোক্ষবাদী সকলেই কি তাহার সবগুলির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন? নিজ শাস্ত্রের প্রস্থানান্তর্য্যয়েই সকলে প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমের স্ত্রায়শাস্ত্র অব্যাহত অংশে মনন-শাস্ত্র। শ্রুতির “মন্তব্যঃ” এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়াই এই ন্যায়শাস্ত্রের গঠন। ইহার সাহায্যে মুমুক্শু “প্রমের” মনন করিবেন এবং সেই অপরিপক্ব তত্ত্বনিশ্চয়কে বিরুদ্ধবাদীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন, এই পর্য্যন্তই অব্যাহত অংশে এই স্ত্রায়শাস্ত্রের মুখ্য ব্যাপার। শেষে মুমুক্শুর আর যাহা বাহ্য কর্তব্য, তাহার বিশেষ বিবরণ অন্য শাস্ত্রে আছে। মহর্ষি গোতমও আবশ্যক বোধে সেগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চতুর্থাধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে, মোক্ষলাভের জন্ত এই পর্য্যন্তই চরম অচ্যুতান নহে, ইহার জন্য বোগাত্যাস করিতে হইবে; যম, নিয়ম প্রভৃতি বোগশাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। হতরাত্ন মহর্ষি গোতম ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়াই মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন, ঈশ্বরের সহিত ন্যায়দর্শনের মুক্তির কিছুমাত্র সংশয় নাই, এ কথাও জোর করিয়া সিদ্ধান্তরূপে বলা যায় না।

মূলকথা, এই ন্যায়বিদ্যা মুমুক্শুকে আত্মাদি প্রমের পদার্থের মনন পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে—“যাও, তুমি এখন নিদিধ্যাসনের তৃতীয় সোপানে গিয়া বসিয়া পড়, এখন তোমার

* “উদ্ভাবনসংসংকল্পার্থঃ জন্মবিতণ্ডা বীজপ্রয়োজনসংকল্পার্থঃ কটকশাখাবরণং।”—স্ত্রায়বৃত্ত, ৪২/১০।

সে অধিকার জন্মিয়াছে। প্রেমের তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্ত তোমাকে এখন ঐ “প্রেমের” পদার্থের ধ্যান, ধারণা ও সমাধি করিতে হইবে। গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা প্রথম হইতেই করিতেছে, এখন প্রেমের তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য ঈশ্বরে তোমার প্রেমলক্ষণী ভক্তির আবশ্যক হইবে। তাহার পরে ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নির্দিধ্যাসনের দ্বারা তাহারও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। ভক্তির পরিপাকে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হইবে। তাহার পরে তোমার নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হইবে,—প্রেমের তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইবে। সেই প্রেমের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই তোমার মোক্ষের চরম কারণ, তাহার জন্যই ঈশ্বরসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত আর সমস্ত সাধন আবশ্যক। আমি তোমাকে “প্রেমের” পদার্থের “মনন” পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলাম, এখন তোমার আর বাহা বাহা আবশ্যক, তাহার জন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্র, বোগশাস্ত্র আছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু আছেন, তুমি সেখানে যাও। আমি এত দিনে তোমার যে বিশ্বাস জন্মাইয়াছি, তাহা রক্ষা করিব, তুমি যাহাতে যে কোন ব্যক্তির নিকটে প্রতারিত না হও, প্রতারিত হইয়া যাহাতে অতীষ্ট-লাভে আবার অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া না পড়, তোমার হিরীকৃত সাধনপ্রণালী হইতে, সিদ্ধান্ত হইতে ভ্রষ্ট না হও, তোমার গুরুপদটি তত্ত্ব পদে পদে সন্নিহান হইয়া, পুনঃ পুনঃ গুরুর অন্তরঙ্গ্যানেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত না কর, আমি সে বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিব। তুমি আমাকে ভুলিও না, আমাকে তোমার অনেক সময়েই আবশ্যক হইবে, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার অনেক অন্তরায় দূর করিব, বোগশাস্ত্রোক্ত অনেক “অন্তরায়” দূর করিতে তুমি আমাকে আশ্রয় করিও। যাও, এখন তুমি নির্দিধ্যাসনের তৃতীয় সোপানে গিয়া বসিয়া পড়। চতুর্থাদ্যায়ে বখাস্থানে এ সকল কথা বিশেষ আলোচনা প্রাপ্য। এখানে আর বেশী বলা যায় না। - সকল কথা বিশদ করাও এখানে সম্ভব নহে।

কেহ বলেন, আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই হুত্রে ‘মিথ্যাজ্ঞান’ শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। উহা ছাড়া আর যে সকল মিথ্যাজ্ঞান আছে, পূর্বোক্ত আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নাশেই সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, হুতরাং হুত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন সমস্ত “মোহ” এবং “রাগ” ও “দ্বेष” বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ মহর্ষিও পরে চতুর্থাদ্যায়ে অহঙ্কারনিবৃত্তির কথাই বলিয়াছেন। শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিই অহঙ্কার। আত্মবিষয়ক ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞান-বিশেষকেই মহর্ষি “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের দ্বারা এখানে লক্ষ্য করিতে পারেন এবং এ জন্য তিনি স্বাক্ষর “মোহ” শব্দ ত্যাগ করিয়াও “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নাশে অর্থাৎ আত্মার তত্ত্বজ্ঞানে অন্যবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইতে পারে না। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করিতে হইবে, সেই বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। তবে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ঐ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের নিষ্পাদক হয় বটে, কিন্তু যে মিথ্যাজ্ঞানটি নষ্ট হইবে, ঠিক তাহার বিপরীত জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানটি জন্মিলেই তাহা নষ্ট হইবে, এ জন্মই ভাব্যকার আত্মা প্রভৃতি সকল “প্রেমের”ই মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, তাহাদিগের সকলেরই তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন আর একটি কথা এই যে, মিথ্যাজ্ঞান পূর্বজাত এবং তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে কি করিয়া বাধা দিবে? যেমন তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্মিতেই পারিবে না বলা হইতেছে, তজ্জপ মিথ্যাজ্ঞান বাহা পূর্বেই জন্মিয়াছে এবং বাহা তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের বাধক, তাহা থাকিতে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে না বলিতে পারি? যে ছুইটি জ্ঞান পরস্পর বিরোধী, তাহাদিগের মধ্যে যেটি প্রথমে জন্মিয়াছে, সেইটিই প্রবল হয়; যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান পরস্পর বিরোধী হইলে, সেখানে পূর্বজাত প্রত্যক্ষই প্রবল, এ জন্য সেখানে প্রত্যক্ষের বিরোবিতাবশতঃ অনুমান হইতেই পারে না। উদ্যোতকর এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, মিথ্যাজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। কারণ, মিথ্যাজ্ঞান সহায়শূন্য বলিয়া দুর্বল, তত্ত্বজ্ঞান সহায়যুক্ত বলিয়া প্রবল, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে বাধা দিবে। তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত তত্ত্বকে বিদ্যর করিয়া জন্মে, তাহা যথার্থ জ্ঞান, সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ব বা প্রকৃত অর্থই তত্ত্বজ্ঞানের সহায়। প্রকৃত পদার্থটি তত্ত্বজ্ঞানের বিদ্যর হইয়া তাহাকে প্রবল করে। মিথ্যাজ্ঞান সেরূপ না হওয়ায় তদপেক্ষা দুর্বল; সুতরাং তাহা পূর্বজাত হইলেও পরজাত প্রবলের দ্বারা বাধিত হইতে পারে এবং তত্ত্বজ্ঞানে বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের সাহায্য রহিয়াছে। প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান করিতে হইলে শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা প্রথমে প্রমেয়বিষয়ক “শ্রবণ” করিতে হইবে। তাহার পরে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ বিষয়ে “মনন” করিতে হইবে। শেষে ঐ বিষয়ে দ্যান, ধারণা, সমাধি করিতে হইবে। তাহার পরে প্রমেয়-তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে। সুতরাং এই প্রমেয়-তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান আগমাদি প্রশ্নের দ্বারা সমর্থিত হইয়া দৃঢ়মূল হওয়ায়, ইহা পরজাত হইলেও পূর্বজাত দুর্বল মিথ্যাজ্ঞানকে বাধা দিয়া থাকে এবং দিতে পারে এবং মিথ্যাজ্ঞান পূর্বে জন্মিলেও এবং বদ্ধমূল হইয়া থাকিলেও প্রবল তত্ত্বজ্ঞান পরে জন্মিতে পারে। প্রবল হইলে সে পূর্বে বদ্ধমূল দুর্বলকে উন্মূলন করিয়া তাহার স্থল অধিকার করিতে পারে ও করিয়া থাকে। এ কথাও যথাস্থানে পুনরালোচনা দ্রষ্টব্য। পরস্পর নিরপেক্ষ জ্ঞানের মধ্যে পরজাত জ্ঞানের প্রাবল্য বিষয়ে ভট্ট কুমারিণও “তত্ত্ববাহিনীকে” অনেক কথা বলিয়াছেন।

সূত্রে ‘হুংখ’ প্রভৃতি শব্দ যে ক্রমে পঠিত, তদনুসারে “হুংখ”ই সর্বপ্রথম। ‘জন্ম’, ‘প্রবৃত্তি’, ‘লোব’, ‘মিথ্যাজ্ঞান’, এই চারিটি উক্তর। ফলে ঐ চারিটি কারণ উহাদিগের প্রত্যেকের পূর্বটি প্রত্যেকের কার্য্য। ‘উত্তরোত্তরাপায়ে’ ইহার অর্থ কারণগুলির অপায়ে। ‘তদনন্তরাপায়াং’ ইহার অর্থ তাহাদিগের কার্য্যগুলির অপায়বশতঃ। কারণের অনন্তরই কার্য্য হয়, এ জন্ত প্রাচীনগণ কার্য্য অর্থে ‘শেব’ শব্দ এবং ‘অনন্তর’ শব্দের প্রয়োগ করিতেন। আবার বাহার অন্তর নাই অর্থাৎ ব্যবধান নাই, অর্থাৎ বাহা অব্যবহিত, তাহাও অনন্তর শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। বাহা অব্যবহিত পূর্ব, তাহাকেও ঐ অর্থে ‘অনন্তর’ বলা যায়। মহর্ষি সেই অর্থেই এখানে অনন্তর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহা বাহার বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে “তদনন্তরাপায়াং” ইহার অর্থ ‘তাহাদিগের পূর্ব পূর্ব পদার্থের অপায়বশতঃ’। এ পক্ষেও

কলে 'কার্যগুলির অপায়বশতঃ' এই অর্থই বলা হয়। কারণ, স্বত্বের পাঠক্রমামুসারে কার্যগুলিই পরপরটির পূর্ব। এখন দেখুন,—

(পূর্ব) হুংথ,	(উত্তর) জন্ম।
(পূর্ব) জন্ম,	(উত্তর) প্রবৃত্তি।
(পূর্ব) প্রবৃত্তি,	(উত্তর) দোষ।
(পূর্ব) দোষ,	(উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান।

উত্তরগুলি কারণ, পূর্বগুলি তাহার কার্য; কারণের অপারে কার্যের অপায় হইয়া থাকে, যেমন কফনিমিত্তক জ্বর হইলে সেখানে কফের অপারে জ্বরের অপায় হয়। এখানেও স্বত্বোক্ত হুংথাদি পদার্থগুলির ঐক্য নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহাদিগের এক একটি উত্তরের অপারে তৎপূর্বটির অর্থাৎ তাহার কার্য পূর্বটির অপায় হইবে। 'মিথ্যাজ্ঞানে'র অপারে তাহার কার্য দোষের অপায় হইবে। দোষের অপায় হইলে তাহার কার্য প্রবৃত্তির অপায় হইবে। প্রবৃত্তির অপায় হইলে জন্মের অপায় হইবে। জন্মের অপায় হইলে হুংথের অপায় হইবে। জন্ম না হইলে আর হুংথের সম্ভাবনাই নাই। তখন আর হুংথের হেতু কিছুই থাকে না। হুংথ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, ইহার মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আবার হুংথাদিপূর্বক। পূর্বে হুংথাদি, পরে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, অথবা পূর্বে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, পরে হুংথাদি, ইহা বলা যাইবে না। উহার অনাদি। অনাদি কাল হইতে ঐ পদার্থগুলির কার্য-কারণ ভাবই সংসার। উহাদিগের অনাদিত্ব সূচনার জন্যই স্বত্বকার হুংথ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও জ্ঞাত্যকার স্বত্বকারের ক্রম লব্ধন করিয়া বলিয়াছেন,—“ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ।” ন্যায়বাস্তবিককার আবার ঐ অনাদিত্বকে বিশেষ করিয়া স্বরণ করাইবার জন্য ভাব্যকারোক্ত ক্রমের বিপরীত ক্রমে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ত ইমে হুংথাদয়ঃ।”

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ স্বত্বের “তদনন্তরাপারায়” এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“তদনন্তরস্ত তৎসম্মিহিতস্ত পূর্বপূর্বস্তাপারায়ঃ।” শেষে বলিয়াছেন যে, হুংথের অপায়ই বখন অপবর্গ, তখন অপবর্গকে হুংথের অপায় প্রযুক্ত বলা যায় না, সুতরাং স্বত্ব পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ বুঝিতে হইবে। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় না, ইহা মনে করিয়া আবার শেষে বলিয়াছেন যে, স্বত্ব অপবর্গ শব্দের দ্বারা অপবর্গব্যবহার পর্য্যন্তই বিবক্ষিত। মনের ভাব এই যে, অপবর্গ হুংথের অপায়স্বরূপ হইলেও অপবর্গ ব্যবহার অর্থাৎ অন্য লোকে যে ‘অমকের অপবর্গ হইয়াছে’ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগাদি করে, তাহা হুংথের অপায়প্রযুক্ত। কেহ বলিয়াছেন, স্বত্ব ‘অপবর্গ’ শব্দের দ্বারা এখানে অপবর্গের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিবক্ষিত। সুতরাং পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি নাই। মনে হয়, এই পঞ্চমী বিভক্তির গোলযোগ মনে করিয়াই শারীরক ভাষ্যের “রত্নপ্রভা” টীকাকার ত্রীগোবিন্দ এই স্বত্ব ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“তস্ত প্রবৃত্তি-রূপহেতোরনন্তরস্ত জন্মনোহপারায় হুংথঞ্চস্বরূপোহপবর্গো ভবতীত্যর্থঃ।”—(বেদান্তদর্শন, চতুর্থ স্বত্ব, শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ তিনি স্বত্ব “তৎ” শব্দের দ্বারা কেবল “প্রবৃত্তি”কে

ধরিয়া “তদনন্তর” অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তির কার্য এবং প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্বে উল্লিখিত “জন্মের” অপায়বশতঃ দুঃখের ধ্বংসরূপ অপবর্গ হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু স্বতন্ত্র “তৎ” শব্দের দ্বারা তাহার পূর্বে একযোগে কথিত “জন্ম”, “প্রবৃত্তি,” “দোষ” ও “মিথ্যাজ্ঞান” এই চারিটিই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ঐ চারিটিই “উত্তরোত্তর” শব্দের প্রতিপাদ্য। সূত্রেরাং মহর্ষি ঐ চারিটিকেই “তৎ” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। উহার মধ্যে একমাত্র “প্রবৃত্তি”ই “তৎ” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা কিছুতেই মনে আসে না। তাহার পরে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাত পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থও সম্ভব হয় না। এক দুঃখাপায়ের সহিত অপবর্গের অভেদ খাটিলেও জন্মের অপায় প্রবৃত্তির সহিত খাটে না। কারণ, সেগুলি অপবর্গ-স্বরূপ নহে। একই পঞ্চমী বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে মহর্ষি প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। বৃত্তিকার তাহাই মনে করিয়া ঐ কথা লিখিয়াছেন। শেষে তিনিও ঐ পক্ষ ত্যাগ করিয়া “অপবর্গ” শব্দে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি অপবর্গ-ব্যবহারের প্রয়োজক বলেন নাই। পরা মুক্তির ক্রম প্রদর্শনের অস্ত্র অপবর্গেরই প্রয়োজক বলিয়াছেন। কল কথা, মহর্ষি অপবর্গ ব্যবহার বুঝাইতেই “অপবর্গ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে আসে না। মহর্ষি-স্বতন্ত্র “অপবর্গ” শব্দে ঐরূপ আধুনিক লক্ষণা অনুমোদন করা যায় না।

বস্তুতঃ স্বতন্ত্র “তদনন্তরাপায়” শব্দের প্রতিপাদ্য কেবল দুঃখের অপায় নহে, কেবল জন্মের অপায়ও নহে; দোষের অপায়, প্রবৃত্তির অপায়, জন্মের অপায় এবং দুঃখের অপায়, এই চারিটি অপায়ই উহার প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে দুঃখের অপায় স্বয়ং অপবর্গ-স্বরূপ হইলেও আর তিনটি অপায় ঐ অপবর্গের প্রয়োজক। উহাদিগের ঐ প্রয়োজকত্ব পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। অথচ দুঃখাপায়ের কথাটাও উহার মধ্যে বলিতে হইবে। কারণ-নাশক্রমে কার্যনাশ হইয়া শেষে দুঃখ পর্য্যন্ত নষ্ট হইলেই পরা মুক্তি হয়, এই ক্রম প্রদর্শনও করিতে হইবে। ‘তদনন্তর’ শব্দের দ্বারা দুঃখও ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু দুঃখের অপায় অপবর্গ প্রয়োজক নহে, এ জন্য ঐ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি খাটে না। কিন্তু আর তিনটি অপায়ে অপবর্গের প্রয়োজকত্ব থাকায় সেই তিন স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি খাটে এবং পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ আবশ্যিক। একের বেলার না খাটিলেও বহুর অনুসারে সর্বত্র একরূপ ব্যবস্থা স্বয়ংগণ করিয়াছেন; তাই মনে হয়, এখানেও মহর্ষি গোতম বহুর অনুসারে একবারে “তদনন্তরাপায়ানাং” এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তিবৃত্ত ব্যাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার মধ্যে দুঃখাপায়ের সহিত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থের কোন সম্বন্ধ বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ হেতুত্ব বা প্রয়োজকত্ব এখানে সম্ভব হয় না। আর তিনটি অপায়ে সম্ভব হয় এবং তাহাদিগকেই প্রয়োজক বলিতে হইবে, মহর্ষির তাহাই বিবক্ষিত। এ অস্ত্র মহর্ষি ঐরূপে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। কলতঃ “দুঃখাপায়াদপবর্গঃ” এইরূপ প্রয়োগ নাথু না হইলেও “তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ” এইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ, উহার মধ্যে দুঃখের অপায় অপবর্গ প্রয়োজক না হইলেও আর তিনটি অপায় অপবর্গের প্রয়োজক, সেই তিনটিকেই অপবর্গের প্রয়োজক বলিবার জন্য বহুর অনুসারে মহর্ষি একবারে

“তদনন্তরাণায়াং” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋগিগণ এইরূপ প্রয়োগ করিতে আনাদিগের ন্যায় সঙ্কুচিত হইতেন না। মহর্ষি গোতমের অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। তাই মনে হয়, মহর্ষি এখানেও বহুর অনুরোধে একরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই যেন প্রকৃত কথা। সুধীগণ এখানে বৃত্তিকার প্রভৃতির পঞ্চমী বিভক্তির সম্ভবিত্য ব্যাখ্যার সংগতি চিন্তা করিয়া এবং অল্প কোনরূপ সংগতির চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত সমাধানের সমালোচনা করিবেন। আর চিন্তা করিবেন, বৃত্তিকারের ন্যায় প্রাচীনগণ এখানে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি দেখাইতে যান নাই কেন ?

কেহ কেহ বলিয়াছেন, রাগ ও ঘেব ধর্ম ও অধর্মের কারণ নহে। ইচ্ছা ব্যতীতও গল্পা-দানাদি কার্যের দ্বারা কর্মশক্তিতে যখন ধর্ম হয় এবং ঘেব ব্যতীতও হিংসাদি ঘটনা গেলে যখন তজ্জন্য অধর্ম হয়, আবার জীবন্ত ব্যক্তির রাগ ও ঘেব থাকিলেও যখন ধর্মীধর্ম জন্মে না, তখন রাগ ও ঘেব ধর্ম অধর্মের কারণ বলা যায় না। সূত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান-জন্ম সংস্কারই বিবক্ষিত। উহাই ধর্মীধর্মের কারণ। জীবন্ত ব্যক্তির উহা না থাকিতেই রাগ ও ঘেববশতঃ কর্ম করিলেও ধর্ম ও অধর্ম হয় না।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতমের পরিভাষানুসারে “দোষ” শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান-জন্ম সংস্কার বুঝা যায় না। মহর্ষি ঐরূপ অর্থে কোথায়ও দোষ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। পরন্তু এখানে মিথ্যাজ্ঞানের নাশে যখন দোষের নাশ বলিয়াছেন, তখন এখানে দোষ বলিতে মিথ্যাজ্ঞানজন্ম সংস্কার বুঝাও যায় না। কারণ, জ্ঞানের নাশে ঐ জ্ঞানজন্ম সংস্কার নষ্ট হয়, এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলেও তজ্জন্য সংস্কার থাকিয়া যায়। জ্ঞানের নাশ ঐ জ্ঞানজন্ম সংস্কারের নাশক হয় না; তাহা হইলে ঐ সংস্কার কোন দিনই স্থায়ী হইতে পারিত না। অবশ্য তদ্বজ্ঞানজন্ম সংস্কারের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্ম সংস্কার নষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মহর্ষি তাহা বলেন নাই। মহর্ষির সূত্রের দ্বারা বুঝা গিয়াছে, মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত তদ্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, তজ্জন্ম দোষের অপায় হয়। তদ্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, এ কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মিতে পারে না এবং তদ্বজ্ঞান যে সংস্কার উৎপন্ন করে, ঐ সংস্কার মিথ্যাজ্ঞানজন্ম সংস্কারকে বিনষ্ট করে। সুতরাং তদ্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে ঐরূপে বিনষ্ট করে বলা যায়। মিথ্যাজ্ঞানজন্ম সংস্কার নষ্ট হইয়া গেলে সেই সংস্কারজন্ম স্বরূপ মিথ্যাজ্ঞানও আর জন্মিতে পারে না। তদ্বজ্ঞানজন্ম সংস্কার থাকার জীবন্তের আর উৎকট রাগঘেবও জন্মিতে পারে না। যেসকল ঘেব কর্মে আসক্ত করিয়া ধর্ম ও অধর্মের কারণ হয়, জীবন্তের তাহা জন্মিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার ধর্ম ও অধর্ম জন্মে না। সূত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা ধর্মীধর্মের কারণরূপে সেইরূপ রাগ-ঘেবই উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, ঐরূপ দোষই ধর্ম ও অধর্মের কারণ। জীবন্তের রাগ-ঘেব সেক্ষেপ নহে। আর বাহ্যদিগের স্থলবিশেষে নিজের রাগ বা ঘেব না থাকিলেও ধর্ম ও অধর্ম জন্মিতেছে, তাঁহারা কিন্তু জীবন্তের দ্বারা ঐ সকল কার্য করিতেছেন না। তাঁহাদিগের কর্মে আসক্তি আছে,

ধর্মজন্য স্থখে আকাজ্ঞা আছে, অধর্মজন্য দুঃখে বিবেচ আছে। মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকার তাঁহাদিগের সেখানেও রাগ ও দ্বেষের বোগ্যতা আছে এবং সেই কর্মে না হইলেও কর্মান্তরে তখনও রাগ বা দ্বেষ আছে। তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারসহিত রাগ ও দ্বেষ বাহ্য ধর্ম ও অধর্মের প্রতি কারণরূপে মহর্ষি বলিয়াছেন, তাহা অসংগত হয় নাই। অবশ্য মহর্ষি রাগ ও দ্বেষকে ধর্মাদ্বয়ের সাফাৎ কারণ বলেন নাই। শুভাশুভ কর্ম দ্বারাই উহার ধর্ম ও অধর্মের কারণ। ঐ সময়ে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার প্রভৃতিও তাহার কারণ। ফল কথা, মহর্ষিসূত্রের “দোষ” শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করার কারণ নাই। তবে ভাষ্যকার যে এখানে মহর্ষিসূত্রের “প্রবৃত্তি” শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। মহর্ষি তাঁহার “প্রমের” পদার্থের অন্তর্গত “প্রবৃত্তিকে” কায়িক, বাচিক এবং মানসিক শুভাশুভ কর্ম বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সেখানে “প্রবৃত্তিকে” প্রবলবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি তাহা বলেন নাই। বস্তুতঃ “প্রবৃত্তিকীগবুজ্জিশরীরারম্ভঃ” (১।১।১৭) এই সূত্রে “আরম্ভ” শব্দের দ্বারা কর্মকেই মহর্ষি-কথিত প্রবৃত্তি বলিয়া বুঝা যায়। এই কর্মরূপ “প্রবৃত্তিকে” কারণরূপ “প্রবৃত্তি” বলা হইয়া থাকে। এই কর্মফল ধর্ম ও অধর্মকেও ঐ কর্মরূপ প্রবৃত্তিসাধ্য বলিয়া “প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মহর্ষিও কোন কোন স্থলে তাহা করিয়াছেন। এই ধর্মাদ্ব্যধর্মরূপ “প্রবৃত্তিকে” কার্যরূপ প্রবৃত্তি বলা হয়। অবশ্য ইহা “প্রবৃত্তি” শব্দের মুখ্যার্থ নহে, মহর্ষির প্রবৃত্তির লক্ষণোক্ত কর্মরূপ প্রবৃত্তিও নহে। কিন্তু এই ধর্ম ও অধর্মরূপ প্রবৃত্তিই জন্মের সাফাৎ কারণ। কর্ম জন্মের সাফাৎ কারণ হইতে পারে না। কারণ, কর্ম জন্মের অব্যবহিত পূর্বে থাকে না, কর্মফল ধর্ম ও অধর্ম থাকে। সূত্রে প্রবৃত্তির অপারে জন্মের অপায় বলা হইয়াছে, সূত্রের জন্মের সাফাৎ কারণ ধর্মাদ্ব্যধর্মরূপ “প্রবৃত্তিই” মহর্ষির এখানে বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে পূর্বসংকীর্ণ ধর্ম ও অধর্মই নষ্ট হইয়া যায়। “জ্ঞানায়িঃ সর্বকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে” এই ভগবদগীতাভাষ্যেও কর্মের ফল ধর্মাদ্ব্যধর্ম অর্থেই “কর্মন্” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, যাগ, দান, হিংসা প্রভৃতি অনুরক্ত কর্ম চিরস্থায়ী নহে, তাহা কর্মান্তেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাহার নাশ বলা যায় না। সেই কর্মের ফল সঞ্চিত ধর্মাদ্ব্যধর্মই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। এইরূপ শাস্ত্রে “কর্মন্” শব্দ ও “প্রবৃত্তি” শব্দ কর্মফল ধর্মাদ্ব্যধর্ম অর্থেও প্রযুক্ত আছে। ঐরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ বেদেও আছে। যেমন প্রাণ অন্ন না হইলেও বেদ প্রাণকে “অন্ন” বলিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ন ব্যতীত প্রাণদিগের প্রাণ থাকে না, অন্ন প্রাণের সাধন, অন্ন থাকিলেই প্রাণ থাকে, সূত্রের প্রাণকে অন্ন বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে “অন্ন” শব্দে লক্ষণার দ্বারা বুঝিতে হইবে—অন্নসাধ্য। ঐরূপ কর্মরূপ প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্মাদ্ব্যধর্মকে “প্রবৃত্তি” বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা করা বাইতে পারে ; কারণ, ঐ প্রকার লাক্ষণিক প্রয়োগ পূর্ব হইতেই হইয়া আসিতেছে ; উহা আধুনিক প্রয়োগ নহে। তাহা “প্রবৃত্তিসাধন” এই কথার দ্বারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম বাহার সাধন, এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার এই সূত্রভাষ্যে শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির নিকায়বিশিষ্ট প্রাণীভাবকে জন্ম বলিয়াছেন। কিন্তু প্রেতাভাব-সূত্রে (১৯ সূত্রে) দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত আত্মার পুনঃসম্বন্ধকে পুনর্জন্ম বলিয়াছেন। এখানেও প্রেতাভাব বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যায় বুদ্ধির পরে বেদনারও উল্লেখ করিয়াছেন। আরও অনেক স্থলে বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানবাস্তবিকে উদ্যোতকরও (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে) অপূর্ব দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত সম্বন্ধবিশেষকে জন্ম বলিয়াছেন। সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্রও (ঈশ্বরকৃষ্ণের অষ্টাদশ-কারিকায়) জন্মের ব্যাখ্যায় বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয়, ভাষ্যকার এখানে জন্মের ব্যাখ্যায় বুদ্ধির পরে বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বেদনা শব্দটি এখানে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে উহা পাওয়া যায় না। দেহাদির নিকায়-বিশিষ্ট প্রাণীভাবকেই ভাষ্যকার এখানে জন্ম বলিয়াছেন। নিকায় শব্দের অর্থ সমানবর্মা প্রাণিসমূহ। (সধর্ষিণাং জ্ঞানিকায়ঃ ইত্যমরঃ)। ভাষ্যকার (১৯ সূত্রে) প্রেতাভাবের ব্যাখ্যায় এই অর্থেই নিকায় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিতে হয়। কারণ, “নিকায়” শব্দের ঐ অর্থ সেখানে সংগত হইতে পারে। কিন্তু এখানে দেহাদির “নিকায়বিশিষ্ট” প্রাণীভাবকে জন্ম বলিয়াছেন। প্রচলিত পাঠে তাহাই পাওয়া যায়। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে জন্মের ব্যাখ্যায় দেহাদিকেই “নিকায়বিশিষ্ট” বলা হইয়াছে। মিলিত পদার্থের সমুচ্চয় অর্থেও “নিকায়” শব্দের প্রয়োগ করা যায়। কারণ, সে অর্থও অভিধানে পাওয়া যায় (শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)। সুতরাং “নিকায়বিশিষ্ট” বলিতে পরস্পর মিলিত বা মিলিত-ভাবাগম, এইরূপ অর্থও বুঝা যায়। এখানে অনুবাদে ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মিলিত দেহাদির সহিত সম্বন্ধবিশেষই আত্মার জন্ম। আত্মা নিত্য, তাহার উৎপত্তিরূপ জন্ম হইতে পারে না। প্রাচীনগণ জন্মের ব্যাখ্যায় জন্মের বিশদ পরিচয়ের জন্যই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনেক পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। জন্মের লক্ষণ বলিতে ঐ সকল পদার্থের উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য, উহার সবগুলিকে না বলিলে জন্মের লক্ষণ নির্দিষ্ট হয় না, ইহা মনে হয় না। প্রাচীনগণ ঐ পদার্থগুলির প্রত্যেকটির উল্লেখের কোন প্রয়োজন বর্ণন করেন নাই। ঐগুলির প্রত্যেকের উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে মনে হয়, তাৎপর্যটীকাকার অবশ্যই তাহা বলিয়া বাইতেন। কারণ, তিনি ঐরূপ প্রয়োজন অনেক স্থলেই বলিয়া গিয়াছেন। আধুনিক টীকাকারগণ প্রাচীন-গণের পরিচায়ক বাক্যকেও লক্ষণ-বাক্য ধরিয়া লইয়া, তাহার প্রত্যেক শব্দের প্রয়োজন প্রদর্শনের জন্য নানা কল্পনা, নানা কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও অনেক স্থলে ইষ্টসিদ্ধি হয় নাই, কেবল পুথি বাড়িয়াছে।

ভাষ্যে “বেদনা” শব্দের অর্থ কি? ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। বেদনা শব্দের দুঃখ এবং জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকগণ পারিভাষিক অর্থেও বেদনা শব্দের প্রয়োগ করিতেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর “পুণিমা” টীকাকার সেই পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিতে “বেদনা”কে সংস্কার বলিয়াছেন। তিনিই আবার বৈশেষিকের “উপস্বারের” টীকায় জন্মের ব্যাখ্যাতেই বেদনাকে “প্রাণসংহতি” বলিয়াছেন। শেষে তাহা সংগত বোধ না হওয়ায় পরিশেষে

আবার সেখানে বেদনা শব্দের 'জ্ঞান' অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ অজ্ঞাত কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাকারও বেদনাকে সংস্কার বলিয়াছেন, কেহ বা “অসুখ” বলিয়াছেন। কিন্তু পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিতে তাঁহারা কেহই কোন প্রকৃত প্রমাণ বা প্রাচীন সংবাদ প্রদর্শন করেন নাই।

বৌদ্ধসম্প্রদায় এক সঙ্গে সুখ ও দুঃখ বুঝাইতে বেদনা শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবিতেন, সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া ভাবিতেন। “দুঃখং দুঃখং” ইত্যাদি তাঁহাদিগের মন্তব্য। মনে হয়, এই জন্তই তাঁহারা দুঃখবোধক বেদনা শব্দের দ্বারা এক সঙ্গে সুখ ও দুঃখ উভয়কেই প্রকাশ করিতেন। ভাষ্যকার বাংস্ফারনও সুখকে দুঃখরূপে ভাবিবার কথা বলিয়া, মহাবী গোতম ষাটপ্রকার প্রেমের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই, কেবল দুঃখেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়াছেন (নবম সূত্র-ভাষ্য জটব্য)। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের “বেদনাসংস্কৃত” হইতে “সংস্কারসংস্কৃত” পৃথক্। উদ্যোতকরও বৌদ্ধমত-খণ্ডনে (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে) “বেদনা” ও “সংস্কার”কে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন এবং (৪।১।৩৩ সূত্রভাষ্য বাটিক) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত-খণ্ডনে এক স্থলে বেদনার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“বেদনা সুখ-দুঃখং”। শারীরিকভাষ্যেও জীবের কথায় বেদনার কথা পাওয়া যায়। সেখানে “রত্নপ্রভা”য় ত্রীগোবিন্দ লিখিয়াছেন—“বেদনা হর্ষশোকাদিঃ”। তিনি আবার “আদি” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (বেদান্তদর্শন, ১ অধ্যায়, ৩ পাদ, দহরাদিকরণের ১৯ সূত্রের শারীরিকভাষ্য জটব্য)। এই সকল দেখিয়া অনুবাদে বেদনার ব্যাখ্যায় সুখদুঃখরূপ পারিভাষিক অর্থেরই গ্রহণ করা হইয়াছে। জন্ম হইলেই আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান এবং সুখদুঃখাদির সহিত সযুক্ত হয়। এই জন্ত ঐরূপ সযুক্তবিশেষকে জন্ম বলা যায়। ভাষ্যের প্রচলিত পাঠে কোন স্থলে “সুখ” শব্দের উল্লেখ করিয়াও তাহার পরে “বেদনা” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেখানে বেদনা শব্দের কেবল দুঃখরূপ প্রসিদ্ধ অর্থই বুঝিতে হয়।

“প্রতিসন্ধান” শব্দটি দার্শনিক ভাষায় প্রত্যভিজ্ঞা অর্থের অধিক প্রযুক্ত দেখা যায়। স্থল-বিশেষে জ্ঞানমাত্র অর্থও প্রযুক্ত দেখা যায়। কিন্তু এখানে “উচ্ছেদ” শব্দের পরবর্তী “প্রতিসন্ধান” শব্দের ঐরূপ অর্থ সংগত হয় না। এখানে উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে উৎপত্তি। দেহাদি একটি সমষ্টির উচ্ছেদ হইলে পুনরায় আর একটি দেহাদিসমষ্টির “প্রতিসন্ধান” বা সংযোজন অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য। মহাবীজসূত্রের পুনরুৎপত্তি অর্থ “প্রতিসন্ধান” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনক্লেশতঃ” (৪।১।৬৪)। সেখানে ভাষ্যকারও সূত্রোক্ত প্রতিসন্ধানকে ‘প্রতিসন্ধি’ শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া, উহার পুনর্জন্ম অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্র “উত্তরোত্তরপায়ে” এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা প্রয়োজক বুঝিতে হইবে। পরপরটির অপায় হইলে অর্থাৎ পরপরটির অপায়প্রযুক্ত। যেমন জল পান করিলে পিপাসার

শাস্তি হয়, এই কথা বলিলে পিপাসার শাস্তি জলপানপ্রযুক্ত—ইহা বুঝা যায়, তজপ এখানেও ঐরূপ বুঝা যাইবে।

প্রচলিত অনেক ভাষ্য-পুস্তক ও “ন্যায়হট্টানিবন্ধ” প্রভৃতি পুস্তকে দ্বিতীয় সূত্রে “তদনন্তরা-ভাবাৎ” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু এখানে “তদনন্তরাপায়াৎ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি চুই স্থলেই “অপায়” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা দেখিলেও তাহাই মনে আসে। উদ্যোতকর, শঙ্করাচার্য্য এবং “ভামতী”তে বাচস্পতি মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও “তদনন্তরাপায়াৎ” এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। স্মরণ করিতে হইবে, মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা কি কি ভাবের সূচনা করিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই মোক্ষসাধন হয় না, উহা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করে বলিয়াই মোক্ষসাধন হয় এবং সেই মুক্তিতেই তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিই তত্ত্বজ্ঞানের ফল বলিতে, ঐ অংশ ধরিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও (বেদান্তদর্শন, চতুর্থ সূত্রভাষ্যে) স্বসিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ত মহর্ষি গোতমের এই সূত্রটিকে “আচার্য্য-প্রণীত” এবং “মুক্তিযুক্ত” বলিয়া বিশেষ সন্মান প্রদর্শন পূর্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের সাধন কেন, ইহার মুক্তি সূচিত হওয়ায় এই সূত্রের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা এবং প্রমাণাদি পদার্থ, তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরীক্ষা হইয়াছে। সূত্ররাং জ্ঞানবিদ্যার সহিত তাহার পরমপ্রয়োজন অপবর্গের সম্বন্ধও পরীক্ষিত হইয়াছে। মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞানে যখন জ্ঞানবিদ্যা আবশ্যক, তখন মোক্ষের সহিতও জ্ঞানবিদ্যার সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। এবং মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষসাধন হয় বলাতে আত্মাদি প্রমেদতত্ত্বসাক্ষাৎকারই যে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা সূচিত হইয়াছে। কারণ, তাহাই আত্মাদি “প্রমেদ” বিষয়ে সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানগুলিকে নিবৃত্ত করিতে পারে। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেদতত্ত্বজ্ঞানে আবশ্যক হয়, সূত্ররাং উহা মোক্ষের প্রয়োজক, সাক্ষাৎকারণ নহে। এবং এই সূত্রে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে অপবর্গের কথা বলায় এবং প্রথম সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে অপবর্গের কারণ বলায় সূচিত হইয়াছে যে, কোন মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরেই জন্মে, কোন মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে কালবিশেষে জন্মে। তাহা হইলে সূচিত হইয়াছে—মুক্তি বিবিধ। অপরা মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই জন্মে, সেই জীবমুক্ত ব্যক্তিই শান্তবক্তা। সূত্ররাং শাস্ত্রের উপদেশ ব্রাহ্মের উপদেশ নহে। পরা মুক্তি নির্লিপ্য, উহা তত্ত্বজ্ঞানের পরেই জন্মে না। উহা জীবমুক্তের প্রারম্ভ ভোগান্তে গৃহীত জন্মের অর্থাৎ গৃহীত দেহাদির উচ্ছেদ হইলেই জন্মে। এইরূপ বহু তত্ত্বই মহর্ষি-সূত্রে সূচিত হইয়া থাকে। বুঝিয়া লইতে পারিলে ঋষিসূত্রের দ্বারা অনেক বুঝা যায়। অতীত কথা চতুর্থধ্যায়ে মোক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রসঙ্গে স্টম্ভ্য ২।

অভিধেয়সদ্ব্যপ্রয়োজনপ্রকরণ সমাপ্ত। ১।

নীতিতির সীকার গবায় তট্টাচার্য্যও লিখিয়াছেন—“সতিদন্তব্যঃ প্রবোধকবর্ধঃ।” (মূলোক্তসদ্ব্যপ্রয়োজনে স্টম্ভ্য)।

ভাষ্য । ত্ৰিবিধা চাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰস্য প্ৰবৃত্তিকুদ্দেশো লক্ষণং পৰীক্ষা চেতি । তত্র নামধেয়েন পদার্থমাত্ৰস্তাভিধানমুদ্দেশঃ,—তত্রোদ্দিষ্টস্তাতত্ত্বব্যব-
চ্ছেদকো ধৰ্ম্মো লক্ষণং, লক্ষিতস্য যথালক্ষণমুপপদ্যতে ন বেতি প্ৰমাণৈৰব-
ধারণং পৰীক্ষা । তত্রোদ্দিষ্টস্য প্ৰবিভক্তস্য লক্ষণমুচ্যতে, যথা প্ৰমাণানাং
প্ৰমেয়স্ত চ । উদ্দিষ্টস্য লক্ষিতস্য চ বিভাগবচনং, যথা ছলস্ত, “বচন-
বিধাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং”—“তৎ ত্ৰিবিধং”মিতি ।

অনুবাদ । এই শাস্ত্ৰের (ত্ৰায়দৰ্শনের) প্ৰবৃত্তি অৰ্থাৎ উপদেশ ব্যাপার
ত্ৰিবিধ, (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ এবং (৩) পৰীক্ষা । তন্মধ্যে নামের দ্বাৰা পদাৰ্থমাত্ৰের
উল্লেখ অৰ্থাৎ পদাৰ্থগুলির নামমাত্ৰ কখন “উদ্দেশ” । তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট পদাৰ্থের
অৰ্থাৎ যাহার নাম বলা হইয়াছে, তাহার অতত্ত্বব্যবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম অৰ্থাৎ সেই পদাৰ্থ
যে তত্ত্ব পদাৰ্থ হইতে ভিন্ন, ইহার বোধক (ইতৰব্যাবৰ্ত্তক) অসাধারণ ধৰ্ম্ম “লক্ষণ”,
(এই লক্ষণকখনই এই শাস্ত্ৰের দ্বিতীয় উপদেশ ব্যাপার) । লক্ষিত পদাৰ্থের অৰ্থাৎ
উদ্দেশের পরে যাহার লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই পদাৰ্থের লক্ষণানুসারে (ঐ পদাৰ্থ)
উপপন্ন হয় কি না, এ জ্ঞাত্ব অৰ্থাৎ ঐ সংশয় নিৰ্বৃত্তির জ্ঞাত্ব প্ৰমাণসমূহের দ্বাৰা
(প্ৰতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বাৰা) অবধারণ অৰ্থাৎ ঐ লক্ষিত পদাৰ্থের লক্ষণানুসারে
বিচারপূৰ্ব্বক তত্ত্বনিৰ্ণয়—“পৰীক্ষা” ।

তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট হইয়া বিভক্ত পদাৰ্থের অৰ্থাৎ যে সকল পদাৰ্থের সামান্য
না । কখনরূপ সামান্য উদ্দেশের পরে পৃথক্ সূত্ৰের দ্বাৰা তাহাদিগের লক্ষণ না
বলিয়াই বিশেষ বিশেষ নামকখনরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাদিগের লক্ষণ
(বিশেষ লক্ষণ) বলা হইয়াছে, যেমন “প্ৰমাণে”র এবং প্ৰমেয়ের । এবং উদ্দিষ্ট হইয়া
লক্ষিত পদাৰ্থের অৰ্থাৎ যে সকল পদাৰ্থের সামান্য নামকখনরূপ উদ্দেশ করিয়া
পৃথক্ সূত্ৰের দ্বাৰা সামান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার বিভাগবচন অৰ্থাৎ বিভাগ-
সূত্র বলা হইয়াছে । যেমন “ছলে”র—“বচনবিধাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং” (এই
সামান্য লক্ষণ-সূত্র বলিয়া) “তৎ ত্ৰিবিধং” ইত্যাদি (বিভাগসূত্র) ১।২।১০।১১ ।

উপনী । প্ৰমাণাদি বোদ্ধ পদাৰ্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্ৰেয়স লাভের উপায়, এ কথা প্ৰথম সূত্রে
অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু ঐ বোদ্ধ পদাৰ্থের নামমাত্ৰ জ্ঞানে উহাদিগের কোন প্ৰকার তত্ত্ব-
জ্ঞানই হইতে পারে না । উহাদিগের লক্ষণকখন এবং পৰীক্ষা তাহাতে আবশ্যক, সুতরাং সে
জ্ঞাত্ব মহৰ্ষির পরবৰ্ত্তী সূত্ৰসমূহ আবশ্যক । তাই ভাষ্যকার মহৰ্ষি গোতমের পরবৰ্ত্তী সূত্ৰসমূহের
প্ৰয়োজন ব্যাখ্যার জন্ত এখানে বলিয়াছেন যে, এই ত্ৰায়শাস্ত্ৰের উপদেশ-ব্যাপার ত্ৰিবিধ । প্ৰথমতঃ

পদার্থগুলির উদ্দেশ্য অর্থাৎ নামকথন, তাহার পরে তাহাদিগের লক্ষণকথন, তাহার পরে বিবিধ বিচারপূর্বক পদার্থের পরীক্ষা, সুতরাং মহর্ষি গোতমের পরবর্তী সূত্রদুহগুলি আবশ্যক হইয়াছে। 'উদ্দেশ্য', 'লক্ষণ' এবং 'পরীক্ষা' এই ত্রিবিধ ব্যাপারেই জ্ঞানশাস্ত্রের সমাপ্তি হইয়াছে এবং এই প্রণালীতে উপদেশই জ্ঞানদর্শনের বৈশিষ্ট্য। পদার্থের বিভাগও উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য।

পদার্থের বিভাগের পূর্বে তাহার সামান্য লক্ষণ বক্তব্য। কারণ, সামান্য লক্ষণ না বলিলে পদার্থের সামান্য জ্ঞান হয় না। সামান্য জ্ঞান না হইলে বিশেষ জ্ঞানের জন্য পদার্থের বিভাগ করা যায় না। কিন্তু সূত্রকার মহর্ষি অনেক পদার্থের সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগ করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর সূত্রকার জ্ঞান ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—“তত্রোদ্দিষ্টত্ব” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য এই যে, মহর্ষি উদ্দিষ্ট পদার্থের বিভাগ দুই প্রকারে করিয়াছেন।—(১) পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়া বিভাগ এবং (২) পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলিয়া বিভাগ। যেমন “প্রমাণ” ও “প্রমেয়”র পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই, বিভাগ করিয়া, ঐ বিভক্ত বিশেষ “প্রমাণ” ও বিশেষ “প্রমেয়”-গুলির লক্ষণ বলিয়াছেন। আবার “ছলে”র পৃথক্ সূত্রের দ্বারা, সামান্য লক্ষণ বলিয়াই বিভাগ করিয়া শেষে ঐ বিভক্ত ত্রিবিধ “ছলের”ই লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যে “প্রমাণ,” “প্রমেয়” ও “ছলে”র কথা প্রদর্শন মাত্র। ঐরূপ অল্প পদার্থেরও বিভাগাদি বুঝিতে হইবে। যথাস্থানে এ সব কথা বুঝা যাইবে। যে সকল পদার্থের পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগসূত্র বলিয়াছেন, তাহাদিগের ঐ বিভাগ-সূত্রের দ্বারাই সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, ইহাও পরে বুঝা যাইবে।

ভাষ্য। অর্থোদ্দিষ্টত্ব বিভাগবচনং।

অনুবাদ। অনন্তর উদ্দিষ্টের অর্থাৎ প্রথম উদ্দিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগবচন (বিভাগ-সূত্র)।

সূত্র। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। ৩।

অনুবাদ। (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) শব্দ, (এই চারিটি) প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি নামে প্রমাণ চতুর্বিধ।

টিপ্পনী। মহর্ষির প্রথম উদ্দিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগের জ্ঞান এই তৃতীয় সূত্রের উদ্দেশ্য। পদার্থের বিশেষ নামের কীর্ত্তনকে বিভাগ বলে, সুতরাং বিভাগও উদ্দেশ্য। অতএব পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষারূপ ত্রিবিধ ব্যাপার হইতে বিভাগ কোন অতিরিক্ত ব্যাপার নহে।

মহর্ষি পরে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের লক্ষণ বলিলেও ইহাদিগের অতিরিক্ত কোন প্রমাণ তাহার স্বীকৃত কি না? আপাততঃ এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কারণ, লক্ষণের দ্বারা কোন পদার্থের সংখ্যা নিয়ম নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। লক্ষণের প্রয়োজন অন্তরূপ। সুতরাং ঐ সংশয়

নিবৃত্তির জন্য প্রমাণের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ্যে উচিত বলিয়া মহাবি এই স্বত্বের দ্বারা তাহা করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রমাণ এই চতুর্বিধই। ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার প্রমাণ নাই। ইহা উদ্যোতকরের কথা।

মহাবি পূর্বক স্বত্বের দ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বলেন নাই। এই বিভাগস্বত্ব “প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ স্থিতি হইয়াছে। প্রমাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝিলেই “প্রমাণে”র সামান্য লক্ষণ বুঝা যায়। (প্রমীয়েতেহেনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) প্রমাণ শব্দটি প্র পূর্বক না ধাতুর উত্তর করণ অর্থে অনট্ প্রত্যয়সিদ্ধ। না ধাতুর অর্থ জ্ঞান। প্র শব্দের অর্থ প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট। যথার্থ জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। সেই জ্ঞান অহুত্বিরূপ হইলে আরও প্রকৃষ্ট হয়। অহুত্বিজানিত স্বতিরূপ জ্ঞান অহুত্বির অধীন বলিয়া অহুত্বি হইতে নিরুট। ফলকথা, যথার্থ অহুত্বিই এখানে প্র পূর্বক না ধাতুর দ্বারা বুঝিতে হইবে। তাহার পরে করণার্থ অনট্ প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝা যায় করণ। তাহা হইলে প্রমাণ শব্দের দ্বারা বুঝা গেল, যথার্থ অহুত্বির করণ। সুতরাং যথার্থ অহুত্বির করণই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। স্বত্ব “প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই তাহা স্থিতি হইয়াছে। “প্রমাণের” ফল “প্রমাই” যথার্থ অহুত্বি। সেই “প্রমার” অর্থাৎ যথার্থ অহুত্বির কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা করিলে “প্রমাতা” ও “প্রমের” প্রভৃতিও প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সেগুলি প্রমাণ হইতে ভিন্ন। বাহ্য যথার্থ অহুত্বির করণ, তাহাই প্রমাণ। ঐ অহুত্বির কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্ম প্রভৃতি প্রমাণ নহে। তবে প্র পূর্বক “মা” ধাতুর উত্তর করণ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে অনট্ প্রত্যয় করিয়া প্রমাতা প্রভৃতিতেও প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। সেরূপ প্রয়োগ স্থলবিশেষে দেখাও যায়। প্রমাতা ব্যক্তিকেও প্রমাণ পুরুষ বলা হয়। আবার “প্রমা”কেও অর্থাৎ যথার্থ অহুত্বিকেও প্রমাণ বলা হয়। প্রমা অর্থে “প্রমাণ” শব্দের প্রয়োগ নব্যগণও করিয়াছেন। প্রাচীন মতে প্রমাও প্রমাণ হয়। অর্থাৎ মহাবি-স্বত্রোক্ত প্রমাকরণরূপ প্রমাণও হয়। ক্রমে ইহা পরিষ্কৃত হইবে।

এখন বুঝিতে হইবে, “করণ” কাহাকে বলে। নব্যগণ বলিয়াছেন—কারণের মধ্যে যেটি অসাধারণ কারণ, তাহাই “করণ”। ইহার ফলিতার্থ বলিয়াছেন যে, যে কারণটি কোন একটি ব্যাপারের দ্বারা কার্যজনক হয় অর্থাৎ তাহার ব্যাপারের অন্তর্গতই কার্য হয়, তাহাই করণ। যেমন কুঠারের দ্বারা কাঠ ছেদন করিতে কাঠের সহিত কুঠারের যে বিলক্ষণ সংযোগ আবশ্যক হয়, তাহা কুঠারের ব্যাপার। ঐ ব্যাপার দ্বারাই কুঠার কাঠ ছেদনের কারণ। ঐ ব্যাপারটি না হইলে কুঠার কাঠছেদনকার্য জন্মাইতে পারে না, সুতরাং ঐ ছেদনকার্যে কুঠার করণ। ঐ বিলক্ষণ সংযোগ তাহার ব্যাপার। কুঠার ঐ স্থলে করণ বলিয়াই “কুঠারেন ছিনত্তি” অর্থাৎ কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে পদার্থটি করণ কারক হইবে, ঐ পদার্থ তাহার কার্য সম্পাদন করিতে ঐ কার্যের অহুকুল যে ধর্মটিকে অপেক্ষা করে, সেই ধর্মকেই ঐ করণকারকের ব্যাপার বলে। ব্যাপারহীন পদার্থ করণ হইতে পারে না এবং ব্যাপারের দ্বারা বাহ্য কার্যজনক, তাহাই করণ; ইহা নব্য নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত। নব্যমতে করণকে কারক

বলা হইলেও করণ পদার্থ পূর্বোক্ত প্রকারই বলা হইয়াছে। ব্যাপার দ্বারা কার্যাজনক পদার্থই করণ। এই মতে যথার্থ অহুত্বের করণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ই হইবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষরূপ ব্যাপার দ্বারা ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের জনক, স্মরণাৎ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই করণ। প্রত্যক্ষটি যথার্থ হইলে সেখানে ঐ যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জলে চক্ষুঃসংযোগ হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় ঐ সংযোগ-সম্বন্ধরূপ ব্যাপার দ্বারা জলের প্রত্যক্ষ জন্মায়, স্মরণাৎ ঐ প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয় করণ, ঐ সংযোগ তাহার ব্যাপার। ঐ স্থলে চক্ষুই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইরূপ অহুমানাদি স্থলেও পূর্বোক্ত প্রকারে বাহ্য যেখানে যথার্থ অহুত্বের করণ হইবে, তাহাই সেখানে প্রমাণ হইবে। নব্য মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান অহুমান প্রমাণ। সাদৃশ্যজ্ঞান উপমান প্রমাণ। পদজ্ঞান শব্দ প্রমাণ। এ বিষয়ে নব্যগণের মধ্যেও মতভেদ আছে। পরে যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের লক্ষণ যথাক্রমে মহর্ষি-সূত্রেই সূচিত হইয়াছে। সূত্রে কেবল সূচনাই থাকে। সূচনা থাকে বলিয়াই তাহার নাম সূত্র। ব্যাখ্যার দ্বারা, বিচারের দ্বারা সেই সূচিত অর্থ বুঝিতে হয়। ব্যাখ্যার ভেদে, বুদ্ধির ভেদে সূত্রার্থবোধের ভেদ হওয়ায় সূত্রসিদ্ধান্তে মতভেদ হইয়াছে। তাহা চিরকালই হইবে। ভাষ্যকার বাংলায়ন প্রভৃতি প্রাচীনদিগের কথায় বুঝা যায়, তাহারা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকেই মুখ্য করণ পদার্থ বলিতেন। স্মরণাৎ ঐ ব্যাপারই তাহাদিগের মতে মুখ্য প্রমাণ। এই জন্মই ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রে “প্রত্যক্ষ” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে অব্যবহিক সমাসের অর্থ প্রকাশ করতঃ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কলকথা, বাহ্য চরম কারণ, অর্থাৎ বাহ্য উপস্থিত হইলে কার্য অবশ্যজ্ঞাবী, সেই ব্যাপারই প্রাচীন মতে মুখ্য করণ পদার্থ। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও চরম কারণ ব্যাপারকে করণ বলিতেন। গঙ্গেশ্বরের শব্দচিন্তামণির প্রারম্ভে টীকাকার মথুরানাথের কথায় ইহা পাওয়া যায়। সেখানে টীকাকার মথুরানাথ বৌদ্ধমতানুসারে করণের লক্ষণ বলিয়াছেন। সে লক্ষণানুসারে কেবল চরম কারণ ব্যাপারই করণ হয়। বাংলায়ন ও উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ চরম কারণরূপ ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিলেও ঐ ব্যাপারের দ্বারা যে পদার্থ কার্যাজনক হইয়া থাকে, তাহাকেও করণ বলিতেন। স্মরণাৎ তাহাদিগের মতে প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ও করণ হওয়ার প্রমাণ হইবে। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে করণ না বলিলে “চক্ষুঃ পশ্যতি” অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। তবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে চরম কারণ না হওয়ায় মুখ্য করণ নহে। মহর্ষি পাণিনি বলিয়াছেন—“সাধকতমং করণং।” কোষকার অমরসিংহও ঐ কথা লইয়া বলিয়াছেন—“করণং সাধকতমং”। এই সাধকতম কাহাকে বলে, ইহা লইয়াই করণ বিষয়ে নানা মত হইয়াছে। বাহ্য সাধক অর্থাৎ কারণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই সাধকতম। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা কি, তাহা বুঝিতে হইবে। বাহ্য ব্যাপারকে করণ বলেন নাই, চরম কারণরূপ ব্যাপার ব্যাপারশূন্য বলিয়া করণ হইতেই পারে না বলিয়াছেন, তাহারা বলিতেন যে, বাহ্য ব্যাপারের পরেই কার্য হয়, ব্যাপার-বিশিষ্ট হইলেই বাহ্য অবশ্য কার্য জন্মায়, তাহাই কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্মরণাৎ তাহাই

করণ। প্রাচীনগণ বলিতেন যে, ঐরূপ পদার্থ ঐ ভাবে সাধকতম হইলেও এবং পানিনি প্রভৃতি প্রয়োগ সাধনের জন্ত ঐ ভাবে ঐরূপ পদার্থকে সাধকতম বলিলেও বস্তুতঃ ঐ স্থলে উহাদিগের ব্যাপারই চরম কারণ। ঐ ব্যাপার না হওয়া পর্য্যন্ত উহার কার্য সাধন করিতে পারে না। সংযোগ না হইলে কুঠার ছেদন জন্মাইতে পারে কি? সুতরাং করণ কারক কার্য সাধন করিতে যে ব্যাপারকে নিয়ত অপেক্ষা করে, সেই চরম কারণ ব্যাপারই সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া বস্তুতঃ তাহাই সাধকতম। সুতরাং তাহা করণ। তবে ঐ ব্যাপারের সাহায্যে যে পদার্থ কার্যজনক, তাহাও অস্ত্র কারণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঐ ভাবে তাহাকেও “সাধকতম” বলা হইয়াছে। যেমন কুঠার কাঠের সহিত বিলক্ষণ সংযোগরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হইলে ছেদনকার্য অবশ্যসম্ভাব্য। এ জন্ত ঐরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট কুঠারকে কারণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া “সাধকতম” বলা যায়। পানিনি প্রভৃতি সেই ভাবেই কুঠার প্রভৃতি করণ কারককে সাধকতম বলিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে ব্যাপারটি যে পদার্থজন্ত, সেই পদার্থ না থাকিলেও ব্যাপারের দ্বারা তাহাকেও কার্যজনক বলা হইয়াছে। যেমন পূর্বাহ্নভূতি না থাকিলেও তজ্জন্ত সংস্কাররূপ ব্যাপার দ্বারা তাহা স্মরণ জন্মাইয়া থাকে। বাগাদি ক্রিয়া না থাকিলেও তজ্জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যাপার দ্বারা তাহা স্বর্গাদি জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপারেরই প্রাধান্ত স্বীকার্য এবং ব্যাপারই যে চরম কারণ, এ বিষয়েও কোন বিবাদ নাই। সুতরাং ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিতে হইবে। উদ্যোতকর হ্যায়বার্ত্তিকের প্রথমে প্রমাতা প্রভৃতিও প্রমিত্তির কারণ, প্রমাণও প্রমিত্তির কারণ, তবে আর প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ কি? এতদ্বত্তরে প্রমাণকে “সাধকতম” বলিয়া প্রমাতা প্রভৃতি হইতে তাহার বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রমাণ “সাধকতম” কেন, ইহার অনেক হেতু দেখাইয়াছেন। তাহাতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি করণ-কারকের ব্যাপারকে “সাধকতম” বলিয়া করণ বলিয়াছেন, নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে তিনি প্রমাণ বলিবেন কিরূপে? এ সকল কথা ক্রমে আরও পরিষ্কৃত হইবে। ফলকথা, প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে করণ বলিয়া প্রমাণ বলিলেও ঐ ব্যাপারজনক ইন্দ্রিয়াদিও তাহাদিগের মতে প্রমাণ। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথাতেও ইহা পাওয়া যায়। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, চরম কারণই প্রাচীন মতে প্রধান কারণ এবং যাহা সেই চরম কারণরূপ ব্যাপারের দ্বারা কার্যজনক হয়, তাহা অপ্রধান কারণ। নব্যগণ তাহাকেই করণ বলিয়াছেন এবং বৈয়াকরণগণ প্রয়োগ সাধনের জন্ত এই অপ্রধান কারণকেই করণ কারক বলিয়াছেন এবং ঐ করণকারক বস্তুর বিবক্ষাধীন, বস্তুর বিবক্ষানুসারে কর্ত্তা ও অবিকরণ কারক প্রভৃতিও করণ কারকরূপে ভাবায় ব্যবহৃত হয়, এ কথা স্বীকার করিতে বৈয়াকরণগণও বাধ্য হইয়াছেন।

১। “ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণেন প্রমাণ্যং কলে প্রযুক্তেন তদ্বৎপাদনামুকুলঃ সন্নিবর্ত্তী জ্ঞানং বা চরমভাবী ধর্ম্ম-ভেদোপেক্ষ্যত ইতি ভবতি ব্যাপারঃ স এব বৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে।”—তাৎপর্য্যটীকা। “ন জ্ঞাবাহীনামেব করণত্বং অপি তু ব্যাপারতাপি, অস্তথা কর্ত্তনামথেষ্টবৃত্তিবাধিশেষে ন করণবিত্তিঃ আরেত। উক্তিদা যজ্ঞেত দর্পণৌর্ণ-মাসাভ্যাং যজ্ঞেতত্যাধি। সম্ভবতি তত্কাপি সিদ্ধন্ত ফলভাবনায় নিমিত্তত্বং” (তাৎপর্য্যটীকা। (অনুবাদ-সূত্র)।

ফলতঃ বৈয়াকরণ-সম্মত করণের মধ্যেও মুখ্য গৌণ ভেদ আছে। প্রাচীন মতে ইন্দ্রিাদি প্রমাণ হইলেও তাহার মুখ্য প্রমাণকে বলিবার জন্তই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রে “প্রত্যক্ষ” শব্দটি অব্যয়ীভাব সমাস হইলেই তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার বুঝা যায়, তাই বার্তিকের ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অত্র “প্রত্যক্ষ” শব্দটি “প্রাদি সমাস” হইলেও সূত্রে ‘প্রত্যক্ষ’ শব্দটি অব্যয়ীভাব সমাস। কারণ, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণই “প্রত্যক্ষ” শব্দের প্রতিপাদ্য। অব্যয়ীভাব সমাস ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহার দ্বারা বুঝা যায় না। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বুঝিলে ইন্দ্রিয়কেও সেই সঙ্গে বুঝা যাইবে। কারণ, ইন্দ্রিয় ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না, স্নতরাং ব্যাপার দ্বারা পরস্পরায় ইন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে, ইহাও তাহাতে বুঝা যায়। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেই সূত্রস্থ “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। আবার শব্দ প্রমাণের ব্যাখ্যায় শব্দকেই প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, মহর্ষি-সূত্রে তাহাই আছে (৭।৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।) সেখানেও শব্দ বোধের চরম কারণরূপ করণই প্রাচীন মতে মুখ্য শব্দ প্রমাণ বুঝিতে হইবে। সেই চরম কারণ যাহার ব্যাপার, সেই জ্ঞায়মান শব্দকেও প্রাচীনগণ শব্দ বোধের করণ বলিয়া স্বীকার করায় তাহাও শব্দপ্রমাণ হইবে। মহর্ষি সেই অভিপ্রায়েই শব্দবিশেষকেই শব্দ-প্রমাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার এই সূত্রে প্রত্যক্ষাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের লক্ষণ বলেন নাই। যথার্থ প্রত্যক্ষের করণত্বই প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ যথার্থ অহুমিত্তির করণত্বই অহুমানপ্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ যথার্থ উপমিত্তির করণত্বই উপমান-প্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ যথার্থ শব্দ বোধের করণত্বই শব্দপ্রমাণের লক্ষণ। মহর্ষি-সূত্রে পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। তবে প্রাচীনগণ চরম কারণকেই মুখ্য করণ বলায় প্রাচীন মতে প্রত্যক্ষাদি যথার্থ অহুভূতির চরম কারণই মুখ্য প্রমাণ, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

এখানে আর একটি কথা বুঝিয়া মনে রাখিতে হইবে। প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে “প্রমা” এবং “প্রমিত্তি” বলে। প্রাচীন মতে এই “প্রমিত্তি”ও প্রমাণ হয়। তাহার ফলকে অর্থাৎ ঐ “প্রমিত্তি”রূপ প্রমাণজন্ত যে জ্ঞানরূপ ফল হয়, তাহাকে প্রাচীনগণ বলিতেন— “হানাদিবুদ্ধি”। “হানাদিবুদ্ধি” বলিতে—“হানবুদ্ধি”, “উপাদানবুদ্ধি” এবং “উপেক্ষাবুদ্ধি”। “হা” ধাতুর উত্তর করণ অর্থে “অনট্” প্রত্যয় যোগে এই “হান” শব্দটি সিদ্ধ। “হা” ধাতুর অর্থ ত্যাগ। “হীয়েতেহেনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বাহার দ্বারা ত্যাগ করা হয়, তাহাই এখানে “হান” শব্দের অর্থ। “হান” এমন যে “বুদ্ধি”, তাহাই—“হানবুদ্ধি”। অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা হেয়ত্ব বোধ করিয়া ত্যাগ করা হয়, তাহাই “হান বুদ্ধি”। এইরূপ যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ হয় এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ঐ স্থলে যথাক্রমে “উপাদান” ও “উপেক্ষা” শব্দটি সিদ্ধ। এখন ইহার উদাহরণ বুঝিতে পারিলেই এ সকল কথা বুঝা যাইবে। জীবের বস্ত্রবোধ হইলে ঐ বস্ত্র গ্রহণ করে, অথবা ত্যাগ করে, অথবা উপেক্ষা

করে। পরিজ্ঞাত বস্তু উপকারী বলিয়া মনে হইলে তাহা গ্রহণ করে, অপকারী বলিয়া বুঝিলে ত্যাগ করে; উপকারীও নহে, অপকারীও নহে, এমন বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। এই পর্য্যন্তই জীবের বস্তুবোধের কার্য্য। এই যে গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষা করে, তাহার পূর্বে জীবের সেই বস্তুতে গ্রাহ্যতা প্রভৃতির বোধ জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। গ্রাহ্য বলিয়া না বুঝিলে জীব কখনই তাহা গ্রহণ করে না। কিন্তু ঐ গ্রাহ্যতা বোধ কিরূপে হইবে? আমি জল দেখিয়া বখন গ্রহণ করি, তখন তৎপূর্বে “এই জল গ্রাহ্য” এইরূপ একটা বোধ আমার অবশ্যই হয় এবং ত্যাগ বা উপেক্ষা করিলেও তৎপূর্বে “এই জল ত্যাজ্য” অথবা “এই জল উপেক্ষ্য” এইরূপ বোধ অবশ্যই জন্মে। কিন্তু ঐ বোধকে সেখানে প্রত্যক্ষ বলা যায় না। কারণ, সেই জলের গ্রহণ প্রভৃতি তখন হয় নাই। সেই গ্রহণাদি সেখানে ভাবী। ভাবী বিষয়ে লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান বিষয়েই হয়। সুতরাং “এই জল গ্রাহ্য”, এইরূপ বোধ বাহ্য জন্মে, তাহা গ্রহণরূপ ভাবী পদার্থবিষয়ক হওয়ার উহা প্রত্যক্ষ নহে, উহা অহুমিতি। ঐ অহুমিতিরূপ বোধবশতঃই সেখানে জল গ্রহণ করে। এইরূপ “এই জল হয়,” অথবা “উপেক্ষ্য,” এইরূপ বোধও অহুমিতি, তাহার ফলে জলের ত্যাগ বা উপেক্ষা হইয়া থাকে। এখন যদি “এই জল গ্রাহ্য” ইত্যাদি প্রকার বোধকে অহুমিতি বলিতে হইল, তাহা হইলে তৎপূর্বে তাহার কারণও দেখাইতে হইবে। তৎপূর্বে এমন কোন বুদ্ধি জন্মে, বাহার ফলে “এই জল গ্রাহ্য” ইত্যাদি প্রকার অহুমিতি হয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীনগণ তাহাকেই বলিয়াছেন “হানাদিবুদ্ধি”। সে কিরূপ বুদ্ধি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বোধ হইলে সেখানে-ইন্দ্রিয়-সংস্করের পরেই যে বোধটি জন্মে, তাহাকে “নির্লিকল্পক” প্রত্যক্ষ বলে। যেমন জলে চক্ষুঃ-সংযোগের পরেই জল ও জলজ-বিষয়ে একটা “আলোচন” হয়। “জলজবিশিষ্ট জল” এইরূপ বোধ না হইয়া কেবল পৃথকভাবে জল ও জলজবিষয়ে যে একটি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই প্রাচীনগণ “আলোচন” জ্ঞান এবং “নির্লিকল্পক” জ্ঞান বলিয়াছেন। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষও বলা হয়। ঐ “নির্লিকল্পক” বা অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষের পরেই “জলজবিশিষ্ট জল” এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের নাম “সবিকল্পক প্রত্যক্ষ”। পদার্থকে বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিলে সে জ্ঞানে “বিকল্প” অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকিল, এ জ্ঞান সেই জ্ঞানকে বলে “সবিকল্পক”। আর যে জ্ঞানে পদার্থদ্বয়ের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বোধ হয় না, তাহা নির্লিকল্পক। পূর্বোক্ত প্রকারে বখন “জলজবিশিষ্ট জল” এইরূপ “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন পূর্বাভূত জল বিষয়ে যে সংস্কার থাকে, তাহার উদ্বোধ হয়, তাহার ফলে একটি বিশিষ্ট স্মৃতি জন্মে। জলদর্শী পূর্বে জল দেখিয়াছিল, সেই জল পান করিয়া তাহার পিপাসা-নিবৃত্তিও হইয়াছিল। সুতরাং সেই জল পিপাসানিবর্তক, এ বিষয়ে তাহার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। এবং “তজ্জাতীয় জল মাত্রই পিপাসানিবর্তক,” এইরূপ একটা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ার তজ্জন্য ঐরূপ সংস্কারও তাহার রহিয়াছে। পুনরায় তজ্জাতীয় জল দেখিলে পরেই তাহার ঐ সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তাহার ফলে

পূর্বনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্বরূপ হয়, তাহার পরেই “এই জল তজ্জাতীয়,” এইরূপ একটা জ্ঞান জন্মে। উহা সেখানে প্রত্যক্ষাত্মক এবং “পরামর্শ” নামক অল্পমানপ্রমাণ এবং ইহাই ঐ স্থলে “উপাদানবুদ্ধি”। কারণ, ঐ বুদ্ধির দ্বারা পরকণ্ঠেই “এই জল গ্রাহ্য” এইরূপ অল্পমতি জন্মে, তাহার ফলে সেই জলের উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে। এইরূপ জলদর্শী ব্যক্তি যদি তাহার পরিদৃষ্ট জলে তাহার পূর্বদৃষ্ট এবং পরিত্যক্ত জলের সাদৃশ্য দেখিয়া “এই জল তজ্জাতীয়,” এইরূপ বোধ করে, অথবা পূর্বদৃষ্ট উপেক্ষিত জলের সাদৃশ্য দেখিয়া “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ বোধ করে, তাহা হইলে ঐ দুইটি বুদ্ধি তাহার যথাক্রমে “হানবুদ্ধি” এবং “উপেক্ষাবুদ্ধি” হইবে। উহার দ্বারা “এই জল হের” এবং “এই জল উপেক্ষা,” এইরূপ অল্পমান করিয়া সেই জলের তাগ বা উপেক্ষা হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত স্থলে পূর্বোক্ত প্রকার “হানাদিবুদ্ধি” প্রত্যক্ষ-প্রমিতি। এই পর্য্যন্তই ঐ স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জলের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধরূপ সন্নিবর্তনজন্ম ঐ পর্য্যন্ত বুদ্ধি হয়। সুতরাং উহাতেও ঐ সন্নিবর্তন কারণ। তবে ঐ “হানাদিবুদ্ধি”র পূর্বে যে “নির্নিকল্লক” বা “সবিকল্লক” প্রত্যক্ষ-প্রমিতি জন্মে, তাহা ঐ হানাদি বুদ্ধির কারণ হওয়ায়, ঐ হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে পূর্বজাত ঐ প্রত্যক্ষ-প্রমিতিকেও প্রাচীনগণ প্রমাণ বলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনগণ চরম কারণ অর্থাৎ যে কারণটি উপস্থিত হইলে কার্য্য অবশ্যজ্ঞাবী, তাহাকেই মুখ্য কারণ বলিতেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমিতি হানাদি বুদ্ধির প্রতি চরম কারণ হওয়ায় তাহাদিগের মতে মুখ্য প্রমাণ হয়, এ জন্ম তাহারা প্রমিতিবিশেষকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত হানাদি বুদ্ধির প্রতি ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সন্নিবর্তন চরম কারণ না হওয়ায় মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্য প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া এবং সেই ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তনজন্ম প্রমিতিকেও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বলিয়া হানাদি বুদ্ধির প্রতি মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু হানাদি বুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি হইলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে না। কারণ, তাহার ফল অল্পমতি।

পূর্বোক্ত স্থলে জলের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন অর্থাৎ সংযোগ-সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের প্রথম ব্যাপার। তাহার পরেই জল ও জলত্ব বিষয়ে “আলোচন” বা নির্নিকল্লক প্রত্যক্ষ জন্মে এবং তাহার পরেই “জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ “সবিকল্লক” প্রত্যক্ষ জন্মে। একই ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তনজন্ম যথাক্রমে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে বলিয়া প্রাচীনগণ ঐ দ্বিবিধ প্রত্যক্ষকেই ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তনের ফল বলিয়াছেন এবং ঐ ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তনকেই তাহার প্রতি মুখ্য কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন এবং ঐ ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তনের কারণ ইন্দ্রিয়ও তাহাতে কারণ বলিয়া তাহাকেও ঐ স্থলে প্রমাণ বলিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য অনেক পদার্থ ঐ দ্বিবিধ প্রত্যক্ষে কারণ হইলেও কারণ না হওয়ায় সেগুলি ঐ স্থলে প্রমাণ নহে। পূর্বোক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের পরে যে পূর্বোক্ত প্রকার “হানাদিবুদ্ধি” জন্মে, প্রাচীনগণ তাহাকে পূর্বজাত জ্ঞানেরই ফল বলিয়া ঐ জ্ঞানকেই তাহার প্রতি মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। ঐ জ্ঞানের সাধন পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তন এবং ইন্দ্রিয়ও ঐ

হানাদি বুদ্ধির প্রতি পরম্পরায় করণ হওয়ার তাহাকেও উহার প্রতি প্রমাণ বলিয়াছেন। অত্যাশ্রয় কারণগুলি করণ না হওয়ার তাহা ঐ স্থলে প্রমাণ হইবে না। মুখা ও গৌণ করণের লক্ষণ পূর্বেই বলিয়াছি। যাহারা ব্যাপারের দ্বারা কার্যাজমক না হইলে করণ বলেন না, অর্থাৎ নির্ল্যাপার চরম কারণকে করণই বলেন না, তাহারা নির্লিকল্পক প্রত্যকে ইন্দ্রিয়কে এবং সলিকল্পক প্রত্যকে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধকে এবং হানাদি বুদ্ধিতে নির্লিকল্পক প্রত্যকে করণ বলিতে পারেন। তাহা হইলে প্রাচীনদিগের জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ এবং তজ্জনা প্রত্যক জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিতে হয়; কিন্তু নবাগণ তাহা বলেন নাই, কেহ বলিলেও ব্যাখ্যাকারগণ তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই; প্রাচীনগণ উহা কেন বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ প্রচুর। জয়ন্ত ভট্ট জ্ঞানমঞ্জরীতে বহু মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, প্রমিতির কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম ও সাধারণ কারণ ভিন্ন যে সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমূহ, তাহাই প্রমাণ। ফলকথা, তিনিও ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ এবং তজ্জনা জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। বাহ্য চরম কারণ অর্থাৎ বাহ্য উপস্থিত হইলে কার্য না হওয়া আর ঘটিবে না, এমন পদার্থই মুখ্য করণ; এই মত জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতেও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বহু মতভেদ ও প্রতিবাদ থাকিলেও প্রাচীন ভাষ্যকার বাংজায়ন ও উদ্যোতকরের মতে প্রমাণের ফল “প্রমিতি”ও পূর্বোক্ত “হানাদি বুদ্ধি”র প্রতি প্রমাণ। অহুমানাদি স্থলেও ঐরূপ হইবে অর্থাৎ অহুমিতিক্রূপ প্রমিতি ও হানাদি বুদ্ধিরূপ অহুমিতির প্রতি অহুমান প্রমাণ হইবে। এইরূপ অত্যাশ্রয় বুদ্ধিতে হইবে। এই সকল প্রাচীন মতের সকল কথা বুদ্ধিতে হইলে অহুমিতিক্রূপ অহুমান “তাৎপর্যটাকা” প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন, কিন্তু বড় সাবধান হইয়া বুদ্ধিতে হইবে।

ভাষ্য। অক্সাক্ষ্য প্রতিবিষয়ঃ বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষঃ। বৃত্তিস্ত সন্মিকর্ষো জ্ঞানং বা। যদা সন্মিকর্ষস্তদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং।

অনুবাদ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি (ব্যাপার) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। “বৃত্তি” কিন্তু সন্মিকর্ষ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ), অথবা জ্ঞান (নির্বিকল্পক বা সলিকল্পক জ্ঞান)। যে সময়ে সন্মিকর্ষ (ব্যাপার হইবে), তখন জ্ঞানরূপ প্রমিতি (প্রমাণের) ফল হইবে। যে সময়ে জ্ঞান (ব্যাপার হইবে), তখন হানবুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করে), উপাদানবুদ্ধি (যে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করে) এবং উপেক্ষা-বুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা করে), (প্রমাণের) ফল হইবে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার এই স্বত্রভাষ্যে স্বত্রোক্ত প্রত্যক প্রভৃতি প্রমাণবোধক চারিটি সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদিগের নিকৃষ্ট লক্ষণ মহাবিশ্বের পরে ব্যক্ত হইবে।

“প্রতিগতমক্ষং” এইরূপ বিধি প্রাদি সমান করিলে প্রতিগত অর্থাৎ বিষয়-সন্নিহিত “অক্ষ” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়; কিন্তু তাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা পরিষ্কৃত হয় না এবং ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানরূপ বৃত্তিও যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে, তাহা বুঝা যায় না। “অক্ষমক্ষং প্রতিবর্ততে” এইরূপ বিধি অব্যয়ীভাব সমাসদ্বিত “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণবোধ না হইলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার “অক্ষমক্ষং প্রতিবর্ততে বৃত্তিঃ”—এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত অব্যয়ীভাব সমাসের বিগ্রহ-বাক্যের সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্য পূর্বোক্ত বিগ্রহবাক্যের কলিতার্থকখন মাত্র। উহা অব্যয়ীভাব সমাসের বিগ্রহবাক্য নহে। তাহা হইলে “অক্ষমক্ষং” এই স্থলে যথী বিভক্তি প্রযুক্ত হইত না।

অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বোক্ত বিগ্রহ-বাক্যের দ্বারা যে “বৃত্তি” অর্থ প্রতীত হইয়াছে, ভাষ্যকার এখানে তাহাকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ, প্রমাণ-বোধক “প্রত্যক্ষ” শব্দের উক্ত ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহাই বুঝা গিয়াছে। “বৃত্তি” বলিতে ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সন্নিবর্তন যেমন ইন্দ্রিয়-জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞান প্রত্যক্ষের জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান যে জ্ঞান জন্মে, তাহাও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান চরম ফল হানাদি-বুদ্ধির জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইবে। প্রাচীন স্মার্ত্যর্থাগণের মতে চরম কারণরূপ ব্যাপারই মুখ্য কারণ। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তন ও তদ্ব্যজ্ঞ জ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রমিতির মুখ্য কারণ বলিয়া মুখ্য প্রমাণ বলা যায়। পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে তাহাই বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তন প্রমাণের ফল নির্বিকল্পক বা সবিবিকল্পক জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল হানাদি-বুদ্ধি। স্মার্ত্যর্থাগণের এখানে এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—“উভয় পরিচ্ছেদকং সন্নিবর্তনো জ্ঞানকঃ।” বাহ্যিক কেবল ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তনকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন, উদ্যোতকর তাহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উদাহরণ বুঝিয়া কথাগুলি বুঝিতে হইবে। আমি আমার মনঃপূত পানীর জলের অন্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে আমার জলে চক্ষুঃসংযোগ হইল, এইটাই আমার বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন। তাহার পরক্ষণেই আমার জল ও জলবিষয়ে পৃথকভাবে একটি অবিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিল। এই জ্ঞানটির নাম “নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ।” তাহার পরক্ষণেই “জলবিবিশিষ্ট জল” এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিল; এই জ্ঞানটির নাম “সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।” পূর্বে জলই প্রত্যক্ষ ব্যতীত “জলবিবিশিষ্ট” এইরূপ প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না,— কারণ, বিশিষ্ট বুদ্ধি মাত্রই পূর্বে বিশেষণ জ্ঞান থাকা চাই। যে সর্প দেখে নাই, তাহার “এই স্থান সর্পবিশিষ্ট”, এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং “জলবিবিশিষ্ট” এইরূপ প্রত্যক্ষের পূর্বে পৃথকভাবে একটি জলই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ প্রত্যক্ষের নাম নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, উহা ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তনজ্ঞান এবং উহার পরজাত “জলবিবিশিষ্ট জল” এইরূপ সবিকল্পক প্রত্যক্ষটিও পূর্বজাত সেই ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তনজ্ঞান। সুতরাং ঐ স্থলে ঐ দুই প্রত্যক্ষেই ইন্দ্রিয়-সন্নিবর্তন প্রমাণ। ঐ প্রত্যক্ষের পরে তদ্ব্যজ্ঞ জ্ঞান জলের পিপাসা-নিবর্তক বিষয়ে আমার

যে সংস্কার আছে, ঐ সংস্কার উদ্ভূত হইয়া আমার পূর্বাহুত জলের পিপাসা-নিবর্তকত্বের স্মরণ জন্মাইল, শেষে “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ একটা জ্ঞান জন্মাইল; ইহারই নাম “উপাদান-বুদ্ধি।” ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইহা অহুমিতির কারণ জ্ঞান, এই জ্ঞান জন্ম শেষে আমার “ইহা গ্রাহ” এইরূপ অহুমিতি জন্মিল, আমি তখন পানের জন্ম ঐ জল গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যে উপাদানবিষয়ক বুদ্ধিকেই উপাদান-বুদ্ধি বলা হয় নাই। “উপাদীয়তেহেনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যে বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করিয়া উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে, তাহাই উপাদান-বুদ্ধি এবং ঐরূপে যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যজ্য বলিয়া অনুমান করিয়া ত্যাগ করে, তাহাই “হানবুদ্ধি” এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা বলিয়া অনুমান করিয়া উপেক্ষা করে, তাহাই “উপেক্ষা-বুদ্ধি।” প্রত্যক্ষ-স্থলে পূর্বোক্ত এই তিনটি বুদ্ধি প্রত্যক্ষাত্মক। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের পরে যে নির্বিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইয়া পূর্বোক্ত ঐ “হানাদি বুদ্ধি”রূপ ফল জন্মায়। এ জন্ম ঐ হানাদি বুদ্ধির পক্ষে পূর্বজাত সেই জ্ঞানই প্রমাণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের দ্বারা তজ্জন্ম যে প্রত্যক্ষ প্রমিতি জন্মে, তাহাকেও পরভাবী হানাদিবুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমিতির পক্ষে প্রমাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্য। মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থস্ত পশ্চান্মানমনুমানং। উপ-
মানং সামীপ্যজ্ঞানং যথা—গৌরেবং গবয় ইতি। সামীপ্যস্ত সামান্য-
যোগঃ। শব্দঃ শব্দ্যতেহেনেনার্থ ইত্যভিধীয়তে জ্ঞাপ্যতে। উপলব্ধি-
সাধনানি প্রমাণানীতি সমাখ্যানিব্বচনসামর্থ্যাদবোদ্ধব্যম্। প্রমীয়তে-
হেনেনেতি করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ। তদ্বিশেষসমাখ্যায়া অপি
তথৈব ব্যাখ্যানম্।

অনুবাদ। মিত অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞাত হেতুর দ্বারা লিঙ্গী অর্থের অর্থাৎ যে পদার্থে হেতু আছে, সেই অর্থের (সাধ্যের) পশ্চাৎ জ্ঞান (বাহার দ্বারা হয়, তাহা) অনুমান। “উপমান” বলিতে যেমন গো, এইরূপ গবয়, এইরূপ সামীপ্য জ্ঞান। সামীপ্য কিন্তু সাদৃশ্য-সম্বন্ধ। ইহার দ্বারা পদার্থ শব্দিত হয়, অভিহিত হয়, জ্ঞাপিত হয়, এ জন্ম “শব্দ” (প্রমাণ)। উপলব্ধির সাধনগুলি প্রমাণ, ইহা সমাখ্যার অর্থাৎ “প্রমাণ” এই সংজ্ঞার নির্বচন-সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ ধাতু-প্রত্যয়ের শক্তিবশতঃ বুঝা যায়। কারণ, “প্রমীয়তেহেনেন” এই ব্যুৎপত্তিতে (অর্থাৎ ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত হয়, এই অর্থে) প্রমাণ শব্দটি করণার্থবোধক ; (সুতরাং) সেই প্রমাণের বিশেষ সমাখ্যারও (“প্রত্যক্ষ,” “অনুমান,” “উপমান,” “শব্দ,” এই চারিটি বিশেষ সংজ্ঞারও) সেইরূপই (যেক্ষেপে করণার্থ বুঝা যায়) ব্যাখ্যা (বুঝিতে হইবে)।

টিপ্পনী। অল্প শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, মান শব্দের অর্থ জ্ঞান। তাহা হইলে অল্পমান শব্দের দ্বারা বুঝা যায় পশ্চাৎ জ্ঞান। অল্পমানের হেতুকে “লিঙ্গ” বলে। লিঙ্গ-জ্ঞানের পরে অল্পমান হয়, তাই উহার নাম “অল্পমান”। সন্দিগ্ধ বা বিপরীতভাবে জ্ঞাত লিঙ্গের দ্বারা জ্ঞান, প্রকৃত অল্পমান নহে; তাই বলিয়াছেন যে, লিঙ্গটি “মিত” অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞাত হওয়া চাই। শব্দ বোধ যথার্থরূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা হয়—কিন্তু সেখানে শব্দ লিঙ্গ হয় না, এ জন্ত তাহা অল্পমান হইতে পারিবে না। যে ধর্ম্মোক্তে অল্পমান হইবে, সেখানে লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু পদার্থ থাকা চাই, এ জন্ত বলিয়াছেন—“লিঙ্গী অর্থের পশ্চাৎ জ্ঞান”। ধর্ম্মী লিঙ্গবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে “লিঙ্গী” বলা যায়। কেবল ধর্ম্মীর অল্পমান হয় না; কারণ, তাহা সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু একটি অসিদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপেই ধর্ম্মীর অল্পমান হয়, এ জন্ত বলিয়াছেন—“লিঙ্গী অর্থের অল্পমান”। অর্থ বলিতে এখানে সাধ্য। কেবল ধর্ম্মী সাধ্য নহে। অল্পমের ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে ধর্ম্মী সাধ্য হইতে পারে। ভাবোক্ত অল্পমান ব্যাখ্যা যদিও অল্পমিতিরূপ ফলের ব্যাখ্যা, তাহা হইলেও (“বতঃ” এই কথার অব্যাহার করিয়া) বাহার দ্বারা ঐ অল্পমিতি জন্মে, তাহাই অল্পমান প্রমাণ—এই পর্য্যন্তই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, যখন অল্পমিতিরূপ ফলও হানাদি বুদ্ধির পক্ষে প্রমাণ হইবে, তখন “বতঃ” এই কথার অব্যাহার না করিলেও ভাষ্যার্থের অসংগতি নাই।

“উপ” শব্দের অর্থ সামীপ্য, “মান” শব্দের অর্থ জ্ঞান। সামীপ্য এখানে সাদৃশ্য, ইহা ভাষ্যকারই বলিয়াছেন। স্তত্রাং উপমান শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সাদৃশ্য-জ্ঞান। গবয়-নামক গো-সদৃশ একপ্রকার পশু আছে। “বধা গোরেবং গবয়ঃ” এই কথা যিনি শুনিয়াছেন, তিনি কখনও গো-সদৃশ ঐ পশুকে দেখিলে, গবয়ে গো-সাদৃশ্য দেখিয়া, “গবয় গবয় শব্দের বাচ্য” এইরূপে গবয়মাত্রের গবয়-শব্দবাচ্য বুঝিয়া থাকেন। ইহা ঐ সাদৃশ্য-জ্ঞানরূপ উপমান-প্রমাণের ফল। “শব্দ্যতেহেনার্থঃ”—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে “শব্দ” শব্দটি সিদ্ধ। স্তত্রাং জ্ঞায়মান পদ অথবা পদজ্ঞানই শব্দপ্রমাণ বলিয়া উহা দ্বারা বুঝা যাইবে। ভাষ্যে “শব্দ্যতে” ইহার বিবরণ অভিধীয়তে—তাহার বিবরণ জ্ঞাপ্যতে। লক্ষণাজ্ঞান পূর্ব্বক পদার্থের উপস্থিতি প্রযুক্তও শব্দ বোধ হয়; সেখানে পদার্থ অভিধা-বোঝিত না হইলেও জ্ঞাপিত হয়। তাই “জ্ঞাপ্যতে” বলিয়া উহারই পুনরুচ্চারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বাহার দ্বারা পদার্থ জ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ পদার্থবিষয়ক শব্দ বোধ হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ।

“প্রমাণ” বলিতে যথার্থ অনুভূতির সাধন। ইহা প্রমাণ শব্দের ধাতু-প্রত্যয়ের শক্তিতেই বুঝা যায়। প্রমাণ-নামান্ত্রবোধক ‘প্রমাণ’ শব্দটি যখন করণার্থবোধক, তখন তাহার বিশেষ নামগুলিও করণার্থবোধক, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। স্তত্রাং সেগুলিরও সেইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। প্রমাণবোধক প্রত্যয়াদি শব্দের ব্যুৎপত্তিমাত্রই এই ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি প্রত্যয়াদি প্রমাণের লক্ষণ নহে। স্তত্রাং প্রমাণাভাসে অতিব্যাপ্তি-দোষের আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ প্রমাণাভাসে নাই।

ভাব্য। কিং পুনঃ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংগ্ৰবন্তেহথ প্রতিপ্রমেয়ং ব্যবতিষ্ঠন্ত ইতি। উভয়থা দর্শনং। অন্ত্যাত্মেত্যাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে। তত্রানুমানং—“ইচ্ছা-দেব প্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানাত্মানো লিঙ্গ”মিতি। প্রত্যক্ষং যুজ্ঞানস্ত যোগসমাধিজ্ঞাত্মমনসোঃ সংযোগ-বিশেষাদাত্মা প্রত্যক্ষ ইতি। অগ্নিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে অত্রাগ্নিরিতি। প্রত্যাসীদতা ধূমদর্শনে-নানুসীয়তে। প্রত্যাসম্মেন চ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে।

অনুবাদ। প্রমাণগুলি কি প্রমেয়কে অভিসংগ্ৰব করে? অথবা প্রতিপ্রমেয়ে ব্যবহৃত? (অর্থাৎ এক একটি প্রমেয়ে কি বহু প্রমাণের ব্যাপার হয়? অথবা কোন একটি বিশেষ প্রমাণেরই ব্যাপার হয়?)। (উত্তর)—দুই প্রকারই দেখা যায়। (এক প্রমেয়ে বহু প্রমাণের ব্যাপাররূপ প্রমাণসংগ্ৰবের উদাহরণ দেখাইতেছেন) আত্মা আছে, ইহা শব্দপ্রমাণ হইতে বুঝা যায়। তদ্বিষয়ে (আত্মবিষয়ে) অনুমান উক্ত হইয়াছে, “ইচ্ছা-দেব প্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানাত্মানো লিঙ্গ” এই সূত্র (১অং, ১আং, ১০সূত্র)। তদ্বিষয়ে যুজ্ঞান ব্যক্তির (যোগিবিশেষের) যোগসমাধিজাত প্রত্যক্ষ আছে। আত্মা এবং মনের সংযোগ-বিশেষ প্রযুক্ত বথার্থরূপে আত্মা প্রত্যক্ষ হয়। (লৌকিক বিষয়েও প্রমাণ-সংগ্ৰবের উদাহরণ দেখাইতেছেন) “এখানে অগ্নি আছে,” এইরূপ শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নি প্রতীত হয়। নিকটবর্তী হইতে থাকিলে তৎকর্তৃক ধূম দর্শনের দ্বারা (ঐ অগ্নি) অনুমিত হয় এবং নিকটবর্তী হইলে তৎকর্তৃক (ঐ অগ্নি) প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ হয়।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ নাই; সুতরাং প্রমাণের চতুর্বিধ বিভাগ উপপন্ন হয় না, এ কথা যাহারা বলিবেন, ভাব্যকার তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রমাণ-সংগ্ৰব এবং প্রমাণ-ব্যবহার কথা বলিতেছেন। যে বিষয়ে বহু প্রমাণের ব্যাপার আছে, সে বিষয়ে প্রমাতা তাঁহার বথার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার ইচ্ছাবশতঃ বহু প্রমাণের দ্বারাই তাহাকে বথার্থরূপে বুঝিয়া থাকেন; সুতরাং এক বিষয়ে বহু প্রমাণের সংকররূপ প্রমাণ-সংগ্ৰব আছে এবং উহা ব্যর্থ নহে। বথার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার ইচ্ছাবশতঃই সম্ভবতঃ বহু প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়। এই প্রমাণ-সংগ্ৰবের উদাহরণ অলৌকিক আত্মবিষয়ে এবং লৌকিক অগ্নি-বিষয়ে ভাব্যকার দেখাইয়াছেন। উহা প্রদর্শন মাত্র। ঐরূপ বহু স্থলেই প্রমাণ-সংগ্ৰব আছে। যেখানে একমাত্র প্রমাণের ব্যাপার অর্থাৎ যে পদার্থ কোন একটি প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণান্তরের বিবরণ নহে, অথবা যেখানে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা বথার্থ জ্ঞান হইলে তাহাতে প্রমাতার আর জিজ্ঞাসা থাকে না, সেখানে প্রমাণের ব্যবহা। এই প্রমাণ-ব্যবহার উদাহরণ ভাব্যকার (অলৌকিক ও লৌকিক বিষয়ে) ইহার পরেই দেখাইতেছেন। সেগুলিও প্রদর্শন মাত্র। সেইরূপ বহু স্থলেই প্রমাণের ব্যবহা আছে, ইহা তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। ব্যবস্থা পুনঃ “অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ” ইতি।
 লৌকিকস্ত স্বর্গে ন লিঙ্গদর্শনং ন প্রত্যক্ষম্। স্তনয়িত্ব শব্দে শ্রয়মাণে
 শব্দহেতোরনুমানম্। তত্র ন প্রত্যক্ষং নাগমঃ। পার্শ্বো প্রত্যক্ষত
 উপলভ্যমানে নানুমানং নাগম ইতি। সা চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা।
 জিজ্ঞাসিতমর্থমাণোপদেশাৎ প্রতিপদ্যমানো লিঙ্গদর্শনেনাপি বুভুৎসতে,
 লিঙ্গদর্শনানুমিতঞ্চ প্রত্যক্ষতো দৃঢ়কতে, প্রত্যক্ষত উপলব্ধেহর্থ জিজ্ঞাসা
 নিবর্ততে। পূর্বোক্তমুদাহরণং অগ্নিরিতি। প্রমাতুঃ প্রমাতব্যেহর্থ
 প্রমাণানাং সংকরোহভিসংপ্লবঃ, অসংকরো ব্যবস্থেতি। ইতি ত্রিসূত্রো-
 ভাষ্যম্। ৩।

অনুবাদ। ব্যবস্থা (অর্থাৎ প্রমাণের অসংকর), কিন্তু “স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র
 হোম করিবে” এই স্থলে। লৌকিক ব্যক্তির স্বর্গবিষয়ে হেতুদর্শন অর্থাৎ অনুমান
 নাই, প্রত্যক্ষও নাই; (অর্থাৎ যিনি স্বর্গপদার্থ প্রত্যক্ষ করেন নাই, অনুমান-প্রমাণের
 দ্বারাও বুঝিতে পারেন নাই, সেই লৌকিক ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরূপ প্রমেয়ে একমাত্র
 শ্রুতি-প্রমাণই ব্যবস্থিত। “অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ” এই শ্রুতি-প্রমাণের
 দ্বারাই তাঁহার স্বর্গবিষয়ক প্রমিতি হইয়া থাকে)। (লৌকিক বিষয়েও প্রমাণের
 ব্যবস্থা দেখাইতেছেন) মেঘের শব্দ শ্রয়মাণ হইলে (সেই শব্দের দ্বারা) শব্দহেতুর
 (মেঘের) অনুমান হয়। তদ্বিষয়ে (তখন) প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, শব্দ-প্রমাণ নাই।
 প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলভ্যমান (দৃশ্যমান) হস্তে (তখন) অনুমান-প্রমাণ নাই, আগম-
 প্রমাণও নাই। সেই এই প্রমিতি (প্রমাণ-সংপ্লব স্থলে প্রমাণের ফল যথার্থ জ্ঞান)
 প্রত্যক্ষপরা অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রধান। (কেন? তাহা বুঝাইতেছেন) জিজ্ঞাসিত
 পদার্থকে শব্দ-প্রমাণ হইতে বোধ করতঃ লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাও বুঝিতে
 ইচ্ছা করে। লিঙ্গদর্শনের দ্বারা অনুমিত পদার্থকে আবার প্রত্যক্ষের দ্বারা দেখিতে
 ইচ্ছা করে। প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ পদার্থে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। (এ বিষয়ে)
 অগ্নি উদাহরণ পূর্বের উক্ত হইয়াছে। প্রমাতার প্রমেয় বিষয়ে বহু প্রমাণের সংকরকে
 “অভিসংপ্লব” বলে, অসংকরকে “ব্যবস্থা” বলে। তিন সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত হইল। ৩।

টিপ্পনী। প্রমাণ-সংপ্লবস্থলে যে সমস্ত প্রমিতি হয়, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান। কারণ,
 প্রত্যক্ষ হইলে আর তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে না। “অগ্নিরাণোপদেশাৎ প্রতীয়তে”, ইত্যাদি
 ভাষ্যের দ্বারা ভাষ্যকার অগ্নিকে ইহার লৌকিক উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া আদিরাছেন।

অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নিকে জানিলেও অনুমানের দ্বারা আবার জানিতে ইচ্ছা হয়। ঐ ইচ্ছাবশতঃ কিছু নিকটে যাইয়া ধূম দর্শনের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করে। তখন তাহার দ্বারা পূর্বজ্ঞান-জন্ত সংস্কার দূত হয়। কিন্তু তখনও অগ্নিকে প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা থাকে। তাই একেবারে নিকটবর্তী হইয়া ঐ অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করে। তখন আর ঐ অগ্নি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে না; কারণ, প্রত্যক্ষের বড় আর কোন প্রশ্ন নাই। তাই ঐ স্থলের প্রমিতির মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ। প্রমাণের ব্যবস্থাহলে এই প্রাধান্য-বিচার নাই। কারণ, সেখানে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা একমাত্র প্রমিতিই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বাহাকে প্রমাণের “অভিনংগ্ৰহ” বলিয়াছেন, তাহা “প্রমাণসংগ্ৰহ” শব্দের দ্বারাও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথম তিন সূত্রের দ্বারা শ্রায়দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য এবং তাহার ব্যবস্থাপক প্রমাণ সূচিত হইয়াছে। তাই বেদান্ত-দর্শনের চতুঃসূত্রীর শ্রায় শ্রায়দর্শনের “ত্রিসূত্রী” মহর্ষি গোতমের একটা বিশেষ প্রবন্ধ; ইহা সূচনা করিবার জন্তই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“ইতি ত্রিসূত্রীভাষ্যম্”। ঐ স্থলে “ইতি” শব্দের অর্থ সমাপ্তি। শ্রায়বার্ত্তিককার এবং তাৎপর্য্যটীকাকার এবং তাৎপর্য্য-পরিণুক্তিকারও এই ত্রিসূত্রী ব্যাখ্যার পরে স্ব স্ব প্রবন্ধের সমাপ্তি বোষণা করিয়াছেন। ৩।

ভাষ্য। অথ বিভক্তানাং লক্ষণবচনম্।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রমাণের বিভাগের পরে বিভক্ত প্রমাণ-চতুষ্কয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। (তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্বপ্রথম উদ্দিষ্ট হওয়ায় তদনুসারে সর্ববাঞ্চে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই লক্ষণ বলিয়াছেন)।

সূত্র। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যাপদেশ্য-
মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। ৪।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষ হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং “অব্যাপদেশ্য” অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের সংজ্ঞাবিষয়ক নহে বলিয়া শব্দ নহে এবং “অব্যভিচারী” অর্থাৎ যে জ্ঞান বিপরীত-নিশ্চয়রূপ ভ্রম নহে এবং “ব্যবসায়াত্মক” অর্থাৎ যে জ্ঞান সংশয়াত্মক নহে—নিশ্চয়াত্মক, এমন জ্ঞানবিশেষ যাহার দ্বারা জন্মে, অর্থাৎ এতাদৃশ জ্ঞানের বাহা করণ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

টীপনী। মহর্ষি গোতম “উদ্দেশ্য”, “লক্ষণ” এবং “পরীক্ষা”র দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার প্রথমোক্ত পদার্থ “প্রমাণ”। তাহার সামান্য উদ্দেশ্য প্রথম সূত্রের দ্বারা করিয়াছেন এবং তৃতীয় সূত্রের দ্বারা তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিভাগ করিয়াছেন। তৃতীয় সূত্রে “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষাদি বিশেষ প্রমাণ-চতুষ্কয়ের লক্ষণ বলিতে হইবে, তাই মহর্ষি তন্মধ্যে এই সূত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত

প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার লক্ষণ বুঝা আবশ্যক। লক্ষণের দ্বারাই পদার্থ তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পদার্থের লক্ষণ না বুঝিলে ঐ বিশিষ্টতা বা বিশেষ বুঝা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিলে তদ্বারা উহা তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা যাইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ-জ্ঞান তাহার একপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে পদার্থের বিশেষ জ্ঞাপনই সর্বত্র লক্ষণের প্রয়োজন। মহর্ষির লক্ষণ-সূত্রগুলিও উহাই প্রয়োজন। প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব জানাইতে তাহাদিগের লক্ষণ বলিতে হয়,—এ জন্ত মহর্ষি তাহাদিগের লক্ষণ-সূত্রগুলি বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইবে, উহা তাহার সজাতীয় অন্তর্যঙ্গাদি প্রমাণ এবং তাহার বিজাতীয় প্রত্যক্ষভাষ্য এবং প্রমের অভূতি পদার্থবর্গ নহে, উহা তাহা হইতে বিশিষ্ট, তাহা হইতে ভিন্ন। এইরূপ বোধ উহার একপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ সর্বত্রই লক্ষণের ইহাই প্রয়োজন বুঝিতে হইবে।

এই স্বত্রে “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছে। “প্রত্যক্ষ” শব্দের অস্তিত্ব অর্থ থাকিলেও এখানে উহার অর্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই এই স্বত্রে মহর্ষির বক্তব্য। স্বত্রের অন্য অংশের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষির তাৎপর্য এই যে, এইরূপ জ্ঞানবিশেষ বাহ্য দ্বারা জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অর্থাৎ স্বত্রে “বতঃ” এই কথার অধ্যাহার করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই স্বত্রার্থ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যটীকাকারও ইহাই বলিয়াছেন। নচেৎ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমিতির লক্ষণ বলা হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই যে মহর্ষির এই স্বত্রে বক্তব্য। যদিও প্রত্যক্ষ প্রমিতিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় বটে, কিন্তু সেই প্রমিতি মাত্রই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে না। হানাদি বুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমিতি অন্তর্মিতির করণ হওয়ার অন্তর্যঙ্গ-প্রমাণই হইবে এবং ইন্দ্রিয় এবং তাহার সন্নিকর্ষবিশেষও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। সুতরাং স্বত্রে “বতঃ” এই কথার অধ্যাহার ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণমাত্রের লক্ষণ বলা হয় না। ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির যখন এই স্বত্রে বক্তব্য, তখন তাহার তাৎপর্য ঐ পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে এবং স্বত্রে “প্রত্যক্ষ” শব্দটি প্রত্যক্ষ প্রমাণবোধক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পরন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে তাহার ফল প্রত্যক্ষ প্রমিতির লক্ষণও এই স্বত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। একই স্বাক্ষর স্বত্রের দ্বারা অনেক তত্ত্বসূচনা করাই স্বত্রকার মহর্ষিদিগের কৌশল। স্বলবিশেষে অন্য বাক্যের অধ্যাহার করিয়া মহর্ষি-স্বত্রের সেই সকল অর্থ বুঝিতে হয়। ঐরূপ অধ্যাহার স্বত্রকারদিগের অভিপ্রেতই থাকে। এ জন্তই ভাষ্যকারগণ স্বত্রার্থবর্ণনায় অনেক কথার পূরণ করিয়া স্বত্রের অবতারণা করেন এবং ঐরূপ করিয়া ব্যাখ্যাও করেন। মূলকথা, যাহার দ্বারা এই স্বত্রোক্ত জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ—এই পর্য্যন্তই এখানে স্বত্রার্থ বুঝিতে হইবে। সে কিরূপ জ্ঞান? তাই প্রথমই বলিয়াছেন, “ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান।” জ্ঞান, রসনা, চক্ষু, শুক্ল, শ্রোত্র, এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়। ইহা ছাড়া আর একটি ইন্দ্রিয় আছে,

তাহা অন্তরিক্ষিয়, তাহার নাম মন। এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মিত বিষয় আছে। সকল পদার্থই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। আবার কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, এমনও বহু পদার্থ আছে। সেগুলিকে বলে অতীন্দ্রিয় পদার্থ। যে পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, সেই পদার্থের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিশেষ-হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাই ই“ন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধবোধোৎপন্ন জ্ঞান,” তাহাকেই বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ভাষ্যকার স্বত্রার্থ-বর্ণনার স্বত্রোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতেও এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহার দ্বারা হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এই পর্য্যন্তই স্বত্রার্থ বৃষ্টিতে হইবে। পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষকেই “ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ” বলে। উদ্যোতকর প্রভৃতি ত্রায়চার্য্যগণ এই “সম্বন্ধ”কে ছয় প্রকার বলিয়াছেন। যথা—(১) “সংযোগ,” (২) “সংযুক্ত সমবায়,” (৩) “সংযুক্তসমবেত সমবায়,” (৪) “সমবায়,” (৫) “সমবেতসমবায়,” (৬) “বিশেষণতা”। ইহাদিগের মধ্যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধই “সম্বন্ধ” এবং দ্রব্যগত গুণ, ক্রিয়া ও জাতির প্রত্যক্ষে “সংযুক্তসমবায়-সম্বন্ধ”ই “সম্বন্ধ”। যেমন বৃক্ষের গুণ, ক্রিয়া এবং বৃক্ষ প্রভৃতি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে বৃক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে বৃক্ষ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হয়। ঐ বৃক্ষের সহিত তাহার গুণ, ক্রিয়া ও জাতির “সমবায়” নামক সম্বন্ধ থাকায় সেই সকল পদার্থে ইন্দ্রিয়-সংযুক্তের সমবায় সম্বন্ধ আছে। এই জন্ত সেখানে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধকে “ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধ” বলা হইয়াছে। এইরূপ দ্রব্যগত গুণ ও ক্রিয়াতে যে জাতি আছে, তাহার প্রত্যক্ষে “সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়” সম্বন্ধই সম্বন্ধ। যেমন গুরু রূপের গুরুত্ব ধর্মটি গুরুরূপগত “জাতি”। ঐ গুরু রূপ গুণপদার্থ। উহা যে দ্রব্যে আছে, তাহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ হইলে সেই দ্রব্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইল। সেই দ্রব্যের সহিত তাহার গুরু রূপের “সমবায়” নামক সম্বন্ধ থাকায় ঐ গুরু রূপ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দ্রব্যে সমবেত অর্থাৎ সমবায় নামক সম্বন্ধে অবস্থিত। সেই গুরু রূপে গুরুত্ব-জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া ঐ গুরুত্বের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের “সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়” নামক সম্বন্ধ থাকিল। উহাই ঐ গুরুত্ব জাতির সহিত সেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ। আকাশের সহিত শব্দের “সমবায়” নামক সম্বন্ধই জ্ঞান ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত। সুতরাং শব্দপ্রত্যক্ষে “সমবায়”ই “সম্বন্ধ”। শব্দগত শব্দ প্রভৃতি জাতিরও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে “সমবেত-সমবায়” সম্বন্ধই সম্বন্ধ। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত অর্থাৎ “সমবায়”-সম্বন্ধে অবস্থিত, সেই শব্দে শব্দ প্রভৃতি জাতিও সমবায় সম্বন্ধেই অবস্থিত, সুতরাং শব্দ প্রভৃতি জাতির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের “সমবেত-সমবায়” নামক সম্বন্ধ আছে, উহাই সেখানে শব্দ প্রভৃতির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের “সম্বন্ধ”। অনেক অভাব পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়, যেখানে ভূতলে চক্ষুঃসংযোগের দ্বারাই “এখানে সর্প নাই” এইরূপ বোধ হয়, সেখানে উহা সর্পাতাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। সেখানে ভূতল চক্ষুঃসংযুক্ত। ভূতলের সহিত সর্পাতাবের “স্বরূপ-

সম্বন্ধ" কল্পনা করা হইয়াছে এবং ঐ সম্বন্ধের নাম বলা হইয়াছে "বিশেষণতা"। তাহা হইলে ভূতলগত সর্পাভাবের সহিত দেখানে চকুরিজিরের "সংযুক্তবিশেষণতা" সম্বন্ধ আছে। এইরূপ অন্তরূপেও অভাবের সহিত ইঞ্জিরের "বিশেষণতা"-সম্বন্ধ ("সংযুক্তসমবেত-বিশেষণতা," "সমবেত-বিশেষণতা" প্রভৃতি) হয়, এ জন্ত অভাব প্রত্যক্ষে "বিশেষণতা" নামে সর্ববিধ বিশেষণতা ধরিয়া এক প্রকারই সন্নিবন্ধ বলা হইয়াছে এবং এই জন্ত লৌকিক প্রত্যক্ষে পূর্বোক্ত "সন্নিবন্ধ" ছয় প্রকারেই পরিগণিত হইয়াছে। এবং এই "সন্নিবন্ধ"গুলি লৌকিক প্রত্যক্ষের সাধন বলিয়া ইহাদিগকে "লৌকিক সন্নিবন্ধ" বলা হইয়াছে। এই "সন্নিবন্ধের" কথা এবং দূরত্ব চকুর সহিত দ্রষ্টব্য দ্রব্যের সংযোগ কিরূপে হয়, ইত্যাদি কথা তৃতীয়াধ্যায়ে ইঞ্জির-পরীক্ষা-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। এই স্বত্রে মহাবি "সন্নিবন্ধ" শব্দের দ্বারাই পূর্বোক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধবিশেষের সূচনা করিয়াছেন। "সন্নিবন্ধ" না বলিয়া সংযোগ বা অন্ত কোন সম্বন্ধবিশেষের নাম করিলে উহা বুঝা যাইত না। স্বত্রে "উৎপন্ন" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, ইঞ্জিরের সহিত বিষয়ের যে সন্নিবন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক, তাহাই এখানে "ইঞ্জিয়ার্থ-সন্নিবন্ধ" বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন ভিত্তিতে চকুর-সংযোগ হইলেও ভিত্তির ব্যবহৃত অথচ ভিত্তিসংযুক্ত বস্তাদির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু দেখানেও চকুরিজিরের ঐ বস্তুর সহিত "সংযুক্ত-সংযোগ" সম্বন্ধ আছে; তাহা হইলে কলামুসারে কল্পনা করিয়া বুঝা যায়, ঐরূপ "সংযুক্ত-সংযোগ" সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের উৎপাদক নহে, সুতরাং স্বত্রে ঐরূপ সম্বন্ধ ইঞ্জিয়ার্থ-সন্নিবন্ধ শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই এবং স্বত্রে ঐ স্থলে "অর্থ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, যে বস্তু ইঞ্জিরের "অর্থ" অর্থাৎ গ্রাহ্য (গ্রহণযোগ্য), তাহার সহিত ইঞ্জিরের সন্নিবন্ধই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক। আকাশ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যের সহিত চকুর সংযোগ হইলেও তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ঐরূপ "সন্নিবন্ধ" স্বত্রে গৃহীত হয় নাই। এই জন্তই ইঞ্জিরসন্নিবন্ধ না বলিয়া মহাবি বলিয়াছেন - "ইঞ্জিয়ার্থসন্নিবন্ধ"। যথাস্থানে এ সকল কথার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ের সহিত ইঞ্জিরের সংযোগাদি সন্নিবন্ধ হেতুক সুখ-দুঃখও উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, সুতরাং কেবল "ইঞ্জিয়ার্থসন্নিবন্ধোৎপন্ন" বলিলে সুখ-দুঃখবিশেষও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এ জন্ত মহাবি "জ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুখ-দুঃখ জ্ঞান পদার্থ নহে, সুতরাং তাহা কোন স্থলে "ইঞ্জিয়ার্থসন্নিবন্ধোৎপন্ন" হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইবে না। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র স্বত্রেও "জ্ঞান" শব্দের এইরূপ প্রয়োজনই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। "জ্ঞানমঞ্জরী"কার জদন্তভট্ট বলিয়াছেন যে, স্বত্রে যখন "ব্যবসায়াত্মক" শব্দ রহিয়াছে, তখন তাহাতেই "জ্ঞান" পাওয়া গিয়াছে। কারণ, "ব্যব-সায়াত্মক" শব্দের অর্থ নিশ্চয়াত্মক; তাহা হইলে বুঝা গেল, নিশ্চয় নামক জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইবে কিরূপে? সেগুলি ত আর নিশ্চয় নামক জ্ঞানবিশেষ নহে? জয়ন্তভট্ট এ কথা লইয়া বহু বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বত্রে "জ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ না করিলে বিষয়বোধক কোন শব্দপ্রয়োগ হয় না, কেবল বিশেষণবোধক

শব্দগুলিই বলা হয়, তাহাতে স্বত্ববাক্যের অনস্পর্গতা হয়। এ জন্ত মহর্ষি বিশেষ্যবোধক “জ্ঞান” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা ছাড়া উহার আর কিছু প্রয়োজন নাই। তাৎপর্যটীকাকার প্রভৃতির মতে স্বত্রে “ব্যবসায়িক” এবং “ব্যবসায়িক” এই দুইটি কথার দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ, ইহাই স্থচিত হইয়াছে। সুতরাং “ব্যবসায়িক” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ বলা হয় নাই। স্বত্ব-স্বত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িলে “জ্ঞান” শব্দের দ্বারা সে দোষ বারণ করা যাইতে পারে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র স্বত্রে “জ্ঞান” শব্দের তাহাই প্রয়োজন বলিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিত্য, সুতরাং উহা প্রমাণের ফল নহে। মহর্ষি প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্ত প্রত্যক্ষপ্রমিতির কথাই বলিবেন, তাই স্বত্রে তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোৎপন্ন না হওয়ার মহর্ষির এই স্বত্বের কোন দোষ হয় নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কোন পূর্বাচরণের ব্যাখ্যান্যারে এই স্বত্বের দ্বারা তাহাতে নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের লক্ষণই বুঝা যায়, সেই ভাবে শেষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি-স্বত্বের দ্বারা সহজে সে অর্থ কিছুতেই বুঝা যায় না। এইরূপ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনও নাই। মহর্ষি এমন কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষের কথা বলিবেন, গ্রাহ্য সাধন বা করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। ঈশ্বর-প্রত্যক্ষের যখন কিছু সাধন নাই, তাহা নিত্য, তখন মহর্ষি তাহার কথা বলিবেন কেন? তবে ঈশ্বরকে এবং তাহার জ্ঞানকে যে প্রমাণ বলা হয়, সেখানে “প্রমাণ” শব্দের অর্থ অন্তরূপ। যাহা অভ্যাস জ্ঞান, অথবা যিনি অভ্যাস পুরুষ, তাঁহাকে “প্রমাণ” বলা হয়। কিন্তু মহর্ষি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ধর্মার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধন। সুতরাং তাহার লক্ষণ বলিতে প্রমাণজন্ত প্রত্যক্ষের কথাই মহর্ষির বক্তব্য। তাই বলিয়াছেন—“ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোৎপন্ন”^১। সাংখ্যস্বত্রেও প্রত্যক্ষের লক্ষণে এইরূপে ঈশ্বরের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু প্রমাণজন্ত প্রত্যক্ষের কথাই স্বত্বকার বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষপ্রমাণের কথা বলিতে তাহাই বক্তব্য, এইরূপ কথা বলিলে সেখানে ঈশ্বর লইয়া মারামারি হয় না। তবে অজ্ঞ উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের অসিদ্ধি সমর্থনের জন্ত স্বত্বকার সেখানে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাই বুঝিতে হয় এবং বলিতে হয়।

প্রাচীন মতে “নির্জিকল্পক” এবং “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ এবং তাহার পরজাত “হানাদি-বুদ্ধি”রূপ প্রত্যক্ষ—এগুলি সমস্তই ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধার্থোৎপন্ন জ্ঞান; সুতরাং উহাদিগের করণগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। তবে ঐ সকল প্রত্যক্ষ সংশয়াক্ত হইলে তাহার করণ প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্ত বলা হইয়াছে—“ব্যবসায়িক” অর্থাৎ নিশ্চয়াক্ত হওয়া চাই। “ব্যবসায়” শব্দের দ্বারা নিশ্চয় অর্থ বুঝা যায়। আবার বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষের (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরীচিকার জলভ্রম প্রভৃতি) করণও প্রমাণ হইতে পারে না, এ জন্ত বলা হইয়াছে

১। উদ্যোতকর্তা ঈশ্বর ও তাহার নিত্য জ্ঞানের প্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেখানে মহর্ষি-স্বত্রে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোৎপন্নরূপ জ্ঞানকমাত্রবিষয়ত্বং”। সেখানে বর্ণনান বলা হইয়াছে,—“যৎ সত্ত্বং সত্ত্বং জ্ঞানকমাত্রাক্রিয়ত্বং তাহা।”—(আদ্যবুদ্ধিমাঞ্জলি, ৪ শ্লোক, ৫ কারিকা)।

“অব্যভিচারী।” অর্থাৎ প্রত্যক্ষটা যথার্থ হওয়া চাই। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সূত্রে “অব্যপদেশ” শব্দ কেন এবং উহার অর্থ কি, এ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে বহু মতভেদ ছিল। সে মতভেদগুলি এবং তাহার সমর্থন জয়ন্তভট্ট স্মারমঞ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, নির্দিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য, ইহা স্মৃচনা করিতেই মহর্ষি সূত্রে “অব্যপদেশ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। “অব্যপদেশ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে “নির্দিকল্পক।” তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যেরও সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাষ্যকারেরও উহাই তাৎপর্য। তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যাসূত্রেই সেখানে অম্ববাদে ভাষ্যার্থ বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যা এবং প্রত্যক্ষ-সূত্রের অত্যান্ত কথা পরবর্তী ভাষ্য-ব্যাখ্যাতেই দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়স্বার্থেন সমিকর্ষাদুৎপাদ্যতে যজ্ঞজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ন তর্হীদানীমিদং ভবতি, আত্মা মনসা সংযুক্ত্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি। নেদং কারণাবধারণমেতাবৎপ্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি। যৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিশিষ্টকারণং তদুচ্যতে, যন্তু সমানমনুমানাদিজ্ঞানস্য ন তন্নিবর্ত্যত ইতি। মনসন্তর্হীন্দ্রিয়েণ সংযোগো বক্তব্যঃ, ভিद्यমানস্য প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য নায়ং ভিদ্যত ইতি সমানত্বামোক্ত ইতি।

অনুবাদ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সমিকর্ষ (সংযোগাদি সম্বন্ধ) হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। (পূর্ববপক্ষ) — তাহা হইলে (কেবল বিষয়েই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধই প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে) এখন ইহা হইল না—(কি হইল না, তাহা বলিতে-ছেন) আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয় অর্থের (বিষয়ের) সহিত সংযুক্ত হয়। (তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সমিকর্ষেব ন্যায় আত্মমনঃসংযোগ এবং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগও কারণ; মহর্ষি পরে নিজেও তাহা বলিয়াছেন। এখন যাহা বলিলেন, তাহাতে ত সে কথা হইল না; কারণ, এখানে প্রত্যক্ষে কেবল ইন্দ্রিয়ার্থসমিকর্ষই কারণ বলিলেন)।

(উত্তর) — ইহা (“ইন্দ্রিয়ার্থসমিকর্ষোৎপন্ন” এই সূত্রবাক্য) এতাবমাত্র প্রত্যক্ষে কারণ, এইরূপে কারণাবধারণ নহে অর্থাৎ কারণান্তর বারণ নহে। কিন্তু বিশিষ্ট কারণ বচন। বিশদার্থ এই যে, যেটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশিষ্ট কারণ (অসাধারণ কারণ), তাহাই উক্ত হইয়াছে। যাহা কিন্তু অনুমানাদি জ্ঞানের সম্বন্ধে সমান

(সাধারণ কারণ), তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। (পূর্ববপক্ষ)—তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও (প্রত্যক্ষলক্ষণঘটকরূপে) বলিতে হয়? (অর্থাৎ অসাধারণ কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ বক্তব্য হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের দ্বারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ বলিয়া তাহাও প্রত্যক্ষলক্ষণে বলিতে হয়?)

(উত্তর)—ভিদ্ধ্যমান অর্থাৎ রূপজ্ঞান অথবা চাক্ষুষ জ্ঞান এইরূপ সংজ্ঞার দ্বারা জ্ঞানান্তর হইতে বিশিষ্ট্যমাণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (রূপ-প্রত্যক্ষের) সম্বন্ধে ইহা (ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ) (আত্মমনঃসংযোগরূপ সাধারণ কারণ হইতে) বিশিষ্ট হয় না; সুতরাং (আত্মমনঃসংযোগের) সমান বলিয়া (প্রত্যক্ষলক্ষণঘটকরূপে এই সূত্রে) উক্ত হয় নাই।

টিপ্পনী। আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতি সাধারণ কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিতে হইবে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধের আধার যে ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়, তাহার দ্বারা রূপাদি প্রত্যক্ষের (রূপজ্ঞান, চাক্ষুষ জ্ঞান ইত্যাদিরূপে) ব্যপদেশ (নামকরণ) হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের আধার মনের দ্বারা ঐ রূপাদি-প্রত্যক্ষের কোন ব্যপদেশ হয় না। সুতরাং ঐ অংশে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ (প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ হইলেও) আত্মমনঃসংযোগের সমান। তাই মহর্ষি প্রত্যক্ষলক্ষণে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করেন নাই, ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য।

ভাষ্য। বাবদর্শং বৈ নামধেয়শব্দাঃ, তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ, অর্থসম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ। তত্ত্বৈদমিন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাচ্চৎপন্নমর্থজ্ঞানং রূপমিতি বা রস ইত্যোবাং বা ভবতি। রূপরসশব্দাশ্চ বিষয়নামধেয়ম্। তেন ব্যপদিশ্যতে জ্ঞানং রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে। নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যমানং সংশব্দং প্রসজ্যতে অত আহ অব্যপদেশমিতি।

অনুবাদ। যতগুলি পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে। সেই সংজ্ঞাশব্দগুলির সহিত অর্থের (বিষয়ের) সম্প্রত্যয় (সমধিক প্রতীতি) হয়। অর্থসম্প্রত্যয়বশতঃ (বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানবশতঃই) ব্যবহার হয়। (প্রকৃতস্থলে ইহার সংগতি করিতেছেন) তাহা হইলে এই ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধ-হেতুক উৎপন্ন বিষয়জ্ঞান “রূপ” এই প্রকারে অথবা “রস” এই প্রকারে (রূপাদি বিষয়ের সহিত রূপাদি সংজ্ঞার অভিন্নরূপে) হয়। (তাহাতে কি হইল, তাহা বুঝাইতেছেন) রূপ, রস প্রভৃতি শব্দগুলি বিষয়ের সংজ্ঞা। (তাহাতেই বা কি হইল, তাহা বলিতে-

ছেন) সেই সংজ্ঞাবারা “রূপ” ইহা জানিতেছে, “রস” ইহা জানিতেছে। (এইরূপে) জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা ব্যপদিষ্টমান অর্থাৎ বিশিষ্ট্যমাণ হইয়া (এই জ্ঞান) শব্দ (শব্দবিষয়ক হওয়ার শব্দ জ্ঞাত) হইয়া পড়ে, এ জ্ঞাত মহাবি (সূত্রে) “ব্যাপদেশঃ” এই কথাটি বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। “নির্লিকল্পক” ও “সবিকল্পক” নামে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ মহাবির লক্ষণের দ্বারা সংগৃহীত হইলেও ঐ প্রকারভেদে বিপ্রতিপত্তি থাকায়, মহাবি “ব্যাপদেশঃ” ও “ব্যবসায়স্বকং”—এই দুইটি কথার দ্বারা স্পষ্টরূপে ঐ প্রকারভেদের কীর্তন করিয়াছেন। ঐ দুইটি কথা প্রত্যক্ষের লক্ষণের অন্তর্গত নহে। যে প্রত্যক্ষে বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব নাই, তাহাকে নির্লিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। মহাবি “ব্যাপদেশঃ” শব্দের দ্বারা এই নির্লিকল্পক প্রত্যক্ষের সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ নির্লিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য। ব্যপদেশ বলিতে বিশেষণ বা উপলক্ষণ, নাম ও জাতি প্রভৃতি। ঐ নাম, জাতি প্রভৃতি ব্যপদেশ-যুক্তকেই ব্যপদেশ বলা যায়। ফলতঃ ব্যপদেশ বলিতে বিশেষ্যই বুঝা যায়। যে জানে ব্যপদেশ অর্থাৎ বিশেষ্য নাই, তাহাই “ব্যাপদেশঃ” নির্লিকল্পক জানে নাম, জাতি প্রভৃতি কেহ বিশেষণ হয় না; সুতরাং সে জানে কোন বিশেষ্যও হয় না। কেবল পদার্থের স্বরূপমাত্রই তাহাতে বিষয় হয়। তাই “ব্যাপদেশঃ” শব্দের দ্বারা উক্ত নির্লিকল্পক জ্ঞান বুঝা যাইতে পারে। যাহারা এইরূপ প্রত্যক্ষ মানেন না, উহা অসম্ভব বলেন, তাহাদিগের মত নিরাকরণের জন্য ভাব্যকার প্রথমতঃ “বাবদর্থং বৈ নামধেরশব্দাঃ” ইত্যাদি ভাব্য-সন্দর্ভের দ্বারা তাহাদিগের স্বপক্ষ-সমর্থনের যুক্তি দেখাইতেছেন। সে যুক্তির মর্ম্ম এই যে, পদার্থমাত্রেরই নাম আছে, নামশূন্য কোন পদার্থ নাই; ঐ নাম ও পদার্থ বস্তুতঃ অভিন্ন। কারণ, “গো এই পদার্থ,” “অশ্ব এই পদার্থ” ইত্যাদিরূপে নাম ও পদার্থ অভিন্নরূপেই প্রতীত হয়। ভাব্যকার “বাবদর্থং বৈ নামধেরশব্দাঃ”—এই অংশের দ্বারা বিরুদ্ধবাদি-সম্মত নাম ও পদার্থের পূর্বোক্ত অভিন্নতাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে হেতু বলিয়াছেন—“তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ,” অর্থাৎ যেহেতু সংজ্ঞা শব্দের সহিত অভিন্নভাবেই (গো এই পদার্থ, অশ্ব এই পদার্থ ইত্যাদিরূপে) পদার্থের সম্প্রত্যয় হয়, অতএব নাম ও পদার্থ অভিন্ন। পরন্তু সংজ্ঞা শব্দের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশতঃ পদার্থ-প্রতীতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, সংজ্ঞাশব্দ ও তৎপ্রতিপাদ্য পদার্থ অভিন্ন। কারণ, জ্ঞাতব্যের উৎকর্ষই জ্ঞানের উৎকর্ষের মূল। সংজ্ঞা শব্দ জ্ঞাতব্য পদার্থ হইতে অভিন্ন না হইলে তাহার উৎকর্ষে জ্ঞানের উৎকর্ষ হইবে কেন? তাই বলিয়াছেন,—“সম্প্রত্যয়”। উহার অর্থ, সমবিক প্রত্যয়। “সং” শব্দের দ্বারা প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) উৎকর্ষ সূচনাপূর্বক বিরুদ্ধবাদিগণের পূর্বোক্ত যুক্তান্তরই সূচনা করিয়াছেন। অভিন্নরূপে প্রতীতি হইলেই বা বস্তুতঃ অভিন্ন হইবে কেন?—অনেক স্থলে ভিন্ন পদার্থেও ঐরূপ ভ্রম প্রতীতি হইয়া থাকে। তাই বলিয়াছেন, “অর্থসম্প্রত্যয়চ্চ ব্যবহারঃ”—অর্থাৎ সংজ্ঞা ও পদার্থের ঐরূপ অভিন্নভাবে প্রতীতিবশতঃ বস্তুন ব্যবহার চলিতেছে, তখন ঐ প্রতীতিকে ভ্রম বলা যায় না, উহা যথার্থ। সুতরাং উহা দ্বারা

সংজ্ঞা ও পদার্থ যে অভিন্ন, তাহা যথার্থরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। পদার্থ ও তাহার নাম অভিন্ন হইলে পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান-মাত্রই নামবিষয়ক হইল। সুতরাং জ্ঞানমাত্রই নামের দ্বারা ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ বিশিষ্ট। প্রত্যক্ষ জ্ঞানও পূর্বোক্ত যুক্তিতে নাম-বিষয়ক হওয়ায় নামবিশিষ্ট। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামাত্মক শব্দ-বিষয়ক হওয়ায় শব্দজ্ঞ হইয়া পড়িল। কারণ, প্রত্যক্ষে তাহার বিষয়গুলি কারণ। নাম প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে প্রত্যক্ষমাত্রই নামজ্ঞ হইবে। নাম-বিষয়ক হইলে আবার নাম-বিশিষ্ট হইবেই; সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অর্থাৎ নাম-রহিত অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ (যাহাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে) একটা হইতেই পারে না, উহা অসিদ্ধান্ত। ভাষ্যে “যাবদর্থং বৈ” এখানে “বৈ” শব্দটি অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত। ‘যাবদর্থং বৈ’—ইহার ব্যাখ্যা যাবদর্থমেব।

ভাষ্য। যদিমনুপযুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধেহর্থজ্ঞানং তন্ন নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যতে। গৃহীতেহপি চ শব্দার্থসম্বন্ধেহস্থার্থস্থায়ং শব্দো নামধেয়-মিতি। যদা তু সৌহর্ধো গৃহ্যতে তদা তৎপূর্বস্মাদর্থজ্ঞানান্ন বিশিষ্যতে, তদর্থবিজ্ঞানং তাদৃগেব ভবতি। তস্মা স্বর্থজ্ঞানস্থান্যঃ সমাখ্যাশব্দো নাস্তি যেন প্রতীয়মানং ব্যবহারায় কল্পেত। ন চাপ্রতীয়মানেন ব্যবহারঃ, তস্মাজ্জ্ঞেয়স্থার্থস্থ সংজ্ঞাশব্দেনৈতিকরণযুক্তেন নির্দিশ্যতে রূপমিতি-জ্ঞানং রস ইতি জ্ঞানমিতি। তদেবমর্থজ্ঞানকালে স ন সমাখ্যাশব্দো ব্যাপ্রিয়তে ব্যবহারকালে তু ব্যাপ্রিয়তে। তস্মাদশব্দমর্থজ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থ-সম্মিকর্ষণোপন্নমিতি।

অনুবাদ। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুপযুক্ত অর্থাৎ অগৃহীত হইলে (যখন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান নাই, সেই অবস্থাতে) এই যে অর্থজ্ঞান (বালক ও মূক প্রভৃতির রূপাদিপ্রত্যক্ষ), তাহা সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা বিশিষ্ট হয় না। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গৃহীত হইলেও (যখন শব্দার্থ-সম্বন্ধ-জ্ঞান আছে, সেই অবস্থাতেও) এই পদার্থের এই শব্দটি নাম, ইহাই জ্ঞান হয়। কিন্তু যে সময়ে সেই পদার্থ গৃহীত হয় (নামস্মরণের পূর্বেই নির্বিকল্পকের দ্বারা নাম-রহিত সেই পদার্থ জ্ঞাত হয়), তখন সেই জ্ঞান পূর্বতন অর্থজ্ঞান হইতে (অব্যুৎপন্নাবস্থার অর্থজ্ঞান হইতে) বিশিষ্ট হয় না। সুতরাং সেই অর্থজ্ঞান সেইরূপই (পূর্বতন অর্থজ্ঞান সদৃশই) হয়। সেই অর্থজ্ঞানের সম্বন্ধে কিন্তু অণ্ড (অর্থ ভিন্ন) সংজ্ঞা শব্দ নাই, যাহার দ্বারা প্রতীয়মান অর্থাৎ পরকর্তৃক জ্ঞায়মান হইয়া (অর্থজ্ঞান) ব্যবহারের নিমিত্ত সমর্থ হইবে। অপ্রতীয়মান পদার্থের দ্বারাও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞেয় পদার্থের

ইতিকরণযুক্ত অর্থাৎ ইতিশব্দযুক্ত (রূপমিতি রস ইতি) সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা “রূপ” এই জ্ঞান, “রস” এই জ্ঞান এই ভাবে (অর্থজ্ঞানকে) নির্দেশ করা হয় । সুতরাং এইরূপ অর্থজ্ঞানকালে সেই সংজ্ঞাশব্দ (প্রতীয়মান হইয়া) ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না । কিন্তু ব্যবহারকালে অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার সময়ে (কারণ হইয়া) ব্যাপারবিশিষ্ট হয় । অতএব ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধবোধোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শব্দ নহে—অর্থাৎ শব্দবিষয়ক না হওয়ায় শব্দজ্ঞান নহে ।

টিপ্পনী । মহর্ষি “অব্যাপদেশঃ” এই কথাটির দ্বারা নির্ণিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব সূচনা করিয়াছেন । বাঁহারা তাহা মানেন না, তাঁহাদিগের যুক্তি ইতঃপূর্বেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন । এখন ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ত তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন । ভাষ্যকারের কথা এই যে, শব্দার্থ সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকিলেও বালকের রূপ প্রত্যক্ষ হয় । আবার শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তিহীন মুক প্রভৃতি ব্যক্তিরও কত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং শব্দরহিত প্রত্যক্ষ নাই, এ কথা বলা যায় না । আবার কেবল যে বালক মুক প্রভৃতিরই শব্দরহিত প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে । বাঁহারা ব্যুৎপন্ন অর্থাৎ অমুক শব্দ অমুক অর্থের বোধক, ইহা জানেন এবং শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহারাও সেই শব্দ ও অর্থকে অভিন্ন বলিয়া বুঝেন না । তাঁহাদিগেরও এই শব্দটি এই পদার্থের নাম, এইরূপই জ্ঞান হয় । সুতরাং তাঁহাদিগেরও নামরহিত প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । প্রথমতঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার পরে ঐ পদার্থ দর্শনজন্ত ঐ পদার্থের সংজ্ঞা স্মরণ হয়, সুতরাং বালক মুকাদিভিন্ন ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগেরও ঐ সংজ্ঞা স্মরণের জন্ত পূর্বে নামরহিত বিষয়-জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য । সেই নামরহিত বিষয়জ্ঞান নির্ণিকল্পক প্রত্যক্ষ । বালক মুকাদির বিষয়জ্ঞান হইতে সে জ্ঞানের কোন বিশেষ নাই । ফলতঃ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের সেই নির্ণিকল্পক প্রত্যক্ষও সেইরূপই হয়, অর্থাৎ তাহাও তখন কোন নামের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না । তাহাতে শব্দ-সম্বন্ধ নাই । বালক মুকাদির জ্ঞানের জ্ঞায় সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রথমজাত প্রত্যক্ষকে “নির্ণিকল্পক” প্রত্যক্ষ বলিতেই হইবে । তাহাই পরে “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশেষণবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে ।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন পরকে বুঝাইবার জন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে গেলে পদার্থের নামের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিতে হয়, তখন বুঝা বাইতেছে যে, জ্ঞান পদার্থাকার এবং সংজ্ঞাকার । পদার্থ এবং তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন না হইলে ঐ ভাবে জ্ঞান পদার্থাকার হইবে কেন ? সুতরাং পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । এই আশঙ্কানিরাসের জন্ত বলিয়াছেন,—“তস্ত তু” ইত্যাদি । সে কথার তাৎপৰ্য্য এই যে, অস্ত প্রকারে পদার্থজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়াই অর্থাকারে তাহার পরিচয় দিতে হয় ; সেই পদার্থজ্ঞানে পদার্থের সংজ্ঞাশব্দ বিষয় হয় না । পদার্থজ্ঞানকালে সংজ্ঞাশব্দের কোন ব্যাপার নাই । পরকে বুঝাইবার সময়

সংজ্ঞাশব্দ আবশ্যক। সে সময়ে তাহার ব্যাপার আছে—কিন্তু তাহাতে পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন, ইহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না। *

ভাষ্য। গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেনোন্নয়না সংস্কৃতাঃ স্পন্দমানা দূরস্থস্ত চক্ষুশা সন্মিকৃষ্যন্তে তত্রেন্দ্রিয়ার্থসন্মিকর্ষাদুদকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ অব্যভিচারীতি। যদতস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি। যন্তু তস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি। দূরাস্তক্ষুশা হয়মর্থং পশ্চান্নাবধারণয়তি ধূম ইতি বা রেণুরিতি বা, তদেতদি-
ন্দ্রিয়ার্থ-সন্মিকর্ষোৎপন্নমনবধারণজ্ঞানং প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ
“ব্যবসায়াত্মক”মিতি।

অনুবাদ। গ্রীষ্মকালে পার্থিব উন্নতির সহিত সংস্কৃত স্পন্দমান (ক্রিয়াবিশিষ্ট) সৌর-কিরণসমূহ দূরস্থ ব্যক্তির চক্ষুর সহিত সন্মিকৃষ্ট (সংযুক্ত) হয়। সেই সূর্য-কিরণে ইন্দ্রিয়ার্থসন্মিকর্ষজ্ঞ “উদক” এই জ্ঞান জন্মে। তাহাও (সেই বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমজ্ঞানও) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এ জ্ঞান মহর্ষি (সূত্রে) “অব্যভিচারি” এই কথাটি বলিয়াছেন। তন্নিম্ন পদার্থে অর্থাৎ যাহা তাহা নহে, এমন পদার্থে যে “তাহা” এরূপ প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারী। যাহা কিন্তু সেই পদার্থে “সেই” এইরূপ প্রত্যক্ষ, তাহা অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। এই ব্যক্তি (দ্রষ্টা ব্যক্তি) দূর হইতে (দূরস্থ-দোষবশতঃ) চক্ষুর দ্বারাই পদার্থ দর্শন করতঃ “ধূম এই” বা “রেণু এই” বা (এইরূপে) অবধারণ করিতেছে না, অর্থাৎ অনবধারণ (সংশয়) করিতেছে, সেই এই ইন্দ্রিয়ার্থসন্মিকর্ষোৎপন্ন অনবধারণ জ্ঞান (সংশয়) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এই জ্ঞান মহর্ষি (সূত্রে) “ব্যবসায়াত্মকং” এই কথাটি বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। ভ্রমপ্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই সূত্রে বার্থ্য প্রত্যক্ষই লক্ষ্য। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের অন্তর্গত সূত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ বার্থ্য প্রত্যক্ষের করণই প্রত্যক্ষ

* প্রত্যক্ষমাত্রই সর্বকল্পক। কারণ, জ্ঞানমাত্রই জ্ঞেয় বিবহের সংজ্ঞাবিশিষ্ট পূর্বার্ধবিবরক হইয়া থাকে, হতরং অবিশিষ্ট নির্জিকল্পক প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না, এই মতটি সত্যি প্রাচীন শাস্ত্রিক মত। শাস্ত্রিকশিষ্যোনি ভর্জুহরি এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার এই মতের সমর্থন ও বক্তাদের দ্বারাই এখানে ভাষ্য-তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। এখানে তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যাসমারেই ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যাত হইল। শব্দ ও তাহার অর্থ অভিন্ন, ইহা শাস্ত্রিক মত বলিয়া কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া গেলেও মহাত্মা যে কিন্ত এই মত পাওয়া যায় না। তাৎপর্যটীকাকার নির্জিকল্পক প্রত্যক্ষ নাই, এই মতের উল্লেখ করিয়া এখানে ভর্জুহরির কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—“ন সোহন্তি প্রত্যক্ষো লোকে যঃ শব্দাহ্বয়নাদুতে। অহুবিদ্ধবিধ জ্ঞানং সর্গং শব্দেন গম্যতে।”—
বাক্যপটীয়।

প্রমাণ। স্বত্রে “যতঃ” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া, বাহার দ্বারা এই প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই শেষে স্বত্বার্থ বুঝিত হইবে। এখন যদি ভ্রমও মহাবির প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ভ্রমের করণও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়া পড়িবে। তাই মহাবির ‘অব্যভিচারি’ শব্দের দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়াছেন। “অব্যভিচারী” বলিতে যথার্থ। মরীচিকাতে জলভ্রম হয়, কিন্তু ঐ ভ্রমের বিষয় জল সেখানে নাই; স্মৃতরাং ভ্রম, বিষয়ের ব্যভিচারী। যথার্থ জ্ঞান তাহার বিষয়ের অব্যভিচারী। মরীচিকাতে জলভ্রমহলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ান্নিকর্ষবশতঃ যে নির্বিকল্পক জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম নহে। পরে চক্ষুর দোষে অথবা দূরত্বান্নিদোষে তাহাতে যে “ইহা জল” এইরূপ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই ভ্রম। সেই ভ্রমের করণ প্রমাণ নহে, উহা প্রমাণাত্যাস। সেখানেও জগৎপরিপ্রকৃত হইয়াছে; কিন্তু সে প্রকৃতি সফল হয় না। যদিও প্রমাণের সামান্য লক্ষণের দ্বারাই ভ্রম-প্রত্যক্ষের করণের প্রামাণ্য নিরস্ত হয়;—কারণ, বিশেষ লক্ষণও সামান্য লক্ষণাক্রান্ত হওয়া চাই,—ভ্রমের করণের প্রমাণত্বই নাই। স্মৃতরাং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও সম্ভবই নহে। বিশেষ লক্ষণও ঐরূপ বিশেষণ বক্তব্য হইলে অহুমানাদি প্রমাণের লক্ষণস্বত্রেও “অব্যভিচারি”-শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়,—তথাপি সকল জ্ঞানই সাক্ষাৎ বা পরস্পরায় প্রত্যক্ষমূলক, প্রত্যক্ষের অব্যভিচার বশতঃই অহুমানাদির অব্যভিচার। প্রত্যক্ষ ব্যভিচারী হইলে তত্ত্বলক অহুমানাদি অব্যভিচারী হইতে পারে না। এই বিশেষবোধের জন্তই মহাবির প্রত্যক্ষস্বত্রে অতিরিক্ত “অব্যভিচারি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার স্বত্বত্ব “অব্যভিচারি” শব্দের যেকোন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিপর্যয় জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষতা নিবারণিত হইয়াছে,—সংশয়-জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা নিবারণিত হয় নাই; কারণ, সংশয়-জ্ঞান তাহা তাহা নহে, এমন পদার্থে “সেই” এইরূপ “ব্যভিচারি” জ্ঞান নহে। সংশয়-জ্ঞান ব্যভিচারী না হইলে তাহাও স্বত্বোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাহা হইলে সংশয়-জ্ঞানের করণও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সংশয়জ্ঞানের করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কারণ, প্রমাণের ফল নিশ্চয়ই হইবে। প্রমাণ কখনও সংশয় জন্মাইবে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণের জন্তই মহাবির-স্বত্রে “ব্যবসায়স্বকং” বলিয়াছেন। “ব্যবসায়” শব্দের অর্থ নিশ্চয়। “ব্যবসায়স্বকং” বলিতে নিশ্চয়স্বক। সংশয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সম্মিকর্ষোৎপন্ন এবং অব্যভিচারী হইলেও নিশ্চয়স্বক নহে। তাই উহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইল না।

তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রত্যক্ষস্বত্রে “অব্যপদেশম্” এবং “ব্যবসায়স্বকম্”—এই দুইটি কথা প্রত্যক্ষলক্ষণের জন্ত নহে। তিনি বলেন,—“অব্যপদেশঃ” এই কথার দ্বারা মহাবির, নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, উহা মানিতেই হইবে, এই তত্ত্বটি স্মৃতি করিয়াছেন। এবং “ব্যবসায়স্বকম্” এই কথাটির দ্বারা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য-স্বীকার্য্য, এই তত্ত্বটি স্মৃতি করিয়াছেন। স্বত্বত্ব “অব্যভিচারী” শব্দের অর্থ ভ্রমভিন্ন। সংশয়জ্ঞান ভ্রম। স্মৃতরাং “অব্যভিচারি”

শব্দৰ দ্বাৰাই সংশয়জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা নিরস্ত হইয়াছে। উহার জন্ত “ব্যবসায়িক” শব্দৰ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। “নিশ্চয়,” “বিকল্প,” “ব্যবসায়”—এই তিনিটি একার্থবোধক শব্দ। সুতরাং “ব্যবসায়িক” শব্দৰ দ্বাৰা বিকল্প বা সবিকল্পক জ্ঞান অবশ্য বুঝা যাইতে পারে। “অব্যপদেশ্য” শব্দৰ দ্বাৰা বেক্ৰপে নিৰ্বিকল্পক জ্ঞান বুঝা যায়, তাহা পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে।

ফলতঃ বৌদ্ধযুগে এই নিৰ্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ লইয়া বড় বিবাদ ছিল। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য ধৰ্ম্মকৌতুহি, দিগ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের বিৰুদ্ধে দাঁড়াইয়া এখানে সৰ্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র বলিতে চাহেন যে, বহু পূৰ্বেই আমাদিগের মহৰ্ষি গোতম এই বিবাদের চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয়মধ্যে “ব্যবসায়িক” বলিয়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। মিশ্র মহোদয় মহৰ্ষি-হৃদয়ে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বক্তৃতঃ দেখা যায়, আমাদিগের দৰ্শন-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার আচাৰ্য্যগণ দার্শনিক ঋষি-হৃদয়ের দ্বাৰাই পরবৰ্ত্তী বৌদ্ধ প্রভৃতি মত-বিশেষের নিরাকরণে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শাৰীৰক-ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচাৰ্য্যের বৌদ্ধমত-খণ্ডন-প্রণালী দেখিলে ইহা আরও হৃদয়ঙ্গম হইবে। মিশ্র মহোদয় পূৰ্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা করিয়া শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, হৃদয়ে “ব্যবসায়িক” শব্দৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা বাহা করিলাম, ইহা অতি স্পষ্ট, শিষ্যগণ নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবে। এ জন্তই ভাষ্যকার ও বার্তিককার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণই হৃদয়ে “ব্যবসায়িক” শব্দ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। উহা হৃদয়কারের উদ্দেশ্য না হইলেও অসংগত বা অসম্ভব নহে। “ব্যবসায়িক” শব্দৰ দ্বাৰা সংশয়ের প্রত্যক্ষতা নিবারিত হইতে পারে; তাই ভাষ্যকার ও বার্তিককার এইরূপ বলিয়াছেন। প্রাচীনগণ ইহারই নাম বলিয়াছেন—“অবাচয়”। যেটি প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, তাহার সংগ্রহের নাম অবাচয়। মিশ্র মহোদয় এই ভাবে ভাষ্যকার ও বার্তিককারের কথঞ্চিৎ সম্মান রক্ষা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, “অব্ৰাভিঃ—

জিলোচনগুরুদ্রীতমার্গাহুগমনোদ্বৈধঃ।

যথামানং যথাবস্তব্যখ্যাতমিদনীদৃশম্॥”

অর্থাৎ তিনি জিলোচন গুরুর উপদেশানুসারেই এখানে যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জিলোচন গুরুর উপদেশ পাইয়াই বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের বার্তিকের উদ্ধার করেন, এ কথা তৎপৰ্য্য-পরিগুহিত প্রথমে উদয়নের কথাতোও পাওয়া যায়। “জিলোচন” বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ছিলেন, ইহা সেখানে প্রকাশ টীকাকার বৰ্দ্ধমানও লিখিয়াছেন।

ভাষ্য। ন চৈতন্যাস্তব্যং আত্মমনঃ সন্নিবৰ্জ্জমেবানবধারণজ্ঞানমিতি। চক্ষুৰ্ভা হ্রয়মর্থং পশ্চাদ্ভাবধারণতি, যথা চেন্দ্রিয়ৈণোপলব্ধমর্থং মনসোপলভতে, এবমিন্দ্রিয়ৈণানবধারণন্ মনসা নাবধারণতি। যচ্চ তদিন্দ্রিয়ানবধারণপূৰ্ব্বকং মনসানবধারণং তদ্বিশেষোপেক্ষং বিমৰ্শমাত্রং সংশয়ো ন

পূর্বমিতি । সর্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিন্দ্রিয়ের ব্যবসায়ঃ, উপহতেন্দ্রি-
য়াণামনুব্যবসায়ানাভাবাদিতি ।

অনুবাদ । অনবধারণ-জ্ঞান অর্থাৎ সংশয় আত্মমনঃ-সম্বন্ধে জন্মই অর্থাৎ
ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে জন্ম নহে, ইহা মনে করিও না ; যেহেতু এই ব্যক্তি (দ্রষ্টা ব্যক্তি)
চক্ষুর দ্বারা পদার্থ-বিশেষকে (সমান-ধর্ম্মা ধর্ম্মকে) দর্শন করতঃ অনবধারণ করে
অর্থাৎ সেই পদার্থে বিশেষরূপে সংশয় করে । এবং যেরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ
(ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধে) পদার্থকে মনের দ্বারা অর্থাৎ নেত্র-সহায় মনের দ্বারা
উপলব্ধি করে, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ
(সংশয়) করে । সেই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণপূর্বক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ-
পূর্বক মনের দ্বারা অনবধারণ, সেই বিশেষাপেক্ষ (যাহাতে বিশেষ-জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা
থাকে) বিমর্শ-ই অর্থাৎ একধর্ম্মাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞানই সংশয় অর্থাৎ
প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় সংশয় । পূর্বটি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার
নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃ-সংযোগ জন্ম যে মানস-সংশয় দৃষ্টান্তরূপে আপত্তি-
কারীর মনে আছে, সেই সংশয় নহে, (প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয়
সংশয় নহে) । সমস্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাতার (আত্মার) ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ব্যবসায়
(বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান) হয় ; কারণ, বিন্দেইন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের অনুব্যবসায় অর্থাৎ
ইন্দ্রিয়জন্ম জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয় না ।

টিপ্পনী । আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয়জ্ঞান মানস, উহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে জন্মই নহে ;
সুতরাং সংশয় মহর্ষির প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হইতেই পারে না । সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণের জন্ম
হুজ্জে “ব্যবসায়ান্নক” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার কি করিয়া বলেন ? তাই ভাষ্যকার
বলিয়াছেন—“ন চৈতন্যন্তব্যম্” ইত্যাদি । ভাষ্যকারের কথা এই যে, সংশয় মাত্রই মন কারণ
হইলেও সংশয়মাত্রই মানস নহে । ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল মনোজন্ম হইলেই সেই জ্ঞানকে মানস
বলে । যেখানে চক্ষুর দ্বারা পদার্থ দর্শন করতঃ সংশয় করে, তাহাকে চাক্ষুষ সংশয় বলিবে
হইবে । তাহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও সেই সংশয়-বিষয়ের সম্বন্ধেও কারণ, সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ-
জন্ম সংশয় জ্ঞান হুজ্জোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষতা বারণ
করিতে হইবে । ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃ-সংযোগ জন্ম যে মানস সংশয় হয়,
তাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া সংশয় মাত্রই মানস, ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় না । কারণ, যে সংশয়ে
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কারণ, তাহা কোন মতেই মানস হইতে পারে না ; তাহাকে ইন্দ্রিয়ার্থ-
সম্বন্ধে জন্ম বলিতেই হইবে । সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধে জন্ম চাক্ষুষ সংশয়কে মনে করিয়াই
অর্থাৎ তাহার হুজ্জোক্ত প্রত্যক্ষতা নিবারণের অভিপ্রায়েই হুজ্জে “ব্যবসায়ান্নক” শব্দের প্রয়োগ করা

হইয়াছে অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধবর্ণনায় সংশয়ই এখানে বুদ্ধিহ; পূর্বটি অর্থাৎ আপত্তিকারী বাহ্যকে দৃষ্টান্ত করিয়া সংশয় মাত্রই মানস বলিতে চাহেন, সেই মানস-সংশয় এখানে বুদ্ধিহ নহে। দৃষ্টান্ততাবশতঃ ঐ সংশয়কে ভাব্যকার “পূর্ব” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তটি পূর্বসিদ্ধ বলিয়া তাহাকে “পূর্ব” বলা যায়।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয়-মাত্রই মানস। মনই বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া বাহ্য পদার্থে প্রযুক্ত হয়। অত্থা ‘আমি ঘট জানিতেছি’ ইত্যাদি রূপে যে জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে ঘটাদি বাহ্য পদার্থ বিষয় হইতে পারে না; সূত্রাতঃ বলিতে হইবে, বাহ্য পদার্থেও মনের প্রযুক্তি হয়। তাহা হইলে সর্বত্র সংশয়কে মানসই বলা যায়। এই জন্ত বলিয়াছেন— সর্বত্র ইত্যাদি। ভাব্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়ের প্রত্যক্ষ হলে সর্বত্রই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান হয়। পরে তাহার অনুব্যবসায় অর্থাৎ ‘আমি চক্ষু দ্বারা ঘট জানিতেছি’ ইত্যাদিরূপে ঐ জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয়। বিনষ্টেক্সিয় অন্ধ, বধির প্রভৃতির মন থাকিলেও ঐরূপ অনুব্যবসায় হয় না; কারণ, তাহাদিগের সেই সেই ইন্দ্রিয় না থাকার তত্ত্বদিস্ত্রিয়-জন্ত ব্যবসায়ই হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ অনুব্যবসায়ের মূলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে অনুব্যবসায়ের দৃষ্টান্তে সংশয়ে বহিরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনই করণ, ইহা বলা যাইবে না। মূল কথা, প্রত্যক্ষের মানস-প্রত্যক্ষে বাহ্য পদার্থ বিষয় হয় বলিয়া সেই দৃষ্টান্তে বাহ্য পদার্থের বহিরিন্দ্রিয়জন্ত সংশয়কেও মানস বলা যায় না। কারণ, সেখানে বহিরিন্দ্রিয়-জন্ত ব্যবসায়ের বিষয় বাহ্য পদার্থই অনুব্যবসায় বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ বাহ্য পদার্থের চাক্ষুসাদি সংশয়ও কেবল মনোজন্ত নহে। উহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধবর্ণনায়; সূত্রাতঃ উহাকে মানস বলা যায় না।

ভাব্য। আত্মাদিষু সূখাদিষু চ প্রত্যক্ষলক্ষণং বস্তব্যমনিন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধবর্ণনং হি তদिति। ইন্দ্রিয়স্ত বৈ সতো মনস ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথগুপ-দেশো ধর্ম্মভেদাৎ। ভৌতিকানোন্দ্রিয়াণি নিয়তবিষয়াণি, সগুণানাকৈ-ষামিন্দ্রিয়ভাব ইতি। মনস্ত্ভৌতিকং সর্ববিষয়কং, নাস্ত্য সগুণশ্চেন্দ্রিয়ভাব ইতি। সতি চেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধে সম্বন্ধিমসম্বন্ধিঞ্চাস্ত্র যুগপজ্জ্ঞানাহনুৎ-পত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি। মনসশ্চেন্দ্রিয়ভাবাম বাচ্যং লক্ষণান্তরমिति। তদ্রাস্তরসমাচারাচ্ছিতং প্রত্যেতব্যমिति। পরমতমপ্রতিষিদ্ধগনুमतমिति হি তদ্ব্যবৃক্তিঃ। ব্যাখ্যাতে প্রত্যক্ষম্ ॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) আত্মা প্রভৃতি এবং সূখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষের লক্ষণ (প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর) বলিতে হয়? কারণ, তাহা (আত্মাদি এবং সূখাদির প্রত্যক্ষ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধবর্ণনায় নহে। (উত্তর) ইন্দ্রিয়রূপেই বিদ্যমান

মনের ধর্মভেদবশতঃ (প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বৈধর্ম্যাবশতঃ) ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে পৃথক উপদেশ হইয়াছে। (যে ধর্মভেদবশতঃ মনের পৃথক উপদেশ হইয়াছে, সেই ধর্মভেদগুলি ক্রমশঃ দেখাইতেছেন)। ইন্দ্রিয়গুলি (ইন্দ্রিয়সূত্রে পঠিত প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়) ভৌতিক, (ভূত-জন্তু বা ভূতাত্মক) নিয়ত বিষয়, (যাহাদিগের বিষয়ের নিয়ম আছে) এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াই ইহাদিগের (প্রাণাদির) ইন্দ্রিয়ত্ব। মন কিন্তু অভৌতিক এবং সর্ববিষয়, গুণবিশিষ্ট হইয়া ইহার ইন্দ্রিয়ত্ব নাই এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ থাকিলে ইহার (মনের) সম্বন্ধি ও অসম্বন্ধি অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধই যুগপৎজ্ঞানানুৎপত্তির অর্থাৎ এক সময়ে বিজ্ঞাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষ না হওয়ার কারণ (প্রয়োজক) বলিব। ফলকথা, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আছে বলিয়াই (আত্মাদি ও স্বখাদি প্রত্যক্ষের) লক্ষণান্তর বলিতে হইবে না। তত্ত্বান্তর অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরের সমাচার (সংবাদ) বশতঃও ইহা (গোতম-সম্মত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব) বুঝা যায়। কারণ, অপ্রতিষিদ্ধ (অখণ্ডিত) পরের মত অনুমত অর্থাৎ নিজ সম্মত,—ইহাকে “তত্ত্বযুক্তি” বলে। প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যাত হইল।

টিপ্পনী। পূর্বপক্ষের তাৎপর্য এই যে, মহর্ষি ইন্দ্রিয়সূত্রে মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাহার মতে মন ইন্দ্রিয় নহে। আত্মাদি এবং স্বখাদিরও প্রত্যক্ষ হয়, উহা মানন-প্রত্যক্ষ। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব না থাকায় ঐ প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধবশত্ব বলা যায় না। সুতরাং মহর্ষির এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঐ মানন-প্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত হইল। উহাকে এই লক্ষণের লক্ষ্য না বলিলে উহার জন্ত আবার পৃথক প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিতে হয়। উক্তরের তাৎপর্য এই যে, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষির সম্মত। মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মাদি বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃই আত্মাদির মানন-প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং মহর্ষির এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণই তাহাতে অব্যাহত আছে, তাহার জন্ত আর পৃথক কোন লক্ষণ বলিবার প্রয়োজন নাই। মন ইন্দ্রিয় হইলেও প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহার উল্লেখ না করিয়া যে পৃথক উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ ধর্মভেদ। অর্থাৎ মন প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বৈধর্ম্য বা বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট বলিয়াই প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে মন ইন্দ্রিয় নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। প্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভৌতিক, মন অভৌতিক। মন ক্ষিত্যাদি কোন ভূতজন্তু নহে, ভূতাত্মকও নহে এবং প্রাণেন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক, রূপাদির গ্রাহক নহে; চকুরিন্দ্রিয় রূপের গ্রাহক, গন্ধাদির গ্রাহক নহে, ইত্যাদিরূপে প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিয়ত। মনের বিষয় নিয়ম নাই, সর্ববিষয়ক জ্ঞানেই মন আবশ্যক; সুতরাং সকল পদার্থই মনের বিষয় এবং প্রাণাদি গন্ধাদিগুণবিশিষ্ট হইয়াই ইন্দ্রিয়, মন তদ্রূপ ইন্দ্রিয় নহে। অর্থাৎ প্রাণাদি ইন্দ্রিয় যেমন স্ব স্ব গুণ গন্ধাদির দ্বারা

বাহ্য গন্ধাদির গ্রহণ করায়, তাহারা যে যে গুণের গ্রাহক, সেই সেই গুণ তাহাদিগেরও আছে, মন তজ্জপ নহে। মনে গন্ধ প্রভৃতি কোন বিশেষ গুণ নাই। শ্রীমদর্শনিকার উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, ভাব্যোক্ত বৈধর্ম্যগুলির মধ্যে সর্ববিষয়ত্ব ও অসর্ববিষয়ত্বই মনের পৃথক উপদেশের প্রকৃত হেতু। অস্ত্রগুলি সংগত হয় না। “মনঃ সর্ববিষয়ঃ স্মৃতিকারণসংযোগা-
ধারিত্বং আত্মবৎ স্মৃৎগ্রাহকসংযোগাবিকরণত্বাৎ সমন্তেন্নিগ্ৰাহিতাত্বাচ্চ”, এই প্রকারে বার্তিক-
কার মনের সর্ববিষয়ত্ব সাধন করিয়াছেন। ভাব্যোক্ত অস্ত্র বৈধর্ম্যগুলি তিনি খণ্ডন
করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে,—মনের পৃথক উপদেশই বা কোথায়? মহর্ষি-সূত্রে
তাহাও ত দেখি না? এতদ্বত্তরে বলিয়াছেন—“সতি চ ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকর্মে” ইত্যাদি। অর্থাৎ
“মুগপজ্জ্ঞানাত্মত্বপতির্মনসো নিদম্” (১।১।১৬) এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি মনের উপদেশ
করিয়াছেন। এক সময়ে চাক্ষুষ প্রভৃতি বিজাতীয় একাবিক প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা অনেকের
অহুভব-সিদ্ধ। এই অহুভব মানিয়া মহাশয় বলিয়াছেন, মন অতি সূক্ষ্ম। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার
সহিত মনের সংযোগ কারণ। এক সময়ে একাবিক ইন্দ্রিয়ে অতি সূক্ষ্ম মনের সংযোগ
অসম্ভব, তাই এক সময়ে বিজাতীয় একাবিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়ার সহিত
মন সংযুক্ত হয়, সেই ইন্দ্রির-জ্ঞাত প্রত্যক্ষই হয়। যে ইন্দ্রিয়ার সহিত তখন মনের সংযোগ
থাকে না, সেই ইন্দ্রির-জ্ঞাত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন যে, এক ইন্দ্রিয়ে
মনের সন্নিধি এবং অস্ত্র ইন্দ্রিয়ে অসন্নিধিই ঐ স্থলে ঐরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়ার মূল, তাই ঐ
উভয়কেই উহাতে প্রবোজক বলিব। ভাব্যোক্ত “কারণ” শব্দের অর্থ এখানে প্রবোজক।
যথাগত একথা বিশদরূপে ভাব্যকার বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি গোতম
মনের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ত মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কোথায়ও বলেন নাই, তবে
আর কি করিয়া তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয়, ইহা ধরিয়া লইব? এতদ্বত্তরে শেষে ভাব্যকার
বলিয়াছেন যে, “তত্ত্বান্তর-সমাচার” অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরসংবাদ হইতেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বুঝা যায়।
মহর্ষি সেই পরমত খণ্ডন করেন নাই, সুতরাং উহা তাঁহার অনুমত, ইহা বুঝা যায়। পরের
মত খণ্ডন না করিলে অনুমত হয়, ইহাকে “তত্ত্বযুক্তি” বলে।^১ এই তত্ত্বযুক্তির দ্বারাও মনের
ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষি গোতমের সম্মত, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যটীকাকার এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
এবং ভাব্যোক্ত “তত্ত্ব” শব্দের অর্থ (“তত্ত্বাভে ব্যুৎপাদ্যভেদেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে)
বলিয়াছেন শাস্ত্র। কিন্তু কোন্ শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত হইয়াছে, ইত্যাদি কথা কিছুই বলেন
নাই। গোতম মুনি খণ্ডন করিলে তাঁহার পূর্ববর্তী শাস্ত্রমতই খণ্ডন করিতেন, সুতরাং ভাব্য-
কারোক্ত “তত্ত্ব” শব্দের দ্বারা গোতমের পূর্ববর্তী “তত্ত্ব”ই বুঝিতে হইবে। মনুস্মৃতিতে আছে,—

১। হৃদয়গ্রন্থের উত্তরতম তত্ত্বযুক্তি অধ্যায়ে ৩২ প্রকার তত্ত্বযুক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে।
তন্মধ্যে একটির নাম “অনুমত”। “পরমতমপ্রতিবিন্দনবৃত্তঃ ভবতি যথান্যো তদ্ব্যং সত্ত্বরসা ইতি”।—হৃদয়।
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের শেষেও ঐরূপ তত্ত্বযুক্তিগুলির উল্লেখ দেখা যায়।

“একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহবীনি পূর্বে মনীষিণঃ । একাদশং মনো জ্ঞেয়ম্” । (২অঃ—৮৯।২২ ।) এখানে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে ধরিয়া মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে । এবং ইহা যে অতি পূর্ববর্তী মত, ইহাও বলা হইয়াছে । “তত্ত্ব” বলিতে কোন দর্শনশাস্ত্র ধরিলেও সাংখ্য-হুত্রে আছে,— “উভয়ায়কং মনঃ” । প্রচলিত সাংখ্যহুত্র কপিল-প্রণীত নহে, এই মত প্রবল হইলেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে কপিল-তত্ত্ব-সম্মত, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই । সাংখ্যের প্রামাণিক গ্রন্থ দ্বৈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকাতেও পূর্বোক্ত সাংখ্যহুত্রের স্থায় “উভয়ায়কমত্র মনঃ” (২৭) এইরূপ কথাই রহিয়াছে । পূর্বে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ার উল্লেখ করিয়া শেষে বলা হইয়াছে,— “মন উভয়ায়ক” । অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্মেন্দ্রিয়ও বটে । মহর্ষি গোতম কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ারই উল্লেখ করিয়াছেন । “বাক্,” “পানি,” “পাদ,” “পায়ু,” “উপস্থ” এই পাঁচটি (বাহ্যার কর্মেন্দ্রিয় নামে শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে) তিনি বলেন নাই । ভাষ্যকার ধেরূপ “তত্ত্বযুক্তির” কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল কর্মেন্দ্রিয়ও গোতমের অমুমত, ইহা বলিতে হয় । কারণ, গোতম মূনি ঐ মতের খণ্ডনও করেন নাই । আমার মনে হয়, ভাষ্যকার যে “তত্ত্বযুক্তি”র কথা বলিয়াছেন, উহাই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গোতমসম্মতি বিষয়ে তাঁহার মুখ্য যুক্তি নহে । এ জন্ত তিনি “তত্ত্বাস্তর-সমাচারাচ্চ” এই স্থানে “চ” শব্দের দ্বারা ঐ যুক্তির অপ্রাধান্য হুচনা করিয়া গিয়াছেন । অর্থাৎ গোতম মূনি যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ারই উল্লেখ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রান্তরোক্ত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মতকে খণ্ডন করেন নাই, মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, তখন তাহাতেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গোতম মত বলিয়া বুঝা যায় । ফলতঃ ইহাই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে গোতম-সম্মতি নির্ণয়ে একমাত্র অথবা মুখ্য যুক্তি নহে । তাহা হইলে যে শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মত কথিত আছে, তাহাতে “বাক্,” “পানি” প্রভৃতি পূর্বোক্ত পাঁচটিকেও কর্মেন্দ্রিয় বলিয়া বলা হইয়াছে, সেগুলিকেও গোতমের অমুমত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । যদি তাহা স্বীকৃতই হয়, তবে ভাষ্যকার প্রভৃতি মনের ইন্দ্রিয়ত্বের স্থায় সেগুলির ইন্দ্রিয়ত্ব বলেন নাই কেন ? কোন ছায়াচার্য্যই ত তাহা বলেন নাই । বস্তুতঃ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষি-হুত্রেই হুচিত হইয়াছে । মহর্ষি গোতম মানস প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর বলেন নাই কেন ? মন যখন ইন্দ্রিয় নহে অর্থাৎ তিনি যখন ইন্দ্রিয়ার মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, তখন তাঁহার মতে মানস প্রত্যক্ষকে “ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান” বলা যায় না, সুতরাং মানস প্রত্যক্ষের একটি পৃথক্ লক্ষণ তাঁহার বলা উচিত ছিল । এই পূর্বপক্ষের সমাধানের জন্তই ভাষ্যকার মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গোতমের মত, ইহা বুকাইয়াছেন । সেখানে বলিতে পারি যে, মহর্ষি যখন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়াছেন এবং মানস প্রত্যক্ষের আর কোন পৃথক্ লক্ষণ বলেন নাই, তখন মহর্ষির এই হুত্রের দ্বারাই মনও যে তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়, ইহা হুচিত হইয়াছে এবং ঐরূপে উহা বুঝা গিয়াছে । হুত্রে এই ভাবে হুচনা থাকে । তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্বযুক্তি”র কথাটাও শেষে গোপভাবে বলা যায় । ভাষ্যকার নিজের বক্তব্য সমর্থনে আর সেটুকু বলিতে পারেন, তাহা এখানে বলিতে ছাড়িবেন কেন ? মনে হয়, সেই ভাবেই ভাষ্যকার এখানে “তত্ত্বযুক্তি”র কথাটাও শেষে বলিয়াছেন । “তত্ত্বযুক্তি”র

কথাটা মুখ্যরূপে বলিলে অর্থাৎ তত্ত্বযুক্তির দ্বারাই যদি সর্বত্র গ্রহণকারের মত নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে গোল উপস্থিত হইবে। তাৎপর্য্যটাকাবার প্রভৃতি কেহই এখানে সে সব কথার কোনই অবতারণা করেন নাই। এবং ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্ব-যুক্তি” অল্পসারে শাস্ত্রাস্তরোক্ত অন্তরাত্ম মতকেও গোতমের মতের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করেন নাই। সুদীর্ঘ এখানে এ সকল কথার চিন্তা করিবেন। অবশ্য শাস্ত্রাস্তরোক্ত বিভিন্ন মতের অনেকগুলিকেই ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্বযুক্তি” অল্পসারে গোতমের সম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। জ্ঞানস্বত্ব অনেক প্রাচীন মতেরই বিরুদ্ধ নহে, ইহা আমরা ভিন্ন স্থানে আলোচনা করিব।

মূল কথা, ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায়, তিনি মনের ইন্দ্রিয়কে সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তই বলিতেন। তাহা “ইন্দ্রিয়ত্ব বৈ” এখানে “বৈ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “ইন্দ্রিয়ত্ব বৈ” ইহার ব্যাখ্যা “ইন্দ্রিয়ত্বৈব”। উপনিষদে এবং ঋষিসূত্রে বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনের বিশেষ প্রাদর্শনের জন্তই মনের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব শ্রুতিমূলক স্মৃতি-প্রমাণসিদ্ধ। উহাতে কাহারও বিবাদ হইতে পারে না—বিবাদ করিলে তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবাদ হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের চরম কথার চরম তাৎপর্য্য। ইহাই ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্বযুক্তি”র গূঢ় তাৎপর্য্য।

পরবর্তী কালে “বেদান্তপরিভাষা”কার ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিবাদ করিয়াছেন—তিনি উপনিষদে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ দেখাইয়া শেষে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ইন্দ্রিয়বিকরণে কিন্তু (২ অঃ, ৪ পাদ, ১৭ সূত্র) মনের ইন্দ্রিয়ত্বের কথা পাওয়া যায়। সেখানে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে পূর্বোক্ত স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক মনকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমৎচম্পতি মিশ্রও সেখানে “ভামতী”তে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক শাস্ত্রে অনেক স্থলে যে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ আছে, তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের জ্ঞানই কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় ভগবদ্বাক্যও রহিয়াছে—“ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চান্মি”। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আনি মন, এ কথা বলিলে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্টই প্রকটিত হয়। বেদান্তপরিভাষাকার গীতার “মনঃ যষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি” এই কথাটির উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজ মতের বিরোধ ভঙ্গন করিতে গিয়াছেন, কিন্তু পূর্বোক্ত “ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চান্মি” এই কথাটির কোন উল্লেখ করেন নাই; কেন করেন নাই, তাহা ভাবিবার বিষয়। কোন আধুনিক টাকাকার “ইন্দ্রিয়াণাং” এই স্থলে সন্দেহ বজীর ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ “ইন্দ্রিয়ের সন্দেহে আমি মন” ইহাই ঐ ভগবদ্বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গ্রহণকারের মত রক্ষা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা যে ঐ স্থলে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, ইহা সুদীর্ঘ অবশ্য বুঝিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্করও সেখানে ঐ ভাবের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি শারীরকভাষ্যে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এখানে অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন কেন? বেদান্ত-পরিভাষাকার এই সকল দেখিয়াও বেদান্তগ্রন্থে—শঙ্করের মতসমর্থক গ্রন্থে মনের ইন্দ্রিয়ত্ববাদ খণ্ডনে এত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন কেন, ইহা চিন্তনীয়। ভগবান্ শঙ্কর শ্রুতিমূলক স্মৃতির মতাল্পসারে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মানিয়া লইয়া উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, আর ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাহা

মানিলেন না, নূতন মতের সৃষ্টি করিলেন, ইহা তাঁহার প্রৌঢ়বাদ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে, সুযোগের ইহা চিন্তা করা উচিত।

ভাষ্যকার যে “তত্ত্বযুক্তি”র কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভাষ্যকারের প্রতিবাদী বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ তাঁহার “প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,—

“ন স্থখাদিপ্রমেনং বা মনো বাহস্তীজিয়াস্তরম্।

অনিবেদ্যপান্ডকেন্দ্রেস্ত্রিয়রূপতং বুধা।”

দিঙ্‌নাগের কথা এই যে, যদি গোতম মুনি মনের ইন্দ্রিয়ের নিবেদ না করাতেই উহা তাঁহার মত বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে তিনি যে ভ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা না বলিলেও চলিত, তাহা বলিলেন না এবং নিবেদও করিলেন না, এইরূপ করিলেই ত মনের ইন্দ্রিয়ের ভ্রাণ ভ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটিরও ইন্দ্রিয়স্থ তাঁহার মত বলিয়া বুঝা যাইত। যে কোনরূপে নিজের মত জ্ঞাপনই ত তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা যদি ঐ রূপেই হইয়া যায়, তাহা হইলে আর ভ্রাণাদি পাঁচটিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা কেন? দিঙ্‌নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, দিঙ্‌নাগ ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্বযুক্তি” না বুঝিয়াই ঐরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন। যেখানে নিজের মত ব্যক্ত করা হইয়াছে, সেখানে পরের কোন একটি মত যদি ঐ মতের অবিরুদ্ধ হয় এবং গ্রহণকার কর্তৃক খণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে সেখানেই ঐ পরের মতটি অল্পমত হয়। ইহাই ভাষ্যকারোক্ত “তত্ত্বযুক্তি”। গোতম মুনি যদি ইন্দ্রিয়ের কথা একেবারেই না বলিতেন, তাহা হইলে এই “তত্ত্বযুক্তি”র কোন স্থলই হইত না। যেখানে নিজের কোন মতই নাই, সেখানে “পরের মত—অল্পমত হইয়াছে” এ কথা বলা যায় না। কোন বিষয়ে একেবারে নীরব থাকিলে তদ্বিষয়ে কোনটি নিজ মত, আর কোনটি পর-মত, তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে? সুতরাং নিজের মতটি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজ মত ও পর-মত বুঝিয়া তত্ত্বযুক্তির কথা বুঝা যাইতে পারে। উদ্যোতকর এই ভাবে দিঙ্‌নাগের প্রতিবাদ করিয়া শেষে দিঙ্‌নাগের প্রত্যক লক্ষণ^১ বিশেষ বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে জৈমিনির এবং বার্ষগণ্যের প্রত্যক লক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিয়া প্রত্যক-স্বত্বভাষ্য-বার্ত্তিক সমাপ্ত করিয়াছেন। সুবীণগ স্তায়বার্ত্তিকে সে সকল কথা দেখিতে পাইবেন।

ভাষ্যকারের তত্ত্বযুক্তির কথা পূর্বে বাহা বলিয়াছি, তাহাতে দিঙ্‌নাগের আপত্তি গ্রাহ্যই হয় না। কারণ, ভাষ্যকারের “তত্ত্বযুক্তি” মূখ্য যুক্তি নহে। পরন্তু মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ উল্লেখ না করিলে তাঁহার মতে মুমুকুর দ্বাদশ প্রকার “প্রমেনে”র মধ্যে “ইন্দ্রিয়” একপ্রকার “প্রমেনে”, ইহা বলা হয় না। তন্মধ্যে মন আবার বহিরিন্দ্রিয় হইতে বিশেষরূপে “প্রমেনে,” এই জন্ত মনের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই জন্তই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, প্রমেন-মধ্যে মনের পৃথক উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়াও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সুবীণগ ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ৪।

১। “প্রত্যকং কল্পনাপোচং নামজাত্যাবাসংস্কৃতম্।”—দিঙ্‌নাগভূত প্রমাণসমুচ্চয়—১ম পরিচ্ছেদ।

সূত্র । অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্বব- চ্ছেদবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ । ৫ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরে (অনুমান নিরূপণ করিতেছি) । “তৎপূর্বকং” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষমূলক জ্ঞান—অনুমান-প্রমাণ । (তাহা) ত্রিবিধ । (১) “পূর্ববৎ,” (২) “শেষবৎ,” (৩) “সামান্যতো দৃষ্ট” ।

টিপ্পনী । প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষবিশেষমূলক এক প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে বলে “অনুমিতি” । আবার ইহাকে “অনুমান”ও বলা হয় । “অনু” পূর্বক “মা” ধাতুর উত্তর ভাব অর্থে “অনট্” প্রত্যয় যোগে “অনুমান” শব্দটি সিদ্ধ হইলে “অনুমান” বলিতে অনুমিতিই বুঝা যায় । ঐরূপে অনুমিতি অর্থে “অনুমান” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে । কিন্তু প্রমাণের বিভাগানুসারে এই সূত্রে যখন অনুমান-প্রমাণের লক্ষণই মহাবীর বক্তব্য, তখন এই সূত্রে “অনুমান” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে অনুমান-প্রমাণ । এই অর্থে “অনুমান” শব্দটি “অনু” পূর্বক “মা” ধাতুর উত্তর করণ অর্থে অনট্ প্রত্যয়-সিদ্ধ । অর্থাৎ যাহা যথার্থ অনুমিতির করণ, তাহাই অনুমান-প্রমাণ । পূর্বোক্ত অনুমিতির স্তর তাহাও প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞান । সে কিরূপ জ্ঞান, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে ।

অনুমান মাত্রেরি দুইটি পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান আবশ্যক । একটি পদার্থ ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত, আর একটি পদার্থ তাহার ব্যাপক । ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত বলিলে বুঝা যায়—যাহাকে কেহ ব্যাপিয়া থাকে । ব্যাপিয়া থাকে বলিলে বুঝা যায়, সেই পদার্থটির সমস্ত আধারেই সম্বন্ধ যুক্ত থাকে । ব্যাপক বলিলে বুঝা যায়, যে পদার্থটি ব্যাপিয়া থাকে । অর্থাৎ কোন পদার্থের সমস্ত আধারেই যাহার সম্বন্ধ আছে । যেমন বিশিষ্ট ধূম ব্যাপ্য, বহি তাহার ব্যাপক । বহি বিশিষ্ট ধূমকে ব্যাপিয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সকল স্থানেই বহি থাকে,—বহিঃশূন্য কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধূম থাকে না, থাকিতেই পারে না ; কারণ, বহি ধূমের কারণ, বহি ব্যতীত ধূম জন্মিতেই পারে না । তাহা হইলে বিশিষ্ট ধূমের সকল আধারেই বহির সম্বন্ধ থাকে বলিয়া বিশিষ্ট ধূমকে বহির ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত বলা যায় । এবং বহিকে বিশিষ্ট ধূমের ব্যাপক বলা যায় । বিশিষ্ট ধূমে বহির ঐরূপ সম্বন্ধকে “ব্যাপ্তি” বলা হইয়াছে । সর্বত্র সম্বন্ধের নামই ত “ব্যাপ্তি” । এই অর্থে প্রচলিত ভাষাতেও “ব্যাপ্তি” শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে । উহা নব্য নৈরায়িকদিগের আবিষ্কৃত কোন নূতন শব্দ নহে । নব্য নৈরায়িকগণ ঐ ব্যাপ্তি পদার্থের স্বরূপ বর্ণনায় সর্বাপেক্ষা সমধিক পরিশ্রম করিয়াছেন মাত্র । অনুমানের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্ভাব্যই এই ব্যাপ্তি পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন (২ অং,—৫ সূত্র স্রষ্টব্য) । মূল কথা, অনুমান মাত্রেরি পূর্বোক্ত ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবরূপ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান আবশ্যক । ঐ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান হইলে যেখানে ব্যাপক পদার্থটি প্রত্যক্ষ হইতেছে না, কিন্তু তাহার ব্যাপ্য পদার্থটির প্রত্যক্ষ বা অন্তরূপ জ্ঞান হইল, সেখানে ঐ ব্যাপ্য পদার্থের

জ্ঞানবিশেষ প্রযুক্ত তাহার ব্যাপক পদার্থটির যে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাই অহুমিতি। ব্যাপ্য পদার্থটিই অহুমানের হেতু-পদার্থরূপে গৃহীত হয়; এ জন্ত ব্যাপ্য পদার্থকে “লিঙ্গ” বলে, ব্যাপক পদার্থটিকে “লিঙ্গী” বলে। “লিঙ্গ” ও “লিঙ্গী”র সম্বন্ধ বলিতে পূর্বোক্ত ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সদৃশ। কোন স্থানে বিশিষ্ট ধূম দেখিলেই এই স্থানে বহি আছে, এইরূপ জ্ঞান অনেকেরই হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আবার ধূমবিশেষ দেখিয়া অথবা শব্দবিশেষ শুনিয়া রেল বা ষ্টীমারের শীঘ্র আগমনের অহুমান করিয়া অনেকেই আশঙ্ক ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন এমন হয়? দূর হইতে বৃকের স্পন্দন দেখিয়া অথবা কাহাঃ শব্দধ্বনি শুনিয়া রেল বা ষ্টীমারের শীঘ্র আগমনের নিশ্চয় করিয়া কোন বিজ্ঞ লোক আশঙ্ক হন না কেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ স্থলে অহুমেয় ধর্মের ব্যাপ্য পদার্থটির জ্ঞান হয় নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে, ব্যাপ্য পদার্থের জ্ঞান-প্রযুক্তই তাহার ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাহাকেই বলে অহুমিতি। আরও বলিতে হইবে, সকল পদার্থই সকল পদার্থের ব্যাপ্য নহে, অর্থাৎ যে কোন পদার্থই যে কোন পদার্থের ব্যাপ্য হয় না এবং কোন পদার্থ কাহার ব্যাপ্য, তাহা না বুঝিলেও অহুমিতি হয় না। অহুমিতি মাত্রেরই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতুর ও সাধ্য ধর্মের) ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক। বিশিষ্ট ধূম বহির ব্যাপ্য, অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি থাকে, ইহা বাহারা বুঝিয়াছেন, ঠাণ্ডাদিগের ঐ বিষয়ে একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কোন স্থানে বিশিষ্ট ধূম দেখিলে বা অল্প প্রমাণের দ্বারা জানিলে সামান্যতঃ বিশিষ্ট ধূমমাত্রেরই ঠাণ্ডাদিগের পূর্বজ্ঞাত যে বহিব্যাপ্যতা বা বহির ব্যাপ্তি, তাহার স্মরণ হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধূম থাকিলেই সেখানে বহি থাকিবে, ইহা ঠাণ্ডাদিগের মনে পড়ে। তাহার পরে “এই স্থান বহিব্যাপ্যবিশিষ্ট ধূমযুক্ত,” এইরূপ জ্ঞান হয়। এইরূপ জ্ঞানকেই “লিঙ্গ-পরামর্শ” বলা হইয়াছে। ইহার পরেই “এই স্থান বহিযুক্ত” এইরূপ জ্ঞান জন্মে। এইরূপ জ্ঞানই অহুমিতি। পূর্বোক্ত “লিঙ্গপরামর্শ” এই অহুমিতির চরম কারণ, এ জন্ত উদ্যোতকর উহাকেই মুখ্য অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। স্বত্রকার ও ভাষ্যকারের কথাতোও উহা অহুমান-প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায়। অহুমানের স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে বহু মতভেদ থাকিলেও উদ্যোতকর সেগুলির উল্লেখ করিয়া^১ বলিয়াছেন যে, লিঙ্গদর্শন, ব্যাপ্তি স্মরণ এবং চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শ, ইহারা সকলেই অহুমান-প্রমাণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্মধ্যে চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শই প্রধান। অনেক স্থলে ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীনগণ এই প্রধান প্রমাণকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়া প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন—(তৃতীয় স্বত্র-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

১। “বহুস্ত পঞ্চাংঃ সর্ববহুমানবহুনিঃসত্ত্বাস্তরীকৃত্বাং প্রধানোপসর্জনভাববিস্কারাং লিঙ্গপরামর্শ ইতি ভাষ্যং, কঃ পুনঃ জ্ঞাতঃ? আনন্তর্ভাবতিপত্তিঃ বস্মাল্লিঙ্গপরামর্শাধনস্তরং শেবার্হপ্রতিপত্তিরিতি তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শে ভাষ্য ইতি শ্রুতির্ন প্রযোজ্য” ইত্যাদি।—(জ্যোতিষিক, ৫ সূত্র।)

ভট্ট কুমারিল ধর্ম, ধর্মজ্ঞান এবং বহিঃ ধর্মের পূর্বোক্ত সঙ্কল্পের অর্থকে অহুমান-প্রমাণ বলিয়া কোন স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ কুমারিলও একটিনাক্রমে অহুমান-প্রমাণ বলেন নাই; সুতরাং তাঁহার মতেও অহুমান-প্রমাণের মুখ্য গোণ ভাব আছে বলিয়াই বুঝিতে হয়। নব্য নৈয়ায়িক একমাত্র ব্যাপ্তিজ্ঞানবিশেষকেই অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। লিঙ্গপরামর্শ তাহার ব্যাপার। লিঙ্গপরামর্শের পরেই অহুমিতি জন্মে; সুতরাং উহা কোন ব্যাপার দ্বারা অহুমিতি জন্মায় না; এ জ্ঞাত অহুমিতির করণ না হওয়ায় অহুমান-প্রমাণ হইতে পারে না, ইহাই তাঁহাদিগের যুক্তি। এ বিষয়ে প্রাচীন মতের যুক্তি (তৃতীয় স্তরে) পূর্বোক্ত বলা হইয়াছে। নব্য জ্ঞানের মূল আচার্য্য গবেশ কিন্তু “লিঙ্গপরামর্শ” শব্দের দ্বারা অহুমান-প্রমাণের নির্দেশ করিয়াছেন। গবেশ বহু স্থলেই উদ্যোতকরের মত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অহুমান-প্রমাণের বিষয়ে তাঁহার মত ও সমর্থন থাকিলেও উদ্যোতকরের মতানুসারে তিনিও “লিঙ্গপরামর্শ”কে প্রধান অহুমান-প্রমাণ বলিতে পারেন। টীকাকারগণ তাহা না বলিলেও গবেশ প্রথমে “লিঙ্গপরামর্শ” শব্দের দ্বারা অহুমান-প্রমাণের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন কেন? ইহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। পরবর্তী প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “হেতু”কে অহুমান-প্রমাণ বলিলেও ফলতঃ তাঁহার মতেও পূর্বোক্ত প্রকার “লিঙ্গপরামর্শ”ও অহুমান-প্রমাণ বলিতে হইবে। কারণ, “হেতু” থাকিলেই অহুমিতি জন্মে না। বিশিষ্ট ধর্ম পর্যন্ত থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহাকে বহির ব্যাপ্য বলিয়া জানে না, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্ম থাকিলেই সেখানে বহিঃ থাকিবেই, ইহা যাহার জানা নাই এবং বহির ব্যাপ্যবিশিষ্ট ধর্ম পর্যন্ত আছে, ইহা যে ব্যক্তি জানিতে পারে নাই, তাহার পর্যন্ত বহির অহুমিতি জন্মে না, এ জ্ঞাত ঐরূপে জ্ঞাতমান বিশিষ্ট ধর্মকেই উদয়ন ঐ স্থলে অহুমিতির করণ বলিয়া অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু চরম কারণকে “করণ” বলিলে ঐ স্থলে যে জ্ঞানটির পরেই অহুমিতি জন্মে, সেই “লিঙ্গপরামর্শ” নামক জ্ঞানকেও অহুমান-প্রমাণ বলিতে হয়। বস্তুতঃ উদয়ন তাহাও বলিতেন। “লিঙ্গপরামর্শ”ের বিষয় “লিঙ্গ”কে অহুমান-প্রমাণ বলিলে ঐ “লিঙ্গপরামর্শ”কেও ফলতঃ অহুমান-প্রমাণ বলা হয়। উদয়নের “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি”র টীকায় বর্তমান উপাধায়ও অহুমানরূপ “জ্ঞান”কে “লিঙ্গপরামর্শ” স্বরূপ বলিয়াছেন। “অর্কিকরক”কার বরদরাজও লিখিয়াছেন,— “লিঙ্গপরামর্শোহহুমানবিত্যাচার্য্যঃ”। সেখানে প্রখ্যাতনামা টীকাকার মলিনাথও লিখিয়াছেন যে, প্রকারান্তরে উদয়নাচার্য্যও “লিঙ্গপরামর্শ”কে অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যেখানে অতীত অথবা ভাবী হেতুর জ্ঞানপূর্বক অহুমিতি জন্মে, সেখানে ঐ হেতুকে অহুমিতির করণ বলা যায় না। যাহা কার্য্যের পূর্বে থাকে না, তাহা কারণই হইতে পারে না। অতীত এবং ভাবী পদার্থ যে কারণই হইতে পারে না, এ কথা উদয়নও তাৎপর্য্যপরিণুক্তিতে অস্ত্র প্রদর্শন লিখিয়াছেন। সুতরাং অতীত ও ভাবী পদার্থ হেতু হইলে সেখানে উদয়নও “লিঙ্গপরামর্শ”কে অথবা তাৎপর্য্যজ্ঞাত “ব্যাপ্তিস্বরূপ”কে অহুমান-প্রমাণ বলিতেন। তাহা হইলে নব্য নৈয়ায়িকগণ যে অতীত ও ভাবী

১। “ধর্মজ্ঞানসম্বন্ধস্থিতিপ্রামাণ্যকল্পে।”—(সৌক্যবৃত্তিক, অহুমান-পরিচ্ছেদ, ৫২।)

২। “তৎকরণবহুমানং তচ্চ লিঙ্গপরামর্শে ন তু পরাম্বৃত্তমানং লিঙ্গমিতি বস্তুতঃ।”—(অহুমানটিলাস, ১৫ খণ্ড।)

হেতুকেই হেতু পূর্বে না থাকায় অহুমিত্তির করণ অর্থাৎ অহুমান-প্রমাণ হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া উদয়নের মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই দোষও থাকে না। কারণ, উদয়ন সর্বত্র হেতুকেই অহুমান-প্রমাণ বলেন নাই। তবে সাধ্যসাধন হেতুপদার্থ অসিদ্ধ হইলে—যথার্থ অহুমিত্তির সম্ভাবনাই নাই, প্রকৃত হেতুই—অহুমানকারীর অহুমান-কার্য্যে মূল অবলম্বন, এই অভিপ্রায়ে হেতুকে প্রধানরূপে বিবক্ষা করিয়া তিনি প্রধানতঃ জায়মান হেতুকে অহুমান-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীনগণও ঐ অভিপ্রায়েই অহুমান-প্রমাণ অর্থে কোন কোন স্থলে “হেতু” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। জায়মান হেতুই অহুমান-প্রমাণ, এই মতট জৈন স্মার-গ্রন্থেও দেখা যায়। জৈন স্মারের “শ্লোকবার্ত্তিক” গ্রন্থে আছে,—“সাধনাং সাধ্যবিজ্ঞানমহুমানং বিতর্কধাঃ”। সেখানে স্মারদীপিকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জায়মান হেতু হইতে সাধ্যের জ্ঞানই অহুমিত্তি। অর্থাৎ জায়মান হেতুকেই তাঁহারা অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকগণ যে “লিঙ্গপরামর্শ”কে অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা ভ্রম-কল্পিত, এ কথাও বলিয়াছেন। এই মতাবলম্বিগণ যাহাই বলুন, পূর্বোক্ত প্রকার “লিঙ্গপরামর্শ” না হইলে যখন কোনমতেই অহুমিত্তি হয় না এবং উহাই অহুমিত্তির চরম কারণ—প্রধান কারণ এবং হেতু পদার্থ অতীত অথবা ভাবী হইলেও ঐ লিঙ্গপরামর্শের দ্বারাই যখন অহুমিত্তি জন্মে, তখন ঐ প্রধান কারণ “লিঙ্গ-পরামর্শ”কে প্রধান অহুমান-প্রমাণ বলিতেই হইবে। উহার পূর্বজাত লিঙ্গলিঙ্গীর সধক দর্শন প্রতীতিকেও অহুমান-প্রমাণ বলিতে হইবে। মহর্ষি-সূত্র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও তাহাই পাওয়া যায়। উদ্যোতকরও তাহাই মীমাংসা করিয়াছেন। তবে বাহ্যার চরম কারণকে করণই বলেন না, সেই নব্য মতে লিঙ্গপরামর্শ অহুমান-প্রমাণ হইবে না। তাঁহাদিগের মতে ঐ পরামর্শের জনক তৎপূর্বজাত ব্যাপ্তিজ্ঞানই অহুমান-প্রমাণ।

অহুমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে যেমন বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তরূপ অহুমান-প্রমাণের প্রমের বিষয়েও ততোহধিক মতভেদ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিগ্‌নাগ তাঁহার “প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থে ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেই অহুমের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ পর্কতে বিশিষ্ট ধর্ম্ম দেখিয়া যেখানে অহুমিত্তি হয়, সেখানে কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, পর্কতে বহিরূপ ধর্ম্মাস্তরের অহুমিত্তি হয়; কোন সম্প্রদায় বলিতেন, পর্কতরূপ ধর্ম্মী এবং বহিরূপ ধর্ম্মের সধকের অহুমিত্তি হয়। দিগ্‌নাগ এই মতদ্বয় খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ স্থলে বহিরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট পর্কতরূপ ধর্ম্মীরই অহুমিত্তি হয়^১। পর্কতরূপ ধর্ম্মী এবং বহিরূপ

১। কেচিদ্ধর্ম্মাস্তরং মেহং লিঙ্গস্তাব্যভিচারতঃ।

সধকং তে চিহ্নিচ্ছান্তি সিদ্ধহাং ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ।

লিঙ্গং ধর্ম্মে প্রসিদ্ধকোং কিমন্তং তেন দীযতে।

অথ ধর্ম্মিণি তন্তৈব কিমর্থং নানুমেয়তা।

সধকেহপি ধর্ম্মং নান্তি বজী শ্রব্যেত তথতি।

অবাচ্যোহনুগৃহীতদ্বার চাসৌ লিঙ্গপংগতঃ।

ধর্ম পূর্বসিদ্ধ পদার্থ হইলেও বহিঃবিশিষ্ট পূর্বত পূর্বক অসিদ্ধ থাকায় অল্পমান-প্রমাণের দ্বারা তাহাই সিদ্ধ করা হয়। বাহ্য সিদ্ধ, তাহা সাধ্য হইতে পারে না। ধর্ম-বিশিষ্ট ধর্মী অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্য হইতে পারে। ভট্ট কুমারিলও শ্লোকবর্তিক এই বিষয়ে বহু মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়া শেষে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীকেই অল্পমের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দিগ্‌নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর “স্মারবর্তিকে” বহু বিচারপূর্বক দিগ্‌নাগের মত এবং অন্তান্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া গতান্তর নাই বলিয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হেতুকে সাধ্যধর্ম-বিশিষ্ট বলিয়াই অল্পমিতি হয়। অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট ধুম দেখিয়া যেখানে বহির অল্পমিতি হয়, সেখানে “এই ধুমবিশেষ বহিঃবিশিষ্ট” এইরূপই অল্পমিতি হয়। ভট্ট কুমারিলও শেষে উদ্যোতকরের এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই মতে ধুমবিশেষই অগ্নি-বিশিষ্ট বলিয়া সাধ্যমান হয় এবং ধুমস্বরূপ সামান্ত ধর্মই হেতু হয়, এই কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন (৩৬ সূত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন যে, সাধ্য দ্বিবিধ—(১) ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম এবং (২) ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী। এবং তৃতীয় সূত্রভাষ্যে লিঙ্গী অর্ণের অল্পমান হয়, এই কথা বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্যটাকাঁকার ভাষ্যকারোক্ত লিঙ্গীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—হেতুবিশিষ্ট ধর্মী। ভাষ্যকার কিন্তু এই সূত্রভাষ্যে সাধ্য ধর্ম অর্থেই “লিঙ্গিন্” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাপ্য হেতুকে “লিঙ্গ” বলে। ঐ লিঙ্গটি বাহার সাধন হইয়া বাহার “লিঙ্গ” হয়, তাহাকে “লিঙ্গী” বলা যায়। এই “লিঙ্গ” ও “লিঙ্গী”র সম্বন্ধ বলিতে হেতু ও সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধ। বাহার সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীকেই অল্পমের বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে হেতু পদার্থটি অল্পমের পদার্থের ব্যাপ্য হয় না। যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধুম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহিঃ থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত স্থানেই বহিঃবিশিষ্ট পূর্বত থাকে না, স্তত্রাং বিশিষ্ট ধুম বহিঃবিশিষ্ট পূর্বতের ব্যাপ্য নহে। তাহা হইলে বিশিষ্ট ধুম দেখিয়া বহিঃবিশিষ্ট পূর্বতের অল্পমিতি হইতে পারে না। পূর্বোক্ত বাদিগণ বিশিষ্ট ধুম ও বহির ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ-জ্ঞানের ফলেই বহিঃবিশিষ্ট পূর্বতের অল্পমিতি হয় বলিয়াছেন। জৈন স্মারগ্রন্থে এই মত পরিষ্কৃত দেখা যায়। জৈন স্মার-গ্রন্থ “পরীক্ষা-সুধসূত্রে” আছে—“ব্যাপ্তৌ তু সাধ্যং ধর্ম এব” (৩২ সূত্র)। অর্থাৎ ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের সময়ে ধর্মরূপ সাধ্যই গ্রাহ্য। কারণ, ধর্মীরূপ সাধ্যের ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে না। ফলতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয়কালে ধর্মরূপ সাধ্যই যে গ্রাহ্য, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। নব্যগণ বলিয়াছেন যে, যখন সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় বশতঃই অল্পমিতি হয়, তখন সাধ্য ধর্মেরই অল্পমিতি হয়। হেতুকে বাহার ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিয়া অল্পমিতি হয়, সেই পদার্থই অল্পমিতির বিধেয় এবং পূর্বতে

লিঙ্গস্তাব্যভিচারঃ ধর্মপানাজ বুজতে।

তত্র প্রসিদ্ধং তৎসূক্তং ধর্মণং ধর্মদ্বিধাতি ।—প্রমাণসমূহ, ২য় পরিচ্ছেদ।

১। “তস্মাদ্ধর্মবিশিষ্টতং ধর্মণং জ্ঞাৎ প্রবেশতঃ। সাধেনস্তায়ায়ুক্ততঃ।”—

নীনাংসারোকবার্তিক, অল্পমান পরিচ্ছেদ।

২। “বদ্যাপ্যবস্তাজ্ঞানভক্তত্বমুপিতৌ তবংশ এব বিধেয়তাধাবিবরতাপীকারাং”—(পক্ষতাবিচারে লাক্ষণী)।

বহির্কে অহুমান করিতেছি, এইরূপই শেষে মানস অহুভব হওয়ার পর্তত ধর্ম্মীতে বহির্কপ ধর্ম্মই অহুনের, সূত্রাং উহাই সাধ্য। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেও “সাধ্য” বলিয়াছেন। কারণ, মহাবি-সূত্রে ঐ অর্থেও “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ আছে। এসকল কথা যথাস্থানে (অবয়ব প্রকরণে) দ্রষ্টব্য। উদ্যোতকর যে হেতুকেই সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অহুনের বলিয়াছেন অর্থাৎ “এই ধর্ম্মবিশেষ বহির্কপ” এইরূপই অহুমিতি হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা কিন্তু সূত্রকার ও ভাষ্যকারের কথায় কোথায়ও পাওয়া যায় না। এবং এই মত লোক-বিকৃত বলিয়া উদ্যোতকরও আপত্তির উত্থাপন পূর্বক তাহারও সমাধান করিতে গিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশিষ্ট ধর্ম্মের দ্বারা পর্ততাদি স্থানে বহির্কই অহুমিতি হয়, এই নব্য মতই লোকসিদ্ধ ও অহুভব-সিদ্ধ। অহুমিতির পূর্বে বহি অস্ত্র সিদ্ধ হইলেও পর্ততাদি ধর্ম্মীতে অসিদ্ধ থাকায় ঐ সকল স্থানে বহি অহুমানের সাধ্য হইতে পারে, ইহাই নব্য নৈয়ায়িকদিগের কথা। ভাষ্যকারও কএক স্থানে সাধ্যধর্ম্মরূপ লিঙ্গীরই অহুমানের কথা বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ অহুমানের মূল; সূত্রাং প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরেই অহুমান নিরূপণ সংগত। এই সংগতি সূত্রকার জন্তই সূত্রে “অথ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। “অহুমান-চিন্তামণি”র প্রারম্ভে উপাধ্যায় গবেশ মহাবি-সূত্রিত এই সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সেখানে দীর্ঘবিত্তিকার রঘুনাথ ও তাহার টীকাকার গদাধর এই সংগতির বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই সংগতি বিষয়ে কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। সূত্রে “অহুমানং” এই অংশের দ্বারা লক্ষ্যনির্দেশ হইয়াছে। “তৎপূর্বকং” এই অংশের দ্বারা অহুমান প্রমাণের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। অস্ত্র অংশের দ্বারা অহুমান প্রমাণের বিভাগ করা হইয়াছে।

ভাষ্য। তৎপূর্বকমিত্যনে লিঙ্গলিঙ্গনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গ-দর্শনকামিসম্বন্ধ্যতে। লিঙ্গলিঙ্গনোঃ সম্বন্ধয়োর্দর্শনেন লিঙ্গস্মৃতিরভি-সম্বন্ধ্যতে। স্মৃত্য লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোহর্থোহনুমায়তে।

অনুবাদ। “তৎপূর্বক” এই কথার দ্বারা অর্থাৎ সূত্রস্থ “তৎপূর্বকং” এই কথার আদিশিত “তৎ” শব্দটির দ্বারা “লিঙ্গ” ও “লিঙ্গী”র (হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের) সম্বন্ধ দর্শন অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গদর্শন (হেতুর প্রত্যক্ষ) অভিসম্বন্ধ অর্থাৎ সূত্রকারের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত হইয়াছে। সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতু ও সাধ্য-ধর্ম্মের) দর্শনের দ্বারা লিঙ্গস্মৃতি অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া হেতুর স্মরণ অভিসম্বন্ধ (সূত্রকারের অভিপ্রেত) হইয়াছে। স্মৃতির দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত লিঙ্গস্মৃতির দ্বারা এবং লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ “এই হেতু এই সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য” এইরূপে হেতু স্মরণের পরে “এই স্থানে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতু আছে”, এইরূপে

যে তৃতীয় লিঙ্গদর্শন হয়, সেই “লিঙ্গপরামর্শ” নামক জ্ঞানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অনুমিত হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। পূর্বসূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ প্রমিতিরও স্বরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমিতিকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেখানে পূর্বের কোন পদার্থ বলিয়া শেষে “তৎ” শব্দের প্রয়োগ করা হয়, সেখানে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত পদার্থ বুঝা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত পদার্থমাত্রই “তৎ” শব্দের বাচ্য নহে। যে পদার্থ বক্তার বুদ্ধিস্ত, “তৎ” শব্দের দ্বারা সেখানে সেই পদার্থকেই বুঝিতে হইবে। কোন পদার্থ বক্তার বুদ্ধিস্ত, তাহাও বুঝিয়া লইতে হইবে। বক্তা মহর্ষি পূর্বসূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমিতি মাত্রকেই বলিয়াছেন, কিন্তু অহুমানপ্রমাণ যখন প্রত্যক্ষমাত্রপূর্বক নহে, তখন এই সূত্রে “তৎপূর্বকং” এই কথার আদিস্থিত “তৎ” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ সামান্যই গ্রহণ করা যায় না। তাহা সম্ভব নহে বলিয়া মহর্ষির এখানে বুদ্ধিস্ত নহে। অহুমান প্রমাণ বৈরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক হইয়া থাকে এবং হইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যক্ষবিশেষকেই মহর্ষি এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। যে কোন প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে অহুমানপ্রমাণ বলিলে শব্দ অবগাদিরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক শব্দ বোধ প্রভৃতি জ্ঞান ও অহুমান-প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষ প্রত্যক্ষই মহর্ষি এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই বিশেষ প্রত্যক্ষ কি? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সৎসদৃশং লিঙ্গদর্শনং।” শব্দ বোধ প্রভৃতি জ্ঞান ঐ বিশেষ প্রত্যক্ষপূর্বক নহে, তাই অহুমান নহে। ঐ দুইটি বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞ যে সংস্কার হয়, তাহাও ঐ প্রত্যক্ষ-বিশেষপূর্বক বলিয়া অহুমান-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাই পূর্বসূত্র হইতে “জ্ঞানং” এই কথাটির অন্তর্ভুক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে (“তৎপূর্বকং জ্ঞানং”)। তৎপূর্বক জ্ঞানই অহুমান প্রমাণ। সংস্কার জ্ঞানপদার্থ নহে; সুতরাং তাহা অহুমান-লক্ষণাক্রান্ত হইল না। অহুমানক হেতুকে “লিঙ্গ” বলে। তাহা যে পদার্থের “লিঙ্গ”, সেই সাধ্যবস্তুটিকে “লিঙ্গী” বলে। যেমন বহি “লিঙ্গী”, বিশিষ্ট ধূম তাহার “লিঙ্গ”। ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যবস্তুয়ের যে ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ, তাহাই অহুমানের অঙ্গ; সুতরাং ভাষ্যে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কথার দ্বারা ঐ সম্বন্ধবিশেষই উক্ত হইয়াছে। সাধ্যবস্তু স্থানে থাকিয়া সাধ্যবস্তু স্থানে হেতুর অবর্তমানতা বা না থাকাই হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিবিশিষ্টকে “ব্যাপ্য” বলে। সেটি তাহার ব্যাপ্য, তাহাকে “ব্যাপক” বলে। যেমন বিশিষ্ট ধূম (লিঙ্গ) “ব্যাপ্য”,—বহি (লিঙ্গী) তাহার “ব্যাপক।” বহুশব্দ কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধূম অর্থাৎ যে ধূম তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে একেবারে বিচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে যায় নাই, তাহা থাকে না, থাকিতেই পারে না; সুতরাং তাহা বহির ব্যাপ্য, বহি তাহার ব্যাপক। বিশিষ্ট ধূম ও বহির এই ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ প্রথমতঃ রক্ষণশীল প্রভৃতি স্থানে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সঙ্গে বিশিষ্ট ধূমের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রথম লিঙ্গদর্শন (হেতু প্রত্যক্ষ)। পরে পর্ত্তাদি কোন

স্থানে বিশিষ্ট ধূম দর্শন হইলে তাহা দ্বিতীয় লিঙ্গ-দর্শন। এই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনই ভাষ্যে “লিঙ্গদর্শনক” এই কথা দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। বিশিষ্ট ধূম ও বহির পূর্বোক্ত ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সদ্বন্ধ দর্শন এবং পক্ষতাদিতে দ্বিতীয় বিশিষ্ট ধূম দর্শন, এই দুইটি প্রত্যক্ষবস্তুঃ শেষে পক্ষতাদিতে ‘বহিব্যাপ্যবিশিষ্ট ধূমবান্ পক্ষত’ ইত্যাদি প্রকারে পুনরায় লিঙ্গদর্শন হয়, ইহাই তৃতীয় লিঙ্গদর্শন। এবং ইহাই “তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ”, “লিঙ্গপরামর্শ” ও “পরামর্শ” নামে অভিহিত হয়। ঐ পরামর্শ নামক জ্ঞানের পরেই “পক্ষতো বহিমান্” ইত্যাদি প্রকারে পক্ষতাদি স্থানে বহির অহুমিতি হয়; সুতরাং উহাই ঐ অহুমিতির চরম কারণ। প্রাচীন মতে চরম কারণই মুখ্য কারণ-পদার্থ (তৃতীয় সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তাই পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে অহুমিতির চরম-কারণ পরামর্শকেই মুখ্য “অহুমান প্রমাণ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্মার্যবৃত্তিককারের শেষ সিদ্ধান্তও এই। বস্তুতঃ ঐ তৃতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষরূপ পরামর্শ নামক জ্ঞান পূর্বোক্তপূর পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়-জনিত। সুতরাং উহাই সূত্রোক্ত “তৎপূর্বক জ্ঞান”, তাই সূত্রানুসারেও উহা অহুমানপ্রমাণ হইবে। পূর্বোক্ত ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সদ্বন্ধ-দর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন, পূর্বোক্ত তৃতীয় লিঙ্গদর্শনের পূর্বেই বিনষ্ট হয়; সুতরাং সেই প্রত্যক্ষদ্বয় ঐ তৃতীয় লিঙ্গদর্শনের কারণ হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন—“লিঙ্গস্বতিরভিসম্বন্ধাতে।” অর্থাৎ ঐ প্রত্যক্ষদ্বয় পূর্বে বিনষ্ট হইলেও তজ্জন্ম যে সংস্কার থাকে, তাহাই উৎকৃষ্ট হইয়া তখন “বহিব্যাপ্য বিশিষ্ট ধূম” ইত্যাদিরূপে লিঙ্গস্বতি জন্মায়। ঐ লিঙ্গস্বতির সাহায্যে ‘বহিব্যাপ্য বিশিষ্ট ধূমবান্ পক্ষত’ ইত্যাদি প্রকার তৃতীয় লিঙ্গ প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং ঐ তৃতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অহুমান প্রমাণ সূত্রোক্ত “তৎপূর্বক জ্ঞান” হইতে পারে অর্থাৎ এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি তাহাকে “তৎপূর্বক জ্ঞান” বলিয়াছেন। কার্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ব, তাই কারণার্থে “পূর্ব” শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাহ্য পরম্পরায় বা অতি পরম্পরায় আবশ্যক, তাহাকেও কারণের কারণ বলিয়া “পূর্ব” বলা হইয়া থাকে। স্মার্যবৃত্তিককার বলিয়াছেন যে, ‘তানি পূর্বাণি যন্ত’, ‘তে পূর্বে যন্ত’, ‘তৎ পূর্বং যন্ত’—এই ত্রিবিধ বিগ্রহসিদ্ধ “তৎপূর্বক” শব্দের তিন বার আবৃত্তি করিয়া উহার দ্বারা ত্রিবিধ অর্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে। ‘তানি পূর্বাণি যন্ত’ এই বিগ্রহ পক্ষে “তৎ” শব্দের দ্বারা তৃতীয় সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণই গ্রাহ্য। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি পূর্বক যে কোন প্রমাণ জন্ম লিঙ্গ-পরামর্শও অহুমান-প্রমাণ, ইহাও “তৎ পূর্বক” শব্দের দ্বারা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অহুমানাদি পূর্বক অহুমান-প্রমাণেও মহর্ষির এই অহুমান-প্রমাণের লক্ষণ অব্যাহত আছে, তবে পরম্পরায় সকল অহুমান-প্রমাণই প্রত্যক্ষপূর্বক, অহুমানের মূলে প্রত্যক্ষ আছেই, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার কেবল প্রত্যক্ষবিশেষপূর্বক জ্ঞান বলিয়াই অহুমান-প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হয় নাই। তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “তে পূর্বে যন্ত”; এই বিগ্রহ পক্ষেও “তৎ” শব্দের দ্বারা অহুমানাদিও বুঝিতে হইবে। স্মার্যবৃত্তিকে “তে যে প্রত্যক্ষে পূর্বে যন্ত” এই বাক্যে প্রত্যক্ষ শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা যে কোনরূপে যথার্থ লিঙ্গপরামর্শ হইলেই তাহা যথার্থ অহুমিতি

জন্মাইরা থাকে ; সুতরাং তাহা অনুমান-প্রমাণ । “তৎপূর্বং যন্ত” এই বিগ্রহপক্ষে “তৎ” শব্দের দ্বারা ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এবং দ্বিতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষ এবং পূর্বোক্ত প্রকার লিঙ্গদ্বয়িত্ব এই তিনটিকে এক সঙ্গে ধরিয়া তজ্জনিত লিঙ্গপরামর্শ ই অনুমান-প্রমাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে । ঐ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইলেও উহাদিগের ভেদ বিবক্ষা না করিয়াই “তৎ” শব্দের দ্বারা এক সঙ্গে ঐ তিনটি গ্রহণ করা হইয়াছে ।

ভাষ্য । পূর্ববদ্বিতি যত্র কারণেন কার্যমনুমীয়তে যথা মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি স্থিতিরिति । “শেষবৎ” তৎ যত্র কার্যেণ কারণমনুমীয়তে, পূর্বোদকবিপরীতমুদকং নদ্যাঃ পূর্ণত্বং শীত্ৰত্বঞ্চ দৃষ্ট্বা স্রোতসোহনুমীয়তে ভূতা স্থিতিরिति । “সামান্যতো দৃষ্টং” ত্রজ্যাপূর্বকমন্যত্রদৃষ্টস্থান্যত্র দর্শন-মিতি তথা চাদিত্যস্ত, তস্মাদস্ত্যপ্রত্যক্ষাপ্যাদিত্যস্ত ত্রজ্যোতি ।

অনুবাদ । যে স্থলে (যে অনুমানস্থলে) কারণের দ্বারা (কারণবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা) কার্য (সেই কারণের ব্যাপক কার্য) অনুমিত হইয়া থাকে, সেই অনুমান “পূর্ববৎ” এই নামে কথিত । (উদাহরণ) যেমন মেঘের উন্নতি-বিশেষের দ্বারা (তাহার জ্ঞানের দ্বারা) স্থিতি হইবে, ইহা অনুমিত হয় । যে স্থলে কার্যের দ্বারা (কার্যবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা) কারণ (সেই কার্যের ব্যাপক কারণ) অনুমিত হইয়া থাকে, সেই অনুমান “শেষবৎ” । (উদাহরণ) যেমন নদীর পূর্বস্থিত জলের বিপরীত জলরূপ পূর্ণতা এবং স্রোতের প্রখরতা-বিশেষ দেখিয়া স্থিতি হইয়াছে, ইহা অনুমিত হয় । অন্যত্র দৃষ্ট পদার্থের অন্যত্র অর্থাৎ অপর স্থানে দর্শন ত্রজ্যাপূর্বক, অর্থাৎ তাহার গতিপূর্বক হয় ; সূর্যেরও তদ্রূপ, অর্থাৎ এক স্থানে দৃষ্ট সূর্যের স্থানান্তরে দর্শন হয় । অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও অর্থাৎ সূর্যের গতি প্রত্যক্ষ না হইলেও সূর্যের গতি আছে, এই প্রকার অনুমান “সামান্যতো দৃষ্ট” ।

টিপ্পনী । অনুমান-প্রমাণের “পূর্ববৎ” প্রভৃতি সূত্রোক্ত প্রকারত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন । কারণ ও কার্যের মধ্যে কারণটি “পূর্ব”, কার্যটি “শেষ”, তাই “পূর্ব” শব্দ কারণার্থে এবং “শেষ” শব্দ কার্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । “পূর্ববৎ” ও “শেষবৎ” এই দুই স্থলে অন্ত্যার্থে “নতুপ্” প্রত্যয় বিহিত হইলে “পূর্ব” অর্থাৎ কারণ বাহাতে বিষয়রূপে বিদ্যমান এবং “শেষ” অর্থাৎ কার্য বাহাতে বিষয়রূপে বিদ্যমান, এইরূপ অর্থ যথাক্রমে ঐ দুইটি শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে । তাহা হইলে “পূর্ববৎ” বলিতে কারণ-বিষয়ক জ্ঞান এবং “শেষবৎ” বলিতে কার্য-বিষয়ক জ্ঞান, ইহা বুঝা যায় । কারণহেতুক অনুমান কারণবিষয়ক জ্ঞানবিশেষ এবং কার্যহেতুক অনুমান কার্যবিষয়ক জ্ঞানবিশেষ । সুতরাং এ পক্ষে কারণহেতুক অনুমান ও কার্যহেতুক

অনুমানই বধাক্রমে “পূর্ববৎ” ও “শেষবৎ” এই দুইটি নামের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কার্য্যমাত্রই কারণের অনুমাপক নহে। ধূমমাত্রই বহির কার্য্য হইলেও যে কোন ধূমজ্ঞানে বহির অনুমান হয় না। কারণ, বহিঃ ধূমমাত্রের ব্যাপক নহে, বিশিষ্ট ধূমেরই ব্যাপক। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও “হেতুভাসসামান্যনিক্তিদীপ্তি” গ্রন্থে বিশিষ্ট ধূমকেই বহির অনুমানে “সং হেতু” বলিয়াছেন। ফলতঃ কার্য্যবিশেষই তাহার ব্যাপক কারণের অনুমাপক এবং কারণ-বিশেষই তাহার ব্যাপক কার্য্যের অনুমাপক। এবং ঐ কার্য্যবিশেষ এবং কারণ-বিশেষের জ্ঞানের দ্বারাই অনুমিতি হয়। কার্য্য ও কারণ পদার্থের দ্বারা অনুমিতি হয় না। সূত্ররাং—“যত্র কারণেন কার্য্যমনুমীয়তে” এবং “যত্র কার্য্যেন কারণমনুমীয়তে,” এই ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা সেইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। মেঘের উন্নতি-বিশেষ বুটীর কারণ এবং নদীর পূর্ণতা-বিশেষ ও স্রোতের প্রধরতা-বিশেষ বুটীর কার্য্য। ভাষ্যে “পূর্ববদিতি” এই স্থলের “ইতি” শব্দটি নামব্যঞ্জক। যেখানে প্রকৃতসাধ্য ব্যক্তি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, কোন হেতুতেই তাহার ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সামান্যতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয়-বশতঃ তাহার অনুমিতি হয়—সেই স্থলীয় অনুমানের নাম “সামান্যতো দৃষ্ট।” স্বর্ঘ্যের গতি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সূত্ররাং তাহার ব্যাপ্তিনিশ্চয় কোনও পদার্থেই সম্ভব নহে। কিন্তু সামান্যতঃ দেখা যায়, এক স্থানে দৃষ্ট পদার্থের অস্ত্র স্থানে দর্শন তাহার গতি ব্যতীত হয় না। এক স্থানে দৃষ্ট স্বর্ঘ্যের অস্ত্র স্থানে দর্শন হইতেছে, সূত্ররাং স্বর্ঘ্য গতিমান। এইরূপ অনুমান সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়-জ্ঞাত। স্থায়বর্ত্তিককার ভাষ্যকারের এই অনুমানে দোষ প্রদর্শন করিয়া প্রকারান্তরে অনুমান-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও ইহার পরেই কনাস্তরে অন্তরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাষ্য। অথবা পূর্ববদিতি যত্র যথাপূর্বং প্রত্যক্ষভূতয়োঃস্মতর-দর্শনেনাস্মতরস্তাপ্রত্যক্ষস্যানুমানং, যথা ধূমেনাগ্নিরিতি।

অনুবাদ। অথবা যে স্থলে (যে অনুমান স্থলে) যথাপূর্ব প্রত্যক্ষ ভূতপদার্থ-দ্বয়ের—অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে যে দুইটি পদার্থ যেরূপে প্রত্যক্ষ বা প্রমাণ-স্বরের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছিল, ব্যাপ্যব্যাপকভাব-সম্বন্ধযুক্ত সেই দুইটি পদার্থের একতর পদার্থ দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ কোন স্থানে সেই পূর্বজ্ঞাত ব্যাপ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থটির সেইরূপে প্রত্যক্ষ বা যে কোন প্রমাণ-জ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা অপপ্রত্যক্ষ (অনুমিতি স্থানে অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত) অপর পদার্থটির অনুমিতি হয় অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে ব্যাপক পদার্থটি যেরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, সেইরূপে তাহার সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হয়; সেই অনুমান “পূর্ববৎ” এই নামে কথিত। (উদাহরণ) যেমন ধূমের দ্বারা অর্থাৎ রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট বিশিষ্ট ধূমের

সজাতীয় পর্বতাদিগত বিশিষ্ট-ধূমের বিশিষ্ট ধূমরূপে জ্ঞানের দ্বারা অগ্নি (রন্ধন-শালা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট অগ্নির সজাতীয় পর্বতাদিস্থিত বহি) অনুমিত হয় (অর্থাৎ রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকজ্ঞানকালে বহি যে প্রকারে ব্যাপক বলিয়া নির্গত হইয়াছিল, সেই বহির প্রকারেই তাহা পর্বতাদি স্থানে অনুমিত হয়) ।

টিপ্পনী । “পূর্ববৎ” শব্দটি অন্ত্যর্থে “মতুপ্” প্রত্যয় ও ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে “বতি” প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে । “বতি” প্রত্যয়পক্ষে “পূর্ববৎ” শব্দের অর্থ পূর্বতুল্য । ভাষ্যকার কল্পান্তরে সূত্রোক্ত “পূর্ববৎ” শব্দের এই অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।—যে স্থলে পূর্বে অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ জ্ঞানকালে হেতু ও সাধ্য যেরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, সেইরূপে সেই পূর্বজ্ঞাত হেতুর তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের কোন স্থানে সেইরূপে জ্ঞান হইলে সেই পূর্বজ্ঞাত সাধ্যের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের সেইরূপে অনুমিতি হয়, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণ পূর্বতুল্য বলিয়া “পূর্ববৎ” নামে কথিত । রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে যে ধূম ও বে বহি দেখিয়া বিশিষ্ট ধূম মাত্রের বহির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে, পর্ত্তের ধূম ও বহি সে ধূম ও সেই বহি নহে । কিন্তু বিশিষ্ট ধূমরূপে পর্ত্তের ধূম সেই পূর্বদৃষ্ট বিশিষ্ট ধূমের তুল্য বা সজাতীয় । এবং বহিরূপে পর্ত্তের বহি সেই পূর্বদৃষ্ট বহির তুল্য বা সজাতীয় । সুতরাং পর্ত্তে পূর্বজ্ঞাত বিশিষ্ট ধূমের সজাতীয় বিশিষ্ট ধূমের জ্ঞানবশতঃ যখন পূর্বজ্ঞাত বহির সজাতীয় বহির সেই বহিরূপেই অনুমিতি হয়, তখন সেই স্থলের “লিঙ্গপরামর্শ”রূপ অনুমান “পূর্ববৎ” । রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে ধূমদর্শন এবং পর্ত্তে ধূমদর্শন, একপদার্থবিষয়ক না হইলেও তুল্য বা সজাতীয় পদার্থবিষয়ক ; সুতরাং ঐ উভয় দর্শন-ক্রিয়াতেও তুল্যতা আছে । এ জ্ঞাত পূর্বোক্ত “পরামর্শ”রূপ অনুমানপ্রমাণ ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে “বতি” প্রত্যয়ান্ত “পূর্ববৎ” শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে । ভাষ্যে “যথাপূর্বং প্রত্যকভূতয়োঃ” এই স্থলে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, “প্রত্যকভূত” কথাটা প্রদর্শন মাত্র । যে কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের এবং অনুমিতির আশ্রয়ে পূর্বজ্ঞাত ব্যাপ্য পদার্থটির সজাতীয় পদার্থের অনুমানাদির দ্বারা জ্ঞান হইলেও “পূর্ববৎ” অনুমান হইতে পারে । পূর্বে যেরূপে ব্যাপ্যতা ও ব্যাপকতার জ্ঞান হইয়াছিল, সেইরূপে ব্যাপ্য পদার্থের সাজাতীয় পদার্থের জ্ঞানবশতঃ সেইরূপে ব্যাপক পদার্থটির সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হইলেই “পূর্ববৎ” অনুমান হয় ।

ভাষ্য । শেষবাক্যম পরিশেষঃ, স চ প্রসক্তপ্রতিষেধেহ্মত্বপ্রাসঙ্গ্য-শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ—যথা “সদনিত্যমিত্যেবমাদিনা দ্রব্যগুণকর্ম্মণা-মবিশেষেণ সামান্যবিশেষসমবায়োভ্যো নির্ভুক্তস্ত, শব্দস্ত তস্মিন্ দ্রব্যকর্ম্ম-গুণসংশয়ে ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম্ম, শব্দান্তরহেতুত্বাৎ, যন্ত শিষ্যতে সৌহর্যমিতি শব্দস্ত গুণত্বপ্রতিপত্তিঃ ।

অনুবাদ। “পরিশেষ” অনুমানের নাম “শেষবৎ”। সেই “পরিশেষ” বলিতে প্রসক্তের অর্থাৎ যে পদার্থ কোন স্থানে সন্দেহের বিষয় বা আপত্তির বিষয় হয়, এমন পদার্থের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা সে স্থানে তাহার অভাব নিশ্চয় হইলে অতঃপর অপ্রসঙ্গবশতঃ অর্থাৎ যে পদার্থ প্রসক্ত হয় না, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তিবিষয়তা না থাকায়, শিষ্যমাণ পদার্থে অর্থাৎ প্রসক্ত পদার্থের মধ্যে যেটি অবশিষ্ট থাকে, প্রতিষিদ্ধ হয় না, এমন পদার্থ বিষয়ে “সম্প্রত্যয়”—অর্থাৎ সম্যক্ প্রতীতির (যথার্থ অনুমিতির) সাধন। (উদাহরণস্থল দেখাইতেছেন) যেমন—সত্তা ও অনিত্য ইত্যাদি প্রকার দ্রব্য, গুণ ও কর্মের অবিশেষ ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্মনামক কণাদসূত্রোক্ত পদার্থত্রয়ের “সদনিত্য” ইত্যাদি কণাদসূত্র (বৈশেষিক দর্শন, ৮ম সূত্র) বর্ণিত সত্তা ও অনিত্য প্রভৃতি সাধারণ ধর্মজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতি, বিশেষ ও সমবায় হইতে (কণাদোক্ত জ্ঞাতি প্রভৃতি তিনটি নিত্য ভাব-পদার্থ হইতে) “নির্ভুল” অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত শব্দের—(শব্দের কি, তাহা বলিতেছেন) তাহাতে অর্থাৎ শব্দে (পূর্বেবাক্ত সত্তা ও অনিত্য প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধারণ ধর্মজ্ঞানবশতঃ) দ্রব্যকর্মগুণ সংশয় হইলে অর্থাৎ শব্দ দ্রব্য কি না? কর্ম কি না? গুণ কি না? এইরূপে শব্দে দ্রব্য, কর্ম ও গুণের সংশয় হইলে শব্দ—একদ্রব্য-হেতুক অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্য আকাশের ধর্ম বলিয়া দ্রব্য নহে; শব্দ—শব্দান্তরের কারণ-হেতুক অর্থাৎ সজাতীয়ের উৎপাদক বলিয়া কর্ম নহে; বাহ্য কিন্তু অর্থাৎ দ্রব্য, কর্ম ও গুণের মধ্যে যে পদার্থটি অবশিষ্ট থাকিল, এই শব্দ তাহা অর্থাৎ গুণ, এইরূপে (“শেষবৎ” অনুমানের দ্বারা) শব্দের গুণ প্রতাপত্তি অর্থাৎ গুণই সিদ্ধি হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। ‘শিষ্যতে অবশিষ্যতে’ এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বাহ্য অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ প্রসক্তের মধ্যে যেটি কোন প্রমাণের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হয় না, এমন পদার্থকে “শেষ” বলা যায়। “শেষঃ অস্তি অস্ত্র অনুমানস্ত প্রতিপাদ্যতয়া” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পূর্বোক্ত “শেষ” পদার্থটি যে অনুমানের প্রতিপাদ্য, তাহাকে “শেষবৎ” অনুমান বলা যায়। ভাষ্যকার এই করে সূত্রোক্ত “শেষবৎ” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এই শেষবৎ অনুমানের আর একটি প্রসিদ্ধ নাম “পরিশেষ”। তাই বলিয়াছেন—“শেষবদান পরিশেষঃ”। ঐ “পরিশেষ” কাহাকে বলে, তাহা বুঝিলেই “শেষবৎ” অনুমানকে বুঝা যাইবে। তাই বলিয়াছেন—“স চ প্রসক্তপ্রতিষেধে” ইত্যাদি। “পরিশেষ” অনুমানের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া—“যথা সদনিত্যং” ইত্যাদি “নির্ভুল শব্দস্ত” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের গুণ-সাধক অনুমানকে তাহার উদাহরণরূপে সূচনা করিয়াছেন। “তস্মিন্ দ্রব্যকর্মগুণসংশয়ে” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই গুণ-সাধক “শেষবৎ” অনুমানের প্রণালী

প্রদর্শন পূর্বক ঐ উদাহরণটি বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, মহাবি কণাদ
 দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, বিশেষ, সমবায়, এই যে ছয়টি ভাব-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার
 মধ্যে তাহার মতে শব্দ গুণপদার্থ, ইহা “শেববৎ” অল্পমানের দ্বারাই বুঝা যায়। কারণ, মহাবি
 কণাদ “সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্যং কারণং সামান্যবিশেষবদিত্তি দ্রব্যগুণ-কর্মণামবিশেষঃ”
 (৬ম সূত্র) এই সূত্রটির দ্বারা সত্তা ও অনিত্য প্রভৃতি দর্শকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের অবিশেষ
 অর্থাৎ সাধর্ম্য বলিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ দর্শগুলি দ্রব্য, গুণ ও কর্মপদার্থেই থাকে, জাতি, বিশেষ,
 সমবায় এই তিন পদার্থে থাকে না। ঐ দর্শগুলি ঐ জাতি প্রভৃতি তিনটি নিত্য পদার্থের
 বৈদর্শ্য। সুতরাং ঐ সত্তা ও অনিত্য প্রভৃতি সাধর্ম্যগুলি যে পদার্থে আছে, ইহা যথার্থরূপে
 বুঝা যাইবে, সে পদার্থে জাতি, বিশেষ ও সমবায়ের প্রসঙ্গই হইবে না, অর্থাৎ ঐ পদার্থটি
 জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিতই থাকিবে। শব্দ নানাজাতীয়
 সংপদার্থ, এবং তাহার অনিত্য প্রভৃতিও কণাদের সমর্থিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্বোক্ত সত্তা
 অনিত্য প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্যগুলি যখন কণাদের মতে শব্দে আছে, তখন শব্দ
 জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু শব্দে পূর্বোক্ত সত্তা, অনিত্য
 প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য থাকায়, তাহাতে দ্রব্য, কর্ম ও গুণ “প্রসক্ত” হইতেছে।
 অর্থাৎ শব্দে পূর্বোক্ত সত্তা, অনিত্য প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধারণধর্মের জ্ঞানবশতঃ শব্দ
 দ্রব্য কি না? শব্দ কর্ম কি না? শব্দ গুণ কি না? এইরূপে শব্দে দ্রব্য, কর্ম ও গুণের
 সংশয় হইতেছে। এখন যদি শব্দ দ্রব্য নহে এবং কর্ম নহে, ইহা যথার্থরূপে বুঝা যায়, তাহা
 হইলে শব্দ গুণপদার্থ, ইহা নিশ্চিত হইয়া যায়। ফলতঃ তাহাই হইতেছে। কারণ, শব্দ আকাশে
 উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আকাশই শব্দের উপাদান কারণ, ইহাই কণাদের সিদ্ধান্ত। আকাশ দ্রব্যপদার্থ
 এবং এক। সুতরাং শব্দ একমাত্র দ্রব্যসমবেত। অর্থাৎ আকাশনামক একটিমাত্র দ্রব্যই শব্দের
 উপাদান কারণ; সুতরাং বুঝা গেল, শব্দ দ্রব্যপদার্থ নহে। কারণ, দ্রব্য-পদার্থের উপাদান কারণ
 একটিমাত্র দ্রব্য হইতে পারে না, একাধিক দ্রব্যেই জন্ত-দ্রব্যগুলি গঠিত হয়। ভাষ্যে “একদ্রব্যত্বাৎ”
 এই স্থলে “একং দ্রব্যং (সমবায়িতরা) যন্ত” এইরূপ বিগ্রহে “একদ্রব্যত্ব” কথা দ্বারা একমাত্র
 দ্রব্যসমবেতত্ব অর্থই বুঝিতে হইবে। এবং শব্দ কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়াপদার্থও নহে। কারণ, শব্দ
 শব্দান্তরের উৎপাদক। ভাষ্যে “শব্দান্তরহেতুত্বাৎ” এই কথা দ্বারা সজাতীয় পদার্থের উৎপাদকত্ব
 হেতুই সূচিত হইয়াছে। উদ্যোতকর প্রভৃতিও তাহাই বলিয়াছেন। কারণ, সজাতীয়োৎপাদকত্ব-
 হেতুই শব্দে কর্মত্বাভাবের অনুমাপক হয়। প্রথম উৎপন্ন শব্দ তাহার সজাতীয় শব্দান্তর জন্মায়,
 সেই দ্বিতীয় শব্দটি আবার তাহার সজাতীয় শব্দান্তর জন্মায়, এইরূপে বীচিতরত্বের দ্বারা শব্দ হইতে
 শব্দান্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই প্রতিগোচর হইয়া
 থাকে, এই সিদ্ধান্তানুসারে শব্দ সজাতীয়ের উৎপাদক। এই সজাতীয়োৎপাদকত্ব কর্মপদার্থে নাই।
 কারণ, কণাদের মতে উহা দ্রব্য ও গুণপদার্থেরই সাধর্ম্য। কণাদ বলিয়াছেন,—“দ্রব্যগুণয়োঃ
 সজাতীয়রস্তুকত্বং সাধর্ম্যম্”। “দ্রব্যানি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্”। “কর্ম কর্মসাধ্যং

ন বিদ্যতে”। ৯।১০।১১ সূত্র। কর্মকে কর্মান্তরের উৎপাদক বলা যায় না। কারণ, ক্রিয়া-মাত্রই বিভাগজনক। বিভাগ না জন্মাইলে তাহাকে কর্ম বলা যায় না। যখন প্রথম ক্রিয়াই বিভাগ জন্মাইয়াছে, তখন ক্রিয়াজন্ত দ্বিতীয় ক্রিয়া স্বীকার করিলে তাহা আবার কিসের সহিত বিভাগ জন্মাইবে? সংযুক্ত পদার্থেরই বিভাগ হইয়া থাকে, বিভক্তের আবার বিভাগ কি? এই যুক্তি অনুসারে মহাবি কণাদ বলিয়াছেন,—কর্ম কর্মান্তরের উৎপাদক নহে। সূত্রাং সজাতীয়োৎপাদককর্ম নাই। পূর্বোক্ত যুক্তিতে শব্দে উহা আছে; সূত্রাং শব্দ কর্ম নহে। শব্দ কর্ম হইলে সজাতীয় শব্দান্তর জন্মাইত না। এইরূপে অনুমানের দ্বারা শব্দে “প্রসক্ত” দ্রব্য ও কর্মের “প্রতিষেধ” অর্থাৎ অভাব নিশ্চয় হইলে “অন্তজ” অর্থাৎ জাতিত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্বে “অপ্রসক্ত”-বশতঃ অর্থাৎ প্রসক্তি না থাকার প্রসক্ত দ্রব্য, কর্ম ও গুণত্বের মধ্যে কেবল গুণত্বই “শিষ্যমাণ” অর্থাৎ “শেষ” থাকিল। শব্দের গুণত্ব-প্রতিষেধক কোন প্রমাণও নাই, সূত্রাং শব্দ গুণপদার্থ, ইহা যথার্থরূপে বুঝা গেল। এইরূপে শব্দে গুণত্বরূপ “শেষ” পদার্থ-বিষয়ক যে অনুমিতি, তাহার করণ লিঙ্গপরিমর্শকে “শেষ” পদার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া ভাষ্যকার “শেষবৎ” অনুমানের উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “শেষবৎ” অনুমানের ভাষ্যোক্ত এই উদাহরণ আদরণীয় নহে। কারণ, “শেষবৎ” ও “পরিষেধ” “ব্যতিরেকী” অনুমানেরই নামান্তর। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উদাহরণটি “ব্যতিরেকী” অনুমান নহে; এটি “অবয়-ব্যতিরেকী”। তাৎপর্য-টীকাকার পরে “সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী”তেও “শেষবৎ” অনুমানের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বাংলায়নের “প্রসক্ত প্রতিষেধে” ইত্যাদি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু ভাষ্যকারের এই উদাহরণটি সেখানেও গ্রহণ করেন নাই। “অবয়ী”, “ব্যতিরেকী” এবং “অবয়-ব্যতিরেকী” এই ত্রিবিধ নামেও অনুমান ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নব্য নৈয়ারিকগণ এই ত্রিবিধ নামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেও ঐ তিনটি নাম তাঁহাদিগেরই আবিস্কৃত নহে। পরমপ্রাচীন উদ্যোতকর “জ্ঞানবার্তিক”ে সূত্রোক্ত “ত্রিবিধঃ” এই কথাটির ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ “অবয়ী ব্যতিরেকী অবয়ব্যতিরেকী চ” এইরূপ বিভাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের ব্যাখ্যা “অবয়ব” পদার্থের ব্যাখ্যাত্বলে প্রকটিত হইবে। ভাষ্যকার বাংলায়ন এখানে “পরিষেধ” অনুমানকেই “শেষবৎ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রসক্তের মধ্যে যেটি শেষ থাকে, সেই শেষ পদার্থের প্রতিপাদক অনুমানই “পরিষেধ”, তাহাই “শেষবৎ”।

ভাষ্য। সামান্যতো দৃষ্টং নাম যত্রাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে কেনচিদর্থেন লিঙ্গস্য সামান্যাদপ্রত্যক্ষে লিঙ্গী গম্যতে, যথেষ্টাদিভিরাহ্মা, ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ, গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ, তদ্বদেবাং স্থানং স আভ্যন্তি।

১। “পরিষেধ” শব্দটি মহাবি শ্রোতসের সূত্রেও পাওয়া যায়। “পরিষেধাব্যবোধোক্তহেতুপপত্তেঃ”। ৩২।৪১ সূত্র। এই সূত্রে “পরিষেধ” শব্দের দ্বারা মহাবি যে প্রকার অনুমান-প্রমাণ স্থচনা করিয়াছেন, ভাষ্যকার সূত্রানুসারে তাঁহা লক্ষ্য করিয়া এখানে “শেষবৎ” অনুমানের ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা মনে হয়।

অনুবাদ। যে স্থলে (যে অনুমানস্থলে) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (প্রকৃত হেতু ও প্রকৃত সাধ্যের) সম্বন্ধ (পূর্ববর্ণিত ব্যাপ্যব্যাপকভাবসম্বন্ধ) অপ্রত্যক্ষ হইলে (লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলে) কোন পদার্থের সহিত (ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞায়মান যে কোন পদার্থের সহিত) লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃত হেতুর সমানতা প্রযুক্ত (সেই লিঙ্গের দ্বারা) “অপ্রত্যক্ষ” অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য “লিঙ্গী” (সাধ্য) অনুমিত হয়, সেই অনুমানের নাম “সামান্যতো দুষ্ট” । (উদাহরণ) যেমন ইচ্ছাদির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয় । (কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছেন) ইচ্ছা প্রভৃতি পদার্থ গুণ, (গুণপদার্থ), গুণগুলি আবার দ্রব্যাপ্রিত ; অতএব ইহাদিগের অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের বাহা আশ্রয়, তাহা আত্মা ।

টিপ্পনী। “পূর্ববৎ” অনুমানের সাধ্য বহি প্রভৃতি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে ; সুতরাং ধুম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদার্থের সহিত তাহার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ও ইহা থাকে । কিন্তু যে পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, কোন পদার্থের সহিতই তাহার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ;— যেমন ইন্দ্রিয় ও আত্মা প্রভৃতি পদার্থ । দেহাদি হইতে বিভিন্ন আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে ; সুতরাং ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও তাহার সহিত ঐ আত্মার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কিন্তু যাহা গুণ-পদার্থ, তাহা দ্রব্যাপ্রিত অর্থাৎ কোন দ্রব্যে থাকে ; এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থের সহিত দ্রব্যাপ্রিতত্বের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । তাহার ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি দ্রব্যাপ্রিত, যেহেতু তাহারা গুণপদার্থ ; এইরূপে ইচ্ছাদি পদার্থে দ্রব্যাপ্রিতত্বের অনুমান হয় । তাহার পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কোন দ্রব্যের আশ্রিত নহে, ইহা বুঝিলে উহাদিগের আশ্রয়রূপে দেহাদি হইতে বিভিন্ন লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য যে দ্রব্য-পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহারই নাম আত্মা । তাহাই পূর্বোক্তরূপে “সামান্যতো দুষ্ট” অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় । ইহাই ভাব্যকারের তাৎপর্য । স্মারবাস্তিক-কার ও তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই স্থলে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রতা অর্থাৎ পরাশ্রিতত্বই “সামান্যতো দুষ্ট” অনুমানের সাধ্য । আত্মা ঐ অনুমানের সাধ্য নহে । ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রতা লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য । কিন্তু সামান্যতঃ যাহা গুণপদার্থ, তাহা পরতন্ত্র ; এই-রূপে গুণপদার্থে পরতন্ত্রতার ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ ইচ্ছা প্রভৃতি পদার্থেও পরতন্ত্রতা সিদ্ধ হইয়া যায় ; কারণ, তাহারাও গুণপদার্থ । তাহার পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি অন্ত কোন দ্রব্যাপ্রিত হইতে পারে না, অর্থাৎ উহারা দেহাপ্রিত নহে,—ইন্দ্রিয়াপ্রিত নহে, ইত্যাদিরূপে অন্তান্ত দ্রব্যগুলির আশ্রিত নহে, ইহা বুঝিলে শেষে অতিরিক্ত কোন দ্রব্যাপ্রিত, ইহাই বুঝা যায় । ঐ অতিরিক্ত দ্রব্যই আত্মা । ফলতঃ পূর্বোক্তরূপে ইচ্ছা প্রভৃতির আত্মতন্ত্রতাই শেষে বুঝা যায় । তাৎপর্য-টীকাকার ঐ আত্মতন্ত্রতা-সাধক অনুমানকেই পূর্বোক্ত “শেষবৎ” অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন এবং

ইচ্ছা প্রভৃতির পরতত্ত্ব-সাধক অহুমানই এখানে “সামান্ততো দৃষ্ট” অহুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। মহর্ষি কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতিকে আশ্রয়ই লিপ্ত বলিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যথাস্থানে প্রকটিত হইবে। (১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে—ত্রিবিধবচনং মহতো মহাবিষয়স্তায়াস্তলঘৌর্যমা সূত্রে নোপদেশাৎ পরং বাক্যলাঘবং মন্যমানস্তায়াস্মিন্ বাক্যলাঘবেহ্নাদরঃ। তথা চায়মস্তেথস্তুতেন বাক্যবিকল্পেন প্রবৃত্তঃ সিদ্ধান্তে ছলে শব্দাদিষু চ বহুলং সমাচারঃ শাস্ত্রে ইতি।

অনুবাদ। “ত্রিবিধঃ” এই বিভাগ-বাক্য হইতেই সিদ্ধ হইলেও (অর্থাৎ পূর্ববৎ প্রভৃতি তিন প্রকার অনুমান মহর্ষির মত, ইহা বুঝা গেলেও) “ত্রিবিধবচনং” অর্থাৎ “পূর্ববৎ” প্রভৃতি নামোল্লেখ “পূর্ববৎ” প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের উক্তি—মহান্ অর্থাৎ ত্রিবিধ এবং মহা বিষয়—অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাহার বিষয়, এমন আয়ের (অনুমানের) অতি লঘু একটি সূত্রের দ্বারা (“তৎপূর্বকং” ইত্যাদি ক্ষুদ্র একটিমাত্র সূত্রের দ্বারা) উপদেশ করায়, যিনি অত্যন্ত বাক্যলাঘব মনে করিয়াছেন, তাঁহার (শিষ্যদিগকে ব্যুৎপন্ন করিতে ইচ্ছুক সূত্রকার মহর্ষি গোতমের) অন্য বাক্য-লাঘবে অর্থাৎ ইহার অপেক্ষায় আরও বাক্য সংক্ষেপে “অনাদরঃ”—অর্থাৎ ঐ উক্তি বাক্যসংক্ষেপে অনাদরপ্রযুক্ত। (এই আয়সূত্রে অগত্যও ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন)। “শাস্ত্রে” (এই আয়দর্শনে) “সিদ্ধান্তে”, “ছলে” এবং শব্দ-প্রমাণাদিতে (ঐ সমস্ত পদার্থ-বোধক সূত্রে) ইহার অর্থাৎ সূত্রকার মহর্ষি গোতমের সেই প্রকার অর্থাৎ এই সূত্রে “ত্রিবিধ” বচনের আয় এই সমাচার (সূত্রে অত্যন্ত বাক্য-সংক্ষেপ না করিয়া বাক্য-প্রয়োগ) এবমুত বাক্য-বৈচিত্র্যের দ্বারা বহুতর প্রবৃত্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি “অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমহুমানং” এই পর্য্যন্ত সূত্র বলিলেই “ত্রিবিধঃ” এই বিভাগ-বাক্যের দ্বারা পূর্ববৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ অহুমান বুঝা যায়; কারণ, অহুমানের প্রকার-ভেদ বিষয়ে চিন্তা করিলে উদাহরণ পর্য্যালোচনার দ্বারা “পূর্ববৎ” প্রভৃতি তিনটি প্রকারই বুদ্ধির বিষয় হয়, “পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্ততো দৃষ্টকং”—এই অংশের দ্বারা মহর্ষি বাক্যগৌরব করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার “বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে” এই কথা দ্বারা এই প্রশ্নের সূচনা করিয়া তত্ত্বতরে বলিয়াছেন যে, অহুমান মহান্ ও মহাবিষয়, একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র সূত্রের দ্বারা ইহার উপদেশ করিয়া মহর্ষি অত্যন্ত বাক্যলাঘব মনে করিয়াছেন। সেই একটি সূত্রের মধ্যেও যে আরও বাক্যলাঘব করা, তাহা মহর্ষি কর্তব্য মনে করেন নাই। তাহা

হইলে এই চক্রহ তৎ আরও অতি চক্রহ হইয়া পড়ে। মহর্ষি ইহার পরেও “সিদ্ধান্ত”, “ছল” ও শব্দ-প্রমাণ প্রভৃতির উপদেশ করিতে এইরূপ অত্যন্ত বাক্য-লাঘবের আদর করেন নাই। সেই সব স্থলে স্পষ্ট করিয়াই তাহাদিগের প্রকার-ভেদের কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার সমর্থন করিতেছেন যে, স্বত্রগ্রন্থে বাক্যলাঘব কর্তব্য হইলেও স্তায়-স্বত্রকার মহর্ষি কোন স্থলেই অত্যন্ত বাক্য-লাঘবের আদর করেন নাই। স্বত্রবাক্যের এইরূপ গৌরব-সমর্থনে ভাষ্যকারের এইরূপ প্রায়শ দেখিয়া কেহ কেহ অস্বস্তি করেন যে, পূর্বকালে স্তায়-স্বত্রের প্রকৃত পাঠ অনেক স্থলে লুপ্ত ও বিকৃত হইয়াছিল, ভাষ্যকার তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। অবশ্য এ অস্বস্তির অস্তিত্ব হেতুও আছে। বাচস্পতি মিশ্রের “স্বায়ম্বূচী-নিবন্ধ” রচনার প্রয়োজনও তাবিবার বিষয়। “বিভাগবচনাদেব” ইত্যাদি ভাষ্য পাঠ করিলে স্বত্রে “ত্রিবিধঃ” এই কথাটি কেন? ইহাই মূল প্রশ্ন বলিয়া মনে আসে। কিন্তু “ত্রিবিধমিতি” এই “ইতি” শব্দ-যুক্ত বাক্যের দ্বারা স্বত্রে “ত্রিবিধঃ” এই বিভাগ-বাক্যটির স্বরূপই বুঝা যায়। উহার দ্বারা ত্রিবিধ স্বত্রে সহজে বুঝা যায় না। এবং “ত্রিবিধবচনঃ” এই কথার দ্বারা ত্রিবিধের বচনই সহজে বুঝা যায়, “ত্রিবিধঃ” এই বাক্যের বচন বুঝা যায় না। মূল কথা, “ত্রিবিধে সিদ্ধে ত্রিবিধমিতি বচনঃ” এইরূপ ভাষ্য থাকিলেই ঐরূপ অর্থ সহজে গ্রহণ করা যায়। মনে হয়, এই সমস্ত কথা মনে করিয়াই ভাষ্য-প্রবীণ বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন,—“ত্রিবিধমিতি বিভাগবচনাদেব সিদ্ধে”, “পূর্ববদাদৌ সিদ্ধে”, “ত্রিবিধবচনঃ ত্রিবিধস্ত পূর্ববদাদেবর্কচনঃ উক্তিঃ।” অনুবাদে মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। স্বত্রকারের “ত্রিবিধবচন” অত্যন্ত বাক্যলাঘবে “অনাদর” প্রযুক্ত। তাই ভাষ্যকার ঐ ত্রিবিধবচনকে বাক্যসংক্ষেপে অনাদর বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। মূৰ্খতাপ্রযুক্ত কোন কার্য হইলে তাহাকে মূৰ্খতা বলিয়াও বলা হয়। ঐ কার্যে মূৰ্খতাই প্রধান হেতু, ইহা বুঝাইবার জন্য তাহাকে মূৰ্খতার সহিত অভিন্নভাবেই উল্লেখ করা হয়, তজ্জপ মহর্ষির এই স্বত্রে যে পূর্ববৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ বচন, তাহার প্রতিও অস্ত কোনও হেতু নাই, অত্যন্ত বাক্য-সংক্ষেপে অনাদরই উহার মূল, ইহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার উহাকে বাক্যলাঘবে অনাদর বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্য। সন্নিবয়ঞ্চ প্রত্যক্ষং সদসন্নিবয়ঞ্চানুমানম্। কস্মাৎ? ত্রৈকাল্যগ্রহণাৎ, ত্রিকালযুক্তা অর্থা অনুমানেন গৃহ্যন্তে, ভবিষ্যতীত্যনুমীয়াতে ভবতীতি চাভূদিতি চ। অসচ্চ খল্বতীতমনাগতক্ষেতি।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ (লৌকিক প্রত্যক্ষ) সন্নিবয় অর্থাৎ বর্তমানবিষয়ক। অনুমান সন্নিবয়ক ও অসন্নিবয়ক অর্থাৎ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎবিষয়ক। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) ত্রৈকাল্য গ্রহণ বশতঃ। বিশদার্থ এই যে,—“অনুমানে দ্বারা ত্রিকালযুক্ত অর্থ (বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ) গৃহীত (জ্ঞাত) হইয়া থাকে।

হইবে ইহা অনুমিত হইয়া থাকে, হইতেছে ইহা এবং হইয়াছে ইহাও অনুমিত হইয়া থাকে। “অসং” বলিতে (অর্থাৎ “সদসম্বন্ধবিশয়কানুমানং” এই পূর্বোক্ত বাক্যে “অসং” শব্দের অর্থ) অতীত এবং ভবিষ্যৎ।

টিপ্পন। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান ভিন্ন, ইহা লক্ষণ ভেদ করিয়াই স্বতন্ত্রকার মহর্ষি দেখাইয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ দুইটির বিষয়-ভেদপ্রযুক্তও ভেদ বলিতেছেন। এখানে ভাষ্যে “প্রত্যক্ষ” শব্দ ও “অনুমান” শব্দ প্রমিতি অর্থেই প্রযুক্ত। ভাবার্থে অনট্ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ “অনুমান” শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার দ্বারা অনুমিতিই বুঝা যায়। ঐ প্রত্যক্ষ প্রমিতি এবং অনুমিতিক্রম প্রমিতি তৃতীয় স্বতন্ত্র-ভাব্য-বর্ণিত হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের প্রতি প্রমাণও হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনুমান-প্রমাণের বিষয়-ভেদ বলিলেও বলা যায়। এবং এই স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষই বুঝিতে হইবে; কারণ, সিদ্ধ বোগিগণের অলৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান বিষয়ক নহে, তাহার সহিত অনুমানের ভাষ্যোক্ত বিষয়-ভেদ নাই। লৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান-বিষয়ক। অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু অনুমানক সংস্কার নাহায়ে অনুমিতি হইয়া থাকে। ভাষ্যে “ত্রৈকাল্য” শব্দের দ্বারা “ত্রিষু কালেষু স্থিতাঃ” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে কালত্রয়বর্ষী অর্থই বুঝিতে হইবে।

অনুমান বুঝিতে হইলে পক্ষ, সাধ্য, সংস্কার, অসংস্কার, ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তিজ্ঞান, লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শ—এই পদার্থগুলি মনে রাখিতে হইবে। যে স্থানে অনুমিতি হয়, তাহাকে “পক্ষ” বা আশ্রয় বলে। সেই পক্ষে যে ধর্মটির অনুমিতি হয়, তাহাকে সাধ্য ধর্ম বলে। এই সাধ্য-ধর্ম-বিশিষ্ট পক্ষরূপ ধর্মীও অনুমানের পূর্বে অসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞানস্বত্রে ও ভাষ্যে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। যে হেতুতে কোন দোষ নাই অর্থাৎ হেতুভাস নহে, তাহাকে সংস্কার বলে। যে হেতু ত্রুটি অর্থাৎ হেতুভাস, তাহাকে অসংস্কার বলে। হেতুভাসের পরিচয় মহর্ষি নিজেই দিয়াছেন। পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মযুক্ত কোন স্থানে থাকিয়া সাধ্যস্বত্বস্থানমাত্র না থাকাকে সাধ্যের “ব্যাপ্তি” বলে। স্থলবিশেষে “ব্যাপ্তির” অন্তরূপ লক্ষণও বলিতে হইবে। ব্যাপ্তি-বিশিষ্টকে “ব্যাপ্য” বলে। সাধ্যের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পদার্থ সাধ্যের ব্যাপ্য। বাহার ব্যাপ্য, তাহাকে “ব্যাপক” বলে। এই হেতু এই সাধ্যের ব্যাপ্য, এইরূপ জ্ঞানকে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান বলে। এই সাধ্য ব্যাপ্য, এই হেতু এই পক্ষে আছে, এইরূপ জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শ বলে। ইহার পরেই “এই পক্ষ এই সাধ্যযুক্ত”, এইরূপে যথার্থানে প্রকৃত সাধ্যের অনুমিতি হয়। তাহার পরে সেই অনুমিত পদার্থের গ্রহণ, তাগ অথবা উপেক্ষা হয়। সুতরাং ঐ অনুমিতির পরেই তৃতীয় স্বতন্ত্র-ভাব্য-বর্ণিত হানাদি বুদ্ধিও জন্মে। ঐ “হানাদিবুদ্ধি”রূপ ফলের প্রতি পূর্বজাত অনুমিতিও চরম কারণ বলিয়া প্রমাণ হইবে। ঐ অনুমিতিও স্বতন্ত্রক “তৎপূর্বক” জ্ঞান। জ্ঞানশব্দের অনুমানকাও অতি দুর্লভ। বিচার্য্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্ত নাই। অবয়ব-প্রকরণ, হেতুভাস-প্রকরণ এবং অনুমান-পরীক্ষা-প্রকরণে আরও এই বিষয়ে অনেক কথা উল্লেখ্য ॥৫১

ভাষ্য । অধোপমানম্ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ অনুমান নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) উপমান (নিরূপণ করিতেছেন) ।

সূত্র । প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ । ৩।

অনুবাদ । প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থ-বিশেষের সহিত অদৃষ্ট পদার্থের সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য হইতে যে সাধর্ম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, সেই সাদৃশ্য প্রযুক্ত (সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ বশতঃ) সাধ্যের অর্থাৎ শব্দ-বিশেষের বাচ্য স্বন্ধের সাধন (নিশ্চয়) বাহ্য দ্বারা হয়, তাহা উপমান প্রমাণ ।

ভাষ্য । প্রজ্ঞাতেন সামান্যাত্ প্রজ্ঞাপনীয়স্ত প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি । “যথা গোরেবং গবয়” ইতি । কিং পুনরুপমানেন ক্রিয়তে ? যদা ধ্বয়ং গবা সমানধর্ম্যং প্রতিপদ্যতে তদা প্রত্যক্ষতন্তমর্থং প্রতিপদ্যত ইতি । সমাখ্যাসম্বন্ধপ্রতিপত্তিরূপমানার্থ ইত্যাহ । “যথা গোরেবং গবয়” ইতুপমানে প্রযুক্তে গবা সমানধর্ম্যাণমর্থমিঙ্গিয়ার্থসমিকর্ষাভুপলভমানোহস্তু গবয়শব্দঃ সংজ্ঞেতি সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যত ইতি । “যথা মুদগস্তথা মুদগপর্ণী”, “যথা মাষস্তথা মাষপর্ণী” তুপমানে প্রযুক্তে উপমানাত্ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যমানস্তামোষধীং ভৈষজ্যায়াহরতি । এব-মন্যোহপুপমানস্ত লোকে বিধয়ো বুভুৎসিতব্য ইতি ।

অনুবাদ । প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত (প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত পদার্থ-বিশেষের সহিত) সমানতা-প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য হইতে পরিজ্ঞাত সাদৃশ্য-প্রযুক্ত (সেই সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষবশতঃ) প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের (সংজ্ঞাবিশেষের বাচ্যরূপে প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থ-বিশেষের অথবা অর্থ-বিশেষে শব্দ-বিশেষের বাচ্য স্বন্ধের) প্রজ্ঞাপন “উপমান” (উপমিতি) । (উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য উপমিতির মূল সাদৃশ্য-বোধক প্রসিদ্ধ আপ্তবাক্যটির উল্লেখ করিতেছেন) “যেমন গো এইরূপ গবয়” । (পূর্বপক্ষ) এই স্থলে উপমান প্রমাণ কি করিতেছে ? যে সময়ে ব্যক্তি-বিশেষ (গবয় পশুতে) গোর সমান ধর্ম্য (সাদৃশ্য) জানে (প্রত্যক্ষ করে,) তখন প্রত্যক্ষের দ্বারাই সেই পদার্থকে (গবয়কে) জানে । (অর্থাৎ ঐ স্থলে গবয়-

পশুজ্ঞানের জ্ঞান উপমান নামক অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন কি? গবয়ে।
 সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকালে গবয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। (উত্তর) সমাখ্যার
 (সংজ্ঞাশব্দবিশেষের) “সম্বন্ধপ্রতিপত্তি” অর্থাৎ অর্থবিশেষে বাচ্যসম্বন্ধ জ্ঞান
 (শক্তিজ্ঞান) উপমান প্রমাণের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, ইহা (মহর্ষি গোতম)
 বলিয়াছেন। (প্রকৃতস্থলে ইহা বিশদ করিয়া বুঝাইতেছেন) “যেমন গো, এইরূপ
 গবয়” এই উপমান (অর্থাৎ উপমিত্তির মূল-সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য) “প্রযুক্ত”
 হইলে অর্থাৎ কোন বোন্ধা ব্যক্তির নিকটে কথিত হইলে (সে বোন্ধা ব্যক্তি কোন
 স্থানে) গোর সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থকে (গো-সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয় পশুকে)
 ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নির্কর্ষবশতঃ উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতঃ গবয়শব্দ ইহার
 (এই দৃশ্যমান পশু-বিশেষের) সংজ্ঞা (নাম)—এইরূপে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ
 অর্থাৎ গবয় ও “গবয়” শব্দের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ বুঝিয়া থাকে। (উপমানের
 আরও একটি স্থল দেখাইতেছেন) (২) “যেমন মুদগ, সেইরূপ মুদগপর্ণী” (এবং)
 “যেমন মাষ, সেইরূপ মাষপর্ণী” এই উপমান (উপমিত্তির মূল-সাদৃশ্য-বোধক
 আপ্তবাক্য) প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসু বোন্ধার নিকটে কথিত হইলে
 (ঐ ব্যক্তি) উপমান প্রমাণ হইতে (পূর্বেবাক্ত প্রকারে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ অর্থাৎ
 সেই ওষধিবিশেষ ও মুদগপর্ণী শব্দের এবং সেই ওষধিবিশেষ ও মাষপর্ণী শব্দের
 বাচ্যবাচকতা-সম্বন্ধ বোধ করতঃ এই ওষধীকে (মুদগপর্ণী নামক এবং মাষপর্ণী
 নামক ওষধীবিশেষকে) ওষধের জ্ঞান আহরণ করে। এইরূপ অন্যও অর্থাৎ ইহা
 ভিন্নও জগতে উপমান প্রমাণের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।

টিপ্পনী। “গবয়” নামে একপ্রকার অরণ্য পশু আছে। যাহাকে দেশবিশেষে “নীলগাই”
 বলে। নগরবাসী গবয় পশু দেখেন নাই; কিন্তু বিজ্ঞ অরণ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছেন—গবয়
 পশু দেখিতে গো-পশুর মত। পরে নগরবাসী কোন কারণে অরণ্যে গমন করিয়া এক দিন
 একটি গবয় পশু দেখিলেন; তখন ঐ অদৃষ্টপূর্ব পশুতে তাহার পূর্ব-প্রজ্ঞাত গো-পশুর সাদৃশ্য
 প্রত্যক্ষ হইল, তাহার পরেই পূর্বজ্ঞাত অরণ্যবাসীর সেই বাক্যের অর্থ স্বরণ হইল। তাহার
 পরেই নগরবাসী নিশ্চয় করিলেন, ইহার নাম গবয়। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ গবয়-বিশিষ্ট পশুমাত্রই
 গবয় শব্দের বাচ্য। এইরূপে তিনি গবয় পশু ও গবয় শব্দের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন।
 তাহার এই সম্বন্ধ-নির্ণয় পূর্বজ্ঞাত সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষরূপ উপমান প্রমাণের ফল। উহারই নাম
 “উপমিতি।”

ঐ স্থলে গবয় পশুর প্রত্যক্ষ এবং তাহাতে গো-সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাই

হইতেছে; কিন্তু গবয়বিশিষ্ট পশুমাংসে গবয় শব্দের বাচ্যত্ব সন্দ্বন্ধ নির্ণয় এই স্থলে অল্প কোন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে না। এই স্থলে তদ্বিষয়ে অল্প কোন প্রমাণই উপস্থিত নাই। যে প্রমাণের দ্বারা এই স্থলে পূর্বোক্ত সন্দ্বন্ধ নির্ণয় হয়, তাহারই নাম উপমান প্রমাণ। পরীক্ষা-প্রকরণে এই সব কথা বিশেষরূপে সমর্থিত হইবে। স্বত্রে “প্রসিদ্ধসাধন্যং” এই স্থলে তৃতীয়া-তৎপুংস্ব সমাসই ভাষ্যকারের অভিপাত। তাই ভাষ্যকার স্বত্রে এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রজ্ঞাতেন সামান্যতঃ।” স্বত্রে “সাধ্যসাধনং” এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রজ্ঞাপনীরস্ত প্রজ্ঞাপনম্।” প্রমাণ কর্তৃক প্রমাতা প্রজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। স্বতরাং প্রজ্ঞাপন প্রমাণেরই ব্যাপার। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার উপমান প্রমাণের ফল উপমিতিকে “প্রজ্ঞাপন” বলিয়াছেন। পরে সংজ্ঞাসংজ্ঞিসংজ্ঞা-নির্ণয়ই উপমানের ফল অর্থাৎ “উপমিতি”, ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। সংজ্ঞাসংজ্ঞিসংজ্ঞা অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দ-বিশেষের বাচ্যত্ব সন্দ্বন্ধই উপমান প্রমাণের সাধ্য, অর্থাৎ সাদৃশ্যবোধক বাক্য বক্তার প্রজ্ঞাপনীর; তাই স্বত্রে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। সেই সাধকের সাধন অর্থাৎ নিশ্চয় বাহার দ্বারা হয়, তাহা উপমান প্রমাণ। তৎপার্থ্যটীকার স্বত্রে “বতঃ” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রকাশ করিয়াছেন। “সাধ্যসাধন-মুপমানং” এইমাত্র স্বত্রে বলিলে প্রত্যক্ষাদির সাধন এবং সূত্রাদির সাধনও উপমান হইয়া পড়ে; তাই বলিয়াছেন—“প্রসিদ্ধসাধন্যং।” অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাধন্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হওয়া চাই। “প্রসিদ্ধসাধন্যমুপমানং” এইরূপ স্বত্রে বলিলে উপমানাভাসও উপমান লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাই বলিয়াছেন—“সাধ্যসাধনম্।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে সাধ্যসাধন হওয়া চাই। প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত পরবর্তী সাদৃশ্য-জ্ঞান (যেমন গবয় পশুতে গো পশুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ) উপমান প্রমাণ। পূর্বশ্রুত আগ্রবাক্যের অর্থ স্মরণ তাহার ব্যাপার। ব্যাপারই মুখ্য করণ, এই প্রাচীন মতে এই পূর্বশ্রুত আগ্রবাক্যের অর্থ স্মরণই মুখ্য উপমান প্রমাণ। ফলতঃ কেবল সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ উপমিতি হয় না। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের পরে পূর্বশ্রুত সেই সাদৃশ্যবোধক আগ্রবাক্যের অর্থ স্মরণ আবশ্যক। তাহার পরেই পূর্বোক্ত উপমিতি জন্মে।

(২) “মুলাপর্ণী” ও “মাবপর্ণী” নামে একপ্রকার ওষধী-বিশেষ আছে, বাহাকে দেশবিশেষে যথাক্রমে “মুগানি” ও “মাবানি” বলে। উহা বিষনাশক। যিনি উহা কখনও দেখেন নাই, তিনি দ্রব্য-তত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট শুনিলেন—“মুলাপর্ণী” মুদোর দ্বারা এবং “মাবপর্ণী” মাঘের দ্বারা। পরে অরণ্যাদিতে বাইরা কোন ওষধী-বিশেষে মুদোর বিলক্ষণ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার পরেই সেই পূর্বশ্রুত চিকিৎসক-বাক্যের অর্থ স্মরণ হইল, তাহার পরেই সেই ওষধী-বিশেষে “মুলাপর্ণী” শব্দের বাচ্যত্ব সন্দ্বন্ধ নির্ণয় হইল। অর্থাৎ তখন তিনি বুঝিলেন, “ইহারই নাম মুলাপর্ণী।” এইরূপে “মাবপর্ণী” শব্দেরও মাঘসদৃশ ওষধী-বিশেষে বাচ্যত্ব নিশ্চয় হইল। এইরূপে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ এবং সাদৃশ্য-বোধক বাক্যের স্মরণে উদ্ভিদবিশেষের সংজ্ঞাসংজ্ঞিসংজ্ঞা-নির্ণয় অনেক স্থলে অনেকেরই হইয়া থাকে। বাহার হইয়াছে, তিনি স্মরণ করুন। তাহার এই জ্ঞান উপমান প্রমাণের ফল “উপমিতি।”

উপমান ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র একটি নূতন কথা বলিয়াছেন যে, সূত্রে “সাধর্ম্য” শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা ধর্মমাত্রই বুঝিতে হইবে। প্রসিদ্ধ বৈধর্ম্য প্রযুক্তও উপমিতি হয়। তাহার উদাহরণ এই যে, কোন ব্যক্তি “করত” শব্দ উষ্ট্র অর্থাৎ বুঝায়, ইহা জানেন না; কিন্তু একজন বিজ্ঞতম ব্যক্তির নিকটে গুলিলেন,—“করত অতি কুশী, তাহার গ্রীবা ও গুঠ অতি দীর্ঘ, সে অতি কঠোর তীক্ষ্ণ কণ্টক ভক্ষণ করে, সে পশুর মধ্যে অদম।” এই কথাগুলির দ্বারা শ্রোতা করভে অল্প কোন পশুর সাদৃশ্য বুঝিলেন না, কিন্তু করভে অল্প পশুর বৈধর্ম্যই বুঝিলেন। পরে এক দিন কোন স্থানে উষ্ট্র দেখিয়া তাহাতে অতিদীর্ঘ গ্রীবা ও কণ্টক-ভক্ষণ প্রভৃতি অল্প পশুর বৈধর্ম্যগুলির প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার পরেই তাঁহার পূর্বশ্রুত বাক্যের স্মরণ হইল, তাহার পরেই তিনি বুঝিলেন, উষ্ট্র, “করত” শব্দের বাচ্য। অর্থাৎ করত শব্দের অর্থ উষ্ট্র। এই বোধ পূর্বজাত বৈধর্ম্য প্রত্যক্ষ এবং পূর্বশ্রুত বাক্যার্থ স্মরণজ্ঞ; সুতরাং ইহা বৈধর্ম্যোপমিতি। ইহাকে উপমিতি না বলিলে ইহার জন্ত অতিরিক্ত পদম প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, ঐ স্থলে ঐরূপে যে উষ্ট্রে “করত” শব্দের বাচ্য নিশ্চয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে হয় না। সাধর্ম্যপ্রযুক্ত ঐরূপ জ্ঞান বধন মহর্ষি গোত মের মতে অসমিতি নহে, তখন বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত ঐরূপ জ্ঞানও তাঁহার মতে অসমিতি হইতে পারে না। তাৎপর্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, এই জন্তই ভগবান্ ভাষ্যকার উপমানের অন্তঃ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াও অর্থাৎ আর উদাহরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন না থাকিলেও শেষে বলিয়াছেন,—“এবমজ্ঞোহপুপমানস্ত লোকে বিবরো বুভুৎসিতব্যঃ”। অর্থাৎ ইহা ভিন্নও উপমানের বিষয় আছে। জানিতে ইচ্ছা করিয়া অনুসন্ধান করিলে আরও মিলিবে। তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার কথার দ্বারাও এখানে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের কথাও সূত্রকারের কথার স্তায় তিনি প্রমাণ মনে করেন এবং ভাষ্যকারও যে শেষে তাঁহার মতেরই সূচনা করিয়া গিয়াছেন ইহাও তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতির দৃঢ় বিশ্বাস। “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজও মহর্ষি-সূত্রস্থ “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য, এবং ধর্ম এই তিনটিকে গ্রহণ করিয়া উপমিতিকে তিন প্রকার বলিয়াছেন এবং তিনিও ভাষ্যকারকে ভগবান্ বলিয়া ভাষ্যকারের এই কথাটির উল্লেখপূর্বক স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখনাথ কিন্তু ভাষ্যকারের ঐ কথার উল্লেখপূর্বক উদাহরণ বলিয়াছেন যে, মুদগপর্ণীর স্তায় একরূপ ওষধী আছে, তাহা বিষনাশক, এই কথা শুনিয়া কোন স্থানে ঐরূপ ওষধী দেখিলে “এই ওষধী বিষ নাশ করে” এইরূপ নিশ্চয়ও উপমান প্রমাণের ফল। অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের সন্ধননির্ণয় ভিন্ন ঐরূপ তত্ত্বনির্ণয়ও উপমানের দ্বারা হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য বলিয়া বিখনাথের কথায় বুঝা যায়। কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকই এই মত স্বীকার না করিলেও ভাষ্যকারের উহা মত বলিয়া বুঝিবার কারণ আছে। ভাষ্যকারের উহা মত না হইলে তিনি “উপনয়” বাক্যের মূলে অসমমান প্রমাণ আছে, এ কথা বলেন কিরূপে? (৩৯ সূত্র দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

ভাষ্য । অথ শব্দঃ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ উপমান নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) “শব্দ” (শব্দপ্রমাণ) (নিরূপণ করিতেছেন) ।

সূত্র । আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ । ৭ ।

অনুবাদ । আপ্তের অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রত্যাহত ব্যক্তির উপদেশ “শব্দপ্রমাণ” ।

ভাষ্য । আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথা দৃষ্টস্তার্থস্তা চিত্ত্যাপন্নিসয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা । সাক্ষাৎকরণমর্থস্তাপ্তিঃ, তয়া প্রবর্তত ইত্যাশ্রিতঃ । স্বাব্যর্থ্যল্লেক্ষানাং সমানং লক্ষণম্ । তথা চ সর্ব্বেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্তন্ত ইতি । এবমেতিঃ প্রমাণৈর্দেবমনুষ্যতিরশ্চাং ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে নাতোহন্ত্যেতি ।

অনুবাদ । “সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা” (যিনি ধর্ম্ম অর্থাৎ পদার্থকে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সূদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন) এবং যথাদৃষ্ট পদার্থের ব্যাপনেচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ বাক্য-প্রয়োগে কৃতবত্ত, এইরূপ “উপদেষ্টা” অর্থাৎ উপদেশ-সমর্থ ব্যক্তি,—“আপ্ত” । (আপ্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন) অর্থের (পদার্থের) সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সূদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ “আপ্তি” । তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই আপ্তিবশতঃ (বাক্যপ্রয়োগে) প্রবৃত্ত হন, এ জন্ম “আপ্ত” । স্বাধিগণ, আধিগণ এবং লেক্ষণের সম্বন্ধে “লক্ষণ” (পূর্ব্বোক্ত আপ্তলক্ষণ) “সমান” । সেইরূপ বলিয়াই (বিষয়-বিশেষে আপ্ত সকলেরই সমান বলিয়াই) সকলের (স্বাধি হইতে লেক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ব্যক্তির) ব্যবহার প্রবৃত্ত হইতেছে । এইরূপ এই প্রমাণগুলির দ্বারা (ব্যখ্যাত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের দ্বারা) দেবতা, মনুষ্য ও পশুদির অর্থাৎ প্রাণিমাাত্রের ব্যবহার চলিতেছে, ইহার অত্যাধা অর্থাৎ এই প্রমাণগুলি ব্যতীত (কাহারও ব্যবহার) চলে না ।

টীকণী । সূত্রে “আপ্তোপদেশঃ” এই স্থলে বস্তু-তৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকার প্রভৃতির মত । অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকেই মহর্ষি শব্দপ্রমাণ বলিয়াছেন । এখন “আপ্ত” কাহাকে বলে, তাহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার প্রথমতঃ আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং “আপ্ত” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া প্রদর্শিত লক্ষণের সমর্থন করিয়াছেন । প্রাচীন ভাষার পদার্থমাত্র বুঝাইতে “ধর্ম্ম” শব্দও প্রযুক্ত দেখা যায় । যিনি পদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি “সাক্ষাৎ-

কৃতধর্মী"। স্মার-বার্তিককার বলিয়াছেন যে, স্বর্গ, অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতি পদার্থগুলি অশ্রুতাদির লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও সর্বদর্শী সেগুলির অলৌকিক সাক্ষাৎকার করেন; সুতরাং সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদক বাক্য-বক্তাও সর্বদর্শী বলিয়া "সাক্ষাৎকৃতধর্মী"। তাৎপর্যটীকা-কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“স্বদৃঢ় প্রমাণেনাবধারিতাঃ সাক্ষাৎকৃততঃ ধর্মীঃ পদার্থা হিতাহিতপ্রাপ্তি-পরিহারার্থী যেন”। অর্থাৎ তিনি বলেন,—পদার্থের স্বদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণই এখানে ভাষ্যোক্ত পদার্থ-সাক্ষাৎকার। স্বদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ সাক্ষাৎকারের তুল্য, তাই তাহাকে ভাষ্যকার সাক্ষাৎকার বলিয়াছেন। তাহা হইলে স্বদৃঢ় অনুমানের দ্বারা অবধারিত তত্ত্বের প্রতি-পাদক-বাক্য-বক্তাও “সাক্ষাৎকৃতধর্মী”। সুতরাং তিনিও “আপ্ত” হইতে পারিবেন। সাক্ষাৎ-কৃতপদার্থ হইয়াও যিনি উপদেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, অথবা মাৎস্যবশতঃ বিপরীত উপদেশ করেন, তিনি “আপ্ত” নহেন; তাই বলিয়াছেন—“যথাদৃষ্টার্থস্ত চিধ্যাপয়িষ্যা”। অর্থাৎ নিজে বেক্রপে অবধারণ করিয়াছেন, ঠিক সেই যথার্থরূপে পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা থাকা চাই। কেবল সেইরূপ খ্যাপনেচ্ছা থাকিলেও আলস্তবশতঃ যদি উপদেশ না করেন, তাহা হইলেও তিনি আপ্ত নহেন। তাই বলিয়াছেন—“প্রযুক্তঃ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ইচ্ছাবশতঃ বাক্য প্রয়োগে কৃতবত্ত হওয়া চাই। কৃতবত্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়াদির পটুতা না থাকায় যদি উপদেশসামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তিনি আপ্ত হইবেন না। তাই বলিয়াছেন—“উপদেষ্টা”। অর্থাৎ এই সবগুলি লক্ষণ বাহাতে আছে, তিনিই “আপ্ত”। তিনি ঋষি, আর্য্য, স্নেহ, বাহাই হউন, তাহার উপদেশই “আপ্তোপদেশ”। তাহাই শব্দ-প্রমাণ। অনাপ্তের উপদেশ শব্দ-প্রমাণ নহে। বিষয়বিশেষে আপ্তত্ব সকলেরই তুল্যভাবে আছে, নচেৎ কাহারও শব্দ-ব্যবহার এবং তন্মূলক অস্তান্ত ব্যবহার চলিতেই পারিত না। তবে সর্বজ্ঞ ব্যতীত সর্ব বিষয়ে অথবা সাধারণের অচিন্ত্য অলৌকিক তত্ত্ব আর কেহ “আপ্ত” হইতে পারেন না, এই বিশ্বাসে ধর্ম্মাধর্ম্ম, ব্রহ্ম প্রভৃতি অলৌকিক তত্ত্ব আর্য্যগণ বাহার তাহার কথা বিশ্বাস করেন না। বেদ এবং বেদের অবিকৃত বেদ-মূলক শাস্ত্র-বাক্যই ঐ সমস্ত তত্ত্ব আপ্তবাক্য বলিয়া আর্য্যগণের চির-বিশ্বাস। বেদ-কর্ত্তা কে? তিনি সর্বজ্ঞ কেন? এ সব কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

সূত্র। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ । ৮ ।

অনুবাদ। দৃষ্টার্থকত্ব ও অদৃষ্টার্থকত্ব বশতঃ অর্থাৎ দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক-ভেদে তাহা (পূর্বসূত্রোক্ত প্রমাণশব্দ) দ্বিবিধ।

ভাষ্য। যন্তেহ দৃশ্যতেহর্থঃ স দৃষ্টার্থো যস্তামৃত্রে প্রতীয়তে সোহ-দৃষ্টার্থঃ। এবম্বিশ্লোকিক-বাক্যানাং বিভাগ ইতি। কিমর্থঃ পুনরিদ-মুচ্যতে? স ন মন্তেত দৃষ্টার্থ এবাপ্তোপদেশঃ প্রমাণম্ অর্থস্তাবধারণা-দিতি। অদৃষ্টার্থোহপি প্রমাণমর্থস্তানুমানাদিতি। ইতি প্রমাণভাষ্যম্।

অনুবাদ। ইহলোকে বাহার (যে বাক্যের) অর্থ (প্রতিপাদ্য) দৃষ্ট হয়, তাহা (সেই বাক্য) “দৃষ্টার্থ”। পরলোকে বাহার অর্থ প্রতীত হয় (অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয় না) তাহা অর্থাৎ সেই বাক্য “অদৃষ্টার্থ”। এইরূপে ঋষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যসমূহের বিভাগ। (পূর্বপক্ষ) কি জ্ঞা আবাহ ইহা (এই সূত্রটি) বলিতেছেন?—(উত্তর) তিনি অর্থাৎ নাস্তিক মনে না করেন—অর্থের (প্রতিপাদ্য পদার্থের) অবধারণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় দৃষ্টার্থমাত্র আপ্তবাক্যই প্রমাণ—(পরন্তু) অর্থের (বাক্য প্রতিপাদ্য পদার্থের) অনুমান অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যও প্রমাণ। (অর্থাৎ ইহা বলিবার জ্ঞাই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন)। প্রমাণভাষ্য সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। আপ্তবাক্য বিবিধ। স্তুরাং প্রমাণ শব্দও বিবিধ। কেবল অদৃষ্টার্থক শাস্ত্রবাক্যই আপ্তবাক্য নহে। লৌকিক বাক্যের মধ্যেও অসংখ্য আপ্তবাক্য আছে। সত্যবাদী বিজ্ঞতম ব্যক্তি কোন স্থানে সর্প দেখিয়া “অমুক স্থানে সর্প আছে” ইহা বলিলে শ্রোতৃগণ সেই বাক্যার্থ-জ্ঞানবশতঃ সাধনান হইয়া থাকেন। বিজ্ঞতম সত্যবাদী ব্যক্তির কথা শুনিয়া কত কত সত্য নির্ণয় হইয়া থাকে। নচেৎ লৌকিক বিবাদ স্থলে সত্য নির্ণয়ের জন্য প্রকৃত সাক্ষিবাক্যের এত প্রয়োজন হয় কেন? ফলতঃ লৌকিক বাক্যের একেবারে প্রামাণ্য না থাকিলে মানবের সংসারবাজী অসম্ভব হইত, ইহা নির্ঝিলাদ সত্য। যিনি নাস্তিক অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তিনিও লৌকিক আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; নচেৎ তাহারও জীবনবাজী নির্ঝিলা হয় না। কিন্তু নাস্তিক অদৃষ্টার্থক বাক্যের প্রামাণ্য একেবারেই স্বীকার করেন না। তাই নাস্তিককে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। অর্থাৎ “অদৃষ্টার্থক আপ্ত বাক্যও প্রমাণ” আন্তিক-দর্শনের এই মূল সিদ্ধান্তটি প্রমাণ প্রভাবে প্রথমই মহর্ষি বলিয়া গিয়াছেন। অদৃষ্টার্থক বেদাদি বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গ, অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতি যখন বাহারও দৃষ্ট পদার্থ নহে, তখন তাহা প্রমাণ হইবে কেন? এতদ্বত্তরে স্তায়বাস্তিককার বলিয়াছেন যে, যোগপ্রভাবে সেগুলিও মহর্ষিগণের দৃষ্ট পদার্থ। ভাব্য-কার এখানে বলিয়াছেন—“অর্থজ্ঞাতমানাং” অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক শাস্ত্রবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থ ইহলোকে আমাদের দৃষ্ট পদার্থ না হইলেও অহুমানসিক। শাস্ত্রমাত্র-বোধ্য স্বর্গাদি পদার্থ আমাদের অহুমানসিক কিরূপে? তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আপ্ত-প্রণীতত্ব হেতুর দ্বারা বেদের প্রামাণ্য অহুমান-সিক অর্থাৎ যেহেতু বেদ আপ্ত ব্যক্তির প্রণীত, অতএব বেদ প্রমাণ। মহর্ষি গোতম নিজেও এ কথা বলিয়াছেন। স্তুরাং অহুমানের দ্বারা সিকপ্রামাণ্য বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গ, দেবতা প্রভৃতিও পরম্পরায় অহুমানসিক। অর্থাৎ নাস্তিক যখন অহুমানপ্রমাণ না মানিয়াই পারিষেন না, তাহা হইলে তাহার বিচার করাই চলিবে না, তখন অহুমানের দ্বারা সিক-প্রামাণ্য বেদাদি অদৃষ্টার্থক বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থ তাহাকে মানিতেই হইবে। এই

অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“অর্থস্তান্য়মানাং ।” ভাষ্যে “স—ন মন্তেত” এই স্থলে তাৎপর্য-
 টীকাকার বলিয়াছেন যে—যে নাস্তিকের কথা অনেক পূর্বে ভাষ্যে বলা হইয়াছে, যোগ্যতা ও
 তাৎপর্যবশতঃ সেই নাস্তিকই এখানে “তং” শব্দের প্রতিপাদ্য, (স নাস্তিকঃ) । ঋষিবাক্য
 এবং লৌকিক আগ্রবাক্য—এই দ্বিবিধ শব্দপ্রমাণকেই মহর্ষি দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক-ভেদে দ্বিবিধ
 বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের মত ; তাই বলিয়াছেন—“এবমুনির্লৌকিকবাক্যানাং বিভাগঃ” ।
 ভাষ্যকার দৃষ্টার্থক বাক্যের এবং অদৃষ্টার্থক বাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে
 ঋষিবাক্যের মধ্যেও দৃষ্টার্থক বাক্য আছে । লৌকিক আগ্রবাক্যের মধ্যেও অদৃষ্টার্থক বাক্য
 আছে । কেহ বলেন যে, যে বাক্যের অর্থ শব্দপ্রমাণ ও তদনুলক প্রমাণ ভিন্ন অস্ত্র প্রমাণের
 দ্বারাও বুঝা যায়, সেই বাক্য দৃষ্টার্থক এবং যে বাক্যের অর্থ শব্দপ্রমাণ ও তদনুলক প্রমাণ-মাত্রগম্য,
 তাহা অদৃষ্টার্থক । “শব্দচিন্তামনি”র “তাৎপর্যবাদ” গ্রন্থে উপাখ্যায় গদ্যে এবং টীকাকার
 মণ্ডুরানিধি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এখানে স্মরণ করিতে হইবে, বার্থা শব্দবোধের
 করণই শব্দপ্রমাণ । কেবল শব্দের দ্বারাই শব্দবোধ জন্মে না, ঐ শব্দের জ্ঞান এবং তাহার
 অর্থজ্ঞান প্রভৃতিও শব্দবোধে আবশ্যক । শব্দবোধের অব্যবহিত পূর্বে শব্দ থাকেও না, এই
 সমস্ত কারণে নব্য নৈয়ায়িকগণ বহু বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দজ্ঞানভুক্ত
 সংস্কারবশতঃ শেষে যে ঐ সকল শব্দবিষয়ক একটা স্মৃতি জন্মে, তাহাই শব্দবোধের করণ এবং
 তাহার পরে ঐ সকল শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থবিষয়ক যে একটা স্মৃতি জন্মে, তাহাই ঐ করণের
 ব্যাপার । ঐ ব্যাপারের পরেই ঐ সকল পদার্থের পরস্পর অবয়ববোধ বা সম্বন্ধবোধ জন্মে । এই
 অবয়ববোধই “শব্দবোধ” । কেবলমাত্র শব্দার্থজ্ঞান শব্দবোধ নহে । উহা শব্দপ্রমাণের দ্বারাও
 সর্বত্র হয় না । প্রাচীন মতে চরম কারণরূপ ব্যাপারই মুখ্য করণ পদার্থ । সুতরাং পূর্বোক্ত
 পদার্থ স্মরণই তাহাদিগের মতে মুখ্য শব্দপ্রমাণ । কিন্তু ঐ পদার্থ স্মরণ বাহার ব্যাপার, তাহাও
 তাহাদিগের মতে শব্দপ্রমাণ । প্রাচীনগণ চরম কারণ ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিলেও ঐ
 ব্যাপার দ্বারা বাহ্য কার্যজনক, তাহাকেও করণ বলিতেন, এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে ।
 প্রকৃত স্থলে অনেক প্রাচীনগণই জায়মান শব্দকে পূর্বোক্ত পদার্থস্মরণরূপ ব্যাপারজনক
 করণ বলিয়াছেন । অর্থাৎ শব্দজ্ঞানকে করণ না বলিয়া জায়মান শব্দকে করণ বলিয়াছেন ।
 সুতরাং এই মতে শব্দজ্ঞান শব্দপ্রমাণ হইবে না । জায়মান শব্দ শব্দপ্রমাণ হইবে । নব্য
 নৈয়ায়িকগণ এই মতের অনেক প্রতিবাদ করিলেও মহর্ষি কিন্তু শব্দজ্ঞানকে শব্দপ্রমাণ বলেন নাই ।
 তিনি আগ্রবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায়, জায়মান শব্দকেই শব্দপ্রমাণ বলিয়াছেন এবং
 ঐ প্রমাণ শব্দকে দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক বলাতে উহা যে শব্দই, শব্দজ্ঞান নহে, ইহা নিঃসংশয়ে
 বুঝা যায় । শব্দই দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক হইতে পারে । ভাষ্যকারও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।
 তাহাতে মহর্ষি-স্বত্ব প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ হয় নাই । কারণ, প্রাচীনগণ শব্দবোধের চরম কারণ
 পদার্থ স্মরণকে শব্দবোধে মুখ্য করণ বলিলেও ঐ ব্যাপারজনক জায়মান শব্দও তাহাদিগের
 মতে করণ বলিয়া শব্দপ্রমাণ হইবে । জায়মান শব্দের প্রমাণত্ব পক্ষে নব্য নৈয়ায়িকগণের

বহু বিবাদ থাকিলেও নব্য জ্ঞানের মূল আচার্য্য গঙ্গেশ কিন্তু প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হইয়া “শব্দ-চিন্তামণি”র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—“শব্দঃ প্রমাণম্”। সেখানে টীকাকার মথুরানাথও জ্ঞানমান শব্দের প্রমাণত্ব পক্ষ অবলম্বন করিয়াই যে গঙ্গেশ ঐ কথা বলিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি-সূত্রেও তাহাই আছে এবং “শব্দ প্রমাণ” এইরূপ কথাও প্রাচীন কাল হইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। নব্যগণও ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, মহর্ষি কিন্তু জ্ঞানমান শব্দমাত্রকেই শব্দপ্রমাণ বলেন নাই, যে শব্দ জ্ঞানমান হইয়া যথার্থ শাব্দবোধ জন্মায়, তাহাই শব্দপ্রমাণ, শব্দমাত্রই শব্দপ্রমাণ নহে; তাই বলিয়াছেন,—“আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ”। প্রমাণ-কাণ্ড অতি দুর্ব্বল। ইহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ গোতমোক্ত এই প্রমাণ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মৈথিল পক্ষের মিশ্র প্রভৃতি বহু মহামনীষী গঙ্গেশের “তত্ত্বচিন্তামণি”র টীকা করিয়া এই প্রমাণ ব্যাখ্যার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরে বঙ্গের গৌরবস্তুত, প্রতিভার অবতার রঘুনাথ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গঙ্গেশের প্রমাণ ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানবিদ্যায় যুগান্তর আনিয়া গিয়াছেন। যে প্রমাণকাণ্ড লইয়া এত কাণ্ড, তাহার কত কথা একবারে বলা যাইতে পারে—কিন্তু যে সংক্ষেপে সহজেই বা তাহার সকল কথা বুঝান যাইতে পারে? তবে প্রমাণপরীক্ষা প্রকরণে এবং অন্ত্য প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরও বহু কথা পাওয়া যাইবে। প্রমাণ সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক। প্রমাণের দ্বারা সকল পদার্থের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, এ জন্তই মহর্ষি সর্ব্বাঙ্গে প্রমাণের উদ্দেশ্য পূর্ব্বক লক্ষণ বলিয়াছেন। এই প্রমাণের ব্যাখ্যা একটি বিশেষ প্রবন্ধ, তাই ভাষ্যকার মহর্ষির সর্ব্বপ্রথমে কথিত প্রমাণ পদার্থের পরিচয়ের জন্ত মহর্ষির প্রমাণ-প্রকরণের পাঁচটি সূত্রের ভাষ্য করিয়া “প্রমাণভাষ্য” নামের দ্বারা তাহার সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

প্রমাণলক্ষণপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভাষ্য। কিং পুনরনেন প্রমাণেনার্থজাতং প্রমাতব্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ। এই প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারিটি প্রমাণের দ্বারা কোন্ পদার্থসমূহ যথার্থরূপে বুঝিতে হইবে, এ জন্ত অর্থাৎ এই প্রশ্নবশতঃ (মহর্ষি) সেই পদার্থগুলি বলিয়াছেন।

সূত্র। আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধিমনঃপ্রস্বতিদোষ-
প্রেত্যভাবফলদ্রুথাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্ ॥ ৯ ॥

১। “এতচ্চ জ্ঞানমানশব্দস্ত প্রমাণত্বপক্ষে, শব্দজ্ঞানস্ত প্রমাণত্বপক্ষে তু তদ্বিশেষবিবরণজ্ঞানত্বং লক্ষণ-মবসেদং”—(গঙ্গেশের শব্দচিন্তামণি, মথুরা।) অর্থঃ খণ্ড।

২। “কিং পুনরনেন প্রমাণেনেতি। জাতাভিপ্রায়নেকবচনং একুতে প্রবেশে যথাযথং প্রমাণানামুপযোগাৎ” (তাৎপর্য্যটীকা)।

অনুবাদ। (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ, (১২) অপবর্গ—ইহারাই অর্থাৎ এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থই “প্রমেয়” অর্থাৎ “প্রমেয়” নামে প্রথম সূত্রে কথিত “প্রমেয়” পদার্থ।

ভাষ্য। তত্রাত্মা সর্বস্ব ভ্রষ্টা, সর্বস্ব ভোক্তা, সর্বজ্ঞঃ, সর্বানুভাবী। তস্ম ভোগায়তনং শরীরম্। ভোগসাধনানীন্দ্রিয়ানি। ভোক্তব্য ইন্দ্রিয়ার্থাঃ। ভোগো বুদ্ধিঃ। সর্বার্থোপলব্ধৌ নেন্দ্রিয়ানি প্রভবন্তীতি সর্ববিষয়মন্তঃকরণং মনঃ। শরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিহৃৎবেদনানাং নির্বৃত্তিকারণং প্রবৃত্তিদোষাশ্চ। নাস্তেদং শরীরমপূর্বমনুত্তরঞ্চ। পূর্বশরীরাণামাদিনাস্তি, উত্তরেষামপবর্গোহস্ত ইতি প্রেত্যভাবঃ। সমাধনহৃৎদুঃখোপভোগঃ ফলম্। দুঃখমিতি নেদমনুকূলবেদনায়স্য হৃৎস্যা প্রতীতেঃ প্রত্যাখ্যানম্। কিং তর্হি? জন্মন এবেদং সমুৎপাদনস্য দুঃখানুসঙ্গাদুঃখেনাবিপ্ৰয়োগাদবিবিধবান্ধনাবোগাদুঃখমিতি সমাধিভাবনমুপদিশ্যতে। সমাহিতো ভাবয়তি, ভাবয়ন্ নির্বিদ্যতে, নির্বিদ্যন্য, বৈরাগ্যং, বিরক্তস্যাপবর্গ ইতি। জন্মমরণপ্রবন্ধোচ্ছেদঃ সর্বদুঃখপ্রহাণমপবর্গ ইতি।

অন্ত্যন্তদপি দ্রব্যগুণ-কর্ম-নামাত্ম-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয়ং তদভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ম্। অস্ত তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষেণেতি।

অনুবাদ। সেই আত্মাদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে (১) “আত্মা” সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখকারণের ভ্রষ্টা (বোদ্ধা), সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখের ভোক্তা, (সুতরাং) “সর্বজ্ঞ” অর্থাৎ সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখের জ্ঞাতা, (সুতরাং) “সর্বানুভাবী” অর্থাৎ সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখপ্রাপ্ত। সেই আত্মার ভোগের স্থান (২) “শরীর”। ভোগের সাধন (৩) “ইন্দ্রিয়” অর্থাৎ গ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ। ভোগ্য (৪) “ইন্দ্রিয়ার্থ”বর্গ, অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়। ভোগ (৫) “বুদ্ধি” অর্থাৎ জ্ঞান। বহিরিন্দ্রিয়গুলি সকল পদার্থের উপলব্ধি-কার্যে সমর্থ হয় না, এ জন্য সর্ববিষয় অর্থাৎ সকল পদার্থই যাহার বিষয় হয়, এমন অন্তঃকরণ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় (৬) “মন”। শরীর, বহিরিন্দ্রিয়, গন্ধাদি

ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, সুখ এবং বেদনার অর্থাৎ দুঃখের উপস্থিতির কারণ (৭) “প্রভৃতি” এবং (৮) “দোষ”বর্গ, অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম এবং রাগ, ঘেব ও মোহ। এই আত্মার অর্থাৎ সংসারী জীবাত্মার এই শরীর অপূর্ব নহে, অন্তরও নহে, অর্থাৎ ইহার পূর্বশরীর নাই, এমন নহে, ইহার উত্তর-শরীর নাই, এমনও নহে। পূর্বশরীরগুলির আদি নাই, (তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায়) পরবর্তী শরীরগুলির মোক্ষ অন্ত অর্থাৎ মোক্ষই শেষ সীমা, মোক্ষ হইলে আত্মার আর শরীর-সম্বন্ধ হয় না, ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনাদি জন্মমরণ-প্রবাহ (৯) “প্রত্যভাব।” সাধন সহিত সুখ-দুঃখের উপভোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উপভোগ এবং তাহার সাধন দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি (১০) “ফল।” (১১) “দুঃখ” এই কথাটি অর্থাৎ মহর্ষি প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ না বলিয়া যে দুঃখ বলিয়াছেন, ইহা অনুকূলবেদনীয় অর্থাৎ অনুকূলভাবে সর্বজীবের অনুভব-বিষয় সুখের অনুভূতির অপলাপ নহে অর্থাৎ মহর্ষি এখানে সুখ না বলিয়া সর্বানুভবসিদ্ধ সুখ পদার্থের অস্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? অর্থাৎ তবে প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ পদার্থ না বলিয়া কি করিয়াছেন? (উত্তর) সুখসাধন সহিত জন্মেরই দুঃখানুব্রবণতঃ, দুঃখের সহিত অবিচ্ছেদবশতঃ, বিবিধ দুঃখসম্বন্ধবশতঃ “ইহা অর্থাৎ সুখ ও সুখের সাধনসমন্বিত জন্ম, দুঃখ,” এইরূপে সমাধিভাবনা অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ভাবনা উপদেশ করিয়াছেন। (মুমুকু) সমাহিত হইয়া ভাবিবেন অর্থাৎ জন্মাদি সুখসাধন সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া চিন্তা করিবেন, ভাবনা করতঃ নির্বিঘ্ন হইবেন, অর্থাৎ সমগ্র জগতে উপেক্ষা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, নির্বিঘ্ন মুমুকুর বৈরাগ্য হইবে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুবিষয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইবে। বিরক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ভাবনার ফলে বৈরাগ্যসম্পন্ন আত্মার মোক্ষ হইবে। জন্মমরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ (অর্থাৎ) সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি (১২) “অপবর্গ।”

অন্যও অর্থাৎ এই আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্নও “দ্রব্য”, “গুণ”, “কর্ম্ম”, “সামান্য”, “বিশেষ”, “সমবায়” (কণাদোক্ত ষট্ পদার্থ) এবং তাহাদিগের ভেদবশতঃ অর্থাৎ ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের অসংখ্য প্রকার-ভেদ থাকায় অসংখ্য প্রমেয় আছে। কিন্তু এই আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ অপবর্গ হয়, মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ সংসার হয়, এ জন্ম এই আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থ বিশেষ করিয়া (প্রমেয় বলিয়া) কথিত হইয়াছে।

টিপ্পনী। চতুর্বিধ প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই চতুর্বিধ প্রমাণের দ্বারা যে সকল পদার্থকে বস্তুত্বরূপে বুঝিলে মোক্ষ হয়, সেই “প্রমেয়” পদার্থ নিরূপণের জন্ত মহর্ষি প্রথমে সেই

প্রমেয় পদার্থগুলির বিভাগ অর্থাৎ তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিভাগস্বত্ব “প্রমেয়” শব্দের দ্বারা মহর্ষি-কথিত “প্রমেয়” পদার্থের সামান্য লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। যাহা প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়, তাহাই “প্রমেয়”। এই প্রমেয়বর্ণের বিশেষ লক্ষণগুলি মহর্ষি নিজেই পৃথক পৃথক স্বত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে যথাক্রমে মহর্ষি-স্বত্রোক্ত প্রমেয়গুলির পরিচয় দিয়াছেন।

“প্রমেয়”বর্ণের প্রথম পদার্থ জীবাশ্ম। ভাষ্যকার তাহাকে বলিয়াছেন—সর্বত্রষ্টা, সর্বভোক্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বাশুভাবী। এখানে “সর্ব” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার সমস্ত স্বধ্বংসসাধন এবং সমস্ত স্বধ্বংসকেই লক্ষ্য করিয়াছেন^১। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে—“প্রমেয়”বর্ণের মধ্যে জীবাশ্ম অনাদি কাল হইতে সমস্ত স্বধ্বংসসাধনের জ্ঞাতা এবং সমস্ত স্বধ্বংসের ভোক্তা। অর্থাৎ যে জীবাশ্মের সম্বন্ধে যতগুলি স্বধ্বংস ও তাহার কারণ উপস্থিত হয়, সেই জীবাশ্মই সেই সমস্তের জ্ঞাতা, আর কেহ উহার একটিরও জ্ঞাতা নহে। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ জ্ঞাত হইতেই পারে না। পরন্তু বহিরিন্দ্রিয়গুলির বিষয় নিদ্রিষ্ট বা নিয়মবদ্ধ। উহার জ্ঞাতা হইলে সর্ব-বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা তাহার সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহক সর্ব বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে এবং আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে জীবাশ্মকে সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন। স্বধ্বংস এবং তাহার সাধনগুলি প্রাপ্ত না হইলে তাহার জ্ঞাতা হওয়া যায় না, এ জন্ত শেষে বলিয়াছেন—“সর্বাশুভাবী”। অহু পূর্বক “হু” যাতুর অর্থ এখানে প্রাপ্তি। ভাষ্যকার অজ্ঞাতও প্রাপ্তি অর্থে “অহুভব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফল কথা, যে পদার্থ স্বধ্বংসের সমস্ত সাধন ও সমস্ত স্বধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্তের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, সেই পদার্থই জীবাশ্ম। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আত্মাকে এইরূপে বুঝিলে বৈরাগ্য জন্মে, এই জন্তই ভাষ্যকার এখানে আত্মাকে ঐরূপে বলিয়াছেন। আত্মা স্বধ্বংসাধিকারীস্বরূপে হয়, কেবল স্বরূপেই গ্রাহ্য। অর্থাৎ প্রমেয়বর্ণের মধ্যে “আত্মা” ও “অপবর্গ” উপাদেয়, আরগুলি হয়। কিন্তু আত্মাতে বিশেষ এই যে, “আত্মা” ভাষ্যোক্তরূপে হয়, স্বধ্বংসাধিকারী-শূন্য কেবলরূপেই উপাদেয় (দ্বিতীয় স্বত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ মাত্রই প্রমেয়। মহর্ষি গৌতমের এই স্বত্রোক্ত “প্রমেয়” ভিন্ন কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ এবং তাহাদিগের অসংখ্য ভেদে আরও অসংখ্য প্রমেয় আছে। প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া সেগুলিও গৌতম-সম্মত প্রমেয়। তবে মহর্ষি গৌতম আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই “প্রমেয়” বলিয়াছেন কেন? এতদ্ব্যতীত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি এবং মিথ্যাজ্ঞানে সংসার, সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্থগুলিকেই বিশেষ করিয়া মহর্ষি গৌতম “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ‘সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়’ এই অর্থে মহর্ষি গৌতমের এই “প্রমেয়” শব্দটি পারিভাষিক। মহর্ষি গৌতম সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলিকেই “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১। “সর্বস্ত স্বধ্বংসসাধনস্ত ত্রষ্টা, সর্বস্ত স্বধ্বংসস্ত ভোক্তা, যতঃ স্বধ্বংসসাধনঃ সর্বঃ সর্বক স্বধ্বংসঃ জানাতী অতঃ সর্বজ্ঞঃ, ন চাধাপ্রাপ্তোক্তানি জানাতীত্যতঃ অহু সর্বাশুভাবী”। অহুভবঃ প্রাপ্তিঃ—তাৎপর্য্যটীকা।

প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি কথাদি যে সকল প্রমেয় পদার্থ পরম্পরায় এবং অতি পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী হয়, তাহাদিগেরও উল্লেখ করিয়া ঐক্যাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের উপায় বলিয়াছেন। মহর্ষি গোতম অপেক্ষাকৃত উচ্চাধিকারী শিষ্যদিগকে উপদেশ করার যে সকল “প্রমেয়” পদার্থবিষয়ে নিখ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান বলিয়া তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, সেই “আত্মা” প্রভৃতি “অপবর্গ” পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়া বলিয়াছেন। এই হস্তের দ্বারা অজ্ঞান সামান্য প্রমেয়ের নিষেধ করেন নাই। সে জ্ঞাতও এই হস্তটি বলেন নাই। মহর্ষি গোতম এই হস্তে “তু” শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, “আত্মা” প্রভৃতি এই পদার্থগুলিই সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী বিশেষ প্রমেয়। এই সকল পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মুমুকুর চরম কর্তব্য, সুতরাং এই সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই প্রমাণের মুখ্য ফল; এ জ্ঞাত “প্রমাণে”র পরে এই সকল পদার্থগুলিই “প্রমেয়” নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ফল কথা, এই সকল পদার্থ ভিন্ন আর প্রমেয় নাই, ইহা সূত্রার্থ নহে। সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী প্রমেয় পদার্থ (প্রথম হস্তে প্রমাণের পরে উল্লিখিত প্রমেয় পদার্থ) এইগুলিই, ইহাই সূত্রার্থ।

উদ্যোতকর এখানে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, হস্তোক্ত “তু” শব্দটি হস্তোক্ত “প্রমেয়ঃ” এই কথার পরে যোগ করিয়া অর্থাৎ “প্রমেয়ন্ত প্রমেয়মেব” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্থগুলি প্রমেয়ই, অর্থাৎ মুমুকুর যথার্থরূপে জ্ঞাতব্যই, এইরূপ সূত্রার্থও বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে আত্মাদি পদার্থগুলিই কেবল প্রমেয়, এইরূপ সূত্রার্থ না হওয়ার কোন অল্পপত্তি নাই। উদ্যোতকরের এই ব্যাখ্যা হস্তের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, হস্তকার মহর্ষি এই হস্তের দ্বারা তাহার প্রথম হস্তে উদ্দিষ্ট “প্রমেয়” পদার্থের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ্যনামগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই হস্তে আত্মাদি পদার্থগুলি মুমুকুর যথার্থরূপে জ্ঞাতব্যই, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য নহে। কোন্ পদার্থগুলি “প্রমেয়” নামে উদ্দিষ্ট, অর্থাৎ তাহার কথিত প্রমেয় পদার্থ কি, তাহাই এখানে মহর্ষির বক্তব্য। পরন্তু হস্তের “তু” শব্দটির অস্ত্রা যোগ মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষির যথাস্থানে “তু” শব্দ প্রয়োগ না করার কোন কারণ নাই। সুতরাং উদ্যোতকরের উহা ব্যাখ্যা-কৌশলমাত্র। উদ্যোতকর এখানে আরও ব্যাখ্যাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্যটীকাকারও বলিয়াছেন। মূলকথা, আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্থগুলিই “প্রমেয়”, অর্থাৎ মহর্ষি গোতমের পরিভাষিত সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী প্রমেয়, ইহাই সূত্রার্থ। এতদতিরিক্ত সামান্য প্রমেয় আরও অসংখ্য আছে, সেগুলিও মহর্ষি গোতমের সম্মত; সেগুলিকেও মহর্ষি গোতম প্রমেয় বলিতেন। উদ্যোতকর এই কথার সমর্থনের জন্ত ইহাও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম “প্রমেয়চ্চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ” (২অঃ, ১আঃ, ১৬ হস্ত) এই হস্তে তুলাদণ্ডকেও প্রমেয় বলিয়াছেন। তুলাদণ্ডের দ্বারা যখন অল্প বস্তুর গুরুত্ববিশেষ নির্ণয় করা হইবে, তখন তুলাদণ্ড প্রমাণ, আর যখন সেই তুলাদণ্ডেরই গুরুত্ববিশেষ নির্ণয় করা হইবে, তখন তুলাদণ্ড প্রমেয়। এইরূপে এক পদার্থও প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব থাকে, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি ঐরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথা এই যে,

মহর্ষি যখন তুলানুকে প্রেমের বলিয়াছেন, তখন তাঁহার পরিভাষিত আত্মাদি প্রেমের ভিন্ন পদার্থ-গুলিকেও তিনি সামান্যতঃ প্রেমের বলিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়েই বুঝা যায়। তুলানু যখন মহর্ষির কথিত আত্মাদি প্রেমের পদার্থের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তখন ঐ তুলানুকে অতীত তিনি “প্রেমের” বলিলে আর কি বুঝা বাইতে পারে? বাহাতে পূর্বাঙ্গের বাক্যের বিরোধ না হয়, সেই-রূপেই ত বুঝিতে হইবে?

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, মহর্ষি গৌতম তাঁহার পরিভাষিত বিশেষ “প্রেমের”গুলির মধ্যে “সুখ” পদার্থের উল্লেখ না করিয়া কেবল “দুঃখ” পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন কেন? তবে কি উহার দ্বারা “সুখ” বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহাই হুচনা করিয়াছেন? এতদ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা নহে। সুখ পদার্থ সকলেরই অতীতবসিদ্ধ। মহর্ষি সেই সর্বসিদ্ধ সুখাত্মত্বের অপলাপ করেন নাই। সুখাদি সমস্ত পদার্থকেই দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে নির্দেহ ও বৈরাগ্য হয়, তাহার ফলে মোক্ষ হয়; অতরাং মুমুকু জন্মাদি সমস্তই দুঃখ বলিয়া ভাবিবেন। “প্রেমের”-মধ্যে সুখের উল্লেখ না করিয়া মহর্ষি পূর্কোক্তপ্রকার দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাধ্য সাধন, সেই সকল পদার্থকেই মহর্ষি গৌতম “প্রেমের” বলিয়াছেন। “প্রেমের”র মধ্যে সুখের উল্লেখ করিলে সেই সুখেরও তত্ত্বজ্ঞান করিতে হয়। সুখকে সুখ বলিয়া না বুঝিয়া অতীতবসিদ্ধ সুখের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কিন্তু সুখে বৈরাগ্য ব্যতীত মোক্ষের আশা নাই। সুখ এবং তাহার সাধন জন্মাদিকে দুঃখ বলিয়া একাগ্রচিত্তে ভাবনা বৈরাগ্যের একটি প্রকৃষ্ট উপায়; অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা উহা ঋষিগণের আবিস্কৃত ও পরীক্ষিত বৈরাগ্যের উপায়। মহর্ষি এই হুত্রে সুখের উল্লেখ না করিয়া বৈরাগ্যের ঐ উপায়টির উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মুমুকু সুখাদি সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভাবিবেন। এই হুত্রে “প্রেমের” মধ্যে সুখের উল্লেখ করিলে সেই সুখরূপ প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম সুখকে সুখ বলিয়াই ভাবিতে হয়। কিন্তু উহা মুমুকুর বৈরাগ্যের বিরোধী। তাই মহর্ষি “প্রেমের” মধ্যে সুখের উল্লেখ না করিয়া কেবল “দুঃখের”ই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি সুখ পদার্থের অপলাপ করেন নাই। এই হুত্রে পরবর্তী হুত্রে এবং অন্ত্যস্ত হুত্রে মহর্ষি সুখের কথাও বলিয়াছেন।

হরিভদ্র হ্রি-বিরচিত “ষড়্ দর্শনসমুচ্চয়” নামক গ্রন্থে জ্ঞানমত বর্ণনায় দেখা যায়,—“প্রেমের স্বাভাবিক দেহাদ্যং বৃত্তীক্রিয়সুখাদি চ”। এখানে গৌতমোক্ত “প্রেমের” বর্ণনার সুখের উল্লেখ থাকায় কোন কোন নবীন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার বাংলায়নের পূর্বে গৌতমের প্রেমের বিভাগহুত্রে “সুখ” শব্দই ছিল, “দুঃখ” শব্দ ছিল না। ফলকথা, গৌতম-সম্প্রদায় সর্বাণ্ডভবাদী ছিলেন না, ইহাই তাঁহাদিগের মূল বক্তব্য। ষড়্ দর্শনসমুচ্চয়ের বহুজ্ঞ টীকাকার গুণরত্ন কিন্তু “আদ্য” শব্দ ও “আদি” শব্দের দ্বারা গৌতমোক্ত অপর প্রেমেরগুলির সংগ্রহ বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাত পাঠই গ্রাহ্য। তবে প্রেমের বর্ণনায় সুখের উল্লেখ আছে কেন? তাহা টীকাকার বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই।

পূর্কোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার বাংলায়নের পূর্বে যে সময়ে জ্ঞানহুত্রে নানা কারণে

বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন হইতেই গোতমের স্বত্র ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে নানা মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের পূর্বে “দশাবয়ববাদী” নৈয়ায়িক ছিলেন, ইহা বাৎস্তায়নের কথা-তেই পাওয়া যায় (৩২ স্বত্র-ভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। অনেক আচার্য্য জ্ঞানস্বত্রের কোন অপেক্ষা না করিয়া নিজ বুদ্ধি অনুসারে জ্ঞানমতের বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে গোতমজ্ঞানমতের কোন কোন সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া নূতন জ্ঞানমতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগকে পরবর্তী আচার্য্যগণ “জ্ঞানৈকদেশী” বলিয়া গিয়াছেন। যেমন “তর্কিকরক্ষা” ও “মানসোন্নয়ন” গ্রন্থে প্রমাণত্রয়বাদী নৈয়ায়িকদিগকে “জ্ঞানৈকদেশী” বলা হইয়াছে। “তর্কিকরক্ষা”র টীকার মন্তিনাথ লিখিয়া গিয়াছেন—“জ্ঞানৈকদেশিনো ভূষণাঃ”। “বড়দর্শনসমুচ্চয়”র টীকার গুণরত্ন ভাস্করজ্ঞ-প্রণীত “জ্ঞানসার” নামক গ্রন্থের টীকার মধ্যে “জ্ঞানভূষণ” নামে টীকাপ্রধান এই কথা লিখিয়াছেন। এ জ্ঞান কেহ কেহ অতুল্যমান করেন যে, এই “জ্ঞানভূষণ” ও প্রমাণত্রয়বাদী জ্ঞানৈকদেশী “ভূষণ” অতিশয় ব্যক্তি। সে বাহা হউক, “ভূষণে”র জ্ঞান-মত বলিয়া যে সকল নূতন মত পাওয়া যায়, তাহা যে প্রচলিত জ্ঞানমতের বিরুদ্ধ এবং জ্ঞানস্বত্রেরও বিরুদ্ধ, এ বিষয়ে সংশয় নাই। “ভূষণের” নূতন জ্ঞানমত “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”র টীকা “দিনকরী”তেও পাওয়া যায়। এখন কথা এই যে, যেমন কোন আচার্য্য গোতমোক্ত “উপমান” প্রমাণটিকে ছাড়িয়া নূতন জ্ঞানমতের প্রচার করিয়াছেন, তদ্রূপ কোন আচার্য্য গোতমোক্ত “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে “জ্ঞঃ”কে ছাড়িয়া দিয়া সেই স্থানে “স্বধে”র উল্লেখ পূর্বক স্বাধীন ভাবে নূতন জ্ঞানমতের সৃষ্টি করিতে পারেন। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র হুরি সেই জ্ঞানৈকদেশীর মতকেই তৎকালে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত দেখিয়া “বড়দর্শনসমুচ্চয়”ে উল্লেখ করিতে পারেন। তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে কোন মতেরই উল্লেখ করেন নাই। বাৎস্তায়নের পূর্বে জ্ঞানস্বত্রের প্রকৃত পাঠ স্থির করিতে না পারিয়া কাল্পনিক পাঠানুসারেও কোন কোন নূতন মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। জৈন দার্শনিকগণ জ্ঞানস্বত্রের পাঠান্তর করনা করিয়াও জ্ঞানস্বত্রের সাহায্যে নিজ মত সমর্থন করিতেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র হুরি নিজ গ্রন্থে সেই কল্পিত জ্ঞান-মতেরও বর্ণন করিতে পারেন। কল কথা, হরিভদ্র হুরির কথার দ্বারা ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রকৃতির কথাকে উপেক্ষা করিয়া গোতমের প্রমেয়-স্বত্রে “জ্ঞঃ” ছিল না, “স্বধঃ”ই ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাতীত ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

পরন্তু প্রমেয়স্বত্রে যদি “জ্ঞঃ”র “উদ্দেশ্য” না থাকে, তবে প্রমেয়বর্গের যথাক্রমে লক্ষণ ও পরীক্ষাহলে জ্ঞঃের “লক্ষণ” ও “পরীক্ষা” থাকিবে কেন? এবং প্রমেয়বর্গের মধ্যে “স্বধে”র

১। “প্রত্যক্ষমেবং চাক্ষিকঃ কথ্যব্রহ্মতো পুনঃ।

অনুমানক তচ্চাপ সাংখ্যঃ শব্দক তে অপি।

জ্ঞানৈকদেশিনোহপোষম্”।—তর্কিকরক্ষা (প্রমাণ-প্রকরণ)।

২। “ভাস্করজ্ঞপ্রণীতে জ্ঞানসারেহষ্টাধিনটীকাঃ

তাহা ন্যা টীকা জ্ঞানভূষণা”।—(বড়দর্শনসমুচ্চয়টীকা)।

উদ্দেশ্য থাকিলে যথাস্থানে সূত্রের লক্ষণ ও পরীক্ষা নাই কেন? দুঃখের লক্ষণ ও পরীক্ষা প্রকরণকে কল্পিত বলিলেও যে সূত্রের জ্ঞান এত করনা, এত আকাঙ্ক্ষা, সেই “সূত্র”ের লক্ষণ ও পরীক্ষা স্মারসূত্রে নাই কেন? মহর্ষি গোতম “প্রমাণ” পদার্থের জ্ঞান তাহার কথিত “প্রমেয়” পদার্থেরও সম্বন্ধলিখি “উদ্দেশ্য,” “লক্ষণ” ও “পরীক্ষা” করিয়াছেন। প্রমেয়বর্ণের মধ্যে সূত্র পদার্থের “উদ্দেশ্য” করিলে তাহারও “লক্ষণ” ও “পরীক্ষা” করিতেন। পরন্তু বাহারা স্মার-বিদ্যাকে কেবল “হেতুবিদ্যা” বলিয়া স্মারসূত্রের অব্যাক্ত অংশকে কল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের মতে এই প্রমেয়-সূত্রটিও কল্পিত হইবে। কারণ, এই সূত্রে “আত্মা” ও “অপবর্গের” কথা থাকায় কেবলমাত্র হেতুবিদ্যায় এইরূপ সূত্র থাকিতে পারে না। যদি এই সূত্রটি কল্পিতই হয় অর্থাৎ গোতমের রচিত সূত্রই না হয়, তবে আর গোতমের প্রমেয়-সূত্রে “দুঃখ” ছিল না, “সূত্র”ই ছিল, এইরূপ কথা বলা যায় কিরূপে? আর এই সূত্রটি প্রকৃত গোতম সূত্র হইলে দুঃখের লক্ষণ-সূত্র এবং দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণই বা কল্পিত হইবে কেন? এ বিষয়ে অস্তান্ত কথা চতুর্থাদিধ্যায়ে যথাস্থানে লিখিব্য।

ভাষ্য। তত্রাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে, স কিমাপোপদেশ-মাত্রাদেব প্রতিপদ্যতে ইতি? নেতৃত্বাচ্যতে। অনুমানাচ্চ প্রতিপত্তব্য ইতি। কথম্?

অনুবাদ। তন্মধ্যে আত্মা প্রত্যক্ষ হইতে গৃহীত হয় না অর্থাৎ “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে যে “আত্মা” বলিয়াছেন, তাহাকে লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না। (প্রশ্ন) সেই আত্মা কি কেবল শব্দপ্রমাণ হইতেই গৃহীত হয়? অর্থাৎ পূর্বোক্ত আত্মাকে কি তবে কেবল শব্দপ্রমাণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে? (উত্তর) ইহা বলা হয় নাই অর্থাৎ আত্মাকে কেবল শব্দপ্রমাণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই, অনুমানপ্রমাণ হইতেও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আপ্তবাক্য হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া, ঐ বোধকে স্মৃদু করিবার জ্ঞান অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আত্মার মননও করিতে হইবে। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আত্মাকে বুঝা যাইবে কিরূপে? আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অনুমাপক কি? (এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন)।

সূত্র। ইচ্ছাদেব-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানাত্মানো
লিঙ্গম্। ১০।

অনুবাদ। ইচ্ছা, দৈষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, এই পদার্থগুলি আত্মার লিঙ্গ, অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্মার অনুমাপক (এবং লক্ষণ)।

বিস্তৃতি। “আমি ইচ্ছা করিতেছি,” “আমি ঘেব করিতেছি,” “আমি ঘর করিতেছি,” “আমি বুঝিতেছি,” “আমি স্থখী,” “আমি দুঃখী,” ইত্যাদিরূপে সকল জীবই ইচ্ছা, ঘেব, বস, স্থখ, দুঃখ এবং জ্ঞানকে নিজের আত্মার ধর্ম বলিয়াই মনের দ্বারা বুঝিয়া থাকে। সর্বজীবের তুল্যভাবে জায়মান পূর্বোক্ত প্রকার অসংখ্য জ্ঞানকে মহর্ষি গোতম ভ্রম না বলিয়া ঐ ইচ্ছা প্রকৃতিতে জীবাত্মার গুণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং ঐ ইচ্ছা প্রকৃতি মনোগ্রাহ গুণগুলি জীবাত্মার অসাধারণ ধর্ম বলিয়া জীবাত্মার লক্ষণ। এবং ঐ ইচ্ছা প্রকৃতি গুণগুলি দেহাদি ভিন্ন জীবাত্মার অনুরূপক। দেহ প্রকৃতি কোন অস্থায়ী পদার্থ জীবাত্মা নহে, ইচ্ছা প্রকৃতি গুণের আশ্রয় জীবাত্মা চিরস্থায়ী, ইহা ঐ ইচ্ছা প্রকৃতি গুণের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, আমি বাল্যকালে যে পদার্থকে দেখিয়া স্থখভোগ করিয়াছিলাম, বৃদ্ধকালে সেই আমিই সেই পদার্থ বা তজ্জাতীয় পদার্থ দেখিলে পূর্বসংস্কারবশতঃ ঐ পদার্থকে স্থখজনক বলিয়া স্মরণ করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং একই আত্মা দর্শন, স্থখানুভব, স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছার কর্তা বা আশ্রয়। একই আত্মা বা আমিই যে সেই পদার্থের বাল্যকালের সেই প্রথম দর্শন হইতে বৃদ্ধকালের পুনর্দর্শন এবং স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত জিয়ার কর্তা বা আশ্রয়রূপে বিদ্যমান আছি, ইহা আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বুঝিতেছি। কারণ, ঐরূপ হলে “যে আমি যে জাতীয় স্থখজনক পদার্থকে পূর্বে দেখিয়া এখন তাহাকে স্থখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই সেই জাতীয় পদার্থকে আজ দেখিতেছি এবং তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি”—এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ আমার জন্মিতেছে। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে “প্রত্যভিজ্ঞা” বলে এবং “প্রতিসন্ধান”ও বলে। “প্রতিসন্ধান” বা “প্রত্যভিজ্ঞা” নামক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে পূর্বপ্রত্যক্ষ-পদার্থের স্মৃতি আবশ্যক। একের অহতুত বিষয় অল্পে স্মরণ করিতে পারে না। সুতরাং যে আত্মা পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই আত্মাই দীর্ঘকাল পরে তাহা স্মরণ করিয়া ঐরূপ প্রতিসন্ধান করিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একই আত্মা প্রথম দর্শন, স্থখভোগ এবং তাহার পুনর্দর্শন এবং স্মরণ ও গ্রহণের ইচ্ছা করে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য। দেহ প্রকৃতি কোন অল্পকালস্থায়ী পদার্থ আত্মা হইলে পূর্বোক্ত প্রকার দর্শনাদি এবং “প্রতিসন্ধান” হইতে পারে না। স্মরণ ব্যতীত যখন “প্রতিসন্ধান” অসম্ভব, তখন স্মরণের উপপত্তির জন্ত দর্শন হইতে স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একটি আত্মা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ পূর্বোক্ত প্রকার “প্রতিসন্ধান”রূপ যথার্থ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে হয়। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঐরূপ আত্মা মানেন নাই। তাঁহাদিগের মতে “অহং অহং” এইরূপ কণস্থায়ী বিজ্ঞানের সমষ্টি ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ নাই। কিন্তু যখন আত্মার পূর্বোক্ত প্রকার “প্রতিসন্ধান” হইতেছে, তখন আত্মাকে কণকালমাত্র স্থায়ী কোন পদার্থ বলা যায় না। আত্মার প্রত্যক্ষ বিষয়ের আবার যখন স্মরণ হইতেছে, তখন স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী আত্মা অবশ্যই আছে। এইরূপে ইচ্ছার দ্বারা এবং ঘেব, বস, স্থখ, দুঃখ ও জ্ঞানের দ্বারা দেহাদি ভিন্ন

চিরস্থায়ী আত্মার অন্বেষণ হয়। স্বতরাং স্বকোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক।

ভাষ্য। যজ্ঞাতীয়স্বার্থস্ত সন্নিবর্ত্যং স্বখমাত্মোপলব্ধবান্ তজ্জাতীয়-
মেবার্থং পশ্যমুপাদাতুমিচ্ছতি। সেয়মাদাতুমিচ্ছা একস্থানেকার্থদর্শিনো
দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ্ভবতি লিঙ্গমাত্মনঃ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রেন
ন সম্ভবতি দেহান্তরবদिति। এবমেকস্থানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতি-
সন্ধানাদ্ভুৎথহেতো দ্বেষঃ। যজ্ঞাতীয়োহস্বার্থঃ—স্বথহেতুঃ প্রসিদ্ধ-
স্তজ্জাতীয়মর্থং পশ্যমাদাতুং প্রযততে মোহয়ং প্রযত্ব একমনেকার্থদর্শিনং
দর্শনপ্রতিসন্ধাতারমন্তুরেণ ন স্যাৎ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রেন
ন সম্ভবতি দেহান্তরবদिति। এতেন ভুৎথহেতো প্রযত্নো ব্যাখ্যাতঃ।
স্বথ্ভুৎথস্মৃত্যা চায়ং তৎসাধনমাদদানঃ স্বখমুপলভতে, ভুৎথমুপলভতে,
স্বথ্ভুৎথে বেদয়তে, পূর্বোক্ত এব হেতুঃ। বুভুৎসমানঃ খল্লয়ং বিমুশতি
কিং স্থিতি। বিমুশংচ জানীতে ইদমिति। তদিদং জ্ঞানং বুভুৎসা-
বিমর্শাভ্যামভিন্নকর্তৃকং গৃহমাণমাত্মলিঙ্গং, পূর্বোক্ত এব হেতুরिति। তত্র
দেহান্তরবদिति বিভজ্যতে। যথা অনাত্মবাদিনো দেহান্তরেণ নিয়তবিষয়া
বুদ্ধিভেদা ন প্রতিসন্ধীয়ন্তে তথৈকদেহবিষয়া অপি ন প্রতিসন্ধীয়েরন্
অবিশেষাৎ। মোহয়মেকসত্ত্বস্ত সমাচারঃ স্বয়ং দৃষ্টস্ত স্মরণং নাশ্চদৃষ্টস্ত
নাদৃষ্টস্তেতি। এবং খলু নানাসন্ধানাং সমাচারোহশ্চদৃষ্টমশ্চো ন
স্মরতি। তদেতদ্ভয়মশক্যমনাত্মবাদিনা ব্যবস্থাপয়িতুমिति এবমুপ-
পন্নমন্ত্যাত্তেতি।

অনুবাদ। যে জাতীয় পদার্থের সন্নিবর্তনশতঃ (ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ-
বশতঃ) আত্মা (অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ) স্বথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তজ্জাতীয়
পদার্থকেই দর্শন করতঃ (ঐ আত্মা) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন, সেই এই
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা—অনেকার্থদর্শী অর্থাৎ বিভিন্ন-কালীন নানা পদার্থদর্শী
এক ব্যক্তির দর্শন-প্রতিসন্ধান হেতুক (অর্থাৎ “যে জাতীয় স্বখজনক পদার্থকে পূর্বের
দেখিয়া যে আমি এখন তাহাকে স্বখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই
তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিতেছি,” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া) আত্মার
(পূর্বপারকালস্থায়ী একটি অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থের) লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক

হয়। “নিয়তবিষয়” অর্থাৎ যাহার বিষয় ব্যবস্থিত বা নির্দিষ্ট, এমন “বুদ্ধিভেদমাত্রে” অর্থাৎ কণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-সম্মত আলয়বিজ্ঞান নামক কণিক-বুদ্ধি-বিশেষ-মাত্রে দেহান্তরের ন্যায় অর্থাৎ পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে ভিন্ন দেহে যেমন আলয়-বিজ্ঞানের ঐরূপ প্রতিসন্ধান হয় না, তদ্রূপ (একদেহেও পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান) সম্ভব হয় না।

(ইচ্ছার পরে ঘেষের আত্ম-লিঙ্গর ব্যাখ্যা করিতেছেন)। এইরূপ (পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপত্তমান) দুঃখজনক পদার্থ-বিষয়ে ঘেষ অনেকার্থদর্শী এক ব্যক্তির (পূর্বোক্ত প্রকার) দর্শনপ্রতিসন্ধান-হেতুক আত্মার লিঙ্গ হয়। (প্রযত্নের আত্মলিঙ্গর ব্যাখ্যা করিতেছেন) যে জাতীয় পদার্থ এই আত্মার সুখজনক বলিয়া “প্রসিদ্ধ” (জ্ঞাত), তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করতঃ (তিনি) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, সেই এই প্রযত্ন অনেকার্থদর্শী একটি দর্শন-প্রতিসন্ধান অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ব্যতীত হয় না। নিয়তবিষয়-বুদ্ধিভেদমাত্রে দেহান্তরের ন্যায় (সেই প্রত্যভিজ্ঞা-বিশেষ) সম্ভব হয় না। (সূতরাং পূর্বোক্ত প্রযত্নও পূর্বাপরকালস্থায়ী আত্মার অনুমাপক হয়)। ইহার দ্বারা (সুখজনক পদার্থের প্রযত্নের ব্যাখ্যার দ্বারা) দুঃখজনক পদার্থে প্রযত্ন ব্যাখ্যাত হইল। (অর্থাৎ সুখজনক পদার্থে প্রযত্ন যে ভাবে আত্মার অনুমাপক বলা হইল, দুঃখ-জনক পদার্থে প্রযত্নও সেই ভাবে (প্রত্যভিজ্ঞার সাহায্যে) আত্মার অনুমাপক বুঝিতে হইবে)।

(সুখ ও দুঃখের এক সঙ্গে আত্মলিঙ্গর ব্যাখ্যা করিতেছেন) সুখ ও দুঃখের স্মৃতিবশতঃ এই আত্মা তাহার সাধনকে (সুখ-সাধন পদার্থ ও দুঃখসাধন পদার্থকে) গ্রহণ করতঃ সুখ উপলব্ধি করেন, দুঃখ উপলব্ধি করেন, সুখ দুঃখ উভয়কে অনুভব করেন; পূর্বোক্তই হেতু (অর্থাৎ যে আমি পূর্বে সুখ দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই তাহার স্মরণ পূর্বক তাহার সেই সাধন গ্রহণ করতঃ সুখ ও দুঃখ লাভ করিয়া তাহার উপলব্ধি করিতেছি। এইরূপ পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধানই ঐ স্থলে সুখদুঃখের প্রথম অনুভব, তাহার স্মরণ ও পুনরায় সুখ-দুঃখানুভবের এক-কর্তৃক নিশ্চয়ে হেতু। সূতরাং ঐরূপে জায়মান সুখ ও দুঃখও চিরস্থির আত্মার অনুমাপক)।

(জ্ঞানের আত্মলিঙ্গর ব্যাখ্যা করিতেছেন) বুড়ুৎসমান হইয়া অর্থাৎ কোন পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ এই আত্মা “ইহা কি ?” এইরূপে সংশয় করেন, সংশয়

করতঃ “ইহা” এইরূপ জ্ঞানেন (নিশ্চয় করেন), সেই এই জ্ঞান (পরবর্তী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) বুঝিবার ইচ্ছা ও সংশয়ের সহিত এককর্ত্ত্বক বলিয়া জ্ঞায়মান হইয়া অর্থাৎ যে আমি বুঝিবার ইচ্ছা করিয়া সংশয় করিয়াছিলাম, সেই আমি নিশ্চয় করিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-নামক মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া আত্মলিঙ্গ অর্থাৎ চিরস্থির আত্মার অনুমাপক হয়। পূর্বোক্তই হেতু (অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞাই ঐ স্থলে বুঝিবার ইচ্ছা, সংশয় ও নিশ্চয়ের এক-কর্ত্ত্বক নিশ্চয়ে হেতু)।

তন্মধ্যে (পূর্বোক্ত কথার মধ্যে) “দেহান্তরবৎ” এই কথাটি বিশদরূপে বুঝাইতেছি। যেমন অনাত্মবাদীর অর্থাৎ যাঁহারা “অহং অহং” এই আকারের ক্ষণিক বিজ্ঞান-প্রবাহ ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ মানেন না, সেই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের (মতে) দেহান্তর-সমূহে অর্থাৎ নিজ দেহ হইতে ভিন্ন দেহে “নিয়ত বিষয়” (ক্ষণকাল-মাত্র-স্থায়ী বলিয়া বাহাদিগের প্রত্যেকের বিষয় ব্যবস্থিত বা নিয়মবদ্ধ এমন) বুদ্ধি-ভেদগুলি (আলয়-বিজ্ঞান নামক বুদ্ধি-বিশেষ-গুলি) প্রতিসংহিত অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় না, তদ্রূপ একদেহগত (নিজ নিজ দেহগত) বুদ্ধিভেদগুলিও (আলয়-বিজ্ঞান নামক অহংজ্ঞানগুলিও) প্রতিসংহিত (পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞাত) হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ নাই। (অর্থাৎ ভিন্নদেহগত বিজ্ঞানগুলি যেমন ভিন্ন, তদ্রূপ নিজ দেহগত বিজ্ঞানগুলিও পরস্পর ভিন্ন। ভিন্ন আত্মার যখন পূর্বোক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, তখন একদেহগত ভিন্ন আত্মারও পূর্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। ভিন্ন দেহগত বিজ্ঞান হইতে এক দেহগত বিজ্ঞানগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপযোগী কোন বিশেষ নাই) সেই এই এক আত্মার সমাচার (সিদ্ধান্ত)—স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয়, অগ্ন্যদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট (অজ্ঞাত) পদার্থের স্মরণ হয় না। এই রূপই নানা আত্মার সমাচার (সিদ্ধান্ত)—অগ্ন্যদৃষ্ট দৃষ্ট পদার্থ অগ্ন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না (অর্থাৎ প্রতিদেহে এক আত্মাই হউক, আর ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ অসংখ্য আত্মাই হউক, উভয় পক্ষেই স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অগ্ন্যদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ, এই দুইটি সিদ্ধান্ত)। সেই এই উভয় (উভয়-পক্ষ-স্বীকৃত স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অগ্ন্যদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ) অনাত্মবাদী অর্থাৎ যিনি অহং অহং এই আকারের ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন চিরস্থির আত্মা মানেন না, সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। এইরূপে (কথিত প্রকারে) আত্মা (চিরস্থির অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ) আছেন, ইহা সিদ্ধ হয়।

টিপ্তনী। এই শাস্ত্রের পরম প্রয়োজন অপবর্গ জীবাশ্মারই পরমপুরুষার্থ বলিয়া প্রেমেরবর্গের মধ্যে জীবাশ্মাই প্রধান। তাই মহর্ষি প্রেমেরবর্গের মধ্যে জীবাশ্মারই প্রথম উদ্দেশ্য করিয়া তদনুসারে প্রথমতঃ জীবাশ্মারই লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। মনোব্রাহ্ম ইচ্ছা, দেব, প্রবর, সূত্র, ছত্র ও জ্ঞান, জীবাশ্মার পৃথক পৃথক লক্ষণ। অর্থাৎ বাহ্যতে মনোব্রাহ্ম ঐ ইচ্ছাদি গুণ জন্মে, তাহাই জীবাশ্মা। পরন্তু জীবাশ্মার যেগুলি লক্ষণ, সেইগুলিই শ্রুতিসিদ্ধ জীবাশ্মার সাধক। ইহা বলিবার জন্য মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণেও ইচ্ছাদিকে জীবাশ্মার লিঙ্গ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারও এই সূত্রে মহর্ষির ঐ বিশেষ বক্তব্যটি (ইচ্ছাদির আশ্রয়-লিঙ্গত্ব) ব্যাখ্যা করিয়াই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন।

নিজ-দেহবর্তী জীবাশ্মা সর্বজীবেরই মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আমি নাই, ইহা কেহ বুঝে না; আমি আছি কি না, এরূপ সংশয়ও কাহারও হয় না। পরন্তু “আমি আছি” ইহা মনের দ্বারা নিঃসংশয়ে সকল জীবই বুঝিয়া থাকে। যিনি ইহা বুঝিয়াও সত্যের অপলাপ করিয়া “আমি নাই” ইহা বলিবেন, তিনি নিজের অস্তিত্বের অপলাপ করিয়া উপহাসাস্পদ হইবেন। শূন্তবাদী, আশ্মার একেবারে নাস্তিত্ব সাধন করিতে যাইয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার আশ্মার নাস্তিত্ব-সাধক প্রমাণই আশ্মার অস্তিত্ব-সাধক হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থে সামান্ততঃ কেহ বিবাদ করিতে পারেন না, বিবাদকারী নিজে না থাকিলে বিবাদ করে কে? কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন;—“আশ্মা প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে”। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, “আমি” বলিয়া আশ্মার যে মানস বোধ, তাহা আশ্মার সামান্য জ্ঞান। ইহা প্রকৃত আশ্মা-সাক্ষ্যকার নহে। কারণ, উহা দেহাদিতে আশ্রয়বুদ্ধ্যি। আমি কে? ইহা বথার্থরূপে প্রত্যক্ষ না করিলে আশ্মার বিশেষ জ্ঞান বা প্রকৃত আশ্মাসাক্ষ্যকার হয় না। ঐ প্রকৃত আশ্মাসাক্ষ্যকার সমাধি ব্যতীত কাহারই হইতে পারে না। মূলকথা, দেহাদিভিন্নরূপে প্রকৃত আশ্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহেন। তাহা হইলে আশ্মাসাক্ষ্যকারের জন্য শ্রুতিতে আশ্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধি থাকিবে কেন? এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রমাণসংগ্রহের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেও (তৃতীয় হুক্তভাষ্যে) আশ্মার লৌকিক প্রত্যক্ষের কথা না বলিয়া, যোগসমামি-জাত অলৌকিক প্রত্যক্ষের কথাই বলিয়াছেন এবং অনুমানভাষ্যে ইচ্ছাদির দ্বারা “অপ্রত্যক্ষ” আশ্মার “সামান্ততো দৃষ্ট” অনুমানের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। ফলতঃ আশ্মা দেহাদিভিন্নরূপে লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, ইহাই ভাষ্যার্থ। প্রথমতঃ শ্রুতি প্রভৃতি আশ্রয়বাক্য হইতে বথার্থরূপে আশ্মার শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্রবোধ করিতে হইবে। পরে ঐ জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য ঐ আশ্মার মনন অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধ স্বরূপে অনুমান করিতে হইবে। সে কিরূপে? তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

ভাষ্যে “যজ্ঞাতীয়ত্ব” ইত্যাদি কথার দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাপ্তি স্বরণ এবং “তজ্ঞাতীয়ং পশুন” এই কথার দ্বারা লিঙ্গপরামর্শরূপ অনুমান-প্রমাণই স্থচিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রথমজাত পদার্থদর্শন হইতে পরজাত গ্রহণেচ্ছা পর্যন্ত সবগুলিই এক-কর্তৃক। ঐরূপে জায়মান ঐ ইচ্ছাই উহাদিগের

সকলের এক-কর্তৃক স্বচনা করিতেছে। একই ব্যক্তি ঐ সবগুলির কর্তা, উহা নিঃসংশয়ে কি করিয়া বুঝিব? তাই হেতু বলিয়াছেন,—“একতানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাং”। অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই একই ব্যক্তি ঐ সবগুলির কর্তা, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। কারণ, ঐ স্থলে “যে আমি যে জাতীয় স্মৃজনক পদার্থকে পূর্বে দেখিয়া এখন তাহাকে স্মৃজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই সেই জাতীয় পদার্থকে দেখিতেছি,” এইরূপ দর্শনবিষয়ক প্রতিসন্ধান অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা ইহা থাকে। উহা সর্ব-সম্মত। ঐ প্রত্যভিজ্ঞাতে পূর্বাভূতবজ্র সঙ্কার-বশতঃ স্মরণ আবশ্যক। স্মরণাৎ দর্শন হইতে স্মরণকাল পর্যন্ত স্থায়ী একটি কর্তা আবশ্যক। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই তাহার স্মরণ করিতে পারেন। দর্শনের কর্তা একজন, স্মরণের কর্তা অল্প, ইহা কখনই হইতে পারে না। মূল কথা, পূর্বোক্ত দর্শনাদির একটি কর্তা না হইলে স্মরণের সম্ভাবনা না থাকায়, পূর্বোক্ত প্রকার মানস-প্রত্যক্ষরূপ সর্বসম্মত প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। স্মরণাৎ বুঝা যায়, যিনি ঐ স্থলে দর্শনের কর্তা, স্মরণের কর্তা, অনুমানের কর্তা এবং ইচ্ছার কর্তা, তিনিই আত্মা। তাহা হইলে পূর্বোক্ত ইচ্ছার দ্বারা চির-স্থির একটি আত্মারই অনুমান হয়, ইহা বলা হইল। শরীর অথবা চক্ষুাদি ইন্দ্রিয়কে ঐ দর্শন-স্মরণাদির কর্তা বলা যায় না। কারণ, উহারা চির-স্থির নহে। ইহা জন্মেই বাল্যদ্যৌবনাদি কালভেদে পূর্বদেহের বিনাশ ও দেহান্তর-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বাল্যদেহের দৃষ্ট পদার্থ বৃদ্ধদেহে কিরূপে স্মরণ করিবে? নেত্রদৃষ্ট পদার্থ নেত্র নষ্ট হইয়া গেলে অস্ত্র ইন্দ্রিয় কি করিয়া স্মরণ করিবে? মন জ্ঞানাদির করণত্বরূপেই সিদ্ধ, তাহা কর্তা হইতে পারে না। এ সকল কথা তৃতীয়াধ্যায়ে আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যথাস্থানেই তাহা বিশদ প্রকাশিত হইবে।

অনেক ভাষ্যগ্রন্থে “ভবন্তী লিঙ্গমাশ্রয়ঃ”—এইরূপ পাঠ আছে। ভাষ্যোক্ত প্রকারে গ্রহণেচ্ছা অনেকাংশেই এক ব্যক্তির দর্শন-প্রতিসন্ধান-প্রযুক্ত উৎপন্ন হয়। প্রথম পদার্থদর্শন হইতে তজ্জাতীয় পদার্থের পুনর্দর্শনাদি কাল পর্যন্ত স্থায়ী একটি আত্মা না থাকিলে ঐরূপে গ্রহণেচ্ছা জন্মিতেই পারে না, স্মরণাৎ ঐ প্রকার ইচ্ছা চির-স্থির আত্মার অনুমাপক, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে তাৎপর্য। “ভবন্তী” ইহার ব্যাখ্যা উৎপাদ্যমান। তাৎপর্যটাকাকারের বর্ণিত তাৎপর্য গ্রহণ করিলে এ পাঠ ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে “অহং” এই আকারের জ্ঞান ভিন্ন চিরস্থির আত্মা নাই। ঐ অহংজ্ঞানের নাম আলয়-বিজ্ঞান। উহা ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণকালমাত্র-স্থায়ী। পূর্ব-জাত “অহংজ্ঞান” পরক্ষণেই আর একটি অহংজ্ঞান জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। এইরূপে নদী-প্রবাহের স্রাব, দীপশিখার স্রাব, “অহং অহং অহং” এইরূপ আকারে প্রতিক্ষণ জন্মান আলয়-বিজ্ঞানের প্রবাহই আত্মা। ইহারই নাম বিজ্ঞানত্বক। ইহারই নাম চিত্ত। একদেহগত ঐ বিজ্ঞান-প্রবাহ বা চিত্ত সেই দেহের পক্ষেই আত্মা, উহা অস্ত্র দেহের আত্মা নহে। পূর্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায় পূর্বোক্ত প্রকার বুদ্ধি ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কিছু মানেন নাই; তাই তাঁহাদিগকে “বৌদ্ধ”

বলা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত তাঁহার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শ্রুতি-সম্মত নিত্য আত্মা মানেন নাই; তাই বেদ-প্রামাণ্য-বিশ্বাসী আন্তিকগণ তাঁহাদিগকে “নাস্তিক” এবং “অনাস্তবাদী” বা “নৈরাশ্র্যবাদী” বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বেদবিশ্বাসী আন্তিকগণ কেহ বেদ না মানিলেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিতেন। মহর্ষি মনুও বেদনিষ্পেক্ষকে নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যিনি পরলোক মানেন না, তিনি “নাস্তিক,” ইহাই কিন্তু নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ। ঐ অর্থে বেদ না মানিয়াও আন্তিক হওয়া যায়। ভাষ্যকার পূর্ববর্ণিত বৌদ্ধসম্মত “আলয়-বিজ্ঞানকে” লক্ষ্য করিয়া এখানে বলিয়াছেন,—“নিয়তবিষয়ে” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্মত “অহং-জ্ঞান”গুলি প্রত্যেকেই ক্ষণকাল-মাত্র স্থায়ী। সুতরাং উহার নিয়তবিষয় অর্থাৎ উহাদিগের বিষয় নির্দিষ্ট বা ব্যবস্থিত, উহার কোন নির্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন সর্ব বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না। অতএব ঐ “অহং-জ্ঞানে” পূর্বোক্ত দর্শন প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। “প্রতিসন্ধান” বলিতে এখানে প্রত্যভিজ্ঞা; উহা প্রত্যক্ষ-বিশেষ। পূর্বাভূত বিষয়ের স্মরণ ব্যতীত ঐ প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে না। যখন পূর্ববর্ণিত স্থলে পূর্বোক্ত প্রকারে দর্শনপ্রতিসন্ধান জন্মে, ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই, (প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যায় না। মানস-প্রত্যক্ষরূপ ঐ প্রত্যভিজ্ঞায় মনঃ স্রবতঃ প্রমাণ) তখন ঐ স্থলে আত্মা অবশ্য তাঁহার পূর্বদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ করিয়া থাকে; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বৌদ্ধসম্মত অহংজ্ঞানরূপ আত্মা যখন ক্ষণমাত্র-স্থায়ী, তখন যে অহংজ্ঞানরূপ আত্মা পূর্বে দর্শন করিয়াছিল, পরক্ষণেই তাহার বিনাশ হওয়ায়, সে আত্মা আর পরে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। পরজাত অহংজ্ঞানরূপ কোন আত্মাও তাহা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, সেই পরজাত আত্মা পূর্বে সে পদার্থ দেখে নাই, তখন তাহার জন্মই হয় নাই। অন্তের দৃষ্ট পদার্থ অন্তে স্মরণ করিতে পারে না। যিনি স্রষ্টা, তাঁহাতেই সংস্থার জন্মে; তজ্জাত তিনিই স্মরণ করেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন, নচেৎ তাঁহাদিগের মতে একদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মা অন্তদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ অল্প আত্মার দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করে না কেন? রামের দৃষ্ট বিষয় শ্রাম না দেখিলে শ্রাম তাহা স্মরণ করিতে পারে কি? অতএব বৌদ্ধসম্মত একদেহগত ক্ষণিক “অহংজ্ঞান”গুলিও পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অন্ত-দেহগত “অহংজ্ঞান”গুলির দ্বারা একে অন্তের অগ্রভূত বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। স্মরণের সম্ভাবনা না থাকায় তাহাতে পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞাও অসম্ভব। সুতরাং বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক অহংজ্ঞানগুলি কোনরূপেই “আত্মা” হইতে পারে না। ভাষ্যকার “নিয়তবিষয়ে” এই কথার দ্বারা বৌদ্ধ-সম্মত আলয়বিজ্ঞানে প্রত্যভিজ্ঞা কেন সম্ভব নহে, তাহার হেতু সূচনা করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ক্ষণিক অহংজ্ঞানগুলির কোনটিই এক ক্ষণের অধিক

১। “গতি নাস্তি বিষ্ণু মতিঃ” (৪৪।১০)।—পাণিনিয়ঃ। অতি পরলোক ইত্যেব মতির্ভূত স আন্তিকঃ।—নাস্তীতি মতির্ভূত স নাস্তিকঃ।—সিদ্ধান্তকোষী (১)।

কাল স্থায়ী না হইলেও নির্বাপন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ “অহংজ্ঞানে”র প্রবাহ চলিতেই থাকে। ঐ অহংজ্ঞানের প্রবাহই আত্মা। উহার নাম “অহংজ্ঞান-সত্ত্বান”। উহার মধ্যগত এক একটি “অহংজ্ঞানের” নাম “অহংজ্ঞানসত্ত্বানী”। নির্বাপন না হওয়া পর্য্যন্ত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মার উচ্ছেদ না হওয়ার তাহাতে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার এই সমাধানের অসারতা স্মৃতির জন্তই “বুদ্ধিভেদমাত্র” এই স্থলে “মাত্র” শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধ-সম্মত অহংজ্ঞানের প্রবাহ বা সত্ত্বান ঐ অহংজ্ঞানসত্ত্বানী হইতে বস্তুতঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। ঐ বুদ্ধিপ্রবাহও কতকগুলি বুদ্ধি-বিশেষ মাত্র। কণমাত্র-স্থায়ী বলিয়া যখন কোন বুদ্ধিবিশেষেই পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না, তখন বুদ্ধিপ্রবাহেই বা কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? ঐ বুদ্ধিবিশেষ ভিন্ন বুদ্ধিপ্রবাহ ত কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে? যদি ঐ অহংজ্ঞানের প্রবাহ অতিরিক্ত পদার্থই হয়, তাহা হইলে পূর্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণের জন্ত তাহাকে চিরস্থির পদার্থই বলিতে হইবে—তাহা হইলে চিরস্থির অতিরিক্ত আত্মা মানাই হইল,—নাম নাজে কোন বিবাদ নাই। যে কোন নামে চিরস্থির আত্মা মানিলেই পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিতে হইবে।

এইরূপে ভাষ্যকার পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধানের দ্বারাই ইচ্ছাদিকে চিরস্থির আত্মার অল্পমাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্য-বর্ণিত ঐ ইচ্ছাদি স্থলে পূর্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণের সহিত পূর্ব-জাত জ্ঞান ও পরজাত জ্ঞানের একবিষয়রূপে যে প্রতিসন্ধান হয়, তাহাই চিরস্থির আত্মাসিদ্ধিতে ব্যতিরেকী হেতু, স্মৃত্তোক্ত ইচ্ছাদি গুণই বস্তুতঃ হেতু নহে। “পূর্বোক্ত এব হেতুঃ” এই বথার দ্বারাও পরে ছই স্থলে ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধানরূপ হেতুকেই স্মরণ করাইয়াছেন। ভাষ্য-বর্ণিত ইচ্ছাদি স্থলে ঐরূপ প্রতিসন্ধান জন্মে বলিয়াই সূত্রকার ইচ্ছাদিকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়াছেন। লিঙ্গ বলিতে এখানে অল্পমাপক মাত্র।

ইচ্ছাদিকে আত্মার লক্ষণ বলিবার জন্তও ঐরূপ ভাবে সূত্র বলিতে হইয়াছে। অল্পমান-ভাষ্যে ভাষ্যকার যে ভাবে আত্মার “সামান্ততো দৃষ্ট” অল্পমান বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা এবং সেখানে বার্তিককার প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানেও বার্তিককার চরমকল্পে এই সূত্রের সেইরূপ ব্যাখ্যাস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বৌদ্ধসম্মত আত্মাতে ভাষ্যকার বাংলায়ন-প্রদর্শিত অল্পপপত্তির উচ্চারণের জন্ত দিঙ-নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ মহামন্যীবিগণ যেকূলে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, উদ্যোতকর স্মারবার্তিক তাহার উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার তাহার বিশদ প্রকাশ করিয়াছেন। “শারীরক ভাষ্য”, “ভামতী”, উদয়নের “বৌদ্ধাধিকার” ও “কুহুমাত্রলি” প্রভৃতি গ্রন্থেও পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতের বিশদ সমালোচনা ও সমীচীন খণ্ডন হইয়াছে। বাহ্যলভয়ে সে সব কথা এখানে পরিত্যক্ত হইল। বাংলায়ন এই স্মার-ভাষ্যে বহু স্থানেই বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

১। “বৃত্তিঃ পূর্ণাণরপ্রত্যয়ভাষ্যেককককক উভাত্যাং সহ একবিষয়ত্বেন প্রতিসন্ধীয়মানবাং”—মাত্মবার্তিক-তাৎপর্য্যটীকা।

ইতঃপূর্বেও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ গিয়াছে। এই সূত্র-ভাষ্যের দ্বারা অল্প সূত্র-ভাষ্যেও স্পষ্ট বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ প্রচুর আছে—তবুও “বিশ্বকোষে” বাংস্ভাষ্যনের অতি-প্রাচীনত্ব সমর্থনের জন্য লিখিত হইয়াছে,— “বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যকার প্রসঙ্গপাদ অনেক স্থলে বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়াছেন; কিন্তু বাংস্ভাষ্যন কোথাও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই” ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ, দ্বাদশ শব্দ—৫০১ পৃষ্ঠা)।

ভাষ্য। তস্ম ভোগাধিষ্ঠানম্।

অনুবাদ। তাহার (পূর্ববসূত্রবর্ণিত জীবাঙ্কার) ভোগের অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবের অধিষ্ঠান (স্থান)।

সূত্র। চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ ॥১১॥

অনুবাদ। চেষ্টার আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় এবং অর্থের অর্থাৎ সুখ-দুঃখের আশ্রয় শরীর। (অর্থাৎ চেষ্টাশ্রয়ত্ব, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব ও অর্থ্যশ্রয়ত্ব, এই তিনটি শরীরের লক্ষণ)।

ভাষ্য। কথং চেষ্টাশ্রয়ঃ? ঈপ্সিতং জিহাসিতং বাহর্থমধিকৃত্য ঈপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য তদুপায়ানুষ্ঠানলক্ষণা সমীহা চেষ্টা, সা যত্র বর্ততে তচ্ছরীরম্। কথমিন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ? যস্তানুগ্রহেণানুগৃহীতানি উপঘাতে চোপহতানি স্ববিষয়েষু সাধ্বসাধুযু বর্তন্তে স এষামাশ্রয়ন্তুচ্ছরীরম্। কথমর্থ্যশ্রয়ঃ? যস্মিন্নায়তনে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাচ্ছপন্নয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ প্রতिसংবেদনং প্রবর্ততে স এষামাশ্রয়ন্তুচ্ছরীরমিতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) চেষ্টাশ্রয় কিরূপে? (অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ চেষ্টা শরীর ভিন্ন অন্য পদার্থেও থাকে, আবার কোন শরীর-বিশেষেও নাই; সুতরাং চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয়ীভূত অথবা পরিত্যাগের ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রাপ্তির ইচ্ছা বা পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্ন ব্যক্তির তাহার (প্রাপ্তি বা পরিত্যাগের) উপায়ানুষ্ঠানরূপ সমীহা ‘চেষ্টা’; তাহা যেখানে থাকে, তাহা “শরীর”। (পূর্ববপক্ষ) “ইন্দ্রিয়াশ্রয়” কিরূপে? (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলেই যদি শরীর হয়, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে ইন্দ্রিয় সংযোগকালে ঘটাদি পদার্থও শরীর হইয়া পড়ে; সুতরাং “ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) বাহ্যর অনুগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ বাহ্যর সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট হইয়া এবং বাহ্যর বিনাশে অবশ্য বিনষ্ট হইবে, এমন বহিরিন্দ্রিয়বর্গ সাধু ও অসাধু স্ববিষয়সমূহে (গন্ধাদি বিষয়সমূহে)

বর্তমান হয়, তাহা ইহাদিগের (ইন্দ্রিয়-বর্গের) আশ্রয়—তাহা শরীর । (পূর্ববপক্ষ) অর্থাশ্রয় কিরূপে ? অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত গন্ধাদি “অর্থ” ঘটাদি পদার্থেও আছে ; সুতরাং “অর্থাশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ বলা যায় না । (উত্তর) যে অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধকর্ষহেতুক উৎপন্ন সূত্র ও হ্রঃখের অনুভূতি হয়, তাহা ইহাদিগের (সূত্র-হ্রঃখরূপ অর্থের) আশ্রয়, তাহা শরীর ।

টিপ্পনী । “তত্ত্ব ভোগাধিষ্ঠানং” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার স্বত্রের অবতারণা করিয়াছেন । সূত্র-বাক্যের সহিত ইহার যোগনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে । ভাষ্যকার প্রথমতঃ ঐ কথার দ্বারা শরীর আত্মার ভোগস্থান, শরীর না থাকিলে আত্মার কোন ভোগ হইতে পারে না ; সুতরাং শরীরই আত্মার সকল অনর্থের পরম নিদান, এই তত্ত্ব জানাইয়া আত্মার পরে শরীরের কথা বলাই সংগত, ইহাই সূচনা করিয়াছেন । ‘চেষ্ঠাশ্রয়ত্ব’, ‘ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব’, ‘অর্থাশ্রয়ত্ব’—এই তিনটি শরীরের পৃথক পৃথক লক্ষণ । চেষ্ঠা বলিতে ক্রিয়ামাত্র নহে । হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহারের ইচ্ছাবশতঃ যত্নবান্ হইয়া তাহার উপায়মূর্ত্তানরূপ যে শারীরিক ক্রিয়া, তাহাই চেষ্ঠা । ঘটাদি পদার্থে তাহা নাই । সমাহিত ব্যক্তির শরীরে এবং পাম্বাণ-মধ্যবর্তী ভেদাদি-শরীরে তাহা না থাকিলেও তাহার যোগ্যতা আছে । বৃক্ষাদিরও চেষ্ঠা আছে । বৃক্ষাদি উদ্ভিদবর্গের জীবন, চৈতন্য ও সূত্রহ্রঃখের সত্তা মন্বাদি শাস্ত্রে কৌণ্ডিত, অনেক দার্শনিক কর্তৃক সমর্থিত এবং কালিদাসাদি কবিগণ কর্তৃক গীত আছে । তাৎপর্য্য-টীকাকার বৃক্ষাদিকে শরীরের লক্ষণের লক্ষ্য বলেন নাই । ইন্দ্রিয়াশ্রয় বলিতে ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত বা ইন্দ্রিয়ের অবিকরণ নহে । শরীর থাকিলে ইন্দ্রিয় থাকে, শরীর নষ্ট হইলে ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়, এই অর্থে শরীরকে ইন্দ্রিয়াশ্রয় বলা হইয়াছে । ঐ ভাবে ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ হইতে পারে । ‘অর্থ’ বলিতে এখানে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ নহে । গন্ধাদি প্রত্যক্ষ-জ্ঞাত সূত্র ও হ্রঃখই এখানে “অর্থ” শব্দের প্রতিপাদ্য । অর্থাৎ গন্ধাদি অর্থ-প্রযুক্ত সূত্রহ্রঃখের আশ্রয় বলিয়াই শরীরকে অর্থাশ্রয় বলা হইয়াছে । শরীর না থাকিলে ঐ সূত্র-হ্রঃখ হয় না এবং বিশ্বব্যাপী জীবাশ্রয় শরীর-প্রদেশেই ঐ সূত্রহ্রঃখের উৎপত্তি ও অনুভূতি হয় ; সুতরাং পূর্বোক্ত “অর্থাশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ হইতে পারে ।

ভাষ্য । ভোগসাধনানি পুনঃ ।

অনুবাদ । (পূর্বোক্ত আত্মার) ভোগসাধন কিন্তু, অর্থাৎ সূত্রহ্রঃখ-ভোগের পরস্পরায় সাধন কিন্তু—

সূত্র । আণরসনচক্ষুস্ত্রক্শ্রোত্রাগৌন্দ্রিয়ানি

ভূতেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । ভূতজ্ঞাত অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমূলক জ্ঞান, রসন,

চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, (এই পাঁচটি) ইন্দ্রিয় । (অর্থাৎ ত্রাণর প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম, ত্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ) ।

ভাষ্য । জিহ্বাত্যেনেনতি ত্রাণং, গন্ধং গৃহ্ণাতীতি । রসরত্যেনেনতি রসনং, রসং গৃহ্ণাতীতি । চর্কেহেনেনতি চক্ষুঃ, রূপং পশ্যতীতি । ত্বক্স্থান-মিন্দ্রিয়ং ত্বক্, তদুপচারঃ স্থানাদিতি । শৃণোত্যেনেনতি শ্রোত্রং, শব্দং গৃহ্ণাতীতি । এবং সমাখ্যানির্বচনসামর্থ্যাদবোধ্যং স্ববিষয়গ্রহণ-লক্ষণানো-দ্ভিয়াণীতি । ভূতেভ্য ইতি নানাপ্রকৃतीনামেষাং সতাং বিষয়নিয়মো নৈকপ্রকৃतीনাং, সতি চ বিষয়নিয়মে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি ।

অনুবাদ । ইহার দ্বারা ত্রাণ করে, এ জন্ত ত্রাণ । (ত্রাণ করে, ইহার অর্থ) গন্ধ গ্রহণ করে । ইহার দ্বারা আস্বাদ করে, এ জন্ত রসন । (আস্বাদ করে, ইহার অর্থ) রস গ্রহণ করে । ইহার দ্বারা দেখে, এ জন্ত চক্ষুঃ । (দেখে, ইহার অর্থ) রূপ দর্শন করে । ত্বক্স্থান অর্থাৎ চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয় ত্বক্ । স্থান-বশতঃ অর্থাৎ চর্ম্ম ঐ ইন্দ্রিয়ের স্থান বলিয়া তাহাতে (চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয়ে) উপচার (চর্ম্মবাচক “ত্বচ্” শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ) । ইহার দ্বারা শ্রবণ করে, এ জন্ত শ্রোত্র, (শ্রবণ করে, ইহার অর্থ) শব্দ গ্রহণ করে । এইরূপ সমাখ্যার নির্বচন-সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ত্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি সংজ্ঞার যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইল, সেইরূপ অর্থে সামর্থ্য থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি স্ববিষয়গ্রহণ-লক্ষণ, ইহা বুঝিবে । (অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি সাধনহই ত্রাণাদি পক্ষেন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ) । ইহারা নানাপ্রকৃতি হইলে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাদান-সম্ভূত হইলে ইহাদিগের (ত্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের) বিষয় ব্যবস্থা হয় ; একপ্রকৃতি হইলে অর্থাৎ কোন একটি মাত্র উপাদান-সম্ভূত হইলে ইহাদিগের বিষয় ব্যবস্থা হয় না, বিষয় ব্যবস্থা হইলেই ইহাদিগের স্ববিষয়-গ্রহণ-লক্ষণ হয়, এ জন্ত ‘ভূতেভ্যঃ’ এই কথাটি বলিয়াছেন ।

টিপ্পনী । ইন্দ্রিয়গ্রহণ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্গের পূর্বে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণই বক্তব্য । ঐ ইন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ সূচনার জন্তই ভাষ্যকার প্রথমতঃ “ভোগসাধনানি পুনঃ” এই ভাষ্যের দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । সূত্রবাক্যের সহিত উহার যোজন্য বুঝিতে হইবে । সূত্রভ্রষ্টের সাক্ষাৎ-কারের নাম ভোগ । মন তাহার সাক্ষাৎ সাধন হইলেও ত্রাণাদি ইন্দ্রিয় পাঁচটি তাহার পরম্পরায় সাধন । শরীর তাহার অধিষ্ঠান, ত্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গই কিন্তু তাহার পরম্পরায় সাধন । মর্হর্ষি এই একটি সূত্রের দ্বারাই ত্রাণাদি পক্ষেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন । তাহার দ্বারাও ঐ ইন্দ্রিয়বর্গের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । ভাষ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন । সূত্রে “ইন্দ্রিয়াণি”

এই অংশ লক্ষ্য-নির্দেশ। উহার ব্যাখ্যা “জ্ঞানাদীনি”। জ্ঞানাদি শব্দের দ্বারা কেবল ঐ ইন্দ্রিয়বর্গের বিশেষ উদ্দেশ্যরূপ বিভাগ করা হয় নাই, উহার দ্বারাই পাঁচটি লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার ঐ জ্ঞানাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থে ব্যাখ্যার দ্বারা ঐ পাঁচটি লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—গন্ধগ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়। রস-গ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় রসেন্দ্রিয়। রূপ দর্শনের সাধন ইন্দ্রিয় চক্ষুরেন্দ্রিয়। স্পর্শ-গ্রহণের সাধন চর্ম্মস্থিত ইন্দ্রিয় স্পর্শেন্দ্রিয়। শব্দ-গ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় শ্রোত্রেন্দ্রিয়। যেমন “মঞ্চ” শব্দের মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে লাক্ষণিক প্রয়োগ^১ হয়, তদ্রূপ চর্মে অবস্থিত বলিয়া চর্ম্মবাক্য “স্বচ্” শব্দের স্পর্শগ্রাহক চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয়ে লাক্ষণিক প্রয়োগ বশতঃ উহার দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয়-বিশেষই বুঝিতে হইবে। জ্ঞানাদি সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা গেল, ইহার ষ্ট ষ্ট বিবয়েরই গ্রাহক;—সুতরাং উহার দ্বারা ষ্ট ষ্ট বিবয়ের উপলব্ধি-সাধনই জ্ঞানাদি পক্ষেঞ্জিয়ের সামান্য লক্ষণ, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

সাংখ্যমতে এক “অহঙ্কার” হইতেই সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। কিন্তু তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়-বর্গের বিষয়-ব্যবস্থা হয় না। অর্থাৎ গন্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই বিষয়, অস্ত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, রূপ চক্ষুরেন্দ্রিয়েরই বিষয়, অস্ত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, এইরূপে বহিরিন্দ্রিয়গুলির যে বিষয়-নিয়ম আছে, তাহা অব্যক্তিক হইয়া পড়ে। ঐ ইন্দ্রিয়গুলি কিস্তি, জল প্রভৃতি বিজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন উপাদানসমুহ হইলে ঐ বিষয়-নিয়ম হইতে পারে। মহর্ষি তৃতীয়াধ্যায়ে ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কলতঃ বহিরিন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-ব্যবস্থা রক্ষার জন্তই মহর্ষি স্বত্রে “ভূতেভ্যঃ” এই কথার দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে “ভৌতিক” বলিয়া গিয়াছেন। বহিরিন্দ্রিয়-বর্গের বিষয়-নিয়ম থাকাতাই ষ্ট বিষয় গ্রহণ অর্থাৎ স্ববিষয়-গ্রাহক বহিরিন্দ্রিয়-বর্গের সামান্য লক্ষণ হইতে পারে। তাই শেষে বলিয়াছেন,—‘স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণং ভবতি’। বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ নামক নিত্য ভূতস্বরূপ বলিয়া ভূতজন্ত নহে, তথাপি জ্ঞানাদি চারিটি ইন্দ্রিয়কে ভূতজন্ত বলিতে যাইয়া বহুর অনুরোধে মহর্ষি “ভূতেভ্যঃ” এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। কলতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ও সাংখ্য-সম্মত “অহঙ্কার” হইতে সমুদ্ভূত নহে, উহাও জ্ঞানাদির স্তায় ভৌতিক বা ভূতাত্মক, ইহাই স্বত্রকার মহর্ষির তাৎপর্য। তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশ এক হইলেও কর্ণগোলকের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ-বিশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ-গোলক-সংযোগরূপ উপাধিগুলি জন্ত পদার্থ বলিয়া এবং তাহাদিগের ভেদবশতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়গুলিও জন্ত ও ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার-সিদ্ধ। ঐ ব্যবহারিক ভেদ ধরিয়াই মহর্ষি শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষেও “ভূতেভ্যঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশজন্ত নহে, উহা আকাশই। ইন্দ্রিয়-স্বত্রে মনের উত্তেজনা নাই কেন? ইহা প্রত্যক্ষ-স্বভাব্যেই ভাষ্যকার বলিয়া আনিয়াছেন।

ভাষ্য। কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি ?

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়-কারণ অর্থাৎ জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়ের উপাদান ভূতবর্গ কোন্গুলি ?

সূত্র । পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥১৩॥

অনুবাদ । ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এইগুলি (এই পাঁচটি) ভূতবর্গ ।

ভাষ্য । সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশো ভূতানাং বিভক্তানাং স্বেচং
কার্য্যং ভবিষ্যতীতি ।

অনুবাদ । বিভক্ত ভূতবর্গের কার্য্য স্বেচ হইবে, অর্থাৎ সহজে বলা যাইবে,
এ জগৎ সংজ্ঞা শব্দগুলির দ্বারা (ভূতবর্গের) পৃথক্ উপদেশ করিয়াছেন ।

টিপ্পনী । পূর্বসূত্রে ইন্দ্রিয়ের কারণরূপে ভূতবর্গের উপদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে
ভূতবর্গের বিশেষ সংজ্ঞাগুলি বলা হয় নাই । মহর্ষি পরে ভূতবর্গের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বাহা
বলিবেন, তাহা স্মরণার্থে করিবার জন্ত এই প্রমের-লক্ষণ-প্রকরণেও ভূতবর্গের সংজ্ঞাগুলি বলিয়া
গিয়াছেন । স্মার-বাস্তবিককার এই সূত্রের ও ভাষ্যের কোন উল্লেখ না করায় অনেকে বলেন, এইটি
সূত্র নহে । “কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি” এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাষ্যকার নিজেই তাহার উত্তর-বাক্য
লিখিয়া গিয়াছেন । অর্থাৎ ঐ অংশ সমস্তই ভাষ্য ।

কিন্তু ত্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাহার “স্মারসূচীনিবন্ধ” গ্রন্থে এইটিকে সূত্রমধ্যেই গণ্য করিয়া
স্মার-সূত্রের ৫২৮ সংখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন । সুতরাং ইহা সূত্ররূপেই গৃহীত হইল ।
“সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশঃ” ইত্যাদি ভাষ্যের ভাবেও ভাষ্যকারের মতে এইটি সূত্র বলিয়াই বুঝা
যায় । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এইটিকে সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য । ইমে তু খলু ।

অনুবাদ । এইগুলিই কিন্তু—

সূত্র । গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদি-গুণা- স্তদর্থাঃ ॥১৪॥

অনুবাদ । পৃথিব্যাদির গুণ (পূর্বোক্ত পঞ্চ ভূতের গুণ) গন্ধ, রস, রূপ,
স্পর্শ, শব্দ, (এই পাঁচটি) “তদর্থ” (ইন্দ্রিয়ার্থ) ।

ভাষ্য । পৃথিব্যাদীনাং যথাবিনিয়োগং গুণা ইন্দ্রিয়াণাং যথাক্রমমর্থী
বিষয়া ইতি ।

অনুবাদ । পৃথিবী প্রভৃতির ব্যবস্থানুসারে গুণগুলি অর্থাৎ পঞ্চভূতের মধ্যে
যাহার যে গুণ ব্যবহৃত আছে, সেই গুণগুলি (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ)
যথাক্রমে ইন্দ্রিয়বর্গের অর্থ—কি না বিষয় ।

টিপ্পনী। পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকেই গন্ধাদি সমস্ত গুণ নাই; তাই বলিয়াছেন,—“যথা-
বিনিবোগম্”। অর্থাৎ পরে মহর্ষি যে ভূতের যে গুণ ব্যবহা করিয়াছেন, তদনুসারেই এখানে
“পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। ঐ গন্ধাদি পাঁচটি গুণই “অর্থ” নামক
প্রমেয়। উহারা যথাক্রমে জাণাদি ইন্দ্রিয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয়, ইহা জানাইবার জন্যই স্বত্রে
বলিয়াছেন,—“তদর্থাঃ।” তদর্থত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থত্বই ঐ অর্থ নামক প্রমেয়ের লক্ষণ। তাই
ভাষ্যকার ঐ লক্ষণেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়াণাং যথাক্রমমর্থ্য বিষয়াঃ”।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, স্বত্বে “পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই স্থলে বস্তুতঃ পুরুষ সমাসই
ভাবাদি-সম্বন্ধ। পৃথিব্যাদি গুণী ও তাহার গুণগুলি অভিন্ন পদার্থ নহে; ইহাই ঐ বস্তু-তৎপুরুষ
সমাসের দ্বারা মহর্ষি জানাইয়াছেন। কিন্তু ভ্রাম-বার্ত্তিককার বহু বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন
যে, ঐ স্থলে দ্বন্দ্ব-সমাসই মহর্ষির অভিপ্রেত। পৃথিব্যাদি বলিতে ক্ষিত্তি, জল, তেজঃ, এই তিনটি
ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্য এবং গুণ বলিতে গন্ধাদি-ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত গুণ-কন্দ্ৰাদি বুঝিতে হইবে।
কারণ, সেগুলিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ। কেবল গন্ধাদি পাঁচটি গুণকেই মহর্ষি ইন্দ্রিয়ার্থ
বলিতে পারেন না। মহর্ষি তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম স্বত্রেও দর্শন ও স্পর্শনযোগ্য ঘট-পটাদি পদার্থকে
“অর্থ” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রামবার্ত্তিকব্যাক্যায় তাৎপর্যটাকাঁকার বলিয়াছেন যে,
“পৃথিব্যাদীনং” এই ভাষ্য বস্তুতঃ পুরুষের জ্ঞাপক নহে। উহা অর্থকথন মাত্র। বস্তুতঃ ভাষ্য
পাঠ করিলে এখানে বিশ্বনাথের কথাই মনে আসে। তাৎপর্যটাকাঁকারের নিজের মতেও এখানে
বস্তুতঃ পুরুষ সমাসই ভাষ্যসম্বন্ধ বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, পূর্বোক্ত “ইমে তু খলু” এই ভাষ্য-
ব্যাক্যায় তাৎপর্যটাকাঁকার বলিয়াছেন যে, “তু” শব্দের দ্বারা অন্ত্যন্ত ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ
করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ আরও অনেক থাকিলেও সেগুলিকে মহর্ষি ইন্দ্রিয়ার্থের মধ্যে উল্লেখ
করেন নাই। ইন্দ্রিয়ার্থের মধ্যে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশেষসমাপক এবং উহাদিগেরই
মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান; তাই মহর্ষি ঐ পাঁচটিকেই বিশেষ করিয়া প্রমেয়মধ্যে “অর্থ” নামে
উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্যটাকাঁকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিব্যাদি তিনটি এবং
অন্ত্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাদি ইন্দ্রিয়ার্থ হইলেও মহর্ষি তাহা বলেন নাই। সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসের দ্বারা
তাহাদিগের সংগ্রহ নিম্নয়োজন। পরন্তু তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দ্রিয়ার্থ-পরীক্ষা হলে গন্ধাদি পাঁচটি
ইন্দ্রিয়ার্থেরই পরীক্ষা করা হইয়াছে। সেখানে ভাষ্যকারের কথায় “পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই স্থলে
বস্তুতঃ পুরুষ সমাসই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বার্ত্তিককারের নিজের মত ভাষ্য-ব্যাক্যায়
গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। অচেতনশ্চ করণশ্চ বুদ্ধেজ্ঞানং বৃত্তিঃ, চেতনশ্চাকর্ত্তুরুপ-
লন্ধিরিতি যুক্তিবিরুদ্ধমর্থং প্রত্যাচক্ষাণক ইবেদমাহ।

অনুবাদ। অচেতন, করণ বুদ্ধির অর্থাৎ জড় অস্ত্যঃকরণের বৃত্তি (পরিণাম-
বিশেষ) জ্ঞান, অকর্ত্তী চেতনের অর্থাৎ পুরুষের উপলব্ধি, অর্থাৎ অস্ত্যঃকরণের জ্ঞান

হয়, পুরুষের উপলব্ধি হয়, জ্ঞান ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ, এই যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থ অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানকারীর ন্যায় (মহর্ষি) এই সূত্রটি বলিয়াছেন।

সূত্র । বুদ্ধিরূপলব্ধিজ্ঞানামিত্যানর্থান্তরম্ ॥১৫॥

অনুবাদ । বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, ইহার অর্থাৎ এই তিনটি শব্দ একার্থবোধক—এ তিনটি একই পদার্থ।

ভাষ্য । নাচেতনস্য করণস্য বুদ্ধেজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি, তচ্চি চেতনং স্যাৎ, একশ্চায়াং চেতনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি । প্রমেয়-লক্ষণার্থস্য বাক্যস্যাত্মার্থপ্রকাশনমুপপত্তিসামর্থ্যাদিতি ।

অনুবাদ । “অচেতন” “করণ” বুদ্ধির অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে না । যেহেতু তাহা (অন্তঃকরণ) চেতন হইয়া পড়ে । দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত হইতে অর্থাৎ দেহাদি মিলিত সমষ্টি হইতে ভিন্ন এই চেতন একমাত্র । প্রমেয় লক্ষণার্থ বাক্যের (অর্থাৎ বুদ্ধি নামক প্রমেয়ের লক্ষণোদ্দেশ্যে কথিত সূত্রের) অত্মার্থ প্রকাশন (সাংখ্যমত নিষেধরূপ অত্মার্থের সূচনা) উপপত্তি সামর্থ্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সূত্রে “বুদ্ধি,” “উপলব্ধি” ও “জ্ঞান” এই তিনটিকে একার্থক পর্যায় শব্দ বলিয়া প্রকাশ করায় উহার দ্বারা সাংখ্যমত নিষেধরূপ অত্মার্থেরও প্রকাশ হইয়া গিয়াছে ।

টিপ্পনী । বুদ্ধির কতিপয় কারণ (আয়াদি) নিরূপণ পূর্বক উদ্দেশ্যমুসারে বুদ্ধির লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন । সূত্রে “বুদ্ধি,” “উপলব্ধি” ও “জ্ঞান” এই তিনটি একার্থক শব্দ—ইহা বলাতেই “বুদ্ধির” লক্ষণ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ বাহাকে “উপলব্ধি” বলে এবং “জ্ঞান” বলে, তাহাই “বুদ্ধি” । বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ । প্রসিদ্ধ পর্যায় শব্দ অর্থাৎ একার্থক শব্দের দ্বারাও পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতে পারে । মহর্ষি এখানে তাহাই বলিয়াছেন । জ্ঞান পদার্থ সকলেরই অঙ্গভব-সিদ্ধ ; ঐ জ্ঞান ও বুদ্ধি একই পদার্থ—ইহা বলিলে “বুদ্ধি” কাহাকে বলে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন । “জ্ঞা” ধাতু ও “বুদ” ধাতুর সর্বত্র এক অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায় । পরন্তু ঐ ভাবে বুদ্ধি পদার্থের লক্ষণ বলায় অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান এই তিনটিকে একই পদার্থ বলায় সাংখ্যের মতও নিরাকৃত হইয়াছে । অবশ্য সাংখ্যমত নিরাকরণোদ্দেশ্যে এই সূত্র বলা হয় নাই, তৃতীয়াধ্যায়ে “বুদ্ধি”পরীক্ষা-প্রকরণেই মহর্ষি সাংখ্যমত নিরাকরণ করিয়াছেন । কিন্তু এখানে বুদ্ধির লক্ষণ বলিতে বাইরা সূত্রকার বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সাংখ্যমত নিরাকরণকারীর হ্রাসই এই সূত্রটি বলা হইয়াছে ; তাই ভাব্যকার পূর্বভাষ্যে “প্রত্যাক্ষাণক ইব” এই স্থলে “ইব” শব্দের দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন । সাংখ্যমতে “বুদ্ধি” বলিতে অন্তঃকরণ । ঐ বুদ্ধির বৃত্তি অর্থাৎ কোন পদার্থাকারে পরিণামবিশেষই “জ্ঞান” । উহা বুদ্ধিরই বস্তু, আত্মার বস্তু নহে । কারণ, আত্মা অপরিশোধিত । চৈতন্যরূপ আত্মা চেতন ও অকর্তা । চক্রমণ্ডলের দ্বারা স্বয়ং অপ্রকাশ

জড় বুদ্ধিতত্ত্ব (অন্তঃকরণ) চৈতন্যরূপ মার্ভগুণগুলের ছায়াপাতেই প্রকাশিত হয় এবং পদার্থকে প্রকাশ করে। এই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার সহিত পূর্বোক্ত বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের যে অবাস্তব সম্বন্ধ, তাহার নাম “উপলব্ধি।” উহাই অপরিণামী আত্মার বৃত্তি। বুদ্ধির পরিণাম-বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধিরই বৃত্তি। ফলতঃ সাংখ্যমতে “বুদ্ধি”, “জ্ঞান”, “উপলব্ধি”—এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। ভাষ্যকার এই সাংখ্যমতের সামান্ত্র্য উল্লেখ করিয়া সামান্ত্র্যতঃ তাহার অধোক্তিকতাও সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, জড় অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে না। তাহা হইলে তাহা চেতন পদার্থ হইয়া পড়ে। দেহাদি হইতে ভিন্ন চেতন পদার্থ একদেহে একমাত্র, ইহা সাংখ্যেরও সিদ্ধান্ত। অন্তঃকরণকে চেতন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে এক দেহে দুইটি চেতন পদার্থ মানা হয়,—তাহা হইলে অন্তঃকরণের জ্ঞাত পদার্থ আত্মা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ, এক চেতনের জ্ঞাত পদার্থ অল্প চেতন উপলব্ধি করিতে পারে না। জড় অন্তঃকরণে জ্ঞান হইলেও তাহা বস্তুতঃ চেতন পদার্থ হয় না—কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডলের জায় অন্তঃকরণে চেতন আত্মার প্রতিবিম্বপাত হয় বলিয়াই, অন্তঃকরণ চেতনের জায় হইয়া থাকে এবং তজ্জন্মই জড় হইয়াও পদার্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সাংখ্য-সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নহে। কারণ, আত্মা সূর্য্যমণ্ডলের জায় পরিণামী পদার্থ নহে, অন্তঃকরণে তাহার প্রতিবিম্বপাত বাস্তব হইতে পারে না। নিরাকার নির্লিঙ্গ আত্মার প্রতিবিম্বপাত অসম্ভব। সুতরাং অন্তঃকরণে জ্ঞান স্বীকার করিলে তাহার স্বাভাবিক চৈতন্য স্বীকার করিতেই হইবে। আত্মা ও অন্তঃকরণ এই উভয়কে চেতন পদার্থ বলিয়া বলিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এক আত্মাকেই চেতন পদার্থ বলিতে হইবে। জ্ঞান তাহারই ধর্ম; বুদ্ধি ও উপলব্ধি ঐ জ্ঞানেরই নামান্তর। উহার সাংখ্যসম্মত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে। ইহাই ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য।

ভাষ্য। স্মৃত্যানুমানাগম-সংশয়-প্রতিভা-স্বপ্নজ্ঞানোহাঃ স্খাদিপ্রত্যক্ষ-মিচ্ছানয়শ্চ মনসো লিঙ্গানি তেবু সৎস্ব ইয়মপি।

অনুবাদ। “স্মৃতি”, “অনুমান”, “আগম” (শব্দবোধ), “সংশয়”, “প্রতিভা” (ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষ মানস জ্ঞানবিশেষ), “স্বপ্নজ্ঞান”, “উহ” (“আপত্তি” নামক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ অথবা সম্ভাবনা-জ্ঞানরূপ তর্ক), স্খাদির প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছাদি, মনের (মন নামক অন্তরিস্থির) “লিঙ্গ” (অনুমাণক)। সেগুলি অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গগুলি থাকিতে ইহাও (অর্থাৎ সুত্রোক্ত যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিও মনের লিঙ্গ)।

সূত্র। যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥১৬॥

অনুবাদ। একই সময়ে জ্ঞানের অর্থাৎ বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি, মনের লিঙ্গ (অনুমাণক)।

ভাষ্য। অনিন্দ্রিয়নিমিত্তাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হ-
স্তীতি। যুগপচ্ছলু ভ্রাণাদীনাং গন্ধাদীনাঞ্চ সন্মিকর্ষেণ সংস্থ যুগপজ্-
জ্ঞানানি নোৎপদ্যন্তে। তেনানুমায়েতে অস্তি তত্তদনিন্দ্রিয়সংযোগি সহ-
কারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি, যস্যাহসন্মিকর্ষনোৎপদ্যতে জ্ঞানং সন্মিকর্ষেণোৎপ-
দ্যতে ইতি। মনঃ সংযোগানপেক্ষ্য হীন্দ্রিয়ার্থ-সন্মিকর্ষস্ত জ্ঞানহেতুত্বে
যুগপচ্ছলুৎপদ্যেরন্ জ্ঞানানীতি।

অনুবাদ। “অনিন্দ্রিয় নিমিত্ত” অর্থাৎ ভ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয় বাহাদিগের নিমিত্ত
নহে, এমন “স্মৃতি” প্রভৃতি (পূর্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান এবং ইচ্ছাদি) “করণান্তর-
নিমিত্ত” অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ভিন্ন কোন একটি করণনিমিত্তক হইবার যোগ্য। এবং
একই সময়ে ভ্রাণ প্রভৃতির ও গন্ধ প্রভৃতির সন্মিকর্ষ হইলে একই সময়ে নিশ্চয়ই
অনেক জ্ঞান (অনেক ইন্দ্রিয়জন্ম বিজাতীয় অনেক প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না;
তদ্বারা অনুমিত হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয় সংযুক্ত, অব্যাপক অর্থাৎ অণুপরিমাণ
(প্রত্যক্ষের) সহকারী করণান্তর আছে, যাহার অসন্মিধিবশতঃ (সেই ইন্দ্রিয়ের
সহিত অসংযোগবশতঃ) “জ্ঞান” (সেই ইন্দ্রিয়-জন্ম প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না এবং
সন্মিধিবশতঃ (সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই
ইন্দ্রিয়জন্ম প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্মিকর্ষের প্রত্যক্ষ
হেতু হইলে অর্থাৎ মনঃসংযোগ-শূন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্মিকর্ষ প্রত্যক্ষের
কারণ হইলে, একই সময়ে অনেক জ্ঞান অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্ম অনেক
বিজাতীয় প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হউক।

টীকানী। বুদ্ধির পরে ক্রমপ্রাপ্ত মনের লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। মনের অনুমাপক বলিতেই
মনের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার স্মৃতি প্রভৃতি মনের অনুমাপকগুলি বলিয়া “ইয়মপি”
এই কথার দ্বারা সূত্রোক্ত “যুগপৎজ্ঞানানুৎপত্তি”রূপ মনের অনুমাপককে গ্রহণ করিয়াছেন।
অর্থাৎ স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গ থাকিলেও এই “যুগপৎজ্ঞানানুৎপত্তি”ও মনের লিঙ্গ, ইহাই
সূত্রকারের তাৎপর্য। স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গ কেন? এতদন্তরে উদ্যোতকর-প্রদর্শিত
অনুমানের দোষ দেখিয়া তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, গন্ধাদির প্রত্যক্ষরূপ আত্মবিশেষণ
ইন্দ্রিয়জন্ম, তদুপাং ঐরূপ আত্মবিশেষণ মাত্রই ইন্দ্রিয়জন্ম, ইহা অনুমানসিদ্ধ। স্মৃতি প্রভৃতি
আত্মবিশেষণগুলি যখন বহিরিন্দ্রিয়-জন্ম হয় না, তখন উহাদিগের করণ একটি অন্তরিন্দ্রিয়
আছেই, তাহার নাম “মন”। সূত্রোক্ত (ভাষ্যোক্ত) স্মৃতি প্রভৃতি মনের অনুমাপক।
বহিরিন্দ্রিয় ও অনুমানাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ মনের দ্বারা যে এক প্রকার যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার

নাম “প্রতিভা”। উহা “প্রতিভ” নামেও অনেক স্থানে অভিহিত হইয়াছে। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ “পদার্থবর্ননসংগ্রহে” “আর্ষ” জ্ঞানকে “প্রতিভ” বলিয়াছেন। সেখানে “ভায়কন্দলী”কার শ্রীধর “প্রতিভা”কেই “প্রতিভ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগবর্ননভাষ্য প্রভৃতি বহু প্রামাণিক গ্রন্থে এই “প্রতিভ” জ্ঞানের উল্লেখ আছে। বাংলায়নও পরে “প্রতিভ” জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। প্রশস্তপাদ শেষে বলিয়াছেন যে, এই “প্রতিভ” জ্ঞান বহু পরিমাণে দেবগণ ও ঋষিগণেরই জন্মে, কদাচিৎ লৌকিকদিগেরও জন্মে। যেমন—“কল্পা বলিতেছে, কল্যা ক্রান্তা আসিবে, ইহা আমার মন বলিতেছে।” কল্পার ঐরূপ জ্ঞান ভ্রম না হইলে উহা তাহার “প্রতিভা”। যদি উহা ভ্রম বলিয়া শেষে বুঝা যায়, তাহা হইলে উহা “প্রতিভা” নহে। যাহারা এই “প্রতিভার” দোহাই দিয়া, নিজের মন যাহা বলে অর্থাৎ নিজের যাহা ভাল লাগে, তাহাই অত্রান্ত মনে করেন, “বিবেকের বিকল্প” বলিয়া বৈদিক মতকেও ভ্রান্ত বলেন, তাহারা এই “প্রতিভার” সহিত পরিচিত হইলে অত্রান্ত হইতে পারেন। ভাষ্যে “স্বখাদি প্রত্যক্ষং” এই স্থলে “আদি” শব্দের দ্বারা ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুণগুলি বুঝিতে হইবে। “ইচ্ছাদয়শ্চ” এই স্থলে “আদি” শব্দের দ্বারা স্বপ্ন-জাগ্রৎ প্রভৃতি গুণগুলি বুঝিতে হইবে।

গন্ধজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রত্যক্ষ একই সময়ে হয় না। ইহা মহর্ষি গোতমের অমূল্যবিন্দু সিদ্ধান্ত। তাই ভাষ্যকার “যুগপচ্চ খলু” এই স্থানে নিশ্চয়ার্থ “খলু” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি যথাস্থানে তাহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ঐ সিদ্ধান্তানুসারে বুঝা যায়, বাহ্য প্রত্যক্ষে এমন একটি সহকারী কারণান্তর আবশ্যক, যাহার অভাবে একই সময়ে গ্রাণাদি অনেক ইন্দ্রিয়ের গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সহিত সন্নির্কর্ষ হইলেও একই সময়ে গন্ধাদি নানা বিষয়ের নানা প্রত্যক্ষ হয় না। এ জন্ত মহর্ষি গোতম পরমাণুর স্থায় অতি সূক্ষ্ম “মন” নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ মনের সংযোগকে বাহ্য প্রত্যক্ষে কারণ বলিয়াছেন। মন পরমাণুর স্থায় সূক্ষ্ম বলিয়া একই সময়ে কোন এক ইন্দ্রিয় ভিন্ন অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারে না; স্বর্ণবিলম্বে দ্রুত বেগবশতঃ এক ইন্দ্রিয় হইতে অন্য ইন্দ্রিয়ে দাঁহিতে পারে। এ জন্ত একই সময়ে ঐরূপ নানা প্রত্যক্ষ হয় না, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপে এক সময়ে নানা জাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অমূল্যপত্তিবশতঃ বেক্রপ লক্ষণাক্রান্ত মন নামক পদার্থ সিদ্ধ হয়, ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন,—“তত্ত্বদিস্ত্রিয়সংযোগি সহকারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি”। ইন্দ্রিয়গত রূপাদি মন নহে, এ জন্ত বলিয়াছেন—“ইন্দ্রিয়দংযোগি”। আকাশাদি মন নহে, এ জন্ত বলিয়াছেন—“সহকারি”। আলোক মন নহে, এ জন্ত বলিয়াছেন—“নিমিত্তান্তরং” অর্থাৎ আলোক প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ হইতে ভিন্ন কারণ। আত্মা মন নহে, এ জন্ত বলিয়াছেন,—“অব্যাপি”। আত্মা বিশ্বব্যাপী। মন অণুপরিমাণ। মহর্ষি মনের অল্পমাপক বলিয়াই মনের এইরূপ লক্ষণ হুচনা করিয়াছেন।

ভাষ্য। ক্রমপ্রাপ্ত তু।

অনুবাদ । ক্রমপ্রাপ্ত কিস্ত, অর্থাৎ প্রমেয়সূত্রে উদ্দেশ্যের ক্রমানুসারে মনের পরে প্রাপ্ত “প্রবৃত্তি” কিস্ত—

সূত্র । প্রবৃত্তির্বাগবুদ্ধিশরীরারম্ভঃ ॥১৭॥

অনুবাদ । “বাগারম্ভ” (বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম ও অধর্মজনক কার্য), “বুদ্ধ্যারম্ভ” (মনের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম ও অধর্মজনক কার্য), “শরীরারম্ভ” (শরীরের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম ও অধর্মজনক কার্য) “প্রবৃত্তি” ।

ভাষ্য । মনোহত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতম্ । বুধ্যতেহনেনেতি বুদ্ধিঃ । সোহয়মারম্ভঃ শরীরেণ বাচা মনসা চ পুণ্যঃ পাপশ্চ দশবিধঃ । তদেতৎ কৃতভাষ্যং দ্বিতীয়সূত্র ইতি ।

অনুবাদ । এই সূত্রে “বুদ্ধি” এই শব্দের দ্বারা “মন” অভিপ্রেত । ইহার দ্বারা (মনের দ্বারা) বুঝা যায়, এ জন্ত “বুদ্ধি” । (অর্থাৎ ভাবার্থ-নিষ্পন্ন “বুদ্ধি” শব্দের “জ্ঞান” অর্থ হইলেও “বুধ্যতেহনেন” এই ব্যুৎপত্তিতে করণার্থ-নিষ্পন্ন “বুদ্ধি” শব্দের মন অর্থ হইতে পারে, মহর্ষির এখানে তাহাই অভিপ্রেত) । শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা পুণ্য ও পাপ অর্থাৎ ধর্মজনক ও অধর্মজনক সেই এই আরম্ভ (“প্রবৃত্তি”) দশ প্রকার । ইহা দ্বিতীয় সূত্রে কৃত-ভাষ্য হইয়াছে (অর্থাৎ শুভ ও অশুভ দশ প্রকার প্রবৃত্তি দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যেই বলা হইয়াছে) ।

টীপনী । প্রবৃত্তির লক্ষণ বলিতে মনোজন্ত প্রবৃত্তিও বলিতে হইবে । মন নিরূপিত না হইলে তাহা বলা যায় না,—এ জন্ত মহর্ষি মনের নিরূপণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত “প্রবৃত্তি”র নিরূপণ করিয়াছেন । ভাব্যকার “ক্রমপ্রাপ্তা তু” এই কথাটির দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়া ইহাই জানাইয়াছেন । ধর্ম ও অধর্মজনক শুভাশুভ কর্মই মহর্ষির “প্রবৃত্তি” নামক প্রমেয় । তাই সূত্রে “আরম্ভ” শব্দের দ্বারা মহর্ষি তাহা জানাইয়াছেন । এই প্রবৃত্তি-সাধ্য ধর্ম ও অধর্মকেও মহর্ষি “প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা স্থলবিশেষে প্রকাশ করিয়াছেন ।

তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “আরম্ভ” অর্থাৎ কর্মই “প্রবৃত্তি” । উহা দ্বিবিধ,—জ্ঞানজনক এবং ক্রিয়াজনক । তন্মধ্যে বাহ্য জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা পুণ্য বা পাপের কারণ, তাহা “বাক্-প্রবৃত্তি” । সূত্রস্থ “বাচ্” শব্দের দ্বারা জ্ঞানজনক পন্যার্থমাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে । সুতরাং মনের দ্বারা ইষ্টদেবতাদির চিন্তা ও চক্ষুরাদির দ্বারা সাধু ও অসাধু পদার্থের জ্ঞান প্রভৃতিও “বাক্-প্রবৃত্তির” মধ্যে গণ্য । ক্রিয়াজনক প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,—‘শরীরজন্ত’ এবং ‘মনোজন্ত’ ; শরীরের দ্বারা পরিত্রাণ, পরিচর্যা এবং দান ; বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় । মনের দ্বারা দয়া, অশ্লীলা ও শ্রদ্ধা, এই দশ প্রকার পুণ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ পুণ্যজনক প্রবৃত্তি । এইরূপ

ঐগুলির বিপরীত ভাবে পাপ-প্রবৃত্তিও দশ প্রকার। ভাষ্যকার দ্বিতীয় হস্তভাষ্যে দশ প্রকার পুণ্য ও পাপ-প্রবৃত্তির বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। তাই এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করেন নাই। দ্বিতীয় হস্তে ‘প্রবৃত্তি’ শব্দ প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্ম ও অধর্ম অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, কর্মফল ধর্ম ও অধর্মই জন্মের কারণ। অস্থায়ী কর্ম জন্মের সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না। কর্মবোধক শব্দের কর্মফল ধর্মাদ্বারা অর্থেও গোণ প্রয়োগ আছে। যেমন,—“জানামিঃ সর্বকর্মাণি ভ্রমস্যাং কুরুতে।”—(গীতা)।

প্রচলিত পুস্তকগুলিতে এই হস্তের শেষে “ইতি” শব্দ আছে। কিন্তু “তাৎপর্যাটীকা” ও “স্বায়ম্ভূতীনবক” গ্রন্থে ইতি-শব্দযুক্ত হস্তের উল্লেখ নাই। সুতরাং “ইতি” শব্দ থাকিলে তাহা ভাষ্যকারের প্রযুক্তই বুলিতে হইবে।

সূত্র । প্রবর্তনা-লক্ষণা দোষাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) “প্রবর্তনালক্ষণ” অর্থাৎ প্রবৃত্তি-জনক তাহাদিগের লক্ষণ এবং অনুমাপক ।

ভাষ্য । প্রবর্তনা প্রবৃত্তিহেতুত্বং, জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে বা, যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি । প্রত্যাস্তবেদনীয়্য হীমে দোষাঃ কস্মালক্ষণতো নির্দিষ্টান্ত ইতি । কর্মলক্ষণাঃ খলু রক্ত-দিক্টমূঢ়াঃ, রক্তো হি তৎকর্ম কুরুতে যেন কর্মণা স্ত্বং ছুঃখং বা লভতে তথা দ্বিষ্টস্তথা মূঢ় ইতি । রাগদ্বেষমোহা ইত্যুচ্যামানে বহু নোক্তং ভবতীতি ।

অনুবাদ । “প্রবর্তনা” বলিতে “প্রবৃত্তি”জনকত্ব । রাগাদি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) আত্মাকে পুণ্য বা পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করে। যেখানে (যে আত্মাতে) মিথ্যাজ্ঞান (মোহ) আছে, সেখানে (সেই আত্মাতে) রাগ (বিষয়ে অভিলাষ) ও দ্বেষ আছে। (পূর্ববপক) “প্রত্যাস্তবেদনীয়” অর্থাৎ সর্বজীবের মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এই দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা কেন নির্দিষ্ট হইতেছে ? (উত্তর) যেহেতু “রক্ত” (অনুরক্ত), “দিক্ট” (দ্বেষযুক্ত) এবং মূঢ় (ভ্রান্ত) জীবগণ “কর্মলক্ষণ” অর্থাৎ কর্মই তাহাদিগের সেইরূপে অনুমাপক । রক্ত ব্যক্তিরই সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা স্ত্বং বা ছুঃখ লাভ করে। সেইরূপ দ্বিষ্ট ব্যক্তিরই সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা স্ত্বং বা ছুঃখ লাভ করে। তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তিরই সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা স্ত্বং বা ছুঃখ লাভ করে।

“রাগদ্বৈমোহাঃ” এই কথাটি মাত্র বলিলে অর্থাৎ “প্রবর্তনালক্ষণাঃ” এই কথাটি না বলিয়া “দোষা রাগদ্বৈমোহাঃ” এইরূপ সূত্র বলিলে অধিক বলা হয় না।

টিল্লনী। “রাগ”, “দ্বৈম” ও “মোহ” এই তিনটির নাম “দোষ”। উহা পূর্বোক্ত “প্রবৃত্তি”র প্রয়োজক, এজন্য “প্রবৃত্তি”র পরে “দোষ” নিরূপণ করিয়াছেন। ‘দোষের’ মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ, মোহবশতঃই রাগ ও দ্বৈম জন্মে। ঐ রাগ ও দ্বৈমই জীবকে সাংসাৎ কর্মে প্রবৃত্ত করে। “মোহ”শূন্য বা মিথ্যাজ্ঞানশূন্য জীবের পুণ্যজনক বা পাপজনক কার্যে প্রবৃত্তি হয় না—অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম ধর্ম বা অধর্ম জন্মায় না। বস্তুতঃ মোহ থাকিলে, তত দিন জীব রাগ-দ্বৈমের বশবর্তী হইয়া পুণ্য বা পাপজনক কর্মে প্রবৃত্ত হইবেই। সুতরাং প্রবর্তনাই দোষের লক্ষণ; অর্থাৎ ধর্মাদ্বৈমজনক কর্মে প্রবৃত্তি বখন দোষ ব্যতীত হয় না, তখন তাদৃশ প্রবৃত্তিজনকই দোষের লক্ষণ। আর ঐ প্রবর্তনাই দোষের অনুমাপক। সুত্রে ‘লক্ষণ’ শব্দের এক পক্ষে লিঙ্গ বা অনুমাপক অর্থ বুঝিতে হইবে। রাগ, দ্বৈম ও মোহ মনোগ্রাহ আত্ম-বিশেষণ, সুতরাং উহার সর্বজীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ বিষয়ে অসম্মান প্রদর্শন কেন? এতদ্বারা তাহার তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যে “কর্মলক্ষণাঃ খলু” এই স্থলে “খলু” শব্দটি হেতুর্থ।

ভাষ্যকারের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য এই যে, রাগ, দ্বৈম ও মোহ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অন্য আত্মাতে তাহা অসম্ময়। কোন ব্যক্তি সুখ বা দুঃখজনক কার্য করিলে ঐ কর্ম দ্বারা তাহাকে রক্ত, দ্বিষ্ট ও মূঢ় বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। কারণ, মোহ ব্যতীত কাহারও রাগ বা দ্বৈম হয় না। রাগ, দ্বৈম ব্যতীতও কাহারও সুখ বা দুঃখজনক কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ রাগ, দ্বৈম ও মোহবৃত্ত ব্যক্তিই সুখ বা দুঃখজনক কর্ম করিয়া থাকে এবং যে প্রবর্তনাবশতঃ জীব বাধ্য হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই প্রবর্তনার আশ্রয় “দোষ”গুলিও জীবে আছে, এইরূপে “প্রবর্তনা”ও অন্য জীবে দোষের অনুমাপক হয়। পরন্তু রাগ, দ্বৈম ও মোহ নিজ আত্মাতে সর্ব জীবের প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ঐগুলি প্রবর্তনাবিশিষ্ট বলিয়া সকলের জ্ঞাত নহে। উহাদিগকে ঐরূপে জানিলে নির্বেদ জন্মিলে, এই অভিপ্রায়েও মহর্ষি ঐ রূপেই উহাদিগের পরিচয় দিয়াছেন। “দোষা রাগদ্বৈমোহাঃ” এইরূপ সূত্র বলিলে কেবল দোষগুলির স্বরূপমাত্রই বলা হয়, তাহাতে বেশী কিছু বলা হয় না।

সূত্র। পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। “পুনরুৎপত্তি” অর্থাৎ মরণের পরে পুনর্জন্ম “প্রেত্যভাব”।

ভাষ্য। উৎপন্নস্ত কচিংসত্ত্বনিকারে মৃত্বা বা পুনরুৎপত্তিঃ স প্রেত্য-
ভাবঃ। উৎপন্নস্ত সম্বন্ধস্ত। সম্বন্ধস্ত দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ। পুন-
রুৎপত্তিঃ পুনর্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ। পুনরিত্যভাসাভিধানম্। যত্র কচিং

প্রাণভূমিকায় বর্তমানঃ পূর্বোপাত্তান্ দেহাদীন্ জহাতি তং প্রৈতি ।
যত্তব্রাহ্মণ বা দেহাদীনন্তানুপাদন্তে তদভবতি । প্রৈত্যভাবো মৃত্যু পুন-
র্জন্ম । সোহয়ং জন্মমরণপ্রবন্ধাভ্যাসোহনাতিরপবর্গান্তঃ প্রৈত্যভাবো
বেদিতব্য ইতি ।

অনুবাদ । কোন প্রাণ-নিকায় অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি কোন এক-
জাতীয় জীবকুলে উৎপন্নের মরণের পরে যে পুনরুৎপত্তি, তাহা “প্রৈত্যভাব” ।
উৎপন্নের কি না,—সম্বন্ধ-বিশিষ্টের । সম্বন্ধ কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার
অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত । “পুনরুৎপত্তি” বলিতে পুনর্বীর দেহাদির সহিত সম্বন্ধ ।
“পুনঃ” এই শব্দের দ্বারা অভ্যাসের অর্থাৎ জন্মের পৌনঃপুণ্যের কথন হইয়াছে ।
যে কোনও প্রাণনিকায় (একজাতীয় জীবকুলে) বর্তমান হইয়া (জীব) পূর্বপরি-
গৃহীত দেহাদিকে যে ত্যাগ করে, তাহা প্রৈত হয়, অর্থাৎ সেই পূর্বগৃহীত দেহাদির
ত্যাগই জীবের প্রৈত বা মরণ । সেই প্রাণনিকায় অথবা অত্র প্রাণনিকায়
যে অত্র দেহাদিকে গ্রহণ করে, তাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই অভিনব দেহাদির
গ্রহণই জীবের উৎপত্তি বা জন্ম । ফলিতার্থ—মরণোত্তর পুনর্জন্মই প্রৈত্যভাব ।
সেই এই জন্ম-মরণ-প্রবাহের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-রূপ প্রৈত্যভাব
অনাদি (এবং) মোক্ষান্ত জানিবে ।

টিপ্পনী । প্রপূর্বক “ইণ্” ধাতুর উত্তর ক্রাচ্-প্রত্যয় যোগে “প্রৈত্য” শব্দ এবং “ভূ” ধাতু
হইতে “ভাব” শব্দ নিষ্পন্ন । প্রপূর্বক “ইণ্” ধাতুর অর্থ এখানে মরণ । ভূধাতুর অর্থ
উৎপত্তি । তাহা হইলে “প্রৈত্য” অর্থাৎ মরিয়া “ভাব” অর্থাৎ উৎপত্তি, ইহাই “প্রৈত্যভাব”
কথার দ্বারা বুঝা যায় । তাই ভাষ্যকার শেষে ফলিতার্থ বর্ণিয়াছেন—“প্রৈত্যভাবো মৃত্যু পুনর্জন্ম” ।
“নিকায়” শব্দের অর্থ এখানে সমানধর্মবিশিষ্ট অর্থাৎ একজাতীয় জীব-সমূহ । (সম্বন্ধিগণ-
স্বামিকায়ঃ) । আত্মা নিজের কর্মফলে মহাব্যাধি কোন একজাতীয় জীবকুলে উৎপন্ন
হয় । নিত্য আত্মার উৎপত্তি নাই, তাই ভাষ্যকার “উৎপন্নস্ত সম্বন্ধস্ত” এই কথার দ্বারা
স্বপদ বর্ণন করিয়াছেন । পূর্বপরিগৃহীত দেহাদির পরিত্যাগ অর্থাৎ ঐ দেহাদির সহিত
আত্মার সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের নাম মরণ । পূর্বসজাতীয় জীবকুলে অথবা অত্র জাতীয় জীবকুলে
অভিনব দেহাদির গ্রহণ অর্থাৎ অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধের নাম উৎপত্তি বা
জন্ম । উৎপত্তি মাত্র না বলিয়া “পুনরুৎপত্তি” শব্দের দ্বারা মহর্ষি এখানে “প্রৈত্যভাবের”
অনাদিত্ব সূচনা করিয়া গিয়াছেন । তৃতীয়াধ্যায়ে পরীক্ষা-প্রকরণে ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন
করিবেন ।

সূত্র । প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলম্ ॥২০॥

অনুবাদ । “প্রবৃত্তি” (ধর্মাদর্শ) এবং “দোষ”-জনিত পদার্থ “ফল” ।

ভাষ্য । সুখদুঃখসংবেদনং ফলম্ । সুখবিপাকং কর্ম দুঃখবিপাকঞ্চ । তৎ পুনর্দেহেন্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধিষু সতীষু ভবতীতি সহ দেহাদিভিঃ ফলমভিপ্রেতম্ । তথাহি প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলমেতৎ সর্বং ভবতি । তদেতৎ ফলমুপাত্তমুপাত্তং হেয়ং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদেয়মিতি । নাস্ত্র হানোপাদানয়োনিষ্ঠা পর্য্যবসানং বাহস্তি । স খল্বয়ং ফলম্ হানোপাদানস্ত্রোতশোহতে লোক ইতি ।

অনুবাদ । সুখ ও দুঃখের অনুভব ফল । কর্ম সুখফলক এবং দুঃখ-ফলক । তাহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সুখ-দুঃখ ভোগ আবার দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি থাকিলে হয়, এ জন্ম দেহাদির সহিত “ফল” অভিপ্রেত, অর্থাৎ মহর্ষি দেহাদিকেও “ফল” বলিয়াছেন । ফলিতার্থ এই যে, প্রবৃত্তি ও দোষজনিত পদার্থ—এই সমস্ত (সুখ-দুঃখভোগ এবং তাহার সাধন দেহাদি সমস্ত) “ফল” হয় । সেই এই ফল গৃহীত হইয়া গৃহীত হইয়া ত্যাজ্য হয়, ত্যক্ত হইয়া ত্যক্ত হইয়া গ্রাহ্য হয় । ইহার অর্থাৎ ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের “নিষ্ঠা” অর্থাৎ সমাপ্তি অথবা “পর্য্যবসান” অর্থাৎ সর্বতোভাবে অবসান নাই । ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ স্রোত অর্থাৎ ভোগের দ্বারা এক ফলের ত্যাগ এবং কর্মের দ্বারা অন্য ফলের গ্রহণ, এই ভাবে অবিশ্রান্ত ফল-ত্যাগ ও ফল-গ্রহণের প্রবাহ সেই এই লোককে (জীবকুলকে) বহন করিতেছে । অর্থাৎ জীবকুল ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ স্রোতে নিরন্তর ভাসিতেছে ।

টিপ্পনী । ফল দ্বিবিধ,—মুখ্য ও গৌণ । সুখ দুঃখের উপভোগই মুখ্য ফল । দেহ, ইন্দ্রিয় প্রকৃতি তাহার সাধনগুলি গৌণ ফল । দ্বিবিধ ফলই মহর্ষির বিবক্ষিত । হুত্রে অতিরিক্ত “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি তাহার ঐ অভিপ্রায় সূচনা করিয়াছেন । যদিও “ফল” পদার্থগুলির যথাসম্ভব পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি ফলমাত্রই “প্রবৃত্তি-দোষ-জনিত”, ইহা জানিলে নির্ভেদ লাভ হয় । তাই মহর্ষি “প্রবৃত্তি-দোষজনিত” বলিয়া ফলের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন । প্রবৃত্তি বলিতে এখানে পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি-সাধ্য ধর্ম ও অধর্ম । দোষজনিত ঐ ধর্মাদর্শ ফলমাত্রের জনক ; সুতরাং ফলমাত্রই প্রবৃত্তি ও দোষ-জনিত । তাৎপর্য্যটিকাकार বলিয়াছেন যে, কেবল প্রবৃত্তির প্রতিই দোষ কারণ নহে, প্রবৃত্তির কার্য্য সুখ ও দুঃখের প্রতিও দোষ কারণ, ইহা জানাইবার জন্মই মহর্ষি “প্রবৃত্তি-জনিত” না বলিয়া “প্রবৃত্তি-দোষ-জনিত” এইরূপ বলিয়াছেন । দোষরূপ জলের দ্বারা দিল্প আয়ত্বমিতেই ধর্ম ও অধর্মরূপ বীজ সুখ-দুঃখ জন্মায় ।

প্রলয়কালেও ফলের ভাগ ও গ্রহণের সমাপ্তি হয়, তাই আবার বলিয়াছেন,—“পর্যাবসানং বা” । অর্থাৎ প্রলয়কালে ঐ ফলভাগ ও ফলগ্রহণের অবসান-মাত্র হইলেও তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সর্বতোভাবে অবসান হয় না । প্রলয়কালেও জীবের ধর্মাদর্ম প্রভৃতি থাকায় পুনঃ সৃষ্টিতে আবার ঐ ফলের ভাগ ও গ্রহণ হইয়া থাকে ।

ভাষ্য । অঐতদেব ।

অনুবাদ । অনন্তর ইহাই অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সর্ববিধ ফলই—

সূত্র । বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ॥২১॥

অনুবাদ । “বাধনালক্ষণ” অর্থাৎ দুঃখানুযুক্ত বলিয়া “দুঃখ” ।

ভাষ্য । বাধনা পীড়া তাপ ইতি । তয়াহনুবিদ্ধমনুষ্যন্তমবিনি-
র্ভাগেণ বর্তমানং দুঃখযোগাদুঃখমিতি । সোহয়ং সর্বং দুঃখেনানু-
বিদ্ধমিতি পশ্চন্ দুঃখং জিহাস্তর্জ্জন্মানি দুঃখদর্শী নির্বিদ্যতে নির্বিধৌ
বিরজ্যতে বিরক্তো বিমুচ্যতে ।

অনুবাদ । “বাধনা” বলিতে পীড়া, তাপ (অর্থাৎ যাহাকে পীড়া বলে, তাপ বলে, তাহাই বাধনা) । তাহার সহিত অর্থাৎ বাধনার সহিত অনুবিদ্ধ অনুযুক্ত (সম্বন্ধবিশিষ্ট) অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান (পূর্বেবাক্ত সমস্ত ফল) দুঃখযোগবশতঃ (দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ) দুঃখ । সেই এই আত্মা (দুঃখানুবিদ্ধ জন্ম-বিশিষ্ট আত্মা) সমস্ত অর্থাৎ সুখ ও সুখসাধন দেহাদি দুঃখের সহিত অনুবিদ্ধ (নিয়ত সম্বন্ধ যুক্ত), ইহা দর্শন করতঃ (বোধ করতঃ) দুঃখ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া, জন্মে দুঃখদর্শী হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বিঘ্ন হইয়া বিরক্ত (বৈরাগ্য-সম্পন্ন) হন, বিরক্ত হইয়া বিমুক্ত হন ।

টিপ্পনী । দুঃখ না পাইলে, দুঃখ না বুঝিলে, পরম পুরুষার্থ অপবর্গ লাভের অবিকারই হয় না এবং শরীরাদি নিরূপণ না করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ বলা যায় না । এ জন্ত অপবর্গের পূর্বেই এবং শরীরাদির পরেই দুঃখের লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন । দুঃখ সকল জীবের সুপরিচিত পদার্থ । “বাধনা”, “পীড়া”, “তাপ”—এগুলি দুঃখ-বোধক পর্যায়শব্দ । সূত্রে “বাধনা” শব্দের প্রয়োগেই দুঃখের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে । বাধনা যাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ, তাহাই দুঃখ, এইরূপ সূত্রার্থ সহজ-বুদ্ধিগম্য হইলেও ভাষ্যকার সেক্ষেপ ব্যাখ্যা করেন নাই । ভাষ্যকারের কথা এই যে, সুখ ও সুখ-সাধন জন্মাদি ফল-মাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ বলিয়া দুঃখ—ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত । তাই ভাষ্যকার প্রথমে “অঐতদেব” এই কথার পূরণ করিয়া মহর্ষির সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত সূত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে ।

স্বত্রে “লক্ষণ” শব্দের অর্থ অতুযঙ্গ। অতুযঙ্গ বলিতে সম্বন্ধ। স্বত্রে হুংখের “অবিনাভাব” সম্বন্ধ। যেখানে স্বত্রে আছে, সেখানে হুংখ আছেই। শরীরে হুংখের নিমিত্ততা সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধিতে হুংখের সাধনত্ব সম্বন্ধ, উদ্যোতকরের “অতুযঙ্গ” ব্যাখ্যা এখানে এইরূপ। তাহার অতুযঙ্গ ব্যাখ্যাও দ্বিতীয় স্বত্রে-ভাব্য ব্যাখ্যার উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে “অতুযঙ্গ” ইহার ব্যাখ্যা “অতুযঙ্গতম”। তাহার ব্যাখ্যা “অবিনির্ভাগেণ বর্তমানম্।” অর্থাৎ হুংখের সহিত পূর্বক্ ভাবে (বিযুক্তভাবে) বর্তমান কোন স্থখাদি নাই। একেবারে হুংখসম্বন্ধ নাই, এমন স্বত্রে ও স্বত্রে-সাধন শরীরাদি হইতেই পারে না; এই জন্ত স্থখাদি ফলে হুংখ শব্দের গোণ প্রয়োগ করিয়া স্থখাদি ফলমাত্রকেই গোণ হুংখ বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, স্বত্রে “বাধনা” শব্দের দ্বারা বাধনাবুদ্ধি অর্থাৎ হুংখবুদ্ধি পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে হইবে। যাহা হুংখবুদ্ধি-লক্ষণ, অর্থাৎ যাহাতে হুংখ বলিয়া বুদ্ধি হয়, তাহাই হুংখ। তাহা হইলে মুখ্য গোণ উভয়বিধ হুংখই স্বত্রে দ্বারা লক্ষিত হইল। “প্রতিকূলবেদনীয়” অর্থাৎ যাহা প্রতিকূলভাবে (অপ্রিয়ভাবে, ভাল লাগে না—এই ভাবে) বুদ্ধির বিষয় হয়, এমন আত্মবিশেষ গুণই মুখ্য হুংখ। তাহাতে মুখ্য হুংখ বুদ্ধি হয়। সেই মুখ্য হুংখাতুযঙ্গ স্থখাদি ফলমাত্রকেই গোণ হুংখবুদ্ধি হয়। কারণ, সেগুলি সমস্তই হুংখাতুযঙ্গ। স্থখাদি ফলমাত্রই হুংখ, ইহা বুদ্ধিলে, ঐরূপ ভাবনা করিলে নির্বেদ লাভ করতঃ বৈরাগ্য লাভ করিয়া আত্মা মুক্তিলাভ করেন, এ জন্ত স্বত্রে ও স্বত্রে-সাধন শরীরাদি ফলমাত্রকেই হুংখ-ভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে।

ঋষিদিগের পরীক্ষিত এই বৈরাগ্যের উপায় কাহারও হুংখ বাড়াইয়া দিবে না। পরন্তু বৈরাগ্যসাধন করিয়া হুংখ হ্রাসই করিবে। বৈরাগ্যের সাধন হুংখও ভগ্নের সাধন করে না, হুংখ সহিষ্ণুতার মূলোচ্ছেদও করে না। পরন্তু হুংখ সহিষ্ণুতার মূল বন্ধনই করিয়া থাকে। হুংখ স্বভাবতই অপ্রিয় পদার্থ, ইহা সত্য। শ্রুতিও “অপ্রিয়” শব্দের দ্বারা হুংখের পরিচয় দিয়াছেন (“প্রিয়াপ্রিয়ৈন স্পৃশতঃ”)। স্বত্রে বা হুংখনিবৃত্তির অভিসন্ধি ব্যতীত হুংখকে কেহই প্রিয় পদার্থ বলিয়া আলিঙ্গন করে না। ভাবুকতার আবরণে সত্য গোপন করা যায় না। তাই ভারতীয় দর্শনকার ঋষিগণ হুংখের বীজনাশের উপায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাই “বৈরাগ্য-মেবাভ্যং” বলিয়া ভারতগুরু ভাবুকতা ছাড়িয়া বাস্তবত্বের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। বৈরাগ্য ব্যতীত কে কবে কোন্ বিষয়ে নির্ভর হইতে পারিয়াছেন? কে কবে হুংখের ভীষণ মূর্তি ভুলিতে পারিয়াছেন? কে কবে বিষয়-স্বত্রে হুংখের মমতা-বন্ধন ছেদ করিয়া “অভয়পদ” লাভের জন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন? বৈরাগ্য বহু সাধনার ফল। বহু হুংখ না পাইলে—বহু কর্ম না করিলে বৈরাগ্য সাধন হয় না। হুংখ ব্যতীত হুংখের নিবৃত্তি হয় না, তাই ভাব্যকার বাৎস্তায়ন ভাষ্যরস্তু হুংখকেও “অর্থ” বলিয়া আসিয়াছেন। হুংখ পরিহারের জন্তই হুংখ অর্থমান। সুতরাং পূর্বোক্ত বৈরাগ্যের উপদেশ কাহারও হুংখভীক বা অকর্মণ্য করে না। পরন্তু প্রকৃত বোকা বৈরাগ্যের তত্ত্ব বুঝিয়া বৈরাগ্য-সাধনের জন্ত বহু ক্লেশসাধ্য কঠোর পুরুষকারেই ব্রতী হইয়া থাকেন।

স্বথ এবং স্বথদানন জন্মাদি প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধি এখানে নির্বেদ। স্বয়ং উপস্থিত সর্ববিধেই বিতৃষ্ণতা বা উপেক্ষা-বুদ্ধিই এখানে বৈরাগ্য।

প্রচলিত অনেক পুস্তকেই এই সূত্রের শেষে “ইতি” শব্দ দৃষ্ট হয়। কিন্তু “তাৎপর্যটাকা” ও “ভারতীনিবন্ধে” ইতিশব্দান্ত সূত্রের উল্লেখ নাই; ইতি শব্দের এখানে কোন প্রয়োজনও নাই।

ভাষ্য। যত্র তু নিষ্ঠা। যত্র তু পর্যাবসানং সোহয়ং।

অনুবাদ। যেখানে কিন্তু নিষ্ঠা (সমাপ্তি), যেখানে কিন্তু সর্বতোভাবে অবসান, সেই এই—

সূত্র। তদত্যন্তবিমোক্ষোপবর্গঃ ॥২২॥

অনুবাদ। তাহার সহিত (পূর্বোক্ত মুখ্য গোণ সর্ববিধ দুঃখের সহিত) অত্যন্ত বিয়োগ অপবর্গ।

ভাষ্য। তেন দুঃখেন জন্মানাত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ। কথম্? উপান্তস্য জন্মনো হানমন্তস্য চানুপাদানম্। এতামবস্থামপর্যাস্তামপবর্গং বেদয়ন্তেহপবর্গবিদঃ। তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি।

অনুবাদ। সেই জন্মরূপ দুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মান শরীরাদি সর্বদুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ “অপবর্গ”। (প্রশ্ন) কি প্রকার? অর্থাৎ জন্মরূপ দুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ কি প্রকার? (উত্তর) গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্মের অগ্রহণ। অবশিষ্ট অর্থাৎ চিরস্থায়ী এই অবস্থাকে (আত্মার শরীরাদি সর্বদুঃখ-শূন্য কৈবল্যাবস্থাকে) অপবর্গবিদগণ অপবর্গ বলিয়া জানেন। তাহা অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবস্থাই শাস্ত্রে অনেক স্থানে ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে)।

টিপ্পনী। দুঃখের পরে মুক্তি। ইহাই মহাবিকথিত চরম প্রমের। ইহাই জীবের চরম উন্নতি। পূর্বোক্ত ফলগ্রহণ ও ফলত্যাগের ইহাতেই সমাপ্তি, ইহাতেই পর্যাবসান। সূত্রস্থ “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত দুঃখই বোধ্য, তাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“তেন দুঃখেন”। কেবল মুখ্য দুঃখই উহার দ্বারা বিবক্ষিত—এরূপ ভ্রম না হয়, তাই আবার বলিয়াছেন—“জন্মনা”। অর্থাৎ “জন্মতে যৎ” এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ “জন্মন্” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার এখানে “দুঃখ” শব্দের দ্বারা জায়মান শরীরাদি গোণ মুখ্য সর্ববিধ দুঃখই বুঝিতে হইবে, ইহা সূচনা করিয়াছেন। জীবগণ অনাদিকাল হইতে জন্মপ্রবাহে ভাসিয়া নানা দুঃখের বিভিন্ন তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। ঐ জন্মপ্রবাহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। সাময়িক

রোগ নিবৃত্তির হ্ৰায় প্রলয়কালে জীবের সাময়িক ছঃখনিবৃত্তি আত্যন্তিক ছঃখনিবৃত্তি নহে, তাই উহা মুক্তি নহে; তাই বলিয়াছেন—“অত্যন্তং বিমুক্তিঃ” এবং “অপর্যাস্তাম্”। কলতঃ চিরকালের জন্ম আত্মার জন্মাদি সৰ্ব্বদ্বঃখশূন্যাবস্থাই কৈবল্যাবস্থা। উহাই মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ। ঐ মুক্তি হইলে আর সংসার-ভয় থাকে না (ন চ পুনরাবর্ততে)। মুক্তি অভয়। শ্রুতিও ব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ “অভয়” বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন—তাই শাস্ত্র অনেক স্থানে মুক্তিকে ব্রহ্ম এবং মুক্তিলাভকে ব্রহ্মলাভ বলিয়াছেন। একরূপ গোপপ্রয়োগ ভাবার প্রচুর পাওয়া যায়।

যাঁহারা ব্রহ্মপরিণামবাদী অর্থাৎ ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা যাঁহাদিগের মত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—“অজরং” অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরূপকার, তাঁহার কোনরূপেই পরিণাম বা পরিবর্তন হইতে পারে না।

ব্রহ্মের হ্ৰায় মুক্তিরও কোন দিন কিছুমাত্র পরিবর্তন নাই; তাই মুক্তি অজর ব্রহ্মসদৃশ। এইরূপ তাৎপৰ্য্যেই শাস্ত্রে অনেক স্থানে মুক্তিকে “ব্রহ্মভাব” বলা হইয়াছে। “নিরঞ্জনঃ...পরমং সাম্যমুপৈতি” এই শ্রুতিতে মুক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মসাম্যলাভের কথা স্পষ্ট থাকায় অজ্ঞাত শ্রুতি ও স্মৃতিতে লক্ষণার সাহায্যে সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। পরন্তু “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিতা মম সাধৰ্ম্মমাগতাঃ। সৰ্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধস্তি চ।” এই ভগবদ্গীতাবাক্যে মুক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মসাদৃশ্যলাভই স্পষ্ট প্রকটিত আছে। সেই ব্রহ্মসাদৃশ্য কি? তাহা বলিবার জন্মই ঐ শ্লোকের পরাৰ্দ্ধ বলা হইয়াছে। নচেৎ ঐ পরাৰ্দ্ধের উত্থাপক কোন আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন থাকে না। “সাধৰ্ম্ম্য” শব্দেরও প্রসিদ্ধার্থ বা মুখ্যার্থ পরিতাগ করিতে হয়। বিশিষ্ট সাদৃশ্যবোধের জন্ম কাহাকে “ব্রহ্ম” বলিলে লক্ষণার দ্বারা “ব্রহ্মসদৃশ” এই অর্থ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু “ব্রহ্মসাম্য”, “ব্রহ্মসাধৰ্ম্ম্য” প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলে লক্ষণার দ্বারা তাহার ব্রহ্মরূপতা অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তাহাতে “সাম্য”, “সাধৰ্ম্ম্য” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। বিশিষ্ট সাদৃশ্য বোধের জন্ম রাজসদৃশ ব্যক্তিকে “রাজা” বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত রাজাকে “রাজসদৃশ” বলিয়া লক্ষণার দ্বারা তাহার “রাজা” এই অর্থের কেহ ব্যাখ্যা করে না। ঐরূপ লক্ষণা নিশ্চয়। উহা অপ্রসিদ্ধ ও নিশ্চয়প্রয়োজন। প্রচলিত ত্ৰায়-মতানুসারে শ্রুতি স্মৃতির ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া অসংগত অপ্রসিদ্ধ লক্ষণার আশ্রয় করা যায় না। “সাম্য”, “সাধৰ্ম্ম্য” প্রভৃতি শব্দের অসংগত লক্ষণার আশ্রয় না করিয়া অজ্ঞাত বহু শব্দের সংগত ও প্রসিদ্ধ লক্ষণার আশ্রয় করাই সনীতীন; ইহাই ত্ৰায়চাৰ্য্যগণের স্বপক্ষ সমর্থনের যুক্তি।

বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত যাহাই হউক, বৈনাশিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিতেন, প্রদীপের হ্ৰায় চিত্ত বা আত্মার চিরনিরূপণই মুক্তি। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“অমৃত্যুপদম্”। অর্থাৎ পূৰ্ণোক্ত কৈবল্যাবস্থারূপ মুক্তিকে “অমৃত্যুপদ” বলে। উহা আত্মার মৃত্যু নহে। আত্মার মৃত্যু অসম্ভব। পরন্তু আত্মার অত্যন্ত বিনাশ কখনও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না। কোন বুদ্ধিমানই উহা আকাঙ্ক্ষা করেন না। আত্মার কৈবল্যাবস্থারূপ মুক্তি হইলে, আর মরিতে হয় না। “তমেব বিদিস্বাহতিমৃত্যুমিতি” (শ্রুতি)। “জন্মমৃত্যুজরাঃ তৈধিহিমুক্তোহমৃতমশ্নতে”—

(গীতা) এবং উহাই আত্মার প্রকৃত ক্ষেত্রপ্রাপ্তি বা মঙ্গলপ্রাপ্তি। উহা মরণ নহে, উহা ভীষণ নহে—উহাই প্রকৃত শান্তি।

ভাষ্য। নিত্যং স্বখমাত্মনো মহত্ত্ববল্লোকে ব্যজ্যতে, তেনাভি-
ব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ স্বখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে। তেবাং প্রমাণা-
ভাবাদনুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো বা বিদ্যতে নিত্যং
স্বখমাত্মনো মহত্ত্ববল্লোকেহ্ভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। মহত্ত্বের স্থায় অর্থাৎ আত্মার পরম মহৎ-পরিমাণের স্থায় মোক্ষে
আত্মার নিত্যস্বখ অভিব্যক্ত (অনুভূত) হয়। সেই অভিব্যক্ত নিত্যস্বখের দ্বারা
বিমুক্ত হইয়া (আত্মা) অত্যন্ত সুখী হন, ইহা কেহ কেহ মনে করেন অর্থাৎ ইহা
এক সম্প্রদায়ের মত। প্রমাণাভাববশতঃ তাহাদিগের উপপত্তি নাই। বিশদার্থ
এই যে, মহত্ত্বের স্থায় মোক্ষে আত্মার নিত্য স্বখ অভিব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ
প্রমাণ নাই, অনুমান প্রমাণ নাই, আগম প্রমাণও নাই।

টিপ্পনী। আত্মার মহত্ত্ব অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাণ আত্মাতে নিত্যসিদ্ধ থাকিলেও সংসারাবস্থায়
শরীরাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ যেমন তাহার অনুভূতি হয় না, কিন্তু মোক্ষে শরীরাদি প্রতিবন্ধক না
থাকায় তাহার অনুভূতি হয়, তদ্রূপ আত্মাতে নিত্যস্বখ থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ সংসারাবস্থায়
ঐ নিত্যস্বখের অনুভূতি হয় না, মোক্ষে তাহার অনুভূতি হয়। ঐ নিত্যস্বখের অভিব্যক্তিই
মুক্তি। এই মতটি নব্য স্মারগ্রন্থে ভট্টমত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এবং নব্যস্মারচার্য্য
রঘুনাথ শিরোমণি এই ভট্টমতের পরিচয় করিয়াছেন,—ইহাও অমুমতি আছে গদাধর ভট্টাচার্য্য
লিখিয়াছেন। মুক্তিবাদগ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্য ভট্টমত বলিয়া এই মতের পরিচয় করিয়া শেষে
কেবল কল্পনাগৌরব বলিয়াই এই মত মনোরম নহে, ইহা বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের উল্লিখিত মতটিকে শুদ্ধা-
বৈতবাদী বেদান্ত মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়া সেই মতের বিরুদ্ধেই পরবর্তী ভাব্যসন্দর্ভের তাৎপর্য্য
বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, “বিজ্ঞানমাননং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম স্বধ্বস্বরূপ

১। নবানৈয়ায়িক গদাধর প্রভৃতি “নিত্য স্বখের অভিব্যক্তি বোক” ইহা ভট্টমত বলিয়া উল্লেখ করায়, উহা
ভট্ট কুমারিলের মত বলিয়াই অনেকের দৃঢ় সংকল্প আছে। কিন্তু ভট্টকুমারিল শ্লোকান্তিকে “নথ্যাক্ষেপপরিহার-
প্রকরণে” (১০৫ শ্লোকে) স্বখসম্বোধ মুক্তি হইতে পারে না, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। নবানৈয়ায়িকগণ
ভট্ট বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা অসুসঙ্কেত। নিত্যানিরতিশয় স্বখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা তুতাত ভট্টের
মত বলিয়া উদ্বন্ধনাচার্য্যের কিরণাবলী গ্রন্থে দেখা যায়। উদ্বন্ধন লিখিয়াছেন—“তৌতাতিতান্ত অকাধ্যানপি ইবরজ্ঞানং
শরীরবন্ধপোনিচ্ছন্তঃ কাধ্যাবেগ স্বখজ্ঞানবপনর্গেহতীতি বদন্তঃ” ইত্যাদি (কিরণাবলী, অধ্যম ভাঃ)। সেখানে
প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—“স্বখসাধনশরীরনাশে নিত্যানিরতিশয় স্বখাভিব্যক্তি-মুক্তিরিতি
ভাট্ট মতঃ নিরাকরোতি তৌতাতিতাতীতি”। বর্দ্ধমানও ঐ মতকে কেবল ভাট্ট মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ব্রহ্ম নিত্য, সূত্রার্থ ঐ স্বথও নিত্য। ঐ নিত্য স্বথস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা হইতে অভিন্ন। ভাষ্যে “আত্মনঃ” এই স্থলে “রাহোঃ শিরঃ” এই স্থলের স্থায় অভেদে যটী। ফলিতার্থ এই যে, মোক্ষের আত্মস্বরূপ নিত্যস্বথ অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যস্বথস্বরূপ। মিশ্র মহোদয়ের উদ্ধৃত ভাষ্যসন্দর্ভে “মহদ্ববৎ” এই কথাটি নাই। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যেই “মহদ্ববৎ” এই কথাটি আছে। মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যায় মহদ্বদৃষ্টান্ত সংগত হয় না। ভাষ্যে “মহদ্ববৎ” এই কথাটি না থাকিলেও পূর্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভ এবং পরবর্তী ভাষ্যসমূহের দ্বারা ভাষ্যকার এই মতের যে অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে শুদ্ধাভিব্যক্তিবাদি-সম্মত মুক্তিই এখানে ভাষ্যকারের সমালোচিত, ইহা মনে আসে না। মুক্তিতে নিত্যানন্দের অনুভূতি হয়, তাহার দ্বারা তৎকালে আত্মা অত্যন্ত সুখী হন, ইহাই মতবিশেষ বলিয়া ভাষ্যকার সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। মুক্তি নিত্যানন্দস্বরূপ, ভাষ্যকার এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সরলভাবে বুঝা যায় না। পরবর্তী ভাষ্যসমূহের দ্বারা ভাষ্যকার তাহার উল্লিখিত মতেরই সমালোচনাপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন—সেই কথাগুলির পর্যালোচনা করিয়াই ভাষ্যকার কোন্ মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সুধারণ চিন্তা করিয়া স্থির করিবেন।

ভাষ্য। নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং তস্য হেতুবচনম্।
 নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং জ্ঞানমিতি তস্য হেতুর্বাচ্যো যতন্তদুৎপদ্যত
 ইতি। সুখবন্নিত্যমিতি চেৎ সংসারস্থস্য মুক্তেনাবিশেষঃ।
 যথা মুক্তঃ সুখেন তৎ সংবেদনেন চ সন্ নিত্যেনোপপন্নস্তথা সংসার-
 স্তোহপি প্রসজ্যত ইতি উভয়স্য নিত্যত্বাৎ।

অভ্যনুজ্ঞানে চ ধর্ম্মাধর্ম্মফলেন সাহচর্য্যং যৌগপদ্যৎ
 গৃহ্যেত। যদিদমুৎপত্তিস্থানেষু ধর্ম্মাধর্ম্মফলং স্বথং দুঃখং বা সংবেদ্যতে
 পর্যায়েণ, তস্য চ নিত্যসংবেদনস্য চ সহভাবো যৌগপদ্যং গৃহ্যেত ন
 স্খাভাবো নানভিব্যক্তিরস্তি, উভয়স্য নিত্যত্বাৎ।

অনুবাদ। নিত্যের অর্থাৎ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি কি না সংবেদন (জ্ঞান),
 তাহার হেতু বলিতে হইবে।

বিশদার্থ এই যে,—নিত্যের (নিত্যসুখের) অভিব্যক্তি বলিতে (তাহার)
 সংবেদন কি না জ্ঞান, তাহার (সেই নিত্যসুখজ্ঞানের) হেতু বলিতে হইবে—যাহা
 হইতে তাহা উৎপন্ন হয়।

সুখের স্থায় (তাহা) নিত্য, অর্থাৎ ঐ নিত্যসুখের অভিব্যক্তিও নিত্য পদার্থ,
 তাহার কোন কারণ নাই, ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) মুক্ত ব্যক্তির সহিত সংসারীর

অবিশেষ হয়। বিশদার্থ এই যে,—যেমন মুক্ত ব্যক্তি নিত্যসুখ এবং তাহার নিত্যানুভূতির দ্বারা উপপন্ন আছেন—উভয়ের (সুখ ও সুখানুভবের) নিত্যতাবশতঃ সংসারী ব্যক্তিও তদ্রূপ (সতত নিত্যসুখ-সম্ভোগী) হইয়া পড়ে।

স্বীকার করিলে অর্থাৎ স্বমত রক্ষার্থ সংসারী ব্যক্তিও নিত্যসুখ সম্ভোগ করে, ইহা বলিয়া বসিলে, ধর্ম ও অধর্মের কলের সহিত অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-দুঃখের সহিত সহভাব কি না যৌগপদ্য গৃহীত হউক ? বিশদার্থ এই যে—উৎপত্তিস্থানসমূহে (চতুর্দশ ভুবনে) এই যে ধর্ম ও অধর্মের ফল সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে (সংসারিগণ কর্তৃক) অনুভূত হইতেছে, তাহার অর্থাৎ সেই সাংসারিক সুখদুঃখানুভবের এবং নিত্যসংবেদনের অর্থাৎ নিত্যসুখের নিত্যানুভবের সহভাব কি না যৌগপদ্য বুঝা যাউক ?—(অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগের সহিত এক সময়েই নিত্যসুখভোগ হউক), উভয়ের (সুখ ও তাহার অভিব্যক্তির) নিত্যতাবশতঃ সুখের অভাব নাই, অভিব্যক্তিরও অর্থাৎ ঐ নিত্যসুখের অনুভূতিরও অভাব নাই।

ভাষ্য। অনিত্যত্বে হেতুবচনম্। অথ মোক্ষে নিত্যস্য সুখস্য সংবেদনমনিত্যং যত উৎপদ্যতে স হেতুর্কাচ্যঃ আত্মমনঃসংযোগস্য নিমিত্তান্তরসহিতস্য হেতুত্বম্। আত্মমনঃসংযোগো হেতুরিতি চেৎ এবমপি তস্য সহকারিনিমিত্তান্তরং বচনীয়মিতি।

ধর্মস্য কারণবচনম্। যদি ধর্মো নিমিত্তান্তরং তস্য হেতুর্কাচ্যো যত উৎপদ্যত ইতি।

যোগসমাধিজস্য কার্যাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ৰয়ে সংবেদন-নিবৃত্তিঃ। যদি যোগসমাধিজো ধর্মো হেতুস্তস্য কার্যাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ৰয়ে সংবেদনমত্যস্তং নিবর্ত্তেত।

অসংবেদনে চাবিদ্যামানেনাবিশেষঃ। যদি ধর্মক্ষয়াৎ সংবেদনো পরমো নিত্যং সুখং ন সংবেদ্যত ইতি কিং বিদ্যমানং ন সংবেদ্যতেহথাবিদ্যমানমিতি নানুমানং বিশিষ্টেহস্তোতি।

অনুবাদ। অনিত্যত্ব হইলে হেতু বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে—যদি মোক্ষে নিত্য সুখের অনুভব অনিত্য হয়, (তাহা হইলে) যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়, সেই হেতু বলিতে হইবে।

নিমিত্তান্তর সহিত আত্মমনঃসংযোগেরই হেতুত্ব হয়। বিশদার্থ এই যে,

আত্মমনঃসংযোগ (নিত্য সুখানুভবে) হেতু, ইহা যদি বল, এইরূপ হইলেও তাহার সহকারী কারণান্তর বলিতে হইবে ।

ধর্মের কারণ বলিতে হইবে । বিশদার্থ এই যে, যদি ধর্ম নিমিত্তান্তর হয় অর্থাৎ সংসারাবস্থায় সুখানুভবে যখন ধর্মই আত্মমনঃসংযোগের সহকারী কারণ, তখন ঐ দৃষ্টান্তে মোক্ষে নিত্যসুখানুভবেও ধর্মই যদি সহকারী কারণ বল, (তাহা হইলে) তাহার (সেই ধর্মের) কারণ বলিতে হইবে, বাহা হইতে (সেই ধর্ম) উৎপন্ন হয় । যোগসমাধিজাত ধর্মের কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ বিনাশ হইলে সংবেদনের (নিত্যসুখানুভূতির) নিবৃত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি যোগ-সমাধিজাত ধর্ম (মোক্ষে নিত্যসুখানুভবের) কারণ হয় অর্থাৎ সহকারী কারণ হয়, তাহা হইলে, তাহার (ঐ ধর্মের) কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ অর্থাৎ ধর্ম মাত্রই তাহার চরম কার্য্য বা চরম ফল নাশ, ধর্মের কার্য্য বা ফলের সমাপ্তি হইলে ধর্ম থাকে না, এ জ্ঞাত্য প্রলয় হইলে অর্থাৎ ঐ ধর্মের বিনাশ হইলে সংবেদন (নিত্য সুখানুভব) অত্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া পড়ে ।

সংবেদন না হইলে আবার অবিদ্যমানের সহিত অবিশেষ হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি ধর্ম ক্ষয়বশতঃ সংবেদনের (নিত্যসুখানুভবের) নিবৃত্তি হয়, নিত্য সুখ অনুভূত না হয়, তাহা হইলে কি বিদ্যমান (সুখ) অনুভূত হইতেছে না ? অথবা অবিদ্যমান (সুখ) অনুভূত হইতেছে না ? বিশিষ্টে অর্থাৎ একতর বিশেষ পক্ষে অনুমান প্রমাণ (যুক্তি) নাই ।

ভাষ্য । অপ্রাক্করশ্চ ধর্মস্য নিরনুমানমুৎপত্তিধর্মকত্বাৎ । যোগসমাধিজো ধর্মো ন ক্রীয়ত ইতি নাস্ত্যানুমানমুৎপত্তিধর্মকমনিত্যমিতি বিপর্য্যয়স্ত্বানুমানম্ । যস্ত তু সংবেদনোপরমো নাস্তি তেন সংবেদন-হেতুর্নিত্য ইত্যনুমেয়ম্ । নিত্যে চ মুক্তসংসারস্থরোরবিশেষ ইত্যুক্তম্ । যথা মুক্তস্ত নিত্যং সুখং তৎসংবেদনহেতুশ্চ, সংবেদনস্ত তুপরমো নাস্তি কারণস্য নিত্যত্বাৎ তথা সংসারস্থস্যাপীতি । এবঞ্চ সতি ধর্মাদধর্মকলেন সুখদুঃখসংবেদনেন সাহচর্য্যং গৃহ্যেতেতি ।

শরীরাদিসম্বন্ধঃ প্রতিবন্ধহেতুরিতি চেৎ, ন, শরীরাদীনা-মুপভোগার্থত্বাৎ বিপর্য্যয়স্য চাননুমানাৎ ।

শ্রান্ততং, সংসারাবস্থায় শরীরাদিসম্বন্ধো নিত্যসুখসংবেদনহেতোঃ

প্রতিবন্ধকন্তেনাবিশেষো নাস্তীতি । এতচ্চাযুক্তং, শরীরাদয় উপ-
ভোগার্থাস্তে ভোগপ্রতিবন্ধং করিষ্যন্তীত্যনুপপন্নম্ । ন চাস্ত্যানুমানমশরীর-
স্বাত্মনো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি ।

অনুবাদ । ধর্মের (পূর্বোক্ত যোগসমাধিজাত ধর্মের) অত্যন্ত বিনাশ নাই,
(এ বিষয়ে) অনুমান প্রমাণের অভাব । কারণ, ধর্মের উৎপত্তিধর্মকর আছে ।
বিশদার্থ এই যে—যোগসমাধিজাত ধর্ম বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ নিত্য, এই বিষয়ে
অনুমান প্রমাণ নাই ; পরন্তু উৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ উৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই অনিত্য,
এইরূপে বিপর্যয়ের (নিত্যত্বের বিপর্যয় অনিত্যত্বের) অনুমান আছে ।

যাহার (মতে) কিন্তু সংবেদনের (নিত্য সুখানুভবের) নিবৃত্তি নাই, তিনি
সংবেদনের হেতু নিত্য, ইহা অনুমান করিবেন । নিত্য হইলে অর্থাৎ নিত্য
সুখানুভবের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে আবার মুক্ত ও সংসারীর অবিশেষ হয়, ইহা
বলিয়াছি । বিশদার্থ এই যে—যেমন মুক্ত ব্যক্তির সুখ এবং তাহার সংবেদনের
(অনুভবের) হেতু নিত্য, কারণের নিত্যত্ববশতঃ সংবেদনেরও (নিত্য সুখানুভবেরও)
নিবৃত্তি নাই, সংসারী ব্যক্তিরও তদ্রূপ হইয়া পড়ে । এইরূপ হইলে আবার ধর্ম ও
অধর্মের ফল সুখদুঃখানুভবের সহিত সহভাব (যোগপদ্য) গৃহীত হইয়া পড়ে ।

শরীরাদি সম্বন্ধ প্রতিবন্ধের হেতু, ইহা যদি বল, তাহা নহে অর্থাৎ তাহা বলিতে
পার না । কারণ, শরীরাদি উপভোগার্থ এবং বিপর্যয়ের অর্থাৎ অশরীর আত্মার
ভোগের অনুমান নাই । বিশদার্থ এই যে—(পূর্ববন্ধ) সংসারীর শরীরাদি সম্বন্ধ
নিত্যসুখানুভবের কারণের প্রতিবন্ধক, তজ্জন্ম (সংসারীর মুক্ত ব্যক্তির সহিত)
অবিশেষ নাই, ইহা মত হইবে অর্থাৎ ইহাই সমাধান করিব । (উত্তর) ইহাও
অযুক্ত । (কারণ), শরীরাদি উপভোগার্থ ; তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধ করিবে, ইহা
উপপন্ন হয় না এবং অশরীর আত্মার কোন ভোগ আছে, এ বিষয়ে অনুমান নাই ।

ভাষ্য । ইষ্টাধিগমার্থা প্রবৃত্তিরিতি চেৎ, ন অনিষ্টো-
পরমার্থত্বাৎ । ইদমনুমানঃ ইষ্টাধিগমার্থো মোক্ষোপদেশঃ প্রবৃত্তিচ্চ
মুমুক্শুণাং নোভয়মনর্থকমিতি । এতচ্চাযুক্তং অনিষ্টোপরমার্থো মোক্ষো-
পদেশঃ প্রবৃত্তিচ্চ মুমুক্শুণামিতি, নেক্তমনিষ্টেনাননুবিদ্ধং সম্ভবতীতি
ইষ্টমপ্যনিষ্টং সম্পাদ্যতে । অনিষ্টহানায় ঘটমান ইষ্টমপি জহাতি ।
বিবেকহানদ্যাশক্যত্বাদিতি ।

দৃষ্টাতিক্রমশ্চ দেহাদিষু তুল্যঃ । যথা দৃষ্টমনিত্যং স্বখং পরিত্যজ্য নিত্যস্বখং কাময়তে এবং দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধোরনিত্যা দৃষ্টা অতিক্রম্য মুক্তস্য নিত্যা দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ কল্পয়িতব্যঃ, সাধীয়শ্চৈবং মুক্তস্য চৈকাত্ম্যং কল্পিতং ভবতীতি ।

উপপত্তিবিরুদ্ধমিতি চেৎ সমানম্ । দেহাদীনাং নিত্যস্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি সমানং স্বখস্যাপি নিত্যস্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি ।

অনুবাদ । প্রবৃত্তি ইচ্ছালাভার্থ, ইহা যদি বল, তাহা নহে । কারণ, (প্রবৃত্তির) অনিষ্ট নিবৃত্ত্যর্থতা আছে । বিশদার্থ এই যে—(পূর্ববপক্ষ) মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্শুদিগের প্রবৃত্তি ইচ্ছা লাভার্থ, (স্বখ লাভের জন্ম) । উভয় অর্থাৎ মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্শুদিগের প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, এই অনুমান আছে অর্থাৎ উপদেশ মাত্র এবং প্রবৃত্তি মাত্রই যখন স্বখলাভার্থ, তখন মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্শুদিগের প্রবৃত্তিও স্বখ লাভার্থ ; সুতরাং মোক্ষে নিত্যস্বখের অভিব্যক্তি হয়, এ বিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার অনুমান-প্রমাণই আছে, উহা নিপ্রমাণ হইবে কেন ? (উত্তর) ইহাও অযুক্ত । মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্শুদিগের প্রবৃত্তি অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ (দুঃখ নিবৃত্তির জন্ম) । অনিষ্টের সহিত (দুঃখের সহিত) অননুবিদ্ধ (সম্বন্ধহীন) ইচ্ছা (স্বখ) সম্ভব নহে ; এ জন্ম ইচ্ছাও (স্বখও) অনিষ্ট (দুঃখ) হইয়া পড়ে । দুঃখ পরিহারের জন্ম প্রবর্তমান হইয়া স্বখও ত্যাগ করে ; কারণ, বিবেক পূর্বক ত্যাগ করা যায় না অর্থাৎ দুঃখ-সংবলিত স্বখের স্বখ মাত্র গ্রহণ করিয়া, কেবল দুঃখাংশকে ত্যাগ করা যায় না ; দুঃখ-পরিহার করিতে হইলে একেবারে স্বখকেও পরিত্যাগ করিতে হয় ।

দৃষ্টের অতিক্রমও দেহাদিবিষয়ে তুল্য । বিশদার্থ এই যে, যেমন দৃষ্ট অনিত্য স্বখ পরিত্যাগ করিয়া (মুমুক্শু) নিত্য স্বখ কামনা করে, এইরূপ দৃষ্ট অনিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত ব্যক্তির নিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি যদি নিত্য স্বখভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিত্য দেহাদিও কল্পনা করিতে হইবে । এইরূপ হইলে মুক্ত ব্যক্তির ঐকাত্ম্যও অর্থাৎ কৈবল্যও সাধুতরূপেই কল্পিত হয় । উপপত্তি বিরুদ্ধ ইহা যদি বল (তাহা) সমান । বিশদার্থ এই যে, দেহাদির প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্যস্ব কল্পনা করা যায় না, স্বখেরও প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্যস্ব কল্পনা করা যায় না, ইহা সমান ।

ভাষ্য । আত্যন্তিকে চ সংসারদুঃখাভাবে সুখবচনাদাগ-
মেহপি সত্যবিরোধঃ ।

যদ্যপি কশ্চিদাগমঃ স্মৃৎ মুক্তস্মৃত্যন্তিকং স্বখমিতি । স্বখশব্দ
আত্যন্তিকে দুঃখাভাবে প্রযুক্ত ইত্যেবমুপপদ্যতে, দৃষ্টো হি দুঃখাভাবে
স্বখশব্দপ্রয়োগো বহুলং লোক ইতি ।

নিত্যসুখরাগস্যাপ্রহাণে মোক্ষাধিগম্যভাবে রাগস্য
বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ ।

যদ্যয়ং মোক্ষে নিত্যং স্বখমভিব্যজ্যতে ইতি নিত্যসুখরাগেণ মোক্ষায়
ঘটমানো ন মোক্ষমধিগচ্ছেন্নাধিগন্তুমর্হতীতি বন্ধনসমাজ্ঞাতো হি রাগঃ ।
ন চ বন্ধনে সত্যপি কশ্চিন্মুক্ত ইত্যুপপদ্যত ইতি । প্রহীণনিত্যসুখ-
রাগস্যাপ্রতিকূলত্বম্ । অথাস্ত নিত্যসুখরাগঃ প্রহীয়তে তস্মিন্
প্রহাণে নাস্তি নিত্যসুখরাগঃ প্রতিকূলো ভবতি ।

যদ্যেবং মুক্তস্য নিত্যং স্বখং ভবতি অথাপি ন ভবতি নাস্যোভয়োঃ
পক্ষয়োর্মোক্ষাধিগমো বিকল্পত ইতি ।

অনুবাদ । আত্যন্তিক সংসার-দুঃখাভাবে সুখ-বচন-বশতঃ আগম থাকিলেও
বিরোধ নাই । বিশদার্থ এই যে, যদিও “মুক্ত ব্যক্তির আত্যন্তিক সুখ” এইরূপ
অর্থাৎ আপাততঃ ঐরূপ অর্থের প্রতিপাদক কোনও আগম থাকে, (তাহাতে)
“সুখ” শব্দ অর্থাৎ সেই আগমস্থ সুখবাচক শব্দ আত্যন্তিক দুঃখাভাবে অর্থাৎ
আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থে প্রযুক্ত, এই প্রকার উপপন্ন হয় । কারণ, লোকে
দুঃখাভাবে অর্থাৎ দুঃখাভাব অর্থে সুখ শব্দের প্রয়োগ (সুখবাচক শব্দের প্রয়োগ)
বহু দেখা যায় । পরন্তু নিত্য সুখাভিলাষের অপরিত্যাগে মোক্ষ লাভ হয় না ;
কারণ, রাগের বন্ধন সমাজ্ঞান আছে । বিশদার্থ এই যে, যদি এই ব্যক্তি (মুমুক্শু
ব্যক্তি) মোক্ষে নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এ জন্ম নিত্য সুখে অভিলাষবশতঃ মুক্তির
জন্ম প্রবর্তমান হয়, তাহা হইলে মুক্তি লাভ করে না ; করিতে পারে না । যেহেতু,
রাগ (বিষয়ে অভিলাষ বা আসক্তি) বন্ধন-সমাজ্ঞাত অর্থাৎ বন্ধন বলিয়াই সর্ববিসম্বৃত ।
বন্ধন থাকিলেও কেহ মুক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না ।

পরিত্যক্ত নিত্য-সুখাভিলাষের প্রতিকূলক নাই । বিশদার্থ এই যে—যদি ইহার

(মুমুকুর) নিত্য সুখে অভিলাষ পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ নিত্য সুখাভিলাষ স্বয়ংই মুমুকুকে পরিত্যাগ করে, সেই নিত্য-সুখাভিলাষ পরিত্যক্ত হইলে, এই মুমুকুর নিত্য-সুখাভিলাষ (মোক্ষলাভের) প্রতিকূল হয় না।

এইরূপ হইলে, অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বৈরাগ্যবশতঃই মুমুকুর মোক্ষ-প্রাপ্তি হইলে, যদি মুক্ত ব্যক্তির নিত্য সুখ হয় অথবা নাও হয়, উভয় পক্ষেই ইহার (মুমুকুর) মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় না, (অর্থাৎ নিত্য সুখের কামনা না থাকায় নিত্য সুখের অনুভূতি না হইলেও তাহাকে নিঃসন্দেহে মুক্ত বলা যাইতে পারে)।

টিপ্পনী। ভাব্যকার পূর্বোক্ত মতের নিম্নমাণত্ব সমর্থনের জন্ত বলিয়াছেন যে, নিত্য পদার্থের অভিব্যক্তি তাহার অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ অনুভূতি নিত্য পদার্থ হইলে সংসারী আত্মারও ঐ নিত্য সুখানুভূতি আছে বলিতে হয়। যদি বল, সংসারীর ঐ নিত্য সুখানুভূতি থাকিলেও তাহার ছুঃখানুভূতিও আছে, সুতরাং মুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার বিশেষ আছে এবং অন্তর্য্য বিশেষও অনেক আছে। এই কথা মনে করিয়া ভাব্যকার দোষাত্মক প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সংসারীর ধর্ম্মার্থের ফল সুখ ও ছুঃখ বধাক্রমেই অনুভূত হইয়া থাকে। ছুঃখভোগের সময়ে সুখভোগ হয় না, ইহা সর্বত্রোক্তব-সিদ্ধ। যদি সংসারী আত্মারও নিত্যসুখানুভূতি থাকে, তাহা হইলে, উহা তাহার ছুঃখানুভবের সমকালীন হইয়া পড়ে। একই সময়ে সুখ ও ছুঃখের অনুভব সর্বত্রোক্তব-বিরুদ্ধ। যদি বল, নিত্যসুখের অনুভূতি নিত্য পদার্থ হইবে কেন? উহা পূর্বে থাকে না; নিত্যসুখ পূর্বে থাকিলেও তাহার অনুভূতি মোকেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এতদ্বত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ অনুভূতির উৎপাদক কারণ বলিতে হইবে। আত্মমনঃসংযোগ না থাকিলে কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মুক্তাবস্থার আত্মাতে মনের সংযোগ থাকে, বলিলে তখন আত্মাকে “কেবল” বলা যায় না। মনঃসংযুক্ত আত্মা “কেবল” আত্মা নহে। যদিও তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ আত্মমনঃসংযোগ সহকারী কারণ ব্যতীত সুখানুভবের কারণ হয় না। সংসারাবস্থায় সুখানুভবে যখন ধর্ম্মই তাহার সহকারী কারণ, তখন মুক্তাবস্থায় সুখানুভবেও ধর্ম্মকেই সহকারী কারণ বলিতে হইবে।

সংসারাবস্থার কারণগুলি মুক্তাবস্থায় আবশ্যক হয় না বলিলে মুক্তাবস্থায় চক্ষুরাদির অভাবেও রূপদর্শনাদি হইতে পারিত। ধর্ম্মকে সহকারী কারণ বলিলে ঐ ধর্ম্মের কারণ বলিতে হইবে। যদি বল, যোগসমাদিজাত ধর্ম্মই তখন সহকারী কারণ হয়, এতদ্বত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে কারণের অভাবে তখন নিত্যসুখানুভবের নিবৃত্তি হইয়া পড়ে। ধর্ম্মমাত্রই ফলশাস্ত্র, ফলসমাপ্তি হইলে ধর্ম্ম থাকে না। যদি বল, নিত্যসুখানুভবরূপ ফলের যখন সমাপ্তি নাই, তখন তাহার কারণ ধর্ম্মও কোনও দিন বিনষ্ট হয় না; এতদ্বত্তরে বলিয়াছেন যে, যোগসমাদিজাত ধর্ম্মের ক্ষয় নাই, এ বিষয়ে অতুমান নাই। পরন্তু উৎপন্ন ভাবপদার্থমাত্রই বিনাশী, ইহা অতুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ। এই কথার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানাদিরূপ কারণও খণ্ডিত হইয়াছে; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানাদিও বিনাশী।

তাহাদিগের অভাবে নিত্যসুখভবেরও নিবৃত্তি হইয়া পড়ে। যদি বল যে, মোক্ষে নিত্য সুখের অল্পভূতির কখনও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, ঐ অল্পভূতির প্রবাহ চিরকালই থাকে; সুতরাং উহার কারণটি কোন নিত্য পদার্থ, ইহা অসম্ভব করিব। এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, নিত্য সুখভবের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে সংসারী জীবেরও নিত্য সুখের অল্পভূতি হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে জীবের ছুঃখ-ভোগের সহিত এক সঙ্গেই সুখভোগ হইতেছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহা অল্পভব-বিরুদ্ধ অসিদ্ধান্ত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যদি বল যে, কারণ থাকিলেও সংসারী জীবের শরীরাদি সঞ্চয় প্রতিবন্ধক থাকায় নিত্য সুখের অল্পভূতি হয় না, এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, শরীরাদি ভোগের সহায়, তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা অসম্ভব। পরন্তু শরীরাদিশূন্য আত্মার কোন ভোগ হইতে পারে, এ বিষয়ে কোন অসম্ভব (যুক্তি) নাই।

যদি বল যে, প্রবৃত্তি মাত্র এবং উপদেশ মাত্রই সুখভোগার্থ; সুতরাং মোক্ষ উপদেশও মুমুক্শুর প্রবৃত্তি অবশ্য সুখভোগার্থ, এই অসম্ভব দ্বারাই মোক্ষে নিত্যসুখসম্ভোগ হয়, ইহা নির্ণয় করা যায়, উহা নিশ্চয় হইবে কেন? এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, অনেক প্রবৃত্তি সুখভোগার্থ হইলেও কেবল ছুঃখ-নিবৃত্তির জন্তও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল ছুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত যখন মরিতেও প্রবৃত্তি হয়, তখন মোক্ষের উপায়ানুষ্ঠানেই বা তাহা হইবে না কেন?—বিরক্ত ব্যক্তির তাহা হইয়া থাকে। ছুঃখ-সঞ্চয়-শূন্য সুখ অসম্ভব; সুতরাং বিরক্ত ব্যক্তির নিকটে সুখও ছুঃখ হইয়া পড়ে, তিনি ছুঃখ পরিহারের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়া সুখকেও পরিত্যাগ করেন। সুখের মধ্যগত ছুঃখভাগ পরিত্যাগ করিয়া সুখ ভোগ করা যায় না। সুখভোগ করিতে হইলে ঐ ছুঃখভোগও করিতে হয়। আর ছুঃখকে একেবারে পরিহার করিতে হইলে সুখকেও একেবারে পরিহার করিতে হয়। বিরক্ত মুমুক্শু তাহাই করিয়া থাকেন। ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্তই তিনি মোক্ষের উপায়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যিনি সুখের লালসা ছাড়িতে পারেন না, তিনি মোক্ষে অনবিকারী,—তাই তিনি এ কথা বুঝিতেও পারেন না।

পরন্তু মুমুক্শু যদি দৃষ্ট অনিত্য সুখ ত্যাগ করিয়া নিত্য সুখের কামনাই করেন, অর্থাৎ নিত্য সুখভোগই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তরুণ দৃষ্ট অনিত্য দেহাদি ত্যাগ করিয়া তিনি নিত্য দেহাদিও কামনা করিবেন। নিত্য সুখ-সম্ভোগের জন্ত মুক্ত ব্যক্তির নিত্য-দেহাদিও কল্পনা করিতে হইবে। আত্মার কেবল-ভাবরূপ প্রকৃত কৈবল্য ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখ-সম্ভোগরূপ নূতন কৈবল্যের কল্পনা করিলে—দেহাদি-শূন্য আত্মার নিত্য-সুখ-সম্ভোগরূপ কল্পিত কৈবল্যের অপেক্ষায়—দেহাদিযুক্ত আত্মার নিত্য-সুখ-সম্ভোগরূপ কল্পিত কৈবল্যই সাধুতর হয়। কারণ, দেহাদিযুক্ত আত্মাতেই সুখসম্ভোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তসারেই কল্পনা করিতে হয়। দেহাদির নিত্য প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিলে, সুখের নিত্যও প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিতে পারি। দেহাদির জ্ঞান সুখও জন্ত ভাব-পদার্থ; সুতরাং সুখমাত্রই দেহাদির জ্ঞান বিনাশী, এইরূপ অসম্ভব করা বাইতে পারে।

যদি বল, মুক্ত ব্যক্তির নিত্য-সুখসম্ভোগ প্রতিসিদ্ধ। “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষো প্রতিষ্ঠিতম্”। “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন”। “রসো বৈ সং রসং হেবাং

গৰ্ভানন্দোভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে নিত্যানন্দ-প্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রুতি-প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিবে কিরূপে? এতদ্বন্ধরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে আত্যন্তিক হৃৎথাভাব অর্থেই আনন্দ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। হৃৎথাভাব অর্থে আনন্দ ও সুখ প্রভৃতি শব্দের গোণ প্রয়োগ তিরকালই হইয়া আসিতেছে। লৌকিক ভাষাতেও উহা দেখা যায়। গুহু ভার নামাইয়া ভারবাহী "বাচিলাম," "সুখী হইলাম" এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। সাময়িক জরবিরাসে রোগী "সুখী হইয়াছি" এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। ফলতঃ ঐরূপ বহু স্থলেই কেবল হৃৎ-নিবৃত্তিতেই সুখবাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যদি বল, শ্রুতির মুখ্যার্থ বাধ না হইলে গোণার্থ ব্যাখ্যা অসম্ভব। পরন্তু কেবল ঐ নিজ সিদ্ধান্ত রক্ষার ওজ্ঞ শ্রুতির অস্ত্রান্ত্র বহু অংশেই লক্ষণার সাহায্যে কোনরূপে নিজ মতামুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা সমীচীন ব্যাখ্যা নহে,—এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে একটি বিশেষ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, নিত্য সুখের কামনা থাকিলে মুক্তিনাভ হইতে পারে না; কারণ, কামনা বা আসক্তি বন্ধন বলিয়াই সর্বসিদ্ধ। বন্ধন থাকিলে কি তাহাকে মুক্ত বলা যায়? পরন্তু কামনার অধীনতায় কর্ম করিয়াই জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতেছে।

নিত্য সুখের কামনার মোক্ষে প্রবৃত্ত হইলে, কামনা-পিচাটা উপস্থিত বিষয়-সুখেও মুমুক্ষুকে প্রবৃত্ত করাইয়া মোক্ষ সূদূর-পরাহত করিবে। অনেক পরমযোগী শেষে ক্ষুদ্র কামনার অধীন হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা "ভুতীনাং ত্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে"। অতএব মুমুক্ষু কামনাকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। রাগের জ্বালা ঘেঁষেও বন্ধন, ঘেঁষকেও পরিত্যাগ করিবে। সুখের কামনা পরিত্যাগ করিলে সুখকে ঘেঁষ করা হয় না। হৃৎখপরিহারের ইচ্ছা হইলেও হৃৎখকে ঘেঁষ করা হয় না। বৈরাগ্যই মুমুক্ষুতার মূল। মুমুক্ষু হৃৎখকে বিদেহ করেন না। বৈরাগ্য এবং বিদেহ এক পদার্থ নহে। জন্মান্তরের নিকাম সাধনার ফলে ত্যাগপ্রিয় স্বকৃতী মানব ইহা অবিলম্বে বুঝিতে পারেন। অস্ত্রের এখানে বড় গোল। মূলকথা, নিত্য সুখের কামনা মোক্ষের প্রতিকূল; সুতরাং শ্রুতিতে মোক্ষে নিত্যসুখানুভব হয়, এ কথা থাকিতে পারে না। মোক্ষে নিত্য-সুখসম্ভোগ হয়, ইহা জানিয়া মোক্ষে প্রবৃত্ত হইলে, মুমুক্ষু সুখসম্ভোগের কামনা কখনই ছাড়িতে পারেন না। সুতরাং মোক্ষে নিত্য-সুখ-সম্ভোগ শ্রুতির প্রকৃতার্থ নহে। ফলতঃ শাস্ত্রীয় যুক্তি অমুসারে পূর্বোক্ত শ্রুতি "আনন্দ" শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না। আত্যন্তিক হৃৎ-নিবৃত্তিরূপ লক্ষ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষণা-স্বীকার উদ্ভব পক্ষেই আছে। কারণ, "অশরীরং বাবদন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিতে মোক্ষে সুখাভাব স্পষ্ট রহিয়াছে। মোক্ষে সুখ-সম্ভোগবাদিগণ ঐ শ্রুতিতে সুখমাত্র-বোধক "প্রিয়" শব্দের অনিত্য সুখে লক্ষণা স্বীকার করিবে। নচেৎ তাহাদিগের সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বাদিত হয়। "প্রিয়" শব্দের ঐরূপ লক্ষণার অপেক্ষায় "আনন্দ", "সুখ" প্রভৃতি শব্দের হৃৎথাভাবে লক্ষণা প্রসিদ্ধ। লৌকিক ভাষাতেও ঐরূপ প্রয়োগ বহু দেখা যায়। তাই বলিয়াছেন—"বহুলাং লোকে।"

যদি বল, প্রথমতঃ নিত্য সুখের কামনা থাকিলেও পরে সর্ব-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্য

উপস্থিত হওয়ায় মুমুকু সৰ্ব বিষয়ে নিৰ্দ্ধান হইয়া পড়েন। সুতরাং নিত্যসুখাভিলাষ পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহা নোক্ষণাতের প্রতিকূল হয় না। সৰ্ব-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্যই মোক্ষের প্রবর্তক, ইহা উভয় পক্ষেই স্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত ভাব্যকার সৰ্বশেষে বলিয়াছেন যে, যদি সৰ্ব-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্যই মোক্ষের প্রকৃত প্রবর্তক, এই প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তবে মুক্ত ব্যক্তির নিত্যসুখ-সন্তোষ না হইলেও তাহাকে মুক্ত বলিবে না কেন? নিত্য সুখ-সন্তোষে যখন তাহার কিছুমাত্র কামনা নাই, তখন উহা না হইলেই বা তাহার ক্ষতি কি? সুখ ও দুঃখ যাহার নিকটে সমান, তাহার সুখভোগ না হইলেও কোন ক্ষতি বুঝা যায় না। মুক্তিতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সৰ্বসম্মত। উহা না হইলে আর কিছুতেই মুক্ত বলা যায় না। কোন সম্প্রদায়ই তাহা বলেন না। ঐ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইলে তাহার নিত্য সুখসন্তোষ হউক বা না হউক, উভয় পক্ষেই মুক্তিরূপের কোন সংশয় নাই। নিত্য সুখ-সন্তোষের যখন কোন কামনা নাই, তখন দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইলে আর তাহার মুক্তিরূপের বাকী থাকিল কি? মোক্ষের নিত্য সুখ-সন্তোষ না হইলেও যদি তাহাকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার কর, তবে আর মোক্ষের নিত্য সুখ-সন্তোষ হয়, উহাই মুক্তি, এই সিদ্ধান্ত রক্ষা হয় না।

পরন্তু নিত্য-সুখ-সন্তোষ যখন জন্ম ও ভাবপদার্থ, তখন তাহা অবশ্য বিনাশী। সুতরাং উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না এবং সুখসন্তোষ “মুচ” ধাতুর অর্থ নহে; দুঃখ-নিবৃত্তিই উহার অর্থ। সুতরাং উহার দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি পর্যন্ত বুঝা যাইতে পারে। উহা জন্ম হইলেও ভাবপদার্থ নহে। সুতরাং বিনাশের আশঙ্কা নাই। “দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি” এই শ্রুতিতে উহাই মুক্তিরূপে অভিহিত হইয়াছে। অজ্ঞান শ্রুতিই “আনন্দ” প্রভৃতি শব্দেরও উহাই অর্থ। শাস্ত্র কখনও মুখ্য লোককে স্বর্গাদির দ্বারা একটা অপূৰ্ব সুখ-সন্তোষ বলিতে পারেন না।

মোক্ষের নিত্য-সুখসন্তোষবাদী কেহ কেহ বলেন যে, উৎপন্ন ভাবপদার্থ মাত্রই বিনাশী, এই নিয়ম স্বীকার করি না। নৈমিত্তিক মতে ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও চিরস্থায়ী, সেইরূপ মুক্ত ব্যক্তির বিজাতীয় সুখ-সন্তোষ উৎপন্ন হইয়াও চিরস্থায়ী হইতে পারে। সাংসারিক সুখ-সন্তোষের দৃষ্টান্তে ঐ বিজাতীয় নিত্য সুখসন্তোষকে বিনাশী বলিয়া স্থির করা যায় না। কারণ, উহা শ্রুতি-সিদ্ধ চিরস্থায়ী পদার্থ। আত্যন্তিক দুঃখের অভাব প্রস্তরাদিতেও আছে, তাহা কখনও পরম পুরুষ হইতে পারে না এবং নিত্য সুখ-সন্তোষের কামনা না থাকিলেও নিত্যসুখ-সন্তোষ হইতে পারে। যেমন দুঃখভোগের কামনা না থাকিলেও জরাদি পীড়া উপস্থিত হইলে দুঃখ-ভোগ হয়, তজ্জপ নিত্য-সুখসন্তোষের কামনা না থাকিলেও তাহার কারণ ঘটিলে অবশ্য তাহা হইবেই। গোপী-প্রেমের ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, গোপীদিগের আত্মজন্মের কিছুমাত্র কামনা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-সমাগমে তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সুখাপেক্ষায় কোটি গুণ সুখ হইত।

“গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।

সুখবাক্য নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥”

—চৈতন্য-চরিতামৃত, আদিলীলা, ৪পঃ।

এ সুখ-সন্তোষ কিরূপ, তাহা তাঁহারা ই বুঝিতেন। সকলে ইহা বুঝিতে পারে না। তাই বলিয়া ইহা কবিকল্পিত নহে, ইহা অসম্ভব নহে।

বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতম-কথিত মুক্তি-লক্ষণ কোন মতেরই বিরুদ্ধ নহে। আতান্ত্রিক চুঃখ-নিবৃত্তি না হইলে কোন মতেই মুক্তি হয় না। সুতরাং মহর্ষি ঐ সর্বগম্যত অবস্থাকেই মুক্তির লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় আনন্দানুভূতি থাকে কি না, তাহা বর্তমান জ্ঞানসূত্রে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। অন্ততঃ পরম প্রাচীন ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ জ্ঞান জ্ঞানার্চ্যই তাহা স্বীকার করেন নাই। সকলেই তাহার বিরুদ্ধবাদী। মাধবাচার্যের “সংক্ষেপ শঙ্করজয়” গ্রন্থের শেষ-ভাগে পাওয়া যায়, কোন নৈরায়িক গর্ভের সহিত ভগবান্ শঙ্করাচার্যকে কণাদের মুক্তি হইতে গৌতমের মুক্তির বিশেষ কি, এই দুরন্তর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তজ্জ্বরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার গুণ-সম্বন্ধের অত্যন্ত বিনাশে আকাশের স্থায় স্থিতিই মুক্তি। গৌতমের মতে উক্ত অবস্থায় “আনন্দ সংবিৎ” থাকে। মনে হয়, অতি প্রাচীন কালে গৌতমের মুক্তির উক্তরূপই ব্যাখ্যা ছিল; ভাব কার উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যার প্রতিবাদের জন্যই এখানে উক্ত মতের সমরিক সমালোচনা করিয়াছেন। এ সকল অতি গুরুতর কথা। মুক্তি-পরীক্ষা-প্রকরণে এ সকল কথার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। স্থানবত এব তর্হি সংশয়স্ত লক্ষণং বাচ্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ। তৎকালে অর্থাৎ প্রথম সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ-সময়ে ক্রম-প্রাপ্ত সংশয়েরই লক্ষণ (এখন) বক্তব্য, এ জন্য তাহা (সংশয়ের লক্ষণ) বলিতেছেন।

সূত্র। সমানানেকধর্মোপপত্তের্বিপ্ৰতিপত্তেরূপ-
লক্ষ্যনুপলক্ষ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষা বিমর্শঃ
সংশয়ঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। (১) সাধারণ ধর্ম-বিশিষ্ট ধর্মের জ্ঞান জন্ম, (২) অসাধারণ ধর্ম-বিশিষ্ট ধর্মের জ্ঞান জন্ম, (৩) বিপ্রতিপত্তি জন্ম অর্থাৎ বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্য জন্ম, (৪) উপলক্ষির অব্যবস্থা জন্ম এবং (৫) অনুপলক্ষির অব্যবস্থা জন্ম,—বিশেষাপেক্ষা (যাহাতে বিশেষজ্ঞানের ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের উপলক্ষি থাকে না, কিন্তু বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাকে) “বিমর্শ” অর্থাৎ একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান—“সংশয়”।

১। ভাস্কর্য্য-প্রণীত “জ্ঞানসার” গ্রন্থে এই মত পাওয়া যায়। “জ্ঞানসারে তু পুনরেক নিত্যসংবেদনানেন দুর্ধেণ বিশিষ্টাত্তিকী চুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্ত মোক্ষঃ”।—যদুদর্শনসমুদয়ের গুণরত্নটীকা।

টিপ্পনী। প্রথম স্তরে “প্রমেয়” পদার্থের পরেই “সংশয়” পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। স্তরোপ-প্রমেয় লক্ষণের পরে এখন সংশয়ই ক্রমপ্রাপ্ত। এ জন্ত প্রমেয়-লক্ষণের পরে এখন সংশয়েরই লক্ষণ বলিতেছেন। ভাষ্যে “তর্হি” ইহার ব্যাখ্যা—“তদানীং” (উদ্দেশনময়ে)। “হান” শব্দের অর্থ ক্রম। “হানবতঃ” ইহার ব্যাখ্যা “ক্রম-প্রাপ্তস্ত”।

স্তরে “সংশয়ঃ” এই অংশ লক্ষ্যনির্দেশ। “বিমর্শঃ” এই অংশের দ্বারা সংশয়ের সামান্য লক্ষণ সূচিত। “বি” শব্দের অর্থ বিরোধ। “মর্শ” ধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাৎপর্য্যানুসারে এখানে “বিমর্শ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। উহাই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ। স্তরে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথা দ্বারা সংশয়মাত্রেরই তৎকালে বিশেষবর্ণনের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু পূর্ব-দৃষ্ট সেই বিশেষ বর্ণনের স্মৃতি থাকা চাই, ইহাই সূচিত হইয়াছে। স্তরের অন্ত্যংশের দ্বারা পাঁচটি বিশেষ কারণের উল্লেখ পঞ্চবিধ বিশেষ সংশয়ের পাঁচটি বিশেষলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ঐ পাঁচটি বিশেষ লক্ষণে স্তরোক্ত “বিমর্শ” শব্দের অল্পবৃত্তি করিতে হইবে এবং ঐ “বিমর্শ” শব্দই পাঁচটি বিশেষ লক্ষণের লক্ষ্য পদ। সে পক্ষে উহার অর্থ বিশিষ্ট সংশয়।

বিস্তৃতি। সংশয় এক প্রকার জ্ঞানবিশেষ। নিশ্চয়ের অভাবই সংশয় নহে। যে বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান নাই, সে বিষয়েও নিশ্চয়ের অভাব আছে, কিন্তু সংশয় নাই। মহর্ষি “বিমর্শ” শব্দের দ্বারা এই সংশয় জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়াছেন। “বিমর্শ” বলিতে বিরুদ্ধজ্ঞান অর্থাৎ বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। একই কালে একই পদার্থে যে সকল ধর্ম থাকে না, থাকিতেই পারে না, সেই সকল ধর্মকে সেই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ বলে। যেমন একই সময়ে একই মনুষ্যে পরিণীত, অপরিণীত, পুত্রবৎ, পুত্রহীনতা, এইরূপ ধর্মগুলি থাকে না, থাকিতেই পারে না; স্তরোপ ঐ ধর্মগুলি একই সময়ে একই মনুষ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ, একই সময়ে একই মনুষ্যে ইনি পরিণীত, অথবা অপরিণীত, ইনি পুত্রবান্ অথবা অপুত্রক, এই প্রকার কোন জ্ঞান জন্মিলে ঐ জ্ঞান সংশয়। ফলতঃ একই ধর্মীতে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্মের জ্ঞানকেই সংশয় বলে। এই সংশয় সর্বত্রই হয় না, হইতে পারে না, জ্ঞানের সামান্য কারণ থাকিয়া যেখানে সংশয়ের কোন বিশেষ কারণ আছে, সেখানেই সংশয় হয়। সংশয়ের বিশেষ কারণের ভেদেই সংশয়ের ভেদ। ভাষ্যকার পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্ত পঞ্চবিধ সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ ধর্ম জ্ঞান জন্ত একপ্রকার সংশয় হয়। অবিকাংশ সংশয়ই এই প্রকার, তাই এই প্রকারটিকেই সর্বাত্মক বলা হইয়াছে।

(১) পথের ধারে একটি শাখাপত্রবৃক্ষ বৃক্ষ (স্থাপু) নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সন্ধ্যাকালে দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে যাবমান পথিক উহাতে স্থাপু ও পুরুষের কোন বিশেষ ধর্ম দেখিতে পাইল না, কিন্তু স্থাপু ও পুরুষের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি এবং সেইরূপ দণ্ডায়মান ভাব প্রভৃতি দেখিয়া পথিকের সংশয় হইল, এইটি কি স্থাপু? অর্থাৎ মুড়ো গাছ? অথবা পুরুষ, অর্থাৎ কোন মনুষ্য, এই সংশয় সাধারণ ধর্মজ্ঞান জন্ত। পথিক

সেই সমুখবর্তী পদার্থকে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছে। তাই তাহার ঐরূপ সংশয় হইয়াছে।

(২) এইরূপ কোন স্থলে অসাধারণ ধর্মজ্ঞান-জ্ঞাত ও সংশয় জন্মে। যে ধর্মাতে সংশয় হয়, কেবল সেই ধর্মাতেই যে ধর্মটি থাকে, তাহার সজাতীয় এবং বিজাতীয় আর কোন পদার্থে থাকে না, সেই ধর্মটিকে সেই ধর্মের অসাধারণ ধর্ম বলে। যেমন শব্দের ধর্ম শব্দত্ব, উহা শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না, সুতরাং উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম। শব্দে যদি নিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম এবং অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম নিশ্চয় না থাকে, তাহা হইলে সেখানে ঐ শব্দরূপ অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজ্ঞাত ও “শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য?” এইরূপ সংশয় জন্মে। অর্থাৎ কোন নিত্য পদার্থেও শব্দ নাই, কোন অনিত্য পদার্থেও শব্দ নাই, এইরূপে জ্ঞায়মান শব্দত্ব ধর্মটির শব্দে জ্ঞান হইলে তাহাতে ঐরূপ সংশয় জন্মে।

(৩) এইরূপ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়-প্রযুক্ত ও সংশয় জন্মে। একজন বলিলেন—“জগৎ মিথ্যা।” একজন বলিলেন—“জগৎ সত্য।” এই দুইটি বাক্য শুনিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় হয়। এই প্রকার সংশয়কে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় বলা হইয়াছে।

(৪) এইরূপ উপলব্ধির অনিয়ম প্রযুক্ত ও সংশয় জন্মে। পদার্থ থাকিলেও উপলব্ধি হয় এবং না থাকিলেও অনেক স্থলে আছে বলিয়া ভ্রম উপলব্ধি হয়, সুতরাং উপলব্ধির নিয়ম নাই। এ জ্ঞাত কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে “ইহা বিদ্যমান, কি অবিদ্যমান” এইরূপ সংশয়ও অনেক স্থলে হয়। এইরূপ সংশয়কে উপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্ত সংশয় বলা হইয়াছে।

(৫) এইরূপ অহুপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্ত ও এক প্রকার সংশয় জন্মে। ভূগর্ভে কত পদার্থ থাকিলেও উপলব্ধি হইতেছে না, আবার যাহার উৎপত্তি হয় নাই, অথবা যাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারও উপলব্ধি হয় না, সুতরাং অহুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, তজ্জাত কোন পদার্থ উপলব্ধি না করিলে তাহা বিদ্যমান, অথবা অবিদ্যমান, এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। তবে বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় থাকিলে এবং বিশেষ ধর্মের স্মৃতি না থাকিলে কোন স্থলেই কোন প্রকার সংশয় জন্মে না। তাই মহর্ষি সংশয় মাত্রকেই বলিয়াছেন—“বিশেষাপেক্ষ”।

ভাষ্য। সমানধর্মোপপত্তের্বিশেষাপেক্ষা বিমর্শঃ সংশয় ইতি। স্থাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্মমারোহপরিণাহৌ পশ্চান্ পূর্বদৃষ্টঞ্চ তয়ো-
র্বিশেষং বুভুৎসমানঃ কিং সিদ্ধিত্যন্যতরং নাবধারণতি, তদনবধারণং জ্ঞানং
সংশয়ঃ। সমানমনয়োদ্ধর্মমুপলভে, বিশেষমন্যতরস্য নোপলভে ইত্যেবা
বুদ্ধিরপেক্ষা সংশয়স্য প্রবর্তিকা বর্ততে, তেন বিশেষাপেক্ষা বিমর্শঃ
সংশয়ঃ।

অনুবাদ। (১) সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মের জ্ঞান জ্ঞাত বিশেষাপেক্ষা অর্থাৎ

বেখানে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাকিবেই, এমন “বিমর্শ” অর্থাৎ এতাদৃশ যে একই ধর্ম্মোতে অনেক বিরুদ্ধ ধর্ম্মের জ্ঞান, তাহা সংশয়, অর্থাৎ তাহাই প্রথম প্রকার সংশয়বিশেষ।

[উদাহরণ প্রদর্শনের সহিত পূর্বোক্ত ভাষ্যের বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন]

স্বাণু ও পুরুষের অর্থাৎ শাখা-পল্লবহীন বৃক্ষ এবং মনুষ্যের সমান ধর্ম্ম আরোহ এবং পরিণাহকে অর্থাৎ তুল্যরূপ দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতিকে দর্শন করতঃ এবং সেই স্বাণু পুরুষের পূর্ববদৃষ্ট বিশেষ ধর্ম্ম বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ অর্থাৎ স্বাণু ও পুরুষের যে বিশেষ ধর্ম্ম পূর্বে দেখিয়াছে, তাহার উপলব্ধি না করিয়া কেবল তাহার স্মরণ করতঃ ইহা কি ? অর্থাৎ ইহা স্বাণু ? অথবা পুরুষ ? এইরূপে একতরকে অর্থাৎ স্বাণু ও পুরুষ অথবা স্বাণুহ ও পুরুষহ-ধর্ম্ম, ইহার মধ্যে কোন একটিকে অবধারণ করে না অর্থাৎ ঐ উভয় বিষয়েই অনবধারণ করে, সেই অনবধারণরূপ জ্ঞান (ঐ স্থলে) সংশয়।

[সূত্রোক্ত ‘বিশেষাপেক্ষ’ এই কথাই এই স্থলে ব্যাখ্যা করিতেছেন]

এই পদার্থবয়ের অর্থাৎ বুদ্ধিস্ব বা স্মৃতিবিষয়ীভূত এই দুইটি পদার্থের সমান ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি, একতরের বিশেষ ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এই বুদ্ধি সংশয়ের সম্বন্ধে অপেক্ষা কি না জনিকা আছে অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে সংশয়ের পূর্বে ঐরূপ জ্ঞান হয়, ঐরূপ জ্ঞান ঐ প্রকার সংশয়ের পূর্বে আবশ্যক, সুতরাং “বিশেষাপেক্ষ” ইহা বিমর্শটি অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে অনবধারণ জ্ঞানটি “সংশয়” হইয়াছে।

টিপ্পনী। সূত্রে “সমানানেকধর্ম্মোপপত্তিঃ” এই অংশের দ্বারা দ্বিবিধ সংশয়ের দুইটি বিশেষ লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি সমান ধর্ম্মের উপপত্তিজন্ম, দ্বিতীয়টি অনেক ধর্ম্মের উপপত্তিজন্ম। সূত্রস্থ একই “ধর্ম্ম” শব্দের উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুদ্ধিয়া ঐরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে “সমান ধর্ম্ম” বলিতে বুঝিতে হইবে—সাধারণ ধর্ম্ম। “উপপত্তি” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে জ্ঞান। সমান ধর্ম্মের উপপত্তি কি না—সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান। যে কোন স্থানে সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান হইলে যে কোন স্থানে সংশয় জন্মে না। যে ধর্ম্মোতে সংশয় হইবে, সেই ধর্ম্মকেই সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞানই ভাব্যকারোক্ত সমান ধর্ম্মজ্ঞান। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, “সমান হইয়াছে ধর্ম্ম সাধারণ”, এইরূপে বহুব্রীহি সমাসই সূত্র-কারের অভিপ্রেত, কর্ম্মধারয় সমাস অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মের জ্ঞানই সূত্রোক্ত “সমানধর্ম্মোপপত্তিঃ”। এইরূপ ব্যাখ্যায় কোন আপত্তি না থাকিলেও ভাব্যকার এখানে বহুব্রীহি সমাস সম্ভব বোধ করেন নাই। কারণ, সূত্রস্থ একই “ধর্ম্ম” শব্দের উভয় সম্বন্ধ

মহাবীর অভিপ্রেত রহিয়াছে। ভাব্যকার সূত্রকারোক্ত “অনেকধর্মোপপত্তি”র বেক্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এখানে বহুব্রীহি সমাস সম্ভব হয় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

সংশয় জ্ঞানে যে সকল বিরুদ্ধ ধর্ম মুখ্য বিশেষণ হয়, তাহাকে সংশয়ের “কোটি” বলে। যেমন “ইহা কি স্বাগু? অথবা পুরুষ?” এইরূপ সংশয়ে স্বাগু অথবা স্বাগুত্ব একটি কোটি এবং পুরুষ অথবা পুরুষত্ব একটি কোটি। নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে ঐ স্থলে ইহা স্বাগু কি না? (স্বাগুর্ন বা) ইত্যাদি প্রকারে সংশয় হয়, তাঁহারা ভাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধকোটি ভিন্ন কেবল বিরুদ্ধ ভাব পদার্থ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বিরুদ্ধ ভাব পদার্থমাত্র লইয়াও সংশয় স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতে একই সংশয় দুইটি বিরুদ্ধ কোটির দ্বারা বহু বিরুদ্ধ কোটি লইয়াও হইতে পারে। ভাব্যকার বাৎস্তায়ন শব্দে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিন কোটি লইয়া সংশয় দেখাইয়াছেন এবং কেবল বিরুদ্ধ ভাব পদার্থ লইয়া সংশয় দেখাইয়াছেন। ইহার দ্বারাই পূর্বোক্ত মত তাঁহার সম্ভব, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। বস্তুতঃ “স্বাগুর্ন পুরুষো বা” ইত্যাদি প্রকার বাক্যের দ্বারাও যখন সংশয়কারী তাহার সংশয়কে প্রকাশ করে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সর্বত্র “নং” শব্দের প্রয়োগ করিয়াই সকলে সংশয় প্রকাশ করিবে, এইরূপ রাজাজ্ঞাও নাই, তখন কেবল বিরুদ্ধভাব পদার্থ বিষয়েও যে সংশয় জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। “স্বাগুর্ন, পুরুষো বা” ইত্যাদি স্থলে নব্য নৈয়ায়িকগণ “বা” শব্দের অভাব অর্থ বলিতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদিগের “পর্যন্তো বহিমান্ ন বা” এইরূপ বাক্যে “নং” শব্দটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহারা “পর্যন্তো বহিমান্ বা” এইরূপ বাক্যের দ্বারাই সংশয় প্রকাশ করেন নাই কেন? এইরূপ বহু কোটি লইয়াও একটি সংশয় হইতে পারে। ঐরূপ সংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলে কেন উহা হইবে না?

তাৎপর্যটীকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যে “বিশেষং বুভুতসমানঃ” এই কথার দ্বারা ভাব্যকার সূত্রোক্ত “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথার বিবরণ করিয়াছেন। “অপেক্ষা” শব্দের ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করিয়া তাৎপর্যবলে উহার দ্বারা জ্ঞানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা সংশয়ের পরেই জন্মে, উহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এ জন্য ভাব্যকার বলিয়াছেন, “সমানমনরোধধর্মুপলভে” ইত্যাদি। ভাব্যকারের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, সূত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথার দ্বারা সংশয়ের পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু পূর্বদৃষ্ট সেই বিশেষ-

- ১। কিমিন্দুঃ কিং গদ্যঃ কিমু মুকুরবিধাং কিমু মুখং
কিমজ্জৈ কিং বীনো কিমু নবনবাণো কিমু দুশো।
নগো বা শুশো বা কনককলসো বা কিমু কুতো
তড়িষা ত্তারা বা কনকলতিকা বা কিমবলা।

বিশ্বাদিত্যের নিকটে কালিদাসের কথিত কবিতা বলিয়া বুদ্ধ পণ্ডিতসমাজে এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার চারি চরণে চারিটি সংশয় প্রকটিত। এই চারিটি সংশয়ের প্রত্যেকটি চতুষ্কোটি এবং কেবল ভাব্যকারটি। ইহার মধ্যে অভাব বুঝিলে কবিতার ভাব বুঝা হইবে না।

ধর্মের স্বতি থাকা চাই, ইহাই স্বত্বকার মহর্ষির অভিপ্রেত। “অপেক্ষা” শব্দের লক্ষণার দ্বারা ঐরূপ অর্থই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বাইবার জ্ঞান ভাব্যকার সর্বশেষে “বিশেষত্বতাপেক্ষাঃ” এই কথা দ্বারা উহার কলিতার্থ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ সংশয়মাত্রই পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলক্ষি থাকিবে না। কিন্তু তাহার স্মরণ হওয়া চাই। বিশেষ জ্ঞান থাকিবে না, ইহা বলাতে সামান্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ স্থাপু অথবা পুরুষের বিশেষ ধর্মের উপলক্ষি হইলে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হয় না এবং স্থাপু ও পুরুষ এবং তাহার বিশেষ ধর্মের কোন জ্ঞান না থাকিলেও ঐরূপ সংশয় হয় না।

ভাষ্য। অনেকধর্মোপপত্তেরিতি। সমানজাতীয়মসমানজাতীয়ক্কা-
নেকম্। তস্তানেকস্ত ধর্মোপপত্তেঃ। বিশেষস্ত উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ।
সমানজাতীয়েভ্যোঃ সমানজাতীয়েভ্যস্তার্থা। বিশিষ্যন্তে। গন্ধবস্ত্বাৎ
পৃথিব্যাদিভ্যো বিশিষ্যতে গুণকর্ম্মভ্যস্ত। অস্তি চ শব্দে বিভাগজ্ঞত্বং
বিশেষঃ, তস্মিন্ দ্রব্যং গুণঃ কর্ম্ম বেতি সন্দেহঃ। বিশেষস্ত উভয়থা-
দৃষ্টত্বাৎ কিং দ্রব্যস্ত সতো গুণকর্ম্মভ্যো বিশেষঃ? আহোম্মিৎ গুণস্ত
সত ইতি অথ কর্ম্মণঃ সত ইতি। বিশেষাপেক্ষা—অন্যতমস্ত ব্যবস্থাপকং
ধর্ম্মং নোপলভে ইতি বুদ্ধিরিতি।

অনুবাদ। (২) “অনেকধর্মোপপত্তেঃ” এই কথাটি (ব্যাখ্যা করিতেছি) সমানজাতীয় এবং অসমানজাতীয় “অনেক”। সেই অনেকের ধর্ম্ম জ্ঞান জ্ঞাত্য, অর্থাৎ অনেক হইতে বিশেষক যে ধর্ম্ম (ব্যাবর্তক অসাধারণ ধর্ম্ম), তাহার জ্ঞান জ্ঞাত্য। যেহেতু, উভয় প্রকারে বিশেষের দর্শন আছে, অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে পদার্থের বিশেষ বা ব্যাবৃত্তি দেখা যায়। (উদাহরণ প্রদর্শনের সহিত এ কথা দ্বারা বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন)—সমানজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে এবং বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে পদার্থসমূহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (ইহার উদাহরণ) গন্ধবস্ত্ব-হেতুক পৃথিবী (দ্রব্যরূপে সজাতীয়) জলাদি হইতে এবং (বিজাতীয়) গুণ ও কর্ম্মসমূহ হইতে বিশিষ্ট হইতেছে। (অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান জ্ঞাত্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন) শব্দে বিভাগজ্ঞত্ব অর্থাৎ বিভাগজ্ঞত্বরূপ বিশেষ (ব্যাবর্তক বা অসাধারণ ধর্ম্ম) আছে। তাহাতে অর্থাৎ শব্দে (ঐ বিভাগ-জ্ঞত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান জ্ঞাত্য) দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্ম? এইরূপ সংশয় হয়। যেহেতু, উভয় প্রকারে বিশেষের দর্শন আছে। (প্রকৃত স্থলে ইহার

প্রকার দেখাইতেছেন) কি দ্রব্য হইয়া শব্দের গুণ ও কর্ম হইতে বিশেষ ? অথবা গুণ হইয়া দ্রব্য ও কর্ম হইতে বিশেষ ? অথবা কর্ম হইয়া দ্রব্য ও গুণ হইতে বিশেষ ? অন্ততমের অর্থাৎ শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, অথবা কর্মত্বের ব্যবস্থাপক (নিশ্চায়ক) ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এই বুদ্ধি (এখানে) বিশেষাপেক্ষা, অর্থাৎ ঐরূপ বুদ্ধি এখানে থাকাতে ঐ সংশয় বিশেষাপেক্ষ হইয়াছে।

টিপ্পনী। হুদ্রে “অনেকধর্ম” বলিতে অসাধারণ ধর্ম। সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থই এখানে “অনেক” শব্দের অর্থ। তাহার বিশেষক অর্থাৎ যে ধর্মের দ্বারা ঐ সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থগুলি হইতে ধর্মীর ভেদ বুঝা যায়, তাহাই “অনেকধর্ম”। তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা যায়—অসাধারণ ধর্ম। তাৎপর্যটাকাঁকার বলিয়াছেন যে, হুদ্রোক্ত “অনেক” শব্দের লক্ষণার দ্বারা অনেক পদার্থ হইতে বিশেষক, এই পর্য্যন্ত অর্থ বুঝিতে হইবে এবং ভাষ্যে “অনেকত্ব” এই স্থলে সম্বন্ধার্থ বস্তুর দ্বারা বিশেষকস্বরূপ সম্বন্ধ বুঝিয়া অনেক হইতে বিশেষক বা ভেদক ধর্মই সেখানে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, অসাধারণ ধর্মই “অনেক ধর্ম”। কারণ, অসাধারণ ধর্মই পদার্থকে তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট করে অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করে। যেমন গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না, এ জন্ত উহা পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম। ঐ গন্ধ পৃথিবীকে তাহার সজাতীয় জল প্রভৃতি হইতে এবং বিজাতীয় গুণাদি পদার্থ হইতে বিশিষ্ট করে। গন্ধ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম, ইহা নিশ্চিত থাকায় অর্থাৎ যে পদার্থে গন্ধ আছে, তাহা পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা নিশ্চিত থাকায় ঐ স্থলে অসাধারণ ধর্মজ্ঞান সংশয় জন্মায় না। কারণ, বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলে সেখানে সংশয় জন্মিতে পারে না। বিশেষ ধর্মের অল্পপলঙ্কি সংশয়মাত্রেরই আবশ্যক, ইহা মহর্ষি “বিশেষাপেক্ষ” এই কথার দ্বারা হুদ্রা করিয়াছেন।

অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় কোথায় কিরূপে হইয়া থাকে ? ভাষ্যকার তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, শব্দে বিভাগজন্যরূপ অসাধারণ ধর্ম-জ্ঞান হইলে অজ্ঞাত কারণে সত্ত্ব “শব্দ কি দ্রব্য ? অথবা গুণ ? অথবা কর্ম ?” এইরূপ একটি সংশয় জন্মে। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য এই যে, কোন বংশধরের অগ্রভাগ বিদীর্ণ করিয়া যখন উহার দুইটি অংশকে দুই হস্তের দ্বারা জোরে আকর্ষণ করা যায়, তখন যে শব্দ হয়, তাহা ঐ বংশধরের দুই ভাগের বিভাগ-জন্ত এবং ঐ দুই অংশের সহিত আকাশের যে বিভাগ হয়, তজ্জন্ত। ঐ স্থলে যে শব্দ জন্মে, তাহার প্রতি আকাশের সহিত পূর্বোক্ত বিভাগ অসমবায়ি কারণ। এইরূপ কোন বস্তুর অংশকে দুই হস্তের দ্বারা ছিড়িয়া ফেলিবার সময়ে যে শব্দ হয়, তাহাও পূর্বোক্ত প্রকার বিভাগজন্য। ফলতঃ বিভাগ দ্বারা অসমবায়ি কারণ, তাহাই ভাষ্যোক্ত বিভাগজন্য পদার্থ। এইরূপ বিভাগ-জন্যতা শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই, সুতরাং উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম। আপত্তি হইতে পারে যে, এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিও

প্রথম বিভাগ অসমবায়ি কারণ, সুতরাং পূর্বোক্ত বিভাগজন্তু যখন বিভাগেও থাকে, তখন উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম হইবে বিরূপে ? এতদ্বারা উদ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগ জন্মে, ইহা স্বীকার করি না। কোন বিভাগের প্রতি তাহার পূর্বজাত বিভাগ কারণ নহে, পূর্বজাত কিয়দংশই বিভাগের কারণ। আর যদি বৈশেষিক মতানুসারে তাহা স্বীকারও করা যায়, অর্থাৎ বিভাগজন্তু বিভাগ স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও সেই বিভাগজন্তু যে দ্বিতীয় বিভাগ, তাহা আর কোন বিভাগের অসমবায়ি কারণ নয় বলিয়া উহা কেবল শব্দেরই অসমবায়ি কারণ। অর্থাৎ বিভাগজন্তু যে বিভাগ, তজ্জন্তু ধর্মটি শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে না থাকায় উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম। তাহা হইলে ভাব্যকার যে “বিভাগজন্তু”কে শব্দের অসাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন, উহার অর্থ বিভাগজন্তু যে দ্বিতীয় বিভাগ, সেই বিভাগজন্তু বৃকিতে হইবে। সুতরাং বৈশেষিক মতেও ভাব্যকারের কথা সংগত হইয়াছে। মহর্ষি কণাদোক্ত “দ্রব্য”, “গুণ” ও “কর্মের” “সত্তা” প্রভৃতি সাধারণ শব্দে নিশ্চিত থাকায় শব্দ “দ্রব্য”, “গুণ” ও “কর্ম” হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত আছে। কিন্তু শব্দে “দ্রব্য”, “গুণ” অথবা “কর্মের” কোন বিশেষ ধর্ম নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে পূর্বোক্ত বিভাগজন্তুরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্তু “শব্দ কি দ্রব্য ? অথবা গুণ ? অথবা কর্ম ?” এইরূপ সংশয় জন্মে। শব্দ দ্রব্য হইয়াও বিভাগজন্তু হইতে পারে, গুণ হইয়া অথবা কর্ম হইয়াও বিভাগজন্তু হইতে পারে। সিদ্ধান্তে যেমন গুণের মধ্যে আর কোন গুণ বিভাগজন্তু না হইয়াও শব্দরূপ গুণবিশেষ বিভাগজন্তু হইয়াছে, তদ্রূপ দ্রব্যের মধ্যে আর কোন দ্রব্য অথবা কর্মের মধ্যে আর কোন কর্ম বিভাগজন্তু না হইলেও শব্দরূপ দ্রব্য অথবা কর্মও বিভাগজন্তু হইতে পারে, তাহাতেও বিভাগজন্তুরূপ অসাধারণ ধর্মটি শব্দকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট করিতে পারে। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে বিভাগজন্তুরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান, শব্দবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মায়। পরিশেষাত্মনানের দ্বারা শব্দের গুণও নিশ্চয় হইলে ঐ সংশয় নিবৃত্ত হয় (পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যটিরনী দৃষ্টব্য)। পূর্বোক্ত “বিভাগজন্তু” দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধারণ ধর্ম নহে, এ জন্তু পূর্বোক্ত সংশয় সাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্তু নহে। মহর্ষি এই জন্তুই অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্তু দ্বিতীয় প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। হুত্রে “অনেক ধর্ম” বলিতে “অসাধারণ ধর্ম”। প্রথমে “সমান ধর্ম” বলাতেও “অনেক ধর্ম” শব্দের দ্বারা অসাধারণ ধর্মই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়।

ভাষ্য। বিপ্রতিপত্তেরিতি। ব্যাহতমেকার্থদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ। ব্যাঘাতো বিরোধোহসমভাব ইতি। অন্ত্যাত্মৈত্যেকং দর্শনম্, নান্ত্যাত্মৈত্যপরম্। ন চ সদ্ভাবাসম্ভাবৌ সঠৈকত্রে সম্ভবতঃ। ন চান্ততরসাধকো হেতুরূপলভ্যতে তত্র তদ্বানবধারণং সংশয় ইতি।

অনুবাদ। (৩) “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই কথাটি (ব্যাখ্যা করিতেছি)। ব্যাঘাতযুক্ত “একার্থদর্শন” অর্থাৎ এক পদার্থে পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয় “বিপ্রতি-

পত্তি”। ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ কি না অসহভাব (একাধারে না থাকা)। (‘বিপ্রতি-
পত্তি’ জন্ম সংশয়ের উদাহরণ) আত্মা অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা আছে,
ইহা এক দর্শন (বাক্য)। আত্মা নাই, ইহা অপর দর্শন (বাক্য)। অস্তিত্ব ও
নাস্তিত্ব মিলিতভাবে একাধারে সম্ভব হয় না। অতীতের সাধক অর্থাৎ নিত্য আত্মার
অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের নিশ্চায়ক হেতুও উপলব্ধ হইতেছে না। - সেই স্থলে তত্ত্বের
অর্থাৎ নিত্য আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের অনবধারণরূপ সংশয় হয়।

টিপ্পনী। “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের মুখ্যার্থ বিরুদ্ধজ্ঞান। কিন্তু উহা বাদী ও প্রতিবাদীর জ্ঞান ;
সুতরাং অস্ত্রের সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। এ জন্ম এখানে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা
বুঝিতে হইবে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিজন্ম বাক্যদ্বয়। তাৎপর্য-টীকাকারও পূর্বোক্ত
যুক্তির উপলব্ধি করিয়া এখানে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের ঐক্যপদ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “ব্যাঘাত-
নেকার্থদর্শনং” এবং “অন্ত্যায়ৈতোকং দর্শনং” এই ভাষ্যেও “দর্শন” শব্দের বাক্য-অর্থ গ্রহণ
করিতে হইবে। কারণ, পূর্বোক্ত যুক্তিতে এখানে বাক্যবিশেষকেই “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা
বুঝিতে হইয়াছে। পরন্তু ভাষ্যকার সংশয়পরীক্ষাফলে (২ অং, ১ অং, ৩ অং) এই স্বত্রের
“বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—“সমানেহমিকরণে ব্যাহতার্থে প্রবাদৌ
বিপ্রতিপত্তিশব্দজ্ঞার্থঃ”। অর্থাৎ একাধারে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক প্রবাদদ্বয় (বাক্যদ্বয়) এই
স্বত্রোক্ত “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ। তাহা হইলে এখানেও “দর্শন” শব্দ—তিনি বাক্য অর্থেই
প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। “দৃষ্টান্তে জ্ঞানতেহনেন” এইরূপ বৃৎপত্তি-
সিদ্ধ “দর্শন” শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্যানুসারে বাক্যও বুঝা যাইতে পারে। জায়দ-সংশয়জনক
দার্শনিক বিপ্রতিপত্তিগুলিই এখানে স্বত্রকারের বিবক্ষিত, ইহা সূচনা করিবার জন্মই ভাষ্যকার
বাক্য শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয়।

সাংখ্যাদি শাস্ত্ররূপ বাক্যবিশেষ অর্থে এবং তজ্জন্ম জ্ঞানবিশেষ অর্থেও বহু কাল হইতে “দর্শন”
শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতের শাস্তিপর্বেও ঐরূপ অর্থে “দর্শন” শব্দের
প্রয়োগ দেখা যায়। “সাংখ্যদর্শন,” “যোগদর্শন” প্রভৃতি শব্দও সেখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্য-
কার পরমপ্রাচীন বাৎস্তায়নও চতুর্থাদ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,—“অন্তোক্তপ্রতীকানি প্রবাদুকানাং
দর্শনানি”। এবং “দর্শন” শব্দের প্রকৃতি দৃশ্যবস্তুকে গ্রহণ করিয়া তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াঙ্কি-
কের প্রথম স্বত্রভাষ্যে সাংখ্যদর্শন তাৎপর্য্যে “দৃষ্ট” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার
মনে হয়, “আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ” এই শ্রুতিই পূর্বোক্ত অর্থে “দর্শন” শব্দপ্রয়োগের মূল।
সৌকর্যের চরম কারণ আত্মদর্শন বা আত্মসাক্ষ্যকারই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। বিচার দ্বারা
উহা প্রতিপন্ন করিবার জন্মই এবং উহার উপায় বর্ণনের জন্মই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের স্বষ্টি।
ফল কথা, যে শাস্ত্র আত্মবিচারের দ্বারা পরম্পরায় আত্মদর্শনের সহায়তা করে, তাহাকে “দর্শনশাস্ত্র”

বলা বাইতে পারে। “দৃশ” ধাতুর দ্বারা পূৰ্ণোক্ত প্রতিপ্রতিপাদিত আত্মদর্শনরূপ বিশেষ অ গ্রহণ করিয়াই পূৰ্ণোক্ত অর্থে “দর্শন” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বাহাতে আত্মদর্শনের কোন কথা নাই, তাহাতেও “দর্শনে”র সাদৃশ্য-প্রযুক্ত পরে “দর্শন” শব্দের গোণ প্রয়োগ হইয়াছে। বাহাতে আত্মবিচার করিয়া, আত্মদর্শনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, পরম্পরায় বাহা পূৰ্ণোক্ত প্রতি-প্রতিপাদিত আত্মদর্শনের সহায়তা করে, তাহাই মুখ্য “দর্শন”।

যে বাহা হউক, মূলকথা এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণ করিয়া মধ্যস্থের সংশয় হইয়া থাকে। আত্মিক বলিলেন,—“আত্মা অস্তি”; নাস্তিক বলিলেন,—“আত্মা নাস্তি”। তাঁহাদিগের উভয়েরই একতর নিশ্চয় আছে। কিন্তু যে মধ্যস্থ শ্রোতা আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের সাধক হেতু পাইলেন না, তাঁহার সংশয় হইল—আত্মা অর্থাৎ নিত্য আত্মা আছে কি না? এই সংশয় বিপ্রতিপত্তিজন্ম। জ্ঞেয় তত্ত্ব এইরূপ অনেক বিপ্রতিপত্তি থাকায় তত্ত্বনির্ণায়দিগের সংশয় হইতেছে। সংশয়ের পরে জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে। জিজ্ঞাসার ফলে বিচারপ্রবৃত্তি হইতেছে। বিচারদ্বারা অনেক স্থলে তত্ত্ব-নির্ণয় হইতেছে এবং বিভিন্ন মতের সমন্বয়বোধও হইতেছে। জিজ্ঞাসা মানবের জ্ঞানের মূল। জিজ্ঞাসার মূল আবার সংশয়। যে মানবের সংশয় হয় না, তিনি জ্ঞানরাজ্যের বহু দূরে আছেন। ফলতঃ সংশয় শাস্তির চিরশত্রু নহে; উহা চিরশাস্তির মূল; উহা জ্ঞানমন্দিরের প্রথম সোপান। সংশয় না হইলে নির্ণয়ের আশা থাকে না। গীতার অর্জুনের সংশয়ে কত তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং দার্শনিক নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি অজ্ঞ মানবের সংশয় জন্মাইয়া এক পক্ষে মঙ্গলই করিতেছে। সংশয় যত সূদৃঢ় হইবে, ততই নির্ণয়ের পথে অগ্রসর হওয়া বাইবে। শেষে প্রকৃত তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই সকল সংশয় ছিন্ন হইবে। (“হিদ্ভ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ”)।

পক্ষান্তরে, শাস্ত্রে নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি আছে বলিয়াই শাস্ত্র ও তাহার চর্চা এত দিন টিকিয়া আছে। বিপ্রতিপত্তিমূলক সাম্প্রদায়িকতার দোষ থাকিলেও উহার একটি মহাশক্তি আছে—বাহার ফলে এ পর্য্যন্ত অনেক তত্ত্বই একেবারে বিলীন হইয়া যায় নাই।

ভাষ্য। উপলক্ষ্যব্যবস্থাতঃ খল্বপি, সচ্ছোদকমুপলভ্যতে তড়াগাদিষু মরীচিষু চাবিদ্যমানমুদকমিতি। অতঃ কচিছুপলভ্যমানে তত্ত্বব্যবস্থাপকস্ত প্রমাণস্থানুপলক্ষে: কিং সত্বপলভ্যতে, অথাসদिति সংশয়ো ভবতি।

অনুবাদ। (৪) উপলক্ষির অব্যবস্থাজন্ম সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। তড়াগাদিতে বিদ্যমান জল উপলব্ধ হয় এবং মরীচিকায় অবিদ্যমান জল উপলব্ধ হয়; অতএব উপলভ্যমান কোনও বিষয়ে তত্ত্ব-ব্যবস্থাপক (প্রকৃত-তত্ত্ব-নিশ্চায়ক) প্রমাণের অনুপলব্ধিবশতঃ কি বিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে? অথবা অবিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে? এইরূপ সংশয় হয়।

টিপ্পনী। উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির অনিয়ম। বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি হয়। সর্বত্র বিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয় অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, এমন নিয়ম নাই। সুতরাং কোন স্থানে কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে তাহার বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে ভাব্যোক্ত প্রকার সংশয় হয়। ইহাকেই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য চতুর্থ প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। ভাষ্যে “থবপি” এই শব্দটি নিশ্চিত। উহার অর্থ উদাহরণ-প্রদর্শন।

ভাষ্য। অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ—সচ্চ নোপলভ্যতে মূলকীলকোদ-
কাদি, অসচ্চানুৎপন্নং নিরুদ্ধং বা, ততঃ কচিদনুপলভ্যমানে সংশয়ঃ, কিং
সম্নোপলভ্যতে? উতাসমিতি সংশয়ো ভবতি। বিশেষ্যাপেক্ষা পূর্ববৎ।

অনুবাদ। (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন
করিতেছি। বিদ্যমান মূল, কীলক, জল প্রভৃতি (ভূগর্ভাদিস্থ) উপলব্ধ হয় না এবং
অবিদ্যমান, অনুৎপন্ন বা বিনষ্ট বস্তু উপলব্ধ হয় না; তজ্জন্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত
অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য অনুপলভ্যমান কোন পদার্থে সংশয় হয়। (সে কিরূপ
সংশয়, তাহা বলিতেছেন) কি, বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? অথবা
অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? এইরূপ সংশয় হয়। বিশেষ্যাপেক্ষা পূর্ববৎ
অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ বিশেষ ধর্মনিশ্চায়ক হেতুর অথবা ঐ বিশেষ
ধর্মের অনুপলব্ধি পূর্বোক্ত সংশয়গুলির দ্বারা এই সংশয়েও আবশ্যিক।

টিপ্পনী। উপলব্ধির দ্বারা অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই। ভূগর্ভ প্রভৃতির বিদ্যমান পদার্থেরও
উপলব্ধি হয় না এবং সর্বত্র অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং কোন পদার্থ
উপলব্ধ না হইলে, তখন তাহাতে বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত ভাব্যোক্ত
প্রকার সংশয় হয়। মহর্ষি ইহাকেই অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য পঞ্চম প্রকার সংশয় বলিয়াছেন।
ভাষ্যে “অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ” এই কথাটির পরে পূর্বোক্ত “থবপি” এই শব্দের যোগ করিতে হইবে।
না করিলেও ব্যাখ্যা হয়।

ভাষ্য। পূর্বঃ সমানোহনেকশ্চ ধর্মো জ্ঞেয়ত্বঃ, উপলব্ধ্যনুপলব্ধী
পুনর্জাতৃগতে, এতাবতা বিশেষণ পুনর্বচনম্। সমানধর্মাদিগমাৎ
সমানধর্মোপপত্তের্বিশেষস্বত্ব্যপেক্ষো বিমর্শ ইতি।

অনুবাদ। পূর্ব অর্থাৎ সূত্রে পূর্বোক্ত সমান-ধর্ম এবং অনেকধর্ম জ্ঞেয়গত

১। উভয়ের ন্যায়ভূত্বজ্ঞতির পঞ্চম স্তরকে “আয়োজনাব থবপি” এই কথাটির ব্যাখ্যায় প্রকাশটীকার বর্দ্ধমান
উপাধায় লিখিয়াছেন,—“থবপীতি নিশ্চিতসমুদায়ঃ উদাহৃততে ইত্যর্থঃ বর্ততে ন সমুদায়ার্থঃ”।

অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের ধর্ম, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি কিন্তু জ্ঞাতৃগত অর্থাৎ জ্ঞানকর্তা আত্মার ধর্ম, এইটুকু বিশেষবশতঃ পুনরুক্তি হইয়াছে। সমান ধর্মের উপপত্তি-বশতঃ কি না—সমান-ধর্মের জ্ঞানবশতঃ বিশেষ-স্বত্বাপেক্ষ অর্থাৎ যাহাতে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া বিশেষ ধর্মের স্মরণ আবশ্যক, এমন “বিমর্শ” (সংশয়) হয়।

টিপ্পনী। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাতলে যে সংশয়, তাহা সাধারণ ধর্মাদি জ্ঞানবশতঃই হইতে পারে, আবার তাহার অন্য পৃথক্ কারণ বলা কেন? পরবর্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহা বলেন নাই। ভাষ্যকার এই প্রশ্ন মনে করিয়া তত্বতরে বলিয়া গিয়াছেন যে, সাধারণ ধর্ম ও অসাধারণ ধর্ম জ্ঞেয়গত। অব্যবস্থিত উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জ্ঞাতৃগত। এই বিশেষটুকু ধরিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্-ভাবে সংশয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণ ধর্মাদি জ্ঞান প্রযুক্ত সেখানে সংশয় হইতে পারিলেও, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্তও সেখানে বিশিষ্ট সংশয় হইয়া থাকে, ইহাই মহর্ষির মনের কথা। তজ্জন্ত তিনি পঞ্চবিধ বিশেষ সংশয়ই পঞ্চবিধ বিশেষ কারণের উল্লেখ পূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

সূত্র “উপপত্তি” শব্দের অর্থভনে অনেক পূর্বপক্ষ হইতে পারে। পরীক্ষাতলে সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং “বিশেষাপেক্ষ” এই কথাটির তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। এ জন্ত ভাষ্যকার উপসংহারে আবার সূত্রোক্ত প্রথম প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইরূপেই অন্ত চতুর্বিধ সংশয়লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাও উহার দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন।

উদ্যোতকর স্ত্রাব্যবর্তিকে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ পূর্বক স্বাধীনভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সংশয় ত্রিবিধ; পঞ্চবিধ নহে। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা কোন বিশেষ সংশয়ের বিশেষ কারণ নহে; উহা সংশয়মাত্রেরই কারণ। যে দুইটি পদার্থ-বিষয়ে সংশয় হয়, তাহার যে কোন একটির নিশ্চয়ের হেতু না থাকাই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং যে কোন একটির অভাবনিশ্চয়ের হেতু না থাকাই অনুপলব্ধির অব্যবস্থা। সংশয়মাত্রেরই ঐ দুইটি আবশ্যক। নচেৎ স্বাপ্ত বা পুরুষত্বের নিশ্চয় হইলে অথবা উহার কোন একটির অভাব নিশ্চয় হইলে পূর্বোক্ত সাধারণ ধর্মাদি-জ্ঞান-জন্ত তখনও পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হয় না কেন? সূত্রগত ত্রিবিধ সংশয়েরই বিশেষ লক্ষণে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা এই দুইটি সামান্য কারণকেও নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহাই সূত্রকারের অভিপ্রেত। আর যেখানে কিছু বুঝিবার ইচ্ছা নাই, সেখানে সংশয়ের অন্তান্ত কারণ থাকিলেও সংশয় হয় না; এ জন্ত বলিয়াছেন—“বিশেষাপেক্ষঃ” অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা থাকা চাই, তাহাও সংশয়মাত্রের কারণ। উহাও ত্রিবিধ সংশয়লক্ষণে নিবিষ্ট করিতে হইবে। বার্তিকব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও

উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাত বলিয়াছেন,—বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি সংশয়ের প্রোজেক মাত্র। ঐ সব স্থলে পূর্বোক্ত সাধারণ ধর্মাদিজ্ঞানজন্তই সংশয় হয়। তাঁহার মতে সংশয় বিবিধ। মহর্ষি কণাদ কেবল সাধারণ-ধর্মজ্ঞান-জন্ত একবিধ সংশয়ই বলিয়াছেন। কণাদ-হৃদয়ের উপহারকার শব্দর মিশ্র বলিয়াছেন যে, সমান-তর গৌতমদর্শনে অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্ত যে সংশয়ের কথা আছে, মহর্ষি কণাদ তাহা বলেন নাই। কারণ, কণাদ সংশয়ের জায় “অন্যথাবাদ” নামক এক প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন।^১ তাঁহার মতে অসাধারণ ধর্মজ্ঞান তাহার প্রতিই কারণ। কণাদ-সম্মত ঐ জ্ঞানকে মহর্ষি গৌতম সংশয়ই বলেন; এ জন্ত তিনি অসাধারণ-ধর্মজ্ঞানকে সংশয়ের কারণের মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন।

পরবর্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের পঞ্চবিধ সংশয়ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলেও সরলভাবে মহর্ষির হৃদ পাঠ করিয়া এবং হৃদে “চ”-কারের প্রতি মনোবোগ করিয়া এবং সংশয়-পরীক্ষাফলে এই হৃত্তোক্ত পাঁচটি হেতুকেই আশ্রয়পূর্বক মহর্ষিকৃত ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপক্ষ হৃত্তগুলির পর্যালোচনা করিয়া ভাষ্যকার পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্ত পঞ্চবিধ সংশয়ই মহর্ষি গৌতমের সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাই সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অল্প-লব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়ের পৃথক কারণ কেন বলিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহারও একটু কারণ বলিয়া গিয়াছেন। ফল কথা, তিনি মহর্ষি-হৃদের সহজ-বোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া উদ্যোতকর প্রভৃতির জায় এখানে অন্তরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব মনে করেন নাই। সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চয় হইলে অথবা তাহার অভাব নিশ্চয় হইলে তখনও সাধারণ-ধর্মাদি-জ্ঞানজন্ত সংশয় হয় না কেন? এ আপত্তি ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও নাই। কারণ, ভাষ্যকারের মতে হৃদে “বিশেষাপেক্ষাঃ” এই কথার দ্বারাই ঐ আপত্তি নিরাকৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে হৃত্তোক্ত ঐ কথার ফলিতার্থ এই যে, যাহাতে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি নাই, কিন্তু পূর্বোপলব্ধ বিশেষ ধর্মের স্মৃতিমাত্র আছে, তাহাই “বিশেষাপেক্ষা”। ফলতঃ ঐ “বিশেষাপেক্ষা” সংশয়মাত্রই আবশ্যক। তাহা হইলে যেখানে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইয়া গিয়াছে, সেখানে ঐ “বিশেষাপেক্ষা” না থাকায় সংশয়ের আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার বাস্তবিককারের প্রদত্ত দোষ থাকিলে কেন? যেখানে কিছু বুঝিবার ইচ্ছাই নাই, সেখানেও সংশয়ের সামগ্রী থাকিলে অবশ্য সংশয় হইয়া থাকে। ইচ্ছার অভাবে জ্ঞানের অল্পপত্তি ঘটে না। যদি কোন স্থলে ঐরূপ ঘটে, ইচ্ছা না থাকায় সংশয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে সংশয়ের কোন কারণের অভাব হইয়াছে অথবা কোন প্রতিবন্ধক আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ফল কথা, “বিশেষাপেক্ষাঃ” এই কথার দ্বারাই হৃত্তকার সংশয়ের আপত্তিগুলির নিরাস করিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষাশ্রমকরণে এ বিষয়ে

১। কণাদহৃদে এ কথা স্পষ্ট না থাকিলেও কণাদ-মতব্যাখ্যাতা পরম প্রাচীন প্রমত্তপার “পদার্থধর্মসংগ্রহে” সংশয়জন্ত অনন্যবাদসার নামক সংশয়সমূহ জ্ঞানান্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাগুলিতে উদ্যোতকরের বিশেষ কথা এবং ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য বিতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ পুত্রকাব্যাব্যায় জটিল।

সকল কথা বিশদ ব্যক্ত হইবে। পরীক্ষা না পাইলে সকল তত্ত্ব ঠিক বুঝা যায় না। সংশয়ের কারণেও সংশয় হয়।

ভাষ্য। স্থানবতাং লক্ষণমিতি সমানম্।

অনুবাদ। ক্রম-প্রাপ্ত পদার্থ-বর্গের লক্ষণ বক্তব্য, ইহা সমান—(অর্থাৎ যেমন প্রমেয়-লক্ষণের পরে সংশয়-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সংশয়-লক্ষণের পরে এখন ক্রম-প্রাপ্ত প্রয়োজন-লক্ষণ এবং তাহার পরে যথাক্রমেই দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থ-বর্গের লক্ষণ বলা হইবে)।

সূত্র। যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়ো-
জনম্ ॥২৪॥

অনুবাদ। যে পদার্থকে গ্রাহ্য বা ত্যাজ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন।

ভাষ্য। যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায় তদাপ্তি-হানোপায়মনু-
ষ্ঠিষ্ঠতি প্রয়োজনং তদ্বৈদিত্যম্। প্রবৃত্তি-হেতুত্বাদিমমর্থমাপ্ত্যামি হাত্যামি
বেতি ব্যবসায়োহর্থস্থাদিকারঃ। এবং ব্যবসায়মানোহর্থোহধিক্রিয়ত ইতি।

অনুবাদ। যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাপ্তি
বা ত্যাগের উপায় অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা (সেই
পদার্থ) প্রয়োজন জানিবে। প্রবৃত্তি-হেতুত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ প্রবৃত্তির কারণ
বলিয়া এই পদার্থ পাইব অথবা ত্যাগ করিব, এইরূপ ব্যবসায় (নিশ্চয়) পদার্থের
“অধিকার”। এইরূপে (পূর্বোক্তরূপে) নিশ্চায়মান পদার্থ অধিকৃত হইয়া থাকে।

টীকানী। প্রয়োজন বিবিধ,—মুখ্য ও গৌণ। দ্বিবিধ প্রয়োজন প্রতিপাদনের জন্তই সূত্রে
“অর্থ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নচেৎ উহা না বলিলেও চলিত। সূত্রের প্রাপ্তি এবং ত্যাগের
নিবৃত্তিতে জীবের স্বতাই ইচ্ছা হয়, এ জন্ত ঐ দুইটিই মুখ্য প্রয়োজন। তাহার সাধনগুলি
গৌণ প্রয়োজন। সূত্রের “অধিকৃত্য” এই কথার ব্যাখ্যা ভাষ্যে “ব্যবসায়”। “যমর্থমধিকৃত্য”
এই কথার দ্বারা সূত্রে পদার্থের যে অধিকার বলা হইয়াছে, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,
এই পদার্থ পাইব বা ত্যাগ করিব, এইরূপ নিশ্চয়ই পদার্থের অধিকার; অর্থাৎ সূত্রে অবিপূর্বক
কু বাতুর অর্থ এখানে ঐরূপ নিশ্চয়। ঐরূপ নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির কারণ। কারণ, প্রাপ্য বা ত্যাজ্য
বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই জীব প্রাপ্তি বা পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়। প্রয়োজন-পদার্থের অন্যান্য কথা
পূর্বকই বলা হইয়াছে। ২৪।

সূত্র । লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ ॥২৫॥

অনুবাদ । লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য (অবি-
রোধ) হয়, তাহা দৃষ্টান্ত ।

ভাষ্য । লোকসামান্যমনতীতা লৌকিকাঃ, নৈসর্গিকং বৈনয়িকং
বুদ্ধাতিশয়মপ্রাপ্তাঃ । তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাস্তর্কেণ প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষিতু-
মর্হন্তীতি । যথা যমর্থং লৌকিকা বুধ্যন্তে তথা পরীক্ষকা অপি, সৌহর্থো
দৃষ্টান্তঃ । দৃষ্টান্তবিরোধেন হি প্রতিপক্ষাঃ প্রতিষেদ্ধব্যা ভবন্তীতি ।
দৃষ্টান্তসমাধিনা চ অপক্ষাঃ স্থাপনীয়া ভবন্তীতি । অবয়বেষু চোদাহরণায়
কল্পত ইতি ।

অনুবাদ । লোক-সমানতাকে অনতিক্রান্ত (অর্থাৎ বাঁহারা সাধারণ লোকের
তুল্যতাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এমন ব্যক্তিগণ) ‘লৌকিক’ । বিশদার্থ
এই যে, (বাহারা) স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলন-সম্বৃত বুদ্ধি-
প্রকর্ষকে অপ্রাপ্ত । তদ্বিপরীতগণ অর্থাৎ স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক বুদ্ধিপ্রকর্ষপ্রাপ্ত
ব্যক্তিগণ পরীক্ষক । (যেহেতু, তাঁহারা) তর্কের দ্বারা এবং প্রমাণ-সমূহের দ্বারা
পদার্থকে পরীক্ষা করিতে পারেন । (লৌকিক এবং পরীক্ষকের স্বরূপ ব্যাখ্যা
করিয়া এখন দৃষ্টান্তের সূত্রোক্ত স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন) যে পদার্থকে
লৌকিকগণ যে প্রকার বুঝেন, পরীক্ষকগণও সেইরূপ বুঝেন, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত ।
(দৃষ্টান্ত লক্ষণের প্রয়োজন বর্ণন করিতেছেন) দৃষ্টান্ত-বিরোধের দ্বারা অর্থাৎ
দৃষ্টান্তের সাধ্যশূন্যতা প্রভৃতি দোষের দ্বারা প্রতিপক্ষসমূহ অর্থাৎ প্রতিপক্ষ-সাধন-
সমূহ খণ্ডনীয় হয় (খণ্ডন করা যায়) এবং দৃষ্টান্ত-সমাধির দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের
অসত্য-দোষারোপের প্রতিষেধের দ্বারা অপক্ষ স্থাপনীয় হয় (স্থাপন করা যায়)
এবং অবয়ব-সমূহের মধ্যে (প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়বের মধ্যে) উদাহরণের নিমিত্ত
অর্থাৎ উদাহরণ নামক তৃতীয় অবয়বের লক্ষণের নিমিত্ত (দৃষ্টান্ত পদার্থ)
সমর্থ হয়^১ ।

১ । ভাষ্যে “উদাহরণায় কল্পতে” এই বুলে সামর্থ্যবাহী “কৃপ” শব্দের প্রয়োগবশতঃ চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত
হইয়াছে । ভাষ্যকার এখন সূত্র-ভাষ্যেও “উদাহরণায় কল্পতে তর্কঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন । তর্ক তত্ত্ব-

টিপ্পনো। যিনি বুঝেন, তিনি লৌকিক। যিনি বুঝান, তিনি পরীক্ষক। যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক প্রকৃতার্থে একমত, তাহাই দৃষ্টান্ত হয়। কোন পক্ষের ঐ পদার্থে প্রকৃতার্থের প্রতিকূল বিবাদ থাকিলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। এই তাৎপর্যেই ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“যথা বসুধা ইত্যাদি”। বস্তুতঃ যাহা লৌকিকবেদ্যই নহে, কেবল পরীক্ষকগণ-বেদ্য, এমন পদার্থও দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। এ সব কথা এবং তদনুসারে স্বত্রের ব্যাখ্যা প্রথম স্বত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতেই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য-টীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, “লৌকিক-পরীক্ষাকাণ্ড” এই কথার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীই স্বত্রকারের অভিপ্রেত। বাদী ও প্রতিবাদীর যে পদার্থে বুদ্ধিদাম্য হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত। বিচারের বহুভাষিপ্রায়েই স্বত্রে ঐ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। আর স্বত্রোক্ত “অর্থ” শব্দের দ্বারা “উদাহরণবাক্য” প্রতিপাদ্য পদার্থ-বিশেষই অভিপ্রেত। তত্ত্বিন্ন পদার্থ দৃষ্টান্ত নহে। উদাহরণ-স্বত্রের অর্থ-পর্যালোচনার দ্বারা এই বিশেষার্থ বুঝা যায়। তাৎপর্য-টীকাকার তাঁহার “ভ্রমতী” গ্রন্থে (ব্রহ্মস্বত্রের আরম্ভণাধিকরণে) উপনিষদুক্ত মৃত্তিকার দৃষ্টান্ততা সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, “লৌকিকপরীক্ষাকাণ্ড” ইত্যাদি স্বত্র দ্বারা প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত, ইহাই মহর্ষি গোতমের বিবক্ষিত। দৃষ্টান্তে লোকসিদ্ধিত্বও থাকা চাই, ইহা তাঁহার বিবক্ষিত নহে। অন্যথা তাঁহাদিগের পরমাণু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু প্রভৃতি লোকসিদ্ধ নহে। পরমাণু প্রভৃতি লোকসিদ্ধ না হইয়াও তাঁহাদিগের মতে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তের লক্ষণ ব্যতীত তাহার জ্ঞান অসম্ভব। দৃষ্টান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজন, ভাষ্যকার পূর্বেও বলিয়া আসিয়াছেন। দৃষ্টান্ত না থাকিলে বা না জানিলে জগতে অনেক তত্ত্বই কেহ সকলকে বুঝাইতে পারিতেন না। যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম না হইত, শুক্লিতে রজত-ভ্রম না হইত, স্বপ্নে নানাবিধ অদ্ভুত ভ্রম না হইত, ঐন্দ্রজালিকের মারাত্মক অদ্ভুত মিথ্যা-স্রষ্ট কেহ না দেখিত, তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্করও তাঁহার মায়াবাদকে লৌকিকের মনে,—বিরুদ্ধ-সংসারীর মনে উপস্থিত করিতে পারিতেন না। কেবল উপনিষদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে খিন্ন হইতে হইত। আবার উপনিষৎও যদি “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং” ইত্যন্ত বাক্যে মৃত্তিকাকে সত্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি উপাদান-কারণ ব্রহ্মের সত্যতা এবং তাহার কার্য জগতের মিথ্যাসিদ্ধান্তই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রতিপক্ষের নিকটে সহজে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন না। ফল কথা, দৃষ্টান্ত ব্যতীত প্রতিপক্ষের নিকটে যুক্তির দ্বারা কিছু প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে। স্বপক্ষ-সমর্থন ও পরপক্ষ-খণ্ডনে

জ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়, ইহাই সেখানে ঐ কথার অর্থ। এখানেও দৃষ্টান্ত পদার্থ উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণের জন্য আবশ্যক বলিয়া উহাকে উদাহরণ-বাক্যের নিমিত্ত সমর্থ বলা যাইতে পারে। সেযুক্তের—

“কল্পিতাস্তে দ্বিরপণপদপ্রাপ্তয়ে অক্ষধানাঃ”।—পূর্বসেধ, ৩৬।

এই শ্লোকের টীকার মন্নিষাণ লিখিয়াছেন,—“তুণ্ডে: পৰ্য্যাপ্তিবচনস্ত অলমর্থদ্বাং তদুযোগে নবঃ স্বত্বীত্যাখিনি চতুর্থী, অলমিতি পৰ্য্যাপ্ত্যর্থপ্রণমিতি ভাষ্যকারঃ।”

দৃষ্টান্ত একটী প্ৰধান উপকরণ। মনে রাখিতে হইবে, দৃষ্টান্ত কখনই সৰ্বাংশে সমান হয় না। কোথায়, কোন্ অংশে, কি ভাবে দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা প্ৰণিধান করিয়া বুঝিতে হয়। অন্ত্যন্ত কথা পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। ২৫।

ভাষ্য। অথ সিদ্ধান্তঃ, ইদমিথস্তুতক্ষেত্ৰ্যভ্যনুজ্ঞায়মানমর্থজাতং সিদ্ধং, সিদ্ধস্ত সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ, সংস্থিতিরিত্থস্তাব্যবস্থা, ধৰ্ম্মনিয়মঃ। স খল্লয়ম্।

সূত্র। তত্ৰাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। অনন্তর (দৃষ্টান্ত-নিরূপণের পরে) সিদ্ধান্ত (নিরূপণীয়)। “ইহা” এবং “এই প্ৰকার” এইরূপে স্বীকৃত্যমান পদার্থসমূহ “সিদ্ধ”। সিদ্ধের সংস্থিতি ‘সিদ্ধান্ত’। “সংস্থিতি” বলিতে ইচ্ছান্তাবের ব্যবস্থা কি না—ধৰ্ম্মনিয়ম। (অর্থাৎ এই পদার্থ এই ধৰ্ম্মবিশিষ্ট, অন্যধৰ্ম্মবিশিষ্ট নহে, এইরূপ প্ৰমাণসিদ্ধ নিয়ম)। সেই-ই এই।

(সূত্রানুবাদ) “তত্ৰাধিকরণে”র অর্থাৎ প্ৰমাণাশ্রিত বা প্ৰমাণবোধিত পদার্থের “অভ্যুপগমসংস্থিতি” অর্থাৎ পূৰ্বেবাক্ত ইচ্ছান্তাবের ব্যবস্থা (পূৰ্বেবাক্ত ধৰ্ম্মনিয়ম) “সিদ্ধান্ত”।

টিপ্পনী। দৃষ্টান্তের পরে সিদ্ধান্তই জনপ্ৰাপ্ত বলিয়া নিরূপণীয়। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার হৃদ-পাঠের পূৰ্বেই হৃদ-প্ৰতিপাদ্য সিদ্ধান্ত সামান্য লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া “স খল্লয়ম্” এই কথার দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ফল কথা, “অথ সিদ্ধান্তঃ” ইত্যাদি ভাষ্য এই সূত্রেরই ভাষ্য। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। সূত্রের ঐ ভাষ্য দেখিয়া নবীনগণের এখানে বিলুপ্ত সূত্রান্তরের অল্পমান অমূলক। ভাষ্যকার “স খল্লয়ম্” এই কথার দ্বারা প্ৰকাশ করিয়াছেন যে, সিদ্ধান্ত বাহ্য ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই এই হৃদ-প্ৰতিপাদ্য। অর্থাৎ মহর্ষি-সূত্রেরও ইহাই তাৎপৰ্য্যার্থ। ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত সূত্রের যোজনা করিতে হইবে। পদার্থমাত্ৰেরই সামান্য ধৰ্ম্ম এবং বিশেষ ধৰ্ম্ম আছে। “ইদং” বলিয়া সামান্যতঃ এবং “ইথস্তুতং” বলিয়া বিশেষতঃ পদার্থনির্ণয় হয়। ঐ সামান্য ধৰ্ম্ম এবং বিশেষ ধৰ্ম্মরূপে স্বীকৃত্যমান পদার্থকে “সিদ্ধ” বলে। ঐ সিদ্ধের অন্তকে সিদ্ধান্ত বলে। “অন্ত” বলিতে সমাপ্তি। সামান্যতঃ স্বীকৃত পদার্থের প্ৰমাণের দ্বারা বিশেষতঃ নিশ্চয় হইলেই উহার স্বীকারের সমাপ্তি হয়। উহারই নাম “সংস্থিতি”। এই পদার্থ এই প্ৰকারই হইবে, অল্প প্ৰকার হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা বা নিয়মই “সংস্থিতি”। তাই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ইচ্ছান্তাব্যবস্থা”। উহারই বিবরণ করিয়াছেন—“ধৰ্ম্মনিয়মঃ”। এই সূত্রটি অথবা ইহার পরবর্তী

স্বত্রটি মহর্ষি গোতমের উক্ত নহে। কারণ, এখানে দুইটি স্বত্র নিম্নয়োজন এবং অর্থ-সঙ্গতিও হয় না—এই পূর্বপক্ষাবলম্বন করিয়া উদ্যোতকর সমাধান করিয়াছেন যে, দুইটিই ঋষিস্বত্র। প্রথমটি—সিদ্ধান্তের সামান্যলক্ষণস্বত্র। দ্বিতীয়টি—সিদ্ধান্তের বিভাগ-স্বত্র। সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়ই আবশ্যক। তাৎপর্যটীকাকারও এই স্বত্রটিকে সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণস্বত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, স্বত্রে “তত্ত্ব” শব্দের অর্থ এখানে প্রমাণ। “তত্ত্ব”, কি না প্রমাণ বাহার “অধিকরণ” অর্থাৎ আশ্রয়, অর্থাৎ যে পদার্থ কোন মতে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত, তাহাই “তত্ত্বাধিকরণ”। বিভিন্ন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির সমস্তই বস্তুতঃ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। এ জন্ম যিনি যে পদার্থ প্রামাণিক বলিয়া মানেন, তাহার পক্ষে সেইটিই “তত্ত্বাধিকরণ” বা প্রামাণিক পদার্থ। বাদী ও প্রতিবাদীর মতানুসারেই এখানে প্রামাণিক পদার্থের কথা বলা হইয়াছে। ভাষ্যে যাহাকে “সংস্থিতি” বলা হইয়াছে, স্বত্রে তাহাকেই “অভ্যুপগমসংস্থিতি” বলা হইয়াছে। মূলকথা, এইটি সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণস্বত্র। এই সিদ্ধান্তকে মহর্ষি গোতম চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যে পদার্থ কোন শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধ নহে এবং অন্ততঃ কোন এক শাস্ত্রে কথিত, তাহার নাম (১) “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত”। যে পদার্থ সকল শাস্ত্রের সম্মত নহে, কোন শাস্ত্রকারবিশেষেরই সম্মত, তাহার নাম (২) “প্রতি-তত্ত্বসিদ্ধান্ত”। যে পদার্থটি প্রমাণসিদ্ধ করিতে হইলে তাহার আনুযায়িক অল্প পদার্থেরও সিদ্ধি আবশ্যক হয়, সেখানে সেই প্রকৃত পদার্থটিই আনুযায়িক সিদ্ধান্তের অধিকরণ বা আশ্রয় বলিয়া সেইরূপে (৩) “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। যেমন ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইলে সেখানে ঈশ্বরের সর্বস্বত্বতা প্রভৃতি আনুযায়িক পদার্থও সিদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং সেখানে ঐ সর্বস্বত্বতা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট জগৎকর্তাই “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। ইহা ভাষ্যকারের মত। পরবর্তী নব্য-দিগের মতে পূর্বোক্ত স্থলে আনুযায়িক পদার্থগুলিই “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। বিচারহলে অন্যের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াই যদি তাহার বিশেষ ধর্ম লইয়া বিচার করা হয়, তাহা হইলে সেখানে ঐ ভাবে স্বীকৃত পরসিদ্ধান্তের নাম (৪) “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ইহাও ভাষ্যকারের মত। পরবর্তী নৈয়ায়িকদিগের মতে যাহা ঋষি স্পষ্ট বলেন নাই, কিন্তু ঋষির অল্প কথার দ্বারা তাহা ঋষির মত বলিয়াই বুঝা যায়, তাহার নাম “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। পূর্বোক্ত প্রকার সিদ্ধান্তের ভেদ ও লক্ষণ এবং উদাহরণাদি ইহার পরেই পাওয়া যাইবে। মহর্ষি গোতমোক্ত চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের জ্ঞানই বিচারে আবশ্যক। তাই অবয়বের পূর্বেই মহর্ষি বিচারাদি সিদ্ধান্ত পদার্থের সর্বশেষ নিরূপণ করিয়াছেন। ২৬।

ভাষ্য। তত্ত্বার্থ-সংস্থিতিঃ তত্ত্বসংস্থিতিঃ। তত্ত্বমিতরেতরাভি-
সম্বন্ধস্তার্থসমূহস্তোপদেশঃ শাস্ত্রম্। অধিকরণানুযায়ী সংস্থিতিরধি-

১। তত্ত্বান্তে বুৎপাতান্তে প্রসেদ্যানেনৈতি তত্ত্বং প্রমাণং তত্ত্বং অর্থঃ অধিকরণমাত্রায়ো জ্ঞাপকত্বেন যোয্যমর্থনিয়মঃ।—
জায়বা঳্কিকতাৎপর্যটীকা।

করণসংস্থিতিঃ । অভ্যুপগমসংস্থিতিরনবধারিতার্থপরিগ্রহঃ । তদ্বিশেষ-
পরীক্ষণায়ভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ । তদ্রভেদান্তু খলু—

সূত্র । স চতুर्विधः सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधि-
करणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात् ॥ २१ ॥

ভাষ্য । তত্রৈতাশ্চতস্রঃ সংস্থিতয়োহর্থান্तरভূতাঃ ।

অনুবাদ । “তদ্ব্যর্থসংস্থিতি” (অর্থাৎ সাক্ষাৎশাস্ত্রপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত)
“তদ্রসংস্থিতি” । (১) সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত (২) এবং (প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত) ।

তদ্র বলিতে (এখানে) পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ-সমূহের উপদেশ শাস্ত্র ।
অধিকরণের অর্থাৎ আশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদার্থের সংস্থিতি “অধিকরণসংস্থিতি”
(৩) অধিকরণসিদ্ধান্ত) । অনবধারিত পদার্থের স্বীকার অর্থাৎ বিচারস্থলে অসিদ্ধ
পদার্থকেও মানিয়া লওয়া “অভ্যুপগমসংস্থিতি” (৪) অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত) । তাহার
অর্থাৎ বিচার্য পদার্থের বিশেষ পরীক্ষার জন্য অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত হয় । তদ্রভেদ
প্রযুক্তই অর্থাৎ শাস্ত্রের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই (সূত্রানুবাদ) তাহা অর্থাৎ
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত চতুर्विध । কারণ, “সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত,” “প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত,”
“অধিকরণসিদ্ধান্ত” এবং “অভ্যুপগমসিদ্ধান্তে”র অর্থান্तरভাব অর্থাৎ পরস্পর ভেদ বা
বৈলক্ষণ্য আছে । (ভাষ্যানুবাদ) তন্মধ্যে এই চারিটি সিদ্ধান্ত অর্থান্तरভূত অর্থাৎ
পরস্পর বিলক্ষণ । (অর্থাৎ সিদ্ধান্তব্যক্তি অসংখ্য হইলেও তাহাকে এই চারি
প্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে । কারণ, এই চারিটি পরস্পর বিলক্ষণ এবং ইহার
মধ্যেই সকল সিদ্ধান্ত আছে) ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার পূর্বসূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তের এই বিভাগ-সূত্রটিরও পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়া
গরে সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । “তদ্ব্যর্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি ভাষ্য পূর্বসূত্রের ভাষ্য বলিয়া
ভ্রম হইয়া থাকে । বস্তুতঃ উহা এই সূত্রেরই ভাষ্য । সূত্রে এবং ভাষ্যে “সংস্থিতি” শব্দ
সিদ্ধান্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । সূত্রে দ্বন্দ্বসমাসের পরবর্তী “সংস্থিতি” শব্দের সহিত প্রত্যেকের
সম্বন্ধবশতঃ পূর্বোক্ত চতুर्वিध সংস্থিতি বা সিদ্ধান্ত বুঝা যায় । ভাষ্যকার চতুर्वিध সিদ্ধান্তের
ব্যাখ্যা করিতে “তদ্রসংস্থিতি,” “অধিকরণসংস্থিতি” এবং “অভ্যুপগমসংস্থিতি” এই তিনটিকেই
বলিয়াছেন, তবে সিদ্ধান্ত চতুर्वিध হয় কিরূপে ? এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—
“তদ্রভেদান্তু খলু” । ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত “স চতুर्विधः” এই সূত্রার্থের যোজনা
বুঝিতে হইবে । তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত “তদ্রসংস্থিতি” শব্দের দ্বারা “সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত” ও
“প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত” এই দুইটি সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে । কারণ, তন্ময়ের ভেদ আছে । প্রতিতন্ত্র-

গুলিও “তত্ত্ব”। সুতরাং “তত্ত্বসংস্থিতি” বলিলে “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তে”র স্থায় “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত”ও বলা হইল। ফলতঃ ভাষ্যকার ঐরূপে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। সিদ্ধান্ত চতুর্বিধই বলা হয় কেন? দ্বিবিধ বা ত্রিবিধও বলা যাইতে পারে? স্বত্রকার এতদ্বারা সিদ্ধান্তের চতুর্বিধত্বের হেতু বলিয়াছেন। ভাষ্যকার স্বত্রপাঠের পরে “ভট্টৈতান্যচতস্রঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা স্বত্রোক্ত ঐ হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ কথিত চারিটি সিদ্ধান্তের পরস্পর ভেদ থাকায় সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ এবং সকল সিদ্ধান্তই এই চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই চারিটির বেনীও নহে, কমও নহে, এই নিয়মের জন্যই স্বত্রকার সিদ্ধান্তের চতুর্বিধ বিভাগ করিয়াছেন। “স চতুর্বিধঃ” এই অংশ ভাষ্য বলিয়াই অনেকে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা স্বত্রাংশ। ত্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার “শ্রায়স্থচানিবন্ধ” গ্রন্থে ঐ অংশকে স্বত্রমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চম স্বত্র-ভাষ্যের শেষে, ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ঐ অংশকে মহর্ষিবচন বলিয়া বুঝা যায়।

ভাষ্য। তাসাম্।

অনুবাদ। তাহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ “সংস্থিতি”র (সিদ্ধান্তের)

মধ্যে—

সূত্র। সর্বতত্ত্বাবিরুদ্ধস্তত্ত্বেহধিকৃতোৎতঃ
সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তঃ ॥২৮॥

অনুবাদ। সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, শাস্ত্রে কথিত পদার্থ “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত।”

ভাষ্য। যথা জ্ঞাপাদীনৌদ্ভিগ্নাণি, গন্ধাদয় ইন্দ্রিয়ার্থাঃ, পৃথিব্যাদীনী
ভূতানি, প্রমাণৈরর্থস্ত গ্রহণমিতি।

অনুবাদ। যেমন জ্ঞাপাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ, ক্রিতি প্রভৃতি ভূত,
প্রমাণের দ্বারা পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়, ইত্যাদি (সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত)।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার “তাসাম্” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত সংস্থিতির অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণ-চতুর্বিধের অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে পদার্থ সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, তাহা “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত”। ভাষ্যকার জ্ঞাপাদির ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ইহার উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞাপাদির ভৌতিকত্ব বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। ভাষ্যের শেষোক্ত “ইতি” শব্দটি আদি অর্থে প্রযুক্তও বলা যায়। “ইতি” শব্দের “আদি” অর্থ কোথায় কথিত আছে?। “সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ” এই কথা না বলিয়া “সর্বশাস্ত্রে কথিত” এই কথা বলিলে গোতমোক্ত “ছল” ও “জাতির” অসহন্যের সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, উহা সর্বশাস্ত্রে কথিত নহে; কেবল জ্ঞানশাস্ত্রেই কথিত। তবে উহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, এই জন্য সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতেছে। কেবল সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেই তাহা মহর্ষি সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত

বলেন না, কোন শাস্ত্রেও কথিত হওয়া চাই। তাই আবার বলিয়াছেন—“তন্মহাবিকৃতঃ”। উদ্যোতকর, বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে মনের ইন্দ্রিয়র অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। উহা সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে, এ জন্ত বলিয়াছেন—“তন্মহাবিকৃতঃ”। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে জ্ঞাততত্ত্ব মনের ইন্দ্রিয়র সাধাৎ কথিত হয় নাই, এ জন্ত উহা সর্বতত্ত্বে অবিকৃত হইলেও “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” হইবে না। কিন্তু ভাব্যকারের মতে অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের লক্ষণ অজ্ঞবিধ। তাঁহার মতে মনের ইন্দ্রিয়র “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” নহে। এ সব কথা পরে ব্যক্ত হইবে। পূর্বোক্ত “দৃষ্টান্ত” এবং এই “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” একই পদার্থ, ইহার পৃথক উল্লেখ কেন? এতদ্ব্যতীত উদ্যোতকর বলিয়াছেন—“দৃষ্টান্ত” কেবল বাদী ও প্রতিবাদীরই নিশ্চিত থাকে। সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত তজ্জপ নহে। উহা সকলেরই নিশ্চিত। দৃষ্টান্ত অল্পমান ও আগমের আশ্রয়, সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত তজ্জপ নহে; স্বতরাং দুইটির ভেদ আছে। উহার এক পদার্থ নহে।

সূত্র। সমানতত্ত্বসিদ্ধঃ পরতত্ত্বাসিদ্ধঃ প্রতিতত্ত্ব- সিদ্ধান্তঃ ॥২৯॥

অনুবাদ। একশাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বশাস্ত্রসিদ্ধ, (কিন্তু) পরতত্ত্বে (অন্য শাস্ত্রে) অসিদ্ধ (পদার্থ) “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত”।

ভাষ্য। যথা নামত আত্মলাভঃ, ন সত আত্মহানঃ, নিরতিশয়া-
শ্চেতনাঃ, দেহেন্দ্রিয়মনঃস্ব বিষয়েষু তত্ত্বৎকারণে চ বিশেষ ইতি
সাংখ্যানাম্। পুরুষকর্মাধিনিমিত্তো ভূতসর্গঃ, কর্মহেতবো দোষাঃ
প্রবৃত্তিচ্চ, স্বগুণ-বিশিষ্টাশ্চেতনাঃ, অসৎপদ্যতে উৎপন্নং নিরুধ্যত ইতি
যোগানাম্।

অনুবাদ। যেমন অসতের উৎপত্তি নাই, সতের অত্যন্ত বিনাশ নাই, (তিরো-
ভাবমাত্র আছে)। চেতনগণ অর্থাৎ আত্মাগুলি নিরতিশয় (অপরিণামী নিগুণ)।
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে, বিষয়-সমূহে এবং তত্ত্বৎকারণে অর্থাৎ “মহৎ”, “অহঙ্কার” এবং
“পঞ্চতন্মাত্র”রূপ সূক্ষ্ম ভূতে “বিশেষ” (পরিণামবিশেষ) আছে, ইহা সাংখ্যাদিগেরই
(প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত)। ভূতসৃষ্টি (দ্ব্যণুকাতিজ্ঞাতগোর উৎপত্তি) পুরুষের কর্মাদিজ্ঞাত
(জীবের অদৃষ্ট এবং পরমাণুদ্বয় সংযোগাদি কারণজ্ঞাত)। দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও
মোহ) এবং প্রবৃত্তি, কর্মের (অদৃষ্টের) হেতু। আত্মাগুলি স্বগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ
জ্ঞানাদি-নিজগুণ-বিশিষ্ট। অসৎই অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যাহার কোনরূপ সত্তা
থাকে না, তাহাই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন বস্তু অর্থাৎ জ্ঞাত সংপদার্থ নিরুদ্ধ হয়

(অত্যন্ত বিনষ্ট হয়), ইহা যোগদিগেরই অর্থাৎ সাংখ্যের পরিণামবাদের বিপরীতবাদী “আরম্ভবাদী”দিগেরই (প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত) ।

টিপ্পনী । তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন,—হুত্রে “সমান” শব্দ একার্থে প্রযুক্ত । যেমন, নৈয়ায়িকদিগের স্মারশাস্ত্র সমানতত্ত্ব, সাংখ্যাশাস্ত্র পরতত্ত্ব ইত্যাদি । ফলতঃ বাহার যেটি নিজ-তত্ত্ব, তাহাই এখানে “সমান-তত্ত্ব” শব্দের প্রতিপাদ্য এবং যে পদার্থ বাহার সমান তত্ত্বসিদ্ধ, কিন্তু পরতত্ত্বে অসিদ্ধ, সেই পদার্থ তাহার “প্রতিতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত” । যেমন মীমাংসকদিগের শব্দ-নিত্যতা প্রভৃতি । কোন সিদ্ধান্তে একাবিক সম্প্রদায়ের একমত থাকিলে তাহাও তাহাদিগের সকলেরই প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইবে । যেমন ভাষ্যোক্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তগুলি পাতঞ্জলেরও সিদ্ধান্ত । পাতঞ্জলও সাংখ্য, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যে “সাংখ্যানাং” এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে । উহাতে পাতঞ্জলদিগকেও বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার পরে সাংখ্যের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—“যোগানাম্” । স্মারবার্ত্তিককার উদ্যোতকরও লিখিয়াছেন,—“ভৌতিকানীশ্রিয়াগীতি যোগানামভৌতিকানীতি সাংখ্যানাম্” । বার্ত্তিক ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—“যোগানামেব সাংখ্যানামেবেতি নিয়মঃ” । কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার “যোগানাং” এই কথার দ্বারা কাহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা কিছু বলেন নাই । “যোগানাং” এই কথা বলিলে যোগাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কথাই সকলে বুঝিয়া থাকেন । “এতেন যোগঃ প্রতুষ্কঃ” এই ব্রহ্মহুত্রে যখন যোগ-শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থেই “যোগ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তখন ঐ “যোগ” শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে “যোগানাং” এই কথার দ্বারা যোগাচার্য্যসম্প্রদায়কে অবশ্য বুঝা যাইতে পারে এবং ঐরূপ প্রয়োগে তাহাই সকলে বুঝিয়া থাকেন । যোগাচার্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন কোন সম্প্রদায় যদি স্মার ও বৈশেষিকের “আরম্ভবাদ” অবলম্বন করিয়া যোগবর্ণন করিয়া থাকেন এবং ভাষ্যকারের সময়ে তাহাদিগের মতের প্রসিদ্ধি থাকে, তাহা হইলে ভাষ্যকার “যোগানাং” এই কথার দ্বারা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারেন । কিন্তু কেবল “যোগানাং” এই কথা বলিলে সামান্যতঃ যোগাচার্য্য সম্প্রদায়মাত্রই বুঝা যায় । পরন্তু কোন যোগাচার্য্য স্মারবৈশেষিকের আরম্ভবাদ গ্রহণ করিয়া যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন, ইহা পাওয়া যায় না । যোগাচার্য্য ভগবান্ বার্ষগণ্য মায়্যবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার কথায় পাওয়া যায়—(পুরোক্ত ব্রহ্মহুত্রে শারীরক ভাষ্য ভূমতী দ্রষ্টব্য) । ফলকথা, ভাষ্যকার যে সকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া “যোগানাং” এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, উহা যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপে কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যায় না । উহা বৈশেষিক ও স্মারের সিদ্ধান্তরূপেই স্বপ্রসিদ্ধ আছে । তবে ভাষ্যকার কেন ঐরূপ বলিয়াছেন ? ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন ।

বহু অল্পসংখ্যের ফলে কোন জাবিড় মহামনীষীর মুখে শুনিতো পাই যে, এখানে “যোগানাং” এই কথার ব্যাখ্যা “বৈশেষিকানাম্” । মহর্ষি কণাদ যোগবিভূতির দ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করায় তাহার ঐ শাস্ত্র তৎকালে যোগশাস্ত্র নামেও অভিহিত হইত । “যোগী” অর্থাৎ যোগবিভূতিসম্পন্ন মহর্ষি কণাদ কর্তৃক প্রোক্ত এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপে

“যোগ” শব্দের অর্থ বৈশেষিক শাস্ত্র। তাহার পরে ঐ “যোগ” কি না—বৈশেষিক শাস্ত্রে বাহ্যার বিস্তৃত অর্থ্যং ঐ শাস্ত্রমতের সম্প্রদায়, এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা “যোগ” শব্দের অর্থ এখানে বৈশেষিক সম্প্রদায় বুঝা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বৈশেষিকের প্রধান আচার্য্য পরমপ্রাচীন প্রশস্তপাদও তাঁহার “পদার্থদর্শনসংগ্রহে”র শেষে কণাদের যোগবিভূতির পূর্বোক্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন।^১ অন্তান্ত টীকাকারগণও কণাদের যোগবিভূতির কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং বায়ুপুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও কণাদের যোগবিভূতি বর্ণিত আছে।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই যে, কেবল বৈশেষিক সম্প্রদায়কে বুঝাইবার জন্য পূর্বোক্ত প্রকার ব্যুৎপত্তি আশ্রয় করিয়া “যোগ” শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি স্ত্রায়াচাৰ্য্যগণ অন্ত কোন স্থানে ঐরূপ প্রয়োগ করেনও নাই। উদ্যোতকর “স্ত্রায়বাস্তিকে” বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত বলিতে “বৈশেষিকানাং” এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনিও “যোগানাং” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। ইহার কি কোন নিগূঢ় কারণ নাই? আর যদি গতান্তর না থাকায় এখানে “যোগ” শব্দের ঐরূপ একটা অর্থ ব্যাখ্যা করিতেই হয় এবং করা যায়, তাহা হইলে এখানে “যোগানাং” এই কথার ব্যাখ্যা “আরম্ভবাদিনাং” ইহাও বলিতে পারি। কারণ, “যোগ” শব্দের সংযোগ অর্থ সুপ্রসিদ্ধ আছে। “সর্বদর্শনসংগ্রহে” যোগ ব্যাখ্যায় মহামনীষী মাধবাচার্য্যও “যোগ” শব্দের সংযোগরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ, ইহা বলিয়াছেন। এখন তাৎপর্য্যানুসারে যদি “যোগিন্” শব্দের দ্বারা কণাদ মহর্ষিকেই বুঝিয়া তাঁহার প্রোক্ত শাস্ত্রকে “যোগ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা হইলে তাৎপর্য্যানুসারে “যোগ” শব্দের দ্বারা জ্ঞায় ও বৈশেষিকের “আরম্ভবাদে”র মূল যে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ এবং ঐরূপ অন্তান্ত সংযোগ, তাহাও বুঝিতে পারি। তাহা হইলে ঐরূপে “যোগ” বা সংযোগবিশেষবাদীকেও “যোগী” বলিতে পারি। যেমন বৈতবাদীকে “বৈতী” এবং অবৈতবাদীকে “অবৈতী” বলা হয়, তদ্রূপ পরমাণুদ্বয়ের “যোগ”বাদীকে “যোগী” বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে “যোগিন্” শব্দের দ্বারা আরম্ভবাদীদিগকেও বুঝা যাইতে পারে। “যোগী” অর্থ্যং আরম্ভবাদীর প্রোক্ত শাস্ত্রকে “যোগ” বলা যাইতে পারে। সেই “যোগ” শাস্ত্রকে বাহ্যার জানেন, তাঁহাদিগকেও “যোগ” বলা যাইতে পারে।^২ ভাব্যকার যে তাহাই বলেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে অন্তরূপ তাৎপর্য্যও কল্পনা করিবার অধিকার আছে। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাবিক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বাহাদিগের সিদ্ধান্ত, তাঁহাদিগকে “আরম্ভবাদী” বলে। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগই আরম্ভবাদীদিগের অসিদ্ধান্তের মূল। উহা খণ্ডিত হইলেই “আরম্ভবাদ”

১। তদ্বীতে তৎপদ—পাণিনিমহত্ৰ, ৪, ২। ৫২। শ্রোতাস্থক্—পাণিনিমহত্ৰ, ৪, ২। ৫৩। শ্রোতাস্থক্ প্রত্যয়ঃ পরমাত্মাত্মবেদিত্বপ্রত্যয়ত্ব লুক্ প্রাচ—সিদ্ধান্তকোষী।

২। যোগাচারবিভূত্যা যজ্ঞোবিত্ত্বা মধেধরম্।

চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তন্মৈ কণভূজে ননঃ—প্রশস্তপাধবাক্য।

৩। যোগিনা আরম্ভবাদিনা শ্রোতং শাস্ত্রং যোগং—তদ্বিভূতি যে তে যোগাঃ আরম্ভবাদিনঃ।

খণ্ডিত হয়। এ জন্ত আরম্ভবাদ খণ্ডনে “ব্রহ্মহুত্বে” ও “শারীরক ভাবো” এই সংযোগই প্রধানতঃ এবং বিশেষতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। পরমাণু বা অস্ত্র অবয়বের সংযোগবিশেষজ্ঞ অবয়বীর উৎপত্তি হয়, ইহা “আরম্ভবাদী” দিগেরই মত। অস্ত্রবাদীর উহা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং “আরম্ভবাদে”র মূল সংযোগকে ধরিয়া ভাষ্যকার ও বার্তিককার এখানে “যোগানাং” এই কথা দ্বারা “আরম্ভবাদী” সম্প্রদায়কে প্রকাশ করিতে পারেন। তাহাতে ঐরূপ প্রয়োগের সার্থকতাও হয়। কারণ, আরম্ভবাদী নৈরায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কে এক কথায় প্রকাশ করিবার জন্ত ঐরূপ প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। ভাষ্যকার যখন “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তে”র উদাহরণ বলিতে “যোগানাং” এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন উহা যোগসম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, অস্ত্র সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই তাহার বক্তব্য। তাৎপর্যটাকাহারও “যোগানাং”মের এইরূপ কথার দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য ঐগুলি ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই ঐ ব্যাখ্যার তাৎপর্য বলিয়াই বুঝা যায়, কিন্তু শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি যে কেবল বৈশেষিকের অথবা কেবল নৈরায়িকের সিদ্ধান্ত নহে, উহা আরম্ভবাদী সকল সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, তদন্তিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা বলিতে হইলে এখানে “বৈশেষিকানাংমের” অথবা “নৈরায়িকানাংমের” এইরূপ কোন প্রয়োগের দ্বারা তাহা বলা হয় না। সুতরাং ভাষ্যকার এখানে “যোগানাংমের” এই কথার দ্বারা তাহার শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি “আরম্ভবাদী” মাত্রেরই “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত,” ইহা প্রকাশ করিতে পারেন।

মূলকথা, যে অর্থেই হউক, ভাষ্যকার যে এখানে “যোগ” শব্দের দ্বারা আরম্ভবাদী বৈশেষিক সম্প্রদায় অথবা ঐ মতাবলম্বী সকল সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, ভাষ্যকারের শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি “আরম্ভবাদী” ভিন্ন আর কোন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে। বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত বলিতে “যোগ” শব্দের প্রয়োগ জৈন জ্ঞানের গ্রন্থেও পাইয়াছি। জৈন জ্ঞানের গ্রন্থে কোন কোন স্থলে “যোগ” শব্দেরও প্রয়োগ আছে। আবার কোন স্থলে “যোগ” শব্দের দ্বারা প্রমাণ-চতুষ্টয়বাদী নৈরায়িক সম্প্রদায়কেও গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা

১। যোগান্ত সদকারণবহ্নিতামিত্যাদিঃ।

সদকারণবহ্নিতামিতি যোগবচনং যথা।—বিদ্যানন্দাধিকৃত “পত্রপত্রিকা” (জৈন জ্ঞান)।

“সদকারণবহ্নিতাং” এইটি বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থাদ্যায়ের প্রথম সূত্র। এইটিকে উল্লেখ করিয়া ইহাকে “যোগ”-বাচ্য বলা হইয়াছে।

২। সৌমতসংখ্যায়োগানাং তথাভূতপরিণাম-বিশেষ্যসিদ্ধেঃ।—(বিদ্যানন্দাধিকৃত পত্রপত্রিকা)।

৩। সৌমত-সংখ্যায়োগ-প্রত্যাকর-জৈমিনীয়াং প্রত্যাকানুমানাংমোপমানার্থগজ্ঞাতাব্যবৈক্যবিবৈক্যান্তিঃ।

—(“পত্রিকাভূত”, ৩ অনুচ্ছেদ, ৫৭ সূত্র)।

এই সূত্রোক্ত প্রত্যাক প্রভৃতি প্রমাণগুলির ব্যাখ্যাসে এক একটি অতিরিক্ত গ্রন্থ করিলে “যোগ” পক্ষে প্রত্যাকাদি চারিটি প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশেষিক যখন প্রত্যাকাদি প্রমাণবহ্নিবাদী, তখন এই সূত্রে “যোগ” শব্দের দ্বারা “প্রত্যাকাদি প্রমাণচতুষ্টয়বাদী নৈরায়িককেই গ্রহণ করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। বড়দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাহার ওপরস্থ পট্টই লিখিয়াছেন—“কথাসৌ নৈরায়িকানাং যোগপরাধিধানানাং”।

বার, প্রাচীন কালে বৈশেষিক সম্প্রদায়কে “যোগ” বা “যোগ” শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইত এবং কোন স্থলে “যোগ” শব্দের দ্বারা কেবল গোতম সম্প্রদায়কেও প্রকাশ করা হইত। কেন হইত, কিরূপ অর্থে ঐরূপ প্রয়োগ হইত, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা না গেলেও ঐরূপ প্রয়োগ বিষয়ে সংশয় নাই। সুধীগণের চিন্তা করিবার জন্য জৈন ত্রায়ের গ্রন্থসংবাদও প্রদত্ত হইল। অনুসন্ধিৎসু অনুসন্ধান করিয়া তথ্য নির্ণয় করুন।

সূত্র । যৎ সিদ্ধাবশ্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সৌহৃদিকরণ- সিদ্ধান্তঃ ॥৩০॥

অনুবাদ । যে পদার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অন্য প্রকরণের অর্থাৎ অন্য আনুষঙ্গিক পদার্থের সিদ্ধি হয়, তাহা (সেই পদার্থ) অধিকরণসিদ্ধান্ত ।

ভাষ্য । যস্তার্থস্য সিদ্ধাবশ্যেহর্থ্য অনুযজ্যন্তে, ন তৈর্বিবিনা সৌহৃদ্যঃ সিধ্যতি তেহর্থ্য যদধিষ্ঠানঃ সৌহৃদিকরণসিদ্ধান্তঃ । যথেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তো জ্ঞাতা দর্শন-স্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাদিতি । অত্রানুযজ্ঞিণোহর্থ্য ইন্দ্রিয়-নানাস্থম্ ; নিয়তবিষয়াণীন্দ্রিয়াণি, স্ববিষয়-গ্রহণলক্ষণানি, জ্ঞাতুজ্ঞান-সাধনানি, গন্ধাদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং গুণাধিকরণং, অনিয়তবিষয়া-শ্চেতনং ইতি, পূর্ব্বার্থসিদ্ধাবেতেহর্থ্যঃ সিধ্যন্তি ন তৈর্বিবিনা সৌহৃদ্যঃ সম্ভবতীতি ।

অনুবাদ । যে পদার্থের (সাধ্যের অথবা হেতুর) সিদ্ধিবিষয়ে অন্য পদার্থগুলি অনুযুক্ত (সংবদ্ধ) হয়, বিশদার্থ এই যে—সেইগুলি অর্থাৎ সেই আনুষঙ্গিক পদার্থ-গুলি ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্ব্বোক্ত পদার্থ) সিদ্ধ হয় না,—আরও বিশদার্থ এই যে, সেই পদার্থগুলি (সেই আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি) ‘যদধিষ্ঠান’ অর্থাৎ যে পদার্থের আশ্রিত, তাহা অর্থাৎ সেই সাক্ষাৎ উল্লিখ্যমান আশ্রয়-পদার্থটি ‘অধিকরণ সিদ্ধান্ত’ । (উদাহরণ) যেমন দর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা অর্থাৎ চক্ষুঃ ও হৃগেন্দ্রিয়ের দ্বারা এক পদার্থের প্রতিসন্ধানবশতঃ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন (ইহা মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন) ।

ইহাতে অর্থাৎ চক্ষুঃ ও হৃগেন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার একার্থ-প্রতিসন্ধান-সিদ্ধিবিষয়ে আনুষঙ্গিক পদার্থ ইন্দ্রিয়নানাস্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব (এবং) ইন্দ্রিয়গুলি (বহি-রিন্দ্রিয়গুলি) নিয়তবিষয়,—স্ববিষয়গ্রহণ-লক্ষণ (এবং) আত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়বর্গের বিষয়নিয়ম এবং স্ব স্ব বিষয়গ্রহণলক্ষণ এবং আত্মার

প্রত্যক্ষসাধন (এবং) দ্রব্য গন্ধাদি গুণ হইতে ভিন্ন (এবং) গুণের আধার, অর্থাৎ দ্রব্যের গন্ধাদিগুণভিন্ন এবং গুণাশ্রয়, (এবং) আত্মাগুলি অনিয়তবিষয় অর্থাৎ আত্মার গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়মের অভাব। (অর্থাৎ মহাবিশ্বকথিত পূর্বোক্ত একার্থপ্রতিসন্ধানপ্রযুক্ত আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্ন সিদ্ধিতে এইগুলি আনুষঙ্গিক পদার্থ)। পূর্বোক্তের সিদ্ধিবিষয়ে অর্থাৎ মহাবিশ্ব সাংক্ষাৎ কথিত পূর্বোক্ত একার্থপ্রতিসন্ধানের সিদ্ধিতে অন্তর্গত এই পদার্থগুলি (ইন্দ্রিয়বহুবাদি) সিদ্ধ হয়। (কারণ) সেইগুলি ব্যতীত অর্থাৎ ঐ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান) সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী। ক্রমানুসারে এই বার অধিকরণসিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তচতুষ্টয়ের মধ্যে এইটিই চূর্বোধ। সূত্রাং ইহার ব্যাখ্যাও একরূপ হয় নাই। অনুবাদে তাৎপর্যাটীকাকারের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—ভাষ্যে “বস্তুার্থসিদ্ধৌ” এই স্থলে বিষয়সমুদায়, নিমিত্ত-সমুদায় নহে। শেষে তাৎপর্যার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যে পদার্থটি জানিতে হইলে তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি তাহার অন্তর্ভাবেই জানিতে হয়, সাংক্ষাৎ উল্লিখ্যমান সেই পদার্থ তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলির আধার; কারণ, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ঐ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি সিদ্ধ হয়; সেই পদার্থ পক্ষই (সাধ্যই) হউক আর হেতুই হউক, সেইরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত হইবে। যেমন “জগৎ চেতনকর্তৃকং উৎপত্তিমহ্যং বস্তুবৎ” এইরূপে জগতের চেতনকর্তৃকত্ব সাধন করিলে সর্বজ্ঞত্ব-সর্বশক্তিমহাবিশিষ্ট-চেতনকর্তৃকত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, সর্বজ্ঞত্বাদি ব্যতীত জগতের চেতনকর্তৃকত্ব সম্ভব হয় না। এ স্থলে চেতনকর্তৃকত্বরূপ সাধ্যটি তাহার সিদ্ধির অন্তর্গত আনুষঙ্গিক সর্বজ্ঞত্বাদি পদার্থবৃত্ত হইয়াই সিদ্ধ হয়। সূত্রাং সর্বজ্ঞত্বাদি সহিত চেতনকর্তৃকত্বই ঐ স্থলে অধিকরণসিদ্ধান্ত, এবং আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নসাধনে মহাবিশ্ব গোতম (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্রে) “আমি যাহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছিলাম, তাহাকে ভগিন্দের দ্বারা স্পর্শ করিতেছি” এই প্রকার একার্থপ্রতিসন্ধানকে হেতু বলিয়াছেন। ঐ হেতুটি সিদ্ধ হইতে গেলে ভাষ্যোক্ত ইন্দ্রিয়-বহুত্ব প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পদার্থবর্গসহিত হইয়াই সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ ইন্দ্রিয়বহুত্বাদি ব্যতীত ঐরূপ একার্থপ্রতিসন্ধান সিদ্ধ হয় না (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে ঐ প্রতিসন্ধানরূপ হেতু ইন্দ্রিয়বহুত্বাদিসহিত হইয়াই সিদ্ধ হইয়া ঐরূপে “অধিকরণসিদ্ধান্ত” হইয়াছে। এই জন্তই উদ্যোতকর লিখিয়াছেন—“বাক্যার্থসিদ্ধৌ তদনুষঙ্গী যো যঃ সোহধিকরণ-সিদ্ধান্তঃ।” ইহাই বাচস্পতিমিশ্রের ব্যাখ্যা। উদয়নের “আত্মতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থের দীপ্তিতে রঘুনাথ শিরোমণি বার্তিকের পাঠ ও তাৎপর্যাটীকাকারের কথার উল্লেখ করিয়া অন্যরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। সেই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া রঘুনাথের পরবর্তী বিশ্বনাথ কলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না, সেই পূর্বোক্ত পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ নবীন রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে আনুষঙ্গিক পদার্থগুলিই

অধিকরণসিদ্ধান্ত। কারণ, তাহাই প্রকৃত পদার্থসিদ্ধির আশ্রয়। উদ্যোতকরের কথাৰ দ্বাৰাও সৰলভাবে ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাব্যাকারের কথাৰ দ্বাৰা ইহা সৰলভাবে বুঝা যায় না। তাঁহাৰ মতে প্রস্তুত পদার্থটিই আত্মবলিক পদার্থের আশ্রয় বলিয়া তাহাই “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। স্বত্বেও ‘বৎ’ শব্দের দ্বাৰা প্রস্তুতপদার্থই মহাবিৰ বুজিছে। কারণ, পরে ‘অন্ত’ শব্দ আছে। এখন কথা এই যে, প্রস্তুত পদার্থই হউক আর আত্মবলিক পদার্থই হউক, তাহা “সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” বা “প্রতিতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত” হইলে তাহাকে পৃথক্ “অধিকরণসিদ্ধান্ত” বলা নিশ্চয়োজন। ইন্দ্রিয়নানাদি সৰ্বতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত এবং প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তই আছে; তাহাকে আবার “অধিকরণসিদ্ধান্ত” বলিবার প্রয়োজন কি? ইহা সকলকেই ভাবিতে হইবে। বাচস্পতির ব্যাখ্যায় এ ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহাৰ মতে কেবল ইন্দ্রিয়নানাদি প্রভৃতি বা কেবল পূৰ্বোক্ত স্বত্বকায়ীৰ প্রতিসদ্বানৰূপ হেতুই “অধিকরণ-সিদ্ধান্ত” নহে। ইন্দ্রিয়নানাদি আত্মবলিক পদার্থ সহিত পূৰ্বোক্ত প্রতিসদ্বানৰূপ প্রস্তুত হেতুই “অধিকরণসিদ্ধান্ত”। তিনি স্বত্বকায়ী ও ভাব্যাকারের এইরূপ তাৎপৰ্য্য বৰ্ণন করিয়াছেন। “পূৰ্বোক্তসিদ্ধান্তেতৎপৰ্য্যঃ” এই ভাব্যসম্বন্ধের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—“পূৰ্বোক্তপৰ্য্যঃ যঃ সাক্ষাদধিকৃতঃ তত্ত্ব সিদ্ধাবস্তগত ইতি ভাব্যপৰ্য্যঃ”। ফলতঃ বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যায় অধিকরণ-সিদ্ধান্তটি সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত ও প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ, ইন্দ্রিয়নানাদি প্রভৃতি অথবা পূৰ্বোক্ত প্রতিসদ্বান পৃথগ্ভাবে শাস্ত্রে কথিত হইলেও পূৰ্বোক্ত প্রকারে প্রমাণসিদ্ধ ইন্দ্রিয়নানাদি সহিত প্রতিসদ্বান কোন শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। এই জন্য ঐরূপ সিদ্ধান্তকে “অধিকরণসিদ্ধান্ত” নামে তৃতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। মনে হয়, সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত লক্ষণস্বত্বে মহাবিৰ এই জন্যই “তত্ত্বৈবধিকৃতঃ” এই কথাটি বলিয়াছেন। কেবল সৰ্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ পদার্থকেই সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত বলিলে সৰ্বসম্মত অধিকরণসিদ্ধান্তও সৰ্বতত্ত্ব-সিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িত। বস্তুতঃ ব্যাখ্যাত অধিকরণসিদ্ধান্তটি সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতে বিশিষ্ট। সুতরাং মহাবিৰ তাহাকে সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্ করিয়াই বলিয়াছেন।

সূত্র। অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণ-
মভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥৩১॥

অনুবাদ। অপরীক্ষিত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বাৰা অনবধারিত পদার্থের স্বীকার করিয়া (যে স্থলে) তাহার বিশেষ পরীক্ষা হয়, (সেই স্থলে সেই স্বীকৃত পদার্থটি) “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”।

ভাষ্য। যত্নে কিঞ্চিদর্শজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে—অস্ত্র দ্রব্যং শব্দঃ, স তু নিত্যোহখ্যানিত্য ইতি,—দ্রবস্ত সতো নিত্যতাহনিত্যতা বা তদ্বিশেষঃ পরীক্ষ্যতে সোহভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ, স্ববুদ্ধ্যতিশয়চিন্ত্যাপয়িষয়া পরবুদ্ধাবজ্ঞানাক প্রবর্তত ইতি।

অনুবাদ। যে স্থলে অপরীক্ষিত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা অনবধারিত কোনও পদার্থ-সামান্য স্বীকৃত হয়, (উদাহরণের উল্লেখের সহিত সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন) হউক শব্দ দ্রব্য, কিন্তু তাহা নিত্য অথবা অনিত্য? (এইরূপে) দ্রব্য হইলে তাহার অর্থাৎ দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত শব্দের নিত্যতা অথবা অনিত্যতারূপ “তদ্বিশেষ” (শব্দগত বিশেষ ধর্ম) পরীক্ষিত হয়, তাহা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত, (ইহা) নিজবুদ্ধির প্রকর্ষ-খ্যাপনেচ্ছা-প্রযুক্ত এবং পরবুদ্ধির অবজ্ঞা প্রযুক্ত প্রবৃত্ত হয়।

টিপ্পনী। “অভ্যুপগম্যতে পরীক্ষাং বিনাপি স্বীকৃত্যতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বিনা বিচারে স্বীকৃত পরসিদ্ধান্তই “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ভাষ্যকার নিজের মতামুসারে উদাহরণ-প্রদর্শনের সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত উদাহরণের মূল কথা এই যে, মীমাংসক সম্প্রদায়-বিশেষের মতে শব্দ দ্রব্যপদার্থ এবং নিত্য। নৈয়ায়িক মতে শব্দ গুণ-পদার্থ এবং অনিত্য। মীমাংসক শব্দের দ্রব্যত্বসাধন করিতেছেন—নৈয়ায়িক তাহার খণ্ডন করিতে গিয়া মধ্যে বলিলেন, —“আচ্ছা, হউক শব্দ দ্রব্যপদার্থ, কিন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, তাহা বিচার কর।” এইরূপে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়া তাহার বিশেষধর্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের পরীক্ষা করিয়া নিত্যত্ব খণ্ডন করিলেন। প্রকারান্তরে মীমাংসক পরাস্ত হইলেন। ঐ স্থলে শব্দের দ্রব্যত্ব মীমাংসকের “প্রতিত্ত্বসিদ্ধান্ত” হইলেও তৎকালে নৈয়ায়িকের পক্ষে উহা “অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত”। নৈয়ায়িক দেখিলেন, মীমাংসক শব্দকে দ্রব্য ও নিত্য পদার্থ বলিতেছেন; তাঁহার সম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়াও শব্দের নিত্যত্ব খণ্ডন করিতে পারি। শব্দনিত্যতাই মীমাংসকের সূত্র প্রধান সিদ্ধান্ত, সুতরাং স্ববুদ্ধির প্রকর্ষখ্যাপন ও প্রতিবাদীর বুদ্ধির অবজ্ঞার জন্ত তাহাই করিব। তাই বিনা বিচারেই মীমাংসকসম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইলেন। বিচারস্থলে তাঁর প্রতিভাসম্পন্ন মনোবী নিজ বুদ্ধির প্রকর্ষখ্যাপনাদির ইচ্ছায় অনেক স্থলেই এইরূপ করিয়া থাকেন এবং এই ভাবেই “অভ্যুপগমবাদ,” “প্রোচিবাদ” প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

স্মার-বার্তিককার প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, স্থলে “অপরীক্ষিত” বলিতে যাহা ঋষিসূত্রে সাক্ষাৎ উপনিবদ্ধ হয় নাই, অথচ তাহার বিশেষ ধর্মের এমন ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে, যদ্বারা বুঝা যায়, উহা ঋষির স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। যেমন মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্মারসূত্রে সাক্ষাৎ উপবর্ণিত না হইলেও স্মারসূত্রে মনের যে বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা আছে, তদ্বারা বুঝা যায়, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্মারসূত্রকার মহর্ষির স্বীকৃত। সুতরাং মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষি গোতমের “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ফল কথা, যেটি স্থলে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, কিন্তু তাহার বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা তাহাকে সূত্রকারের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায়, উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে তাহারই নাম “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” এবং ঐরূপই সূত্রার্থ। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পক্ষে বলিতে পারি যে,

স্বত্র পাঠ করিয়া ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সহজবুদ্ধিগম্য হয়। “অপরীক্ষিত” শব্দের দ্বারা বাহা পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা বুঝিয়া লওয়া হয় নাই, এই অর্থই সহজে বুঝা যায়। বাহা ঋষিসূত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, এই অর্থ উহার দ্বারা সহজে বুঝা যায় না। উহা বুঝিতে কষ্টকরনা করিতে হয়। পরন্তু বিশেষ পরীক্ষাপ্রযুক্ত অপরীক্ষিতের স্বীকার, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে “তদ্বিশেষপরীক্ষাদপরীক্ষিতাত্যুপগমঃ” এইরূপ ভাষাই মহর্ষি প্রয়োগ করিতেন। ফল কথা, ঋষি-সূত্রের সহজবোধ্য অর্থ পরিত্যাগ করা ভাষ্যকার সম্ভব মনে করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মনের ইন্দ্রিয়ের ভাষ্যকারের মতে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত নহে। ভাষ্যকার প্রত্যকলক্ষণ-সূত্রভাষ্যে মনের ইন্দ্রিয়ের সন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, মনের ইন্দ্রিয়ের তাহার মতে “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত”। মনু স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং “ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চান্ধি” এই ভগবদ্গীতাবাক্যে মনের ইন্দ্রিয়ের স্পষ্ট প্রকৃতিত থাকার উহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ বলিয়াই ভাষ্যকার মনে করেন। “বেদান্ত-পরিভাষা”-কারের পক্ষ হইয়া ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিলে ভাষ্যকার তাহা নিতান্ত অপব্যাখ্যা মনে করেন। বস্তুতঃ মন্বাদিশাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়বাদের স্পষ্ট আছে। তবে ঋষিসূত্রে ইন্দ্রিয় হইতে মনের যে পৃথক উল্লেখ আছে, ভাষ্যকার তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছেন। ঋষিসূত্রে বহিরিন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যেই ইন্দ্রিয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাহার দ্বারা মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা স্বর্গা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ” ইত্যাদি উপনিষদেও বহিরিন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যেই ইন্দ্রিয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বহিরিন্দ্রিয়বর্গ হইতে অন্তরীন্দ্রিয় মনের বিশেষ-প্রদর্শনের জন্তই উপনিষদে ঐরূপে বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক উল্লেখ হইয়াছে। মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহা ঐ উপনিষদবাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। তাহা হইলে মনের ইন্দ্রিয়-প্রতিপাদক মন্বাদি শাস্ত্রবাক্যের অপ্ৰামাণ্য হইয়া পড়ে। মনের ইন্দ্রিয়ের “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” হইলে তাহা কোনমতে “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” হইতেও পারে না। কারণ, সর্বসম্মত পদার্থে কোন পক্ষেরই বিবাদ হয় না; এবং ভাষ্যকারের মতে যখন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিলিপ্য-সিদ্ধান্তই বিচারস্থলে অন্তের “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” হইবে, তখন তাহাতে সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণও অবশ্য থাকিবে।

ভাষ্যকারের মতে স্বীকৃত পদার্থই সিদ্ধান্ত। কারণ, তিনি পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন—
 “অনুজ্ঞানানোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ।” সূত্রাত্মক তাহার মতে সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ-সূত্রেরও সেইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণসূত্রের মধ্যেও প্রথম তিনটিতে পদার্থেরই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে। উদ্যোতকর প্রভৃতি পদার্থের অভ্যুপগমকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। উদয়না-চার্য্য “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকায় ইহার নীমাংসা করিয়াছেন যে, “অর্থাত্ম্যুপগমযোগ্যপ্রধানভাবস্ত বিবক্ষ্যাত্মকঃ।” অর্থাৎ কেহ পদার্থের প্রাধান্য, কেহ তাহার অভ্যুপগমের প্রাধান্য বিবক্ষা করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন, ফলে উহা একই কথা। উহাতে কোন বিরোধ হয় নাই। সিদ্ধান্তের ভেদ থাকিলে অথবা সর্ববিষয়ে সকলের ঐকমত্য সম্ভব হইলে বিচারপ্রবৃত্তি অসম্ভব, এ কথা ভাষ্যকার পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছেন।

ভাষা । অথাবয়বাঃ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ সিকান্তনিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) অবয়বগুলি (নিরূপণ করিয়াছেন) ।

সূত্র । প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়-নিগমনাত্তবয়বাঃ ॥৩২॥

অনুবাদ । (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়, (৫) নিগমন, ইহারা অর্থাৎ এই পাঁচ নামে পাঁচটি বাক্য “অবয়ব” ।

বিস্তৃতি । অল্পমান প্রমাণ সামান্যতঃ দ্বিবিধ । স্বার্থ এবং পরার্থ । নিজের তত্ত্ব-নিশ্চয়ের জন্ত যে অল্পমানকে আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে স্বার্থাল্পমান । যেখানে নিজের এক পক্ষের নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রতিবাদী তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ প্রকাশ করিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় জন্মাইয়াছে, সেখানে মধ্যস্থদিগের নির্ণয়ের জন্ত অথবা প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার জন্ত যে অল্পমান-প্রমাণ আশ্রয় করা হয়, তাহাকে পরার্থাল্পমান বলে । এই “পরার্থ” শব্দের দুই প্রকার অর্থের ব্যাখ্যা আছে । “পরার্থ” বলিলে বুঝা যায়, পরের জন্ত । পরের জন্ত অর্থাৎ মধ্যস্থের জন্ত, মধ্যস্থের নির্ণয়ের জন্ত । অথবা (২) পরের জন্য কি না প্রতিবাদীর জন্ত, অর্থাৎ প্রতিবাদীর পরাজয়ের জন্ত । কিন্তু যে বিচারে মধ্যস্থ নাই, কেবল তত্ত্বনির্ণয় উদ্দেশ্য করিয়া গুরু-শিষ্য প্রভৃতি যে বিচার করেন, সেই “বাদ”বিচারে প্রতিবাদীর পরাজয় উদ্দেশ্য না থাকায় এবং মধ্যস্থ না থাকায় সেই স্থলীয় অল্পমান পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যাখ্যাহুসারে “পরার্থ” হইতে পারে না । যদি বলা যায় যে, যে অল্পমান প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থকে বুঝাইবার জন্ত, তাহাই “পরার্থাল্পমান”, তাহা হইলে “বাদ”-বিচারের পরার্থাল্পমানও ঐ কথার দ্বারা পাওয়া যায় । “বাদ”বিচারে মধ্যস্থ না থাকিলেও প্রতিবাদী অবশ্য থাকিবে । প্রতিবাদী না থাকিলে কোন বিচারই হয় না । তবে “বাদ”বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষা না থাকায় মধ্যস্থের আবশ্যকতা নাই ।

কিন্তু যে বিচারে বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষু, যে কোনরূপে নিজের বিপক্ষকে পরাজিত করার জন্ত যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেখানে বিচার্য বিষয়ে বিজ্ঞতম নিরপেক্ষ এবং উভয় পক্ষের সম্মানিত মধ্যস্থ থাকা আবশ্যিক । সভাপতি সেই মধ্যস্থ নিয়োগ করিবেন । উপযুক্ত মধ্যস্থ না থাকিলে এবং কোন বিশিষ্ট নিয়মের অধীন না থাকিয়া বিচার করিলে, সে বিচারে অনেক প্রকার গোলাবোঁগে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এবং ঘটাই থাকে । এ জন্ত মহর্ষি গোতম সেই বিচারের একটি বিশিষ্ট নিয়মবন্ধনের জন্ত “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য-বিশেষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । যথাক্রমে ঐ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের সমষ্টিকে পরবর্তী ছায়াচাষণগণ “ছায়” নামে উল্লেখ করিয়াছেন । “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য ঐ “ছায়” নামক বাক্যসমষ্টির পাঁচটি অংশ, তাই উহাদিগকে “অবয়ব” বলা হইয়াছে (প্রথম সূত্র-ভাষ্যে অবয়ব-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । ফলকথা, বিচারে নিজের পক্ষটি বুঝাইতে এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ

উপস্থিত করিতে যে সকল বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই বাক্যগুলিই “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে বাক্যের দ্বারা পরের হেতুর দোষের উল্লেখ করা হইবে, অথবা প্রতিবাদীর উল্লিখিত দোষের নিরাকরণ করা হইবে, সে সকল বাক্য “অবয়ব” নামে কথিত হয় নাই। মহাবির পঞ্চাবয়বের লক্ষণগুলি দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। মহাবি এই স্বত্বের দ্বারা তাহার “অবয়ব” পদার্থের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ নামগুলির উল্লেখ করিলেও এই স্বত্বের দ্বারা “অবয়বের” সামান্য লক্ষণেরও স্মৃতি করিয়াছেন। কারণ, পদার্থের সামান্য লক্ষণ ব্যতীত তাহার বিভাগ হইতে পারে না। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ এই “অবয়ব” পদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যায় প্রচুর বুদ্ধিমত্তা ও দাক্ষিণ্যতার পরিচয় দিলেও মহাবির এই স্বত্বের দ্বারা বুঝা যায় যে, “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পঞ্চ বাক্যের অন্ততমত্বই “অবয়বের” সামান্য লক্ষণ এবং যথাক্রমে উচ্চারিত “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পঞ্চবাক্যের সমূহত্বই বাক্যরূপ স্বত্বের সামান্য লক্ষণ। মহাবি-স্বত্বে ইহাই যেন স্মৃতিত হইয়াছে^১। মূলকথা, পরার্থানুমানকে যেমন “জ্ঞায়” বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ পরার্থানুমানে “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি যে পাঁচটি বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয়, ঐ পঞ্চ বাক্যের সমষ্টিকেও “ন্যায়” বলা হইয়াছে। যথাক্রমে উচ্চারিত ঐ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের সমষ্টিতেই এই “ন্যায়” শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। উহাদিগের এক একটি বাক্য “ন্যায়” নামে ব্যবহৃত হয় না। প্রতিজ্ঞাদি এক একটি বাক্য ন্যায়ের “অবয়ব” নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের যে ভাবে প্রয়োগ হয়, তাহার একটা উদাহরণ দেখাইতেছি। নৈয়ায়িক শব্দকে অনিত্য বলেন, নীমাংসক শব্দকে নিত্য বলেন। উভয় পক্ষ জিগীবাবশতঃ স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন করিয়া বিচার করিবেন। সভার আহ্বান হইল, উপযুক্ত মধ্যস্থের নিয়োগ হইল। বাদী নৈয়ায়িক, নীমাংসক তাহার প্রতিবাদী। মধ্যস্থ প্রথমে বাদী নৈয়ায়িককে জিজ্ঞাসা করিবেন,—“তোমার সাধনীয় কি?” অর্থাৎ তুমি কি প্রতিপন্ন করিতে চাও। তখন বাদী নৈয়ায়িক প্রথমেই বলিবেন—(১) “শব্দ অনিত্য”। এখানে “শব্দ অনিত্য”

১। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য বিলিত হইয়া একবাক্যতা লাভ করতঃ একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে। ঐ বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদক মহাবাক্যকেই “জ্ঞায়” বলে। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য প্রত্যেকে ঐ মহাবাক্যের অঙ্গ বা অবয়ব। এই প্রাচীন মত উদ্যোতকরের কথাতে পাওয়া যায়। তত্ত্বচিন্তামণিকার পক্ষে এই প্রাচীন মতকেই অগ্রসর করিয়া “জ্ঞায়” ও “অবয়বের” লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণান রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষের “জ্ঞায়” ও “অবয়বের” লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে পক্ষের অবলম্বিত চিরপ্রচলিত মতের প্রতিবাদই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“উচিতানুপূর্বকপ্রতিজ্ঞাদিশব্দকসমূহাভং জ্ঞায়ত্বং”। অর্থাৎ যথাক্রমে “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি “নিয়মন” পর্যন্ত বাক্যের সমষ্টিকেই “ন্যায়”। উহারা বিলিত হইয়া কোন একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না, ইহা রঘুনাথ বুঝাইয়াছেন। রঘুনাথ “অবয়বের” প্রথম লক্ষণ বলিয়াছেন—“ন্যায়ান্তর্গতত্ব সতি প্রতিজ্ঞাভাবাতমত্বং”। অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাবাক্যের অনাত্মনই “অবয়ব”। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উহাই বলিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ প্রভৃতিও মহাবি-স্বত্বের একপ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বাক্যটির নাম "প্রতিজ্ঞা"। ঐ বাক্যটি নৈয়ায়িকের সাধ্যনির্দেশ; সূত্রং উহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাহার পরে মধ্যস্থ পুনর্বার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি কি হেতুর দ্বারা তোমার মত সংস্থাপন করিবে? অর্থাৎ শব্দ যে অনিত্য, ইহার হেতু কি? কোন্ পদার্থ শব্দে অনিত্যত্বের সাধক বা জ্ঞাপক? তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন যে, (২) "উৎপত্তিবর্ধকত্ব জ্ঞাপক"। নৈয়ায়িকের এই বাক্যটির নাম "হেতু" অর্থাৎ "হেতু" নামক দ্বিতীয় অবয়ব। পরে মধ্যস্থ পুনর্বার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, উৎপত্তিবর্ধকত্ব থাকিলেই যে সেখানে অনিত্যত্ব থাকিবে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তিরূপ ধর্ম আছে, তাহারা যে অনিত্যই হইবে, ইহা কিরূপে বুঝিবে? এতদ্বত্তরে তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন,—(৩) "উৎপত্তিবর্ধক ঘটাদি দ্রব্যকে অনিত্য দেখা যায়" অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তিরূপ ধর্ম আছে, সে সকল পদার্থ অনিত্যই হইবে, ইহা উৎপত্তিবর্ধক বহু পদার্থ দেখিয়া নিশ্চয় করা গিয়াছে। নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত তৃতীয় বাক্যের নাম "উদাহরণবাক্য"। পরে মধ্যস্থ বাদীকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আচ্ছা, উৎপত্তিবর্ধক বস্তুমানই অনিত্য, ইহা বুঝিলাম, তাহাতে শব্দ অনিত্য হইবে কেন? এতদ্বত্তরে বাদী নৈয়ায়িক তখন বলিবেন—(৪) "শব্দ সেই প্রকার উৎপত্তিবর্ধক"। অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থ যেমন উৎপত্তিবর্ধক, তদ্রূপ শব্দও তাদৃশ উৎপত্তিবর্ধক। নৈয়ায়িকের এই চতুর্থ বাক্যটির নাম "উপনয়"। তাহার পরে মধ্যস্থ বলিবেন যে, তুমি এ পর্য্যন্ত বাহা বলিলে, তাহা এক কথায় উপসংহার করিয়া বল। তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন—(৫) "সেই উৎপত্তিবর্ধকত্বহেতুক শব্দ অনিত্য"। নৈয়ায়িকের এই পঞ্চম বাক্যটির নাম "নিগমন"। এই প্রণালীতে শেষে নীমাংসকও আত্মপক্ষ স্থাপন করিবেন।

এইরূপ বিচারে মধ্যস্থের সংশয়বশতঃ জিজ্ঞাসা জন্মে। ঐ সংশয় নিরাস করিতে তর্ক আবশ্যক হয়। প্রমাণই তদ্বিনিশ্চয় জন্মায়। প্রমাণের তদ্বিষয়ে সামর্থ্য আছে। তদ্ব নিশ্চয়ই প্রমাণের ফল। পূর্বোক্ত সংশয় প্রভৃতি পাঁচটিকেও কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় অবয়বের মধ্যে গণ্য করিয়া অবয়ব দশটি বলিতেন। কিন্তু "সংশয়", "জিজ্ঞাসা", "তর্ক", "প্রমাণের তদ্বিনিশ্চয়-সামর্থ্য" এবং "তদ্বিনিশ্চয়"—এই পাঁচটি বাক্য নহে, সূত্রং উহার জ্ঞানবাক্যের অবয়ব হইতে পারে না। বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে, এ জন্ত মহর্ষি প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যকেই "অবয়ব" বলিয়াছেন।

ভাষ্য। দশাবয়ববানেকে নৈয়ায়িকা বাক্যে সঞ্চকতে। জিজ্ঞাসা, সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্তিঃ, প্রয়োজনং, সংশয়ব্যাধাস ইতি। তে কস্মান্মোচ্যন্ত ইতি। তত্রাপ্রতীয়মানেহর্থে প্রত্যয়ার্থস্ত প্রবর্তিকা জিজ্ঞাসা। অপ্রতীয়মানমর্থঃ কস্মাজ্জিজ্ঞাসতে? তং তদ্বতো জ্ঞাতং হাস্তামি বা উপাদাস্তে, উপেক্ষিষ্যে বেতি। তা এতা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়স্তত্ত্বজ্ঞান-

স্বার্থসুদর্শনময়ং জিজ্ঞাসতে । সা খল্বিয়মসাধনমর্থশ্চেতি । জিজ্ঞাসাধিষ্ঠানং সংশয়ঃ চ ব্যাহতধর্মোপসংঘাতাৎ তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্নঃ । ব্যাহতয়োর্হি ধর্ময়োরন্যতরং তত্ত্বং ভবিতুমর্হতীতি । স পৃথগুপদির্কোহপ্যসাধনমর্থশ্চেতি । প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমেয়াধিগম্যার্থানি, সা শক্যাপ্রাপ্তির্ন সাধকস্য বাক্যস্য ভাগেন যুজাতে প্রতিজ্ঞাদিবদिति । প্রয়োজনং তদ্বাবধারণমর্থসাধকস্য বাক্যস্য ফলং নৈকদেশ ইতি । সংশয়ব্যাধাসঃ প্রতিপক্ষোপবর্জনং, তৎ প্রতিষেধে তদ্বাভ্যনুজ্ঞানার্থং, ন ত্বয়ং সাধকবাক্যৈকদেশ ইতি । প্রকরণে তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ সমর্থ্য অবধারণীয়ার্থোপকারাৎ । তত্ত্বসাধকভাবাতু প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সাধকবাক্যস্য ভাগা একদেশা অবয়বা ইতি ।

অনুবাদ । অত্র নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় বাক্যে (শ্রায় নামক বাক্যে) দশটি অবয়ব বলেন । (তন্মধ্যে গোটমোক্ত পাঁচটি হইতে অতিরিক্ত পাঁচটি ভাষ্যকার বলিতেছেন) (১) জিজ্ঞাসা, (২) সংশয়, (৩) শক্যাপ্রাপ্তি, (৪) প্রয়োজন, (৫) সংশয়ব্যাধাস । (প্রশ্ন) সেগুলি অর্থাৎ অত্র নৈয়ায়িক-সম্মত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটি অবয়ব (মহাবি গোটম) কেন বলেন নাই ?—(জিজ্ঞাসা প্রভৃতির ব্যাখ্যান পূর্বক ইহার কারণ প্রকাশ করিতেছেন) তন্মধ্যে (জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটির মধ্যে) অপ্রতীয়মান (সামান্যতঃ জ্ঞায়মান, কিন্তু বিশেষতঃ অজ্ঞায়মান) পদার্থ বিষয়ে প্রত্যয়ার্থের অর্থাৎ ঐ পদার্থের বিশেষ তদ্বাবধারণের প্রয়োজন হানাদিবুদ্ধির প্রবর্তিকা (উৎপাদিকা) জিজ্ঞাসা । (প্রশ্নোত্তরমুখে এই কথার বিশদার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন) অজ্ঞায়মান পদার্থকে কেন জিজ্ঞাসা করে ? (উত্তর) যথার্থরূপে জ্ঞাত সেই পদার্থকে—অর্থাৎ ঐ অজ্ঞায়মান পদার্থকে বিশেষরূপে জানিয়া ত্যাগ করিব অথবা গ্রহণ করিব অথবা উপেক্ষা করিব, এই জ্ঞাত । সেই এই হানবুদ্ধি, গ্রহণবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগাদি করে, সেই বুদ্ধি) তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নিশ্চয়ের প্রয়োজন । সেই নিমিত্ত জ্ঞাতা ব্যক্তি (বিশেষতঃ অজ্ঞায়মান পদার্থকে) জিজ্ঞাসা করে । সেই এই “জিজ্ঞাসা” অর্থের সাধক (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের শ্রায় পরপ্রতিপাদক) নহে । (অর্থাৎ এই জ্ঞাতই জিজ্ঞাসা শ্রায়েব অবয়ব হইতে পারে না ।) জিজ্ঞাসার মূল সংশয়ও বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন (নিকটবর্তী) । যেহেতু, বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের একটিই তত্ত্ব হইতে পারে । সেই “সংশয়” (মহাবি কর্তৃক) পৃথক্

উপদিষ্ট হইলেও অর্থের সাধক (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা পরপ্রতিপাদক) নহে ।
(অর্থাৎ এই জন্মই সংশয় দ্বারায় অবয়ব হইতে পারে না) ।

প্রমাণগুলি প্রমাতার প্রমেয়-বোধার্থ । সেই “শকাপ্রাপ্তি” অর্থাৎ প্রমাতা ও প্রমাণগুলির প্রমেয়-বোধ-জনন-শক্তি প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা সাধক অর্থাৎ পর-প্রতিপাদক বাক্যের অংশের সহিত যুক্ত হয় না (অর্থাৎ এই জন্মই “শকাপ্রাপ্তি” দ্বারায় অবয়ব হইতে পারে না) । তদ্ব-নিশ্চয়রূপ প্রয়োজন অর্থ-সাধক বাক্যের (পরপ্রতিপাদক দ্বারা-বাক্যের) ফল, একদেশ নহে । (অর্থাৎ এই জন্মই প্রয়োজন দ্বারায় অবয়ব হইতে পারে না) । “সংশয়ব্যাধাস” বলিতে প্রতিপক্ষোপবর্জন, অর্থাৎ প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের কথন, প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের নিষেধ হইলে, তাহা (প্রতিপক্ষোপবর্জন) তদ্বজ্ঞানের অর্থাৎ প্রমাণের অভ্যনুজ্ঞার নিমিত্ত । ইহা (সংশয়ব্যাধাস) কিন্তু সাধকবাক্যের (পরপ্রতিপাদক দ্বারা-বাক্যের) একদেশ (অংশ) নহে । (অর্থাৎ এই জন্মই “সংশয়ব্যাধাস” দ্বারায় অবয়ব হইতে পারে না) । প্রকরণে অর্থাৎ বিচার-প্রবৃত্তিতে কিন্তু অবধারণীয় পদার্থের উপকারিত্ব প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি (পূর্বোক্ত পাঁচটি) সমর্থ অর্থাৎ আবশ্যিক । পদার্থ-সাধক অর্থাৎ পরপ্রতিপাদক প্রযুক্ত কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি (গৌতমোক্ত পাঁচটি) সাধক-বাক্যের অর্থাৎ দ্বারা-বাক্যের ভাগ, একদেশ, অবয়ব ।

টিপ্পনী । উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, অবয়বের সংখ্যাবিষয়ে অন্তান্ত মতগুলি ত্রাস্ত, ইহা সূচনা করিবার জন্মই অর্থাৎ অবয়বের সংখ্যা-নিয়মের জন্মই দ্বারাচার্য্য মহর্ষি গৌতম এই বিভাগ-সূত্রটি বলিয়াছেন । ভাষ্যকার কিন্তু ইহা কিছু বলেন নাই । তিনি কেবল দশাবয়ববাদেই এখানে উল্লেখ করিয়া তাহার অল্পপপত্তি দেখাইয়াছেন ।

ভাষ্যকারোক্ত দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রকৃত পরিচয় এখন নিতান্ত দুর্বল হইয়াছে । উদ্যোতক প্রভৃতি প্রাচীনগণ তাহাদিগের বিশেষ বার্তা কিছু বলিয়া যান নাই । “তর্কিকরক্ষা”-কার বরদরাজ এবং তাহার টীকাকার মণিনাথ এবং “জ্ঞানসার” গ্রন্থকার প্রভৃতি দশাবয়ববাদী-দিগকে প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু ঐ প্রাচীন নৈয়ায়িক কাহারো, ইহা কেহ বলেন নাই । ষষ্ঠ-পূর্ববর্তী “ভাস” কবির “প্রতিমা” নাটকে মেঘাতিথির জ্ঞানশাস্ত্রের সংবাদ পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না । “চরকসংহিতা”র গৌতমের উক্ত ও অমুক্ত জ্ঞান অনেক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায় । কিন্তু দশাবয়ববাদ তাহাতেও নাই ।

অবশ্য কেহ কল্পনা করিতে পারেন যে, মহর্ষি গৌতমের পূর্ববর্তী দ্বারাচার্য্যগণ অথবা তন্মধ্যে কোন দ্বারাচার্য্য “দশাবয়ববাদী” ছিলেন । মহর্ষি গৌতম ঐ মতের অসঙ্গতি বুঝিয়া “পঞ্চাবয়ব-

জ্ঞানবিদ্যা"র প্রবর্তন করিয়াছেন। তখন হইতে গৌতমের বিস্তৃত ও সুপ্রণালীবদ্ধ সূত্রগুলিই জ্ঞানবিদ্যার মূলগ্রন্থরূপে প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, সর্ববিদ্যার প্রদীপ "জ্ঞানবিদ্যা" অতি প্রাচীন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিদ্যার গণনায় শ্রুতি ও বলিয়াছেন,—“জ্ঞানো মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রানি”। ছান্দোগ্যোপনিষদে “বাকো বাক্য” অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বৃহদারণ্যকে “সূত্র” গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অহুমান করেন যে, বৈদিক যুগের ঐ সকল সূত্রই সংকলিত ও পরিবর্তিত হইয়া পরে পাণিনি-সূত্র ও গৃহ্যদি-সূত্র এবং জ্ঞানাদি দর্শনসূত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। সে বাহা হউক, এখন প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি গৌতমের পূর্বে জ্ঞানবিদ্যার সম্প্রদায়-প্রবর্তক কোন আচার্য থাকিলে, মহর্ষি গৌতম অবশ্যই তাঁহার নামাদির উল্লেখ করিতেন। বেদান্তসূত্র প্রভৃতির জ্ঞান জ্ঞানসূত্রে বিভিন্নমতবাদী কোন আচার্যের নামাদির উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাতে বুঝা যায়, মহর্ষি গৌতমই সর্বপ্রথম সূত্রসমূহের দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জ্ঞান-তত্ত্বসমূহের গ্রন্থন করেন। তাঁহার পূর্বে হইতে জ্ঞানবিদ্যা থাকিলেও, তিনিই জ্ঞানবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, দর্শনকার ঋষি—ইহাই চির-প্রচলিত সিদ্ধান্ত আছে। তাঁহার পূর্বে বা সমকালে দশাবয়ববাদী জ্ঞানচার্য্য কেহ ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যদি কল্পনার আশ্রয়েই একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অল্পরূপ কল্পনাও সম্ভব কি না, তাহাও চিন্তা করা উচিত।

আমার মনে হয়, বাৎস্তায়নের পূর্বে বাহার বিকৃত, কলিত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসূত্রের সাহায্যে এবং কল্পনার আশ্রয়ে জ্ঞানবিদ্যার রচনা করিয়া গৌতমীয় জ্ঞানমতের প্রচার করতঃ কোন মতে সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দশাবয়ববাদের উদ্ভাবক। ঐ প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সর্বাংশে প্রকৃত গৌতম মত জানিতেন না। অনেক নূতন সূত্র ও নূতন মতের কল্পনা করিয়া তাহা গৌতম মত বলিয়াই প্রচার করিতেন। তাঁহারাই গৌতমীয় পঞ্চাবয়বসিদ্ধান্তে লাস্ত ছিলেন, তাই প্রকৃত গৌতম-মতপ্রতিষ্ঠাকামী বাৎস্তায়ন অবয়ব বিষয়ে এখানে তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। অবয়ব বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইলে, উদ্যোতকরের জ্ঞান তিনি এখানে মীমাংসক মতেরও উল্লেখ করিতেন। ফলতঃ বাৎস্তায়ন এখানে অল্প কোন মতের উল্লেখ না করিয়া, কেবল অপ্রসিদ্ধ দশাবয়বমতের উল্লেখপূর্বক তাহার অল্পপপত্তি প্রদর্শন কেন করিয়াছেন? ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অবয়ব-সংখ্যাবিষয়ে অজ্ঞান মতের জ্ঞান দশাবয়বমতটি প্রসিদ্ধ হইলে, অজ্ঞান প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখা বাইত। প্রাচীন ত্রীধরচার্য্যও বৈশেষিক গ্রন্থ “জ্ঞান-কন্দলী”তে প্রশস্তপাদের পঞ্চাবয়বব্যাপ্যার বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াও দশাবয়বমতের উল্লেখ করেন নাই। কারণ, উহা কোন প্রবল ও প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের মত নহে। অপ্রসিদ্ধ এবং দুর্বল মত হইলেও প্রকৃত গৌতম-মত-প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উহার উল্লেখপূর্বক অল্পপপত্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনে হয়, “তর্কিকরক্ষা”-কার বরদরাজ প্রভৃতিও পরে এইরূপ কল্পনার বলেই দশাবয়ববাদীদিগকে প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাৎস্তায়ন জ্ঞানসূত্রের উদ্ধার পূর্বক অপূর্ণ ভাষ্য রচনা করিলে, ঐ প্রাচীন

পরবর্তী ত্ৰায়চাৰ্য্যগণ গৌতম মুক্তিবিষয়ে বাৎস্তায়নেরই ব্যাখ্যার অনুসরণ করতঃ তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বাৎস্তায়নের পূৰ্বে গৌতম মুক্তি-বিষয়ে পূৰ্বোক্ত মত বিশেষ প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, বাৎস্তায়ন মোক্ষলক্ষণ-ভাষ্যে বিস্তৃত বিচারপূৰ্বক এই মতের অনুপপত্তি দেখাইতে যাইতেন না, ইহা মনে হয়। লক্ষণ-প্রকরণে তাহার ঐক্যবাদ-প্রতিবাদ আর কোন স্থানে নাই। মুক্তির লক্ষণবিষয়ে তিনি সেখানে আর কোন মতেরও উল্লেখপূৰ্বক প্রতিবাদ করেন নাই।

সে যাহা হউক, এখন মূল কথা এই যে, বাৎস্তায়নের পূৰ্ব হইতে তাহার বিরুদ্ধ গৌতমমত-ব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ছিলেন, ইহা বুঝিবার প্রচুর কারণ আছে এবং বাৎস্তায়নের পূৰ্ব হইতেই মূল ত্ৰায়সূত্রের অনেকাংশে বিকৃতি ও বিলোপ ঘটিয়াছিল, ইহাও বেশ বুঝা যায়। উদ্যোতকের সূত্র-পরিচয় এবং বাচস্পতি মিশ্রের “ত্ৰায়-সূচীনিবন্ধ” প্রভৃতির প্রয়োজন চিন্তা করিলেও ঐ বুদ্ধি আরও স্পষ্ট হয়। বাৎস্তায়নের পূৰ্ববর্তী গৌতমসম্প্রদায়রক্ষক নৈয়ায়িকদিগের ব্যাখ্যাত মত প্রকৃত গৌতম মত হউক বা না হউক, তাহাদিগের অনেক মত এবং তাহাদিগের সংগৃহীত বা কল্পিত অনেক সূত্র পরস্পরাগত হইয়া বৃত্তিকার বিখনাথ প্রভৃতি কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিখনাথ প্রভৃতি নব্যগণ একেবারে অমূলক নূতন সূত্রের কল্পনা করিতে পারেন না। ফল কথা, বাৎস্তায়নের পূৰ্ববর্তী বা সমকালবর্তী গৌতমসম্প্রদায়রক্ষক প্রাচীন নৈয়ায়িকগণই দশাবয়ববাদের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা সদ্ব্যুমান কি না, তাহা বলিতে পারি না। কল্পনার অন্ধকারে থাকিয়া তাহা ঠিক বলাও যায় না। তবে কল্পনা বা আলোচনা তত্ত্বনিৰ্ণায় সাহায্য করে, ইহা বলিতে পারি।

“প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটির ত্ৰায় “জিজ্ঞাসা” প্রভৃতি পাঁচটিও যখন ত্ৰায়ান্ত, তখন মহাবি অবয়বের মধ্যে কেন তাহাদিগের উল্লেখ করেন নাই? এ প্রশ্নের উত্তর ভাব্যকারকে দিতে হইবে, তাই ভাব্যকার নিজেই সেই প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটির স্বরূপ-বর্ণন পূৰ্বক তাহারা ত্ৰায়ের অবয়ব হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়া গিয়াছেন।

একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে সংশয় ও জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। সান্নিধ্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষতঃ অজ্ঞাত পদার্থে বিশেষ ধর্মের সংশয় হইলে, তাহাতে বিশেষ ধর্মের জিজ্ঞাসা হয়। জিজ্ঞাসার ফলে প্রশ্নের দ্বারা পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তদ্বিষয়ে হানাদি বুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা তাগাদি করে) জন্মে। তাই বলিয়াছেন—“প্রত্যয়ার্হন্ত প্রবর্তিকা”। পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই এখানে “প্রত্যয়” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। হানাদি বুদ্ধিই তাহার “অর্গ” অর্থাৎ প্রয়োজন। “জিজ্ঞাসা” পরস্পরায় ঐ প্রয়োজনের উৎপাদক। জিজ্ঞাসার মূল আবার “সংশয়”। সংশয়ে যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম বিষয় হয়, তাহার একটি তত্ত্ব হইতে পারে, এ জ্ঞাত সংশয় তত্ত্বজ্ঞানের নিকটবর্তী। “শক্যপ্রাপ্তি”র ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন,—“শক্যং প্রমেয়ং তদ্বিন্ প্রাপ্তিঃ শক্ততা প্রশ্নানানাং প্রশ্নাতুশ্চ”। অর্থাৎ প্রশ্নাতা ও প্রশ্নানের প্রমেয় বোধজনন-শক্তিই “শক্যপ্রাপ্তি”। “সংশয়বৃদ্ধাসে”র প্রসিদ্ধ নাম “তর্ক”। “সংশয়ো বৃদ্ধস্ততেহনেন” এইরূপ

ব্যুৎপত্তিতে ঐ কথার দ্বারা তর্ক বুঝা যায়। তর্কই সংশয় দূর করে। ভাষ্যকার ইহাকে বলিয়াছেন,—“প্রতিপক্ষেপবর্ণন”। তাৎপর্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের বর্ণন। যেমন “যদি শব্দ নিত্য হয়, তবে জ্ঞান পদার্থ না হউক?”—এইরূপে অনিত্যত্বের প্রতিপক্ষ নিত্যত্বে হেতুর অভাব বর্ণন করিলে (অর্থাৎ ঐরূপ তর্কের দ্বারা) শব্দের অনিত্যত্বসাধক প্রমাণ সমর্থিত হয়। প্রমাণের দ্বারা শব্দে নিত্যত্বের প্রতিবেদ হইলে, পূর্বোক্ত প্রকার তর্ক শব্দের অনিত্যত্বসাধক প্রমাণকে সমর্থন করিয়া অগ্রস্তুত করে।

ভাষ্যে “তত্ত্বং জ্ঞানতেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ “তত্ত্বজ্ঞান” শব্দের দ্বারা প্রমাণ বুঝিতে হইবে।

দশাবয়ববাদধাওনে ভাষ্যকারের মূল কথা এই যে, জ্ঞানের দ্বারা সাধ্যসাধন করিতে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যের দ্বারা “জিজ্ঞাসা” প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থও নিত্যন্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটিও জ্ঞানের অঙ্গ। কিন্তু উহার যখন বাক্য নহে, পরপ্রতিপাদক নহে, তখন উহার কোন মতেই জ্ঞানের অবয়ব হইতে পারে না। বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে। পরন্তু জিজ্ঞাসা প্রভৃতি স্বরূপতঃই আবশ্যক হয় অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যের দ্বারা উহাদিগের জ্ঞান আবশ্যক হয় না। সুতরাং জিজ্ঞাসাদি-বোধক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ঐ বাক্যগুলিকে অবয়বরূপে কল্পনা করাও নিশ্চয়োজন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য নিজের জ্ঞান দ্বারা পরপ্রতিপাদক হয়; সুতরাং ঐ পাঁচটিই জ্ঞানবাক্যের “ভাগ” অর্থাৎ একদেশ বা অংশ বলিয়া “অবয়ব” নামে অভিহিত হইতে পারে। এ জ্ঞান মর্শ্বি গোতন ঐ পাঁচটিকেই “অবয়ব” বলিয়াছেন। “চিন্তা-মর্শ্বি”কার গবেষণাও “অবয়ব-নিরূপণে”র শেষে সংশয় ও প্রয়োজন প্রভৃতি জ্ঞানের অঙ্গ হইলেও বাক্য নহে বলিয়া অবয়ব নহে, এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, “কণ্টকোদ্ধার” সর্বত্র আবশ্যক হয় না, এ জন্য তাহা বাক্য হইলেও “অবয়ব” নহে। “নাশং হেত্বাভাসঃ” অর্থাৎ এইটি হেত্বাভাস নহে, এইরূপ বাক্যকে নবীন দ্বারাচার্য্যগণ “কণ্টকোদ্ধার” বলিয়াছেন। অন্তান্ত কথা নিগমসূত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য (৩৯ সূত্র)।

ভাষ্য। তেবাস্তু যথাবিভক্তানাং।

সূত্র। সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥৩৩॥

অনুবাদ। যথাবিভক্ত সেই প্রতিজ্ঞাদি পূর্বোক্ত পঞ্চাবয়বের মধ্যে “সাধ্য-নির্দেশ” অর্থাৎ যে ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া কোন ধর্ম্মকে অনুমানের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে বাদী উপস্থিত হইয়াছেন, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট সেই ধর্ম্মমাত্রের বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা।

ভাষ্য। প্রজ্ঞাপনোয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্য পরিগ্রহবচনং প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ। অনিত্যঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। প্রজ্ঞাপনীয় ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্মের অর্থাৎ কোন ধর্মেতে যে ধর্মটিকে অনুমানের দ্বারা বুঝাইতে চায় প্রয়োগ করা হইবে, সেই ধর্মবিশিষ্ট সেই ধর্মের “পরিগ্রহ বচন” অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা যায়, এমন বাক্য, “প্রতিজ্ঞা”। (মহাশি এই অর্থেই বলিয়াছেন) প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশ^১। (উদাহরণ) “শব্দ অনিত্য” অর্থাৎ যেমন শব্দকে অনিত্য বলিয়া বুঝাইতে গেলে “শব্দ অনিত্য” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা হইবে।

বিবৃতি। পঞ্চমবয়সের প্রথম অবয়ব “প্রতিজ্ঞা”। বাদীর বক্তব্য কি? বাদী কি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন? ইহা সর্বাঙ্গে তাহাকে বলিতে হইবে। বাদী যে বাক্যের দ্বারা সর্বাঙ্গে তাহাই বলিবেন, সেই বাক্যটির নাম “প্রতিজ্ঞা”। বাদী তাহার ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যথাসক্তি চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাহা করিতেই হইবে এবং “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি দোষে বাদী নিগৃহীত হইবেন, এই জন্ত বাদীর ঐ বাক্যের নাম “প্রতিজ্ঞা”। বাদী শব্দকে অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উপস্থিত হইলে সেখানে শব্দরূপ ধর্মেতে অনিত্যত্বরূপ ধর্মটিই তাহার প্রজ্ঞাপনীয়। কারণ, তাহা লইয়াই শব্দ-নিত্যতাবাদী নীমাংসকের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত। শব্দরূপ ধর্মী লইয়া তাহারও কোন বিবাদ নাই। শব্দ নামে একটা পদার্থ আছে, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। শব্দের অনিত্যতাবাদী নৈসর্গিক মধ্যস্থের প্রমাণসারে “অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দ” এইরূপ অর্থবোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে, উহা তাহার সাধ্য নির্দেশ হইবে। সুতরাং “শব্দ অনিত্য” এইরূপ বাক্য ঐ স্থলে “প্রতিজ্ঞা”। ঐ বাক্যের দ্বারা মধ্যস্থ বুঝিতে পারিবেন যে, “শব্দ অনিত্য”, ইহাই এই বাদীর সাধ্য, ইনি শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষ সংস্থাপন করিতেছেন। এইরূপ পক্ষতে বহির সংস্থাপনে “পক্ষত বহিমান্” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। মনুষ্যমাত্রেরই বিনশ্বরত্ব সংস্থাপন করিতে “মনুষ্যমাত্র বিনশ্বর” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপনে “আত্মা নিত্য” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। সর্বত্রই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের দ্বারা সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মমাত্রের বোধ জন্মে। অতিরিক্ত আর কোন ধর্মের বোধ হয় না। অতিরিক্ত কোন ধর্মের উল্লেখ করিলে তাহা প্রতিজ্ঞা-বাক্য হইবে না; এই জন্ত “নিগমন-বাক্য” প্রতিজ্ঞা নহে। “নিগমন”-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞার্থভিন্ন অতিরিক্ত অর্থেরও বোধ জন্মে। এইরূপ “স্মার” প্রয়োগ উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু “শব্দ অনিত্য” এইরূপ বাক্য কেহ বলিলেন, সেখানে সেইরূপ বাক্যও “প্রতিজ্ঞা” হইবে না। স্মারের অন্তর্গত পূর্বোক্তরূপ বাক্যই “প্রতিজ্ঞা”।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার সূত্রস্থ “সাধ্য” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“প্রজ্ঞাপনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম”। সূত্রস্থ “নির্দেশ” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“পরিগ্রহবচন”। “পরিগ্রহ” শব্দের অর্থ এখানে

১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই ভাষ্যে প্রতিজ্ঞালক্ষণের ব্যাখ্যার পরে “প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ” এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে বুঝিতে হইবে, ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে মহাশি যে ঐ অর্থেই “সাধ্যনির্দেশ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

বোধক, “বচন” শব্দের অর্থ বাক্য। “পরিগ্রহ-বচন” কি না—বোধক বাক্য। বাহার দ্বারা নির্দেশ করা অর্থাৎ বুঝান হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে হুত্রে “নির্দেশ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সাধ্যের নির্দেশ কি না—“পরিগ্রহ-বচন” অর্থাৎ সাধ্যের বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা। বাহা সিদ্ধ নহে, তাহাকে বাদী সাধন করিবেন, তাহাকে “সাধ্য” বলে। শব্দ সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব ধর্মটি সিদ্ধ নহে; কারণ, প্রতিবাদী মায়াংসক তাহা মানেন না, হুতরাং শব্দে অনিত্যত্ব ধর্মটি “সাধ্য”। নৈয়ায়িক তাহা সাধন করিবেন। শব্দ পূর্বসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অনিত্যত্বরূপে পূর্বসিদ্ধ না থাকায় অনিত্যত্বরূপে শব্দকেও সেখানে “সাধ্য” বলা যায়। মহর্ষি গোতম এই অর্থেই এখানে এবং আরও অনেক হুত্রে “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত ধর্মরূপ সাধ্য অর্থেও মহর্ষি-হুত্রে “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ আছে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। “উদাহরণ-হুত্রে”-ভাষ্যে ভাষ্যকারও “সাধ্য” শব্দের দ্বিবিধ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফল কথা, অমুমের-ধর্ম বা সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মকে প্রাচীনগণ “সাধ্যধর্ম” বলিতেন। এই হুত্রে সেই সাধ্যধর্মী অর্থেই মহর্ষি “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মরূপ যে “সাধ্য”, তাহার “নির্দেশ” অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র তাহাই বুঝা যায় এবং জ্ঞানবাদী তাহা বুঝিয়া থাকেন, সেই বাক্যই “প্রতিজ্ঞা”। “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধনীয় ধর্মকে বুঝিয়া, সাধ্য ধর্মের নির্দেশকে প্রতিজ্ঞা বুঝিলে পূর্বোক্ত স্থলে কেবল “অনিত্যত্ব” এইরূপ বাক্যও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ঐরূপ বাক্য “প্রতিজ্ঞা” হইবে না। তবচিন্তা-মলিকার গল্পে সর্বত্র সাধ্য ধর্ম অর্থেই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, হুতরাং সেই অর্থে “সাধ্যের” নির্দেশকে পূর্বোক্ত দোষবশতঃ “প্রতিজ্ঞা” বলিতে পারেন নাই। তিনি “সাধ্যনির্দেশ প্রতিজ্ঞা নহে,” এই কথা বলিয়া নিজে স্বাধীনভাবে “প্রতিজ্ঞা”র লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘতিকা রচয়িতা শিরোমণি সেখানে মহর্ষির এই প্রতিজ্ঞার লক্ষণ-হুত্রে উদ্ধারপূর্বক মহর্ষি-হুত্রে সাধ্যের “সাধ্য” শব্দের পূর্বোক্ত সাধ্য ধর্মী অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াই মহর্ষিপ্রোক্ত প্রতিজ্ঞা লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন^১। শেষে তিনি নিজেও স্বাধীনভাবে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন।

১। পরিগ্রহভেদেনৈতি পরিগ্রহঃ স চ বচনকেতি পরিগ্রহবচনম্।—(তাৎপর্থাটিকা)।

২। “তত্ত্বচিন্তামণি”র অবয়ব প্রকরণে দীর্ঘতিকা রচয়িতা শিরোমণি মহর্ষি গোতমের প্রতিজ্ঞালক্ষণ-হুত্রে উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করায়, সেখানে দীর্ঘতিকা টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, গল্পে মহর্ষিপ্রোক্ত প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন। দীর্ঘতিকা রচয়িতা মহর্ষি-হুত্রে “সাধ্য” শব্দের বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিয়া, মহর্ষির প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের নির্দোষত্ব সমর্থন করিয়াছেন। আবার মনে হয়, গল্পে মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিতে যান নাই। তিনি সেখানে এইমাত্র বলিয়াছেন,—“তত্র প্রতিজ্ঞান সাধ্যনির্দেশঃ সাধ্যগবেহতিব্যাপ্তোঃ”। ইহার দ্বারা গল্পে মহর্ষি-লক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। গল্পে অমুমের ধর্ম অর্থেই সর্বত্র “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার ঐরূপ প্রয়োগের কারণও আছে। সাধ্যের ব্যাপ্তিনিরূপণে অমুমের ধর্মরূপ সাধ্যই গ্রাহ্য। হুতরাং ঐ অর্থে “সাধ্যনির্দেশ” প্রতিজ্ঞা বলা যায় না, ইহাই গল্পের তাৎপর্থা। গল্পে মহর্ষির প্রতিজ্ঞা-লক্ষণটি উদ্ধৃত করিয়া ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনি মহর্ষিপ্রোক্ত প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের ব্যাখ্যা করাত আবশ্যক মনে করেন নাই। তবে গল্পে যে ভাবে, যে ভাষায়

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ তাঁহার “পদার্থধর্মসংগ্রহে” প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন,— “অনুমেরোদ্যোদেশোহবিরোধী প্রতিজ্ঞা”। অনুমানের দ্বারা যে ধর্মটি প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই ধর্মবিশিষ্ট ধর্মাই তাঁহার মতে “অনুমের” এবং তাহারই নাম “পক্ষ”। যেমন পক্ষতে বহির্ধর্ম প্রতিপাদনের ইচ্ছা হইলে সেখানে “বহির্বিশিষ্ট পক্ষতই” অনুমের বা পক্ষ। “অনুমের” কি? এই বিষয়ে প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল। সে সকল মত যথাসম্ভব অনুমান-সূত্র-ব্যাখ্যাতেই বলা হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, “পক্ষতো বহিমান্ ন বা” এইরূপ বিপ্রতি-পত্তি-বাক্য এবং “পক্ষতো বহিমান্” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা যখন অভেদ সম্বন্ধে পক্ষতো “বহিমান্”কেই বুঝা যায় অর্থাৎ ঐ বাক্যদ্বয়জ্ঞাত বোধে যখন বহির্ধর্ম বিশেষণ হয় না, “বহিমান্”ই বিশেষণ হয়, তখন ঐরূপ প্রতিজ্ঞাস্থলে “বহিমান্”ই সাধ্য, বহির্ধর্ম সাধ্য নহে। অবশ্য ব্যাখ্যায় দীর্ঘবিত্তিকার রঘুনান্দ এই মতের উল্লেখ করিয়া ইহার প্রকর্ষ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

প্রশস্তপাদ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে “অবিরোধী” এই কথাটি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা “প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ”, “অনুমানবিরুদ্ধ”, “স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ” এবং “স্ববচনবিরুদ্ধ” প্রতিজ্ঞাভাস-গুলি নিরাকৃত হইয়াছে। “স্বায়কন্দলী”কার শ্রীধর ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, বাদী যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই “সাধ্য” হইবে না। যাহা সাধনের যোগ্য, তাহাই সাধ্য, তাহারই নাম “পক্ষ”, তদন্তির “পক্ষাভাস”। বাদী যদি নিজের ভ্রমবশতঃ প্রত্যক্ষানি-বিরুদ্ধ কোন পদার্থ সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রতিজ্ঞার স্বায় কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য “প্রতিজ্ঞা” হইবে না; উহার নাম “প্রতিজ্ঞাভাস”। তাই প্রশস্তপাদ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে “অবিরোধী” এই কথাটি বলিয়াছেন।

“স্বায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, “প্রজ্ঞাপনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম”ই যখন মহর্ষি-সূত্রোক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ এবং তাহার “নির্দেশ”কেই মহর্ষি প্রতিজ্ঞা বলিয়াছেন, তখন “প্রতিজ্ঞাভাস”গুলিতে প্রতিজ্ঞার লক্ষণই নাই, স্তত্রায় প্রতিজ্ঞার লক্ষণে “অবিরোধী” অথবা ঐরূপ কোন কথা বলা নিপ্রয়োজন, তাই মহর্ষি গোতম তাহা বলেন নাই।

“অগ্নি অনুক্ষ” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া হেতু প্রকৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে সেখানে ঐ বাক্যটি “প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে। প্রথম সূত্র-ভাবে “স্বায়ভাসের” উদাহরণ ব্যাখ্যায় এসকল কথা বলা হইয়াছে। সেখানে বোদ্ধ নৈয়ায়িক দিগ্‌নাগের কথাও বলা হইয়াছে।

ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মহর্ষির প্রতিজ্ঞালক্ষণের স্পষ্টতা জন্ম হইতে পারে, এই জ্ঞাত সেখানে দুরবশী রঘুনান্দ শিরোমণি মহর্ষির প্রতিজ্ঞালক্ষণ-সূত্রটির উল্লেখ করিয়া তাহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনান্দ গল্পের জন্ম প্রবর্তন করেন নাই, তিনি অন্তের জন্ম সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহারই নিরাস করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, গল্পের মহর্ষির সূত্রার্থ না বুঝিয়া, মহর্ষির জন্ম প্রবর্তন করিতে গিয়াছেন, ইংা বলিতে ইচ্ছা হয় না, টীকাকার জয়দীপ ও রঘুনান্দ তাহা বলেন নাই। নৈয়ায়িকগণ এ কথাগুলি চিন্তা করিবেন।

“শ্রায়কন্দলী”কার প্রশস্তপাদোক্ত “অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাসের” উদাহরণ বলিয়াছেন,—
 “গগনং নিবিড়ং” অর্থাৎ “গগন নিবিড়” এই বাক্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যে অনুমানের দ্বারা
 গগন সিদ্ধ হইয়াছে, সেই অনুমানের দ্বারাই গগন নিরবয়ব বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায় “গগন নিবিড়” এই
 বাক্য “অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”। কারণ, নিরবয়ব পদার্থ নিবিড় হইতে পারে না। সাবয়ব
 পদার্থই নিবিড় হইতে পারে।

কোন বৈশেষিক যদি বলেন,—“কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে”, তাহা হইলে তাহার
 ঐ বাক্য “স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে। কারণ, কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে
 না, ইহাই বৈশেষিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

যদি কেহ বলেন—“শব্দ বাচক নহে”, তাহা হইলে ঐ বাক্য “স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”
 হইবে। কারণ, বাদী নিজেই শব্দের বাচক স্বীকার করিয়া অপরকে শব্দের দ্বারা অর্থ বুঝাইবার
 জন্ত ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

“স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ” এবং “স্ববচনবিরুদ্ধ” প্রতিজ্ঞাভাস অনুমানবিরুদ্ধই হইবে, ঐ দুইটির আবার
 পৃথক্ উল্লেখ কেন? এইরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া “শ্রায়কন্দলী”কার বলিয়াছেন
 যে, অন্তত তাহা হইলেও সর্বত্র তাহা হয় না। যেমন বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমস্ত পদার্থকেই “ক্ষণিক”
 বলেন। কিন্তু কোন বৌদ্ধ যদি বলেন,—“সমস্ত পদার্থ অক্ষণিক”, তাহা হইলে স্থিরবাদী অত
 সম্প্রদায় উহাকে প্রমাণবিরুদ্ধ বলিতে পারেন না। সেখানে বৌদ্ধের ঐ বাক্য তাহার “স্বশাস্ত্র-
 বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”, ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, কিন্তু স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ,
 এমন প্রতিজ্ঞাভাস আছে। এইরূপ “স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”ও আছে।

কোন বৈশেষিক যদি বলেন, “শব্দ নিত্য,” তাহা হইলে দিগ্‌নাগ বলিয়াছেন, উহা “আগম-
 বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে। উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, বৈশেষিক আগমের
 দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সাধন করেন না। কারণ, শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা এই উভয়বোধক
 আগম থাকায় আগমার্থে সন্দেহবশতঃ বৈশেষিক প্রথমতঃ অনুমানকেই আশ্রয় করেন। শেষে
 সেই অনুমানের দ্বারা শব্দের অনিত্যতা নির্ণয় করিয়া উহাই আগমার্থ বলিয়া নির্ণয় করেন।
 সুতরাং “শব্দ নিত্য”, এইরূপ বাক্য বৈশেষিকের পক্ষে “অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”ই হইবে;
 উহা “আগমবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে না।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বাক্যকেও দিগ্‌নাগ প্রভৃতি এক প্রকার “প্রতিজ্ঞাভাস” বলিয়াছেন, কিন্তু
 উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বাক্য যেখানে “প্রতিজ্ঞাভাস”
 হইবে, সেখানে অবশ্য উহা কোন প্রমাণ-বিরুদ্ধই হইবে। সুতরাং প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ নামে পৃথক্
 এক প্রকার “প্রতিজ্ঞাভাস” কেন বলিব, তাহা বুঝি না। উদ্যোতকর এইরূপে দিগ্‌নাগ-প্রদর্শিত
 অনেক প্রকার “প্রতিজ্ঞাভাসের” উদাহরণ খণ্ডন করিয়াছেন এবং দিগ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ
 নৈয়ায়িকগণের প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনেরও খণ্ডন করিয়াছেন। “শ্রায়বার্ত্তিকে” সেই সকল কথা দ্রষ্টব্য।

দিগ্‌নাগ প্রভৃতির দ্বায় জরজ ভট্টও “শ্রায়মঞ্জরী”তে আরও কতকগুলি “প্রতিজ্ঞাভাসের”

উল্লেখ করিয়াছেন। মহাবি গোতম “প্রতিজ্ঞাভাস” নামে পৃথক্ করিয়া আর কিছু বলেন নাই। ভাষাকার বাৎস্তায়ন প্রথম সূত্র-ভাষ্যে “জ্ঞাভাস” বলিয়াই “প্রতিজ্ঞাভাস” বলিয়াছেন। কারণ, “প্রতিজ্ঞাভাস” হইলেই সেখানে “জ্ঞাভাস” হইবে, “জ্ঞাভাস” হইলেই “প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে। পরবর্তী আচার্য্যগণ বিশদরূপে বুঝাইবার জন্তই “প্রতিজ্ঞাভাস”, “পক্ষাভাস” ইত্যাদি নামে “জ্ঞাভাস” বুঝাইয়াছেন। মহাবি গোতম “ন্যাভাস” নাম করিয়াও কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল “হেতুভাসের”ই বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। “প্রতিজ্ঞাভাস” প্রভৃতির স্থলে সর্বত্র “হেতুভাস” থাকিবেই। সুতরাং “হেতুভাস” বলাতেই মহাবির ঐগুলি বলা হইয়াছে। তদ্বদর্শী সূত্রকার মহাবি গোতম এই জন্যই “প্রতিজ্ঞাভাস” প্রভৃতি বলিয়া গ্রহণের ব্যবস্থা করেন নাই। জয়ন্ত ভট্টও শেষে ইহাই বলিয়াছেন,—

“অতএব চ শাস্ত্রেহগ্নিন্ দূর্নিনা তদ্বদর্শনা।

পক্ষাভাসাদয়ো নোক্তা হেতুভাসান্ত দর্শিতাঃ” ॥—৩৩

সূত্র। উদাহরণসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ। উদাহরণের সহিত সমান ধর্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ কেবল দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সাধ্য ধর্ম্মের যাহা কেবল সমান ধর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধনীয় পদার্থের সাধনবোধক বাক্যবিশেষ “হেতু” (সাধর্ম্ম্য হেতু নামক দ্বিতীয় অবয়ব)।

ভাষ্য। উদাহরণে সামান্যতাং সাধ্যস্ত ধর্ম্মস্ত সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতুঃ। সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্ম্মমুদাহরণে চ প্রতিসন্ধায় তস্ত সাধনতা-বচনং হেতুঃ। উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদিতি। উৎপত্তি-ধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সাধন কি না প্রজ্ঞাপন, অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের সাধনতাবোধক বাক্যবিশেষ হেতু (সাধর্ম্ম্যহেতু নামক দ্বিতীয় অবয়ব)। বিশদার্থ এই যে, সাধ্যে অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্ম্যতে ধর্ম্মকে (হেতু পদার্থরূপ ধর্ম্মবিশেষকে) প্রতিসন্ধান করিয়া এবং দৃষ্টান্ত পদার্থেও (সেই ধর্ম্মকে) প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ যাহাকে দৃষ্টান্ত পদার্থে দেখিয়াছি, তাহাকে এই সাধ্য ধর্ম্ম্যতেও দেখিতেছি বা জানিতেছি, এইরূপে সেই হেতু পদার্থরূপ ধর্ম্মটিকে বুঝিয়া, সেই ধর্ম্মের সাধনতাবচন (সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্যবিশেষ) হেতু, অর্থাৎ এইরূপ বাক্যবিশেষই সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। (যেমন পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাস্থলে) “উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ” এই বাক্য। অর্থাৎ “উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব (অনিত্যত্বের) জ্ঞাপক” এইরূপ অর্থবোধক বাক্য পূর্বোক্ত স্থলে সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। উৎপত্তি-ধর্ম্মক (বস্তু) অনিত্য দেখা গিয়াছে।

বিবৃতি। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা বাদী নিজের সাধ্য ধর্মটিকে প্রকাশ করিয়া মধ্যস্থের প্রশংসার জন্য ঐ সাধ্য ধর্মের সাধন অর্থাৎ হেতু পদার্থকে প্রকাশ করিবেন। মধ্যস্থ প্রশংসা করিবেন,—“তোমার সাধ্য ধর্মের জ্ঞাপক কি?” স্তবরাং বাদী সেখানে হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলিয়া প্রকাশ করিবেন। যে বাক্যের দ্বারা বাদী তাহা প্রকাশ করিবেন, তাহাকে বলে “হেতুবাক্য”। এই হেতুবাক্যই “হেতু” নামে দ্বিতীয় অবয়ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন “শব্দ অনিত্য” এই প্রতিজ্ঞা বলিলে মধ্যস্থের প্রশংসা হইবে—“শব্দ অনিত্যের জ্ঞাপক কি?” তখন বাদী নৈয়ায়িক যদি “উৎপত্তি-ধর্মকল্প”কে ঐ স্থলে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বলিবেন,—“উৎপত্তিধর্মকল্প, জ্ঞাপক”। সংস্কৃত ভাষায় বিচার হইলে বলিবেন,—“উৎপত্তিধর্মকল্পঃ”। ঐ বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা “জ্ঞাপক” বৃদ্ধিতে হইবে, স্তবরাং ঐ বাক্যের দ্বারা “উৎপত্তিধর্মকল্প জ্ঞাপক” ইহাই বুঝা যাইবে। পূর্বে যখন “শব্দ অনিত্য,” এইরূপ বাক্য বলা হইয়াছে এবং তাহার পরে “শব্দে অনিত্যের জ্ঞাপক কি?” এইরূপ প্রশংসা হইয়াছে, তখন “উৎপত্তি-ধর্মকল্প জ্ঞাপক” এইরূপ বাক্য বলিলে “উৎপত্তি-ধর্মকল্প” পদার্থটি শব্দে অনিত্যের জ্ঞাপক, এইরূপই চরম বোধ হইবে। ফলকথা, যে বাক্যের দ্বারা বাদী তাহার হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলিয়া বুঝাইবেন, তাহাই হেতুবাক্য। তাহাকেই বলে—“হেতু” নামক অবয়ব। হেতু পদার্থ বিবিধ; (১) সাধন্যহেতু এবং (২) বৈধর্ম্য হেতু। স্তবরাং হেতুবাক্যও ঐ নামদ্বয়ে দ্বিবিধ। মহর্ষি এই স্তবের দ্বারা “সাধন্যহেতু-বাক্য”র লক্ষণ বলিয়াছেন।

যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ উৎপত্তি বাহার ধর্ম, তাহাকে বলে “উৎপত্তিধর্মক” পদার্থ। গ্রন্থমতে শব্দ “উৎপত্তিধর্মক” পদার্থ। শব্দ যদি ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান জ্ঞাত পদার্থ না হইয়া আত্মা প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞান নিত্য পদার্থ হইত, তাহা হইলে উচ্চারণ না করিলেও শব্দের শ্রবণ হইত। উচ্চারণের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ শব্দের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না, এই সিদ্ধান্ত মহর্ষি গৌতম বলেন নাই। গৌতমের মতে শব্দ পূর্বে থাকে না, শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাহার শ্রবণ হয় না, বাহা শ্রবণের যোগ্যই নহে, কিন্তু বর্তমান আছে, নিত্য সিদ্ধ আছে, তাহাকে শব্দ বলা যাইতে পারে না। এই সিদ্ধান্তানুসারে শব্দ উৎপত্তিধর্মক। উৎপত্তিধর্মক ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান শব্দেরও ধর্ম। উৎপত্তিধর্মক হইলেই যে, সে পদার্থ অনিত্য হইবে, তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এ জ্ঞান নৈয়ায়িক উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। নৈয়ায়িক যদি ঘটাদি পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত হেতুবাক্য “সাধন্য-হেতুবাক্য” হইবে। ঘটাদি পদার্থরূপ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মক আছে, সেখানে অনিত্যত্বও আছে, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত। এখন উৎপত্তি-ধর্মক ধর্মটি যদি শব্দ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহা শব্দ ও ঘটাদিরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম। নৈয়ায়িক ঐ “উৎপত্তিধর্মক”কে শব্দ ও ঘটাদিরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম বলিয়া বুঝিয়া যদি পূর্বোক্ত স্থলে “উৎপত্তিধর্মক” এইরূপ হেতুবাক্য বলেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য “সাধন্যহেতুবাক্য” হইবে। আর যদি ঐ স্থলে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করেন অর্থাৎ “বাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক নহে, তাহা অনিত্য নহে,—যেমন আত্মা প্রভৃতি” এইরূপ কথা বলেন,

তাহা হইলে পূর্বোক্ত “উৎপত্তিধর্মকথাং” এইরূপ হেতুবাক্যই সেখানে “বৈধর্ম্যহেতুবাক্য” হইবে। আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে উৎপত্তিধর্মকথ না থাকায় উহা শব্দ ও আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তের সাধারণ্য বা সমান ধর্ম নহে, উহা আত্মা প্রভৃতির বৈধর্ম্য। উৎপত্তি-ধর্মকথরূপ হেতু পদার্থকে যদি ঐরূপে আত্মাদি দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্যরূপে বুঝিয়া, তাহার জ্ঞাপক-বোধক বাক্য বলা হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্য সেখানে “বৈধর্ম্যহেতুবাক্য” হইবে। এই “বৈধর্ম্যহেতুবাক্য”র কথা ইহার পরবর্তী সূত্রে বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব বাক্যবিশেষ। “প্রতিজ্ঞা”র লক্ষণের পরে “হেতু” নামক অবয়বের লক্ষণই যখন মহর্ষির বক্তব্য, তখন এই সূত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা হেতু পদার্থ না বুঝিয়া হেতুবাক্যই বুঝিতে হইবে। সূত্রে “সাধ্যসাধনং” এই অংশের দ্বারা ঐ হেতু-বাক্যের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। উহার দ্বারাও সাধ্যসাধন হেতুপদার্থ না বুঝিয়া, সাধ্যের সাধন বা জ্ঞাপকবোধক বাক্যবিশেষই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও সূত্রস্থ “সাধ্যসাধন” শব্দের ব্যাখ্যায় শেষে “তন্ত সাধনতাবচনং” এই কথা বলিয়া মহর্ষির ঐ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধ্যের সাধন যে বাক্যে থাকে অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা সাধ্যসাধন পদার্থকে সাধন বলিয়া বুঝা যায়, এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাসসিদ্ধ “সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারা এখানে পূর্বোক্তরূপ বাক্য বুঝা যায়, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনগণ ঐ পথে যান নাই। প্রাচীন মতে সূত্রে “সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারাই সাধ্যের সাধনতাবোধক বাক্য পর্য্যন্তই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও তাহাই প্রকটিত। বস্তুতঃ প্রাচীন ভাষার ঐরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যায়। পরন্তু ঐরূপ প্রয়োগের দ্বারা সাধ্যসাধনই যে হেতু পদার্থের লক্ষণ, ইহাও মহর্ষি সূচনা করিয়াছেন। সূত্রে এইরূপ সূচনাই থাকে।

মহর্ষি দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। তাহার দ্বারাই দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ বুঝিয়া মহর্ষির উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণ বুঝা যাইবে। কিন্তু হেতু পদার্থের স্বরূপ না বুঝিলে, “হেতুবাক্য” ও “হেতুভাস” বুঝা যায় না। মনে হয়, সেই জন্তই মহর্ষি “সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারাই হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে হেতু পদার্থের স্বরূপও সূচিত হইয়াছে। তবে হেতু-বাক্যের লক্ষণই এখানে মহর্ষির মূল বক্তব্য, সেই জন্তই এই সূত্রের উক্তি, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ হেতু-বাক্যের লক্ষণ পক্ষেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “জায়দর্শন”-কার জয়ন্ত ভট্টের কথায় পাওয়া যায়, কোন সম্প্রদায় এই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি পরিভাষ্য করিয়া, ইহাকে হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতেন, শেষে ইহার দ্বারাই হেতুবাক্যের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এইরূপ কথা বলিতেন। জয়ন্ত ভট্ট সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি রক্ষা করিয়াও ঐ মতের সমর্থন করিতে গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনগণ ঐরূপ বলেন নাই। “অবয়ব” প্রভাবে হেতুবাক্যের লক্ষণই যখন মহর্ষির এখানে মূল বক্তব্য, তখন হেতু পদার্থের লক্ষণই প্রধানতঃ এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলেন নাই, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। জয়ন্ত ভট্টের অসঙ্গত কথা ইহার পরবর্তী সূত্রে প্রকটিত হইবে।

মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা “সাধর্ম্য্য হেতুবাক্যের” লক্ষণ বলিলেও, স্বত্রের অর্থ পর্যালোচনা করিলে ইহার দ্বারা হেতুবাক্যের সামান্ত্র লক্ষণও বুঝা যায়। বস্তুতঃ হেতুবাক্যের সামান্ত্র লক্ষণও মহর্ষির বক্তব্য। সামান্ত্র জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, এই স্বত্রের দ্বারা হেতুবাক্যের সামান্ত্র লক্ষণ এবং সাধর্ম্য্য হেতুবাক্যের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সামান্ত্র লক্ষণটি অর্থ এবং বিশেষ লক্ষণটি শাব্দ। বিশেষ লক্ষণ পক্ষে স্বত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা “সাধর্ম্য্য হেতুবাক্য” বুঝিতে হইবে। “উদাহরণসাধর্ম্য্য সাধ্যসাধনং” এই কথার দ্বারা ঐ “সাধর্ম্য্য হেতুবাক্যের” লক্ষণ বলা হইয়াছে।

যাহা উদাহৃত হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে স্বত্রে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা এখানে “দৃষ্টান্ত” পদার্থই বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত পদার্থ বিবিধ, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। “সাধর্ম্য্য হেতুবাক্যের” এই লক্ষণে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা “সাধর্ম্য্য দৃষ্টান্তই” বুঝিতে হইবে। “সাধর্ম্য্য” বলিতে সমান ধর্ম্ম। ভাষ্যকার স্বত্রোক্ত “সাধর্ম্য্য” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “সামান্ত্র”। “সামান্ত্র” বলিতে সমানতা বা সমানধর্ম্মই বুঝিতে হইবে। কাহার সহিত সমান ধর্ম্ম? তাই স্বত্রে বলা হইয়াছে, “উদাহরণসাধর্ম্য্য”। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান ধর্ম্ম। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত কাহার সমান ধর্ম্ম, ইহা স্বত্রকার না বলিলেও সাধ্যধর্ম্মীর সমান ধর্ম্মই বুঝা যায়। কারণ, তাহাই প্রকৃত এবং নিকটবর্তী। ফল কথা, “সাধর্ম্য্য দৃষ্টান্ত” পদার্থের সহিত “সাধ্য ধর্ম্মীর” বাহা সমান ধর্ম্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম্মটি “সাধর্ম্য্য দৃষ্টান্তেও” আছে এবং “সাধ্য ধর্ম্মীতে”ও আছে, তাহাই এই স্বত্রে “উদাহরণ-সাধর্ম্য্য” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ঐরূপ পদার্থকেই “সাধর্ম্য্য হেতু” পদার্থ বলে। যে কোন পদার্থের সহিত সমান ধর্ম্ম বলিলে বিরুদ্ধ ও ব্যক্তিচারী অর্থাৎ হেতুভাঙ্গ ও হেতু পদার্থ হইয়া পড়ে, তাই বলা হইয়াছে—“উদাহরণ সাধর্ম্য্য”। কোন ব্যক্তিচারী পদার্থ উদাহরণেও আছে, আবার বাহা উদাহরণ নহে, সেই পদার্থেও আছে—এমন পদার্থও “উদাহরণ-সাধর্ম্য্য” বলিয়া হেতু পদার্থ হইয়া পড়ে, এ জন্য “উদাহরণ-সাধর্ম্য্য” বলিতে এখানে কেবলমাত্র উদাহরণের সহিতই সমান ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। এবং “সাধর্ম্য্য” বলিতেও কেবলমাত্র সাধর্ম্য্য (বৈধর্ম্ম্য নহে) বুঝিতে হইবে। ফলকথা, এই স্বত্রে “উদাহরণ-সাধর্ম্য্য” শব্দের দ্বারা “সাধর্ম্য্য হেতু” পদার্থেরও লক্ষণ সূচিত হওয়ায়, উহার দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে স্বত্রের তাৎপর্য্যার্থ হইল যে, কেবলমাত্র “সাধর্ম্য্য দৃষ্টান্ত” পদার্থের সহিত সাধ্য ধর্ম্মীর বাহা কেবলমাত্র সমান ধর্ম্ম, ফলিতার্থ এই যে, বাহা সেখানে “সাধর্ম্য্য হেতু” পদার্থ, তৎপ্রযুক্ত তাহার সাধ্যসাধনতাবোধক যে বাক্য, তাহাই “সাধর্ম্য্য হেতুবাক্য”। যেগুলি ভুট্ট হেতু অর্থাৎ হেতুভাঙ্গ, সেগুলি সাধ্যসাধনই হয় না, সুতরাং তাহার সাধনতাবোধক ঐরূপ বাক্য হেতু-বাক্য হইবে না। এবং ভাববাক্যের অন্তর্গত না হইলেও ঐরূপ কোন বাক্য ত্রাত্তের অবয়ব হেতু-বাক্য হইবে না। ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞায় হেতুবাক্য বলিয়াছেন—“উৎপত্তিধর্ম্ম-কদ্ধাং” এই বাক্য। “উৎপত্তিধর্ম্মকদ্ধ” শব্দে আছে এবং বটাদি পদার্থরূপ-সাধর্ম্য্য দৃষ্টান্তেও

আছে, সুতরাং উৎপত্তিধর্মকল্প ধর্মটি সূত্রোক্ত “উদাহরণ-সাধর্ম্য”। উহা কেবল ঘটাদি অনিত্য পদার্থরূপ সাধর্ম্য দৃষ্টান্তেই থাকায় এবং শব্দে থাকায় কেবল সাধর্ম্য দৃষ্টান্তের সহিত সাধ্যধর্মী শব্দের সমান ধর্মই হইয়াছে। উহাকে ঐরূপে বুঝিয়া ঐ স্থলে “উৎপত্তিধর্মকল্প” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, ঐ বাক্য “সাধর্ম্য হেতুবাক্য” হইবে। ফল কথা এই যে, হেতু-বাক্য প্রয়োগের পরে বাদী বৈরূপ উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তদনুসারেই ঐ হেতুবাক্যের পূর্বোক্ত ভেদ হইবে। বাদী যদি “সাধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের” দ্বারা পরে সাধর্ম্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাহার পূর্বোক্ত হেতুবাক্যটি “সাধর্ম্য হেতুবাক্য” হইবে। আর যদি “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের” দ্বারা বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাহার হেতুবাক্য “বৈধর্ম্য হেতুবাক্য” হইবে। ভাব্যকার যে এখানে সাধর্ম্য হেতুবাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝাইতেই শেষে এখানে “সাধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যটির”ও উল্লেখ করিয়াছেন। উদাহরণসূত্রে এ সকল কথা পরিষ্কৃত হইবে। (৩৬।৩৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

সূত্রের “সাধ্যসাধনং” এই অংশের ব্যাখ্যায় ভাব্যকার বলিয়াছেন—“সাধ্যস্ত-ধর্মস্ত সাধনং প্রজ্ঞাপনং।” সূত্রে “সাধ্য” শব্দটি যে এখানে সাধ্য ধর্ম অর্থেই প্রযুক্ত, ইহা ভাব্যকারের কথাতোও বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাব্যকার কেবল “সাধ্যস্ত” এই কথা বলিলে, যে ধর্মীতে অনুমান হয়, কেবল সেই ধর্মীমাত্রকেই কেহ বুঝিতে পারেন, এ জ্ঞাত ভাব্যকার আবার বলিয়াছেন—“ধর্মস্ত”। উহার দ্বারা এখানে অনুমের ধর্ম সহিত ধর্মীই সূত্রোক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে, কেবল ধর্মীমাত্র বুঝিতে হইবে না, ইহাই ভাব্যকারের তাৎপর্য। এই জ্ঞাই ভাব্যকার শেষে “সাধ্যো প্রতিসন্ধায় ধর্মঃ” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত অর্থ সুব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ঐ স্থলে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্য ধর্মীকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, সাধ্য ধর্মী এবং দৃষ্টান্ত পদার্থেই হেতু পদার্থরূপ ধর্মীটির প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে।

তাৎপর্যটীকাকারের কথায় বক্তব্য এই যে, ভাব্যকারের শেষোক্ত ঐ “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মী অর্থ ইচ্ছা, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু উহা যে সূত্রোক্ত “সাধ্য” শব্দেরই বিবরণ, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। ভাব্যকারের শেষ কথাগুলি তাহার অন্য প্রকারে বিশদার্থ ব্যাখ্যাও বলা যায়। পরন্তু ভাব্যকার প্রথমে কেবল “সাধ্যস্ত” এই কথা বলিলে, উহার দ্বারা কেবল ধর্মী মাত্র বুঝিবে কেন? কেবল ধর্মী “সাধ্য” হইতে পারে না। ভাব্যকার উদাহরণ সূত্রভাষ্যে “সাধ্য” শব্দের যে দ্বিবিধ অর্থ বলিয়াছেন, তদনুসারে কেবল “সাধ্য” বলিলে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী বুঝা যাইতে পারে। “সাধ্য” শব্দের দ্বারা যদি এখানে তাহাই ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে ভাব্যকার আবার “ধর্মস্ত” এই কথা বলিবেন কেন? ফলকথা, ভাব্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় “সাধ্যস্ত-ধর্মস্ত” এই কথা বলিয়া, সূত্রোক্ত “সাধ্য” শব্দের দ্বারা এখানে যে সাধ্য-ধর্মীকে গ্রহণ না করিয়া সাধ্য ধর্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই মনে আসে। ভাব্যকারের ঐ কথার সরল অর্থ তাগ করিবার কোন কারণও মনে আসে না। পরন্তু হেতু পদার্থটি সাধ্য ধর্মেরই সাধন হয়। হেতুপদার্থ সাধ্য ধর্মীর ব্যাপ্য হয় না, সাধ্য ধর্মেরই ব্যাপ্য হইয়া থাকে। সুতরাং মহর্ষি

এখানে “সাধ্যসাধনঃ” এই বাক্যে সাধ্য ধর্ম অর্থেই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই সহজে বুঝা যায়। সুবীণ কথটা ভাবিয়া দেখিবেন।

“সাধ্য হেতুবাক্য” হলে “সাধ্য দৃষ্টান্ত” পদার্থ এবং সাধ্য ধর্ম্মাতে হেতুপদার্থকে প্রতিসন্ধান করিয়া, তাহার সাধক বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়, এ জ্ঞাত হেতুবাক্য উদাহরণ সাধ্যপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইবার জ্ঞাই পরে ঐ কথা বলিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত পদার্থে যাহা দেখিয়াছি বা জানিয়াছি, এই সাধ্য ধর্ম্মাতেও তাহাকে দেখিতেছি বা জানিতেছি, এইরূপে হেতুপদার্থের জ্ঞানই তাহার দৃষ্টান্ত পদার্থ ও সাধ্যধর্ম্মাতে প্রতিসন্ধান। “প্রতিসন্ধান” বলিতে “প্রত্যভিজ্ঞা” নামক জ্ঞানবিশেষ। উহা অনেক সময়ে একজাতীয় পদার্থেও পূর্কোক্ত প্রকারে হইয়া থাকে। রন্ধনগৃহে যে ধূম দেখা হয়, পর্কতে ঠিক সেই ধূমই দেখা হয় না, তাহার সজাতীয় অস্ত্র ধূমই দেখা হইয়া থাকে। তাহা হইলেও ধূমরূপে অথবা বিশিষ্ট ধূমরূপে সজাতীয় ধূম দেখিয়াও পূর্কসংস্কারবশতঃ যাহা রন্ধনগৃহে দেখিয়াছি, তাহা পর্কতেও দেখিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে।

বাংলায়নের প্রবল প্রতিবাদী বোদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ নাগ তাহার “প্রমাণসমুচ্চর” গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, “সাধ্যঃ যদি হেতুঃ স্তাৎ ন বাক্যাংশো ন পঞ্চমী”। দিঙ নাগের কথা এই যে, যদি উদাহরণ-সাধ্যই হেতু হয়, তাহা হইলে উহা বাক্য না হওয়ার স্তায়বাক্যের অংশ বা “অবয়ব” হইতে পারে না। আর যদি হেতু পদার্থেরই লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি সংগত হয় না, প্রথমা বিভক্তিই সম্ভব হয়, অর্থাৎ “উদাহরণসাধ্যঃ সাধ্যসাধনঃ হেতুঃ” এইরূপ সূত্রই বলা উচিত। দিঙ নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর ঐ কথার বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকরের প্রতিবাদের মর্ম্ম এই যে, হেতুবাক্যের লক্ষণই এই সূত্রের দ্বারা মর্হি বলিয়াছেন। উদাহরণ সাধ্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধনতাবোধক বাক্যই সূত্রার্থ। উদাহরণ-সাধ্য-রূপ হেতুপদার্থ উদাহরণসাধ্যপ্রযুক্ত হইতে না পারিলেও হেতুবাক্য উদাহরণসাধ্যপ্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, হেতু পদার্থটিকে উদাহরণ-সাধ্য বলিয়া বুঝিয়াই তাহার জ্ঞাপকত্ববোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহাই হেতুবাক্য। তাহার প্রতি উদাহরণসাধ্য অর্থাৎ হেতু পদার্থ ঐরূপে নিমিত্ত বা প্রবোজক হইবে। সুতরাং সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি সম্ভব এবং আবশ্যক। ফলকথা, হেতুপদার্থের লক্ষণ হইলেই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি হয় এবং তাহা স্তায়বাক্যের অংশ হেতুবাক্যের লক্ষণ হয় না। যখন পূর্কোক্তরূপে হেতুবাক্যের লক্ষণই সূত্রার্থ, তখন দিঙ নাগের প্রদর্শিত দোষ এখানে সম্ভবই নহে। দিঙ নাগ সূত্রার্থ না বুঝিয়াই এখানে কায়নিক দোষের আরোপ করিয়াছেন, ইহাই উদ্যোতকরের প্রতিবাদের সার ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য। কিমেতাবন্ধেতুলক্ষণমিতি ? নেতুচ্যতে। কিং তর্হি ?

অনুবাদ। হেতুবাক্যের লক্ষণ কি এই মাত্র ? অর্থাৎ পূর্বসূত্রে হেতুবাক্যের লক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই কি কেবল হেতুবাক্যের লক্ষণ ? (উত্তর) ইহা

বলিতেছি না, অর্থাৎ হেতুবাক্যের যে আর কোন প্রকার লক্ষণ নাই, ইহা বলা হয় নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? অর্থাৎ তাহা হইলে হেতুবাক্যের অন্য প্রকার লক্ষণ কি? (এই প্রশ্নের উত্তররূপে মহর্ষি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন)।

সূত্র। তথা বৈধর্ম্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ অর্থাৎ উদাহরণবিশেষের বৈধর্ম্যাপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ সাধ্যসাধনবোধক বাক্যবিশেষ হেতু (বৈধর্ম্যাহেতুবাক্য)।

ভাষ্য। উদাহরণ-বৈধর্ম্যাচ্চ সাধ্যসাধনং হেতুঃ। কথং? অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং যথা আত্মাদি দ্রব্য-মিতি।

অনুবাদ। উদাহরণের বৈধর্ম্যাপ্রযুক্ত অর্থাৎ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত মাত্রের বাহ্য কেবল বৈধর্ম্য তৎপ্রযুক্ত, সাধ্যসাধনও অর্থাৎ ঐরূপ সাধ্যসাধনতাবোধক বাক্যবিশেষও হেতু (বৈধর্ম্য-হেতুবাক্য)। (প্রশ্ন) কি প্রকার? অর্থাৎ এই বৈধর্ম্যাহেতু-বাক্য কি প্রকার? (উত্তর) “শব্দ অনিত্য”, “উৎপত্তিধর্মকত্ব-জ্ঞাপক”, “অনুৎপত্তিধর্মক বস্তু নিত্য, যেমন আত্মাদি দ্রব্য” (অর্থাৎ প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞাদি স্থলে “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এই বাক্যই বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। উৎপত্তিধর্মকত্ব আত্মা প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে না থাকায়, উহা আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য। প্রদর্শিত স্থলে ঐ হেতুবাক্যটি পূর্বোক্ত বৈধর্ম্যাপ্রযুক্ত হওয়ায় উহা বৈধর্ম্য হেতু-বাক্য)।

টীকণী। হেতুবাক্য বিবিধ;—সাধর্ম্য হেতুবাক্য এবং বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। মহর্ষি পূর্ব-সূত্রের দ্বারা “সাধর্ম্যাহেতুবাক্যের” লক্ষণ বলিয়া, এই সূত্রের দ্বারা “বৈধর্ম্য হেতুবাক্যের” লক্ষণ বলিয়াছেন। এই সূত্রে “তথা” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্র হইতে “উদাহরণ” শব্দের এবং “সাধ্য-সাধনং” এবং “হেতুঃ” এই দুইটি বাক্যের অমর্যুতি স্থিতি হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ কথাগুলির বোঝ করিয়াই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। বাহ্য উদাহৃত হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পূর্বসূত্রে দৃষ্টান্ত পদার্থ অর্থেই “উদাহরণ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত পদার্থও দ্বিবিধ;—সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত। যেখানে হেতুপদার্থ নাই, সাধ্য ধর্মও নাই, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হইলে, ভাষ্যকারের মতে তাহা “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত”। হেতু পদার্থটি তাহাতে থাকে না, সুতরাং হেতু পদার্থ বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তেরই বৈধর্ম্য হয়। অতএব এই সূত্রে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত” কেই বুঝিতে হইবে। এবং এই সূত্রে “উদাহরণ-বৈধর্ম্য” কথার দ্বারা বাহ্য বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থমাত্রের কেবল বৈধর্ম্য (সাধর্ম্য নহে), তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই মহর্ষির বিবক্ষিত এবং তাহাকেই বলে “বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ”। যেমন “উৎপত্তিধর্মকত্ব” আত্মা

প্রভৃতি পদার্থে নাই বলিয়া, উহা আত্মাদি নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্য। শব্দে অনিত্যত্বের অহুমানো আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইলে, উহা সেখানে বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থ। সুতরাং ঐ স্থলে “উৎপত্তিধর্মকত্ব” পদার্থটি কেবল ঐ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য মাত্র হওয়ার “বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ” হইয়াছে। বাহ্য বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের জ্ঞান অজ্ঞ পদার্থেরও বৈধর্ম্য, তাহা “বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ” নহে। তাহা হইলে শরীরদ্বয়ে “সাম্ব্যকত্ব”র অহুমানো “প্রাণাদিমত্ব”ও বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা হইবে না। কারণ, “প্রাণাদিমত্ব” যেমন ঐ স্থলে বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত (প্রাণাদিশূন্য এবং নিরাস্বক) ঘটাদি পদার্থের বৈধর্ম্য, তদ্রূপ মৃত শরীরেরও বৈধর্ম্য। মৃত দেহেও প্রাণাদি নাই। শরীরদ্বয়েই সাম্ব্যকত্বের অহুমান করিতে গেলে সেখানে মৃত শরীর দৃষ্টান্ত হইবে না। ফলকথা, যে পদার্থটি কেবল “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত”র বৈধর্ম্য মাত্র, তাহাই বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ এবং তাহাই এই স্থলে “উদাহরণ-বৈধর্ম্য” কথার দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রদর্শিত স্থলে “উৎপত্তিধর্মকত্ব” পদার্থকে আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য-রূপে বুঝিয়া “উৎপত্তিধর্মকত্ব” এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে, উহা “বৈধর্ম্য-হেতুবাক্য” হইবে। ভাষ্যকার এখানে পূর্বোক্ত প্রকার ঐ বাক্যটিকেই “বৈধর্ম্য-হেতুবাক্য”র উদাহরণ-রূপে উল্লেখ করিয়া, উহা যে এখানে “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত”র বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্ত শেষে ঐ স্থলীয় “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য”টিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ যে হেতুবাক্যের পরে “বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য”র প্রয়োগ হইবে, তাহাই বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। বৈধর্ম্য হেতুপদার্থকে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝান হয় এবং বৈধর্ম্য হেতুপদার্থকে পূর্বোক্ত উদাহরণ-বৈধর্ম্য বলিয়া বুঝিয়াই ঐরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করা হয়, সুতরাং “উদাহরণ-বৈধর্ম্য” বা বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ, ঐরূপ হেতুবাক্যের নিমিত্ত বা প্রযোজক, তাহা হইলে বৈধর্ম্য হেতুবাক্যকে উদাহরণ বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত বলা যায়, সুতরাং এই স্থলেও পূর্বস্থলের জ্ঞান পঞ্চমী বিতক্তির অসংগতি নাই। হেতু পদার্থ এবং হেতুবাক্য একই পদার্থ নহে। হেতুবাক্যের প্রতি হেতু পদার্থ প্রযোজক হওয়ার, হেতুবাক্যকে হেতুপদার্থপ্রযুক্ত বলা যাইতে পারে।

এই বৈধর্ম্য হেতুবাক্যের ব্যাখ্যার পরবর্তী কোন নৈসর্গিকই ভাষ্যকারের মত গ্রহণ করেন নাই। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার পূর্বে যাহাকে “সাদর্ম্য হেতুবাক্য” বলিয়া আসিয়াছেন, এখানে তাহাকেই অর্থাৎ সেইপ্রকার বাক্যকেই “বৈধর্ম্য হেতুবাক্য” বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “সাদর্ম্য হেতুবাক্য” হইতে এই “বৈধর্ম্য হেতুবাক্য”র বাস্তব কোন ভেদ হয় নাই, কেবল প্রয়োগভেদ হইয়াছে মাত্র। তাহাতে হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণের ভেদবশতঃও হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ হইতে পারে না। যদি তাহাই হয় অর্থাৎ যদি উদাহরণের ভেদবশতঃই হেতুবাক্যের এই ভেদ মহর্ষির বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মহর্ষি “বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য”র যে লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাই এই ভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে, মহর্ষির এই সূত্রটির কোন প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং ভাষ্যকার-প্রদর্শিত বৈধর্ম্য হেতুবাক্যের উদাহরণ গ্রাহ্য নহে। “জীবৎ শরীরং ন নিরাস্বকং অপ্ৰাণাদিমত্বপ্রসঙ্গাৎ” অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির

শরীর আয়ত্ত নহে, যে হেতু তাহা হইলে উহা প্রাণাদিশূন্য হইয়া পড়ে, এইরূপ স্থলেই বৈবৰ্ধ্য হেতুবাক্যের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। “তত্ত্বচিন্তামনি”কার গবেষণে উদ্যোতকরের মতামতানুসারে পূৰ্ণোক্ত স্থলে এবং “পৃথিবী ইত্যন্তো ভিত্তিতে গন্ধবদ্ব্যং” অর্থাৎ পৃথিবী জলাদি সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহাতে গন্ধ আছে। বাহা জলাদি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা গন্ধযুক্ত নহে, এইরূপ স্থলে “গন্ধবদ্ব্যং” এই বাক্যকে বৈবৰ্ধ্য হেতুবাক্য বা “ব্যতিরেকী হেতুবাক্য” বলিয়াছেন।

উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী প্রায় সকল জাতিচর্চায়গণের মতেই হেতু ও অনুমান ত্রিবিধ। (১) “অবরী,” (২) “ব্যতিরেকী,” (৩) “অবয়ব্যতিরেকী”। অনুমানের পূর্বে অনুমের ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া উভয় পক্ষের সম্মত পদার্থকে “সপক্ষ” বলে। ঐ “সপক্ষ” পদার্থ উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত হইলে তাহাকে “অবরী উদাহরণ” বলে। ঐ অবরী উদাহরণের সাহায্যে হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাহাকে অবয়ব্যাপ্তি বলে। গবেষণ প্রভৃতি প্রধানতঃ এই অবয়ব্যাপ্তির স্বরূপ বলিয়াছেন—“হেতুব্যাপক-সাধ্যসামান্যধিকরণ্য”। অর্থাৎ যেখানে যেখানে হেতুপদার্থ আছে, সেই সমস্ত স্থানেই যে সাধ্য ধর্ম থাকে, তাহাকে বলে “হেতুব্যাপকসাধ্য”। তাহার সহিত হেতু পদার্থের একাধারে থাকাই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের অবয়ব্যাপ্তি। যেখানে অনুমের ধর্মটি সন্নিবিষ্ট, অথবা নিশ্চিত হইলেও অনুমানের ইচ্ছার বিবরীভূত, তাহাকে “পক্ষ” বলে। এক কথায় যে ধর্ম্মেতে কোন ধর্মের অনুমান করা হয়, সেই ধর্ম্মকেই নব্যগণ “পক্ষ” বলিয়াছেন। যে পদার্থে অনুমের ধর্মটি নাই, ইহা উভয় পক্ষের সম্মত, সেই পদার্থকে “বিপক্ষ” বলে (হেতুভাস-লক্ষণপ্রকরণে দ্রষ্টব্য)। যেখানে এই বিপক্ষ নাই, কেবল সপক্ষরূপ “অবরী উদাহরণে”র সাহায্যে পূৰ্ণোক্ত “অবয়ব্যাপ্তি”র নিশ্চয়পূর্বক অনুমান হয়, সেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (১) অবরী বা “কেবলাবরী”। যেমন “ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়দ্ব্যং” এইরূপে বাচ্যধর্মের অনুমানে “বিপক্ষ” নাই। কারণ, এখানে সাধ্য বা অনুমের ধর্ম “বাচ্যত্ব”। বস্ত্ত মাত্রেরই বাচক শব্দ আছে; স্তত্তরাং বস্ত্ত মাত্রই শব্দের বাচ্য অর্থাৎ সকল বস্ত্ততেই বাচ্যত্বরূপ ধর্ম আছে। তাহা হইলে ঐ বাচ্যত্ব-রূপ সাধ্যশূন্য পদার্থ না থাকায়, ঐ স্থলে “বিপক্ষ” নাই অর্থাৎ ঐ স্থলে “বিপক্ষ” অলীক। স্তত্তরাং বিপক্ষরূপ “ব্যতিরেকী উদাহরণ” এখানে অলীক। কিন্তু ঘটাদি বহু বস্ত্তই “বাচ্যত্ব”রূপ সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত থাকায়, যে যে স্থানে জ্ঞেয়ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ত্ব আছে, সেই সমস্ত স্থানে বাচ্যত্ব আছে;—যেমন ঘটাদি জ্ঞেয় পদার্থ। এইরূপে “অবরী উদাহরণের সাহায্যে এখানে জ্ঞেয়ত্বরূপ হেতু পদার্থে বাচ্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের “অবয়ব্যাপ্তি” নিশ্চয়পূর্বক অনুমান হয়। এই জন্ত এই স্থলীয় হেতুও অনুমান অবরী বা কেবলাবরী। গবেষণের মতে ইহার অন্তরূপ ব্যাখ্যাও আছে।

যেখানে পূৰ্ণোক্ত “সপক্ষ” অর্থাৎ সাধ্যধর্মযুক্ত বলিয়া উভয় পক্ষের নিশ্চিত পদার্থ নাই, কিন্তু বিপক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্মশূন্য বলিয়া উভয় পক্ষের নিশ্চিত পদার্থ আছে, সেখানে সেই বিপক্ষ পদার্থ দৃষ্টান্ত হইলে, তাহাকে ব্যতিরেকী উদাহরণ বলে। সেই ব্যতিরেকী উদাহরণের সাহায্যে “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” নিশ্চয় পূর্বক সেখানে অনুমান হয়; এ জন্ত সেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (২) ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী। সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বকেই

নব্যগণ “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” বলিয়াছেন। যে যে স্থানে সাধ্য ধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই যে অভাব থাকে, তাহাকে সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাব বলে। সাধ্যশূন্য স্থান মাঝেই হেতুর অভাব থাকিলে, তাহা সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাব হয়। সেই হেতুর অভাবের প্রতিযোগী হেতু। কারণ, বাহার অভাব, তাহাকে ঐ অভাবের “প্রতিযোগী” বলে। তাহা হইলে সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে হেতুর অভাব, তাহার প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকে। ফলতঃ এই ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান স্থলে সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাবের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব জ্ঞান হইয়াই অল্পমান হয়, এই জ্ঞাত উহাকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান বলা হইয়াছে। “ব্যতিরেক” শব্দের অর্থ অভাব।

যেমন “জীবজরুরীং সায়কং প্রাণাদিমহাৎ” অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, যেহেতু তাহাতে প্রাণাদি আছে, এইরূপে জীবিত ব্যক্তির শরীরে সায়কত্বের অল্পমানে “সপক্ষ” নাই। কারণ, জীবিত ব্যক্তির শরীর এখানে “পক্ষ” হইয়াছে। উহা ভিন্ন “সায়ক” বলিয়া উভয় পক্ষের সম্মত কোন পদার্থই নাই। বাহা সাধ্যযুক্ত বলিয়া উভয় পক্ষের সম্মত, তাহাই “সপক্ষ”। তাহা এখানে নাই। কিন্তু সায়কত্বশূন্য অর্থাৎ যাহাতে আত্মা নাই—ইহা সর্বসম্মত, এমন ঘটাদি পদার্থরূপ বিপক্ষ আছে। সুতরাং ঐ স্থলে বাহা সায়ক নহে, তাহা প্রাণাদিযুক্ত নহে অর্থাৎ প্রাণাদির কারণ ইচ্ছাদিযুক্ত নহে, যেমন ঘটাদি—এইরূপে ব্যতিরেকী উদাহরণের সাহায্যে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়পূর্বকই অল্পমান হয়। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির শরীরে সায়কত্ব নহে, তাহা হইলে উহা প্রাণাদিশূন্য হইয়া পড়ে; সায়কত্ব পদার্থমাত্রই প্রাণাদিশূন্য, জীবিত ব্যক্তির শরীরে যখন প্রাণাদি আছে, তখন উহাতে আত্মা আছে, এইরূপে জীবিত ব্যক্তির শরীরে সায়কত্বের অল্পমান হয়। এখানে জীবিত ব্যক্তির শরীর ভিন্ন প্রাণাদিযুক্ত অথচ সায়ক বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থ নাই, সুতরাং সপক্ষ না থাকায় অম্বয়ী উদাহরণের সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু ঘটাদিরূপ “বিপক্ষ” ব্যতিরেকী উদাহরণ আছে। তাহার সাহায্যে ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয়পূর্বক অল্পমান হওয়ায়, এই স্থলীয় হেতু ও অল্পমান ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী।

যেখানে “সপক্ষ”ও আছে, বিপক্ষও আছে, এবং হেতুপদার্থটি “সপক্ষে” আছে, কিন্তু “বিপক্ষে” নাই, সেই স্থলে সপক্ষরূপ অম্বয়ী উদাহরণ এবং বিপক্ষরূপ ব্যতিরেকী উদাহরণ, এই দ্বিবিধ উদাহরণের সাহায্যে পূর্বোক্ত অম্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি—এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তির নিশ্চয়পূর্বকই অল্পমান হওয়ায় সেই স্থলীয় হেতু ও অল্পমান (৩) অম্বয়ব্যতিরেকী। যেমন পক্ষতে বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া বহির অল্পমান স্থলে পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষ আছে এবং জল প্রভৃতি বিপক্ষও আছে। ঐ স্থলে যে স্থানে বিশিষ্ট ধূম আছে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি আছে, যেমন পাকশালা—এইরূপে অম্বয়ী উদাহরণের সাহায্যে বিশিষ্ট ধূমে বহির অম্বয়ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। এবং যে যে স্থানে বহি নাই, সেই সমস্ত স্থানে বিশিষ্ট ধূম নাই, যেমন জল—এইরূপে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে হেতু ও অল্পমান অম্বয়ব্যতিরেকী।

উদ্যোতকর মহর্ষি-স্মৃক্তোক্ত দ্বিবিধ অল্পমানের প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। অল্পমানের এইরূপ প্রকারত্বের ব্যাখ্যা পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকদিগেরই উদ্ভাবিত নহে।

“তত্ত্বচিন্তামণি”কৰ গদ্যেৰ উদ্যোতকৰেৰ ব্যাখ্যা গ্ৰহণ কৰিয়াই অহুমানকে পূৰ্বোক্তৰূপে ত্ৰিবিধ বলিয়া তাহাৰ বিশদ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। প্ৰদৰ্শিত “ব্যতিৰেকী” অহুমানৰ উদাহৰণস্থলে কোন জীৱিত ব্যক্তিৰ শৰীৰে সাত্ত্বিকৰ নিশ্চয় অবস্থা স্বীকাৰ্য্য বলিয়া সেই শৰীৰবিশেষই “সপক” আছে, তাহাই “অম্বৰী উদাহৰণ” হইবে, তাহাৰ সাহায্যে “অম্বৰব্যাপ্তি”ৰ নিশ্চয় কৰিয়াই অৰ্থাৎ “বাহা বাহা প্ৰাণাদিযুক্ত, সে সমস্তই সাত্ত্বিক, যেমন আমাৰ শৰীৰ” — এইৰূপে “প্ৰাণাদিমত্ব” হেতুতে “সাত্ত্বিক”ৰূপ সাধ্য ধৰ্ম্মেৰ “অম্বৰব্যাপ্তি” নিশ্চয় পূৰ্বকই জীৱিত ব্যক্তিৰ শৰীৰমায়ে সাত্ত্বিকত্বৰ অহুমান হইতে পারে, সূতৰাং “ব্যতিৰেকী” বা “কেবলব্যতিৰেকী” নামে কোন প্ৰকাৰ হেতু বা অহুমান নাই, এই কথা বলিয়া অনেকে উহা মানেন নাই। প্ৰাচীন কাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্ৰদায়ে উহা লইয়া বহু বিচাৰ হইয়া গিয়াছে। “তত্ত্বচিন্তামণি”কৰ গদ্যেৰ “ব্যতিৰেক্যহুমান” গ্ৰেছে সেই সমস্ত বিচাৰেৰ বিস্তৃত প্ৰকাশ কৰিয়াছেন। গদ্যেৰ চৰম কথা বলিয়াছেন যে, যদিও এইৰূপ স্থলে কোনপ্ৰকাৰে “অম্বৰব্যাপ্তি” নিশ্চয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা বেধানে হয় নাই, কেবলমাত্ৰ “ব্যতিৰেকী উদাহৰণে”ৰ সাহায্যে “ব্যতিৰেকব্যাপ্তি” নিশ্চয়ই হইয়াছে, সেখানেও অহুমিতি হইয়া থাকে, ইহা অহুভবসিদ্ধ। অন্ততঃ সেইৰূপ স্থলেও “কেবলব্যতিৰেকী” অহুমান অবশ্য স্বীকাৰ্য্য। নীমাংসকগণ এইৰূপ স্থলে অহুমিতি স্বীকাৰ করেন নাই; তাহাৰা এইৰূপ স্থলে “অৰ্থাপত্তি” নামে অতিৰিক্ত প্ৰমাণ ও প্ৰমিতি স্বীকাৰ কৰিয়াছেন। গদ্যেৰ তাহাৰ “অৰ্থাপত্তি” গ্ৰেছে সেই মতেৰও বিশদ বিচাৰপূৰ্বক খণ্ডন কৰিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক যযুনাথ শিৰোমণি নীমাংসক-মত-পক্ষপাতী হইয়া নিজে কেবল মাত্ৰ “অম্বৰী” অহুমানৰই ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। তাহাৰ মতে সৰ্ব্বত্ৰ “অম্বৰব্যাপ্তি” নিশ্চয়পূৰ্বকই অহুমান হয়, এ জন্ত অহুমানমাত্ৰই “অম্বৰী”। গদ্যেৰে প্ৰদৰ্শিত “ব্যতিৰেকী” অহুমান স্থলে যযুনাথ নীমাংসকদিগেৰ জ্ঞান “অৰ্থাপত্তি” নামে অতিৰিক্ত জ্ঞানই স্বীকাৰ কৰিয়াছেন। কিন্তু যযুনাথৰ এই মত প্ৰকৃত জ্ঞানমত নহে। উহা গোতম মত-বিকল্প। কাৰণ, মহৰ্ষি গোতম দ্বিতীয়াধ্যায়ে নীমাংসক-সম্মত “অৰ্থাপত্তি”ৰ প্ৰমাণান্তৰত্ব খণ্ডন কৰিয়া “অৰ্থাপত্তি”কে অহুমানৰ মধ্যেই নিবিষ্ট কৰিয়াছেন।

গদ্যেৰে পূৰ্ববৰ্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্যও হেতু ও অহুমানকে পূৰ্বোক্ত নামত্বেৰে ত্ৰিবিধ বলিয়াছেন। তবে তিনি “ব্যতিৰেকব্যাপ্তি” জ্ঞানকে অহুমিতিৰ কাৰণৰূপে মানেন নাই। “অৰ্থাপত্তি” নামেও অতিৰিক্ত প্ৰমাণ মানেন নাই। তাহাৰ মতে সৰ্ব্বত্ৰ “অম্বৰব্যাপ্তি”ৰ নিশ্চয়-পূৰ্বকই অহুমিতি হয়। ঐ অম্বৰব্যাপ্তিনিশ্চয় বে স্থলে “অম্বৰসহচাৰ” মাত্ৰ জ্ঞানজন্ত হয়, সেই স্থলীৰ অহুমান “অম্বৰী”। এবং বেধানে উহা “ব্যতিৰেকসহচাৰ” মাত্ৰ জ্ঞানজন্ত হইবে, সেই স্থলীৰ অহুমান “ব্যতিৰেকী”। এবং “অম্বৰসহচাৰ” ও “ব্যতিৰেকসহচাৰ” এই দ্বিবিধ “সহচাৰ” জ্ঞানজন্ত হইলে সেই স্থলীৰ অহুমান “অম্বৰব্যতিৰেকী”। সাধ্যযুক্ত স্থানে হেতু

১। ব্যতিৰেকসহচাৰেণ অম্বৰব্যাপ্তিঃ সৰ্বথাঃ (অহুমিতিবোধিত)। — তথাচ ব্যতিৰেকব্যাপ্তিজ্ঞানং হেতুৰেব ন, কৃতং তদ্ব্যাপ্তিৰিত্যবাপ্তিৰিত্যভিঃ। অম্বৰ ব্যতিৰেক-পৰামৰ্শজন্ত-বুদ্ধেৰ অৰ্থাপত্তিঃ প্ৰমাণমাত্ৰঃ। বিহ্বাঃ। আচাৰ্য্যোক্তাঃ।

আছে, এইরূপ জ্ঞানের নাম “অদ্বয়সহচারজ্ঞান”। সাধ্যশূন্য স্থানে হেতু নাই, এইরূপ জ্ঞানের নাম “ব্যতিরেক সহচারজ্ঞান”। এই “সহচারজ্ঞান” ব্যাপ্তিজ্ঞানের অন্ততম কারণ। উদয়নাচাৰ্য্য ঐ ব্যাপ্তিগ্রাহক “সহচারে”র ভেদেই অল্পমানকে পূৰ্ব্বোক্ত নামত্রে জিবিব বলিয়াছেন। উদয়নের মতে “ব্যতিরেকসহচার” জ্ঞানের দ্বারা “অদ্বয়ব্যাপ্তি”র নিশ্চয় পূৰ্ব্বকই অল্পমিতি জন্মে, ইহা নব্য ত্রায়ের অনেক গ্রন্থে পরিস্ফুট আছে। উদয়নের “জ্ঞানকুসুমাজ্জলি” গ্রন্থে (তৃতীয় স্তবকে) অৰ্থাপত্তি বিচারে কিন্তু ইহা পরিস্ফুট নাই।

উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী শ্রায়চাৰ্য্যগণ পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে হেতু ও অল্পমান বিষয়ে নানা মতভেদের সৃষ্টি করিলেও ভাষ্যকার পূৰ্ব্বোক্ত জিবিব নাম ও তাহানির্গের ঐরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকারের মতে হেতু দ্বিবিধ ;—সাধ্যম্ হেতু এবং বৈধর্ম্য হেতু। হেতুবাক্যও পূৰ্ব্বোক্ত নামদ্বয়ে দ্বিবিধ। উদাহরণের ভেদেই হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ হইয়া থাকে। পূৰ্ব্ব-প্রদর্শিত “উৎপত্তিদ্ব্যর্থকত্বাৎ” এই প্রকার হেতুবাক্যটি সাধ্যম্যোদাহরণ স্থলে সাধ্যম্ হেতুবাক্য হইবে এবং বৈধর্ম্যোদাহরণ স্থলে উহা বৈধর্ম্যহেতুবাক্য হইবে। ফলকথা, উদাহরণের ভেদে এক আকারের হেতুবাক্যেরও পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারভেদ হইবে এবং তাহা হইতে পারে। উদ্যোতকর এই কথার উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, উদাহরণের ভেদে হেতুবাক্যের ঐ প্রকার ভেদই মহাবির বিবক্ষিত হইলে, মহাবির পরবর্তী বৈধর্ম্যোদাহরণস্থত্রের দ্বারাই এই ভেদ ব্যক্ত হইতে পারে ; সুতরাং মহাবির এই সূত্রটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার ইহা মনে করেন নাই। কারণ, হেতুবাক্য দ্বিবিধ, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তও মহাবির এখানে এই সূত্রটি বলা আবশ্যক। সুতরাং মহাবি এখানে যথাক্রমে দুইটি সূত্রের দ্বারাই দ্বিবিধ হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। ফলকথা, প্রকৃত স্থলে উদাহরণস্থত্রের দ্বারা হেতুর দ্বিবিধ বৃদ্ধা গেলেও, মহাবি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ত অর্থাৎ হেতু জিবিব- নহে, দ্বিবিধ, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্ত এই সূত্রটি বলিয়াছেন। উদ্যোতকরও হেতুভাসের লক্ষণ-সূত্রগুলির প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে পূৰ্ব্বস্থত্রে বলিয়াছেন যে, যদিও এই হেতুলক্ষণের দ্বারাই হেতুপদার্থের অবধারণ হওয়ার, হেতুভাসগুলি নিরাকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ সেগুলি হেতু নহে, সেগুলি “হেতুভাস” ইহা বৃদ্ধা গিয়াছে অর্থাৎ যদিও হেতুপদার্থের লক্ষণ বৃদ্ধিলেই “হেতুভাসে”র স্বরূপ বৃদ্ধা যায়, তথাপি “অনৈকান্তিক” প্রভৃতি নামে এই “হেতুভাস”গুলি পঞ্চবিধ,—এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তই মহাবি যথাস্থানে “হেতুভাসে”র পাঁচটি লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। উদ্যোতকরের এই কথার জ্ঞান এখানেও ভাষ্যকারের পক্ষে ঐরূপ কথা বলা ঘাইতে পারে। ফলকথা, মহাবি বাক্যসংক্ষেপ না করিয়া অস্ত্র স্থলের জ্ঞান এখানেও দুইটি সূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ হেতুবাক্যেরই লক্ষণ বলিয়াছেন এবং উদাহরণের ভেদেই হেতুবাক্যের এই দ্বিবিধ মহাবির বিবক্ষিত, ইহাই ভাষ্যকারের কথা। হেতুপদার্থ এবং হেতুবাক্য যে ভাষ্যকারের মতে পূৰ্ব্বোক্তরূপে দ্বিবিধ এবং একই হেতুপদার্থ উদাহরণের ভেদে “সাধ্যম্-হেতু” এবং “বৈধর্ম্য হেতু” হইতে পারে, ইহা নিগমন-সূত্র-ভাষ্যেও স্পষ্ট আছে। “সাধ্যম্ বৈধর্ম্য হেতু” বা “অদ্বয়ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু ভাষ্যকার মানেন নাই।

একই স্থানে দ্বিবিধ উদাহরণের সাহায্যে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তিনিশ্চয়কে অল্পমিত্রের কারণ বলিয়া স্বীকার করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। কোন কোন নব্য নৈয়ায়িকও তাহা আবশ্যক মনে না করিয়া “অব্যব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু বা অনুমান মানেন নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি বাহ্যকে “অব্যব্যতিরেকী” হেতু বলিয়াছেন, ভাষ্যকারের মতে তাহা “সাধর্ম্য হেতু”ও হইতে পারে, “বৈধর্ম্য হেতু”ও হইতে পারে। ভাষ্যকার “শেষবৎ” অনুমানের যাহা উদাহরণ দেখাইয়া আসিয়াছেন, উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহা গ্রহণ করেন নাই (পঞ্চম স্বত্রভাষ্য-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। সেখানে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, “শেষবৎ” অনুমান “ব্যতিরেকী” অনুমানেরই নামান্তর। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত “শেষবৎ”র উদাহরণটি “অব্যব্যতিরেকী”, সূত্রায় উহা গ্রাহ্য নহে। ভাষ্যকার কিন্তু “পরিশেষ” অনুমানকেই “শেষবৎ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই স্থলীয় হেতু উদাহরণানুসারে “সাধর্ম্য হেতু”ও হইতে পারে, “বৈধর্ম্য হেতু”ও হইতে পারে। ফলকথা, “পরিশেষ” অনুমান বা ভাষ্যকার-ব্যাখ্যাত “শেষবৎ” অনুমান সর্বত্র “ব্যতিরেকী” অনুমানই হইবে, অর্থাৎ উহা “ব্যতিরেকী” অনুমানেরই নামান্তর, ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হয় নাই। সূত্রায় ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে তাহার ঐ উদাহরণ অসংগত হয় নাই।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথও হেতুবাক্যকে “অব্যব্যতিরেকী” ও “ব্যতিরেকী” নামে দ্বিবিধ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্র “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা “অব্যব্যাপ্তি” এবং “বৈধর্ম্য” শব্দের দ্বারা “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” কলিতার্থ গ্রহণ করিয়া স্বত্রস্থয়ের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে দ্বিবিধ ব্যাপ্তির ভেদেই হেতু দ্বিবিধ। এক হেতুতে দ্বিবিধ ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলে, সেই স্থলীয় হেতুবাক্যের নাম “অব্যব্যতিরেকী”, মহর্ষি-স্বত্রে তাহাও স্মৃতিত হইয়াছে; ইহা মতান্তর বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বৃত্তিকারের নিজের মত নহে।

“ভ্রামরভট্ট”র জয়ন্ত ভট্ট এখানে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিয়াই হেতুবাক্যের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। হেতুপদার্থ কি, তাহা বলা প্রয়োজন এবং হেতুপদার্থের স্বরূপ বুঝিলে-হেতুবাক্যের লক্ষণ সহজেই বুঝা যাইবে এবং “অব্যব্য” প্রকরণ-বশতঃ শেষে তাহাই বুঝিতে হইবে। হেতুপদার্থের লক্ষণপক্ষে কেহ কেহ হেতুলক্ষণস্বত্বের পঞ্চমী বিভক্তি ত্যাগ করিয়া, ঐ স্থলে সপ্তমী বিভক্তিবৃত্ত স্বত্র পাঠ করিতেন, এই কথা বলিয়া জয়ন্ত ভট্ট হেতুপদার্থের লক্ষণপক্ষেও স্বত্রে পঞ্চমী বিভক্তির কথঞ্চিৎ সংগতি ও আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন।

জয়ন্তভট্ট আরও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম অনুমানস্বত্রে (পঞ্চম স্বত্রে) “তৎপূর্বকং” এই কথার দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়মাত্র সূচনা করিয়াছেন। এখানে হেতুলক্ষণস্বত্রে “সাধ্য-সাধন” শব্দের দ্বারা ঐ “ব্যাপ্তি”র স্বরূপও সূচনা করিয়াছেন এবং “হেতুভাস”কে পঞ্চবিধ বলিয়া “ব্যাপ্তি” পঞ্চবিধ, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। এক একটি “ব্যাপ্তি”র অভাবেই এক একটি “হেতুভাস” হওয়ায়, “হেতুভাস” পঞ্চবিধ হইয়াছে। “হেতুভাস”র কোন লক্ষণ না থাকাই “ব্যাপ্তি”। তাহাই হেতুর সাধ্যসাধনতা। বাহা সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট,

তাহাই প্রকৃত হেতু। “হেতুভাস” পদার্থে সাধ্যসাধনতা অর্থাৎ সাধের “ব্যাপ্তি” নাই, এ জ্ঞাত সেগুলি হেতু নহে। ফলকথা, মহর্ষি হেতুলক্ষণস্থিত “সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারা “ব্যাপ্তি”কেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং হেতু পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্বস্থিত “উদাহরণ-সাধ্যম্ভাস” এই কথার দ্বারা এবং এই স্থানের দ্বারা বথাক্রমে “অময়ব্যতিরেকী” ও “কেবলব্যতিরেকী” হেতুর বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন। “কেবলময়ী” নামে কোন হেতু নাই; মহর্ষি তাহা বলেন নাই। কোন সম্প্রদায় একমাত্র “অময়ব্যতিরেকী” হেতুই স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম ছই স্থানের দ্বারা “অময়ব্যতিরেকী” হেতুরই লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, “কেবলময়ী” এবং “কেবলব্যতিরেকী” নামে কোন প্রকার হেতু নাই, উহা স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মহর্ষি পূর্বস্থিত দ্বারা “অময়” এবং পরস্থিত দ্বারা “ব্যতিরেক” নিরূপণ করিয়া ছই স্থানে এক বাক্যে “অময়ব্যতিরেকী” হেতুরই নিরূপণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারেরও তাহাই মত। কারণ, ভাষ্যকার “কিমৈতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি, নেতুত্যাতে” এই কথার দ্বারা এই স্থানের অবতারণা করিয়া পূর্বস্থিতের সহিত এই স্থানের একবাক্যভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উভয় স্থানে তিনি হেতুবাক্যের একই প্রকার উদাহরণ বলিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত হেতুবাক্যটি দ্বিবিধ উদাহরণের যোগে “অময়ব্যতিরেকী”। সূত্রায় বুঝা যায়, ভাষ্যকারও একমাত্র “অময়ব্যতিরেকী” হেতুই মহর্ষির সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জয়ন্তভট্ট এই মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, “কেবলব্যতিরেকী” হেতু অবশ্য স্বীকার্য, নচেৎ আত্মা প্রভৃতি পদার্থসাধন সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার পূর্বে (অনুমান-স্থত্র ভাষ্যে) আত্মার অনুমানে “কেবলব্যতিরেকী” হেতুকেই আশ্রয় করিয়াছেন, সূত্রায় “কেবলব্যতিরেকী” হেতু ভাষ্যকারেরও সম্মত বলিয়া বুঝা যায়। তাহা হইলে এই স্থানের দ্বারা ভাষ্যকার সেই “কেবলব্যতিরেকী” হেতুরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতেই হইবে। ফলকথা, জয়ন্তভট্ট “কেবলব্যতিরেকী” হেতুর সমর্থন করিয়া হেতুকে “অময়ব্যতিরেকী” এবং “কেবলব্যতিরেকী” এই নামদ্বয়ে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। “কেবলময়ী” বা “অময়ী” নামে কোন হেতু বা অনুমান মানেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষি ছই স্থানের দ্বারা একযোগে একপ্রকার হেতুর লক্ষণই বলেন নাই। একমাত্র লক্ষণই তাহার বক্তব্য হইলে, তিনি এক স্থানের দ্বারাই তাহা বলিতেন। মহর্ষি অস্ত্রত্বও ছই স্থানের দ্বারা একমাত্র লক্ষণ বলেন নাই। পরন্তু ভাষ্যকারের মতে হেতু যে দ্বিবিধ, ইহা নিগমন-স্থত্রভাষ্যে স্পষ্ট আছে, সূত্রায় ভাষ্যকার হেতুকে একপ্রকার বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা কখনই বলা যায় না। এবং নিগমন-স্থত্রভাষ্যে ভাষ্যকার পৃথকভাবে দ্বিবিধ হেতুবাক্যের প্রয়োগ প্রদর্শন করায়, তিনি যে একই স্থলে “অময়ব্যতিরেকী” নামে একপ্রকার হেতুবাক্যই এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। (নিগমনস্থত্র-ভাষ্য জটব্য)। ভাষ্যকার “অময়ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু মানেন নাই, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জয়ন্তভট্টের স্থত্র ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই যে, হেতুপদার্থের লক্ষণ পক্ষে স্থিত পঞ্চমী বিভক্তির সম্যক

সংগতি হয় না। পরন্তু “অবয়ব” প্রকরণবশতঃ এখানে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই মহাবীর মুখ্য বক্তব্য, সুতরাং এই ছই স্বত্রের দ্বারা প্রকরণাহসারে হেতুবাক্যের লক্ষণই মুখ্যতঃ বুঝিতে হইবে। তাহাতে হেতুপদার্থের স্বরূপ এবং ভেদও বুঝা যাইবে। প্রাচীন জ্ঞানার্চা উদ্যোতকরও হেতুবাক্যের লক্ষণ পক্ষেই স্বত্রার্থ বর্ণন করিয়া ইহার দ্বারাই হেতুপদার্থের স্বরূপও প্রকটিত হইয়াছে, ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। হেতুবাক্যে যে পক্ষমী বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়, ঐ পক্ষমী বিভক্তির দ্বারাই সেখানে হেতুপদার্থের হেতু বা জ্ঞাপক বুঝা যায়। পক্ষমী বিভক্তির ঐরূপ অর্থে “নিরূপলক্ষণা” থাকায় হেতুবাক্যে পক্ষমী বিভক্তিরই প্রয়োগ করিতে হইবে।

“তত্ত্বচিন্তামনি”কার গঙ্গেশ বলাইছেন যে, হেতুবাক্যস্থলে সর্বত্র হেতুবোধক শব্দের হেতুজ্ঞানে লক্ষণাই বাদীর অভিপ্রেত। কারণ, হেতুপদার্থের জ্ঞানই বস্তুতঃ অনুমানে হেতু হইয়া থাকে। হেতুপদার্থ অনুমানের হেতু হয় না। সুতরাং পক্ষমী বিভক্তির অর্থ যে হেতু, তাহাতে হেতুপদার্থের অর্থ সম্ভব নাহে বলিয়া, হেতুবোধক শব্দের দ্বারা লক্ষণার সাহায্যে হেতুজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং পক্ষমী বিভক্তির দ্বারা সেখানে “জ্ঞাপ্যত্ব” বুঝিতে হইবে। যেমন “পর্যন্তো বহিমান্” এইরূপ প্রতিজ্ঞার পরে “ধূমঃ” এইরূপ হেতুবাক্য বলিলে, সেখানে “ধূম” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—ধূমজ্ঞান। পক্ষমী বিভক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে—জ্ঞাপ্যত্ব, ধূমজ্ঞান বহির জ্ঞান জন্মায়, এ জ্ঞান ধূমজ্ঞানটি জ্ঞাপক, বহি তাহার জ্ঞাপ্য। তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের মিলনে উহার দ্বারা বুঝা যাইবে—“ধূমজ্ঞানের জ্ঞাপ্য যে বহি, সেই বহিবিশিষ্ট পর্যন্ত”। দীর্ঘতিকা রঘুনাথ শিরোমণি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মিলনে একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ জন্মে, এই প্রাচীন মত স্বীকার না করিলেও “প্রতিজ্ঞা” ও “হেতুবাক্য”র একবাক্যতা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি হেতুবাক্যস্থ হেতুবোধক শব্দের হেতুজ্ঞানে লক্ষণা স্বীকার করেন নাই। তিনি গঙ্গেশের ঐ মতের অপরিহার্য অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। রঘুনাথ নব্য মত বলিয়া নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন হেতুবাক্যস্থ পক্ষমী বিভক্তিতেও লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে, তখন ঐ পক্ষমী বিভক্তির দ্বারাই লক্ষণার সাহায্যে “জ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব”রূপ অর্থ বুঝিয়া “প্রতিজ্ঞা” ও “হেতুবাক্য”র মিলনে পূর্বোক্ত প্রকার বোধ হইতে পারে। সুতরাং সর্বত্র হেতুবাক্যস্থ পক্ষমী বিভক্তিতেই “জ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব”রূপ অর্থে লক্ষণা বুঝিতে হইবে। হেতুবোধক শব্দের দ্বারা হেতুপদার্থই বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন মতে সর্বত্র হেতুবাক্যস্থ পক্ষমী বিভক্তির অর্থ হেতু বা সাধনত্ব। উহার ফলিতার্থ—জ্ঞাপকত্ব। ঐ জ্ঞাপকত্বের সহিত হেতুপদার্থ ও সাধ্য শব্দের সম্বন্ধবিশেষে অর্থ বোধই প্রাচীন-দিগের সম্মত। সুতরাং “ধূমঃ” এইরূপ বাক্যের দ্বারা ধূমরূপ হেতুপদার্থের যে জ্ঞাপকত্ব, তাহা বুঝা যায়, অর্থাৎ “ধূম জ্ঞাপক” ইহা বুঝা যায়। তাহাতেই নব্যের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয়। জ্ঞাপকত্ব বলিতে এখানে জ্ঞানজনক জ্ঞানের বিষয়ত্ব। সুতরাং উহা হেতুপদার্থেই থাকে।

১। হেতুবাক্যে পক্ষমী লক্ষণিক।—অবয়ববীতি। হেতুবা জ্ঞাপকত্ব: আদিবা জ্ঞাপ্যত্ব: পরিগ্রহঃ—জ্ঞাপ্যত্ব।

ভাষাকারের প্রদর্শিত “উৎপত্তিধর্মকল্প” এই বাক্যের দ্বারা উৎপত্তিধর্মকল্প জ্ঞাপক, ইহা বুঝা যায়। ৩৫।

সূত্র । সাধ্যসাধ্যাত্ত্বধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । সাধ্যধর্ম্যের সহিত সমানধর্ম্য প্রযুক্ত সেই সাধ্যধর্ম্যের ধর্ম্যটি যেখানে বিদ্যমান থাকে, এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ, (সাধ্যোদাহরণ-বাক্য) ।

বিস্তৃতি । যে ধর্ম্যবিশিষ্ট বলিয়া যে ধর্ম্যকে অহুমানের দ্বারা বুঝাইতে হইবে সেই ধর্ম্যবিশিষ্ট সেই ধর্ম্যকে বলে “সাধ্যধর্ম্য” এবং সেই ধর্ম্যতে সেই ধর্ম্যটিকে বলে “সাধ্যধর্ম” । “সাধ্য” বলিলে এই সাধ্য ধর্ম্য অথবা এই “সাধ্যধর্ম”কে বুঝিতে হইবে । যেমন নৈয়ায়িক শব্দরূপ ধর্ম্যকে অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্যবিশিষ্ট বলিয়া অহুমানের দ্বারা বুঝাইতে গেলে, সেখানে অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দই নৈয়ায়িকের “সাধ্যধর্ম্য” এবং ঐ অনিত্যত্ব ধর্ম্যই “সাধ্যধর্ম” । নৈয়ায়িক প্রথমতঃ (১) “শব্দ অনিত্য”, এই কথার দ্বারা ঐ সাধ্যধর্ম্যকে প্রকাশ করিবেন । উহারই তাহার “সাধ্যনির্দেশ”, উহারই নাম “প্রতিজ্ঞা” । পরে শব্দ অনিত্য অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব ধর্ম্য আছে, তাহার জ্ঞাপক কি ? এই প্রশ্নগ্রন্থারে নৈয়ায়িক বলিবেন,—(২) উৎপত্তিধর্মকল্প জ্ঞাপক, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকল্পরূপ ধর্ম্যটি শব্দে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক । নৈয়ায়িকের এই দ্বিতীয় বাক্যই (উৎপত্তিধর্মকল্প জ্ঞাপক) তাহার হেতুবাক্য ।

যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, উৎপত্তি তাহাদিগের ধর্ম্য । সূত্রায়ং সেই সকল পদার্থকে “উৎপত্তিধর্মক” বলা যায় । তাহা হইলে সেই সকল পদার্থে “উৎপত্তিধর্মকল্প” নামে ধর্ম্য আছে, এ কথাও বলা যায় । নৈয়ায়িকের বক্তব্য এই যে, যে পদার্থ উৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা অনিত্য পদার্থ । শব্দের বখন উৎপত্তি হয়, তখন শব্দও অনিত্য পদার্থ, শব্দ কখনই নিত্য পদার্থ হইতে পারে না । উৎপত্তি হইলেই যে সে পদার্থ অনিত্য হইবে, তাহা বুঝিব কিরূপে ? এ জন্ত নৈয়ায়িক শেষে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন । নৈয়ায়িক বলিবেন যে, (৩) “বাহ্য উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনিত্য ; যেমন স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য” । নৈয়ায়িকের ঐ কথার তাৎপর্যার্থ এই যে, যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেগুলিকে ত অনিত্যই দেখা যায় । ঐ যে কুস্তকারগণ স্থালী প্রভৃতি (হাড়ী কলস প্রভৃতি) প্রস্তুত করিতেছে, ঐগুলি কি নিত্য পদার্থ ? ঐগুলি ত সর্বদক্ষত অনিত্য পদার্থ । উহাদিগের উৎপত্তি হইতেছে, সুতরাং উহার উৎপত্তিধর্মক । তাহা হইলে ঐ সকল দৃষ্টান্তেই বুঝা গেল যে, উৎপত্তিধর্মক হইলেই সে পদার্থ অনিত্য হইবে । অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকল্প সাধন এবং অনিত্যত্ব তাহার সাধ্যধর্ম, ইহা ঐ সকল দৃষ্টান্তেই বুঝা গিয়াছে । নৈয়ায়িকের ঐ তৃতীয় বাক্যের নাম “উদাহরণ-বাক্য” । এই স্থলে “উৎপত্তিধর্মকল্প” এই ধর্ম্যটি নৈয়ায়িকের সাধ্যধর্ম্য অনিত্য শব্দ এবং স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত,—এই উভয়েই আছে ;

কোন নিত্য পদার্থে নাই, এ জন্ত এই ধর্মটি সাধ্যধর্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের “সাধ্যম্য” বা সমান ধর্ম। এই উৎপত্তিধর্মকল্পরূপ সাধ্যম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ এই ধর্মটি আছে বলিয়া, স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে অনিত্যত্ব ধর্ম বিদ্যমান আছে। ফলিতার্থ এই যে, এই উৎপত্তিধর্মকল্প থাকিলেই যেখানে অনিত্যত্ব ধর্ম বিদ্যমান থাকে, ইহা এই স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বুঝা গিয়াছে; তাহা হইলে এই দৃষ্টান্তের বোধক পূর্বোক্ত প্রকার তৃতীয় বাক্য নৈয়ায়িকের “উদাহরণ-বাক্য” হইবে। এই উদাহরণ-বাক্য পূর্বোক্তরূপ সাধ্যম্য-প্রযুক্ত বলিয়া উহাকে বলে “সাধ্যম্যোদাহরণ-বাক্য।”

ভাষ্য। সাধ্যেন সাধ্যম্যং সমানধর্মতা, সাধ্যসাধ্যম্যং কারণাৎ তদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত ইতি। তস্মৈ ধর্মস্তদ্ধর্মঃ। তস্মৈ, সাধ্যম্য। সাধ্যক্ দ্বিবিধঃ,—ধর্মবিশিষ্টো বা ধর্মঃ শব্দস্থানিত্যত্বঃ, ধর্মবিশিষ্টো বা ধর্মো, অনিত্যঃ শব্দ ইতি। ইহোত্তরং তদগ্রহণেন গৃহ্যত ইতি। কস্মাৎ? পৃথগ্ধর্মবচনাৎ। তদ্ধর্মস্য ভাবস্তদ্ধর্মভাবঃ, স যস্মিন্ দৃষ্টান্তে বর্ততে স দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাধ্যম্যাদুৎপত্তিধর্মকল্পাৎ তদ্ধর্মভাবী ভবতি, স চোদাহরণ-মিষ্যতে। তত্র যদুৎপাদ্যতে তদুৎপত্তিধর্মকং, তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি আত্মনাং জহাতি নিরুধ্যত ইত্যনিত্যম্। এবমুৎপত্তিধর্মকল্পং সাধন-মনিত্যত্বং সাধ্যং, সোহয়মেকস্মিন্ দ্বয়োদ্ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবঃ সাধ্যম্যাদব্যবস্থিত উপলভ্যতে, তং দৃষ্টান্তে উপলভমানঃ শব্দেহ-প্যনুমিনোতি, শব্দোহপ্যুৎপত্তিধর্মকল্পাদনিত্যঃ স্থালাদিবদिति।

উদাহ্রিয়তে তেন ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাব ইত্যুদাহরণম্।

অনুবাদ। সাধ্যধর্মীর সহিত অর্থাৎ যে ধর্মীকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই ধর্মীর সহিত সাধ্যম্য কি না—সমান-ধর্মতা অর্থাৎ সমান ধর্ম। সাধ্যসাধ্যম্যরূপ প্রয়োজকবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মীর সমান ধর্মটি আছে বলিয়া, সেই সাধ্যধর্মীর ধর্মটি (সাধ্যধর্মটি) যেখানে বিদ্যমান আছে, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হয়। (“তদ্ধর্মভাবী” এই সূত্রোক্ত বাক্যের পদার্থ বর্ণন-পূর্বক ব্যাখ্যা করিতেছেন)। তাহার ধর্ম “তদ্ধর্ম”। তাহার কি না—সাধ্যের অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মীর। “সাধ্য” কিন্তু দ্বিবিধ, (১) ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম অর্থাৎ কোন ধর্মিগত কোন ধর্ম, (যেমন) শব্দের অনিত্যত্ব অর্থাৎ শব্দরূপ ধর্মিগত অনিত্যত্বধর্ম। (২) অথবা ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী (যেমন) অনিত্য শব্দ অর্থাৎ অনিত্যত্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট শব্দরূপ ধর্মী। এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা উত্তরটি

অর্থাৎ শেখোক্ত ধর্মবিশিষ্ট ধর্মরূপ সাধ্য বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) “ধর্ম” শব্দের পৃথক উল্লেখবশতঃ। অর্থাৎ সূত্রে “তদ্ব্যবহারী” এই স্থলে “তৎ” শব্দের দ্বারা যদি সাধ্য ধর্ম বুঝানই মহাবীর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আর “ধর্ম” শব্দ পৃথক বলিতেন না, “তদ্ব্যবহারী” এইরূপই বলিতেন। তদ্ব্যবহারী ভাব “তদ্ব্যবহারী”। তাহা অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্মের ধর্ম যে সাধ্যধর্ম, তাহার ভাব কি না—বিদ্যমানতা যে দৃষ্টান্ত পদার্থে আছে, সেই দৃষ্টান্ত (প্রদর্শিত স্থলে) উৎপত্তি-ধর্মকরূপ সাধ্যসাধ্য প্রযুক্ত “তদ্ব্যবহারী” আছে। (অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকরূপ ধর্ম আছে, উহা সাধ্যধর্ম অনিত্য শব্দেও আছে, সুতরাং ঐ ধর্মটি শব্দ ও স্থানী প্রভৃতির সমান ধর্ম এবং ঐ ধর্মটি থাকিলেই সেখানে অনিত্য-ধর্ম থাকে, ইহা স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বুঝা গিয়াছে। এ জন্ম পূর্বোক্ত উৎপত্তিধর্মকরূপ সমান ধর্ম প্রযুক্ত স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত “তদ্ব্যবহারী” অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মের ধর্ম যে অনিত্য, তাহার ভাব কি না—বিদ্যমানতা ঐ দৃষ্টান্তে আছে)। তাহাই অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্তবোধক বাক্যবিশেষই উদাহরণ বলিয়া অর্থাৎ “সাধ্যোদাহরণ বাক্য” বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে।

সেই স্থলে অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা বিদ্যমান থাকিয়া অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বেও যে কোনরূপে বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না (এবং) আত্মাকে অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে ত্যাগ করে, নিরূপক হয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহার কোনরূপ সত্তা থাকে না, এজন্ম অনিত্য। এইরূপ হইলে উৎপত্তিধর্মক হেতু, অনিত্য সাধ্যধর্ম। ধর্মবয়ের অর্থাৎ অনিত্য এবং উৎপত্তিধর্মক এই দুইটি ধর্মের সেই এই সাধ্য-সাধন-ভাব সাধ্যপ্রযুক্ত ব্যবস্থিত বলিয়া এক পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে উপলব্ধি করে। তাহাকে অর্থাৎ ঐ দুইটি ধর্মের পূর্বোক্ত সাধ্যসাধন ভাবে দৃষ্টান্ত পদার্থে উপলব্ধিকরতঃ শব্দেও অনুমান করে। (কিরূপ অনুমান করে, তাহা বলিতেছেন) শব্দও উৎপত্তিধর্মক বলিয়া স্থানী প্রভৃতির দ্বারা (হাড়ী কলস প্রভৃতি উৎপত্তি-ধর্মক বস্তুর দ্বারা) অনিত্য।

তাহার দ্বারা অর্থাৎ সেই বাক্যবিশেষের দ্বারা ধর্মবয়ের সাধ্যসাধন-ভাব উদাহৃত (প্রদর্শিত) হয়, এজন্ম “উদাহরণ” অর্থাৎ “উদাহরণ” শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তিভা অর্থ গ্রহণ করিয়া, উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে—উদাহরণ-বাক্য এবং উহার দ্বারাই উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

টিপ্পন। “প্রতিজ্ঞা”-বাক্যের পরেই “হেতু”-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া সেই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। কারণ, যাহা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য বা ব্যতিচারী পদার্থ, তাহা হেতু হয় না। ঐ ব্যাপ্তি প্রদর্শন উদাহরণ-বাক্য ব্যতীত হয় না, এ জ্ঞাত মহর্ষি হেতু-বাক্যের লক্ষণের পরেই ক্রমপ্রাপ্ত “উদাহরণ-বাক্যের” লক্ষণ বলিয়াছেন। “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থও বুঝা যায়; কিন্তু এখানে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা “উদাহরণ-বাক্য” বুঝিতে হইবে। কারণ, মহর্ষি “উদাহরণ” নামক তৃতীয় অবয়বের লক্ষণই এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। “অবয়ব” বাক্যবিশেষ, স্মরণ্য দৃষ্টান্ত পদার্থ “অবয়ব” হইতে পারে না। যে বাক্যের দ্বারা দুইটি ধর্মের সাধ্যসাধন-ভাব উদাহৃত অর্থাৎ প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা ইহা “উদাহরণ” নামক তৃতীয় অবয়বের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকারও সর্বশেষে সূত্রোক্ত “উদাহরণ” শব্দের পূর্কোক্ত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া, মহর্ষি-সূচিত উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এই উদাহরণ-বাক্য ত্রিবিধ;— “সাধ্যম্যোদাহরণ” এবং “বৈধর্ম্যোদাহরণ”। উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী স্মার্যচাৰ্য্যগণ যথাক্রমে ইহাকেই বলিয়াছেন—“অদ্বয়ী উদাহরণ” এবং “ব্যতিরেকী উদাহরণ”। উদাহরণের বিবিধত্ব বিষয়ে সকলেই একমত। “হেতু”কে ত্রিবিধ বলিলেও “উদাহরণকে” কেহই ত্রিবিধ বলেন নাই। উদাহরণ-বাক্য-বোধ্য দৃষ্টান্ত পদার্থও পূর্কোক্ত প্রকারে ত্রিবিধ। দৃষ্টান্ত পদার্থ কাহাকে বলে, মহর্ষি তাহা পূর্বে বলিয়াছেন। এখানে সেই দৃষ্টান্ত-বোধক বাক্যবিশেষকেই “উদাহরণ-বাক্য” বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত পদার্থ কখনই উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে না, মহর্ষি তাহা বলিতে পারেন না, স্মরণ্য সূত্রে “দৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—দৃষ্টান্তবোধক বাক্য। প্রাচীন ভাষার এইরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতিও এখানে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা “সাধ্যম্যোদাহরণ”-বাক্যের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। কিরূপ দৃষ্টান্ত-বোধক বাক্যবিশেষ “সাধ্যম্যোদাহরণ” হইবে, তাহা বলিবার জ্ঞাত মহর্ষি বলিয়াছেন—“সাধ্যসাধ্যম্যোদাহরণ-দৃষ্টান্তঃ”। ভাষ্যকার “সাধ্যেন সাধ্যম্যোদাহরণঃ” এই কথা দ্বারা সংক্ষেপে ঐ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে স্বপদ বর্ণনার দ্বারা সূত্রের বিশদার্থ বর্ণন করিয়াছেন।

যাহা অল্পমানের দ্বারা সাধন করিতে হইবে, তাহাকে বলে “সাধ্য”। শব্দগত অনিত্যত্ব ধর্মও “সাধ্য” হইতে পারে, আবার অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দও সাধ্য হইতে পারে। শব্দ সিদ্ধ পদার্থ হইলেও অনিত্য বলিয়া সর্বসিদ্ধ নহে। কারণ, নীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নৈয়ায়িক নীমাংসকের সহিত বিচারে শব্দকে অনিত্য বলিয়া সাধন করিতে গেলে, অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দকেও “সাধ্য” বলা যায়। মহর্ষি প্রায় সর্বত্রই এই অভিপ্রায়ে “সাধ্যত্ববিশিষ্ট ধর্মী” অর্থেই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে “সাধ্য”কে ত্রিবিধ বলিয়া অর্থাৎ কোন ধর্মগত ধর্ম, অথবা সেই ধর্মবিশিষ্ট সেই ধর্মী, এই উক্ত অর্থেই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া মহর্ষির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সূত্রে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা ধর্মবিশিষ্ট ধর্মরূপ সাধ্যকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, উৎপত্তি-

ধর্মকণ্ড প্রভৃতি হেতু পদার্থ তাহারই সাধ্যম্ হইতে পারে, সাধ্যধর্মের সাধ্যম্ হইতে পারে না ; কোন স্থলে হইলেও সেইরূপ সাধ্যম্ এখানে বিবক্ষিত নহে। যে ধর্মকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই ধর্মের সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের যেটি সমান ধর্ম, তাহাই এখানে “সাধ্যসাধ্যম্”। ফলিতার্থ এই যে, কেবলমাত্র সাধ্যধর্মের সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের বাহ্য কেবল মাত্র সাধ্যম্ (বৈধর্ম্য নহে), তাহাই এই স্থলে “সাধ্যসাধ্যম্”। এখানে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা যদি ধর্মরূপ সাধ্যই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে “তদ্ধর্মভাবী” এই স্থলে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত ধর্মরূপ সাধ্যই বুঝিতে হইবে। কারণ, “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত পদার্থই বুঝিতে হয়। উদ্যোতকর প্রভৃতি এইরূপ যুক্তির দ্বারা স্বত্রোক্ত “তৎ” শব্দের অর্থ নির্ধারণ করিলেও যদি কেহ পরবর্তী বৃত্তিকার বিঘ্ননাথ প্রভৃতির দ্বারা “সাধ্যম্” শব্দের অন্তরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মেরই ব্যাখ্যা করেন এবং “তদ্ধর্মভাবী” এই স্থলে “তদ্ধর্ম” শব্দের দ্বারা তাহার ধর্ম না বুঝিয়া, সেই সাধ্যরূপ ধর্মকেই বুঝেন এবং সেইরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে সে ব্যাখ্যা সংগত নহে, এত দূর চিন্তা করিয়া ভাব্যকার একটি বিশেষ যুক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভাব্যকারের সে যুক্তির মর্ম এই যে, যদি স্বত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মই মহাবির বিবক্ষিত হইত এবং পূর্ববর্তী “সাধ্য” শব্দের দ্বারাও সাধ্যধর্মই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে আর “ধর্ম” শব্দের পৃথক্ উল্লেখ করিতেন না। “তদ্ধর্মভাবী” এইরূপ কথা বলিলেই মহাবির বলব্য বলা হইত। মহাবির যখন “তদ্ধর্মভাবী” না বলিয়া “তদ্ধর্মভাবী” এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়, “তৎ” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মই তাহার বিবক্ষিত। “তদ্ধর্ম” বলিতে সেই সাধ্যধর্মের ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম। “তদ্ধর্ম” বলিতে সেই সাধ্যরূপ ধর্ম বুঝিলে, সে পক্ষে “ধর্ম” শব্দের প্রকৃত সার্থকতা থাকে না, ইহাই ভাব্যকারের গূঢ় তাৎপর্য। এখানে ভাব্যকারের এই কথার দ্বারা মহাবির যে সাধ্যধর্মকেও “সাধ্য” বলেন অর্থাৎ তাহার “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম অর্থও কোন স্থলে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, ইহা ভাব্যকারেরও মত বলিয়া বুঝা যায়। তাহা না হইলে এখানে ভাব্যকার মহাবির-স্বত্রোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা ধর্মরূপ সাধ্যই বুঝিতে হইবে, এই কথা বলিতে এবং তাহার হেতু দেখাইতে গিয়াছেন কেন? তাহার দ্বারা অর্থ গ্রহণ হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে প্রাচীনগণ শব্দ অর্থেও “গ্রহণ” শব্দের প্রয়োগ করিতেন। ভাষ্যে “তদগ্রহণ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে তৎ শব্দ।

এখন মূল কথা এই যে, কেবলমাত্র সাধ্যধর্মের সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের বাহ্য কেবলমাত্র সাধ্যম্ (বৈধর্ম্য নহে), তাহাই স্বত্রোক্ত “সাধ্যসাধ্যম্” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। প্রদর্শিত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দই সাধ্যধর্ম। স্থানী প্রভৃতি সর্বসম্মত অনিত্য পদার্থগুলি দৃষ্টান্ত। ঐ সকল পদার্থের উৎপত্তি নীমাংসকও মানেন। নৈমায়িক শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন। নৈমায়িক বহু বিচার দ্বারা শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে “উৎপত্তিধর্মকণ্ড”

১। সাধ্যসাধ্যম্ সাধ্যসহচরিত-ধর্ম্য প্রকৃতসাধ্যবিত্তার্থঃ। তৎ সাধ্যরূপং ধর্ম্য ভাবব্রতি, তথাচ সাধ্য-ব্রতী প্রকৃত-সাধ্যব্রতীভাবকোহিব্রতঃ সাধ্যসাধ্যব্রতীভাবকোহিব্রতঃ সাধ্যসাধ্যব্রতীভাবকোহিব্রতঃ।—নিবন্ধাবব্রতি।

ধর্মটি প্রদর্শিত স্থলে সাধ্যধর্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম। স্থালী প্রভৃতি অনিত্য কোন পদার্থে ঐ ধর্মের অভাবও নাই; সুতরাং উৎপত্তিধর্মকর ধর্মটি প্রদর্শিত স্থলে স্বেচ্ছাক্ত “সাধ্যসাধ্য” হইয়াছে। ঐ উৎপত্তিধর্মক বলিয়া স্থালী প্রভৃতি ভ্রব্যেও অনিত্যধর্ম বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক হইলেই সেখানে অনিত্যধর্ম বিদ্যমান থাকে, ইহা স্থালী প্রভৃতি ভ্রব্যে বুঝা গিয়াছে। তাহা হইলে এখানে ঐ স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তকে স্বেচ্ছাক্ত “সাধ্যসাধ্যপ্রযুক্ত তদ্ধর্মভাবী” বলা যাইতে পারে। ঐরূপ স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য-বিশেষই এখানে স্বেচ্ছাক্তসারে “সাধ্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে।

তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে বাক্যে সাধ্যসাধ্য প্রযুক্ত “তদ্ধর্মভাবি” প্রদর্শিত হয়, ঐ বাক্যই “সাধ্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে, ঐরূপ বাক্য না হইলে হইবে না, ইহাই স্বেচ্ছাক্ত পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা সূচিত হইয়াছে। পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা এখানে প্রযোজকর অর্থই বুঝিতে হইবে। “সাধ্যসাধ্য” এই কথার অর্থ সাধ্যসাধ্য প্রযুক্ত। এই প্রযোজকতা কি? তাহা ভবিয়া বুঝা উচিত। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, উহার কলিতার্থ এখানে ব্যাপ্যতা। তাহা ভিন্ন আর কোন অর্থ এখানে সংগত হয় না। তাহা হইলে বুঝা গেল, সাধ্যসাধ্যটি ব্যাপ্য। প্রকৃত স্থলে উৎপত্তিধর্মকর “সাধ্যসাধ্য” বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনিত্যধর্মটি তাহার ব্যাপক। অনিত্যই প্রকৃতস্থলে সাধ্যধর্মীর ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম। সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য না হইলে তাহা হেতুপদার্থই হয় না। “যাহা যাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনিত্য,—যেমন স্থালী প্রভৃতি”, এইরূপ বাক্যের দ্বারা উৎপত্তিধর্মকর ধর্মটি অনিত্য ধর্মের ব্যাপ্য, অনিত্য ধর্ম তাহার ব্যাপক, ইহা অর্থাৎ ঐ ধর্মঘরের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব প্রদর্শিত হয়, এ জন্ত ঐরূপ বাক্য “সাধ্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে। স্বেচ্ছাক্ত “সাধ্যসাধ্য” এবং “তদ্ধর্মভাবী” এই দুইটি কথার দ্বারা সাধনশূন্য পদার্থ এবং সাধ্যধর্মশূন্য পদার্থ এবং যেখানে সাধনও নাই, সাধ্যও নাই, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহা সূচিত হইয়াছে। সে সকল পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলে, তাহা “দৃষ্টান্তভাস” হইবে, “দৃষ্টান্ত” হইবে না, সুতরাং সেই সকল পদার্থবোধক বাক্যবিশেষ প্রয়োগ করিলে তাহা “উদাহরণভাস” হইবে, “উদাহরণ-বাক্য” হইবে না। এই স্বেচ্ছাক্ত “তদ্ধর্মভাবী” এই কথার ব্যাখ্যায় প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল।^{১)} উদ্যোতকরের চরম ব্যাখ্যাসূত্রে তাৎপর্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তদ্ধর্মরূপ ভাব পদার্থ যেখানে বিদ্যমান আছে, তাহাই “তদ্ধর্মভাবী”। উদ্যোতকর ঐ স্থলে “ভাব” শব্দের দ্বারা ভাব পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কেন, তাহারও কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাব্যকার কিন্তু সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তদ্ধর্মের ভাবই “তদ্ধর্মভাব”। “অস” ধাতুনিপ্পন্ন “ভাব” শব্দের অর্থ এখানে বিদ্যমানতা। উদ্যোতকর এখানে ভাব্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“স যদিহ দৃষ্টান্তে ভবতি বিদ্যতে”। উৎপত্তি-

১। “তদ্ধর্ম ভাবিত্বং বোধিত্বং শীলমত” অর্থাৎ যাহা সাধ্য সাধ্যরূপ হেতু পদার্থ প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের বোধক, এইরূপ প্রাচীন ব্যাখ্যা উদ্যোতকর গঠন করিয়াছেন। নবীন বৃত্তিকার বিশদ্য কিন্তু ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ধর্মকল্প প্রযুক্ত স্থানী প্রভৃতিতে অনিত্যত্ব ধর্ম উৎপন্ন হয় না। তাই উদ্যোতকর “ভবতি” এই কথা বলিয়া তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন — “বিদ্যতে”। অর্থাৎ উদ্যোতকর “ভবতি” এই স্থলে বিদ্যমানতা অর্থেই “ভূ” ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও শেষে এখানে “তদ্ব্যবহাবী ভবতি” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন; সুতরাং বিদ্যমানতা অর্থে “ভূ” ধাতুর প্রয়োগ তিনিও করিয়াছেন। প্রাচীনগণ ঐরূপ প্রয়োগ করিতেন।

উৎপত্তিধর্মক কাহাকে বলে এবং তাহা অনিত্য হয় কেন? অনিত্য বলিতে এখানে কি বুঝিতে হইবে? ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে “উৎপত্তিধর্মক” বলে। ঐরূপ পদার্থ উৎপত্তির পূর্বে থাকে না এবং উৎপত্তির পরে কোন দিন আত্মত্যাগ করে। আত্মত্যাগ করে, এই কথাই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যে, তাহা নিবন্ধ হয় অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব বিনাশ হয়। বাহা উৎপত্তির পূর্বে থাকে না এবং উৎপন্ন হইয়াও চিরকাল থাকে না, তাহাই এখানে অনিত্য বলিতে বুঝিতে হইবে। শব্দ উৎপত্তির পূর্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না এবং শব্দের অস্তিত্ব বিনাশ হয়, ইহাই শব্দ অনিত্য — এই প্রতিজ্ঞার দ্বারা নৈয়ায়িক প্রকাশ করিয়াছেন। উৎপত্তিধর্মক বস্তুমাত্রই যখন উৎপত্তির পূর্বে থাকে না এবং কোন কালে তাহার বিনাশ হইবেই — ইহা নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত, তখন নৈয়ায়িক উৎপত্তিধর্মক পদার্থকে অনিত্যত্ব সাধনে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

আপত্তি হইতে পারে যে, “ধ্বংস” নামক অভাবের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহার ধ্বংস হইতে পারে না, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত অনিত্যত্ব “ধ্বংস” পদার্থে না থাকায়, অনিত্যত্বের অল্পমানে ভাষ্যকার “উৎপত্তি-ধর্মক”কে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না; কারণ, উহা অনিত্যত্বের ব্যতিক্রমী। এতদ্বত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, উৎপত্তিধর্মক ভাব পদার্থমাত্রই অনিত্য, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। বস্তুতঃ প্রাচীনগণ উৎপত্তি পদার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সেই উৎপত্তি কেবল ভাব পদার্থেরই ধর্ম হয়। বস্তুর প্রথম ক্ষণে তাহার কারণের সহিত সমবায় সম্বন্ধই যদি এখানে “উৎপত্তি” পদার্থ বলিয়া ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উহা ধ্বংসে না থাকায় তাহার হেতু ব্যতিক্রমী হয় নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, শব্দে অনিত্যত্বের অল্পমানে “উৎপত্তিধর্মক”ই চরম হেতু নহে। ঐ হেতুতে পূর্ণোক্ত রূপ ব্যতিক্রমের আপত্তি করিয়া মহর্ষি গোতমই তাহার সমাধান করিয়াছেন এবং মহর্ষি অল্প হেতুরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা প্রকটিত হইবে। (২ অং, ২ অং, ১৩।১৪।১৫ সূত্র জটব্য) ১৩৬।

সূত্র। তদ্বিপৰ্য্যায়াদ্বাবিপৰীতম্ ॥৩৭॥

অনুবাদ। তাহার বিপর্যায়প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত বিপরীত (অতদ্ব্যবহাবী) দৃষ্টান্তও অর্থাৎ ঐরূপ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য-বিশেষও উদাহরণ (বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্য)।

বিস্তৃতি। যেখানে যেখানে হেতু আছে, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম আছে, ইহা যে দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, অমুমানস্থলে সেই দৃষ্টান্তকে বলে “সাধ্যম্যা দৃষ্টান্ত” এবং “অমুদৃষ্টান্ত”। ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ হইবে “সাধ্যম্যোদাহরণ-বাক্য” এবং যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম নাই অথবা যেখানে যেখানে সাধ্যধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই হেতু নাই, ইহা যে দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, অমুমানস্থলে তাহাকে বলে “বৈধর্ম্যা দৃষ্টান্ত” ও “ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত”। ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষকে বলে “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য”। যেমন প্রদর্শিত স্থলে “বাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক নহে, সেগুলি অনিত্য নহে—যেমন আত্মা প্রভৃতি” এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে। এই স্থলে “উৎপত্তিধর্মকত্ব” সাধ্যধর্মী শব্দের সাধ্যম্য। তাহার অভাব অর্থাৎ “অমুৎপত্তিধর্মকত্ব” সাধ্যধর্মী শব্দের বৈধর্ম্য। উহা আত্মাদি নিত্য পদার্থে আছে, সেখানে সাধ্যধর্ম অনিত্য নাই, তাহা হইলে ঐ স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্ত সাধ্যধর্মীর বৈধর্ম্য-প্রযুক্ত “বিপরীত” অর্থাৎ “তদ্ব্যবহার্য” নহে, “অতদ্ব্যবহার্য”। সুতরাং ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ ঐ স্থলে “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে।

ভাষ্য। দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং। সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্ব্যবহার্যভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি। অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তি-ধর্মকং নিত্যমাত্মাদি। সোহয়মাত্মাদিদৃষ্টান্তঃ সাধ্যবৈধর্ম্যাদনুৎপত্তি-ধর্মকত্বাদতদ্ব্যবহার্যভাবী, যোহসৌ সাধ্যস্য ধর্মোহনিত্যত্বং, স তস্মিন্ ন ভবতীতি। অত্রাত্মাদৌ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকত্বস্তাভাবানিত্যত্বং ন ভবতীতি উপলভ্যমানঃ শব্দে বিপর্যয়মনুমিনোতি উৎপত্তিধর্মকত্বস্তা ভাবা-দনিত্যঃ শব্দ ইতি।

সাধ্যম্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যসাধ্যম্যাৎ তদ্ব্যবহার্যভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। বৈধর্ম্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্ব্যবহার্যভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। পূর্বস্মিন্ দৃষ্টান্তে যৌ তৌ ধর্মৌ সাধ্যসাধনভূতৌ পশ্যতি, সাধ্যোহপি তয়োঃ সাধ্যসাধনভাবমনুমিনোতি। উত্তরস্মিন্ দৃষ্টান্তে যয়োর্ধর্ময়ো-রেকস্তাভাবাদিতরস্তাভাবং পশ্যতি, তয়োরেকস্য ভাবাদিতরস্য ভাবং

১। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্য-পুস্তকেই এখানে “তয়োরেকস্তাভাবাদিতরস্তাভাবং সাধ্যোহনুমিনোতি” এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠ সংশ্লিষ্ট হয় না। একের ভাবপ্রযুক্ত অপরেকের ভাবকে অনুমান করে, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য এবং তাহাই প্রকৃত কথা। ভাষ্যকার ইহার পূর্বেও বলিয়াছেন—“যে বিপর্যয়মনুমিনোতি উৎপত্তি-ধর্মকত্বস্তাভাবনিত্যঃ শব্দ ইতি”। সুতরাং এখানেও “একস্ত ভাবাদিতরস্ত ভাবং সাধ্যোহনুমিনোতি” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইল।

সাধ্যোহুমিনোতীতি । তদেতদ্ধেত্বাভাসেষু ন সম্ভবতীত্যাহেতবো
হেত্বাভাসাঃ । তদিদং হেত্বদাহরণয়োঃ সামর্থ্যং পরমসূক্ষ্মং দুঃখবোধং
পণ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি ।

অনুবাদ । “দৃষ্টান্ত উদাহরণং” এই কথাটি প্রকৃত (প্রকরণলক্ষ) অর্থাৎ
পূর্ববসূত্র হইতে ঐ অংশের এই সূত্রে অনুবৃত্তি বুঝিতে হইবে । (তাহা হইলে
সূত্রার্থ হইল) সাধ্যধর্ম্মের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃত হেতু পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত
“অতদ্ধর্ম্মভাবী” অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম যেখানে বিদ্যমান নাই, এমন যে দৃষ্টান্ত, তাদৃশ
দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয় অর্থাৎ “বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্য” হয় ।
(যেমন) (১) “শব্দ অনিত্য”, (২) “উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক”, (৩) “অনুৎপত্তিধর্ম্মক
অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয় না, এমন আত্মা প্রভৃতি নিত্য” । সেই এই আত্মা
প্রভৃতি দৃষ্টান্ত (বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত) সাধ্যধর্ম্মের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ শব্দে থাকে না—এমন
যে অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর অভাব, তৎপ্রযুক্ত “অতদ্ধর্ম্ম-
ভাবী”, বিশদার্থ এই যে, সাধ্যধর্ম্মের ধর্ম্ম এই যে অনিত্যত্ব, তাহা সেই আত্মা
প্রভৃতিতে নাই ।

এই আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তে—উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তি-
ধর্ম্মকত্ব না থাকিলে অনিত্যত্ব থাকে না, ইহা উপলব্ধি করতঃ শব্দে বিপর্যয় অর্থাৎ
অনিত্যত্বাভাবের বিপর্যয় অনিত্যত্ব অনুমান করে (কিরূপে, তাহা বলিতেছেন)
উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের ভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে বলিয়া “শব্দ
অনিত্য” ।

সাধ্যোক্ত হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ পূর্বোক্ত “সাধ্যো হেতু” বাক্যস্থলে সাধ্য-
ধর্ম্মের সাধ্যপ্রযুক্ত “তদ্ধর্ম্মভাবী” দৃষ্টান্ত অর্থাৎ পূর্বব্যাখ্যাত ঐরূপ দৃষ্টান্তের
বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয় । বৈধর্ম্ম্যোক্ত হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ পূর্বোক্ত
“বৈধর্ম্ম্যো হেতু” বাক্য স্থলে সাধ্যধর্ম্মের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত “অতদ্ধর্ম্মভাবী” দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ
পূর্বব্যাখ্যাত ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয় ।

পূর্বদৃষ্টান্তে অর্থাৎ প্রথমোক্ত সাধ্যদৃষ্টান্তে সেই যে দুইটি সাধ্যসাধন-ভাবাপন্ন
ধর্ম্ম দর্শন করে অর্থাৎ একটিকে সাধ্য এবং অপরটিকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝে,
সাধ্যধর্ম্মোক্তেও সেই দুইটি ধর্ম্মের সাধ্যসাধনভাব অনুমান করে । (অর্থাৎ প্রদর্শিত
স্থলে স্থানী প্রভৃতি সাধ্যদৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে এবং অনিত্যত্বও আছে,

ইহা বুঝিলে অনিত্যত্ব সাধ্য এবং উৎপত্তিধর্মকত্ব তাহার সাধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-ধর্মকত্ব থাকিলেই সেখানে অনিত্যত্ব থাকে, ইহা বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দেও অনিত্যত্বকে সাধ্য বলিয়া এবং উৎপত্তিধর্মকত্বকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝে অর্থাৎ স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকত্ব ও অনিত্যত্ব এই দুটি ধর্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব বুঝিয়া উৎপত্তিধর্মকত্ব হেতুর সাহায্যে শব্দকে অনিত্য বলিয়া অনুমান করে) ।

শেথোক্ত দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বৈধর্ম্যা দৃষ্টান্তে যে দুইটি ধর্মের একের অভাব প্রযুক্ত অপরটির অভাব বুঝে, সেই দুইটি ধর্মের একের ভাব প্রযুক্ত অপরটির ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা সাধ্যধর্ম্যোতে অনুমান করে । (যেমন পূর্বোক্ত স্থলে আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্যা দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব প্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব বুঝিলে অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্ব না থাকিলে সেখানে অনিত্যত্ব থাকে না, ইহা বুঝিলে ঐ উৎপত্তি-ধর্মকত্বের ভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্ব ধর্মের ভাব অনুমান করে) ।

সেই ইহা অর্থাৎ এইরূপে সাধ্যসাধনত্ব হেতুভাসগুলিতে সম্ভব হয় না, এজন্য হেতুভাসগুলি হেতু নহে । “হেতু” ও “উদাহরণের” সেই এই অতি সূক্ষ্ম দুর্বোধ্য সামর্থ্য প্রশস্ত পণ্ডিতের বোধ্য (অর্থাৎ ইহা প্রশস্ত পণ্ডিত ভিন্ন সকলে বুঝিতে পারে না, না বুঝিয়াই অনেকে এ বিষয়ে অনেক ভ্রম করে) ।

টিপ্পনী । স্বত্রের “তদ্বিপৰ্য্যয়াৎ” এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“সাধ্যবৈধর্ম্যাৎ” অর্থাৎ পূর্বস্বত্রে যে “সাধ্যসাধর্ম্যা” উক্ত হইয়াছে, তাহার বিপর্যয় অর্থাৎ তাহার অভাবকেই ভাষ্যকার “সাধ্যবৈধর্ম্যা” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । স্বত্রোক্ত “বিপরীতঃ” এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“অতদ্ব্যভাবী” । পূর্বস্বত্রোক্ত “তদ্ব্যভাবী”র বিপরীত “অতদ্ব্যভাবী” । পূর্বস্বত্রোক্ত “দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ” এই অংশের অন্তর্ভুক্তি স্বত্রকারের অভিপ্রেত বুঝা যায়, নচেৎ স্বত্রার্থ সংগতি হয় না । তাই ভাষ্যকার প্রথমেই সেই কথার উল্লেখপূর্বক সম্পূর্ণ স্বত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন । “উদাহরণ” শব্দের ক্রীতিলিঙ্গস্বাস্থ্যেই স্বত্রকার “বিপরীতঃ” এইরূপ ক্রীত-লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । তাৎপর্য্যটীকাকার স্বত্রস্থ “বা” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন সমুচ্চয় । প্রকৃত কথা এই যে, “শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞার পরে “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এই হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া, উৎপত্তিধর্মকত্বরূপ হেতুপদার্থে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্ত যেমন পূর্বস্বত্রোক্ত “সাধ্যোদাহরণ-বাক্যে”র প্রয়োগ করা যায়, তদ্রূপ ঐ স্থলে “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যে”রও প্রয়োগ করা যায় । মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা সেই “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যে”র লক্ষণ বলিয়াছেন । এই “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যে”র দ্বারা কিরূপে ঐ স্থলে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হয়, ভাষ্যকার তাহা বুঝাইয়াছেন । ভাষ্যকারের কথা এই যে, যাহা অন্তঃপত্তি-ধর্মক, অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় না, স্থূল কথা, যাহা চিরদিনই আছে এবং চির-

দিনই থাকিবে, এমন পদার্থগুলি অনিত্য নহে অর্থাৎ সে সকল পদার্থ নিত্য, ইহা বুঝিলেও বাহ্য বাহ্য উৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, সে সকল পদার্থ অনিত্য, এইরূপে উৎপত্তিধর্মক পদার্থে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে। কারণ, উৎপত্তিধর্মক না থাকিলেই অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ না হইলেই যখন সেই পদার্থকে নিত্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে—আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে তাহা নিশ্চয় করা যাইতেছে, তখন উৎপত্তিধর্মক থাকিলে অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ হইলে তাহা অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় উহার দ্বারা হইবেই। ফলতঃ উৎপত্তিধর্মক এবং অনিত্য এই দুইটি ধর্ম সমদেশবর্তী। অর্থাৎ বাহ্য উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনিত্য এবং বাহ্য অনিত্য, তাহা উৎপত্তিধর্মক; সুতরাং উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব থাকিলে অনিত্যত্বের অভাব থাকে—ইহা বুঝিলে, উৎপত্তিধর্মকত্বের ভাব থাকিলে অনিত্যত্বের ভাব থাকে,—অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্ব যেখানে বিদ্যমান থাকে, সেখানে অনিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে, ইহাও বুঝা যায়;—তাহার ফলে শব্দধর্মীতে অনিত্যত্ব ধর্মের অঙ্গমান হয়। প্রদর্শিত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দই সাধ্যধর্মী। উৎপত্তিধর্মকত্বরূপ হেতু পদার্থটি তাহার সাধ্যধর্মী। ঐ উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব তাহার বৈধর্ম্য; কারণ, জ্ঞান-মতে শব্দের উৎপত্তি হয়, সুতরাং শব্দ উৎপত্তিধর্মক। উৎপত্তিধর্মকত্ব শব্দের ধর্ম, তাহার অভাব শব্দে থাকে না, এ জ্ঞান উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব শব্দের বৈধর্ম্য। বাহ্য যেখানে থাকে না, তাহাকে সেই পদার্থের “বৈধর্ম্য” বলা হয়। পূর্বোক্ত “সাধ্য-বৈধর্ম্য” প্রযুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব প্রযুক্ত আত্মা প্রভৃতি পদার্থগুলি “অতদ্ব্যভাবী”। কারণ, আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মীর ধর্ম যে অনিত্যত্ব, তাহা বিদ্যমান নাই। যে পদার্থে “তদ্ব্যভাবী” অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মীর ধর্মের “ভাব” কি না—বিদ্যমানতা আছে, তাহাকেই বলা হইয়াছে “তদ্ব্যভাবী”। আর যে সকল পদার্থে ঐ তদ্ব্যভাবের “ভাব” নাই, তাহাকে বলা হইয়াছে “অতদ্ব্যভাবী” অর্থাৎ যে পদার্থ পূর্বোক্ত “তদ্ব্যভাবী”র বিপরীত, তাহাই “অতদ্ব্যভাবী” এবং তাহাই “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত”। পূর্বোক্ত স্থলে আত্মা প্রভৃতি পদার্থে সাধ্যধর্মীর ধর্ম অনিত্যত্ব বিদ্যমান না থাকায় ঐ সকল পদার্থ পূর্বোক্ত “অতদ্ব্যভাবী” বলিয়া “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত”। ঐ আত্মাদি বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই ঐ স্থলে “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বিবিধ;—“অবয়ব্যাপ্তিজ্ঞান” এবং “ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান”। (৩৫ সূত্র ভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। যেখানে যেখানে ঐ হেতু পদার্থ থাকে, সেই সমস্ত স্থানে ঐ সাধ্যধর্ম থাকে, এইরূপ জ্ঞান অবয়ব্যাপ্তি জ্ঞান। যেখানে যেখানে ঐ সাধ্যধর্ম নাই, সেই সমস্ত পদার্থে ঐ হেতু পদার্থ নাই, এইরূপ জ্ঞানকে পরবর্তী জ্ঞানচাৰ্য্যগণ “ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান” বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে হেতুপদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব বলায়, তাহার মতে যেখানে যেখানে হেতু পদার্থ নাই, সেই সমস্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম নাই, এইরূপ জ্ঞানও অনেক স্থলে “ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান” হইবে, ইহা বুঝা যায়। এবং বাহ্য বাহ্য ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা অবয়ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়াই অঙ্গমিতি হয় বলিয়াছেন, ব্যতিরেক-

ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অহুমিতির কারণ বলেন নাই, তাঁহাদিগের ঐ মতের মূল বলিয়া ভাষ্যকারকেও বলা যাইতে পারে। কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপত্তিধর্মকল্প নাই, সে সকল পদার্থ নিত্য, এইরূপ বুঝিলে, যে সকল পদার্থে উৎপত্তিধর্মকল্প আছে, সে সকল পদার্থ অনিত্য—ইহা বুঝা যায়, এইরূপ কথা ভাষ্যকারের কথার এখানে পাওয়া যায়। ফলকথা, “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তে” হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব বুঝিয়া যদি সেই হেতু থাকিলে সেই সাধ্যধর্ম থাকিবেই, এইরূপ নিশ্চয় হয় এবং ভাষ্যকারও সেইরূপ কথা বলিয়াছেন—ইহা বলা যায়, তাহা হইলে “যেখানে যেখানে এই হেতু আছে, সেই সমস্ত স্থানেই এই সাধ্যধর্ম আছে”, এইরূপ “অম্বয়ব্যাপ্তি” নিশ্চয়ই সর্বত্র অহুমিতির কারণ। যেখানে যেখানে এই হেতু নাই, সেখানে সেখানে এই সাধ্যধর্ম নাই, এইরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিনিশ্চয় অহুমিতির কারণ নহে, স্থলবিশেষে উহা অম্বয়ব্যাপ্তিনিশ্চয়েরই কারণ—ইহাই ভাষ্যকারের মত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার এখানে হেতু পদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব বলায়, উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী আচার্যগণ ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যাকে অসংগত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যে”র দ্বারা সাধ্যধর্মের অভাব প্রযুক্তই হেতুপদার্থের অভাব প্রদর্শিত হয়। যেখানে যেখানে সাধ্য ধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই হেতু পদার্থ নাই, এইরূপ জ্ঞানই “ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান”। কারণ, সাধ্যধর্মের অভাব থাকিলে সেখানে তাহার হেতু পদার্থের অভাব থাকে। হেতু পদার্থ না থাকিলেই সেখানে সাধ্যধর্ম থাকিবে না, এইরূপ কথা বলা যায় না; ঐরূপ নিয়ম সর্বত্র নাই। যেখানে বহিঃ সাধ্যধর্ম, বিশিষ্ট ধুম তাহার হেতু, সেখানে হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব—ইহা কোনমতেই বলা যাইবে না। কারণ, বিশিষ্ট ধুম না থাকিলেও অনেক স্থানে বহিঃ থাকে, কিন্তু বহিঃ না থাকিলে কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধুম থাকে না, থাকিতেই পারে না; স্তূতরাং সাধ্যধর্মের অভাব প্রযুক্ত হেতুর অভাব থাকে—ইহাই বলিতে হইবে এবং বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যও সেইরূপই বলিতে হইবে। এবং ভাষ্যকার যে স্থলে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ স্থলে হেতু “অম্বয়-ব্যতিরেকী”। ঐরূপ স্থলে সাধ্যধর্মোদাহরণ-বাক্যেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। কেবল বৈধর্ম্য হেতু স্থলেই “সাধ্যদৃষ্টান্ত” না থাকায় বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, স্তূতরাং ভাষ্যকারের উদাহরণ-স্থলও ঠিক হয় নাই। ফলকথা, ভাষ্যকারের মত এখানে গ্রাহ্য নহে; উহা বৃষ্টিবিরুদ্ধ। তবে কিরূপ স্থলে, কিপ্রকারে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য হইবে? উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “জীবৎশরীরং সাত্মকং প্রাণাদিমহাৎ” এই স্থলে অর্থাৎ “জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, প্রাণাদিমহাৎ (ইহার) জ্ঞাপক, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও হেতুস্থলে “বাহ্য বাহ্য সাত্মক নহে, তাহা প্রাণাদিব্যক্ত নহে—যেমন ঘটাদি” এইরূপ ঘটাদি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য। যে সকল পদার্থে আত্মা নাই, সে সকল পদার্থে প্রাণাদি নাই, ইহা বুঝিলে প্রাণাদিব্যক্ত জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, ইহা বুঝা যায়। পূর্বেক্ত বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত ঘটাদি পদার্থে পূর্বেক্ত প্রকার ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয় রশতঃই ঐরূপ অহুমান

হয়, ইহাই পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িকের মত। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের পূর্বকথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সাধ্যকস্বরূপে সাধ্যধর্মী যে জীবিত ব্যক্তির শরীর, তাহার সহিত বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত ঘটাদি পদার্থের বৈধর্ম্য যে সাধ্যকস্বের অভাব, তৎপ্রযুক্ত যে পদার্থ “অতদ্ধর্মভাবী” অর্থাৎ সাধ্যধর্মী জীবিত ব্যক্তির শরীরের প্রাণাদিমত্ ধর্ম যেখানে নাই, এমন যে ঘটাদি পদার্থ, তাহাই বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত। শেষে তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে ঘটাদি পদার্থে সাধ্যধর্মের অভাব প্রযুক্ত হেতু পদার্থের অভাব থাকে, সেই ঘটাদি পদার্থ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত হইবে এবং ঐ বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য হইবে। ফলকথা, উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী আচার্য্যগণের মতে যেখানে যেখানে সাধ্যধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানে হেতুপদার্থ নাই, ইহাই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় এবং ঐরূপ ভাবেই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়।

ভাষ্যকার ইহার বিপরীত কথা কেন বলিয়াছেন অর্থাৎ তিনি এখানে হেতুপদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাবের কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা এখানে বিশেষ চিন্তনীয়। তাৎপর্য-টীকাকার প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে যান নাই। তাঁহারা সকলেই ভাষ্যকারের কথা অসংগত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আমার মনে হয়, ভাষ্যকার মহাবিশ্বজ্ঞের পদার্থ পর্যালোচনা করিয়া বেরূপ সূত্রার্থ সংগত বোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই ঐরূপ ভাবে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মহাবিশ্বজ্ঞে “তদ্বিপর্য়ায়” শব্দ আছে। তাহার দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত সাধ্যসাধ্যের বিপর্যয়ই বুঝা যায়। সাধ্যসাধ্যের বিপর্যয় বলিতে সাধ্যসাধ্যের অভাবকে বুঝা যায়। তাহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন সাধ্যবৈধর্ম্য। “পূর্বসূত্রে “সাধ্যসাধ্য” শব্দের দ্বারা ফলতঃ প্রকৃত হেতু পদার্থই গৃহীত হইয়াছে, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং এই সূত্রে “তদ্বিপর্য়ায়” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত “সাধ্যসাধ্য” যে প্রকৃত হেতু, তাহার অভাবকেই বুঝা যায়। এবং এই সূত্রে “বিপরীত” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত “তদ্ধর্মভাবী”র বিপরীতই বুঝিতে হইবে। পূর্বসূত্রে “তদ্ধর্ম” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মীর ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্মই গৃহীত হইয়াছে। যে কোনরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ফলে উহার দ্বারা সাধ্যধর্মই গৃহীত হইবে, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং এই সূত্রে তদ্ধর্মভাবীর বিপরীত বলিতে যেখানে সাধ্যধর্মটি বিদ্যমান নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত হেতুর অভাব প্রযুক্ত প্রকৃত সাধ্যধর্মের অভাব যেখানে আছে, এমন পদার্থই “বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত” এবং সেই বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য, ইহাই মহাবিশ্বজ্ঞের দ্বারা বুঝা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে এই সূত্রে “তদ্বিপর্য়ায়” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—সাধ্যধর্মের অভাব এবং “বিপরীত” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—হেতুশূন্য। কিন্তু পূর্বসূত্রে যে তদ্ধর্মভাবী এই কথাটি আছে, তাহার অর্থ সেখানে সাধ্যধর্মযুক্ত, সুতরাং এই সূত্রে তাহার বিপরীত অর্থই “বিপরীত” শব্দের দ্বারা বুঝা উচিত। তাহা হইলে এই সূত্রে “বিপরীত” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় সাধ্যধর্মশূন্য। যদিও হেতু পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম এই

ছুইটিকেই সাধ্যসাধ্য শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সুতরাং সাধ্যধর্মের অভাবকেও এই হুক্তে তদ্বিপর্যয় শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা যায় ; উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু পূর্বহুক্তে যখন হেতু পদার্থকেই সাধ্যসাধ্য শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই হুক্তে “তদ্বিপর্যয়” শব্দের দ্বারা তাহার অর্থাৎ সাধ্যসাধ্য হেতুপদার্থের অভাবকেই বুঝা উচিত এবং পূর্বহুক্তে “তদ্ব্যর্থ” শব্দের দ্বারা যখন সর্বপ্রকার ব্যাখ্যাতেই সাধ্যধর্মকেই গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই হুক্তে “বিপরীত” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম যেখানে বিদ্যমান নাই, এইরূপ অর্থই বুঝা উচিত । পূর্বহুক্তোক্ত “তদ্ব্যর্থভাবী”র “বিপরীত” অতদ্ব্যর্থভাবী । যেখানে তদ্ব্যর্থ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম বিদ্যমান নাই, এমন পদার্থই “অতদ্ব্যর্থভাবী” । এইরূপে পূর্ব-হুক্তের পদার্থানুসারে এই হুক্তের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, তদনুসারে ভাষ্যকার এখানে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন । পরন্তু উৎপত্তিধর্মক হেতু এবং অনিত্যবস্তু সাধ্যধর্ম, এই দুইটি সমদেশবর্তী । অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক বস্তু মাত্রই অনিত্য এবং অনিত্য বস্তুমাত্রই উৎপত্তিধর্মক, এইরূপ হেতু ও সাধ্যধর্মকে “সমব্যাপ্ত” হেতুসাধ্য বলে । এইরূপ হলে হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্মের অভাব, একথাও বলা যায় অর্থাৎ যাহা বাঁহা উৎপত্তিধর্মক নহে, তাহা অনিত্য নহে অর্থাৎ নিত্য ; যেমন আত্মা প্রভৃতি, এইরূপ কথাও বলা যায় । হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্তই উদাহরণ-বাক্য বলিতে হয় । প্রকৃত হলে সেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন যদি ঐরূপ বাক্যের দ্বারাও হয় এবং মহর্ষির হুক্তানুসারেও ঐরূপ বাক্যকেই বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ভাষ্যকার তাহাই কেন বলিবেন না ? ভাষ্যকার বুঝিয়াছেন যে, যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম নাই, ইহা যে পদার্থে বুঝা যায়, তাহাকেই মহর্ষি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত বলিয়াছেন এবং আরও বুঝিয়াছেন যে, যেখানে যেখানে উৎপত্তি-ধর্মক নাই, সেই সমস্ত স্থানেই অনিত্য নাই, ইহার কুজাপি ব্যভিচার নাই এবং আরও বুঝিয়াছেন যে, যাহা বাঁহা উৎপত্তিধর্মক নহে, সেই সমস্ত পদার্থ অনিত্য নহে, ইহা বুঝিলেও যাহা বাঁহা উৎপত্তিধর্মক, সেই সমস্ত পদার্থ অনিত্য, ইহা বুঝা হয়, সুতরাং ভাষ্যকার এখানে পূর্ণোক্ত প্রকার বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্যই প্রদর্শন করিয়াছেন ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে হেতু ও সাধ্যধর্ম সমদেশবর্তী নহে, যেমন বিশিষ্ট ধূম হেতু, বহি সাধ্য, এইরূপ হলে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য ভাষ্যকার কিরূপ বলিতেন ? সেখানে ত যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই বহি নাই—এইরূপ কথা বলা যাইবে না ? কারণ, ধূমশূন্য স্থানেও বহি থাকে । এতদ্বত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে, মহর্ষি-হুক্তের ভাষ্যকার-সম্মত অর্থানুসারে ঐ হলে যখন “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য” হইতে পারে না, তখন ঐ হলে ভাষ্যকার কেবল সাধ্যধর্মোদাহরণ-বাক্যই বলিতেন । অর্থাৎ “যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি থাকে, যেমন রজনশালা”, এইরূপ সাধ্যধর্মোদাহরণ-বাক্যের দ্বারা

১। বাহার উৎপত্তি এবং বিশেষ উত্তরই হয়, এই অর্থে ভাষ্যকার পূর্ণোক্ত হলে “অনিত্য” শব্দের প্রয়োগ করার অনিত্য বস্তু মাত্রকেই তিনি উৎপত্তিধর্মক বলিতে পারেন । (৩৯ হুক্ত-ভাষ্য টিপ্পনী জট্টা) ।

ঐ স্থলে বিশিষ্ট ধূমে বহির ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। সেখানে বিশিষ্ট ধূম কেবল সাধ্যম্বে হেতুই হইবে, বৈধর্ম্য হেতু না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উৎপত্তিব্যর্থক হেতু স্থলে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যও সম্ভব হওয়ায় ঐ হেতু “বৈধর্ম্যহেতু”ও হইবে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, মহর্ষি সমদেশবর্তী হেতু ও সাধ্যধর্মের স্থলেই “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের” ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, ভাষ্যকারের মতে মহর্ষির ঐ লক্ষণ সেইরূপ স্থলেই সম্ভব হয়। যেখানে বহিঃসাধ্য, বিশিষ্ট ধূম হেতু, সেই স্থলে “যেখানে যেখানে বহিঃসাধ্য, সেই সমস্ত স্থানে বিশিষ্ট ধূম নাই—যেমন জল”, এইরূপ বাক্যই “বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে। মহর্ষি-স্বত্রে ইহা প্রকটিত না থাকিলেও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া ইহা মহর্ষির সম্মত এবং স্বত্রে “বা” শব্দের দ্বারা ইহাও সূচিত। কল কথ্য, হেতুর অভাবপ্রযুক্ত যেখানে সাধ্যধর্মের অভাব, এমন পদার্থকেই ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্বত্রের দ্বারা “বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত” বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সমদেশবর্তী হেতু ও সাধ্যধর্মের স্থলে তাহা হইতেও পারে, এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে ঐরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পরবর্তী ভাষ্যচর্চায়গণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যে পদার্থটি “সাধ্যম্বে দৃষ্টান্ত” অথবা “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত” হইবে, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থের বোধক বাক্য প্রয়োগ না করিলেও উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে। যেমন “বাহা বাহা উৎপত্তিব্যর্থক, সে সমস্ত অনিত্য” এই পর্য্যন্ত বলিলেও উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে। উহার পরে আবার “যেমন স্থানী প্রভৃতি” এই কথাটি না বলিলেও চলে। হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্তই উদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়। তাহা পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারাও হইতে পারে। ভাষ্যকার কিন্তু উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগে দৃষ্টান্তবোধক শব্দেরও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন (নিগমন-স্বত্র প্রভৃতি)। মহর্ষিস্বত্রের দ্বারাও দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগের কর্তব্যতা বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত মতের আশ্রয় করিয়া এখানে মহর্ষি-স্বত্রোক্ত “দৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তকথনবোধ্য অবয়ব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ দৃষ্টান্তের কথন না হইলেও উদাহরণ-বাক্যে দৃষ্টান্তের কথন-বোধ্যতা আছে, উদাহরণ-বাক্যরূপ তৃতীয় অবয়বে দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ করা যায়, অজ্ঞ কোন অবয়বে তাহা করা যায় না। তত্ত্বচিন্তামণিকার গল্পেশও দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ সার্বজনিক নহে, এই কথা বলিয়াছেন। তিনি ইহার হেতু বলিয়াছেন যে—“যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে অগ্নি আছে” এই পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা ধূমে বহির ব্যাপ্তি বোধ হইয়া থাকে। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণের অনেকেই ঐ স্থলে কেবল “যথা মহানসং” অর্থাৎ যেমন রজনশালা, এইরূপ বাক্যকেও উদাহরণ-বাক্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষে “পণ্ডিতৈরুপবেদনীয়ং” এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। “পণ্ডিতৈরুপবেদনীয়ং” ইহাই প্রকৃত পাঠ। “পণ্ডিত” শব্দের পরে প্রশস্ত বা উৎকৃষ্ট অর্থে “রূপ” প্রত্যয়ের বোলে “পণ্ডিতরূপ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “পণ্ডিতরূপ” শব্দের অর্থ প্রশস্ত পণ্ডিত।

ভাষ্যকার এখানে হেতু ও উদাহরণের অতি হৃদয়োপ পরম সূক্ষ্ম সামর্থ্য প্রশস্ত পণ্ডিতেরাই

বুঝিতে পারেন, এ কথাটি কেন লিখিয়াছেন? ইহা ভাবিবার বিষয়। ভাষ্যকারের পূর্বেও জ্ঞানসূত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা ছিল, ইহা ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের মতে তাহার পূর্বতন কোন কোন পণ্ডিত হেতু ও উদাহরণের ব্যাখ্যায় অনেক ভ্রম করিয়াছিলেন। তাহার প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারেন নাই, ইহাও ঐ কথার দ্বারা মনে করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা তাহারই ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন কি না, ইহা এই ভাবের ভাবুকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। ৩৭।

সূত্র। উদাহরণাপেক্ষস্তথৈতু্যপসংহারো ন তথৈতি বা সাধ্যশ্চোপনয়ঃ ॥ ৩৮॥

অনুবাদ। সাধ্যধর্ম্মের সম্বন্ধে অর্থাৎ যে ধর্ম্মাতে ধর্ম্মবিশেষের অনুমান করিতে হইবে, তাহাতে উদাহরণানুসারী “তথা” অর্থাৎ তদ্রূপ এই প্রকারে, অথবা “ন তথা” অর্থাৎ তদ্রূপ নহে, এই প্রকারে উপসংহার অর্থাৎ হেতুর উপস্থাপন (হেতুবোধক বাক্য) উপনয়।

বিবৃতি। যে হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অনুমান করিতে হইবে, সেই হেতু সেই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে যেখানে আছে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই সাধ্যধর্ম্ম থাকে, ইহা উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বুঝাইয়া, তাহার পরেই সেই হেতু পদার্থটি সাধ্যধর্ম্মাতে আছে অর্থাৎ সেই হেতুর দ্বারা যেখানে সাধ্যধর্ম্মটির অনুমান করিতে হইবে, সেই পদার্থে আছে, ইহা বুঝাইতে হইবে, নচেৎ অনুমান হইতে পারে না। বাহা বাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, সে সমস্তই অনিত্য, ইহা বুঝিলেও ঐ উৎপত্তিধর্ম্মক হেতুটি শব্দে আছে, ইহা না বুঝিলে শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান হইতে পারে না। ঐরূপ বুঝার নামই “লিঙ্গপর্যায়ন”। যে বাক্যের দ্বারা ঐরূপ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে—“উপনয়”। উদাহরণ-বাক্যের পরেই উদাহরণ-বাক্যানুসারে এই “উপনয়-বাক্য” প্রয়োগ করিতে হয়। উদাহরণ-বাক্য দ্বিবিধ, সূত্রাত্মক উপনয়-বাক্যও দ্বিবিধ। (১) সাধ্যশ্চোপনয়, (২) বৈধশ্চোপনয়। “উৎপত্তিধর্ম্মক হালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য” এইরূপ সাধ্যশ্চোদাহরণ-বাক্যের পরে “শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তিধর্ম্মক”, এইরূপ বাক্য বলিলে উহার দ্বারা বুঝা যায়, অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তিধর্ম্মক, তাহা শব্দে আছে, শব্দও হালী প্রভৃতি দ্রব্যের জ্ঞায় উৎপত্তিধর্ম্মক, ঐ স্থলে এইরূপ বাক্যের নাম “সাধ্যশ্চোপনয়”। এবং ঐ স্থলে “অনুৎপত্তিধর্ম্মক আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য” এইরূপ বৈধশ্চোদাহরণ-বাক্যের পরে “শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে” এইরূপ বাক্য বলিলে উহার দ্বারাও বুঝা যায়, অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তিধর্ম্মক, তাহা শব্দে আছে। শব্দ আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের জ্ঞায় অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে, ইহা বলিলে শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মক আছে, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। ঐ স্থলে ঐরূপ বাক্যের নাম “বৈধশ্চোপনয়”। (নিগমন-সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য । উদাহরণাপেক্ষ উদাহরণতন্ত্রঃ উদাহরণবশঃ । বশঃ
সামর্থ্যং । সাধ্যসাধর্ম্যযুক্তে উদাহরণে স্থালাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্মক-
মনিত্যং দৃষ্টং তথা শব্দ উৎপত্তিধর্মক ইতি সাধ্যস্তা শব্দশ্রোৎপত্তি-
ধর্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে । সাধ্যবৈধর্ম্যযুক্তে পুনরুদাহরণে আত্মাদিদ্ৰব্য-
মুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং দৃষ্টং ন চ তথা শব্দ ইতি অনুৎপত্তিধর্মকত্ব-
শ্রোপসংহার-প্রতিষেধেনোৎপত্তিধর্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে । তদিদমুপসংহার-
বৈতমুদাহরণবৈতাদভবতি । উপসংহ্রিয়তেহেনেনেতি চোপসংহারো
বেদিতব্য ইতি ।

অনুবাদ । উদাহরণাপেক্ষ কি না উদাহরণতন্ত্র,—উদাহরণের বশ, অর্থাৎ
উদাহরণ-বাক্যের বশ । বশ অর্থাৎ বশ্যতা (এখানে) সামর্থ্য । অর্থাৎ উপনয়-
বাক্য উদাহরণ-বাক্যের ফল, উহা উদাহরণ-বাক্যানুসারেই প্রয়োগ করিতে হয়, এ
জন্ম উদাহরণাপেক্ষ ।

সাধ্যসাধর্ম্যযুক্ত উদাহরণে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধর্ম্যোদাহরণ স্থলে “উৎপত্তি-
ধর্মক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়, শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তি-ধর্মক” এইরূপে
সাধ্যধর্ম্য শব্দের সম্বন্ধে অর্থাৎ অনিত্যরূপে সাধ্যধর্ম্য শব্দে উৎপত্তি-ধর্মকত্ব
উপসংহৃত (প্রদর্শিত) হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার বাক্যটির দ্বারা অনিত্যত্ব ধর্মের
ব্যাপ্য যে উৎপত্তি-ধর্মকত্ব, তাহা শব্দে আছে, ইহা বুঝান হয় ; ঐ বাক্যটি
সাধর্ম্যোপনয় বাক্য ।

সাধ্যবৈধর্ম্যযুক্ত উদাহরণে কিন্তু অর্থাৎ পূর্বোক্ত বৈধর্ম্যোদাহরণ স্থলে
“অনুৎপত্তি-ধর্মক (যাহার উৎপত্তি নাই) আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য দেখা যায়, কিন্তু
শব্দ তদ্রূপ নহে” এই বাক্যের দ্বারা (“শব্দ তদ্রূপ নহে” এই শেযোক্ত বাক্যটির
দ্বারা) অনুৎপত্তি-ধর্মকত্বের উপসংহার নিষেধের দ্বারা অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা শব্দে
অনুৎপত্তিধর্মকত্ব নাই, ইহা উপসংহার (প্রদর্শন) করিয়া উৎপত্তিধর্মকত্ব উপসংহৃত
(প্রদর্শিত) হয় । উপসংহারের অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্যোতে হেতু-পদার্থের বোধক পূর্বোক্ত
উপনয়-বাক্যের সেই এই (পূর্বোক্ত) দ্বিবিধ উদাহরণের দ্বিবিধ প্রযুক্ত হয় ।
ইহার দ্বারা উপসংহৃত হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার উপনয়-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্যোতে
হেতু-পদার্থের উপসংহার করা হয় ; এ জন্ম ইহাকে “উপসংহার” জানিবে (অর্থাৎ
এইরূপ অর্থেই উপনয়-বাক্যকে উপসংহার বলা হইয়াছে) ।

টিপনী। স্বত্রে “উদাহরণাপেক্ষঃ সাধ্যস্ত্রোপসংহারঃ” এই অংশের দ্বারা উপনয়-বাক্যের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। “তথা” এবং “ন তথা” এই কথার দ্বারা উপনয়-বাক্যের বিশেষ লক্ষণ বলা হইয়াছে। উপনয়-বাক্য উদাহরণ-বাক্যকে অপেক্ষা করে, উদাহরণ-বাক্যের পরে তদনুসারে উপনয়-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তাই মহাবি বলিয়াছেন—“উদাহরণাপেক্ষঃ”। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“উদাহরণ-তত্ত্ব”, আবার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“উদাহরণ-বশ”। তাৎপৰ্য্য-টীকাকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“বশতে ইতি বশঃ বশিন উদাহরণস্ত বশ ইত্যর্থঃ”। অর্থাৎ উপনয়-বাক্য উদাহরণবাক্যের বশ। শেষে বলিয়াছেন যে, ঐ বশ্যতাকেই “বশ” শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার উহার অর্থ বলিয়াছেন “সামর্থ্য”। তাৎপৰ্য্যটীকাকার ঐ “সামর্থ্যে”র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“বশেন উদাহরণস্ত ফলেন উপনয়েন অভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ”। অর্থাৎ উপনয়-বাক্য উদাহরণবাক্যের ফল, ঐ ফলের সহিত উদাহরণবাক্যের সম্বন্ধই উপনয়বাক্যে উদাহরণ-বাক্যের বশ্যতা এবং উহাই এখানে উদাহরণের সামর্থ্য। ভাষ্যকার আদি ভাষ্যেও ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থে “সামর্থ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মূলকথা, উদাহরণবাক্য ব্যতীত হেতুপদার্থে সাধ্যবর্ণনের ব্যাপ্তি প্রদর্শন হয় না। হেতুপদার্থকে সাধ্যবর্ণনের ব্যাপ্য বলিয়া না বুঝিয়া সাধ্য-ধর্ম্মীতে হেতুপদার্থের অবধারণ হইলেও অসম্মান হইতে পারে না; সুতরাং হেতুপদার্থকে সাধ্যবর্ণনের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিয়া সাধ্যধর্ম্মীতে সেই হেতুপদার্থের উপসংহার করিতে হইবে, তাহাই “উপনয়-বাক্য” হইবে এবং উদাহরণের ভেদানুসারেই “উপনয়-বাক্যে”র প্রকারভেদ হইবে; সুতরাং “উপনয়” উদাহরণ-সাপেক্ষ।

যে বাক্যের দ্বারা উপসংহার করা হয় অর্থাৎ কোন পদার্থে কোন পদার্থের অবধারণ করা হয়, তাহাকে উপসংহার-বাক্য বলা যায়। মহাবি ঐরূপ বাক্যবিশেষ অর্থেই স্বত্রে “উপসংহার” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উপনয় বাক্যবিশেষ। সুতরাং স্বত্রোক্ত “উপসংহার” শব্দের অর্থও বাক্যবিশেষ। ভাষ্যকারও শেষে স্বত্রোক্ত “উপসংহার” শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন কিরূপ বাক্য-বিশেষ উপনয় হইবে? এ জন্ত স্বত্রকার বলিয়াছেন—“উদাহরণাপেক্ষঃ” এবং “সাধ্যস্ত”। এখানে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে সাধ্যধর্ম্মী। কারণ, উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যবর্ণনের উপসংহার করা হয় না। অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, উপনয়-বাক্যের দ্বারা ত সাধ্যধর্ম্মীরও উপসংহার করা হয় না, সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুপদার্থেরই উপসংহার করা হয়। তাৎপৰ্য্যটীকাকার এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার এই জন্তই এখানে সাধ্যধর্ম্মী শব্দের সম্বন্ধে, উপপত্তিবর্ষক হেতুর উপসংহার হয়, এই কথা বলিয়াছেন। তাৎপৰ্য্যটীকাকার শেষে ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য বলিয়াছেন যে, স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার হয় না, সাধ্যবর্ণনের ব্যাপ্য যে হেতু, সেই হেতু-বৃত্তভাবে সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার হয়। অর্থাৎ উপনয়বাক্যের দ্বারা যখন সাধ্যধর্ম্মীকে সাধ্যবর্ণনের ব্যাপ্যহেতু বিশিষ্ট বলিয়াই বুঝান হয়, তখন উপনয়-বাক্যের দ্বারা ঐ ভাবে সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার হয়, ইহা বলা যাইতে পারে এবং ঐ ভাবে সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার-বাক্যকে উপনয়-বাক্য বলা যাইতে পারে, ইহাই তাৎপৰ্য্য।

টীকাকারের কথা। জ্ঞানমঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন যে, সূত্রে “সাধ্যস্ত” এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে যষ্টি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুর উপসংহার-বাক্যই উপনয়। সূত্রে “হেতু” শব্দ না থাকিলেও উহা এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে। জয়ন্তভট্টের ব্যাখ্যায় কোন গোল নাই। ঋষিহৃত্রে এক বিভক্তি স্থানে অত্র বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও যায়। ভাষ্যকারও এখানে সাধ্যধর্ম্মীর সম্বন্ধে হেতুর উপসংহার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রায় “হেতু” শব্দ সূত্রে না থাকিলেও এখানে হেতুর উপসংহারই সূত্রকারের বিবক্ষিত, ইহা ভাষ্যকারও বুঝিয়াছিলেন। “সাধ্যস্ত” এই স্থলে সম্বন্ধ অর্থে যষ্টি বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেও উহার দ্বারা “সাধ্যধর্ম্মীতে” এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগস্থলেও সম্বন্ধ অর্থে যষ্টি বিভক্তির প্রয়োগ কোন কোন স্থলে দেখাও যায়। জয়ন্তভট্ট তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ফলকথা, জয়ন্তভট্ট বৈকুণ্ঠ বলিয়াছেন, সূত্রকার ও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকারের জ্ঞান কষ্টকল্পনা না করিলেও চলে।

ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে “শব্দ তত্রূপ উৎপত্তি-ধর্ম্মক” এইরূপ উপনয়বাক্যের দ্বারা যেমন সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুপদার্থের উপসংহার হয়, সেইরূপ “শব্দ তত্রূপ অমূল্যপত্তি-ধর্ম্মক নহে” এইরূপ উপনয়-বাক্যের দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুপদার্থের উপসংহার হয়। কারণ, শব্দ আত্মা প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞান অমূল্যপত্তি-ধর্ম্মক নহে, এই কথা বলিলে শব্দে অমূল্যপত্তি-ধর্ম্মকত্বের উপসংহার নিবেশ করা হয় অর্থাৎ শব্দে অমূল্যপত্তি-ধর্ম্মক নাই, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে ফলতঃ শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মক আছে, ইহাই বলা হইল। সূত্রায় ঐরূপ বাক্যের দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মী শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর উপসংহার হওয়ায়, ঐরূপ বাক্যও ঐ স্থলে “উপনয়বাক্য” হইবে। ঐ বাক্য পূর্ব্বোক্ত “বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ”-সাপেক্ষ হওয়ার উহা ঐ স্থলে “বৈধর্ম্ম্যোপনয়বাক্য”।

কোন প্রাচীন সম্প্রদায় “নচ নায়ং তথা” এইরূপ বাক্যকেই “বৈধর্ম্ম্যোপনয়” বাক্য বলিতেন। এই মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে “নচ নায়ং তথা” অর্থাৎ “শব্দ উৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে, ইহা নহে,” এইরূপ অর্থের বোধক ঐরূপ বাক্যই “বৈধর্ম্ম্যোপনয়”-বাক্য হইবে। কিন্তু মহর্ষি যখন “বৈধর্ম্ম্যোপনয়”-বাক্যের স্বরূপ প্রকাশ করিতে “ন তথা” এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মত মহর্ষি-সম্মত বলিয়া বুঝা যায় না। ভাষ্যকারও ঐরূপ বলেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় সাধ্যধর্ম্মীকে “অয়ং” এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া “তথা চায়ং” এইরূপ বাক্যকে “সাধ্যোপনয়”-বাক্য বলিতেন। ভাষ্যকার তাহাও বলেন নাই। পরবর্ত্তী নব্য-নৈয়ায়িকগণও ঐরূপ না বলিলেও অবশ্যব ব্যাখ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি প্রাচীনদিগের “তথা চায়ং” এইরূপ উপনয়-বাক্যের সংগতি দেখাইয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, উপনয়বাক্যে যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে, ইহা সূত্রকারের তাৎপর্য্য নহে। “বহিমান্ ধূমাত্” এইরূপ স্থলে “বহির্ব্যাপ্য ধূমবানয়ং” অথবা

১। সাধ্যত্বেন সপ্তমার্থে যষ্টি মন্তব্য। সাধ্যো ধর্ম্মিণি হেতোরূপসংহার উপনয়ঃ।—(জ্ঞানমঞ্জরী, উপনয়-সূত্র)।

“তথা চায়ং” এই দুই প্রকারই উপনয়বাক্য বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার সর্বত্রই উপনয়-বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্তী নব্যনৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই “উপনয়-বাক্যে” “তথা” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। এবং “অয়ং” এই বাক্যের দ্বারাই ধর্ম্মার নির্দেশ করিয়া “বহুব্রীহী ধূমবানয়ং” ইত্যাদি প্রকার বাক্যকেই “উপনয়” বলিয়াছেন এবং “উপনয়-বাক্য” হইবে “অয়ং” এই বাক্যের নিগমন-বাক্যে “অম্বুদ্বয়” করিলে “তস্মাদ্‌বহিমান্” ইত্যাদি প্রকার বাক্যও “নিগমন” হইতে পারে, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু এইরূপ বলেন নাই। (নিগমন-সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য) ॥৩৮॥

ভাষ্য । দ্বিবিধস্ত পুনর্হেতোর্দ্বিবিধস্ত চোদাহরণস্তোপসংহারস্বৈতে চ সমানম্ ।

অনুবাদ । দ্বিবিধ “হেতু”র সম্বন্ধে এবং দ্বিবিধ “উদাহরণে”র সম্বন্ধে এবং উপসংহারদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বিবিধ “উপনয়ে” (পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত “নিগমন”-বাক্য) সমান অর্থাৎ নিগমন-বাক্য সর্বত্রই এক প্রকার ।

সূত্র । হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনম্ ॥৩৯॥

অনুবাদ । হেতুকথনপূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন “নিগমন” (নিগমন নামক পঞ্চম অবয়ব) ।

বিস্তৃতি । উপনয়বাক্যের পরেই যে বাক্যটির প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার নাম “নিগমন” । পূর্বে যে হেতুর উল্লেখ করা হইবে, সেই “হেতু”র পূর্বোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিয়া সেই সঙ্গে— সর্বপ্রায়ে যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উল্লেখ করা হইবে, তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই ঐ সম্পূর্ণ বাক্যটি “নিগমন-বাক্য” হইবে। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে “তস্মাদ্‌হুংপত্তিবর্শ্বকস্বাদনিতাঃ শব্দঃ” অর্থাৎ সেই উৎপত্তি-বর্শ্বকস্ব হেতুক শব্দ অনিত্য, এইরূপ অর্থের বোধক বাক্য। ঐ বাক্যের প্রথমে পূর্বোক্ত হেতুর উল্লেখ হইয়াছে, শেষে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনরুল্লেখ হইয়াছে। এই “নিগমন”-বাক্যই পঞ্চমাবয়বের চরম অবয়ব। ইহার দ্বারাই ত্রায়বাক্যের উপসংহার বা সমাপ্তি করা হয়। স্থূল কথাই ইহাই প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের সারসংকলন। প্রতিজ্ঞাবাক্য, হেতুবাক্য, উদাহরণবাক্য এবং উপনয়বাক্যের দ্বারা পূর্বে পৃথক পৃথক ভাবে বাহা বলা হয়, সেইগুলি সমস্তই শেষে এই “নিগমন”-বাক্যের দ্বারা একবারে বলা হয়। এই নিগমন বাক্যই পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া উহাদিগকে একই প্রতিপাদ্যের প্রতিপাদক করে, এ জন্ত ইহার নাম “নিগমন” ।

ভাষ্য । সাধর্ম্ম্যোক্তে বা বৈধর্ম্ম্যোক্তে বা যথোদাহরণমুপসংহ্রিয়তে

তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি নিগমনম্ । নিগম্যন্তেহনেনেতি প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়া একত্রেতি নিগমনম্ । নিগম্যন্তে সমর্থ্যন্তে সম্বধ্যন্তে । তত্র সাধর্ম্যোক্তে তাবদ্ব্যক্তৌ বাক্যং “অনিত্যঃ শব্দ” ইতি প্রতিজ্ঞা । “উৎপত্তি-ধর্মকত্বা”দিতি হেতুঃ । “উৎপত্তি-ধর্মকং স্থালাদি দ্রব্যমনিত্য”মিত্যুদাহরণম্ । “তথা চোৎপত্তিধর্মকঃ শব্দ” ইত্যুপনয়ঃ । “তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ” ইতি নিগমনম্ । বৈধর্ম্যোক্তেহপি “অনিত্যঃ শব্দঃ” “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ”, “অনুৎপত্তি-ধর্মকমাত্মাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং”, “ন চ তথাহনুৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ” “তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ” ইতি ।

অনুবাদ । উদাহরণানুসারে হেতুবাক্য সাধর্ম্য প্রযুক্তই উক্ত হউক, আর বৈধর্ম্য প্রযুক্তই উক্ত হউক, অর্থাৎ তাদৃশ হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়া “সেই উৎপত্তিধর্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য” এইরূপ নিগমন-বাক্য উপসংহত হয় অর্থাৎ চরম বাক্যরূপে প্রযুক্ত হয় ।

(এই “নিগমন” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন) ইহার দ্বারা “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু,” “উদাহরণ” এবং “উপনয়” এক অর্থে নিগমিত হয়, এ জ্ঞা ইহাকে “নিগমন” বলিয়াছেন । নিগমিত হয়, কি না, সামর্থ্যযুক্ত হয়, সম্বন্ধযুক্ত হয় । অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়ব মিলিত হইয়া যে একাধের প্রতিপাদন করে, তাহাতে ঐ বাক্য-চতুষ্কয়ের যে সামর্থ্য বা পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক, পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্যই তাহা সম্পাদন করে ; এ জ্ঞা ঐ বাক্যের নাম “নিগমন” ।

[ভাষ্যকার পরিশেষে এখানে “সাধর্ম্য হেতু” ও “বৈধর্ম্য হেতু” স্থলে প্রতিজ্ঞা হইতে নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া পূর্বোক্ত স্থলে জ্ঞায়বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন] ।

সেই স্থলে (শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানস্থলে) সাধর্ম্যোক্ত হেতু হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত “সাধর্ম্য হেতু” স্থলে (১) “শব্দ অনিত্য” এই বাক্য প্রতিজ্ঞা । (২) “উৎপত্তিধর্মকত্ব জ্ঞাপক,” এই বাক্য হেতু । (৩) “উৎপত্তিধর্মক স্থানী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য,” এই বাক্য উদাহরণ । (৪) “শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তি-ধর্মক,” এই বাক্য উপনয় । (৫) “সেই উৎপত্তি-ধর্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য” এই বাক্য নিগমন । এবং বৈধর্ম্যোক্ত হেতু হইলে অর্থাৎ বৈধর্ম্য হেতু স্থলে (১) “শব্দ অনিত্য”

এই বাক্য প্রতিজ্ঞা। (২) “উৎপত্তি-ধৰ্মকল্প জ্ঞাপক”, এই বাক্য হেতু। (৩) “অনুৎপত্তি-ধৰ্মকল্প আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য দেখা যায়” এই বাক্য উদাহরণ। (৪) “শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তি-ধৰ্মকল্প নহে” এই বাক্য উপনয়। এবং (৫) “সেই উৎপত্তি-ধৰ্মকল্প-হেতুক শব্দ অনিত্য”, এই বাক্য নিগমন।

টিপ্পনী। নিগমন-বাক্য সৰ্ব্বত্রই একরূপ। ভাষ্যকার প্রথমেই সেই কথা বলিয়া হস্তের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ প্রথম ভাষ্যসন্দর্ভের সহিত হস্তের যোজনায় বুঝিতে হইবে। হস্তে “হেতু” শব্দের অর্থ এখানে হেতুবাক্য। অবয়ব প্রকরণে “হেতু” শব্দের দ্বারা হেতু-পদার্থ না বুঝিয়া হেতু-বাক্যরূপ অবয়বই বুঝা উচিত। “অপদেশ” শব্দের অর্থ এখানে কথন। পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ উত্তরবর্তিতা। তাহা হইলে হস্তের “হেতুপদোদ্যম” এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, হেতু-বাক্য কথনের পরে, অর্থাৎ হেতু-বাক্য কখনপূর্বক। তাহা হইলে সম্পূর্ণ হস্তের দ্বারা বুঝা যায়, “হেতুবাক্যের কখন পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন নিগমন।” যে কোন বাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থের কখনপূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থের পুনঃ কথনই হস্তার্থ বলিলে হস্তে “হেতু” শব্দের দ্বারা হেতু-পদার্থ এবং “প্রতিজ্ঞা” শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ বুঝিতে হয়, কিন্তু তাহা সহজে বুঝা যায় না; তাহাতে “প্রতিজ্ঞা” শব্দের যাহা প্রকৃত অর্থ এখানে বুঝা উচিত, তাহা বুঝা হয় না। অবয়ব প্রকরণে “প্রতিজ্ঞা” শব্দের দ্বারা প্রথম অবয়ব প্রতিজ্ঞা-বাক্যকেই বুঝা উচিত এবং তাহারই পুনঃ কথন সহজে উপপন্ন হয়। পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িক পূর্বোক্ত প্রকার হস্তার্থ বর্ণন করিয়াই পূর্বোক্ত স্থলে “তদ্বাদনিত্যঃ শব্দঃ” অথবা “তদ্বাদনিত্যোহয়ং” এইরূপ “নিগমন”-বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকার “হেতুবাক্য”-রই উল্লেখ করিয়া তাহার পরে পূর্বোক্ত প্রকার “প্রতিজ্ঞাবাক্য”-র উল্লেখ করিয়া “নিগমন-বাক্য” প্রদর্শন করিয়াছেন। হস্তের তাহার মতে হেতুবাক্যের কখন পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃকথনই হস্তার্থ বলিয়া বুঝা যায়। পূর্বে “উদাহরণ”-বাক্যের দ্বারা যে হেতু-পদার্থকে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝান হইবে এবং “উপনয়”-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য যে হেতু-পদার্থ সাধ্যধর্মীতে আছে, ইহা বুঝান হইবে, সেই হেতু-পদার্থকেই সেইরূপে “নিগমন”-বাক্যে প্রকাশ করিবার জন্ত—“নিগমন”-বাক্যে হেতু-বাক্যের প্রথমে “তদ্বাদ” এই বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে উৎপত্তি-ধৰ্মকল্প অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মী শব্দে বর্তমান, সেই উৎপত্তি-ধৰ্মকল্প-হেতুক শব্দ অনিত্য, ইহাই “নিগমন”-বাক্যের দ্বারা ঐ স্থলে বুঝান হইয়া থাকে। কেহ বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের “তদ্বাদ” এই কথার অর্থ অতএব। অর্থাৎ যেহেতু উৎপত্তি-ধৰ্মকল্প অনিত্যত্বের ব্যাপ্য এবং উহা শব্দে আছে, অতএব উৎপত্তি-ধৰ্মকল্প-হেতুক শব্দ অনিত্য, ইহাই ভাষ্যকারোক্ত “নিগমন”-বাক্যের অর্থ। ফলতঃ “নিগমন”-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের প্রতিপাদ্যই প্রকাশ করা হয়। “নিগমন”-বাক্যে “প্রতিজ্ঞা-বাক্য” ও “হেতু”-বাক্য মিলিত থাকে এবং “তদ্বাদ” এই কথার দ্বারা “উদাহরণ”-বাক্য এবং

“উপনয়”-বাক্যের কলিতার্থ প্রকটিত হইয়া থাকে। “তস্মাৎ” এই হলে “তৎ” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান বলিয়া বোধিত হেতু-পদার্থকেই সেইরূপে বুঝা যায়। পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িক কেবল “তস্মাৎ” এই কথার দ্বারাই পূর্ববোধিত হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি হেতু-বাক্যের কখনই স্বত্রকারের অভিমত হয়, “হেতুপদেশ” শব্দের দ্বারা স্বত্রকার তাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেবল “তস্মাৎ” এইরূপ বাক্য বলিলে চলিবে না। প্রকৃত হেতুবাক্য “উৎপত্তিধর্মকস্মাৎ” এইরূপ কথাই প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “উৎপত্তিধর্মকস্মাৎ” এই কথাটি তাহার পূর্বোক্ত “তস্মাৎ” এই কথারই ব্যাখ্যা বলা যায় না; কারণ, তিনি এখানে “নিগমন-বাক্য”র আকারই দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না। “তস্মাৎ” এই কথাটি পূর্বে না বলিলে, উৎপত্তিধর্মকস্মাৎ হেতুকে অনিত্যস্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মী শব্দে বর্তমান বলিয়া প্রকাশ করা হয় না, এই জগৎ পূর্বে “তস্মাৎ” এই কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায়, স্বত্রে যে “হেতুপদেশ” শব্দ আছে, উহার দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে হেতুবাক্যের কখনই ভাষ্যকার বুঝিয়াছিলেন। আর যদি ভাষ্যকারের “তস্মাৎ” এই কথার দ্বারা “অতএব” এইরূপ অর্থই বুঝা হয়, তাহা হইলে ঐরূপে হেতুবাক্যের কখনই স্বত্রোক্ত “হেতুপদেশ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয়। যাহারা “নিগমন”-বাক্যে পূর্বোক্ত হেতুবাক্যের উল্লেখ না করিয়া কেবল “তস্মাৎ” এই কথার দ্বারাই পূর্বজ্ঞাত হেতু-পদার্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারাও ঐ “তৎ” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান হেতুপদার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা, “সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান যে হেতুপদার্থ, সেই হেতুপদার্থের জ্ঞাপনীয় যে সাধ্যধর্ম, সেই সাধ্যধর্মবিশিষ্ট সাধ্যধর্মী” এই পর্য্যন্ত যে বাক্যের দ্বারা বুঝা যাইবে, তদ্বাক্যের অন্তর্গত ঐরূপ বাক্যবিশেষই “নিগমন”, ইহাই পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণের সমর্থিত হুল সিদ্ধান্ত। অনেকে সাধ্যধর্ম হেতু হলে “তস্মাত্তথা” এবং বৈধর্ম্যাহেতু হলে “তস্মান তথা” এইরূপ নিগমন-বাক্য বলিতেন; কিন্তু ঐরূপ বাক্যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনর্লচন নাই, “তথা” এবং “ন তথা” এইরূপ “প্রতিজ্ঞা” বাক্য হয় না। “প্রতিজ্ঞা”-বাক্য সর্বত্রই একরূপ এবং “নিগমন”ও সর্বত্র একরূপ, ইহা ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাবাক্যেই পুনর্লচন করিতে হইলে ভিন্ন প্রকার “নিগমন”-বাক্য হইতেও পারে না। তদ্বচিত্তান্বিতিকার গদেশও “তস্মাত্তথা” এইরূপ “নিগমন”-বাক্য কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহা বিশেষ বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় প্রশ্ন এই যে, “প্রতিজ্ঞা” বাক্য সাধ্যনির্দেশ, “নিগমন”-বাক্য সিদ্ধনির্দেশ, অর্থাৎ নিগমনবাক্যের পরভাগ প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্তই হয় না; সুতরাং মহাবি “নিগমনবাক্য”কে প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্লচন বলিতে পারেন না। যাহার কোন অংশে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ নাই, তাহাকে কি প্রতিজ্ঞার পুনর্লচন বলা যায়? এতদ্বত্তরে তৎপর্য্যটিকাঙ্কার বলিয়াছেন যে, যদিও “প্রতিজ্ঞা” সাধ্যনির্দেশ এবং “নিগমন” সিদ্ধনির্দেশ, তথাপি “প্রতিজ্ঞাবাক্য”র দ্বারা যে পদার্থটি সাধ্যরূপে বোধিত হয়, “নিগমনবাক্য”র দ্বারা সেই পদার্থটিই সিদ্ধরূপে বোধিত হয়, অর্থাৎ

“প্ৰতিজ্ঞাবাক্যে” যে পদাৰ্থে সাধ্য ছিল, “নিগমনবাক্যে” তাহাই সিদ্ধ হয়; সুতৰাং সাধ্য ও সিদ্ধৰূপ অবস্থাবিশিষ্ট একই পদাৰ্থ “প্ৰতিজ্ঞাবাক্য” ও “নিগমনবাক্যে”ৰ প্ৰতিপাদ্য হওয়ায় “নিগমনবাক্যে” “প্ৰতিজ্ঞা” শব্দেৰ গৌণপ্ৰয়োগ কৰিয়া মহৰি “নিগমন-বাক্য”কে “প্ৰতিজ্ঞা”ৰ পুনৰ্বচন বলিয়াছেন। অৰ্থাৎ “নিগমনবাক্য” বস্তুতঃ “প্ৰতিজ্ঞাবাক্য” না হইলেও কোন অংশেৰ দ্বাৰা প্ৰতিজ্ঞাৰ্ণেৰ প্ৰতিপাদক হওয়ায় এবং পৰভাগে “প্ৰতিজ্ঞাবাক্যে”ৰ সমানাকার হওয়ায় তাহাকে “প্ৰতিজ্ঞাবাক্যে”ৰ পুনৰ্বচন বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকাৰ “নিগমন” শব্দেৰ ব্যুৎপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিতে বলিয়াছেন যে, ইহাৰ দ্বাৰা প্ৰতিজ্ঞাদি চাৰিটি বাক্য একাৰ্থে নিগমিত হয়। “নিগমিত হয়” এই কথাৰ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন—“সমৰ্থিত হয়”। শেষে তাহাই আবার ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন—“সদ্ব্যবহৃত হয়”। অৰ্থাৎ প্ৰতিজ্ঞাদি চাৰিটি বাক্যেৰ যে পৰস্পৰ সদ্ব্যবহৃত আছে, “নিগমন-বাক্যে”ৰ দ্বাৰা তাহা বুজা যায়। পৰে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। অবয়বসমুদায়ে চ বাক্যে সমুদ্যেতরেতরাভিসম্বন্ধাৎ প্ৰমাণান্যৰ্থঃ সাধয়ন্তীতি। সম্ভবস্তাবৎ, শব্দবিষয়া প্ৰতিজ্ঞা, আশ্ৰয়-পদেশস্ত প্ৰত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্ৰতিসন্ধানাৎ, অন্বেষেচ স্বাতন্ত্ৰ্যানুপপত্তেঃ। অনুমানং হেতুঃ, উদাহরণে সংদৃশ্য প্ৰতিপত্তেঃ, তচ্ছোদাহরণভাষ্যে ব্যাখ্যাতম্। প্ৰত্যক্ষবিষয়মুদাহরণং, দৃষ্টেনাদৃষ্টসিদ্ধেঃ। উপমান-মুপনয়ঃ, তথৈতু্যপসংহাৰাৎ, ন চ তথৈতি চোপমানধৰ্ম্মপ্ৰতিষেধে বিপৰীত-ধৰ্ম্মোপসংহাৰসিদ্ধেঃ। সৰ্ব্বেষামেকাৰ্থপ্ৰতিপত্তৌ সামৰ্থ্যপ্ৰদৰ্শনং নিগ-মনমিতি।

ইতরেতরাভিসম্বন্ধোহ্যস্যত্যাং প্ৰতিজ্ঞায়ামনাশ্ৰয়া হেত্বাদয়ো ন প্ৰবৰ্ত্তেয়ন্। অসতি হেতৌ কস্য সাধনভাবঃ প্ৰদৰ্শ্যেত। উদাহরণে সাধ্যে চ কশ্চোপসংহাৰঃ স্যাৎ, কস্য চাপদেশাৎ প্ৰতিজ্ঞায়াঃ পুনৰ্বচনং নিগমনং স্যাদিতি। অসত্যুদাহরণে কেন সাধৰ্ম্ম্যং বৈধৰ্ম্ম্যং বা সাধ্যসাধনমুপাদৌ-য়েত, কস্য বা সাধৰ্ম্ম্যবশাদুপসংহাৰঃ প্ৰবৰ্ত্তেত। উপনয়কান্তৰেণ সাধ্যেহনু-পসংহতঃ সাধকৌ ধৰ্ম্মো নাৰ্থং সাধয়েৎ, নিগমনাভাবে চানভিব্যক্তসম্বন্ধানাং প্ৰতিজ্ঞাদোনামেকাৰ্থেন প্ৰবৰ্ত্তনং তথৈতি প্ৰতিপাদনং কশ্চৈতি।

অনুবাদ। অবয়ব সমূহৰূপ বাক্যে অৰ্থাৎ ব্যাখ্যাত প্ৰতিজ্ঞা প্ৰভৃতি নিগমন পৰ্য্যন্ত পঞ্চাবয়বাত্মক ত্ৰায়বাক্যে প্ৰমাণগুলি অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভৃতি চাৰিটি প্ৰমাণ

মিলিত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ অর্থ (সাধ্যপদার্থ) সাধন করে। সম্ভব অর্থাৎ অবয়বসমূহের মূলে প্রমাণ-চতুষ্টয়ের মিলন (দেখাইতেছি)।

প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দবিষয়, অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত কোন বিষয়ের প্রতিপাদক। কারণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা আপ্তবাক্যের (শব্দ-প্রমাণের) প্রতীক্ষান করিতে হয় অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা-কেই অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আবার ভাল করিয়া বুঝিতে হয় এবং বুঝাইতে হয়; সুতরাং যে বিষয়টি প্রতিপাদন করিতে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করা হয়, ঐ বিষয়টি শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত থাকায় ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের মূলে শব্দ-প্রমাণ থাকে। এবং ঋষিভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ ঋষিভিন্ন ব্যক্তির যখন আগমগম্য অলৌকিক তত্ত্বের দর্শন করেন নাই, তখন তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিলে তাঁহাদিগের সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য আগম-প্রমাণ হইতে পারে না। এই জন্তই তাঁহারা ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সাধনের জন্ত হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করেন এবং তাঁহাদিগের ঐ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের মূলে আগম-প্রমাণ আছে বলিয়াই, ঐ প্রতিজ্ঞাকে আগম বলা হইয়াছে।

হেতুবাক্য অনুমান প্রমাণ। কারণ, উদাহরণে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে সন্দর্শন করিয়া অর্থাৎ হেতু-পদার্থ ও সাধ্যধর্মের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্যক্রূপে বুঝিয়া (হেতুর) জ্ঞান হয়। তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থও সাধ্যধর্মকে দেখিয়াই যে ঐ উভয়ের সাধ্য-সাধনভাব বা ব্যাপক-ব্যাপ্যভাব বুঝা যায়, উহাদিগের মধ্যে একটি সাধন (ব্যাপ্য) এবং অপরটি তাহার সাধ্য (ব্যাপক), ইহা নির্ণয় করা যায়, ইহা উদাহরণ-ভাষ্যে (উদাহরণসূত্র ভাষ্যে) ব্যাখ্যা করিয়াছি।

[তাৎপর্য্য এই যে—দৃষ্টান্ত পদার্থে কোন পদার্থকে ব্যাপ্য এবং কোন পদার্থকে তাহার ব্যাপক বলিয়া বুঝিয়া অর্থাৎ এই পদার্থ যে যে স্থানে আছে, সেই সমস্ত স্থানে এই পদার্থ আছেই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই সেই ব্যাপ্য পদার্থটিকে হেতু বলিয়া বুঝা হয়। তদনুসারেই সেই হেতুর বোধক হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, পূর্বে ঐরূপ নিশ্চয় না হইলে কখনই হেতুবাক্য প্রয়োগ করা যায় না। পূর্বোক্ত প্রকারে হেতুনিশ্চয় অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য; সুতরাং তন্মূলক হেতুবাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে]।

উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষবিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বোধিত পদার্থের বোধক। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু ও সাধ্যধর্মের যে ব্যাপ্য-

ব্যাপকভাব দৃষ্ট হয়, তদ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মোক্তে যে পদার্থ দৃষ্ট নহে—অনুমেষ, সেই পদার্থের সিদ্ধি হয় (তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াই যখন উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তখন উদাহরণ-বাক্য প্রত্যক্ষমূলক ; এ জন্ম উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে ।)

উপনয়-বাক্য উপমান-প্রমাণ ; কারণ, “তথা” এই বাক্যের দ্বারা উপসংহার হইয়া থাকে,—অর্থাৎ উপনয়-বাক্যে “তথা” এই বাক্যের দ্বারা সাদৃশ্য বোধ হওয়ায় সেই সাদৃশ্য-জ্ঞান-মূলক উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে । এবং “ন চ তথা” এইরূপ বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ “তদ্রূপ নহে” এইরূপ বাক্যের দ্বারা উপমানের ধর্ম্মের নিষেধ হইলেও বিপরীত ধর্ম্মের উপসংহার সিদ্ধি হয়, [তাৎপর্য্য এই যে, বৈধর্ম্ম্য হেতু স্থলে যে উপনয়-বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহার দ্বারাও সাধ্য-ধর্ম্মোক্তে প্রকৃত হেতুরই উপসংহার সিদ্ধি হয় ; যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে “শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে” এইরূপ উপনয়-বাক্যের দ্বারা আত্মা প্রভৃতি যে উপমান অর্থাৎ দৃষ্টান্ত, তাহার ধর্ম্ম যে অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকহ, তাহা শব্দে নাই, এ কথা বলা হইলেও অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত আত্মাদি পদার্থের সহিত শব্দের সাদৃশ্য বোধ না হইয়া বিসদৃশ্য-বোধ হইলেও তাহারই ফলে ঐ অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের বিপরীত ধর্ম্ম যে উৎপত্তিধর্ম্মকহ, শব্দে তাহারই উপসংহার (অবধারণ) হইয়া পড়ে ।]

সকলগুলির অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, “উদাহরণ” এবং “উপনয়” এই চারিটি বাক্যের এবং তাহাদিগের মূলীভূত প্রমাণচতুষ্টয়ের একাধ্ব-বোধ বিষয়ে সামর্থ্য-প্রদর্শন অর্থাৎ উহারা মিলিত হইয়া যে একটি অর্থের বোধ জন্মাইবে, তাহাতে উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ বা আকাজক্ষা আবশ্যক, তাহার বোধক “নিগমন” ।

পরস্পর সম্বন্ধও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের পরস্পর আকাজক্ষা বা অপেক্ষাও (দেখাইতেছি) ।

“প্রতিজ্ঞা” না থাকিলে হেতু প্রভৃতি নিরাশ্রয় হওয়ায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না । “হেতু” না থাকিলে কাহার সাধনর প্রদর্শিত হইবে ? দৃষ্টান্ত পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মোক্তে কাহার উপসংহার করা হইবে ? কাহারই বা কখন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ব্বচন-রূপ “নিগমন” হইবে ?

“উদাহরণ” না থাকিলে কাহার সহিত সাধ্যম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যকে সাধ্যসাধন বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে ? কাহারই বা সাধ্যম্ম্য বশতঃ উপসংহার (উপনয়) প্রবৃত্ত হইবে ?

এবং “উপনয়ন”-বাক্য ব্যতীত সাধ্যধর্ম্মোক্তে অনূপসংহত সাধক ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্য-ধর্ম্মোক্তে যাহার উপসংহার করা হয় নাই, এমন হেতুপদার্থ অর্থ (সাধ্যপদার্থ) সাধন করিতে পারে না।

এবং “নিগমনবাক্যে”র অভাবে অনভিব্যক্তসম্বন্ধ অর্থাৎ নিগমনবাক্য না বলিলে যাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান হয় না, এমন প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের একার্থ বিশিষ্টরূপে প্রবর্তন কি না,—“তথা” এই প্রকারে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্য যে একার্থযুক্ত, সেই প্রকারে প্রতিপাদকতা কাহার হইবে? অর্থাৎ নিগমন-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, উহারা যে একই বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত, তাহা বুঝা যায়। নিগমন-বাক্য ব্যতীত তাহা কোন্ বাক্য প্রতিপাদন করিবে অর্থাৎ বুঝাইবে?

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মঞ্চি-কথিত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এই পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞানবাক্যে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ মিলিত হইয়া সাধ্যসাধন করে, অর্থাৎ ইহাদিগের মূলে চারিটি প্রমাণই আছে; সুতরাং এই পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া সাধ্যসাধন করিলে সেই সাধ্যপদার্থটি সর্বপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত বলিয়া, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য, তদ্বিষয়ে আর কাহারও বিরুদ্ধবাদ সম্ভব হইতে পারে না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই প্রথম-সূত্র-ভাষ্যে পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞানকে “পরম” বলিয়াছেন। এখন প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-সমূহে যে সর্বপ্রমাণের মিলন আছে, তাহা বুঝাইতে হইবে; তাই ভাষ্যকার প্রথম-সূত্র-ভাষ্যে সংক্ষেপে সেই কথা বলিয়া আসিলেও এখানে হেতুর উল্লেখ করিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যে “সম্বয়” এই কথার অর্থ মিলিত হইয়া; সংপূর্ণক ভূতাত্ত্বিক মিলন অর্থে প্রয়োগ আছে। তাই ভাষ্যকার শেষে “সম্বব” শব্দের দ্বারাই সেই মিলনকে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যে “সম্বব” শব্দের অর্থ এখানে মিলন। ভাষ্যকার তাহার কথিত প্রমাণচতুষ্টয়ের মিলন বুঝাইতে “প্রথম অবয়ব” প্রতিজ্ঞাকে বলিয়াছেন শব্দবিশয়, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যকে শব্দপ্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দ-প্রমাণ হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার দ্বারাই সাধ্যনির্ণয় হইতে পারায় হেতুপ্রভৃতি প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তবে ভাষ্যকার

১। অগ্নুঃ পৌরুষঃ ক্রপং ভগবান্ মহাবাহিঃ।

সমুৎকং বোদ্ধবলম্ব্যে লোকসিদ্ধক্য।

এই স্তোত্রের ব্যাখ্যায় বটসম্বর্ডে শ্রীজীব গোখরা লিখিয়াছেন,—মহাবাহিঃ সমুৎকং মিলিতং। সংপূর্ণো ভবতিঃ সংসম্বর্ডে এসিদ্ধ এব, সমুৎকংভোদিনিভোতি মহানকা নমাপগেত্যাদে। শ্রীকৃষ্ণসম্বর্ডের প্রারম্ভ এইরূপ।

প্রাচীন আচার্য্যগণ সস্তা অর্থেও “সম্বব” শব্দের প্রয়োগ করিতেন। প্রশ্নের সম্বব, কি না—প্রমাণের সস্তা, এইরূপও ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রশ্নপদগণীকরিত্ত্ব এইরূপ।

“প্রতিজ্ঞাকে” শব্দ-প্রমাণ বলিয়াছেন কিরূপে ? উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, আত্মা প্রভৃতি প্রমের পদার্থের প্রতিপাদন করিতেই এই তায়শাস্ত্রের স্রষ্টি। আত্মা প্রভৃতি পদার্থগুলি শাস্ত্রের দ্বারা যেদ্রুপে বুঝা গিয়াছে, সেইগুলিকে অহুমানের দ্বারা সেইরূপে প্রতিপাদন করাই “তায়ের” মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহারা শাস্ত্রার্থে বিবাদ করিবে এবং শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত তত্ত্ব মানিবে না, তাহার বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিবে, তাহাদিগকে যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সেই পদার্থকেই মানাইতে হইবে এবং সেই তত্ত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্যও মানাইতে হইবে, তজ্জন্ত “তায়” প্রয়োগ করিয়া বিচার করিতে হইবে। শাস্ত্রের দ্বারা যাহা যেদ্রুপে বুঝা হইয়াছে, তাহাকে সেইরূপে প্রতিপাদন করিতে যে “তায়” প্রয়োগ করা হইবে, তাহাই প্রকৃত তায়। তাহার প্রথম অবয়ব “প্রতিজ্ঞা” শব্দ-প্রমাণ না হইলেও শব্দ-প্রমাণ মূলক অর্থাৎ তাহার মূলে শব্দ-প্রমাণ আছে, কারণ, শব্দ-প্রমাণের দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত আছে, প্রতিজ্ঞা-বাক্যে তাহাই বিষয় হইবে। এই জন্ত ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাকে শব্দ-বিষয় বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞার মূলে শব্দ-প্রমাণ থাকায় উহা শব্দ-প্রমাণের তায় ; এ জন্ত ভাষ্যকার পূর্বে প্রতিজ্ঞাকে আগম বলিয়াছেন। যে প্রতিজ্ঞা আত্মাদি পদার্থের প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবে, তাহাও পরস্পরায় ঐ শাস্ত্র-প্রতিপাদিত আত্মাদি পদার্থের প্রতিপাদক হইবে। ফল কথা, যাহা প্রকৃত “তায়”, তাহাতে শব্দ-প্রমাণ-বোধিত বিষয়ই সাক্ষ্য এবং পরস্পরায় প্রতিপাদ্য হয়। সেই তায়ের দ্বারা শাস্ত্র-বোধিত পদার্থেরই দৃঢ়তর বোধ জন্মে এবং তাহাই “তায়ের” মুখ্য প্রয়োজন। এবং “প্রতিজ্ঞা”কে আগম বলিয়া আগমবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রকৃত প্রতিজ্ঞা হইবে না, উহা “প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। মূল কথা, শব্দ-প্রমাণ-মূলক প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত প্রতিজ্ঞা, মুখ্য প্রতিজ্ঞা ; তাহাই প্রকৃত তায়ের প্রথম অবয়ব, এ জন্ত ভাষ্যকার তাহাকে শব্দ-প্রমাণ বলিয়াই ধরিয়াছেন। যে প্রতিজ্ঞা শব্দ-প্রমাণ-মূলক নহে, শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধও নহে, (যেমন “পর্যন্ত বহিমান্” ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার ঐ কথা বলেন নাই। সেই সকল “তায়” প্রকৃত তায় নহে, অর্থাৎ যে “তায়” ব্যুৎপাদন করা তায়-বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য, সে “তায়” নহে। ভাষ্যকার এখানে “প্রতিজ্ঞা”ক শব্দবিষয় বলিয়া তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ এবং অহুমানের দ্বারা অগ্ণিবাক্যের প্রতিসন্ধান করিতে হয়। এই কথার তাৎপর্য এই যে, অগ্ণিবাক্যের দ্বারা যাহা বুঝা যাইবে, তাহাকেই অহুমানের দ্বারা আবার ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অপরকে বুঝাইতে হইবে। তাহার পরে প্রত্যাঙ্কের দ্বারা তাহাকে বুঝিলে আর সে বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা থাকিবে না। অগৌণিক তত্ত্বে সমাধি জন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলে, তখন তত্ত্ব-সাক্ষ্যকার জন্মিবে। ফল কথা, প্রথমতঃ শাস্ত্রের দ্বারা শ্রবণ-জ্ঞান লাভ করিয়া সেই শাস্ত্র-

১। তন্মাদ্বন্দ্যনি ন তায়নাত্তবর্জিনী প্রতিজ্ঞা আগমস্তথাপি প্রকৃতজ্ঞাত্তিপ্রায়েন ত্রষ্টব্যং। তথা চাপনাস্ত-
সন্ধানেন প্রতিজ্ঞায়াঃ কামতবিরহদ্বন্দ্বি নিরাকৃতং বেদিতব্যং।—প্রথম সূত্রভাষ্যে তাৎপর্যটীকা।

জ্ঞাত তবেরই অহুমানের দ্বারা প্রতিপাদন করিতে যে “প্রতিজ্ঞা”-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাতে শাস্ত্র-বোধিত বিষয়ই প্রতিপাদ্য হইবে; সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞা শব্দ-প্রমাণ-মূলক বলিয়া উহা শব্দ-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আপত্তি হইতে পারে যে, “প্রতিজ্ঞা”-বাক্যই শব্দ-প্রমাণ কেন হয় না? উহাকে শব্দ-প্রমাণ-মূলক বলিয়া গোণভাবে শব্দ-প্রমাণ বলা হইতেছে কেন? ভাষ্যকার এই আপত্তি মনে করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃত জ্ঞানের প্রথম অবয়ব প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদ্য হইবে, তদ্বিষয়ে ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই, অর্থাৎ বাহ্যারা ঐ সকল অলৌকিক তত্ত্ব দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তদ্বিষয়ের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহা লোকে মানিতে পারে না, এ জন্য তাঁহারা ঐ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিয়া শেষে হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়া সাধ্য পদার্থের সমর্থন করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদিগের ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের মূলে শব্দ-প্রমাণ থাকায়, তাহাকে শব্দ-প্রমাণ বলিয়া বলা হইতেছে। কল কথ্য, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির শাস্ত্রগম্য অলৌকিক তত্ত্ব পরতর; তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইতে প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলে তাঁহাদিগের ঐ বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না।

প্রতিজ্ঞার পরে “হেতু”-বাক্যকে অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। হেতুবাক্য বস্তুতঃ অহুমান-প্রমাণ না হইলেও হেতুবাক্যের দ্বারা হেতুপদার্থের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অহুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য করিয়া তাহার সম্পাদক হেতুবাক্যকে ভাষ্যকার অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, হেতুবাক্যের দ্বারা হেতুপদার্থের যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অহুমান-প্রমাণ নহে। প্রথমতঃ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুজ্ঞান হয়, তাহার পরে যে স্থানে সেই হেতুর দ্বারা কোন দর্শনের অহুমান করা হয়, সেই স্থানে হেতুজ্ঞান হয়; পরার্থীহুমানে ইহাই দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান। হেতুবাক্যের দ্বারা এই দ্বিতীয় হেতুজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। শেষে যে স্থানে সেই দর্শনের অহুমান করিতে হইবে, সেই স্থানে সেই অহুমের দর্শনের ব্যাপ্য হেতুপদার্থটি আছে, এইরূপে হেতুর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই তৃতীয় হেতুজ্ঞান। “উপনয়”-বাক্যের দ্বারা উহা জন্মিয়া থাকে। ঐ তৃতীয় হেতুজ্ঞানের পরেই অহুমিতি জন্মে; এ জন্য উহাই মুখ্য অহুমান-প্রমাণ। উহা হেতুবাক্যের দ্বারা জন্মে না; সুতরাং হেতুবাক্যকে অহুমান-প্রমাণ বলা যায় কিরূপে? ভাষ্যকার এই আপত্তি মনে করিয়া হেতুবাক্য অহুমান-প্রমাণ কেন, তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, উদাহরণে সম্যক দর্শন করিয়া হেতুপদার্থের জ্ঞান হয়। ভাষ্যে এখানে “উদাহরণ” শব্দের অর্থ বাহ্য উদাহৃত হয়, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থ। উদাহরণ বাক্য নহে। “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা উদাহরণ বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থও বুঝা যায়। এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ অর্থেও সূত্রে ও ভাষ্যে “উদাহরণ” শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। অনেক পুস্তকেই এখানে “সাদৃশ্যপ্রতিপত্তিঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু “সংদৃশ্য প্রতিপত্তিঃ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত। কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠই আছে। তাৎপর্য্য-টীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু পদার্থ ও সাধ্যদর্শনের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ সম্যকরূপে দর্শন করিয়া অর্থাৎ এই পদার্থ থাকিলে সেখানে এই পদার্থ থাকিবেই, ইহা কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে

স্বার্থরূপে বুঝিয়া হেতুর জ্ঞান হয় অর্থাৎ সেই ব্যাখ্যা পদার্থটিকে হেতু বলিয়া বোধ জন্মে। তাৎপর্য-টীকাকার শেষে ইহার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে 'যদিও প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হেতুজ্ঞান এবং হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি স্মরণ, এই সবগুলিই অহুমান-প্রমাণ (পঞ্চম সূত্র টিপ্পনো দ্রষ্টব্য), তাহা হইলেও হেতুব্যাক্যজ্ঞ যে দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান, তাহাকেই এখানে ঐ সমস্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়া অহুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ পরার্থানুমানস্থলে ঐ দ্বিতীয় হেতু জ্ঞানের সম্পাদক বলিয়া হেতুব্যাক্যকে অহুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ফল কথা, হেতুব্যাক্য-জ্ঞ হেতুজ্ঞানকেও অহুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য করিয়া, উহা যাহা হইতে জন্মে, সেই হেতুব্যাক্যকে ভাষ্যকার অহুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উপনয়-ব্যাক্য জ্ঞ যে হেতুজ্ঞান জন্মে, তাহা মুখ্য অহুমান-প্রমাণ হইলেও হেতু-ব্যাক্যজ্ঞ হেতুজ্ঞানও অহুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য। তাৎপর্য-টীকাকার প্রথম সূত্রভাষ্যে এই প্রস্তাবে বার্তিকের তাৎপর্যবর্ণনায় বলিয়াছেন যে, প্রথমতঃ যেখানে হেতুপদার্থের জ্ঞান হয়, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থকে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়াই জ্ঞান হয়। শেষে যখন সেই হেতুর দ্বারা কোন স্থানে সেই সাধ্যধর্মটির অহুমান হয়, তখন সেই স্থানে যে দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান হয়, তাহা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া হেতুর জ্ঞান না হইলেও উহার দ্বারা হেতুপদার্থে পূর্ণানুভূত সেই ব্যাপ্তিরূপ স্বক্কে স্বতি জন্মে; সূত্রাতঃ উহা ব্যাপ্তি স্বক্কে স্বরূপ হওয়ায়, ঐ ব্যাপ্তি স্মরণরূপ অহুমানের সহকারী কারণ। এই ভাবে অহুমান-প্রমাণের সহকারী কারণ ঐ দ্বিতীয় হেতুজ্ঞানও অহুমান-প্রমাণ হওয়ায় তাহার সম্পাদক হেতুব্যাক্যকে অহুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ফলতঃ হেতুব্যাক্য যদি অহুমান-প্রমাণ সম্পাদন করিল, তাহা হইলে হেতুব্যাক্যকে ঐ ভাবে অহুমান প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে; ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন, বস্তুতঃ হেতুব্যাক্যটিই যে অহুমান-প্রমাণ, ইহা ভাষ্যকারের কথা নহে। মনে রাখিতে হইবে, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়বে চারিটি প্রমাণের মিলন দেখাইতেই ভাষ্যকার এ সকল কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যব্যাক্যের সাহায্যে যখন অহুমান-প্রমাণকেই মুখ্যরূপে আশ্রয় করা হয়, তখন সেখানে অহুমান-প্রমাণ মুখ্যরূপেই আছে।

হেতুব্যাক্যের পরে উদাহরণ-ব্যাক্যকে প্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়। তাৎপর্যটীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে, হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের যে ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহার দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে অল্পমের পদার্থের নিক্তি (অহুমিতি) হয়। শেষে তাৎপর্য বলিয়াছেন যে, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান হইতে গেলে তাহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছেই নচেৎ অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান কোনরূপেই হইতে পারে না। অহুমানের দ্বারা তাহার জ্ঞান যেখানে হইবে, সেখানে হেতু আবশ্যক; সেই হেতু থাকিলেই যে সেই

১। এতদ্ব্যতীত ভবতি যথাপি ত্রয়াণামপিসিদ্ধিবর্ণনানাং সম্বর্তনানুমানং তথাপি তবৎকালে মধ্যমেংপি সিদ্ধিবর্ণনে সমুদায়োপচারানুমান ব্যাপ্ণে ইতি—(তাৎপর্যটীকা)।

পদার্থটি দেখানে থাকিবেই, ইহা বার্থ্যরূপে নিশ্চয় করা আবশ্যক। ইহাকেই বলে ব্যাপ্তিনিশ্চয়, ইহার জন্ত দৃষ্টান্ত আবশ্যক। অহুমানের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিলে সেই অহুমানের হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক। এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছেই; এই জন্তই মহর্ষি অহুমানকে প্রত্যক্ষ-বিশেষবুলক জ্ঞান বলিয়াছেন। কলকথা, কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে, হেতুপদার্থে সাধ্যবর্ণের যে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, তাহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকায় এবং উদাহরণ-বাক্যটি সেই মূলভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপত্তি হওয়ায়, উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ উদাহরণ-বাক্যটি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাহা নহে। তাৎপর্য্যটিকাকার প্রথম সূত্র-ভাষ্যে এই প্রস্তাবে বার্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যে প্রত্যক্ষ পদার্থটিতে পূর্বে হেতু-পদার্থে সাধ্যবর্ণের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে, উদাহরণ-বাক্যটি সেই পদার্থের স্মারক হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থলে যেমন কোন বিবাদ থাকে না, তদ্রূপ উদাহরণ-বাক্য বলিলেও, কোন বিবাদ থাকে না; কারণ, উদাহরণ-বাক্যটি মূলভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপত্তি, সুতরাং উদাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভূলা; এই জন্ত উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে।

উদাহরণ-বাক্যের পরে “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উদ্যোতকের ইহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, উপমান-বাক্যে যে “তথা” শব্দটি থাকে, উপনয়-বাক্যেও সেইরূপ “তথা” শব্দ থাকায় উপনয়বাক্যে উপমান-বাক্যের একাংশ থাকে (যদি সূত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।) তাৎপর্য্যটিকাকার উদ্যোতকের তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, “তথা চায়ং” অর্থাৎ “ইহা তদ্রূপ” (তৎসদৃশ), এইরূপে প্রবর্তমান উপনয়-বাক্য “তথা” শব্দকে অপেক্ষা করে, সুতরাং উপনয়বাক্যের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত উদাহরণ-বাক্যে যে “যথা” শব্দ থাকে, তাহার সহিত উপনয়বাক্যের “তথা” শব্দের যোগ হওয়ায় একটা সাদৃশ্য বোধ জন্মে। যেমন “যথা পাকশালা তথা পর্কত”, “যথা স্থানো তথা শব্দ” ইত্যাদি। উপমান-প্রমাণের মূল উপদেশ-বাক্য এবং তাহার অর্থ স্মরণ এবং সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ, এই সবগুলিই কেহ সাক্ষাৎ ও কেহ পরস্পরায় উপমান-প্রমাণ। তন্মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষরূপ উপমান-প্রমাণের একাংশ সাদৃশ্যে যে “যথা তথা ভাব”টি থাকে, অর্থাৎ যেমন “যথা গো, তথা গরুর” এই বাক্যের দ্বারা অবগত সাদৃশ্যে যে ভাবটি থাকে, উপনয়-বাক্যেও ঐ “যথা তথা ভাব”টি থাকে বলিয়া তাহাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ উপমান-বাক্য বস্তুতঃ উপমান-প্রমাণ না হইলেও উপমান-প্রমাণ সদৃশ বলিয়া ভাষ্যকার তাহাতে “উপমান” শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্যোতকের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটিকাকার এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিষয়ে আরও চিন্তা করা উচিত মনে হয়। প্রথম কথা মনে করিতে হইবে যে, ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাদি অবয়বসমূহে চারিটি প্রমাণ দেখাইবার জন্তই “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। ছায়বাক্যে চারিটি প্রমাণ সাক্ষাৎ ও পরস্পরায় মিলিত হইয়া বস্তু সাধন করে, ইহাই কিন্তু ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য এবং এই যুক্তিতেই ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকে “পরম স্মার” বলিয়াছেন। এ কথা উদ্যোতকের ও বাচস্পতি

দ্বিশ্রুও সেখানে লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের মত ব্যাখ্যায় প্রতিজ্ঞাদি চারিট অবয়ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণমূলক, এইরূপ কথাও তাৎপর্যটীকাকার এবং তাৎপর্যপরিষ্কার প্রকাশ-টীকাকার প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। কিন্তু যদি উপনয়-বাক্যে উপমান-প্রমাণের বস্তুতঃ কোন বিশেষ সন্ধন না থাকে, তাহা হইলে উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যে কোন একটা সাদৃশ্য লইয়া উপনয়বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিলে উপনয়-বাক্যের মূলে উপমান-প্রমাণ আছে, ইহা বলা হয় না। তাহা না বলিতে পারিলেও প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-সমূহে সর্বপ্রমাণ মিলিত হইয়া বস্তু সাধন করে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। উপনয়বাক্য যদি উপমান-প্রমাণের ফল নিষ্পাদন না করে, তাহা হইলে আর কিরূপে উহাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়? কেবল উপমান-প্রমাণের যে কোন একটা সাদৃশ্য থাকতেই উপনয়বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমার মনে হয়, ভাষ্যকারের মতে “উপনয়”-বাক্যের দ্বারা যে সাদৃশ্যবোধ জন্মে, “উপনয়”-বাক্যটি ঐরূপ সাদৃশ্য-জ্ঞানমূলক,—ঐ সাদৃশ্য-জ্ঞানকেই উপমান বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উপনয়-বাক্য সাদৃশ্য-জ্ঞানমূলক এবং সাদৃশ্যজ্ঞানরূপ উপমান-প্রমাণের নিষ্পাদক। “যেমন হালী” তদ্রূপ শব্দ” এইরূপ বাক্যার্থবোধ হইলে অনিত্য স্থায়ীর সহিত শব্দের একটা সাদৃশ্যবোধ জন্মে। প্রদর্শিত হলে উৎপত্তিবর্ণকরই সেই সাদৃশ্য। “হালী যেমন উৎপত্তিবর্ণক, শব্দও তদ্রূপ উৎপত্তিবর্ণক” ইহাই ঐ হলে উপনয়-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উদাহরণ-বাক্যে “যথা” শব্দ না থাকিলেও উপনয়-বাক্যে “তথা” শব্দ থাকার “যথা” শব্দের জ্ঞানপূর্বক উপনয়-বাক্যের দ্বারাই ঐরূপ সাদৃশ্য বোধ জন্মে। অবশ্য ঐরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানকে এবং তাহার ফল তত্ত্বজ্ঞানকে কোন নৈরায়িকই উপমান-প্রমাণ ও উপমিতি বলেন নাই। শব্দবিশেষের অর্থবিশেষ নিশ্চয়ই উপমান-প্রমাণের ফল বলিয়া প্রধান স্মার্যচাৰ্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমও দ্বিতীয়াধ্যায়ে উপমানের অতিরিক্ত প্রামাণ্য সমর্থনে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও ঐ সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যখন “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন, তখন তিনি উপমানের দ্বারা শব্দার্থ-নিশ্চয় ভিন্ন অল্প প্রকার বোধও জন্মে—এই মতাবলম্বী, ইহা বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু ভাষ্যকার মহর্ষি গোতমের উপমান-লক্ষণ-সূত্রের (৬ সূত্র) ভাষ্যে উপমান-প্রমাণের প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, “ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।” তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা সেখানে বৈধর্ম্যোপমিতির সমর্থন করিয়াছেন এবং সেখানে ভাষ্যকারকে “ভগবান্” বলিয়া ভাষ্যকারের মত অবশ্য-গ্রাহ্য এবং উহাও মহর্ষি গোতমের সম্মত, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন (যষ্ঠ সূত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

উপমান-প্রমাণের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নোত্তরে ভাষ্যকার যষ্ঠ সূত্রভাষ্যে প্রথমে সংজ্ঞাসংজ্ঞা-সন্ধন-নিশ্চয়কে অর্থাৎ এই পদার্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপে শব্দার্থ-নিশ্চয়কে উপমান-প্রমাণের

প্রয়োজন বলিয়াছেন। এবং সেখানে “ইহা (মহাবি) বলিয়াছেন”, এইরূপ কথাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহার পরে ভাষ্যকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, “ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।” ভাষ্যকার ঐ ভাবে শেষে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? তাহা ভাবিতে হইবে। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা যদি বুঝা যায় যে, অগতে সংজ্ঞাসংক্রি-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্তরূপ তত্ত্বও উপমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, মহাবি গোতম ইহা কণ্ঠতঃ না বলিলেও ইহা তাহার মত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে শব্দার্থ-নিশ্চয়ের দ্বারা অন্তরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ও উপমান-প্রমাণের দ্বারা অনেক স্থলে হইয়া থাকে, ইহা ভাষ্যকারের মত বলা যাইতে পারে। এবং তাহা হইলে ভাষ্যকার যে উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ^১ ভাষ্যকারের ঐ কথার উল্লেখ করিয়া যেরূপ উদাহরণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যবোধিকার প্রভৃতি ঐরূপ তাৎপর্য বর্ণনা না করিলেও এবং শব্দার্থ-নিশ্চয় ভিন্ন অন্তরূপ তত্ত্বের নিশ্চয়ও উপমানের দ্বারা হইয়া থাকে, এই মত কোন প্রধান ছায়াচাৰ্য্য স্বীকার না করিলেও ভাষ্যকারের যে ঐরূপ মত ছিল, ইহা বুঝিবার পক্ষে পূর্বোক্ত কারণগুলি সুদীর্ঘণের চিন্তনীয়।

বস্তুতঃ “গবয়” শব্দ “করত” শব্দ প্রভৃতির অর্থ-নিশ্চয়ই যদি কেবল উপমান-প্রমাণের ফল হয়, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপযোগিতা বিশেষ কিছুই থাকে না। যদি উহার দ্বারা অন্তরূপ তত্ত্ব-নিশ্চয়ও জন্মে, তাহা হইলে উহার মোক্ষোপযোগিতা থাকিতে পারে। নচেৎ উপমান-প্রমাণ মুমুকুর কোন বিশেষ কার্যে আবশ্যক, এই প্রশ্নের সহজর দেওয়া যায় না। বেদাদি শাস্ত্রে অনেক স্থানে সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়া অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সকল স্থানের অনেক স্থলে সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারা যে স্বল্প তত্ত্ব বুঝা যায়, তাহাকে উপমান-প্রমাণের ফল বলিলে উপমান-প্রমাণ বিশেষরূপে মোক্ষোপযোগী হইতে পারে। মীমাংসকগণ উপমান-প্রমাণের ঐরূপই উপযোগিতা বর্ণন করিয়াছেন। ভট্ট কুমারিলের “শ্লোকবার্ত্তিক”র “উপমান পরিচ্ছেদ” দেখিলে ইহা পাওয়া যাইবে। মীমাংসাভাষ্যকার শবর স্বামীও উপমান-প্রমাণের দ্বারা অন্তবিধ তত্ত্বনিশ্চয়ের কথা^২ বলিয়াছেন। অবশ্য বাহারা “উপমান” নামে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার করা আবশ্যক মনে করেন নাই, তাহারা ঐরূপ বলিতে পারেন না। কিন্তু মহাবি গোতম বখন মীমাংসকের দ্বারা উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তখন মীমাংসকের দ্বারা “উপমান”-প্রমাণের দ্বারা স্থলবিশেষে অন্তবিধ তত্ত্বনিশ্চয়ও জন্মে, ইহা গোতমের মত ছিল বলিতে বাধা কি? তবে শব্দবিশেষের অর্থবিশেষ নিশ্চয় কোন কোন স্থলে “উপমান” প্রমাণের দ্বারা হই, হয়,

১। এবংজ্ঞানোপমানস্ত বিষয় ইতি ভাষ্যং বখা—মূলপর্বা সপ্তমী ওষধী বিধং ইত্যতিদেশবাক্যার্থে জ্ঞাতো মূলপর্বা সাদৃশ্যজ্ঞানে জ্ঞাতো ইহমোষধী বিধবর্ণনোপমিত্যাবিধরী ক্রিয়ত ইত্যাদি।—বট্ট স্বত্রবৃত্তিঃ।

২। উপমানোচ্চোপনিষতে বাতৃশং ভবান্ পরমাঝান্ পশ্যতি অনেনোপন্যাসেনাবপচ্ছ অহবশি তাদৃশমেন পশ্যামীতি ইত্যাদি।—(শবর-ভাষ্য, পঞ্চম পৃষ্ঠা)।

উহা সেখানে অল্প প্রমাণের দ্বারা হইতেই পারে না; সুতরাং “উপমান” নামে অতিরিক্ত প্রমাণ দিচ্ পদার্থ, এইটি গোতমের বিশেষ যুক্তি। এই জন্তই মহর্ষি গোতম “উপমানে”র অতিরিক্ত প্রামাণ্য সমর্থন স্থলে ঐ কথাটিরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারি। তাহাতে “উপমান”-প্রমাণের অল্প কলের নিবেদন করা হয় নাই। পরন্তু নিবেদন না করিলে পরের মত অসম্মত হয়, এ কথা চতুর্থ স্বত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার উপমান-প্রমাণ স্থলেও গোতমের অনিবিদ্ধ মীমাংসক-মত গোতমের অসম্মত বলিবেন না কেন?

পূর্বোক্ত সমস্ত কথাগুলিতে পরবর্তী স্তায়চার্য্যগণের সম্মতি না থাকিলেও ভাষ্যকার যখন “উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং ষষ্ঠ স্বত্রভাষ্যে “ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় আছে” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন, তখন ভাষ্যকারের উপমানের বিষয় বিষয়ে মত-কিরূপ, তাহা সূচীকণ চিন্তা করিবেন। এবং উপনয়-বাক্যের মূলে যদি বস্তুতঃ উপমান-প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে ভাষ্যকার উপনয়-বাক্যকে কিরূপে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং কিরূপেই বা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাশবসে সর্বপ্রমাণ নিগিত হইয়া বস্তু সাধন করে, এই কথা বলিয়াছেন, ইহাও সূচীকণ চিন্তা করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিবেন। সূচীকণের সমালোচনার জন্তই পূর্বোক্ত কথাগুলি লিখিত হইল।

“বৈবৰ্ণ্যোপনয়”-বাক্য স্থলেও ফলে সাধ্যবস্মীতে প্রকৃত হেতুরই উপসংহার হইয়া থাকে। কারণ, ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে “শব্দ তরুণ অমুংপত্তি-বস্মক নহে” এইরূপ বাক্যই “বৈবৰ্ণ্যো-পনয়।” উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের জ্ঞান অমুংপত্তিবস্মক নহে। তাহা হইলে শব্দে উৎপত্তি-বস্মক আছে, ইহাই বুঝা হয়। তাহা হইলে ঐ স্থলে শব্দরূপ সাধ্যবস্মীতে অনিত্যবস্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তি-বস্মক হেতু, তাহারই উপসংহার বা নিশ্চয় হয়। শব্দে ঐ উৎপত্তি-বস্মকের জ্ঞানই শব্দে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের বৈবৰ্ণ্য-জ্ঞান। ঐ উৎপত্তি-বস্মককে আত্মা প্রভৃতির বৈবৰ্ণ্যরূপে পূর্বোক্ত “বৈবৰ্ণ্যোপনয়”-বাক্যের দ্বারা বুঝা হয়; সুতরাং “বৈবৰ্ণ্যোপনয়”-বাক্যকে বৈবৰ্ণ্যোপমান বলিয়াই ভাষ্যকার বলিবেন। ফলকথা, পূর্বোক্ত প্রকারে অল্পবিধ তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্ত বৈবৰ্ণ্যোপমানও ভাষ্যকারের সম্মত বলিয়া বুঝা যায়; নচেৎ “বৈবৰ্ণ্যোপনয়” স্থলে ভাষ্যকার উপমান বলিয়া ধরিবেন কাহাকে? ভাষ্যকার এখানে নিজেই বলিয়াছেন যে, “তরুণ নহে” এই কথার দ্বারা উপমানের বস্ম নিবেদন করিলেও তদ্বারা বিপরীত বস্মেরই উপসংহার হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলের “উপনয়”কে যখন “বৈবৰ্ণ্যোপনয়” বলা হইয়াছে, তখন ঐ “উপনয়”কে ভাষ্যকার “বৈবৰ্ণ্যোপমান” বলিয়াই পূর্বোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিতেন, ইহা বুঝা যায়।

“তাৎপৰ্য্য পরিশুদ্ধি”তে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদিও “নিগমন”-বাক্যেও প্রমাণ-বিশেষের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলেও ভাষ্যকার সামান্ততঃ অবয়ব-সমূহে সর্বপ্রমাণের মিলন আছে বলিয়া, শেষে “নিগমনে”র মূল বলিয়া কোন প্রমাণের উল্লেখ না করাতেও কোন দোষ হয় নাই। কারণ, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যই তাহার সর্বপ্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়া গিয়াছে।

পরন্তু গোষ্ঠম-মতে প্রত্যক্ষাদি চারিটি ভিন্ন কোন প্রমাণ নাই। “নিগমন”-বাক্যের মূলে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ না থাকায় উহা বলা নিশ্চয়োজন।

ভাষ্যকার “নিগমন”-বাক্যের প্রয়োজন বুঝাইতে শ্বেবে বলিয়াছেন যে, সবগুলির একার্থবোধে সামর্থ্য-প্রদর্শক বাক্যই “নিগমন”। তাৎপর্যগোচক্যকার এই কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি উপনয় পর্য্যন্ত চারিটি বাক্যের একটি অর্থ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য যে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য হেতু, অথবা অল্পমেষধর্ম, তাহা বুঝিতে ঐ চারিটি বাক্যের যে সামর্থ্য অর্থাৎ পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা আবশ্যক, নিগমনবাক্য তাহারই প্রদর্শক অর্থাৎ বোধক। শ্বেবে বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য যে হেতু, তাহার জ্ঞান নিগমনের গোণ প্রয়োজন। সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যধর্মের জ্ঞানই নিগমনের মূখ্য প্রয়োজন। নিগমনের প্রয়োজন এইরূপে বিবিধ। তাৎপর্যগোচক্যকার প্রথম সূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় এই স্থলে বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্য মিলিত হইয়া যে একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাতে ঐ চারিটি বাক্যের একবাক্যতা-বুদ্ধি আবশ্যক। ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা না বুঝিলে উহাদিগের একবাক্যতা বুঝা হয় না। প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের এবং উহাদিগের মূলভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের পরস্পর সাকাক্ষকতাই তাহা “সামর্থ্য” শব্দের অর্থ। নিগমন-বাক্য উহা বুঝিয়া থাকে, এ জন্ত নিগমন-বাক্য আবশ্যক। বিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারিত “অবয়ব”গুলির যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহাকে “আকাঙ্ক্ষা” বলে। ভাষ্যকার শেষে সেই আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষাও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা-বাক্যই সর্বপ্রধান। কারণ, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। “প্রতিজ্ঞা” না থাকিলে হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগই হইতে পারে না; সূত্রায়ং সর্বগ্রাণে প্রতিজ্ঞা বলিতে হইবে। প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে হেতু কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। প্রথমই হেতুবাক্যের অপেক্ষা থাকে না। হেতুবাক্য না বলিলেও সাধ্যধর্মের সাধন কি, তাহা বলা হয় না, দৃষ্টান্ত এবং সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুপদার্থ আছে, ইহাও বলা হয় না,—হেতুকখন পূর্বক প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনর্কচনরূপ নিগমন-বাক্যও বলা বাইতে পারে না। কারণ, এ সমস্তই হেতুসাপেক্ষ। উদাহরণবাক্য না বলিলে দৃষ্টান্ত কি, তাহা বুঝা যায় না; সূত্রায়ং দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম বা বৈধর্ম্ম্যকে

১। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি বাক্য বিচ্ছিন্নরূপেই উচ্চারিত হয়। উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা না বুঝিলে উহাদিগের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝা বাইতে পারে না। পৃথক পৃথক বাক্যের দ্বারা পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন চারিটি অর্থই বুঝা বাইতে পারে; হতরাং উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝা আবশ্যক। উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই এখানে উহাদিগের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা। উহা বুঝিলেই ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের “একবাক্যতা” বুঝা হয় এবং উহারই নাম “বাটাকাক্যাক্যতা।” বংধি বৈমিনি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন,—“অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাক্ষকৈ-
ত্বে ত্বে” (পূর্ববীমাংসা-বর্ণন, ২অঃ, ১পাদ, ৪০ সূত্র) অর্থাৎ বিচ্ছিন্নরূপে পঠিত বাক্যগুলি যদি পরস্পর সাকাক্ষক হয়, তাহা হইলে একার্থের প্রতিপাদক হওয়ার উহারা “একবাক্য” হয়। অল্পমিতলৌবিত্তির টীকায় বদাধর ভট্টাচার্য্য “একবাক্যতা” বুঝাইতে বৈমিনির এই সূত্রট উদ্ধৃত করিয়া শেষে কলিতার্থ বলিয়াছেন যে, পরস্পর মিলিত হইয়া বিশিষ্ট একটি অর্থের প্রতিপাদকতাই একবাক্যতা।

সাধ্যসাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, উদাহরণস্বরূপে উপনয়বাক্যও বলা যায় না। উপনয়বাক্য না বলিলেও সাধ্যধর্মীতে হেতু আছে, ইহা বলা হয় না ; সূত্রাং হেতুরূপে গ্রহীত পদার্থ সাধ্যসাধন করিতে পারে না। নিগমন-বাক্য না বলিলে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ অভিযুক্ত হয় না অর্থাৎ উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝা যায় না ; তাহা না বুঝিলেও অর্থাৎ উহাদিগের পরস্পর-সাকাক্ষতা না বুঝিলেও উহাদিগের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ হইতে পারে না। ভাষ্যে “একার্থেন প্রবর্তনং” এই কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে, একার্থ-বিশিষ্ট-রূপে প্রবর্তকতা। শেষে আবার ঐ কথাই বিবরণ করিয়াছেন,—“তথেন্টি প্রতিপাদনং”। অর্থাৎ নিগমনবাক্য ব্যতীত আর কেহ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যকে সেই প্রকারে (উহার যে একার্থযুক্ত, উহার যে পরস্পর-সাকাক্ষ, উহার যে একবাক্য, এই প্রকারে) প্রতিপাদন করিতে পারে না। নিগমন-বাক্যই উহাদিগকে ঐ প্রকার বলিয়া বুঝাইয়া থাকে। নিগমন-বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্যগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, উহার একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতেই প্রযুক্ত। ভাষ্যে “প্রতিপাদনং” বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে প্রতিপাদকতা।

ভাষ্য। অথাবয়বার্থঃ—সাধ্যস্য ধর্মস্য ধর্মিণা সম্বন্ধোপাদানং প্রতিজ্ঞার্থঃ। উদাহরণেন সমানস্য বিপরীতস্য বা সাধ্যস্য ধর্মস্য সাধক-ভাববচনং হেতুর্থঃ। ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধন-ভাবপ্রদর্শনমেকত্রোদাহরণার্থঃ। সাধনভূতস্য ধর্মস্য সাধ্যেন ধর্মেণ সামান্যাদিকরণ্যোপপাদনমুপনয়ার্থঃ। উদাহরণস্বল্পোক্তধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবোপপত্তৌ সাধ্যে বিপরীত-প্রসঙ্গ-প্রতিষেধার্থং নিগমনম্।

ন চৈতস্ত্যাং হেতুদাহরণ-পরিশুদ্ধৌ সত্যং সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্য-বস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বং প্রক্ৰমতে। অব্যবস্থাপ্য খলু ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবমুদাহরণে জাতিবাদী প্রত্যবর্তিত্তে। ব্যবস্থিতে হি খলু ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবে দৃষ্টান্তস্থে গৃহমাণে সাধনভূতস্য ধর্মস্য হেতুস্বেনোপাদানং, ন সাধর্ম্যমাত্রস্য ন বৈধর্ম্যমাত্রস্য বেতি।

অনুবাদ। অনন্তর অবয়বগুলির প্রয়োজন (বলিতেছি)। ধর্মের সহিত অর্থাৎ যে ধর্মীতে কোন ধর্মের অনুমান করিতে হইবে, সেই ধর্মের সহিত সাধ্য ধর্মের সম্বন্ধের প্রতিপাদন “প্রতিজ্ঞা”র প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান অথবা বিপরীত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ সাধ্যধর্মের সাধক কখন অর্থাৎ কোন পদার্থ ঐ সাধ্যধর্মের সাধন, তাহা বলা “হেতু”বাক্যের প্রয়োজন। এক পদার্থে (দৃষ্টান্ত নামক কোন এক পদার্থে) দুইটি ধর্মের সাধ্য-

সাধনভাব প্রদর্শন অর্থাৎ এই ধর্মটি সাধ্য, এই ধর্মটি তাহার সাধন, ইহা প্রদর্শন করা “উদাহরণ”-বাক্যের প্রয়োজন। সাধনভূত ধর্মটির অর্থাৎ হেতু-পদার্থটির সাধ্যধর্মের সহিত একত্র অবস্থিতি প্রতিপাদন করা “উপনয়”-বাক্যের প্রয়োজন, অর্থাৎ সাধ্যধর্মের আধার যে সাধ্যধর্মী, তাহাতে হেতুপদার্থ আছে, ইহা বুঝানই উপনয়-বাক্যের প্রয়োজন, উপনয়-বাক্যের দ্বারা উহাই বুঝান হয়। দৃষ্টান্ত পদার্থে অবস্থিত দুইটি ধর্মের সাধ্যসাধনভাবের জ্ঞান হইলে সাধ্যধর্মীতে বিপরীত প্রসঙ্গ নিষেধের জন্য “নিগমন” অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে একটি ধর্মকে সাধ্য এবং একটি ধর্মকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝিলেও যে ধর্মীতে সাধ্যধর্মের সাধন করা উদ্দেশ্য, সেই ধর্মীতে সাধ্যধর্ম নাই, এইরূপ বিপরীত ধর্মের আপত্তি নিরাস করা “নিগমন”-বাক্যের প্রয়োজন।

হেতু ও উদাহরণের এই পরিশুদ্ধি হইলে সাধ্যম্যা ও বৈধর্ম্যের দ্বারা দোষ প্রদর্শনের নানা-প্রকারতা বশতঃ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান”র বহুত্ব ঘটিতে পারে না, অর্থাৎ “হেতু” ও “উদাহরণ” বিশুদ্ধ হইলে বহুবিধ “জাতি” নামক অসদ্বৃত্তর এবং বহুবিধ “নিগ্রহস্থান” হইতে পারে না। কারণ, জাতিবাদী অর্থাৎ জাতি নামক অসদ্বৃত্তরবাদী দৃষ্টান্ত পদার্থে দুইটি ধর্মের সাধ্যসাধন ভাব ব্যবস্থাপন না করিয়া দোষ উল্লেখ করে। কিন্তু দুইটি ধর্মের দৃষ্টান্তস্থিত সাধ্যসাধন ভাবকে ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিশ্চিত বলিয়া জানিলে সাধনভূত ধর্মের হেতুরূপে গ্রহণ হয়, অর্থাৎ যে ধর্মটিকে প্রকৃত সাধ্যধর্মের সাধন বলিয়াই যথার্থরূপে নিশ্চয় করে, সেই ধর্মটিকেই হেতুরূপে গ্রহণ করে, সাধ্যম্যা মাত্রের (হেতুরূপে) গ্রহণ হয় না, অথবা বৈধর্ম্যমাত্রের (হেতুরূপে) গ্রহণ হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টান্তে কোন পদার্থকে সাধ্যসাধন বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চয় করিলে, বাহা বস্তুতঃ সাধ্যসাধন নহে, এমন কোন সাধ্যম্যা অথবা বৈধর্ম্য মাত্রকে হেতুরূপে গ্রহণ করে না; সুতরাং বহুবিধ অসদ্বৃত্তর করিতে হয় না, পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত হইতেও হয় না।

টিপ্পনী। পূর্বভাষ্যে অবয়বগুলির প্রয়োজন একরূপ বলা হইলেও আবার ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার অন্য ভাবে অবয়বগুলির প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে “অবয়বার্থঃ” এখানে অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞাদি বাক্য স্থলে যথাক্রমে তাঁহার কথিত প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ (১) “শব্দ অনিত্য” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দধর্মীর সহিত অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের সম্বন্ধ বুঝান হয় অর্থাৎ শব্দধর্মী অনিত্যত্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট, এই প্রতিপাদ্যটি প্রকাশ করা হয়। তাহার পরে শব্দধর্মীতে যে

অনিত্যত্ব ধর্ম আছে, তাহার সাধক কি ? ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। এ জন্ম (২) উৎপত্তিধর্মকল্প জ্ঞাপক, এইরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা উৎপত্তি-ধর্মকল্প অনিত্যত্বের সাধক, ইহা বলা হয়; ইহাই ঐ হেতুবাক্যের প্রয়োজন। তাহার পরে উৎপত্তিধর্মকল্প যে অনিত্যত্বের সাধক হয় অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকল্প থাকিলেই যে সেখানে অনিত্যত্ব থাকিবেই, ইহা বুঝাইতে হইবে। এই জন্ম (৩) "উৎপত্তিধর্মক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়" এইরূপ উদাহরণবাক্যের দ্বারা তাহা বুঝান হয়। ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, বাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনিত্য, স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যে ইহা দেখা গিয়াছে। আবার "অনুৎপত্তিধর্মক আত্মা প্রভৃতি নিত্য" এইরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাও বুঝা যায় যে, বাহা বাহা উৎপত্তিধর্মক, সে সমস্ত অনিত্য। ফলকথা, অনিত্যত্ব সাধ্যধর্ম, উৎপত্তিধর্মকল্প তাহার সাধন; ইহা স্থালী প্রভৃতি সাধ্যদৃষ্টান্ত এবং আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তে বুঝিয়া উদাহরণবাক্যের দ্বারা তাহাই বুঝান হয়। তাহা বুঝানই ঐ উদাহরণবাক্যের প্রয়োজন। তাহার পরে উৎপত্তিধর্মকল্পকে অনিত্যত্বের সাধন বলিয়া বুঝিলেও ঐ উৎপত্তিধর্মকল্প যে শব্দে আছে, ইহা না বুঝিলে শব্দে অনিত্যত্বের অহুমান হয় না, এ জন্ম তাহা বুঝাইতে হইবে। তাহা বুঝাইবার জন্মই (৪) "শব্দ তত্রূপ উৎপত্তিধর্মক" অথবা "শব্দ তত্রূপ অনুৎপত্তি-ধর্মক নহে" এইরূপ উপনয়-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। ফলতঃ শব্দধর্মীতে যে উৎপত্তিধর্মকল্প আছে, ইহা বুঝানই ঐ উপনয়-বাক্যের প্রয়োজন। উপনয়বাক্যের এই প্রয়োজন অনেক সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন নাই। তাহারাই ইহার প্রচুর প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি স্মার্তাচার্যগণ মহর্ষি গোতমের মত রক্ষণের জন্ম ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাহারাই উপনয়বাক্যের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই, তাহাদিগের কথা এই যে, হেতুবাক্যের দ্বারাই উপনয়বাক্যের কার্য্য হইয়া থাকে। "শব্দ অনিত্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলিয়া, "উৎপত্তি-ধর্মকল্প জ্ঞাপক" এই কথা বলিলে ঐ উৎপত্তিধর্মকল্প শব্দে আছে, ইহা বাদীর অভিপ্রেত বলিয়াই বুঝা যায়। নচেৎ বাদী শব্দে অনিত্যত্বের অহুমানে উৎপত্তিধর্মকল্পকে হেতু বলিবেন কেন ? বাহাকে বাদী হেতুরূপে উল্লেখ করিবেন, তাহা বাদীর মতে তাহার সাধ্যধর্মীতে নিশ্চয়ই আছে, ইহা বাদীর হেতুবাক্যের দ্বারাই বুঝা যায়। স্মার্তাচার্যগণের কথা এই যে, সাধ্যধর্মের হেতু কি ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষাহুনারে যে হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তাহার দ্বারা কেবল হেতুরই জ্ঞান হয়, অর্থাৎ এই পদার্থটি জ্ঞাপক, এইমাত্র জ্ঞানই তাহার দ্বারা হয়। ঐ হেতু বা জ্ঞাপক পদার্থটি যে সাধ্যধর্মীতে আছে, ইহা তাহার দ্বারা বুঝা যায় না। কারণ, তাহার বোধক কোন শব্দ হেতুবাক্যে থাকে না। প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের কথা এই যে, তাৎপর্য্য চিন্তা করিলেই হেতুবাক্যের দ্বারা উগা বুঝা যায়। স্মার্তাচার্যগণের কথা এই যে, যখন স্মিৎকের সহিত বিচারে মধ্যত্বের নিকটে নিজের বক্তব্যগুলি বুঝাইতে হইবে, তখন স্পষ্ট বাক্যের দ্বারাই তাহা বুঝান উচিত। পরন্তু সকল ব্যক্তিই সর্বত্র বাদীর তাৎপর্য্য চিন্তা করিয়া তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারাই উপযুক্ত মধ্যস্থ বাদীর অভিমত

হেতু প্রভৃতি বুঝিতে পারেন; আর হেতুবাক্য প্রভৃতি সেখানে আবশ্যক কি? এইরূপ হেতুবাক্য প্রভৃতি যে কোন অবয়বের দ্বারা বাদীর তাৎপর্য চিত্তা করিয়া বাদীর প্রতিজ্ঞা বুঝিতে পারিলে আর সেখানে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োজন কি? পরন্তু উপনয়বাক্য না বলিলে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য হেতুপদার্থ সাধ্যধর্মীতে আছে, এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ বাহ্যকে লিঙ্গপরামর্শ বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞান আর কোন বাক্যের দ্বারা জন্মে না, সুতরাং সেই জ্ঞান জন্মাইতেও উপনয়-বাক্য বলিতে হইবে। তত্ত্বচিন্তামণিকার গবেষণেও পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তির উপস্থান করিয়া উপনয়-বাক্যের সার্থকতা সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচীনগণের মধ্যে সকলেই উপনয়-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য হেতু-পদার্থ সাধ্যধর্মীতে আছে, এইরূপ বোধ জন্মে, এই মত স্বীকার করেন নাই। অনেকের মতে উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মীতে হেতুমাাত্রেরই জ্ঞান হয়। উদাহরণবাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থকে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিলে, শেষে ঐ হেতু সাধ্যধর্মীতে আছে, ইহাই উপনয়-বাক্যের দ্বারা বুঝে অর্থাৎ উপনয়-বাক্যজ্ঞাত বোধে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি বিদ্য হয় না। এবং এই হেতু এই সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং এই হেতু সাধ্যধর্মীতে আছে, এইরূপ যথাক্রমে উৎপন্ন দুইটি জ্ঞানের পরেই অল্পমিতি জন্মে; ইহাই অনেক প্রাচীনের সিদ্ধান্ত। অনেকে ভাষ্যকারেরও উহাই মত বলিয়া থাকেন। ভাষ্যকার এখানে উপনয়-বাক্যের বাহ্য প্রয়োজন বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তাঁহার ঐ মত অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উপনয়বাক্যের অর্থ পর্যালোচনা করিলে এবং মহর্ষির উপনয়হৃতের “তথা” শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, মহর্ষি ও ভাষ্যকার সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য যে হেতু, তাহা সাধ্যধর্মীতে আছে, এইরূপ বোধই উপনয়বাক্যের ফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উদাহরণবাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থকে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝা যায় এবং সেইরূপ হেতু দৃষ্টান্ত-পদার্থে আছে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং উদাহরণবাক্যের পরে (পূর্বোক্ত স্থলে) “শব্দ তরুণ উৎপত্তি-ধর্মক” এইরূপ উপনয়-বাক্য বলিলে শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য উৎপত্তি-ধর্মক আছে, এইরূপ বোধ জন্মিতে পারে। ঐরূপ বোধের নামই লিঙ্গপরামর্শ। নব্য নৈয়ায়িকগণও উপনয়-বাক্যজ্ঞাত ঐরূপ বোধই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও “বহুব্যাপ্য ধ্বনয়নং” এইরূপ উপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়া শেষে ঐ বাক্যের সমানার্থক-রূপে “তথা চায়ং” এইরূপ উপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি “তথা” এই শব্দের দ্বারাই সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য হেতু-বিশিষ্ট, এইরূপ অর্থ প্রকটিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেন, বলিতেই হইবে।

সে বাহ্য হউক, মূলকথা এই যে, উপনয়বাক্য সর্বত্রই বলিতে হইবে, ইহা জ্ঞানচাৰ্য্যগণের সিদ্ধান্ত। তবে উদাহরণ-বাক্যের সার্বজনিক প্রয়োগ সকল নৈয়ায়িক স্বীকার করেন নাই। অনেকে বলিয়াছেন যে, যে হেতুতে, যে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিষয়ে কাহারই কোন বিবাদ নাই, সেখানে ব্যাপ্তি-প্রদর্শনের জন্ত উদাহরণ-বাক্য বলা নিশ্চয়োজন। যেমন ব্যভিচারী হেতু হইলেই তাহা সাধক হয় না, ইহা সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং কোন বাদী প্রতিবাদীর ব্যভিচারী হেতুকে

অন্যক বলিয়া বুঝাইতে “ব্যতিচারিহ”রূপ হেতুর উল্লেখ করিয়া উদাহরণবাক্যের প্রয়োগ না করিলেও কোন কতি নাই। উহা নিশ্চয়োজন। নব্য নৈময়িক রত্ননাথ প্রভৃতি এই মত স্বীকার করেন নাই। বাদীর নিজ কর্তব্য নির্দোষের জন্ত পূর্বোক্ত স্থলেও উদাহরণবাক্য বলিতে হইবে, যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়বেরই প্রয়োগ না করিলে তাহা “ছায়া”ই হইবে না, ইহাই রত্ননাথ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত^১। জৈন নৈময়িকগণ বাদবিচারে প্রতিজ্ঞা ও হেতু এই দুইটি মাত্র অবয়বের প্রয়োগ কর্তব্য বলিলেও স্থলবিশেষে তিনটি এবং চারিটি এবং নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চাবয়বেরই প্রয়োগ কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন^২।

পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্যের প্রয়োজনও অনেক সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। ভাষ্যকার পূর্বে নিগমনবাক্যের প্রয়োজন বর্ণন করিলেও শেষে উহার আরও একটি প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও শেষে ঐ ভাবেই নিগমনবাক্যের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার গবেষণও নিগমনের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় উদ্যোতকরের ঐ কথা গ্রহণ করিয়া নিগমন-বাক্যের প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। সে কথাটি এই যে, উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাখ্যাবোধ হইলেও এবং উপনয়-বাক্যের দ্বারা ঐ হেতু-পদার্থ সাধ্যধর্মীতে আছে, ইহা বুঝা গেলেও বাদীর সাধ্যধর্ম তাহার সাধ্যধর্মীতে নাই, এইরূপ বিপরীত প্রশ্ন দ্বিধাবোধের জন্ত নিগমন-বাক্য আবশ্যক। শব্দ অনিত্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলেই শব্দে অনিত্যতা আছে, ইহা সিদ্ধ হইয়া যায় না। উহা সিদ্ধ করিতে হেতু, উদাহরণ এবং উপনয়বাক্য বলিতে হয়। কিন্তু উপনয়-বাক্য পর্য্যন্ত বলিলেও শব্দে যদি বস্তুতঃই অনিত্যতা না থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থলীয় হেতু “ব্যথিত” নামক হেতুভাঙ্গ হইবে, উহা হেতু হইবে না। এবং যদি উভয় পক্ষে পাম্পর-প্রতিকূল তুল্যবল দুইটি হেতুর প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ঐ দুই হেতুই “সংপ্রতিপক্ষিত” নামক হেতুভাঙ্গ হইবে, উহা হেতু হইবে না। “অব্যথিত” এবং “অসংপ্রতিপক্ষিত” না হইলে সে পদার্থ সাধ্যসাধন হয় না, অর্থাৎ তাহাতে হেতুর লক্ষণই থাকে না (হেতুভাঙ্গ লক্ষণ-প্রকরণ, প্রথম সূত্র-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। বাদী ভাষ্যবাক্যের দ্বারা তাহার সাধ্য সাধন করিতে তাহার গৃহীত হেতু যে সাধ্যসাধন, অর্থাৎ তাহাতে যে হেতু পদার্থের সমস্ত লক্ষণই আছে, ইহা প্রকাশ করিবেন। তজ্জন্ত বাদীকে পরিশেষে পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্যেরও প্রয়োগ করিতে হইবে।

ফলকথা, নিগমন-বাক্যের দ্বারা বাদী তাহার প্রযুক্ত হেতুকে “অব্যথিত” এবং “অসংপ্রতিপক্ষিত” বলিয়া প্রকাশ করেন। পূর্বোক্ত স্থলে ছায়াবাদী নিগমন-বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করেন যে, উৎপত্তিধর্মক বস্তুমাত্রই অনিত্য এবং সেই উৎপত্তি-ধর্মক বস্তু শব্দে আছে, সূত্রাং শব্দ অনিত্য। অর্থাৎ ঐ নিগমন-বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের বাহা প্রতিপাদ্য, তাহা একবারে

১। শিরোমণিতে তত্রাপি বাহিনঃ স্বকর্তব্যনির্দোষবুদ্ধাহরণভাবশ্চকরাং অনাথা সর্কটবোপনয়নাক-
জোহ্যভাব্যভাবতঃ অনুমিতাপনুভবাপিগণকর্ষভারান্ত এব লাভসম্ভবাঃ।—(অবয়ববিচারতে ভাষ্যবীন্দী)।

২। প্রয়োগপরিপাটি হু প্রতিপাদ্যাসুসারতঃ।—(জৈন কুসারনলিকারিকা, জৈনভাষ্যবীন্দী দ্রষ্টব্য)।

প্রকাশ করতঃ উপসংহার করিয়া দেখান হয় যে, শব্দে অনিত্য আছে, শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্ব ধর্ম্মের বিপরীত নিত্যত্ব ধর্ম্মের কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইতে পারে না। কারণ, “শব্দ অনিত্য” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম অথবা অনিত্যত্বরূপে শব্দ সাধ্যরূপেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট হয় না। নিগমন-বাক্যের দ্বারা উহা সিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট হওয়ার শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্বই আছে, নিত্যত্ব নাই, ইহাই সমর্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে শব্দধর্ম্মীতে নিত্যত্বের আপত্তি নিরস্ত হইয়া যায়।

সাঁহার নিগমন-বাক্যের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের কথা এই যে, নিগমন-বাক্যের দ্বারা বাদী বাহ্য বুঝাইবেন, তাহা বাদীর তাৎপর্য্য বুঝিয়াই বুঝা যায়। বাদীর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির দ্বারা তাঁহার তাৎপর্য্যানুসারেই যখন উহা বুঝা যায়, তখন নিগমন-বাক্য নিরর্থক। নিগমনবাদী নৈরায়িকগণের কথা এই যে, বাদীর তাৎপর্য্য সকলেই সমান ভাবে বুঝিবে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কে বুঝিবে, কে না বুঝিবে, ইহাও পূর্ব্বে নিশ্চয় করা যায় না। বাদীর তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অনেক প্রতিবাদী অনেক আপত্তি করিয়া থাকে, তাহা বিচারক মাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং তাৎপর্য্য বুঝিয়াই সকলে আমার বক্তব্য বুঝিয়া গইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া এই ক্ষেত্রে বাদীর বাক্যসংক্ষেপ কখনই উচিত নহে। বাদী নিজ কর্তব্য নির্বাহের জন্য তাঁহার সকল বক্তব্যই বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিবেন। সুতরাং প্রতিজ্ঞা প্রতীতি নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যই তাঁহার বক্তব্য। পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্য অবশ্যই বলিতে হইবে।

ভাষ্যকার পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন বর্ণন করিয়া, শেষে ঐ পঞ্চাবয়ব বুঝাইতে এত প্রয়াস কেন, তাহার প্রয়োজন বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই শেষ কথার মর্ম্ম এই যে, কেবল সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-মূলক এবং ঐরূপ আরও বহুবিধ দোষ প্রদর্শন হইয়া থাকে। উহাকে মহাবি জাতি নামক অসহস্রর বলিয়াছেন। আর বহুবিধ নিগ্রহস্থানও আছে, তজ্জ্বারা বাদী বা প্রতিবাদী পরাজিত হইয়া থাকেন (প্রথমাদ্যায়ের শেষভাগ এবং পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যদি হেতু ও উদাহরণ পরিভুক্ত হয়, উহাতে কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদী নানাবিধ অসহস্রর করিতে পারেন না। জাতিবাদী কোন উদাহরণে ধর্ম্মত্বের সাধ্যসাধন-ভাবে ব্যবস্থাপন না করিয়াই দোষ-প্রদর্শন করেন এবং করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোন উদাহরণে এই ধর্ম্মটি এই ধর্ম্মের সাধন অর্থাৎ এই ধর্ম্ম থাকিলেই এই ধর্ম্ম সেখানে থাকিবেই, এইরূপ বুঝিয়া এবং বুঝিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে আসেন, তাহা হইলে তিনি ঐরূপ দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না, তাঁহার জাতি নামক অসহস্ররের আর সেখানে অবসর থাকে না। সুতরাং সকলকেই হেতু ও উদাহরণের তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তজ্জ্ব পঞ্চাবয়বের তত্ত্ব বুঝান নিত্য আবশ্যক। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত হেতু ও উদাহরণের অতি স্বল্প, অতি দুর্ব্বোধ সামর্থ্য সকলে বুঝে না, প্রশস্ত পণ্ডিতেরাই বুঝেন, এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং এই সকল তত্ত্ব যে অতি দুর্ব্বোধ, ইহা পরম প্রাচীন ভাষ্যকার বাংলায়নও বলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

নীমাংসক-সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অথবা উদাহরণাদি তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন।

তাহারা^১ পঞ্চাবয়বের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ত্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু তাহার ভানভী গ্রন্থে পরার্থানুসারে অনেক স্থলে পঞ্চাবয়বেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইউরোপীয় নৈয়ামিকগণও নীমাংসকদিগের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে উদাহরণ এবং উপনয় এই দুইটি মাত্র অবয়ব স্বীকৃত, ইহা তার্কিকরক্ষার দ্বারা অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ামিকদিগের কোন কোন গ্রন্থ-সংবাদে বুঝা যায়, প্রতিজ্ঞা এবং হেতুও তাহারা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ প্রধান নৈয়ামিক দিগ্‌নাগ এবং জুবজুর “প্রতিজ্ঞা-লক্ষণে”র সমালোচনা ও খণ্ডন উদ্যোগকরের দ্বারাও পাওয়া যায়। সাংখ্যসূত্রে পঞ্চাবয়বের কথাই পাওয়া যায়। বৈশেষিকাচার্য্য পরমপ্রাচীন প্রশস্তপাদ “পদার্থধর্মসংগ্রহে” নিয়ম পূর্বক পঞ্চাবয়বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষ্য এই সকল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ মহর্ষি গোতমোক্ত পঞ্চাবয়ব সর্বসম্মত না হইলেও অনেক সম্প্রদায়ের সম্মত এবং উহা অতি প্রাচীন মত। মহাভারতেও নারদ মুনির পঞ্চাবয়ব-বিজ্ঞতার সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে মহাভারতের পূর্বেই হইতেই পঞ্চাবয়ব জ্ঞান-বিদ্যার গুরু-সম্প্রদায় এ দেশে ছিলেন, ইহা বুঝা যায়^২। ৩৯।

ভাষ্য। অত উক্তং তর্কো লক্ষণীয় ইতি অথেন্দুমুচ্যতে।

অনুবাদ। ইহার পরে (অবয়ব নিরূপণের পরে) তর্ক লক্ষণীয় অর্থাৎ তর্কের লক্ষণ বলিতে হইবে, এ জ্ঞান অনস্তর এই সূত্র বলিয়াছেন।

সূত্র। অবিজ্ঞাত-তত্ত্বৈহর্থো কারণোপপত্তিত-
স্তত্ত্বজ্ঞানার্থমুহস্তুকঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। অজ্ঞাত-তত্ত্ব পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝা যাইতেছে না, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতেছে—এমন পদার্থে, তত্ত্বটি জানিবার জ্ঞান প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত যে “উহ” অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষ, তাহা “তর্ক”।

ভাষ্য। অবিজ্ঞায়মানতত্ত্বৈহর্থো জিজ্ঞাসা তাবজ্ঞায়তে জানীয় ইম-
মিতি। অথ জিজ্ঞাসিতস্ত বস্তুনো ব্যাহর্তৌ ধর্মৌ বিভাগেন বিমুশতি

১। ত্রীমদ্বাচস্পতি বা যোগেশ্বরাদিকান্।

২। শ্রীমদ্বাচস্পতিঃ সৌম্যতান্ত্র্য সৌম্যনীতিমুহস্তুকতিম্।—(তার্কিকরক্ষা, ৩৫ কারিকা।)

২। পঞ্চাবয়ববোধঃ স্তব্ধসংবিজ্ঞিঃ।—(সাংখ্যসূত্র, ৫ অঃ, ২৭ সূত্র।)

৩। পঞ্চাবয়বযুক্তস্ত বাক্যস্ত গুণদোষবিৎ।—মহাভারত, সভাপর্ক, ৫ অঃ, ৫ শ্লোক।

কিং স্থিতিত্বেবমাহোস্থিমৈবমিতি । বিম্বশ্যমানয়োদ্ধিগ্নয়োরেকতরং
 কারণোপপত্ত্যাহনুজানাতি, সম্ভবত্যাগ্নিন্ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি ।
 কারণোপপত্ত্যা আদেবমেতম্মেতরদিতি । তত্র নিদর্শনং—যোহয়ং জ্ঞাতা
 জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্ত্বতো জানীয়েতি জিজ্ঞাসা । স কিমুৎপত্তি-
 ধর্মকোহথানুৎপত্তিধর্মক ইতি বিমর্শঃ । বিম্বশ্যমানেহবিজ্ঞাততত্ত্বেহর্থে
 যস্য ধর্মস্যাহভ্যনুজ্ঞাকারণমুপপদ্যতে তমনুজানাতি, যদ্যয়মনুৎপত্তিধর্মক-
 স্ততঃ স্বকৃতস্য কর্মণঃ ফলমনুভবতি জ্ঞাতা । দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যা-
 জ্ঞানানামুত্তরমুত্তরং পূর্বস্য পূর্বস্য কারণং, উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা-
 পায়াদপবর্গ ইতি স্মৃতাং সংসারাপবর্গো' । উৎপত্তিধর্মকে জ্ঞাতরি পুনর্ন
 স্মৃতাম্ । উৎপন্নঃ খলু জ্ঞাতা দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ সম্বধ্যত ইতি,
 নাশ্চৈদং স্বকৃতস্য কর্মণঃ ফলম্ । উৎপন্নশ্চ ভূহা ন ভবতীতি, তস্মাবিদ্যা-
 মানস্য নিরুদ্ধস্য বা স্বকৃতকর্মণঃ ফলোপভোগো নাস্তি, তদেবমেকস্থানেক-
 শরীরযোগঃ শরীরবিরোগশ্চাত্যস্তং ন স্মৃদিতি, যত্র কারণমুপপদ্যমানং
 পশ্যতি তমানুজানাতি—সোহয়মেবং লক্ষণ উহস্তর্ক ইত্যুচ্যতে ।

অনুবাদ । যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ ধর্মের সংশয়
 হওয়ায় তবুটি বুঝা যায়নি, এমন পদার্থ—“এই পদার্থকে (তত্ত্বতঃ) জানিব”^১
 এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে । অনন্তর জিজ্ঞাসিত পদার্থের বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মকে পৃথক্
 ভাবে ‘ইহা এইরূপ কি ? অথবা এইরূপ নহে ?’ এইরূপ সংশয় করে । সন্দেহ-
 মান ধর্মদ্বয়ের কোন একটি ধর্মকে কারণের উপপত্তিবশতঃ অনুজ্ঞা করে ।
 (কারণের উপপত্তি কি, তাহা বলিতেছেন) এই পদার্থে অর্থাৎ সন্দেহমান ধর্মদ্বয়ের
 মধ্যে এই ধর্মটিতে “কারণ” কি না “প্রমাণ”—“হেতু”—সম্ভব হয় । (অর্থাৎ
 এইরূপ জ্ঞানই সূত্রোক্ত কারণোপপত্তি) । (অনুজ্ঞা কিরূপ, তাহা বলিতেছেন)
 কারণের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রমাণের সম্ভব প্রযুক্ত এই পদার্থ এইরূপ
 হইতে পারে, এতদ্বিত্ব হইতে পারে না (অর্থাৎ এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানই অনুজ্ঞা
 এবং উহাই তর্ক) । তদ্বিষয়ে অর্থাৎ এই তর্ক বিষয়ে উদাহরণ,—এই যে জ্ঞাতা

১। ভাষ্যে “জানীত্ব” এই পদটি বিবিধিগত আত্মনেপথ্য বিতর্জিত উত্তর পূর্বের একত্বগত নিম্পন্ন । বর্জ্য
 বলবৎবিবক্ষা হলে উপসর্গহীন জ্ঞাতৃত্ব উত্তর আত্মনেপথ্য হয় । “অনুপসর্গজ্ঞঃ”—পাদিনিহৃত, ১।৩।৩০ বাং
 জানীতে (সিদ্ধান্তকৌমুদী) । ভাষ্যকার পক্ষেও বলিষাছেন,—“জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্ত্বতো জানীত্ব” ।

জ্ঞাতব্য পদার্থ জানিতেছে, তাহাকে তত্ত্বতঃ জানিব, এইরূপ জিজ্ঞাসা হয়। (পরে) সেই জ্ঞাতা কি উৎপত্তি-ধর্মক অর্থাৎ অনিত্য ? অথবা অনুৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ নিত্য ? এইরূপ সংশয় হয়। (পরে) সন্দিহমান অজ্ঞাত-তত্ত্ব পদার্থে অর্থাৎ ঐ জ্ঞাতৃপদার্থে যে ধর্মটির অনুজ্ঞার কারণ (প্রমাণ) উপপন্ন হয়, সেই ধর্মটিকে অনুজ্ঞা করে। (সে কिरূপে, তাহা বলিতেছেন) যদি এই জ্ঞাতা অনুৎপত্তিধর্মক হয় অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-পদার্থ আত্মা যদি অনাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করে (করিতে পারে) এবং দুঃখ, জন্ম, প্রযুক্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান, এইগুলির পরপরটি পূর্বপূর্বটির কারণ। পরপরটির অপায় হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্যন্ত (দ্বিতীয় সূত্রোক্ত) পদার্থগুলির পরপরটির অভাব হইলে, তাহাদিগের অনন্তরের অর্থাৎ তাহাদিগের পূর্বপূর্বটির অভাব প্রযুক্ত অপবর্গ হয়, সূতরাং সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে অর্থাৎ আত্মা নিত্য পদার্থ হইলেই তাহার সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে। কিন্তু আত্মা উৎপত্তি-ধর্মক অর্থাৎ দেহের সহিত উৎপন্ন হইলে (পূর্বোক্ত সংসার ও অপবর্গ) হইতে পারে না। যেহেতু আত্মা উৎপন্ন হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং বেদনা অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ইহা অর্থাৎ অভিনব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ এই আত্মার অর্থাৎ উৎপন্ন বলিয়া স্বীকৃত আত্মার স্বকৃত কর্মের ফল হয় না। কারণ, উৎপন্ন পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না। অবিদ্যমান অর্থাৎ এই জন্মের পূর্বে যাহার অস্তিত্বই ছিল না, অথবা নিরুদ্ধ অর্থাৎ একেবারে অত্যন্ত বিনষ্ট সেই আত্মার (উৎপন্ন বলিয়া স্বীকৃত আত্মার) স্বকৃত কর্মের ফলভোগ নাই; সূতরাং এইরূপ হইলে এক আত্মার অনেক দেহের সহিত যোগ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার এবং শরীরের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ অর্থাৎ মোক্ষ হইতে পারে না। এইরূপে যে পদার্থে অর্থাৎ সন্দিহমান ধর্মদ্বয়ের মধ্যে যে ধর্মটিতে প্রমাণ অনুপপদ্যমান বুকে, তাহাকে অনুজ্ঞা করে না। সেই এই, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত উহ, অর্থাৎ এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, এইরূপ হইতে পারে না, এই প্রকার যে অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা নামক জ্ঞানবিশেষ, তাহা তর্ক নামে কথিত হয়।

বিসৃতি। কোন পদার্থের সামান্য জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ জ্ঞান সকলের থাকে না। বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা হইলে সেখানে দুইটি ধর্ম হইয়া আলোচনা করে। যেমন আত্মা বলিয়া একটা পদার্থ আছে, ইহা জানিলেও, তাহা নিত্য, কি অনিত্য, ইহা বুঝা যাইতেছে না, অর্থাৎ আত্মার নিত্যধর্ম বিশেষ তত্ত্বটি বুঝিবার ইচ্ছা হইলেও বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কারণ, আত্মার

অনিত্য বিষয়ে সেখানে একটা সূক্ষ্ম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে আত্মার নিত্য বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াও তাহা কার্য্যকারী হইতেছে না। ঐ সূক্ষ্ম সংশয়টা বিনষ্ট করিতে না পারিলে প্রমাণ কিছু করিতেও পারে না; এ জন্ত সেখানে তর্ক আবশ্যক। যাহারা আত্মার সংসার ও অপবর্গ মানেন, তাহারা ঐ স্থলে বুঝেন যে, আত্মা নিত্য হইলেই তাহার সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে, অনিত্য হইলে তাহা হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মার নিত্য বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব; সুতরাং আত্মা নিত্য হইতে পারে, অনিত্য হইতে পারে না, এইরূপ জ্ঞানই এখানে তর্ক। উহার দ্বারা পূর্বজাত সংশয়ের নিবৃত্তি হইলে আত্মার নিত্যত্বসাধক প্রমাণ আত্মার নিত্য সাধন করে। তর্ক এইরূপ অনেক স্থলে প্রমাণের সাহায্য করে, তর্ক নিজে প্রমাণ নহে, প্রমাণের সহকারী।

টিপ্পনী। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব নিরূপণের পরেই মহর্ষি তর্কের নিরূপণ করিয়াছেন। কারণ, পঞ্চাবয়বের দ্বারা প্রমাণ প্রদর্শন করিলেও অনেক স্থলে প্রমাণ-বিষয়ের অভাব-বিষয়ে সূক্ষ্ম সংশয়বশতঃ প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ জন্ত তর্ক আবশ্যক হয়। তর্ক শব্দের দ্বারা তর্কশাস্ত্র বুঝা যায় এবং আপত্তিবিষয়েও বুঝা যায়, আবার অহুমানও বুঝা যায়। হেতু, তর্ক, ছায়, অবীক্ষা, এই চারিটি শব্দ প্রাচীনগণ অহুমান অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন, এ কথা উদ্যোতকরের কথাতেও পাওয়া যায়।

কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই স্বত্রোক্ত তর্ক পদার্থ কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত “উহ”। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কারণের উপপত্তিযুক্ত উহ। ভাষ্যকার এখানে কারণ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রমাণ। উপপত্তি শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সম্ভব। এই পদার্থে প্রমাণ সম্ভব হয়, এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার স্বত্রকারোক্ত কারণোপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং হেতু শব্দের দ্বারা পরে আবার পূর্বোক্ত প্রমাণেরই পুনরুচ্চায়া করিয়াছেন। কারণ এবং হেতু শব্দ প্রাচীন কালে প্রমাণ অর্থেও প্রযুক্ত হইত। ভাষ্যকার এখানে তাহাই দেখাইয়া মহর্ষি-স্বত্রোক্ত ‘কারণ’ শব্দের দ্বারা এখানে প্রমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তর্ক, প্রমাণের উপপত্তি-প্রযুক্ত একতর ধর্মকে অহুজ্ঞা করে। এই অহুজ্ঞার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, এতদ্বিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছে, সেই বিষয়টির বিপর্য্যয় শব্দ অর্থাৎ তাহার অভাব বিষয়ে সংশয় হইলে, যে পর্য্যন্ত কোন অনিষ্ট আপত্তি ঐ উৎকট সংশয় নিবৃত্ত না করে, সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সেই সংশয়ের নিবৃত্তি হইলেই প্রমাণের নিজ বিষয়ে প্রমাণের সম্ভব হয়। ঐ প্রমাণ-সম্ভবকেই বলা হইয়াছে—প্রমাণের উপপত্তি। সেই প্রমাণের উপপত্তি কর্তৃক প্রমাণ অহুজ্ঞাত হইলে প্রমাণের বিষয়টি পরিশোধিত হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ে পূর্বজাত সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়। তখন প্রমাণের সেই সংশয়রূপ অন্তরায় না থাকায় প্রমাণ তাহার নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার কল সম্পাদন করে অর্থাৎ তখন তদ্বিনিশ্চয় জন্মায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার প্রথম স্বত্র-ভাষ্য-বার্তিকের ব্যাখ্যায় “তর্ক” প্রত্যাবে বলিয়াছেন যে, প্রমাণবিষয়ের

যুক্তাযুক্ত বিচাৰৰূপ “তৰ্ক” যুক্ততত্ত্বে প্ৰবৰ্ত্তমান প্ৰমাণকে অহুজ্জা কৰতঃ অহুগ্ৰহ কৰে, তৰ্কানুগৃহীত প্ৰমাণ তথ্য নিৰ্ণয়ে সমৰ্থ হয়। সেখানে তাৎপৰ্য্যটীকাকাৰেৰ এই কথাত ব্যাখ্যাৰ উদয়নাচাৰ্য্য তাৎপৰ্য্যপৰিগুহিত্তে বলিয়াছেন যে, “তৰ্ক প্ৰমাণকে অহুজ্জা কৰে” ইহাৰ অৰ্থ এই যে, তৰ্ক প্ৰবৰ্ত্তমান প্ৰমাণেৰ অহুকুলভাবে অবস্থান কৰে। “অহুগ্ৰহ কৰে” ইহাৰ অৰ্থ নিৰ্ক্যাপাৰ প্ৰমাণকে ব্যাপাৰবিশিষ্ট কৰে অৰ্থাৎ যে উৎকট সংশয় বশতঃ প্ৰমাণ নিজ বিষয়ে ব্যাপাৰশূন্য ছিল, সেই সংশয়ৰূপ অন্তৰাৱটিকে নিৰস্ত কৰিয়া প্ৰমাণকে ব্যাপাৰযুক্ত কৰে অৰ্থাৎ নিজ বিষয়ে প্ৰবৃত্ত কৰে।

ভাষ্যকাৰ এখানে তৰ্কৰ স্বৰূপ বৰ্ণনাৰ জন্ত প্ৰথমেই বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাৰ পৰে সংশয় জন্মিলে, তৰ্ক সেই সন্দিহমান ধৰ্ম্মদ্বয়েৰ একটিকে প্ৰমাণেৰ উপপত্তিপ্ৰযুক্ত অহুজ্জা কৰে। তাৎপৰ্য্যটীকাকাৰ এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও সংশয়েৰ পৰেই জিজ্ঞাসা জন্মিয়া থাকে, তথাপি অনেক স্থলে জিজ্ঞাসাৰ পৰেও সংশয় জন্ম, সেই সংশয়ই এখানে ভাষ্যকাৰেৰ বিবক্ষিত। কাৰণ, জিজ্ঞাসাৰ পৰজাত সেই সংশয়ই তৰ্কোপস্থিতিৰ অঙ্গ। তৰ্ক সেই সংশয়েৰ বিষয় দুইটি পক্ষৰ একটিক নিষেবেৰ দ্বাৰা অপৰটিকে প্ৰমাণেৰ বিষয়ৰূপে অহুজ্জা কৰে; সুতৰাং যে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, সেই বিষয়েই তৰ্ক উপস্থিত হয় অৰ্থাৎ যে বিষয়ে সংশয় হয় নাই, তদ্বিষয়ে তৰ্ক উপস্থিত হয় না। এ জন্ত সংশয়কে তৰ্কোপস্থিতিৰ অঙ্গ বলা হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকাৰ প্ৰমাণেৰ বিষয়েৰ অহুজ্জাকেই তৰ্ক বলিয়াছেন। “এই পদাৰ্থ এইৰূপ হইতে পারে, অস্তৰূপ হইতে পারে না” এইৰূপ জ্ঞানবিশেষই ভাষ্যকাৰেৰ মতে প্ৰমাণ-বিষয়েৰ অহুজ্জা। প্ৰমাণেৰ বিষয়ে সংশয় নিৰাসই ঐ তৰ্কৰ ফল। উহাকেই বলা হইয়াছে, তৰ্কৰ অহুগ্ৰহ। তৰ্ক প্ৰমাণকে অহুগ্ৰহ কৰে অৰ্থাৎ প্ৰমাণেৰ বিষয়ে সংশয় নিৰাস কৰে। উদয়নেৰ ব্যাখ্যা পূৰ্বেই বলিয়াছি। স্বজ্জকাৰ যে উহকে তৰ্ক বলিয়াছেন, ভাষ্যকাৰেৰ মতে বাহা প্ৰমাণবিষয়ে পদাৰ্থেৰ অহুজ্জা, উদ্যোতকৰ সেই জ্ঞানকে সম্ভাবনা নামক অতিরিক্ত জ্ঞান বলিয়াছেন। তিনি বহু বিচাৰপূৰ্বক এখানে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, “উহ” বা “তৰ্ক” সংশয়ও নহে, নিৰ্ণয়ও নহে, ইহা এইৰূপ হইতে পারে; এই প্ৰকাৰ সম্ভাবনাৰূপ জ্ঞানই মহৰ্ষি সূত্ৰোক্ত উহ বা তৰ্ক। মহৰ্ষি সংশয়কে এবং নিৰ্ণয়কে পৃথক্ৰূপে বলিয়া তৰ্কৰ পৃথক্ উল্লেখ কৰিয়াছেন, সুতৰাং মহৰ্ষি গোটমোক্ত তৰ্ক-পদাৰ্থ, সংশয় ও নিৰ্ণয় হইতে ভিন্ন প্ৰকাৰ জ্ঞান। প্ৰাচীন কালে কেহ কেহ এই তৰ্ককে সংশয়বিশেষ বলিতেন, কেহ নিৰ্ণয়বিশেষ বলিতেন, কেহ অহুমান বলিতেন। উদ্যোতকৰ সে সকল মত খণ্ডন কৰিয়াছেন।

উদ্যোতকৰেৰ মতানুসাৰে পৰবৰ্ত্তী ত্ৰায়াচাৰ্য্যগণ সংশয় ও নিৰ্ণয় ভিন্ন “সম্ভাবনা” নামক কোন জ্ঞান স্বীকাৰ করেন নাই এবং ঐৰূপ জ্ঞানকে “তৰ্ক” বলেন নাই। পৰবৰ্ত্তিগণেৰ মতে আপত্তি-বিশেবেৰ নাম তৰ্ক। উদয়নাচাৰ্য্য তাৎপৰ্য্যপৰিগুহিত্তে বলিয়াছেন যে, অনিষ্টপ্ৰসঙ্গই তৰ্কৰ স্বৰূপ। তিনি কিয়ণাবলী গ্ৰহে বলিয়াছেন যে, বাহা প্ৰসঙ্গস্বৰূপ এবং বাহাৰ অপৰ নাম “উহ”, তাহাই “তৰ্ক।” তৰ্কৰ অপৰ নাম “প্ৰসঙ্গ”, এ কথা এখানে তাৎপৰ্য্যটীকাকাৰও লিখিয়াছেন। “প্ৰসঙ্গ” বলিতে এখানে প্ৰসক্তি; তাহাৰ কলিতাৰ্থ আপত্তি। তাত্ত্বিক-

রক্ষাকার এই তর্কের স্বরূপ বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তর্ক বলিতে অনিষ্টপ্রসঙ্গ। অনিষ্ট দ্বিবিধ;—(১) বাহ্য প্রমাণসিদ্ধ, তাহার পরিত্যাগ এবং (২) বাহ্য অপ্রামাণিক, তাহার গ্রহণ। ইহার যে কোন অনিষ্টের যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি, তাহাকে তর্ক বলে। যেমন কেহ বলিলেন,—জলপান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। এই কথা শুনিয়া অপর ব্যক্তি আপত্তি প্রকাশ করিলেন যে, “যদি জল পীত হইয়াও পিপাসার নিবর্তক না হয়, তাহা হইলে পিপাসু ব্যক্তির জল পান না করুক? তাহার জল পান করিয়া থাকে কেন?” এই স্থলে পিপাসু ব্যক্তির যে জল পান করিয়া থাকে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐ প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগরূপ অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তি প্রকাশ করার উহা “তর্ক” হইল। এবং কেহ বলিলেন—জল পান করিলে ঐ জল অন্তর্দাহ জন্মায়। তখন অপর ব্যক্তি আপত্তি প্রকাশ করিলেন যে, “যদি পীত জল অন্তর্দাহ জন্মায়, তাহা হইলে আমারও অন্তর্দাহ উৎপাদন করুক, আমিও ত জল পান করিলাম; আমার অন্তর্দাহ জন্মায় না কেন?” এখানে আপত্তিকারীর অন্তর্দাহ অপ্রামাণিক, তাহার স্বীকারের প্রসঙ্গ বা আপত্তি প্রদর্শন করার উহাও “তর্ক” হইবে। পরবর্তী নব্য নৈয়মিকগণও আপত্তিবিশেষকেই “তর্ক” বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাত স্বত্র-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, (স্বত্রে) কারণ শব্দের অর্থ ব্যাপ্য, উপপত্তি শব্দের অর্থ আরোপ। ‘কারণোপপত্তি’ বলিতে এখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ। উহ শব্দের অর্থও আরোপ। তাহা হইলে বুঝা যায়, ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত যে আরোপ, তাহাই “তর্ক”। যে পদার্থ থাকিলেই অপর একটি পদার্থ সেই সঙ্গে সেখানে থাকিবেই, সেই পূর্বোক্ত পদার্থটিকে ব্যাপ্য পদার্থ বলে এবং যে পদার্থটি তাহার সমস্ত আশ্রয়েই থাকে, তাহাকে ঐ পদার্থের ব্যাপক বলে। ব্যাপ্য থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক থাকিবে, সূত্রসাং ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থেরই আরোপ বা আপত্তি করা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায়, ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত যে তাহার ব্যাপক পদার্থের আরোপ, তাহাই স্বত্রকারের অভিমত “তর্ক”। যেখানে ব্যাপক পদার্থটি আছে, সেখানে তাহার আরোপ বা আপত্তি হয় না। ঐরূপ আপত্তি প্রকাশ করিলে তাহাকে বলে “ইষ্টাপত্তি”। পর্তুতে ধূমও আছে, বহিও আছে, সেখানে যদি কেহ পর্তুতে ধূম আছে বলিলে, অপর ব্যক্তি বলেন যে, “যদি পর্তুতে ধূম থাকে, তাহা হইলে বহি থাকুক,” তাহা হইলে উহা “তর্ক” হইবে না। কারণ, পর্তুতে বহি আছেই; সূত্রসাং পর্তুতে বহির আপত্তি ইষ্টাপত্তি। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যে স্থান ব্যাপক পদার্থশূন্য বলিয়া নিশ্চিত, সেই স্থানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ, তাহাই তর্ক। বৃত্তিকার এইরূপেই স্বত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। “আরোপ” বলিতে ভ্রম জ্ঞান। ঐ ভ্রম জ্ঞান দ্বিবিধ। যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞান সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্বক আরোপ করা হয়, তাহাকে বলে “আহার্য্য

১। তর্কোহন্বিষ্টপ্রসঙ্গঃ ভাবনিষ্টঃ দ্বিবিধঃ নতম্।

প্রামাণিকপরিত্যাগস্তথেষ্টপরিগ্রহঃ—১। তর্কিকরক্ষা, ৭০ কারিকা।

ভ্রম"। উহা ইচ্ছাপূর্বক কৃত্রিম ভ্রম বলিয়াই মনে হয়, নৈয়ায়িকগণ উহাকে "আহার্য্য" বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় কৃত্রিম অর্থে "আহার্য্য" শব্দের প্রয়োগ আছে^১। আর যে ভ্রম ইচ্ছাপূর্বক নহে অর্থাৎ বাহ্যর পূর্বে তাহার প্রতিবন্ধক বস্তু জ্ঞান জন্মে নাই, সেই ভ্রমকে বলা হইয়াছে "অন্যাহার্য্য ভ্রম"। তর্কের লক্ষণে বৃত্তিকার যে "আরোপ" বলিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত "আহার্য্য ভ্রম"। জন্মে বহি নাই জানি, ধূম নাই—ইহাও জানি, কিন্তু কেহ যখন জলে ধূম আছে ইহা বলে, সমর্পণ করে, তখন আপত্তি প্রকাশ করি যে, যদি জলে ধূম থাকে, তবে বহি থাকুক। এখানে বহির ব্যাপ্য পদার্থ ধূম বা বিশিষ্ট ধূমের জলে আরোপ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত সেখানে তাহার ব্যাপক বহির আরোপ করায় উহা "তর্ক" হইবে। ঐ স্থলে ঐ দুইটি আরোপই ইচ্ছাপ্রযুক্ত। জলে ধূম নাই এবং বহি নাই, ইহা জানিয়াই ঐরূপ আরোপ করায়, উহা "আহার্য্য" আরোপ। যে কোন পদার্থের আরোপ করিয়া তৎপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপ "তর্ক" নহে। যেমন কেহ "এই গৃহে হস্তী থাকে" এই কথা বলিলে, যদি কেহ বলেন যে, "যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তাহা হইলে অশ্ব থাকুক", এইরূপ আরোপ "তর্ক" হইতে পারে না। কারণ, হস্তী অশ্বের ব্যাপ্য পদার্থ নহে, অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই যে সেখানে অশ্ব থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। "যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তাহা হইলে হস্তীর বন্ধন-তন্তু থাকুক", এইরূপ আরোপ ঐ স্থলে "তর্ক" হইতে পারে। কারণ, হস্তী থাকিলে অর্থাৎ হস্তীর বাসগৃহ হইলে সেখানে তাহার বন্ধন-তন্তু থাকিবেই। অবশ্য যদি সে গৃহে বন্ধন-তন্তু থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ আপত্তি "তর্ক" হইবে না, উহা ইষ্টাপত্তি হইবে। ফলকথা, নব্যমতে ঐরূপ আপত্তিবিষয়েই তর্ক। উহা এক প্রকার মানস প্রত্যক্ষ। তর্কিক, বাক্যের দ্বারা তাহার ঐ আপত্তিরূপ মানস জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। তর্কিকের সেই আপত্তিই "তর্ক", তাহার বাক্য "তর্ক" নহে। আপত্তিস্থলে "আপাদ্য" ও "আপাদক" এই দুইটি পদার্থ আবশ্যক। বাহ্যর আপত্তি করা হয়, তাহাকে "আপাদ্য" বলে, যে পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত আপত্তি হয়, তাহাকে "আপাদক" বলে। যেমন বিশিষ্ট ধূম আপাদক—বহি আপাদ্য। আপাদ্যটি ব্যাপক হইবে, আপাদকটি তাহার ব্যাপ্য হইবে। ব্যাপ্য থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক থাকিবেই; সুতরাং ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপকের আপত্তি করা যায়। এ অল্প ব্যাপ্য পদার্থটিই "আপাদক" হয়, ব্যাপক পদার্থটি তাহার "আপাদ্য" হয়। "ব্যাপ্য" পদার্থ থাকিলেই যেমন তাহার "ব্যাপক" পদার্থটি সেখানে থাকে, তরূপ ঐ ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের অভাব থাকে; সুতরাং "তর্ক" স্থলে "আপাদ্য"রূপ ব্যাপক পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইলে তদ্বারা সেখানে "আপাদক"রূপ ব্যাপ্য পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইয়া বাইবে। ঐরূপ নিশ্চয় অহুমিতি। নব্যমতে তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে ঐরূপ অহুমিতি জন্মে। এইরূপ হেতু পদার্থে সাধ্যবর্ধের ব্যাভিচার সংশয় হইলে তর্কের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। যেমন "ধূম যদি বহির ব্যাভিচারী হয়, তাহা হইলে বহিজন্ম না হউক," এই প্রকার তর্ক উপস্থিত হইলে সেখানে ধূমে বহিজন্ম অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া ঐ

হেতুর দ্বারা “ধুম বহির ব্যভিচারী নহে” এইরূপ অহমিতি জন্মে। তাহার ফলে “ধুম বহির ব্যভিচারী কি না” এইরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয়। বাহ্য বহিঃপদার্থ, অর্থাৎ বহিঃ বাতীত বাহ্য উৎপত্তিই হয় না, সেই ধুম বা বিশিষ্ট ধুম যেখানে থাকিবে, সেখানে বহি থাকিবেই; সুতরাং ধুম বা বিশিষ্ট ধুম বহির ব্যভিচারী নহে, পূর্বোক্ত প্রকার তর্কের ফলে এইরূপ অহমিতি জন্মে। তাহার পরে পূর্বোক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয়। ফলতঃ সংশয় নিবৃত্তিই তর্কের শেষ ফল। এই সংশয় নিবৃত্তি কোনরূপেই হইতে পারে না বলিয়া চার্য্যাক এই সিদ্ধান্তের তাঁর প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য ছায়কুসুমাজলি গ্রন্থে তাহার উত্তর দিয়াছেন। শ্রীহর্ষমিশ্র তাহার “খণ্ডনখণ্ডানা” গ্রন্থে উদয়নের ঐ কথার উপহাসের সহিত উত্তর করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। “খণ্ডনোদ্ধার” গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্র এবং “তত্ত্বচিন্তামণি”র তর্ক প্রকরণে গঙ্গেশ শ্রীহর্ষের প্রতিবাদের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। (দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১ আঃ, ৩৮ স্বত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।) পরবর্তী ছায়াচার্য্যগণ এই তর্ককে পাঁচ প্রকার বলিয়াছেন এবং এই তর্কের পাঁচটি অঙ্গ বলিয়াছেন। সেই পঞ্চাঙ্গের কোনটি না থাকিলে তাহা তর্ক হইবে না; তাহাকে বলে তর্কভাস। “লাঘব”, “গৌরব” প্রভৃতি আরও কতকগুলি প্রমাণের সহকারী আছে, সেগুলি আপত্তি পদার্থ নহে বলিয়া তর্ক নহে; তবে তর্কের ছায় প্রমাণের সহকারী বলিয়া তর্কের ছায় ব্যবহৃত হয়। এ সকল কথারও যথাস্থানে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার তর্কের উদাহরণ বলিতে যথাক্রমে যে ভাবে তর্কের উদাহরণ হয়, তাহা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ “জ্ঞাতা আছে” এইরূপে জ্ঞাতার সামান্ত জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতেছে, তখন এই জ্ঞানের অবশ্য বর্ত্তা আছে, এইরূপে জ্ঞাতা বা আত্মার সামান্ততঃ জ্ঞান হইলে পরে সেই জ্ঞাতাকে তত্ত্বতঃ জানিব অর্থাৎ আত্মা নিত্য, কি অনিত্য, ইহা জানিব, এইরূপ ইচ্ছা জন্মে। তাহার পরে সেই আত্মা উৎপত্তিবর্ধক অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি হয় অথবা আত্মার উৎপত্তি হয় না, আত্মা নিত্যনিক পদার্থ, এইরূপ সংশয় জন্মে। তাহার পরে আন্তিকগণের এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে,—যদি আত্মার উৎপত্তি না হয় অর্থাৎ আত্মা নিত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে দেহাদির উৎপত্তির পূর্বেও আত্মা থাকে, সুতরাং একই আত্মার নানা দেহাদি সম্ভববশতঃ পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের ভোগ এবং পূর্বকৃত কর্মফলে এই বর্ত্তমান দেহাদি পরিগ্রহ হইতে পারে। ফলকথা, তাহা হইলে আত্মার সংসার হইতে পারে। ঐরূপ না হইলে আন্তিকগণের মতে আত্মার সংসার হয় না। আত্মা নিত্য হইলে বহু জন্মের কর্মাদির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার মোক্ষলাভও হইতে পারে। আত্মার উৎপত্তি হইলে তাহার

১। আত্মাশ্রয়াদিতেষন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ সূত্রঃ।

অতঃপঞ্চকম্পন্নতত্ত্বজ্ঞানায় কথ্যতে।

ব্যাপ্তিতর্কীশ্রুতিহিতরবদানং বিপর্য্যয়ে।

অনিষ্টাননুভূত্ব ইতি তর্কীজপঞ্চকম্।

জ্ঞানাত্ততমবৈকল্যে তর্কজ্ঞানাত্ততা ভবেৎ—তর্কিকরক্ষা, ১১।১২।১৩।

সংসার ও মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ, আত্মার উৎপত্তি হয় বলিলে যে দেহের সহিত যে আত্মা উৎপন্ন হইবে, সেই দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ বলিতে হইবে; সেই দেহের পূর্বে আর সে আত্মা ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উৎপন্ন বস্তু উৎপত্তির পূর্বে থাকে না এবং উৎপন্ন ভাব পদার্থ চিরস্থায়ী হয় না, কোন দিন তাহা অত্যন্ত বিনষ্ট হইবেই (ভ্রাতৃ-মতে ইহাই সিদ্ধান্ত)। তাহা হইলে বর্তমান অভিনব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ আত্মার পূর্বকৃত কর্মের ফল হইতে পারে না। পূর্বে যে আত্মা নাই, তাহার দেহাদি-সম্বন্ধ তাহারই কর্মফল হইবে কিরূপে? এবং পূর্বাচরিত কর্ম ভিন্ন অভিনব দেহাদি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন বিচিত্র সুখদুঃখ-ভোগও তাহার হইতে পারে না। এবং শরীরের সহিত উৎপন্ন আত্মা শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইবে, সুতরাং আত্মার অপবর্ণও হইতে পারে না। আত্মা চিরকাল থাকিবে, কিন্তু তাহার আর কখনও দেহাদি-সম্বন্ধ হইবে না, এই অবস্থাই আত্মার কৈবল্যাবস্থা। আত্মা নিত্য না হইলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ তর্ক পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় নিবৃত্ত করে, তখন আত্মার নিত্যত্বসাধক প্রমাণ আত্মার নিত্যত্বনিশ্চয় জন্মায়। ভাব্যকারের সম্মত এইরূপ তর্কস্থলেও কিন্তু নব্যগণ-সম্মত প্রসঙ্গ বা আপত্তি আছে। যদি আত্মা অনিত্য হয় অর্থাৎ দেহাদির সহিত উৎপন্ন পদার্থ হয়, তাহা হইলে আত্মার সংসার ও অপবর্ণ না হউক, এইরূপ আপত্তিই নব্য-মতে এখানে তর্ক হইবে। ভাব্যকার প্রভৃতি প্রাচীন মতে ঐ স্থলে আত্মার অমুৎপত্তিধর্মকত্ব বিষয়েই প্রমাণকে উপপদ্যমান দেখিয়া “আত্মা অমুৎপত্তিধর্মক হইতে পারে অর্থাৎ তাহাই সম্ভব, উৎপত্তিধর্মক হইতে পারে না অর্থাৎ তাহা সম্ভব নহে” এই প্রকার অসম্ভাব বা সম্ভাবনারূপ জ্ঞানবিশেষই “তর্ক” হইবে। ভাব্যকার যে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়-তত্ত্বটির অসম্ভাবরূপ জ্ঞানবিশেষকেই তর্কের স্বরূপ বলিতেন, তাহা পরবর্তী ভাষ্যে পরিষ্কৃত আছে।

একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে কোন সংশয়ই হয় না, সুতরাং সেই পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ তর্ক হওয়া অসম্ভব। তাই মহর্ষি “অবিজ্ঞাত পদার্থে” এইরূপ কথা না বলিয়া “অবিজ্ঞাতত্ব পদার্থে” এইরূপ কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে না, তাহার তত্ত্ববিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছে, এমন পদার্থেই তর্ক হইবে। যে পদার্থের তত্ত্ববোধ জন্মিয়াছে, ঐ পদার্থে ঐ তত্ত্ববোধ সূদৃঢ় করিবার জন্ত সাংখ্যশাস্ত্রে শুক্রবা, শ্রবণ, ধারণ প্রভৃতি অস্তঃকরণ-ধর্মকে “উহ” বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে সেই সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত “উহ” কেহ না বুঝেন, এই জন্ত মহর্ষি সূত্রে “অবিজ্ঞাততত্ত্বহর্থে” এই অংশ বলিয়া-ছেন। যদিও সূত্রে “কারণোপপত্তি” শব্দ থাকাতাই ইহা বুঝা যায়, অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত “উহ” বখন এই সূত্রোক্ত কারণোপপত্তি প্রবৃত্ত নহে, তখন এই সূত্রোক্ত “উহ” সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত “উহ” নহে, ইহা বুঝা যায়; তাহা হইলেও উদ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, “অবিজ্ঞাততত্ত্বহর্থে” এই কথা না বলিলে সূত্রোক্ত “কারণোপপত্তি” শব্দের যথোক্ত ব্যাখ্যা বুঝা যায় না, এই জন্ত মহর্ষি সূত্রের প্রথমে ঐ অংশ বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকারও এই কথা বলিয়া তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, সূত্রকার কোন বাক্য বলিলে তাহার একটা প্রয়োজন চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু মনে

রাখিবে, এখানে স্বত্রকারের বাক্যলব্ধি কোন আশ্রয় ছিল না, তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। “তত্ত্বজ্ঞানার্থঃ” এই অংশের দ্বারা তর্কের প্রয়োজন বলা হইয়াছে। অজ্ঞাততত্ত্ব পদার্থে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত “উহ”কে “তর্ক” বলিলে প্রমাণও তর্ক হইতে পারে; তাই বলিয়াছেন, “কারণোপপত্তিঃ”। “কারণোপপত্তি”র ব্যাখ্যা পূর্বেই বলা হইয়াছে। “অবিজ্ঞাততত্ত্ব” এইরূপ কথা বলিলে অর্থাৎ ঐ কথার পরে অর্থ শব্দের প্রয়োগ না করিলে “অবিজ্ঞাততত্ত্ব” শব্দের দ্বারা যে ব্যক্তি তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছে না, সেই ব্যক্তিকেও বুঝা যাইতে পারে অর্থাৎ ঐরূপ অর্থের ভ্রম অথবা সংশয় হইতে পারে, তাই উহার পরে অর্থ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থ শব্দের প্রয়োগ থাকার যে পদার্থের তত্ত্বটি বুঝা যাইতেছে না, সেই পদার্থকেই ঐ কথার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে। উদ্যোতকর এই সকল কথার দ্বারা এখানে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, স্বত্রে ঐ স্থলে যজ্ঞ বিভক্তির অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, ঐ স্থলে যজ্ঞ বিভক্তির প্রয়োগ হওয়াই উচিত। উদ্যোতকর এই কথার সমর্থনের জন্য কণাদের একটি স্বত্র উদ্ধৃত করিয়া ঋষিহ্মত্রে যজ্ঞ বিভক্তির স্থানে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়াছেন।

ভাষ্য। কথং পুনরয়ং তত্ত্বজ্ঞানার্থো ন তত্ত্বজ্ঞানমেবেতি, অনব-
ধারণাং, অনুজ্ঞানাত্ময়মেকতরং ধর্মং কারণোপপত্ত্যা, ন স্ববধারণতি ন
ব্যবস্রতি ন নিশ্চিনোতি এবমেবেদমিতি। কথং তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইতি,
তত্ত্বজ্ঞানবিষয়াভ্যনুজ্ঞানক্ষণাদুহাদুভাবিতাং প্রসম্মাদনস্তরং প্রমাণস্ব
সামর্থ্যাং তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যত ইত্যেবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইতি। সোহয়ং তর্কঃ
প্রমাণানি প্রতিসন্দধানঃ প্রমাণাভ্যনুজ্ঞানাং প্রমাণসহিতো বাদেহপদিক্ত
ইতি। অবিজ্ঞাততত্ত্বে ইতি যথা সোহর্থো ভবতি তস্মা তথাভাব-
স্তত্ত্বমবিপর্যায়ো যাথাতথ্যম্।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ কেন? তত্ত্বজ্ঞানই নয় কেন?
(উত্তর) যেহেতু অবধারণ করে না। বিশদার্থ এই যে, এই তর্ক প্রমাণের উপপত্তি-
প্রযুক্ত একতর ধর্মকে অর্থাৎ সন্দিহমান ধর্মদ্বয়ের মধ্যে যেটি যুক্ত, যেটি সেখানে
প্রকৃত তত্ত্ব, তাহাকে অনুজ্ঞা করে। কিন্তু এই পদার্থ এই প্রকারই, এইরূপ
অবধারণ করে না, ব্যবসায় করে না, নিশ্চয় করে না, অর্থাৎ তর্ক স্বয়ং তত্ত্ব-
নিশ্চয়স্বরূপ নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে তত্ত্বনিশ্চয়ের সাধনও নহে, প্রমাণের
দ্বারাই তত্ত্বনিশ্চয় হয়, তর্ক ঐ প্রমাণের সহকারিতা করে।

(প্রশ্ন)। (তর্ক) তত্ত্বজ্ঞানার্থ কিরূপে? অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্বতন্ত্র সাধন
না হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞানার্থই বা হয় কিরূপে? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ের অর্থাৎ

যেটি প্রমাণের বিষয়, প্রকৃত তত্ত্ব তাহার অনুজ্ঞাস্বরূপ ভাবিত অর্থাৎ চিস্তিত, (অতএব) প্রসন্ন অর্থাৎ নিশ্চল যে উহ (তর্ক), তাহার অনন্তর অর্থাৎ বিশুদ্ধ তর্কের পরে প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইরূপে (তর্ক) তত্ত্বজ্ঞানার্থ অর্থাৎ প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ প্রমাণের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাতে বিশুদ্ধ তর্ক আবশ্যিক হয়, এই জন্মই তর্ককে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা হয়।

সেই এই তর্ক প্রমাণের অনুজ্ঞা করে বলিয়া, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়ে প্রবর্তমান প্রমাণের অনুকূলভাবে অবস্থান করে বলিয়া প্রমাণগুলিকে প্রতিসন্ধান করে অর্থাৎ সংশয়রূপ অন্তরায় নিবৃত্তি করিয়া প্রমাণকে নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, নির্যাপার প্রমাণকে ব্যাপারযুক্ত করে, এ জন্ম বাদসূত্রে প্রমাণ সহিত হইয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ তর্ক প্রমাণের বিশেষ সহায়তা করে, তর্ক ব্যতীত অনেক সময়ে প্রমাণ তত্ত্বনিশ্চয় জন্মাইতে পারে না, এ জন্ম একমাত্র তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশে যে-বাদ বিচার হয়, সেই বাদের লক্ষণে (১২।১ সূত্রে) প্রমাণের সহিত মহর্ষি তর্কেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

(সূত্রে) “অবিজ্ঞাততত্ত্বে” এই স্থলে সেই পদার্থটি যে প্রকার হয়, তাহার তথাভাব অর্থাৎ তদ্রূপতা, তত্ত্ব, অবিপর্ধ্যয়, যাথাতথ্য, অর্থাৎ সূত্রে ঐ স্থলে যে “তত্ত্ব” বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, যে পদার্থ যেমন অর্থাৎ যে প্রকার, তাহার তদ্রূপতা। অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃত ভাবই তাহার তত্ত্ব, তাহাকেই বলে অবিপর্ধ্যয়, তাহাকেই বলে যাথাতথ্য।

টিগুনী। মহর্ষি-সূত্রের দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞান নহে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ এক প্রকার জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ইহাতে প্রশ্ন এই যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানই নয় কেন? তর্ককে তত্ত্বজ্ঞান না বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা হইয়াছে কেন? এতদ্ভিত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় করে না, তত্ত্বের অনুজ্ঞা করে। “তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় করে না” এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে, তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় নহে। ঐ তাৎপর্য্যেই ঐরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অবধারণ, ব্যবসায় এবং নিশ্চয়, এই তিনটি একই পদার্থ। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার এখানে তিনটি একার্থবোধক বাক্যের দ্বারা ‘তর্ক’ তত্ত্বনিশ্চয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, তত্ত্বনিশ্চয়কেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। তর্ক যখন তত্ত্বনিশ্চয় নহে, তখন তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। ‘এই পদার্থ এই প্রকার হইতে পারে, অন্তপ্রকার হইতে পারে না’ এইরূপ অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা জ্ঞানই তর্ক। উহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নহে। ‘এই পদার্থ এই প্রকারই’ এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তর্ক হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারিত। কিন্তু তর্ক ঐরূপ জ্ঞান নহে। ফলকথা, ‘সংশয়’ও নহে, ‘নিশ্চয়’ও নহে, ‘ইহা এইরূপ হইতে পারে, অন্তরূপ হইতে পারে না’ এই প্রকার বিজাতীয়

জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ভাষ্যকার তাহাকেই বলিয়াছেন—প্রমাণবিষয়ের অভ্যুজ্জা অথবা তত্ত্বের অভ্যুজ্জা। সংশয় ও নিশ্চয় হইতে ভিন্ন অভ্যুজ্জা বা সম্ভাবনা নামক অতিরিক্ত জ্ঞান উদ্যোতকর সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ঐরূপ জ্ঞান ভাষ্যকারেরও সম্মত বলিয়া বুঝা যায়, নচেৎ ভাষ্যকারের মতে তর্ক কিরূপ জ্ঞান হইবে? তাৎপর্যটীকাকারও এই মতের ব্যাখ্যায় এখানে তর্করূপ জ্ঞানের পূর্বোক্তরূপ আকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

শেষে আবার প্রশ্ন হইয়াছে যে, তর্ক যদি তত্ত্ব নিশ্চয় না জন্মায়, তবে তাহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানার্ণবই বা বলা যায় কিরূপে? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় যে তত্ত্ব, তাহার অভ্যুজ্জাস্বরূপ। এই তর্ক সূচিস্থিত হইলে বিশুদ্ধ হয়। সেই বিশুদ্ধ তর্কের পরে প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, এই জন্তই তর্ককে তত্ত্বজ্ঞানার্ণব বলা যায়। তাৎপর্য এই যে, যদিও প্রমাণই তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়, কিন্তু তর্ক তাহার সহকারী হইয়া থাকে। তর্ক কিরূপে সহকারী হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানে প্রমাণের সামর্থ্য বলিয়া ভাষ্যকার তর্কের স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাই প্রকটিত করিয়াছেন।

ভাষ্যে “উহাদ্ভাবিতাং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত। তাৎপর্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—“ভাবিতাচ্চিস্থিতাং অতএব প্রদর্শনান্নির্মাণাতি”। তর্ক সূচিস্থিত হইলে সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয়; সূত্রায়ং বিশুদ্ধ হয়। যদি তর্কের প্রতিকূল কোন তর্কান্তর থাকে, তাহা হইলে তর্ক হয় না। ফলকথা, বিশুদ্ধ প্রকৃত তর্কের পরে সংশয় নিরস্ত হওয়ায়ও প্রমাণ নিজ সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। “ভাবিত” এবং “প্রদর্শন”, এই দুইটি বিশেষণবোধক শব্দের দ্বারা যে বিশেষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসামর্থ্যের বিশেষণরূপেই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়া অনেকে বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ভাষ্যকারের সন্দর্ভানুসারে তাহা বুঝা যায় না। সূত্রীগণ ঐ সন্দর্ভে মনোবোগ করিবেন। ভাষ্যে “প্রতিসন্দর্ধানঃ” এই স্থলে হেতুর্থে “শান” প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ তর্ক প্রমাণকে প্রতিসন্দান করে বলিয়াই বাদস্বত্রে প্রমাণের সহিত কথিত হইয়াছে। প্রমাণকে প্রতিসন্দান করে কেন, এ জন্ত বলিয়াছেন—প্রমাণের অভ্যুজ্জা করে বলিয়া। তাৎপর্য এই যে, প্রমাণবিষয়ের অভাববিষয়ে যে সংশয় জন্মে, তর্ক তাহাকে নিরস্ত করিয়া প্রমাণকে প্রতিসন্দান করে অর্থাৎ নিজবিষয়ে প্রেরণ করে, ব্যাপারযুক্ত করে। এখানে প্রমাণের অভ্যুজ্জা বলিতে প্রবর্তমান প্রমাণের অভ্যুজ্জাভাবে থাকা, অর্থাৎ প্রমাণের সাহায্য করা।

মহর্ষি গোতম স্ত্রাঙ্গরূপে তর্কের উল্লেখ করিলেও এই তর্ক সর্বপ্রমাণেরই অভ্যুজ্জাহক অর্থাৎ সহকারী। ভাষ্যকারও প্রথম সূত্রভাষ্যে “প্রমাণানামনুগ্রাহকঃ” এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্যটীকাকার প্রত্যক্ষ এবং শব্দপ্রমাণের সহকারী তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসকগণ তর্ককে প্রমাণের ইতিকর্তব্যতা বলিয়াছেন। তাহা কোন কার্যে করণ, তাহা কার্য সাধন করিতে তাহাকে সহকারিরূপে অপেক্ষা করে, তাহাকে মীমাংসকগণ করণের ইতি-কর্তব্যতা বলিয়াছেন। করণ হইলেই তাহার ইতিকর্তব্যতা আবশ্যক, ইহা মীমাংসকদিগের সমর্থিত সিদ্ধান্ত। তাৎপর্যটীকাকারও প্রমাণের উপপত্তিকে ইতিকর্তব্যতা বলিয়াছেন। ফলকথা, তর্ক

কেবল অনুমানপ্রমাণেরই অঙ্গ বা সহকারী নহে, বিচারস্থলে তর্ক সর্বপ্রমাণেরই সহকারী হয়। এই জন্য তাৎপর্যটীকাকার যে কোন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্বক নির্ণয়কেই মহাধি গৌতমোক্ত নির্ণয় পদার্থ বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে^১ তর্ককে সর্বপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক বলিয়াছেন। নীমাংসাচার্য্যগণও তর্ককে শব্দপ্রমাণেরও অনুগ্রাহক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভগবান্ মনুও^২ তর্ককে শব্দপ্রমাণের অনুগ্রাহক বলিয়া গিয়াছেন। তর্ক কেবল অনুমান-প্রমাণেরই সহকারী হয়, অঙ্গ প্রমাণস্থলে কুত্রাপি তর্ক আবশ্যক হয় না, ইহা কেহই বলেন নাই। তार्কিকরক্ষাকার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, তর্ক প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অনুগ্রাহক^৩। এবং এই তর্কসাধ্য ‘অনুগ্রহ’ কি, ইহা বলিতে তিনি অনুমান-প্রমাণের বিষয়ে সংশয়নিবৃত্তিকে তর্কের ‘অনুগ্রহ’ বলিয়া অঙ্গ প্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিবৃত্তিকেও তর্কের ‘অনুগ্রহ’ অর্থাৎ তর্কসাধ্য ফল বলিয়াছেন। ৪০।

ভাষ্য। এতস্মিংশত্বকবিষয়ে।

সূত্র। বিয়শ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। এই তর্কবিষয়ে অর্থাৎ পূর্বেবক্ত তর্কস্থলে—সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থীৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পদার্থের অবধারণ “নির্ণয়”।

ভাষ্য। স্থাপনাসাধনং, প্রতিষেধ উপালম্ব্যঃ। তৌ সাধনোপালম্বৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়ো ব্যতিষক্তাবনুবন্ধেন প্রবর্তমানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্য-
চ্যেতে। তয়োৱশ্যতৱশ্য নিবৃত্তিরেকতৱশ্যাবস্থানমবশ্যংভাবি, যস্তাবস্থানং
তস্তার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।

১। ইত্তরহপি প্রমাণমনুমানচ্ছাদয়ৈব বিচারাজং ভবতীতি তত্র তর্কমনস্তথানিদ্ধিক পূরকৃত্য
এবর্ত্তত ইতি।—(আত্মতত্ত্ববিবেক)।

২। ধর্ম্মে প্রমীদমাণে হি বেদেন করণাজ্ঞনা।

ইতিকর্তব্যাতাভাং নীমাংসা পুরদিধ্যতি।—(ভট্টবার্তিক)।

৩। তর্কি ধর্ম্মোপদেশক বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যত্তর্কোপাসুসম্বন্ধে স ধর্ম্মং বেদে নেতরঃ।—(মনুসংহিতা ১২অঃ, ১০৬।)

[এখানে তর্ক শব্দের অর্থ অনুমান প্রমাণ, ইহা অনেকের মত। কিন্তু ভাষ্যকার বেদান্তিধি পরে তাহা বলেন নাই]

৪। পক্ষে বিপক্ষজিজ্ঞাসা বিচ্ছেদবস্তুরগ্রহঃ।

উপলক্ষণমেতৎ। প্রমাণবিষয়ে তদ্বিপরীতপক্ষাবিষয়ং তর্কসাধ্যোহনুগ্রহ ইত্যর্থঃ।—

(তार्কিকরক্ষা)। বিপক্ষজিজ্ঞাসা সাধারাহিত্যশব্দেত্যর্থঃ।—তार्কিকরক্ষার টীকাকার দল্লিনাথের
ব্যাখ্যা।

নেদং পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং সম্ভবতীতি, একো হি প্রতিজ্ঞাত-
মর্থং তং হেতুতঃ স্থাপয়তি দ্বিতীয়স্ত প্রতিষিদ্ধকোদ্ধরতীতি, দ্বিতীয়েন
স্থাপনাহেতুঃ প্রতিবিধ্যতে, তস্মৈব প্রতিষেধহেতুশ্চোদ্বিগতঃ, স নিবর্ততে,
তস্ত নিবৃত্তৌ যোহবতিষ্ঠতে তেনার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।

উভাভ্যামেবার্থাবধারণমিত্যাহ। কয়া যুক্ত্যা? একস্ত সম্ভবো
দ্বিতীয়স্তাসম্ভবঃ,—তাবেতৌ সম্ভবাসম্ভবৌ বিমর্শং সহ নিবর্তয়তঃ,—
উভয়সম্ভবে উভয়াসম্ভবে বাহনিবৃত্তৌ বিমর্শ ইতি। বিমূশ্চেতি বিমর্শং
কৃত্বা। সোহয়ং বিমর্শঃ পক্ষপ্রতিপক্ষাবদ্যোত্য চ্যায়ং প্রবর্তয়তীতুপা-
দীয়ত ইতি। এতচ্ বিরুদ্ধয়োরেকধর্মিস্থয়োর্বোদ্ধব্যম্। যত্র তু
ধর্মিসামান্যগতৌ বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ হেতুতঃ সম্ভবতস্তত্র সমুচ্চয়ঃ, হেতুতো-
হর্থস্ত তথাভাবোপপত্তেঃ, যথা ক্রিয়াবদ্দ্রব্যমিতি লক্ষণবচনে যস্ত দ্রব্যস্ত
ক্রিয়াযোগো হেতুতঃ সম্ভবতি, তৎ ক্রিয়াবৎ,—যস্ত ন সম্ভবতি তদক্রিয়-
মিতি। একধর্মিস্থয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োর্ধর্ময়োঃ যুগপদভাবিনোঃ কাল-
বিকল্পঃ,—যথা তদেব দ্রব্যং ক্রিয়াযুক্তং ক্রিয়াবৎ, অনুৎপন্নোপরতক্রিয়ং
পুনরক্রিয়মিতি।

ন চায়ং নির্ণয়ে নিয়মো বিমূশ্চৈব পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়
ইতি। কিন্তুিদ্দিয়ার্থসম্মিকর্ষোৎপন্নপ্রত্যক্ষেহর্থাবধারণং নির্ণয় ইতি।
পরীক্ষাবিষয়ে—বিমূশ্চ পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ। বাদে
শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্জঃ।

ইতি বাংলায়ননীয়ে চ্যায়ভাষ্যে প্রথমাদ্যায়স্ত প্রথমাহিকম্।

অনুবাদ। স্থাপনা অর্থাৎ আত্মপক্ষ সংস্থাপনকে সাধন বলে। প্রতিষেধ
অর্থাৎ পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনকে উপালম্ব বলে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যাহার
আশ্রয় অর্থাৎ একাধারে বিবাদের বিষয় দুইটি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া অথবা উদ্দেশ্য
করিয়া যাহা করা হয় (এবং) যাহা ব্যতিষক্ত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত (এবং)
যাহা অনুবন্ধবিশিষ্ট হইয়া (প্রকৃতানুবর্তী হইয়া) প্রবর্তমান অর্থাৎ যাহার অবসানে
একতর পক্ষের নির্ণয় হয়, এমন সেই (পূর্বোক্ত) সাধন ও উপালম্ব (এই সূত্রে)
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ এই দুই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষের

অৰ্থাৎ পূৰ্বেবাক্ত সাধন ও উপালন্ত্ৰের কোন একটির নিবৃত্তি এবং কোন একটির অবস্থান অবশ্যসম্ভাবী, অৰ্থাৎ উপযুক্ত মধ্যস্থের নিকটে বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পর সাধন ও উপালন্ত্ৰ হইলে সেখানে সাধনের নিবৃত্তি হইয়া উপালন্ত্ৰ থাকিবে অথবা উপালন্ত্ৰের নিবৃত্তি হইয়া সাধনই থাকিবে। তাহার অৰ্থাৎ সাধনেরই হউক অথবা উপালন্ত্ৰেরই হউক, অবস্থান হইবে, তাহার অৰ্থাৎ সেই সাধনের অথবা সেই উপালন্ত্ৰের যে অর্থ অৰ্থাৎ পক্ষ অথবা প্রতিপক্ষরূপ পদার্থ, তাহার অবধারণ নির্ণয়।

(পূৰ্বপক্ষ) এই অৰ্থাবধারণ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অৰ্থাৎ পূৰ্বেবাক্ত সাধন ও উপালন্ত্ৰ এই উভয়েরই দ্বারা হয় না। যেহেতু এক ব্যক্তি (প্রথমবাদী) সেই প্রতিজ্ঞাত পদার্থকে অৰ্থাৎ যে পদার্থটি সাধন করিতে ঐ বাদী প্রতিজ্ঞা বলিয়াছে, সেই পদার্থটি হেতুর দ্বারা স্থাপন করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির (প্রতিবাদীর) প্রতিষেধকে অৰ্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুর যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, ঐ দোষকে উদ্ধার করে, অৰ্থাৎ উহা দোষ হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে। (পরে) দ্বিতীয় ব্যক্তি (প্রতিবাদী) স্থাপনার হেতুকে অৰ্থাৎ বাদীর স্বপক্ষ সংস্থাপনের হেতুকে প্রতিষেধ করে অৰ্থাৎ তাহা ঠিক হেতু হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে এবং তাহারই (বাদীরই) প্রতিষেধের হেতুকে উদ্ধার করে। অৰ্থাৎ প্রতিবাদী পূৰ্বে বাদীর কথিত হেতুর যে দোষ প্রদর্শন করে, তাহার পরে বাদী ঐ দোষের যে প্রতিষেধ করে, সেই প্রতিষেধের হেতুকে প্রতিবাদীই উদ্ধার করে। (তখন) তাহা অৰ্থাৎ বাদীরই হউক আর প্রতিবাদীরই হউক, হেতু এবং উপালন্ত্ৰ নিবৃত্ত হয়, তাহার নিবৃত্তি হইলে বাহ্য-অৰ্থাৎ যে একটি মাত্র অবস্থান করে, তাহার দ্বারাই অৰ্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয় [অৰ্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে যখন মধ্যস্থের নির্ণয় হয়, তখন বাদী বা প্রতিবাদীর সাধন ও উপালন্ত্ৰ দুইটিই থাকে না। উহার একটি নিবৃত্ত হয়, একটি থাকে এবং যেটি থাকে, তাহার দ্বারাই সেখানে নির্ণয় হয়, তথাপি মহাবি সাধন ও উপালন্ত্ৰ, এই উভয়কেই নির্ণয়সাধন বলিয়াছেন কেন ?]

(উত্তর) উভয়ের দ্বারাই অৰ্থাবধারণ হয়, এই জ্ঞান বলিয়াছেন। (প্রশ্ন) কোন যুক্তিবশতঃ ? অৰ্থাৎ সাধন ও উপালন্ত্ৰ, এই দুইটিই যে নির্ণয়ের সাধন, তাহার যুক্তি কি ? (উত্তর) একটির সম্ভব, দ্বিতীয়টির অসম্ভব, অৰ্থাৎ বাদীর সাধনের সম্ভব, প্রতিবাদীর উপালন্ত্ৰের অসম্ভব এবং প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব, বাদীর উপালন্ত্ৰের অসম্ভব, সেই অৰ্থাৎ উক্ত প্রকার এই সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়া সংশয়কে নিবৃত্ত করে। উভয়ের সম্ভব হইলে অথবা উভয়ের অসম্ভব হইলে

অর্থাৎ যদি পূর্বোক্ত সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত না হয়, কেবল সাধন ও উপালন্তের সম্ভবই হয়, অথবা ঐ উভয়ের অসম্ভবই হয়, তাহা হইলে সংশয় নিবৃত্ত হয় না। (সূত্রে) “বিশুদ্ধ” এই কথার অর্থ সংশয় করিয়া। সেই এই সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ এক পদার্থে বিভিন্নবাদের স্বীকৃত দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে নিয়ত বিষয় করিয়া ত্রায়কে (পরার্থানুমানকে) প্রবৃত্ত করে অর্থাৎ উত্থাপিত করে; এ জ্ঞান অর্থাৎ সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে ত্রায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া (এই সূত্রে) গৃহীত হইয়াছে।

ইহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংশয়-জ্ঞান কিন্তু একধর্মগত বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কোন একই বিশেষ ধর্ম্মাতে যেখানে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের জ্ঞান হয়, তাহাই সংশয়। যেখানে কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় সামান্য ধর্ম্মগত হইয়া প্রমাণের দ্বারা সম্ভব (উপপন্ন) হয়, সেখানে ‘সমুচ্চয়’ হয় অর্থাৎ সামান্য ধর্ম্মাতে ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের জ্ঞান হইলে, সে জ্ঞান সংশয় নহে, তাহা ‘সমুচ্চয়’ নামক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। কারণ, (সেখানে) প্রমাণের দ্বারা পদার্থের (সামান্যধর্ম্মার) তথ্যভাবের (তদ্রূপতার) অর্থাৎ জ্ঞায়মান সেই ধর্মদ্বয়বৃত্ততার উপপত্তি হয়। যেমন ‘ক্রিয়াযুক্ত পদার্থ দ্রব্য’ এই লক্ষণবাক্যে (কণাদোক্ত দ্রব্যলক্ষণে) যে দ্রব্যের ক্রিয়াযোগ প্রমাণের দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা ক্রিয়াযুক্ত, যে দ্রব্যের সম্ভব হয় না, তাহা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে সক্রিয় দ্রব্যও আছে, নিষ্ক্রিয় দ্রব্যও আছে; সামান্যতঃ দ্রব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এইরূপ জ্ঞান সংশয় নহে, উহা ঐ স্থলে সমুচ্চয় জ্ঞান এবং যথার্থ জ্ঞান।

এবং একধর্ম্মগত বিভিন্ন কালভাবী বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের কালবিকল্প হয় অর্থাৎ কালবিশেষ বিষয় করিয়া সেখানে ঐ ধর্মদ্বয়ের যথার্থ নিশ্চয়ই হয়, সেখানেও ঐ জ্ঞান সংশয় নহে। যেমন সেই দ্রব্যই ক্রিয়াযুক্ত হইয়া সক্রিয় অর্থাৎ যখন তাহাতে ক্রিয়া জন্মিয়াছে, তখন সক্রিয় এবং অনুৎপন্নক্রিয় অথবা বিনষ্টক্রিয় হইলে অর্থাৎ যখন সেই দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মে নাই অথবা ক্রিয়া জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, তখন সেই দ্রব্যই আবার নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ কালভেদে এক দ্রব্যেও সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে, উহা কালভেদে বিরুদ্ধ হয় না, সুতরাং কালভেদ বিষয় করিয়া ঐ ধর্মদ্বয়ের একই ধর্ম্মাতে জ্ঞান হইলেও তাহা সংশয় নহে।

সংশয় করিয়াই পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্তের দ্বারা অর্থবধারণ নির্ণয়; ইহাও নির্ণয় মাত্র নিয়ম নহে অর্থাৎ উহাই নির্ণয়মাত্রের

লক্ষণ নহে। কিন্তু ইঙ্গিতের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষ বশতঃ উৎপন্ন প্রত্যক্ষে অর্থের অবধারণ নির্ণয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্থলে “অর্থাবধারণ” এই মাত্রই নির্ণয়ের লক্ষণ। পরীক্ষাবিষয়ে অর্থাৎ যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উপযুক্ত মধ্যস্থের নিকটে স্ব স্ব পক্ষ স্থাপনাদি করিয়া বস্তু বিচার করেন, তাদৃশ পরার্থানুমান স্থলে সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয়।

বাদবিচারে অর্থাৎ কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, যাহাতে মধ্যস্থ নাই, সেই বাদ নামক কথাতে এবং শাস্ত্রে অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারা কর্তব্য তত্ত্বনির্ণয় স্থলে সংশয় বর্জন করিয়া অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয়, অর্থাৎ সেখানে বস্তুতঃ কাহারও সংশয়পূর্বক নির্ণয় হয় না।

বাৎসায়ন-প্রণীত ত্যাগভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্গিক সমাপ্ত।

বিবৃতি। প্রমাণের দ্বারা বস্তু নিশ্চয়কেই নির্ণয় বলে; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও হয়, শাস্ত্রের দ্বারাও হয়, আবার নিজে নিজে অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও হয়, আবার দ্বিজ্ঞাত ইহা গুরু প্রভৃতি মনোবিগণের সহিত বিচার করিয়াও হয়, নীরবে গুরু প্রভৃতির কথা শুনিয়াও হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া আর এক প্রকার নির্ণয় আছে, তাহা উভয় পক্ষের বিচার শুনিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের হয়। যেখানে একই পদার্থে দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ নাই বা বাদী ও প্রতিবাদী দুইটি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন, সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিরা সংশয় করেন। তাহার পরে ঐ বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষ সংস্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন শুনিয়া একতর পক্ষের নির্ণয় করেন। মধ্যস্থ ব্যক্তি-নির্ণয়ের একতর পক্ষের নির্ণয় হইলে তাঁহারা সেই পক্ষেরই অনুমোদন করেন, সেই পক্ষের বিরুদ্ধবাদী নিরস্ত হন। মধ্যস্থের সংশয় দূর করিতে না পারিলে মধ্যস্থ একতর পক্ষের অনুমোদন করিতে পারেন না, সুতরাং মধ্যস্থের নির্ণয় সম্পাদনের জন্ত বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিবেন। যেখানে ঐ স্থাপন ও খণ্ডন যথারীতি যথাসম্ভব চলিবে, সেখানে অবশ্যই উহার একটির নিবৃত্তি এবং অপরটির স্থিতি হইবে। কারণ, দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ একই পদার্থে কখনও প্রমাণদ্বিগু হইতে পারিবে না।

আত্মা নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, ইহা কখনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। আত্মার নিত্যত্ববাদী ও অনিত্যত্ববাদী প্রকৃত মধ্যস্থের নিকটে পঞ্চাষয়ব দ্বারা প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিতে থাকিলে সেখানে একটি পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হইবে। মধ্যস্থ তাহার নির্ণয় করিবেন। উভয়বাদীর সম্মানিত স্বীকৃত মধ্যস্থ যে পক্ষের নির্ণয় করিবেন, তাহাই সেখানে সিদ্ধান্ত হইবে। বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের নিশ্চয় করিয়াই বিচার করে, তাহাদিগের কোন সংশয় থাকে না। এইরূপ স্থলে মধ্যস্থেরই সংশয় হয়, মধ্যস্থেরই নির্ণয় হয়। মধ্যস্থ না থাকিলে এ নির্ণয়টি হইতে পারে না। কারণ, কয় জন বাদী স্বেচ্ছায় নিজের পক্ষ

তাগ করেন, নিজের ভ্রম স্বীকার করেন? মধ্যস্থের এইরূপ নির্ণয়ে রাজা এবং অজ্ঞান সভ্যগণেরও ঐরূপ নির্ণয় হইয়া যায়। এই নির্ণয় জ্ঞান-বিদ্যার একটি মুখ্য ফল। ইহা জ্ঞানবিদ্যাগাধ্য। ইহার মূল মধ্যস্থগণের সংশয়। ঐ সংশয়ই বাদী ও প্রতিবাদীর পরার্থানুমান-প্রবৃত্তির মূল। সন্দেহ পদার্থেই জ্ঞানপ্রবৃত্তি হয় এবং তাহার ফল এই নির্ণয়। ইহাতে প্রমাণের সাহায্যের জন্ত তর্ক আবশ্যক হয়। তাই জ্ঞানবিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি গৌতম তর্কের পরেই এই নির্ণয়ের উল্লেখ ও স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। ইহা নির্ণয়মাত্রের লক্ষণ নহে।

টিপ্পনো। নির্ণয় অনেক প্রকারেই হয়, কিন্তু সকল নির্ণয় তর্কপূর্বক নহে। তর্কবিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি গৌতম তর্কপূর্বক নির্ণয়কেই এই স্বত্বের দ্বারা বলিয়াছেন। এই নির্ণয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞান প্রয়োগ আবশ্যক হয়, মধ্যস্থের সংশয় দূর করিতে তর্কের উদ্ভাবন করিতে হয়; এ জ্ঞান মহর্ষি পঞ্চাবয়ব এবং তর্ক নিরূপণ করিয়া তাহার ফল নির্ণয় নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাবধারণই নির্ণয় মাত্রের সামান্য লক্ষণ। সংশয়পূর্বক পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা যে অর্থাবধারণ, তাহা নির্ণয়বিশেষের লক্ষণ।

একাধারে বিবাদের বিষয় দুইটি বিকল্প ধর্মই এই শব্দে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রকৃত অর্থ। মহর্ষি গৌতম বাদস্থে এই অর্থেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে ভাব্যকারও মহর্ষি-স্বত্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের ঐরূপ প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের ঐ অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ, এই স্থানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ বলা হইয়াছে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে যখন বিবাদবিষয় দুইটি বিকল্প ধর্ম, তখন তাহার দ্বারা অবধারণ বলা যায় না; ঐ দুইটি ধর্মেরই একটির অবধারণ হইবে, তাহার দ্বারা অবধারণ হইবে না। যাহা অবধারণীয়, যাহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে, তাহার দ্বারাই কি তাহাকে বুঝিয়া লওয়া যায়? অবধারণ করা যায়? তাহা কখনই যায় না। এ জ্ঞান ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, এই স্থানে মহর্ষি যে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দ বলিয়াছেন, উহার দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সাধন ও উপালম্ব বুঝিতে হইবে। মহর্ষি এখানে ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধন বলিতে সংস্থাপন, উপালম্ব বলিতে তাহার ধ্বংস। একজন স্বপক্ষের সংস্থাপন করিলে অপর ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবাদী তাহার ধ্বংস করেন। এই সাধন ও উপালম্ব শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। পরে অনেক স্থলে এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ হইবে। সর্বত্র উহার অর্থ প্রকাশ করা যাইবে না। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের মুখ্য অর্থও মনে রাখিতে হইবে। মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষকেই লক্ষণা বলে। মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গার অতি নিকটে বাস করিলে “তিনি গঙ্গাবাস করিতেছেন”, এইরূপ কথা বলা হইয়া থাকে। এখানে গঙ্গা শব্দের মুখ্য অর্থ সেই জল-বিশেষ না বুঝিয়া তাহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধযুক্ত গঙ্গাতীরকেই “গঙ্গা” শব্দের দ্বারা বুঝা হয়। ঐ সম্বন্ধবিশেষই ঐ স্থলে লক্ষণা। ঐ সম্বন্ধরূপ লক্ষণাজ্ঞানবশতঃ ঐ স্থলে ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থ বুঝা যায়। অনেক স্থলে কোন প্রয়োজনবশতঃই লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ হইয়া

আসিতেছে। এখানে এই স্বত্রে লাক্ষণিক পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ কেন করা হইয়াছে এবং উহার মুখ্যার্থের সহিত পূর্বোক্ত লাক্ষণিক অর্থের সম্বন্ধই বা কি? এই প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে ঐ সাধন ও উপালন্তরূপ লাক্ষণিক অর্থকে বলিয়াছেন “পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়” অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বাহার আশ্রয়। পক্ষকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সাধন করিতে হয় এবং প্রতিপক্ষ পদার্থটির উপালন্ত না করিলেও অর্থাৎ তাহা অসম্ভব হইলেও ঐ প্রতিপক্ষ পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার সাধনের (সংস্থাপনের) উপালন্ত (খণ্ডন) করা হয়, এ জন্ত সাধন ও উপালন্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের আশ্রিত। তাহা হইলে সাধন ও উপালন্তের সহিত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পদার্থের ঐরূপ সম্বন্ধ (আশ্রয়াশ্রয়িতাব) থাকায় ঐ সাধন ও উপালন্ত অর্থে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইতে পারে। ফলকথা, মহর্ষি পক্ষ ও প্রতিপক্ষের আশ্রিত সাধন ও উপালন্তকেই এই স্বত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সাধন ও উপালন্তের দ্বারা অর্থাবধারণ হইয়া থাকে, সুতরাং মহর্ষির ঐ কথা অব্যোধ্য হয় নাই। মহর্ষি এই স্বত্রে সাধন ও উপালন্ত শব্দের প্রয়োগ করিলেই তাহার স্বত্রে স্পষ্টার্থ হইত। তিনি তাহা না করিয়া এবং মুখ্য শব্দ পরিভাষা করিয়া লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার ইহার উত্তর স্বচনার জন্ত আবার বলিয়াছেন,—“ব্যতিষক্তৌ”। ব্যতিষক্ত বলিতে এখানে পরস্পর মিলিত অথবা উভয় পক্ষে সম্বন্ধযুক্ত (বাদ-স্বত্বভাব্য দ্রষ্টব্য)। তাৎপর্য্য এই যে, সাধন ও উপালন্ত বলিলে উহা যে উভয় পক্ষেই সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই, ইহা বুঝা যায় না। এ জন্ত মহর্ষি এখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা ঐরূপ সাধন ও উপালন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পক্ষেও সাধন এবং উপালন্ত থাকিবে এবং প্রতিপক্ষেও সাধন এবং উপালন্ত থাকিবে। পক্ষে বাদীর সাধন, প্রতিবাদীর উপালন্ত, প্রতিপক্ষে প্রতিবাদীর সাধন, বাদীর উপালন্ত—এইরূপ হইলে, সেই সাধন ও উপালন্তকে “ব্যতিষক্ত” বলা যায়। এইরূপ না হইলে তাহা ঐ স্থলে অর্থাবধারণের সাধনও হয় না। তাই মহর্ষি এইরূপ সাধন ও উপালন্তকে প্রকাশ করিবার জন্তই এই স্বত্রে লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্বত্রে “অবধারণ” না বলিয়া “অর্থাবধারণ” বলিয়া স্বচনা করিয়াছেন যে, যে কোন বিষয়ে একটা অবধারণ হইলেই স্ত্রায়ের দ্বারা বস্ত্ত পরীক্ষা স্থলে নির্ণয় হইবে না। যে অর্থ লইয়া অর্থাৎ যে বস্ত্ত লইয়া বিচার, তাহারই অবধারণ হওয়া আবশ্যক। বিচারমাত্রেরই যে কোন বিষয়ে একটা অবধারণ হইয়াই থাকে। প্রকৃতার্থের অবধারণ না হইলে তাহা সেখানে নির্ণয় হইবে না। বিচার্য্য বিষয়ে সাধন ও উপালন্ত হইতে থাকিলে যেখানে ঐ সাধন ও উপালন্তের একতরের নিবৃত্তি এবং একতরের স্থিতি অবশ্যই হইবে, সেখানেই একতর পক্ষের নির্ণয় হইবে। সাধন ও উপালন্তের ঐরূপ অবস্থাই তাহাদিগের পরস্পর অনুবন্ধ বলা হইয়াছে। “অনুবন্ধবিশিষ্ট হইয়া প্রবর্ত্তমান” এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার শেষে পূর্বোক্ত প্রকার পরস্পর অনুবন্ধবিশিষ্ট সাধন ও উপালন্তকেই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি স্বত্রে “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াই উহা স্বচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ

যে সাধন ও উপালন্তের চরম ফল একতর নির্ণয়, তাহাই এখানে বুঝিতে হইবে। তাহাকেই বলে অল্পবাক্যুক্ত সাধন ও উপালন্ত। তাৎপর্যটীকাকারও এখানে পূর্বোক্ত প্রকার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্রকার সাধন ও উপালন্তের একটির নিবৃত্তি এবং একটির স্থিতি অবশ্যই হইবে। কারণ, একই পদার্থে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম কখনই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। যেখানে সাধনের স্থিতি হয়, সেখানে সেই সাধনের যেটি অর্থ, অর্থাৎ যে পদার্থকে (পক্ষ বা প্রতিপক্ষ) আশ্রয় করিয়া ঐ সাধন করা হইয়াছে, তাহারই অবধারণ হয়। যেখানে উপালন্তের স্থিতি হয় অর্থাৎ উপালন্তের পরে বিরুদ্ধবাদী আর কিছু না বলিতে পারে, তাহার খণ্ডন করিতে না পারে, সেখানে ঐ উপালন্তের যেটি অর্থ অর্থাৎ যে পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতিবাদী বাদীর সাধনের খণ্ডন করিয়াছেন, সেই পদার্থটিরই অবধারণ হইবে। এইরূপ অবধারণই পরীক্ষাস্থলে নির্ণয়। সংশয়ের পরে মধ্যস্থ ব্যক্তিরই এই নির্ণয় হইয়া থাকে। ভাষ্যোক্ত পূর্বপক্ষের তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্তের যখন একটির নিবৃত্তি এবং একটির স্থিতি হইবে, নির্ণয়ের পূর্বে দুইটিই থাকিবে না, এ কথা ইহার পূর্বেও বলা হইয়াছে, তখন সাধন ও উপালন্ত, এই দুইটিকেই অর্থাবধারণের সাধন বলা যায় কিরূপে? পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্ত মিলিত হইয়া ত নির্ণয়ের সাধন হয় না, উহার মধ্যে যেটির স্থিতি হয়, সেইটির দ্বারা নির্ণয় হয়। উত্তর-পক্ষের তাৎপর্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও উপালন্তের ফলে মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্ত হয়। ঐ সাধন ও উপালন্ত, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইলে সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না এবং ঐ উভয়ের স্থিতি হইলেও সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না। যদি বাদীর সাধনের সম্ভব এবং প্রতিবাদীর উপালন্তের অসম্ভব হয়, অথবা প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব এবং বাদীর উপালন্তের অসম্ভব হয়, তবে সেখানেই মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ যদি বাদীর সাধনকে প্রতিবাদী খণ্ডন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন, অথবা প্রতিবাদীর সাধনকে বাদী খণ্ডন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন, তবেই সেখানে এক পক্ষের অবধারণ হয়, সংশয় নিবৃত্ত হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও উপালন্তের নিবৃত্তি হইল না, অথবা সাধন ও উপালন্ত, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইয়া গেল, কোন বাদীই স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না, উভয়েই নিবৃত্ত হইয়া গেলেন, সেখানে সংশয় নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং সেখানে নির্ণয় হয় না। তাহা হইলে বুঝা গেল, পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্তের সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়াই নির্ণয়ের সাধন করে; সুতরাং সাধন ও উপালন্ত এই উভয়ই নির্ণয়ের সাধন। ঐ উভয়ের মধ্যে একের সম্ভব ও অপরটির অসম্ভব যখন নির্ণয়ে আবশ্যক, তখন ঐ উভয়কেই নির্ণয়ের সাধন বলিতে হইবে।

সূত্রে যে "বিমুক্ত" এই কথাটি আছে, উহার অর্থ সংশয় করিয়া। মহর্ষি গোতম "বিমুক্ত"-কেই সংশয় বলিয়াছেন। এই সূত্রে ঐ কথার প্রয়োজন কি? এতদ্বত্তে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয় পূর্বোক্ত স্থলে ত্রায়প্রবৃত্তির মূল। যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম লইয়া বাদী ও প্রতিবাদীর ত্রায়প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডন হয়, সেই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে নিম্নত বিষয় করিয়া মধ্যস্থের সেখানে সংশয় হইয়া থাকে। ঐ সংশয়ই সেখানে

বাদী ও প্রতিবাদীর স্মারপ্রবৃত্তির মূল। সুতরাং ঐরূপ স্থলে সংশয়পূর্বকই নির্ণয় হইয়া থাকে। এ জন্ত এইরূপ নির্ণয়ে মহর্ষি সংশয়ের কথা বলিয়াছেন। ভাব্যে “পক্ষপ্রতিপক্ষৌ অবদ্যোতা” এইরূপ সন্ধিবিক্ষেদ করিয়া বাক্যার্থ বৃদ্ধিতে হইবে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দ এখানে মুখ্য অর্থেই প্রযুক্ত। “অবদ্যোতা” এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটাকাকার বলিয়াছেন,— “নিরমেন বিষয়ীকৃত্য”। ভাব্যকার পূর্বে যে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় বিষয়ে সংশয়ের কথা বলিয়াছেন, ঐ সংশয় একই সময়ে একই ধর্ম্মাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সম্বন্ধে বৃদ্ধিতে হইবে। তাই ভাব্যকার শেষে তাহাই বলিয়াছেন। ভাব্যকারের সেই কথার তাৎপর্য এই যে, যেখানে কোন প্রকারে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে, সেখানে তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মে না। তজ্জন্ত কোন বাদী ও প্রতিবাদীর “স্মারপ্রবৃত্তি” হয় না। যেমন মহর্ষি কণাদ “ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্য-লক্ষণং” (বৈশেষিক-দর্শন, ১৫ সূত্র) এই সূত্রে দ্রব্যের প্রথম লক্ষণ বলিয়াছেন ক্রিয়া। কিন্তু দ্রব্যমাত্রেরই ক্রিয়া নাই। আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিষ্ক্রিয় বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ। তাহা হইলেও “দ্রব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়” এইরূপ জ্ঞান সংশয় হইবে না। কারণ, দ্রব্যরূপে দ্রব্য সামান্তধর্ম্মী। তাহার মধ্যে দ্রব্যবিশেষ সক্রিয় এবং দ্রব্যবিশেষ নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও ধর্ম্মীর ভেদে উহা বিরুদ্ধ নহে। একই দ্রব্য ধর্ম্মীতে যদি সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একটি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান সংশয় হইবে। যখন কোন দ্রব্যে সক্রিয়ত্ব এবং কোন দ্রব্যে নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রমাণসিদ্ধ, তখন সামান্ততঃ দ্রব্যধর্ম্মীতে সক্রিয়ত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্বের উল্লেখ করিলে তাহা সংশয় জন্মাইবে না। ঐ স্থলে দ্রব্যধর্ম্মীতে সক্রিয়ত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব বিদ্যে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহাকে বলে সমুচ্চর-জ্ঞান। অর্থাৎ দ্রব্য সক্রিয়ও বটে, নিষ্ক্রিয়ও বটে, কোন দ্রব্য সক্রিয়, কোন দ্রব্য নিষ্ক্রিয়। এইরূপে বিভিন্ন দ্রব্যধর্ম্মীতে সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বরূপ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয়। স্মারচাৰ্য্যগণ এইরূপ জ্ঞানকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলিয়াছেন। ভাব্যকার “সমুচ্চর” শব্দের দ্বারা এই সমূহালম্বন জ্ঞানকেই প্রকাশ করিয়াছেন। সমূহালম্বন জ্ঞান বুঝাইতে সমুচ্চর শব্দের প্রয়োগ^১ নব্য নৈয়ায়িকগণও করিয়াছেন। সংশয় জানে একই ধর্ম্মীতে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিষয় হয়, অর্থাৎ “সংশয়” জানে যে পদার্থ বিশেষ্য হইবে, তাহাতে একটিমাত্র বিশেষ্যতা থাকিবে। আর বিশেষণ যে কয়েকটি হইবে, তাহাতে সেই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণতা থাকিবে। “সমুচ্চর” জানে যে কয়েকটি বিশেষণ হয়, সেই কয়েকটি বিশেষ তা হইয়া থাকে। সেই জানে বিশেষণতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, বিশেষ্যতাও তজ্জপ ভিন্ন ভিন্ন। সমুচ্চর ও সংশয় জ্ঞানের অন্ততঃ এই ভেদ সর্বত্র থাকিবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভাব্যকার এখানে যে সমুচ্চর জ্ঞানের কথা বলিয়া তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন, উদ্যোতকর ও

১। সংশয়বিশেষ্যতাব্যবহিত প্রকারভাবনিরূপিতভাবেষক “নির্দিষ্টকর্তৃকৃত্যপক্ষ” ইত্যাদি-সমুচ্চরজ্ঞান সাধানিচ্ছারবসত্ত্বাৎ তৎসম্বন্ধেপি ন বহুহুমিতিঃ, সমুচ্চরস্থলে প্রকারভাবনিরূপিত-বিশেষ্যতা-স্বরোপপন্নং ইত্যাদি।—পক্ষভাষ্যকারে ভাষ্যদ্বীপ।

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐ সকল কথার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। “ক্রিয়াবদ্ভব্যমিতি লক্ষণ-বচনে” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার পূর্বোক্ত কণাদ-সূত্রটিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, নহে। কণাদ ক্রিয়াকে ভব্যমাত্রেয় লক্ষণ বলেন নাই। আত্মা প্রভৃতি ভব্যে গমনাদি ক্রিয়া নাই। বাহ্যতে ক্রিয়া জন্মে, তাহা ভব্য পদার্থই হইবে; ভব্য ভিন্ন পদার্থে ক্রিয়া থাকে না, ইহাই কণাদের তাৎপৰ্য্য। প্রাচীনগণ কণাদ-সূত্রের ঐ অংশের এইরূপই তাৎপৰ্য্য বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং কণাদের ঐ ভব্যবিশেষের লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা নামান্তরঃ ভব্যমাত্রে ক্রিয়া আছে কি না, এইরূপ সংশয় হয় না। কারণ, কোন ভব্যে ক্রিয়া আছে, কোন ভব্যে ক্রিয়া নাই, ইহা বুঝিলে কণাদের ঐ কথা সংশয় জন্মায় না। কেহ যেন ঐ লক্ষণ-বাক্য শুনিয়া ঐরূপ সংশয় না করেন, ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যকার ঐ কথার অবতারণা করিয়াছেন, ইহা বলা বাইতে পারে। আবার কালভেদে একই ভব্যে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে। গাড়ী যখন চলিতেছে, তখন গাড়ী সক্রিয়, যখন দাঁড়াইয়া আছে, তখন নিষ্ক্রিয়; ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং নাশও হয়; সুতরাং একই ভব্যকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বলিলে, ঐ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সেই ভব্যে কালভেদে বুঝিতে হইবে। কালভেদে এক ভব্যেও উহা বিকল্প ধর্ম নহে। কলকথা, ভব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়, এইরূপ কথা বলিলে ঐ বাক্যের দ্বারা বোদ্ধা ব্যক্তির সংশয় জন্মে না। সেখানে উহা লইয়া কোন বাদো ও প্রতিবাদীর স্তায়প্রবৃতি হয় না।

সূত্রকারোক্ত এই নির্ণয়-লক্ষণ নির্ণয় মাত্রেয় লক্ষণ নহে। স্তায়ের দ্বারা বস্তু পরীক্ষা স্থলে মধ্যস্থের যে নির্ণয়বিশেষ জন্মে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সেই স্তায়ের ফল নির্ণয়েরই লক্ষণ বলিয়াছেন। অজ্ঞাত কেবল অর্থাবধারণই নির্ণয়ের লক্ষণ; এ কথা ভাষ্যকারও শেষে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তাৎপৰ্য্যটীকাকার কিন্তু প্রথম সূত্র-ভাষ্যে নির্ণয় ব্যখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্বক নির্ণয় হইলে বস্তুতঃ তাহাও নির্ণয় হইবে অর্থাৎ তিনি সেখানে তর্কপূর্বক নির্ণয়কেই মহর্ষি গোতমের নির্ণয় পদার্থ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে এবং শাস্ত্রে সংশয় পূর্বক নির্ণয় হয় না। বাদবিচারে মধ্যস্থ আবশ্যক নাই; সুতরাং সেখানে কাহারও সংশয়, স্তায়প্রবৃতি জন্মায় না। বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষে নিশ্চয় রাখিয়াই বিচার করে। বাদী ও প্রতিবাদীর সংশয় জন্ম কোন স্থানেই স্তায়প্রবৃতি হয় না; সুতরাং বাদবিচারে যে নির্ণয় হয়, তাহা সংশয়পূর্বক নহে। অর্থাৎ সূত্রে যে “বিমুক্ত” এই কথাটি আছে, উহা বাদবিচার ভিন্ন বিচারান্তিমুখেই বলা হইয়াছে।

বাদবিচার-স্থলীয় নির্ণয়ের লক্ষণ বুঝিতে সূত্রের “বিমুক্ত” এই কথাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণয়ও সংশয় পূর্বক নহে। অশ্বমেধ যাগ করিলে স্বর্গ হয়, ইহা বেদের দ্বারা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু ঐ নির্ণয়ের পূর্বে ঐ বিষয়ে অজ্ঞতা থাকিলেও সংশয় থাকে না। সুতরাং ঐ নির্ণয় সংশয়পূর্বক নহে। এ বিষয়ে অজ্ঞাত কথা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে সূত্র ৪১।

স্তায়সূত্রকার মহানুভি গোতমের স্তায়সূত্রের প্রথম হইতে ৪১টি সূত্র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আদিক নামে সম্প্রদায়ক্রমে প্রসিদ্ধ আছে। অনেকে বলেন, মহর্ষি গোতম তাঁহার শিষ্যদিগকে

যে সূত্রগুলি এক দিনে বলিয়াছিলেন, সেই সূত্রগুলিই শ্রায়সূত্রের আন্থিক নামে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি দশ দিনে সমস্ত শ্রায়সূত্র বলিয়াছিলেন। এই জন্ত শ্রায়সূত্রে দশটি আন্থিক আছে। কিন্তু ভাব্যকার প্রভৃতি এই “আন্থিক” শব্দের পূর্বোক্ত প্রকার অর্থের ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার উহার অন্তরূপ কোন ব্যাখ্যাও করেন নাই। তবে এক দিবসে নিষ্পন্ন, এইরূপ অর্থও আন্থিক শব্দটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কণাদসূত্র এবং পানিনি-সূত্রেরও এইরূপ তিন তিন অংশ আন্থিক নামে প্রসিদ্ধ আছে। সূত্রগ্রন্থের কোন কোন ভাষ্যেরও সূত্রানুসারে আন্থিক দেখা যায়। পানিনিসূত্রের আন্থিক অনুসারেই মহাভাষ্যের আন্থিক প্রসিদ্ধ আছে। শ্রায়সূত্র-ভাব্যকার বাংভারনও শ্রায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আন্থিকের ভাষ্য করিয়া “শ্রায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আন্থিক সমাপ্ত” এই কথা বলিয়া তাহার ভাষ্যের প্রথম আন্থিকের সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রায়সূত্রেরও প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আন্থিকের এখানেই সমাপ্তি, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে।

ভাষ্য । তিস্রঃ কথা ভবন্তি, বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি তাসাং

সূত্র । প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্বঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ
পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ॥১।৪২॥

অনুবাদ । কথা অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে উক্তি ও প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যসন্দর্ভ ত্রিবিধ হয় ;—(১) বাদ, (২) জল্প এবং (৩) বিতণ্ডা ।

সেই ত্রিবিধ কথার মধ্যে যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব অর্থাৎ স্বপক্ষ সংস্থাপন এবং পরপক্ষ সংস্থাপনের খণ্ডন হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ এবং যাহাতে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পূর্বোক্ত পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হয়, এমন যে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অর্থাৎ যাহাতে একই পদার্থে পক্ষস্বর-বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের মধ্যে বাদী একটিকে এবং প্রতিবাদী অপরটিকে নিয়ম করিয়া স্বীকার করেন, এইরূপ যে বাক্যসন্দর্ভ, তাহা ‘বাদ’ ।

বিত্তি । বাদী ও প্রতিবাদীর যথারীতি পরস্পর বাদপ্রতিবাদরূপ বিচার দুই উদ্দেশ্যে হইতে পারে। একমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অথবা জয়লাভের উদ্দেশ্যে। তাহার মধ্যে যে বিচার কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই হয়, তাহার নাম “বাদ” এবং যে বিচার জয়লাভের

১। তেন নির্কৃত্তং ।—পানিনিসূত্র, ৪।১।৭২।

অন্য নির্কৃত্তং ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী ।

উদ্দেশ্যে হয়, তাহার নাম “জন্ম” ও “বিতণ্ডা।” তন্মধ্যে বিতণ্ডায় বিতণ্ডাকারী আত্মপক্ষ সংস্থাপন করেন না, কেবল পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন; জন্ম হইতে বিতণ্ডার ইহাই মাত্র বিশেষ। গুরু প্রভৃতির সহিত কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাদবিচার হয়, স্তূতরাং তাহাতে জিগীষার গন্ধও নাই, মধ্যস্থেরও আবশ্যকতা নাই। জিগীষুর বিচার জন্ম বা বিতণ্ডা, তাহাতে মধ্যস্থ আবশ্যক। মধ্যস্থই সেখানে জয় ও পরাজয়ের ঘোষণা করেন। জন্ম ও বিতণ্ডায় বিচারকদ্বয় ছিল প্রভৃতি অসহ্যেরও করিতে পারেন এবং সর্ববিধ নিগ্রহস্থানেরই উল্লেখ করিতে পারেন। কারণ, যে কোনরূপে যে কোন দিক্ দিয়া বিপক্ষকে পরাস্ত করাই সেখানে বিচারকদ্বয়ের উদ্দেশ্য থাকে। বাদবিচারে তাহা উদ্দেশ্য নহে; তাহার উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়, স্তূতরাং তাহাতে ‘জন্ম’ প্রভৃতি অসহ্যের করা হয় না এবং করা যায় না। এক অর্থে প্রযুক্ত বাক্যের অল্প অর্থ কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করাকে জন্ম বলে। বাদী নূতন কঞ্চল অর্থে “নব কঞ্চল” শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন,—“নয়থানা কঞ্চল কোথায়, তাহা ত নাই,” এরূপ অসহ্যের ‘জন্ম’। এই জন্ম তিন প্রকার। অল্প প্রকারে আরও অনেক অসহ্যের আছে; সেগুলির নাম ‘জাতি’; তাহা চতুর্বিংশতি প্রকার। যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর অজ্ঞতা বা ভ্রম প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যাহা যে কোনরূপে যে কোন অংশে বাদী বা প্রতিবাদীর পরাজয় স্থচনা করে, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে; এই নিগ্রহস্থান ষাটবিংশতি প্রকার। ইহার মধ্যে হেত্বাভাস একপ্রকার নিগ্রহস্থান। বাদী বা প্রতিবাদী যদি কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত হলে হেতু হয় না, তাহার দ্বারা অহুমান করেন, তাহা হইলে তাহার বিপক্ষ বিচারক তাহা উল্লেখ করিবেন;—এ হেতু ঠিক হয় নাই, ইহা বুঝাইয়া দিবেন। বাদবিচারেও ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, সেখানে তত্ত্ব নির্ণয় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাহা তত্ত্ব নির্ণয়ের অন্তর্কূল এবং যাহা উপেক্ষা করিলে সেখানে তত্ত্ব নির্ণয়েরই বাধাত ঘটে, তাহা সেখানে কখনই উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। গুরু-শিষ্যের বাদ-বিচার হইতেছে, গুরু আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন, আত্মা দেহাদি নহে—ইহা বুঝাইলেন, কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে ভ্রমবশতঃ বলিয়া ফেলিলেন—“আত্মা নিত্য, বেহেতু তাহার রূপ নাই; যেমন আকাশ, কাল, দিক্ প্রভৃতি।” তখন তত্ত্বনির্ণয়ার্থী শিষ্য অবশ্যই বলিবেন—এই হেতু ঠিক হয় নাই, ইহা হেত্বাভাস। কারণ, রূপ না থাকিলেই তাহা নিত্য পদার্থ হইবে, এমন নিয়ম নাই। বায়ুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু নিত্য পদার্থ নহে। গুরু যদি তখন বায়ুমাত্রেই নিত্য বলিয়াই বলেন, তাহা হইলে উহা অসিদ্ধান্ত, ইহা শিষ্য অবশ্যই বলিবেন। কারণ, অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার করিয়া গেলে প্রকৃত বিষয়ে তত্ত্বনির্ণয় ঘটিবে না; বাদবিচারে যে তত্ত্ব নির্ণয়ই উদ্দেশ্য। “অপসিদ্ধান্ত” একটি “নিগ্রহস্থান”, বাদবিচারে তাহার উদ্ভাবন আছে এবং হেত্বাভাস মাত্রেই উদ্ভাবন আছে এবং স্থলবিশেষে আর ছই একটি নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন আছে। জন্ম ও বিতণ্ডার দ্বায় বাদবিচারে সর্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই, জন্ম ও জাতির একেবারেই কোন সংশ্রব নাই। বাদী ও প্রতিবাদী কেবল জয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় জন্ম বিচার করিলেও ঐ বিচার ভাল ভাবে

চলিলে উহার দ্বারা অনেক সময়ে মধ্যস্থের তত্ত্বনির্ণয় হইয়া যায়। এই নির্ণয়ই মহর্ষি গোতমের বোদ্ধশ পদার্থের অন্তর্গত নির্ণয় পদার্থ। ঐ নির্ণয় মধ্যস্থের সংশয় পূর্বক। বাদবিচারে নির্ণয় ঐক্যপনহে।

ভাষ্য। একাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, প্রত্যনৌকভাবাৎ, অন্ত্যাত্মা নাস্ত্যাভ্যেতি। নানাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ন পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, যথা নিত্য আত্মা অনিত্যা বুদ্ধিরিতি। পরিগ্রহোহভ্যুপ-
গমব্যবস্থা। সোহয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। তস্য বিশেষণং, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভঃ, প্রমাণৈস্তর্কেণ চ সাধনমুপালম্ভশ্চাস্মিন্ ক্রিয়ত ইতি। সাধনং স্থাপনা, উপালম্ভঃ প্রতিষেধঃ। তৌ সাধনোপালম্ভৌ উভয়োরপি পক্ষয়োর্ব্যতিষক্তাবনুবদ্ধৌ, যাবদেকৌ নিবৃত্ত একতরো ব্যবস্থিত ইতি, নিবৃত্তস্ত্রোপালম্ভৌ ব্যবস্থিতস্য সাধনমিতি। জল্পে নিগ্রহ-স্থানবিনিয়োগাদ্বাদে তৎপ্রতিষেধঃ। প্রতিষেধে কস্মচিদভ্যনু-
জ্ঞানার্থং “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ” ইতি বচনম্। “সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ” ইতি হেত্বাভাসস্য নিগ্রহস্থানস্যাভ্যনুজ্ঞাবাদে। “পক্ষাবয়বোপপন্ন” ইতি “হীনমন্ততমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনং,” “হেতুদাহরণাধিকমধিক”মিতি চৈতয়োরভ্যনুজ্ঞানার্থমিতি। অবয়বেষু প্রমাণতর্কাস্তর্ভাবে পৃথক্ প্রমাণ-
তর্কগ্রহণং সাধনোপালম্ভব্যতিষঙ্গজ্ঞাপনার্থং, অন্যথোভাবপি স্থাপনাহেতুনা প্রবৃত্তৌ বাদ ইতি স্যাৎ। অন্তরেণাপি চাবয়বসম্বন্ধং প্রমাণান্বর্থং সাধয়ন্তীতি দৃষ্টং, তেনাপি কল্পেন সাধনোপালম্ভৌ বাদে ভবত ইতি জ্ঞাপয়তি। ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভৌ জল্প ইতি বচনাদ-
বিনিগ্রহো জল্প ইতি মা বিজ্ঞায়ি, ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভ এব জল্পঃ, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভৌ বাদ এবেতি মা বিজ্ঞায়ীত্যেবমর্থং পৃথক্-
প্রমাণ-তর্কগ্রহণমিতি।

অনুবাদ। একাধারে অবস্থিত দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম বিরুদ্ধতাবশতঃ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন একই পদার্থে বাদীর স্বীকৃত একটি এবং প্রতিবাদীর স্বীকৃত একটি—এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলে। (যেমন) আত্মা আছে এবং আত্মা নাই, (এখানে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব পক্ষ এবং

তাহার নাস্তিই প্রতিপক্ষ, আবার নিত্য আত্মার নাস্তিইবাদীর নাস্তিই পক্ষ, অস্তিত্ব প্রতিপক্ষ)। বিভিন্ন আধারে স্থিত বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না, যেমন আত্মা নিত্য, বুদ্ধি অনিত্য, (এখানে এক আত্মারই অথবা বুদ্ধিরই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বলা হয় নাই; সুতরাং উহা বিরুদ্ধ না হওয়ায় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে না)। পরিগ্রহ বলিতে (এখানে) স্বীকার ব্যবস্থা, অর্থাৎ এই পদার্থ এই প্রকারই হইবে, এই প্রকার হইবে না, এইরূপে স্বীকারের নিয়ম। সেই এই পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ অর্থাৎ যাহাতে পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নিয়মবদ্ধ স্বীকার থাকে, এমন বাক্যসম্বলিত 'বাদ'। তাহার বিশেষণ প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব, (অর্থাৎ পূর্বোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ ত্রিবিধ কথ্যেই আছে, উহাই কেবল বাদের লক্ষণ হয় না, এ জ্ঞাত ঐ বাদলক্ষণে মহর্ষি বিশেষণ বলিয়াছেন—প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব,) প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা এই বাদবিচারে সাধন এবং উপালম্ব করা হয়। সাধন বলিতে স্থাপন অর্থাৎ স্বপক্ষ সংস্থাপন, উপালম্ব বলিতে প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন। সেই সাধন ও উপালম্ব এই দুইটি উভয় পক্ষেই ব্যতিষক্ত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত এবং অনুবন্ধবিশিষ্ট হইবে। (ঐ উভয়ের অনুবন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন) যে পর্য্যন্ত একটি নিবৃত্ত হইবে, একটি ব্যবস্থিত হইবে। নিবৃত্তের সম্বন্ধে উপালম্ব, ব্যবস্থিতের সম্বন্ধে সাধন হইবে।

জন্মে নিগ্রহস্থানের বিনিয়োগবশতঃ অর্থাৎ ইহার পরবর্তী সূত্রে জন্ম নামক বিচারে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবার বিধি থাকায় বাদবিচারে তাহার নিষেধ হয় অর্থাৎ বাদবিচারে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের নিষেধ বুঝা যায়। নিষেধ হইলেও কোন নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞার জ্ঞাত অর্থাৎ বাদবিচারেও কোন কোন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচনা করিবার জ্ঞাত (এই সূত্রে) “সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ” এই কথাটি বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী, এমন পদার্থ বিরুদ্ধ এই সূত্রবশতঃ (২২২৬ সূত্র) বাদবিচারে হেতুভাসরূপ নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞা হইয়াছে অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রে “সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ” এই কথার দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেতুভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

অন্ততম অবয়বশূন্য বাক্য ন্যূন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কোন একটির প্রয়োগ না করিলেও ন্যূন নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতুবাক্য অথবা উদাহরণবাক্য একটির অধিক হইলে অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই দুই সূত্রোক্ত (৫ অং,

২ অঃ, ১২।১৩ সূত্র) ন্যূন এবং অধিক নামক দুইটি নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞার জন্ম অর্থাৎ বাদবিচারে ঐ দুইটিরও উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচনা করিবার জন্ম (মহর্ষি এই সূত্রে) পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই কথাটি বলিয়াছেন ।

অবয়বগুলিতে প্রমাণ এবং তর্কের অন্তর্ভাব থাকিলেও অর্থাৎ যদিও সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই কথা বলাতেই প্রমাণ ও তর্কের কথা পাওয়া যায়, তথাপি সাধন ও উপালম্বের ব্যতিষদ্র জ্ঞাপনের জন্ম অর্থাৎ উভয় পক্ষেই ঐ উভয়ের সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, ইহা বুঝাইবার জন্ম (সূত্রে) পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে । অত্যাধা সংস্থাপনের হেতুর দ্বারা প্রবৃত্ত (প্রকাশিত) উভয় পক্ষও বাদ হউক, অর্থাৎ যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন করিয়াছেন, কেহ কোন পক্ষের সংস্থাপনের খণ্ডন করেন নাই, সেখানে সেই সংস্থাপনও বাদ হইয়া পড়ে । বস্তুতঃ কেবল সংস্থাপন বাদ হইবে না, উভয় পক্ষে সংস্থাপনের দ্বারা উভয় পক্ষে তাহার খণ্ডনও হওয়া চাই, ইহা সূচনা করিবার জন্মই মহর্ষি বিশেষ করিয়া এই সূত্রে প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন ।

পরন্তু প্রমাণগুলি অবয়বসম্বন্ধ ব্যতীতও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ দ্বা-বাক্যের প্রয়োগ না করিলেও পদার্থ সাধন করে, ইহা দেখা যায় অর্থাৎ ইহা অনুভব সিদ্ধ, এ কথা অস্বীকার করা যায় না । সেই কল্পের দ্বারাও অর্থাৎ পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া বাদ হয়, ইহা প্রথম কল্প, পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়াও বাদ হয়, ইহা দ্বিতীয় কল্প ; এই দ্বিতীয় কল্পেও বাদবিচারে সাধন এবং উপালম্ব হয়, ইহা জানাইয়াছেন, অর্থাৎ মহর্ষি এই বাদলক্ষণ-সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা বলিলেও পৃথক্ করিয়া প্রথমেই যে “প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব” এই কথাটি বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চাবয়বযুক্ত না হইলেও প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব হইলে অর্থাৎ বাদবিচারের অত্যাধা লক্ষণ থাকিয়া পঞ্চাবয়ব সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা বাদ হইবে, মহর্ষি ঐ কথার দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন ।

পরন্তু ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব যাহাতে হয়, তাহা জল্প, এই কথা (জল্পসূত্রে) আছে বলিয়া জল্প নিগ্রহশূন্য অর্থাৎ বাদবিচারে যে সকল নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য, জল্পে সেগুলি নাই, ইহা না বুঝে । বিশদার্থ এই যে, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব যাহাতে হয়, তাহাই জল্প, প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব যাহাতে হয়, তাহা বাদই, ইহা না বুঝে অর্থাৎ বাদস্থলীয় নিগ্রহস্থান জল্পে নাই, জল্পস্থলীয় নিগ্রহস্থান বাদে নাই, ইহা কেহ না

বুঝে, এই জ্ঞাত পৃথক্ করিয়া (এই সূত্রে) প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে (অর্থাৎ সূত্রে অতিরিক্ত বচনের দ্বারা ইহাও বলা হইয়াছে যে, বাদস্থলীয় নিগ্রহস্থানও জল্পে আছে, জল্পস্থলীয় নিগ্রহস্থানবিশেষও বাদে আছে)।

টিপ্পনী। ভাষ্যসূত্রকার মহামুনি গোতম প্রথম আক্ষিকের দ্বারা প্রমাণ হইতে নির্ণয় পর্য্যন্ত (ভাষ্য ও ভাষ্যাদ্ব) পদার্থের লক্ষণ বলিয়া অবশিষ্ট বাদ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত পদার্থগুলির লক্ষণ বলিতে দ্বিতীয় আক্ষিক বলিয়াছেন। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষাও করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথম পদার্থ বাদ। মহর্ষি দ্বিতীয় আক্ষিকের প্রথমেই সেই বাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু একটি সূত্র একটি প্রকরণ হয় না, প্রকরণ ভিন্নও গ্রহণ হয় না, এই কথা মনে করিয়া ভাষ্যকার বাদ-লক্ষণ-সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, “কথা তিনটি—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা”। ভাষ্যকারের গৃহ তাৎপর্য্য এই যে, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা—এই তিনটির নাম ‘কথা’। ঐ তিন প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার কথা নাই—সামান্যতঃ ‘কথা’ বলিলে ঐ তিনটিকেই বুঝিতে হইবে। ঐ ত্রিবিধ কথার পৃথক্ পৃথক্ তিনটি বিশেষ লক্ষণ-সূত্রেই মহর্ষির একটি প্রকরণ। উহার নাম “কথালক্ষণ-প্রকরণ”। কথারূপে ঐ তিনটিই এক, সূত্রাং ঐ তিনটিকে লইয়া একটি প্রকরণ অসঙ্গতও নহে। উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কথামাত্রই ত্রিবিধ, এইরূপ নিয়ম বলেন নাই। তিনি বিচার-বস্তুর নিয়ম বলিয়াছেন। যে বস্তু বিচার করিতে হইবে, তাহা বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, এই তিন প্রকারেই বিচার করিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন আর কোন প্রকারে বস্তু বিচার হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, তখন “বৃহৎ-কথা” প্রভৃতি ভাষ্যকারোক্ত ত্রিবিধ কথার অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন কথা মাত্রই ত্রিবিধ, ইহা ভাষ্যকার বলেন নাই। বিচার্য্য বিষয়ে একাধিক বক্তার যে বাক্য-সন্দর্ভ, তাহাই ভাষ্যকারের ঐ কথা শব্দের অর্থ এবং তাহাকেই তিনি ত্রিবিধ বলিয়াছেন^১। তর্কিকরক্ষাকার প্রভৃতিও এই “কথা”র ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কথা শব্দ মহর্ষির সূত্রে নাই, উহা ভাষ্যকারের কথা, এই কথা কোন গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন; কিন্তু এ কথা সত্য মনে। ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্র হইতেই যথোক্ত অর্থে “কথা” শব্দ পাইয়া, তাহাই এখানে ব্যবহার করিয়াছেন এবং মহর্ষিপ্রোক্ত সেই কথা কি, তাহা এখানে বলিয়াছেন। ত্রিবিধ কথাতেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। বাদী যাহা প্রতিপন্ন করিবেন, সেই পদার্থটি বাদীর পক্ষ এবং প্রতিবাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। প্রতিবাদী যাহা প্রতিপন্ন করিবেন, সেই পদার্থটি প্রতিবাদীর পক্ষ এবং বাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। বিরোধী ব্যক্তিদ্বয়কেও অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীকেও পরস্পর পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হয়, কিন্তু ঐ বিরোধিত্ব বা বিরুদ্ধত্ব ধর্মবশতঃ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ই এখানে পক্ষ ও

১। বিচারবিষয়ে নানাবক্তৃকো বাক্যবিশ্তরঃ।

কথা ও জ্ঞাঃ বদ্ব্যন্থি আশঙ্কহারি কেচন।—তর্কিকাক্য।

২। কার্য্যবাসনায় কথাবিচ্ছেদো বিক্ষেপঃ।—ভাষ্যসূত্র, ৫৯, ২৩, ১১ সূত্র।

সিদ্ধান্তবজ্রোপনিষদাৎ কথাপ্রসঙ্গোহপসিদ্ধান্তঃ।—ঐ, ২৩ সূত্র।

প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কেই স্বত্রকারোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের মুখ্যার্থ বলিয়াছেন (নির্ণয়স্বত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। বাদী বলিলেন—আত্মা আছে অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা আছে; এই কথা দ্বারা বুঝা গেল, আত্মার নিত্যত্ব-ধর্ম্মই বাদীর পক্ষ। প্রতিবাদী নৈরাশ্ব্যবাদী বোদ্ধ বলিলেন—আত্মা নাই অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা নাই; এই কথা দ্বারা বুঝা গেল, আত্মার অনিত্যত্ব-ধর্ম্মই প্রতিবাদীর পক্ষ। তাহা হইলে আত্মার অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম বাদীর প্রতিপক্ষ এবং আত্মার নিত্যত্ব-ধর্ম্ম প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, ইহাও বুঝা গেল। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্ম্ম আত্মার পক্ষে বিরুদ্ধ; এক আত্মাতে দুইটি ধর্ম্ম কখনও থাকিতে পারে না। আত্মাতে নিত্যত্বই থাকিবে, অথবা অনিত্যত্বই থাকিবে। আত্মাতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষ লইয়া উভয় বাদীর বিচার উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি একজন বলেন, আত্মা নিত্য আর অপর বাদী বলেন, বুদ্ধি অনিত্য, তাহা হইলে সেখানে উহা লইয়া কোন বিচার উপস্থিত হয় না। কারণ, আত্মা নিত্য হইলেও বুদ্ধি অনিত্য হইতে পারে। আত্মার নিত্যত্ব এবং বুদ্ধির অনিত্যত্বে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ভাব নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মও বিরুদ্ধ হয় না, বিরুদ্ধ না হইলেও তাহা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। এককালে একই ধর্ম্মাতে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মকে বিভিন্ন-বাদী উল্লেখ করিলে তাহাই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইয়া বিচার্য্য বিষয় হইয়া থাকে।

স্বত্রকার মহর্ষি এই “পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ” বলিয়া বাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। স্বত্রকারের পরিগ্রহ শব্দের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “অভ্যুপগমব্যবস্থা”। অভ্যুপগম বলিতে স্বীকার, ব্যবস্থা বলিতে নিয়ম; তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা গেল—স্বীকারের নিয়ম। এই পদার্থ এইরূপই, ইহার অস্তরূপ নহে, এইরূপভাবে স্বীকার বা নিশ্চয়ের নিয়মই স্বীকারের নিয়ম বা নিয়মবদ্ধ স্বীকার। উহাই ভাষ্যকারের মতে স্বত্রোক্ত পরিগ্রহ শব্দের অর্থ। পূর্কোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের ঐ পরিগ্রহ অর্থাৎ স্বীকারের নিয়ম বা নিয়মবদ্ধ স্বীকার বাহাতে থাকে, তাহা বাদ, ইহাই ঐ কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ স্বত্রে “পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ” এই বাক্য বহুব্রীহি সমাস বৃত্তিতে হইবে।

কিন্তু কেবল ঐ মাত্রই বাদের লক্ষণ বলা যায় না। কারণ, পূর্কোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ জ্ঞান ও বিতণ্ডাতেও থাকে। বিতণ্ডায় বিতণ্ডাকারী স্বপক্ষের সংস্থাপন না করিলেও তাহার স্বপক্ষের একটা স্বীকার আছেই, এ জ্ঞান মহর্ষি ঐ বাদ-লক্ষণে বিশেষণ বলিয়াছেন,—“প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব”। প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব বাহাতে হয়, তাহাই প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব। সাধন বলিতে স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং উপালম্ব বলিতে ঐ সংস্থাপন বা সাধনের ষণ্ডন। বাদী সাধন করিলে, প্রতিবাদী ঐ সাধনেরই ষণ্ডন করেন। বাদীর পক্ষ সেই পদার্থটির বস্ত্ততঃ ষণ্ডন হয় না, এ জ্ঞান উপালম্ব বলিতে সর্কাজই সাধনেরই ষণ্ডন বৃত্তিতে হয়।

স্বায়দর্শিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, উপালম্ব বস্ত্ততঃ সাধনেরও হয় না। স্বপক্ষ সংস্থাপনই সাধন, উহা বাক্য, তাহার ষণ্ডন হইবে কিরূপে? সে বাক্য তাহার প্রতিপাদ্য প্রকাশই

করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার সামর্থ্য নষ্ট করা যায় না। ঐ উপালম্ব বস্তুতঃ সেই বাক্যবাদী পুরুষের। বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহই তাহার উপালম্ব, তাহা তাহাদিগের সাধন-বাক্যকে অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়, এ জন্ত সাধনের উপালম্ব বলা হইয়াছে। সাধনের উপালম্বই বা হুত্রে বলা হইয়াছে কৈ? পক্ষের সাধন এবং প্রতিপক্ষের উপালম্বই হুত্রে দ্বারা বুঝা যায়, এ জন্ত স্মারবাস্তিককার বলিয়াছেন যে, “প্রতিপক্ষ” পদার্থটি যখন উপালম্বের অধোগ্য, তখন হুত্রে দ্বারা তাহা বুঝা যায় না, তাহা বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। হুত্রে যে “প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ব” এই বাক্যটি আছে, উহার দ্বারা “প্রমাণ-তর্কসাধন” এবং “প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ব” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বোক্ত অর্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ স্থলে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে। সমাসে একটি “সাধন” শব্দের লোপ হইয়াছে। কোন ভাষ্যপুস্তকে অতিরিক্ত ভাষ্য পাঠের দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যারও আভাস পাওয়া যায়।

সে বাহা হউক, এখন প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি এই বিশেষণের দ্বারা জয় ও বিতণ্ডা হইতে বাদের বিশেষ কি বলিলেন? এতদ্বত্তরে স্মারবাস্তিককার বলিয়াছেন যে, বাদে প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্ব হয়; এই নিয়মই মহর্ষির বিবক্ষিত। জয় ও বিতণ্ডাতে ছল ও জাতির দ্বারাও উপালম্ব হয়, বাদে তাহা হয় না; স্মরণ্য মহর্ষির ঐ বিশেষণের দ্বারা জয় ও বিতণ্ডা বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় নাই। যদিও কোন জয়-বিচারে কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্ব হইতে পারে, ছল ও জাতির কোন উল্লেখ না করিয়াও জয়-বিচার হয়, তথাপি জয় ও বিতণ্ডা ছল ও জাতির দ্বারা উপালম্বের যোগ্য, তাহাতে উহা করিলে করা যায়; এ জন্ত তাদৃশ জয়বিশেষ বাদলক্ষণাক্রান্ত হইবে না। অর্থাৎ যাহা প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্বের যোগ্য, তাহাই বাদ; এই পর্য্যন্তই মহর্ষির ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। যদিও তর্ক নিজে কোন প্রমাণ নহে, তাহা হইলেও প্রমাণের বিষয়-বিবেচক হইয়া প্রমাণের অন্তর্গত অর্থাৎ প্রমাণের বিশেষ সহকারী হয়। বিচারস্থলে তর্ক দ্বারা বিবেচিত বিষয়ই প্রমাণ নির্ধারণ করে, এ জন্ত এই হুত্রে প্রমাণের সহিত তর্কেরও উল্লেখ হইয়াছে। এখন কথা এই যে, হুত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পক্ষাবলম্বোপপন্ন, এই দুইটি কথার আর প্রয়োজন কি? বাদের লক্ষণে ঐ দুইটি কথার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরহুত্রে জয়বিচারে নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্বের কথা থাকায়, এই হুত্রেও বাদবিচারে কোন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই অর্থাৎ বাদবিচারে উহা নিষিদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারে, এই জন্ত মহর্ষি এই হুত্রে ঐ দুইটি কথার দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারেও কোন কোন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবে। উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, যখন বাদ-বিচারেও উপালম্বের কথা আছে, এই হুত্রে তাহা বলা হইয়াছে, তখন বাদবিচারেও নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বুঝা যায়। তবে উহার দ্বারা বাদবিচারে সমস্ত নিগ্রহস্থানই উদ্ভাব্য, ইহাও বুঝিতে পারে, এ জন্ত মহর্ষি এই হুত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পক্ষাবলম্বোপপন্ন, এই দুইটি কথা বলিয়া বাদবিচারে সমস্ত নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য নহে, নিগ্রহস্থানবিশেষই উদ্ভাব্য, এইরূপ নিয়ম

সূচনা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই বাদবিচারে নান, অধিক এবং হেত্বাভাস নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাব্যতা সূচিত হইয়াছে। কারণ, “অবয়বযুক্ত” এই কথা বলিলে “অবয়বভাস” থাকিবে না, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে হেত্বাভাস থাকিবে না, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, অবয়বভাস প্রয়োগ করিলে সেখানে হেত্বাভাসেরই প্রয়োগ হয়। সুতরাং বাহা মহর্ষির অত্র কথার দ্বারাই পাওয়া গিয়াছে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা আবার তাহারই সূচনা করা নিরর্থক, তাহা মহর্ষি করেন নাই। তবে সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথা বলার প্রয়োজন কি? এতদ্বারা উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান বাদবিচারে অবশ্য উদ্ভাব্য, ইহা সূচনা করিবার জন্তই মহর্ষি সূত্রে ঐ কথাটি বলিয়াছেন। পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণও উদ্যোতকরের এই ব্যাখ্যাকেই সংগত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ইহাই মনে হয় যে, সূত্রোক্ত পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারা হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহা সহজে বুঝা যায় না। পরন্তু পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথাটি মহর্ষি বাদবিচারমাত্রেরই বলেন নাই। পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়াও বাদবিচার হইতে পারে, ইহা ভাষ্যকারের কথায় পরে ব্যক্ত হইবে। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথাটি মহর্ষি বাদবিচারমাত্রেরই বলিয়াছেন। হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান বাদমাত্রেরই উদ্ভাব্য, ইহাই যখন মহর্ষি সূচনা করিবেন, তখন বুঝা যায়, (বাদবিচারমাত্রেরই মহর্ষি যে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথাটি বলিয়াছেন, সেই) সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথাটির দ্বারাই তাহা সূচনা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এই জন্ত ভাষ্যকার এখানে তাহা বুঝাইবার জন্তই মহর্ষি গোতমের বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বাহা স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, মহর্ষি তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন এবং এই সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, বাদবিচারে সিদ্ধান্তবিরোধী কিছু বলা যাইবে না, তাহা বলিলে প্রতিবাদী তাহার অবশ্য উদ্ভাবন করিবেন। উদ্যোতকর মহর্ষি-কথিত বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রের বৈকল্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে হেত্বাভাসমাত্রই সিদ্ধান্তবিরোধী। হেত্বাভাসমাত্রেরই বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ আছে, অর্থাৎ হেত্বাভাসমাত্রই “বিরুদ্ধ”। তাহা হইলে ভাষ্যকার মহর্ষির বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াও সমস্ত হেত্বাভাসকে গ্রহণ করিতে পারেন। এবং এই সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা সিদ্ধান্তবিরোধী অর্থাৎ হেত্বাভাসমাত্রই বাদবিচারে উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচিত হইয়াছে, এ কথাও বলিতে পারেন। ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন (২২।৬ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ যে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারে তদ্বিনির্গয়েরই ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত নিগ্রহস্থানই বাদবিচারে উদ্ভাবন করিতে হইবে; সুতরাং হেত্বাভাসের দ্বারা অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থানও বাদবিচারে অবশ্য উদ্ভাব্য। ভাষ্যকার অপ-

সিদ্ধান্তের নাম করিয়া সে কথা না বলিলেও এই স্বত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা তাহাও স্থচিত হইয়াছে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ কথার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে যেটি গুঢ় প্রয়োজন, শেষে তাহারই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাদবিচারে কোন্ কোন্ নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য, তাহাদিগের সকলের নামোন্মেষ করা এখানে কর্তব্য মনে করেন নাই। মহর্ষি-স্বত্র ব্যাখ্যায় স্বত্রোক্ত সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার একটি প্রয়োজন ব্যাখ্যা করাই তিনি কর্তব্য মনে করিয়া তাহাই করিয়াছেন; তাহাতে অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান ভাষ্যকারের মতে বাদবিচারে উদ্ভাব্য নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না।

প্রথম স্বত্রভাষ্যেও ভাষ্যকার হেত্বাভাসের পূর্বক উল্লেখের প্রয়োজন বর্ণনায় বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা নূন, অধিক ও অপসিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহস্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাবন কর্তব্য, বুঝিতে হইবে; কেবল হেত্বাভাসেরই উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বুঝিতে হইবে না। এইরূপে তাৎপর্যটীকাকারও ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কোন একটি না বলিলেও নূন নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতু ও উদাহরণ-বাক্য একের অধিক বলিলে অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাষ্যকার এই দুইটি নিগ্রহস্থানের মহর্ষিপ্রোক্ত লক্ষণ-স্বত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই দুইটিরও বাদবিচারে উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা স্থচনা করিতে মহর্ষি পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা বলিয়াছেন। অবশ্য পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদবিচারেই এ কথা বলা হইয়াছে; সেখানেই উহা সম্ভব। পরবর্তী বৃত্তিকার বিধনাথ প্রভৃতি বাদবিচারে নূন ও অধিক নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন স্বীকার করেন নাই। তাহার বলিয়াছেন যে, উহা বখন প্রমাণের দোষ নহে, উহা বক্তার দোষ, তখন বক্তার অন্তান্ত দোষের দ্বারা উহাও বাদবিচারে ধর্তব্য নহে। একটা হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বেশী বলা হইলে অথবা একটা অবয়ব না বলিলে, তাহাতে তত্ত্বনির্ণয়ের আসে যায় কি?

প্রাচীন মত সমর্থনে উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, অবয়বগুলি প্রমাণ না হইলেও প্রমাণ-মূলক বলিয়া প্রমাণ সঙ্গত। স্তত্রাং অবয়বের নূনতা বা অধিক্য কোন প্রমাণভ্রমবশতঃও হইতে পারে, এ জন্ত বাদবিচারেও তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন বাদবিচারে এক পক্ষ প্রকৃত হেতু-বুদ্ধিতেই হেত্বাভাস প্রয়োগ করেন এবং সেই জন্তই বাদবিচারে তাহার উদ্ভাব্যতা আছে। প্রমাণের দোষ না দেখাইলে তত্ত্বনিশ্চয়েরই ব্যাঘাত হয়। তরুণ নূন, অধিক ও অপসিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলেও হেত্বাভাসের দ্বারা সাধ্যসাধনের জন্ত প্রযুক্ত হওয়ায়, উহার প্রমাণ সঙ্গত; স্তত্রাং উহাদিগেরও উদ্ভাবন বাদবিচারে কর্তব্য। বাদবিচারে নিজের বক্তব্যটি প্রতিপাদন করিতে না পারাই নিগ্রহ; সেখানে পরাজয়রূপ নিগ্রহ নাই। জিগীষা না থাকায় বাদবিচারে পরাজয়রূপ নিগ্রহ হয় না।

পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিলেই প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধনাদি করা হয়। ফলকথা, পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারা ই প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথা পাওয়া যায়। আবার

প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথা কেন? অথবা প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ কেন? কেবল সাধন ও উপালম্বের কথা বলিলেই হইত? পৃথক্ করিয়া আবার প্রমাণ ও তর্ক শব্দের প্রয়োজন কি? অবশ্য কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই যেখানে সাধনাদি হইবে, বাহাতে ছল ও জাতির কোন সংস্রব নাই অথবা তাহার যোগ্যতাই নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা প্রমাণ ও তর্ক শব্দের গ্রহণ করিলেই হইতে পারে এবং তাহাই মহর্ষির ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ। নচেৎ পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ব বুদ্ধিতে হইলে, জল্পবিচার হইতে বাদবিচারের বিশেষ বুঝা হয় না; সুতরাং পৃথক্ভাবে প্রমাণ তর্ক গ্রহণের প্রয়োজন পূর্বেই ব্যক্ত আছে, তাহা পি ভাষ্যকার বাক্যক্রমে উহার আরও তিনটি প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। এই তিনটি প্রয়োজন প্রসঙ্গপ্রাপ্ত, অর্থাৎ উহার মূখ্য প্রয়োজন একটি থাকিলেও উহার দ্বারা আরও তিনটি অতিরিক্ত প্রয়োজন সংগ্রহ করা যায়। তন্মধ্যে প্রথম প্রয়োজন—সাধন ও উপালম্বের ব্যতিবন্ধজ্ঞাপন। ব্যতিবন্ধ বলিতে উভয় পরস্পর মিলন। যেমন পক্ষের সাধন থাকা চাই, তদ্রূপ প্রতিবাদী কর্তৃক ঐ সাধনের উপালম্বও থাকা চাই। এবং যেমন প্রতিপক্ষের সাধন থাকা চাই, তদ্রূপ বাদী কর্তৃক ঐ প্রতিপক্ষ-সাধনের উপালম্বও চাই। বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্ব স্ব পক্ষের সাধন করিলেন, কেহ কোন সাধনের উপালম্ব করিলেন না, সেখানে বাদ হইবে না। সুতরাং পূর্বোক্ত ব্যতিবন্ধযুক্ত সাধন ও উপালম্বই এখানে স্বজ্ঞাকারের বিবক্ষিত। মহর্ষি পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ করিয়া ইহা সূচনা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হয়। কারণ, তত্ত্বনির্ণয়ই বাদবিচারের উদ্দেশ্য। পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিলেও প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং সূত্রোক্ত পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথাটি বাদমাত্রেরই গ্রহণীয় নহে। পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া বাদ হইবে, ইহা এক কল্প এবং পঞ্চাবয়বশূন্য হইয়াও অস্তান্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে বাদ হইবে, ইহা দ্বিতীয় কল্প। স্বজ্ঞাকারের পৃথক্ করিয়া “প্রমাণ-তর্ক-গ্রহণ” এই দ্বিতীয় কল্পটি সূচনা করিয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি, সূত্রে ঐ অতিরিক্ত কথার দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হইতে পারে।

ভাষ্যকার তৃতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, জল্পলক্ষণে (পরসূত্রে) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা বাহাতে সাধন ও উপালম্ব হয়, তাহা জল্প, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে কেহ বুঝিতে পারেন যে, জল্পে বাদবিচারে উদ্ভাব্য নিগ্রহস্থান নাই। কারণ, এই সূত্রে যদি প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথাটা না বলা হয়, তাহা হইলে জল্পসূত্রে এক কথাটা পাওয়া যায় না। পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা হইতেই প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব বুদ্ধিতে হয়। এবং ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ব, এই কথার দ্বারাই জল্পে নিগ্রহস্থানের কথা বুঝা যায়। তাহা হইলে জল্পসূত্রের ঐ কথাটির দ্বারা কেহ বুঝিতে পারেন যে, বাদবিচারে যে সকল নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য, জল্পবিচারে সেগুলি নাই। তাহা বুঝিলে কিরূপ অর্থ বুঝা হয়? ইহা বলিবার জন্তই ভাষ্যকার শেষে তাহার পূর্বকথারই ফলিতার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, ছল, জাতি ও

নিগ্রহস্থানের দ্বারা বাগতে সাধন ও উপালম্ব হয়, তাহাই জর এবং প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা বাহাতে সাধন ও উপালম্ব হয়, তাহা বাদই, ইহা কেহ না বুঝেন, এই জন্ত সূত্রে পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে এইরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যের বিনিগ্রহ শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বাদগত নিগ্রহস্থানরহিত। শেষে বলিয়াছেন যে, বাদগত নিগ্রহ জন্মে নাই, জন্মগত নিগ্রহ বাদে নাই, ইহা বুঝিও না; বাদগত নিগ্রহও জন্মে আছে, ইহা মহাবি পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ করিয়া সূচনা করিয়াছেন। উদ্ভূত বা অতিরিক্ত কথার দ্বারা অতিরিক্ত ফলের সূচনা হইয়া থাকে, ইহা প্রাচীনগণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে মধ্যমির অতিরিক্ত কথার দ্বারা দেই অতিরিক্ত ফলেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্রে যে প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথাটি আছে, উহার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব বাহাতে করেন, ইহা বুঝিতে হইবে না। কারণ, তাহা অসম্ভব। বিচারে এক পক্ষ প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসকেই প্রমাণ ও তর্ক বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা সাধন ও উপালম্ব করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত পক্ষের অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বটিরই সাধন করেন, তিনিই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কে গ্রহণ করিয়া থাকেন। একাধারে দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ বধন কোন মতেই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, তখন এক পক্ষের জায়াভাস হইবেই। যিনি প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসকেই অবলম্বন করিয়া বিচার করেন, তিনিও তাহাকে প্রমাণ ও তর্ক বলিয়াই গ্রহণ করেন এবং তদ্বারা বস্ত্তঃ সাধন ও উপালম্ব না হইলেও তিনি তদ্বারাই সাধন ও উপালম্ব করিতে প্রবৃত্ত হন। এই তাৎপর্য্যেই সূত্রে প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব, এই কথা বলা হইয়াছে।

ঐ ভাবে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন এবং উপালম্ব ব্যতিবক্ত এবং অমুদ্বন্ধ হওয়া চাই। বাদবিচারে বধন তদ্বনির্ণয়ই উদ্দেশ্য, তখন তদ্বনির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাদবিচার চলিবেই। যে পর্য্যন্ত এক পক্ষের নিবৃত্তি এবং এক পক্ষের দ্বিতি না হইবে, সে পর্য্যন্ত বাদবিচারে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধন ও উপালম্ব করিতেই হইবে, ইহাই সাধন ও উপালম্বের পরম্পর অমুদ্বন্ধ। ভাষ্যকার নির্ণয়-সূত্র-ভাষ্যেও ইহা বলিয়া আসিয়াছেন (নির্ণয়সূত্রভাষ্য ভ্রষ্টব্য)।

জায়বান্তিককার উদ্যোতকর এখানে বস্তুবদ্ধ বা সূত্রবদ্ধ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের বাদ-লক্ষণ তুলিয়া তাহাদিগের সহিত তুমুল বিবাদের পরিসর দিয়া, বহু প্রতিবাদের পরে নিবৃত্ত হইয়াছেন। বাহ্য ভয়ে সে সকল কথা আলোচিত হইল না।

উদ্যোতকর আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে কোন প্রগ্রকারীর আবশ্যকতা নাই। প্রগ্রকারীকে বুঝাইবার জন্তই যে বাদবিচার হয়, এমন নিয়ম নাই। প্রগ্রকারী অজ্ঞ ব্যক্তি না থাকিলেও শুধু প্রভৃতির সহিত বাদবিচার হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, দৈবাৎ যদি বাদবিচার স্থলে প্রগ্রকারী উপযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন, তবে তাহাকে বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থত্বে তব্ব নির্ণয়ের সাহায্যের জন্ত গ্রহণ করিবেন, তাহাকে বর্জন করিবেন না।

বৃত্তিকার বিখনাথ পূৰ্বোক্ত ‘কথা’র সামান্য লক্ষণ এবং কথার অধিকারীর লক্ষণ এবং বাদের অধিকারীর লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন।

তত্ত্বনিৰ্ণয় অথবা জয়লাভ, ইহার কোন একটির যোগ্য জ্ঞানানুগত বাক্য-সন্দর্ভই কথা। লৌকিক বিবাদ কথা নহে, তাই বলিয়াছেন—জ্ঞানানুগত বাক্য-সন্দর্ভ। বস্তুতঃ জ্ঞানানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিলেই প্রকৃত বিচার হয়। অল্পখা এখনকার অধিক সংখ্যক বিচার নামে প্রচলিত বাক্য-সন্দর্ভের জ্ঞান একটা লৌকিক বিবাদ অথবা হট্টগোল হইয়া পড়ে। যেখানে বিচারে তত্ত্ব নিৰ্ণয় অথবা জয়লাভের কোনটিই হইল না, কিন্তু বিচার চলিলে উহার একটি হইতে পারিত, এইরূপ বিচারও কথা হইবে। তাই বলিয়াছেন, তত্ত্বনিৰ্ণয় অথবা জয়লাভের কোন একটির যোগ্য; উহার কোন একটি হওয়াই চাই, নচেৎ তাহা কথা হইবে না, ইহা বলেন নাই। কিন্তু যেখানে তত্ত্ব নিৰ্ণয় অথবা জয়লাভের যোগ্যতাই নাই, সেখানে জ্ঞানানুগত বাক্য-সন্দর্ভ হইলেও তাহা কথা হইবে না। বৃত্তিকারের এই কথা যুক্তিযুক্ত।

যাহারা তত্ত্ব নিৰ্ণয় অথবা জয়লাভের অভিলাষী এবং সৰ্বজনসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না এবং শ্রবণাদি কার্যে পটু এবং কথার উপযুক্ত বাদ-প্রতিবাদাদি কার্যে সমর্থ, অথচ কলহকারী নহেন, তাঁহারা ই কথার অধিকারী।

কথার অধিকারীর মধ্যে যাহারা তত্ত্বমাত্র-জিজ্ঞাসু এবং প্রকৃত বাদী ও প্রতিভাশালী এবং যাহারা যুক্তিসিদ্ধ পদার্থ বুঝেন এবং মানেন এবং প্রত্যয়ক নহেন, তিরস্কার করেন না, তাঁহারা ই বাদকথার অধিকারী। এই অধিকারীর লক্ষণগুলি বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয়। যাহারা কথা ও বাদের এইরূপ অধিকারী নিৰ্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা, তাঁহাদিগের প্রকৃতি, তাঁহাদিগের প্রাজ্ঞতা, এগুলিও চিন্তাশীলগণ অবগতই চিন্তা করিবেন।

বাদবিচারে সভার আবশ্যকতা নাই; জয়-পরাজয়ের ব্যাপার না থাকার মধ্যস্থেরও আবশ্যকতা নাই। এ বিচার অতি পবিত্র। এই বিচারের কর্তা, এই বিচারের শ্রোতা—সকলেই পবিত্র, সকলেই ধৰ্ম্ম। কালমাহাত্ম্যে এই বাদবিচারের অধিকারী এখন নিতান্ত ছল্‌ল হইয়াছে। বাদ, জয় ও বিতণ্ডা, এই ত্রিবিধ কথার মধ্যে এই বাদই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা ভগবানের বিতৃতি। তাই ভগবান এই বাদকেই লক্ষ্য করিয়া গীতার বলিয়াছেন,—“বাদঃ প্রবদতামহম্” ১০।৩২। অর্থাৎ বাদ, জয় ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি বাদ। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর^১ এবং টীকাকার স্বামী শ্রীধরও ভগবদ্বাক্যের ঐরূপ তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোতমোক্ত পারিতোষিক বাদ শব্দই ঐ স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

১। বাসোহৰ্ণনিৰ্ণয়হেতুবাং প্রবদঃ, অতঃ সোহহমস্মি। এককৃত্বায়েণ বদনভেদানামেব বাক-ব্রহ্মবিতণ্ডানামিহ গ্রহণং প্রবদভাবিতি:—শাকরভাষ্য। প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিত্বো বাব-জয়-বিতণ্ডান্তিত্বঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ, তাসাং মধ্যে বাসোহহঃ। বাবন্ত বীতরাগাঃ শিখাচার্য্যহোরস্তরোক্ষী তত্ত্বনিৰ্ণয়পণ্ডতাঃ, অতোহনৌ শ্রেষ্ঠত্বাৎ বহিঃকৃতিরিত্যর্থঃ,—শ্রীধরশাসিতীকা।

সূত্র । যথোক্তোপপন্ন-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান- সাধনোপালম্ভো জ্ঞাপঃ ॥২॥৪৩॥

অনুবাদ । যথোক্তোপপন্ন অর্থাৎ পূর্বসূত্রে বাদের লক্ষণ বলিতে যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের শব্দলভ্য যে অর্থ, সেই অর্থযুক্ত, (পরন্তু) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ করা হয়, (করিতে পারা যায়), তাহা জ্ঞান ।

ভাষ্য । যথোক্তোপপন্ন ইতি “প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ,” “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ,” “পক্ষাবয়বোপপন্নঃ,” “পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহঃ” । ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ ইতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধন-মুপালম্ভচাম্পিন্ ক্রিয়ত ইতি, এবং বিশেষণো জ্ঞানঃ ।

ন খলু বৈ ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনং কস্মচিদর্থস্তা সম্ভবতি প্রতিষেধার্থতৈবেবাং সামান্যলক্ষণে বিশেষলক্ষণে চ শ্রীয়াতে । ‘বচন-বিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলমিতি, ‘সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি’রিতি, ‘বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিচ্চ নিগ্রহস্থান’মিতি, বিশেষলক্ষণেষাপি যথাস্থমিতি । ন চৈতদ্বিজানীয়াং প্রতিষেধার্থতয়েবার্থং সাধয়ন্তীতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালম্ভো জ্ঞান ইত্যেবমপ্যুচ্যমানে বিজ্ঞায়ত এতদिति ।

প্রমাণৈঃ সাধনোপালম্ভয়োঃ ছলজাতীনামঙ্গভাবো রক্ষণার্থত্বাৎ ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ । যৎ তৎ প্রমাণৈরর্থস্তা সাধনং তত্র ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানামঙ্গভাবো রক্ষণার্থত্বাৎ, তানি হি প্রযুক্ত্যমানানি পরপক্ষ-বিঘাতেন স্বপক্ষং রক্ষন্তি । তথা চোক্তং “তদ্বাদ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জ্ঞান-বিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণব”দिति । যস্মাচৌ প্রমাণৈঃ প্রতিপক্ষস্তোপালম্ভস্তস্তা চৈতানি প্রযুক্ত্যমানানি প্রতিষেধ-বিঘাতাৎ সহকারীণি ভবন্তি, তদেবমঙ্গীভূতানাং ছলাদীনামুপাদানং—জ্ঞানো, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ, উপালম্ভে তু স্বাতন্ত্র্যমপ্যাস্তীতি ।

অনুবাদ । যথোক্তোপপন্ন, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ এবং

পঞ্চাবয়বযুক্ত, এমন (পূর্ববসূত্রোক্ত) পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ (অর্থাৎ পূর্ব-সূত্রে বাদের লক্ষণ বলিতে মহর্ষি যে চারিটি বাক্য বলিয়াছেন, এই সূত্রেও তাহার যোগ করিয়া এবং তাহার যথাযোগ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, মহর্ষি এই সূত্রে যথোক্তোপপন্ন, এই কথার দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন)। ছলজাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ব, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, এই জ্ঞানে ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করা হয়, করিতে পারা যায়। এইরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইলে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ বাদের ন্যায় কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা এবং কতিপয় নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব হইলে অর্থাৎ ছল প্রভৃতির অযোগ্য হইলে তাহা জ্ঞান নহে। যাহাতে ছল, জাতি এবং সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করা হয়, না করিলেও করিবার যোগ্যতা থাকে, তাহাই জ্ঞান।

(পূর্বপক্ষ) ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা কোন পদার্থের সাধন হইতেই পারে না। ইহাদিগের সামান্য লক্ষণ এবং বিশেষ লক্ষণে অর্থাৎ মহর্ষি এই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের যে সামান্য লক্ষণ এবং বিশেষ লক্ষণ-গুলি বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাদিগের প্রতিষেধার্থতাই শ্রুত হইতেছে, অর্থাৎ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান পদার্থ সাধন করে না, উহারা সাধনের প্রতিষেধ অর্থাৎ খণ্ডনই করে, সেই খণ্ডনার্থই উহাদিগের উল্লেখ হয়, মহর্ষি-কথিত ছল প্রভৃতির লক্ষণেও সেই কথাই আছে; সুতরাং এখানে ছল প্রভৃতির দ্বারা সাধনও হয়, ইহা কিরূপে বলা হইতেছে? (মহর্ষি-কথিত ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থানের সামান্য লক্ষণ-সূত্র তিনটির উদ্ধার করিয়া এই পূর্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন) “বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনার দ্বারা বাদীর বাক্য-ব্যাঘাতকে ছল বলে” (১ অঃ, ২ আঃ, ১০ সূত্র)—“সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের সাহায্যে দোষ কখনকে জাতি বলে” (১ অঃ, ২ আঃ, ১৮ সূত্র)—“বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে” (১ অঃ, ২ আঃ, ১৯ সূত্র) বিশেষ লক্ষণগুলিতেও (মহর্ষি-কথিত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষ লক্ষণগুলিতেও) ইহাদিগের যথাস্বরূপ অর্থাৎ সামান্য লক্ষণকে অতিক্রম না করিয়া প্রতিষেধার্থতাই অর্থাৎ উহারা খণ্ডনার্থ, সাধনার্থ নহে, ইহাই শ্রুত হইতেছে।

(যদি বল) প্রতিষেধার্থতাবশতঃই ইহার পদার্থ সাধন করে, ইহা বুঝিবে ? অর্থাৎ এই ছল প্রভৃতি পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করে বলিয়াই তদ্বারা পদার্থ সাধন করে, ইহা বুঝিবার জন্যই উহাদিগের দ্বারা সাধনের কথাও বলা হইয়াছে ? ইহাও বলা যায় না। (কারণ) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা বাহাতে উপালম্ব্য অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করা যায়, তাহা জল্প, এইরূপ বলিলেও ইহা বুঝা যায়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত কথা বুকান আবশ্যক হইলেও সূত্রে ‘সাধন’ শব্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল উপালম্ব্য বলিলেও তাহার চরম ফল চিন্তা করিয়া উহা বুঝা যায়।

(উত্তর) প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মূলীভূত প্রমাণ-সমূহের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব্য ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অঙ্গভাব অর্থাৎ আবশ্যকতা আছে। কারণ, উহারা রক্ষার্থ, স্বতন্ত্র ইহাদিগের সাধনই নাই। বিশদার্থ এই যে, প্রমাণের দ্বারা পদার্থের সেই যে (মহর্ষি-সূত্রোক্ত) সাধন, তাহাতে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অঙ্গই আছে ; কারণ, তাহারা রক্ষার্থ, সেই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান প্রযুক্ত্যমান হইয়া পরপক্ষ বিঘাতের দ্বারা অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিয়া স্বপক্ষ রক্ষা করে। মহর্ষি গৌতম সেই প্রকারই বলিয়াছেন,—“তব্বনিশ্চয় রক্ষার জন্ম জল্প ও বিতণ্ডা আবশ্যক, যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন অনুর বা ক্ষুদ্র বৃক্ষ রক্ষার জন্ম কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ আবশ্যক।”—(৪অঃ, ২ আঃ, ৫০ সূত্র)। আবার প্রমাণের দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ প্রতিপক্ষ স্থাপনার এই যে উপালম্ব্য, তাহার সম্বন্ধেও এই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান প্রযুক্ত্যমান হইয়া প্রতিষেধের বিঘাত করায় অর্থাৎ প্রতিবাদীর খণ্ডনের খণ্ডন করে বলিয়া (প্রমাণের) সহকারী হয়। অর্থাৎ এই প্রকারেও ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, সাধন ও উপালম্ব্যের অঙ্গ হয়। সুতরাং এই প্রকারে অঙ্গীভূত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের জন্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ইহাদিগের সাধনই নাই অর্থাৎ ইহারা স্বতন্ত্রভাবে সাধন করিতে পারে না। উপালম্ব্যে কিন্তু (ইহাদিগের) স্বাতন্ত্র্যও আছে।

টিপ্পনী। বাদ-লক্ষণের পরে ক্রমান্বয়ে মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা জন্মের লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্বসূত্রে “প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ব্যঃ” ইত্যাদি যে চারিটি বাক্য বলিয়াছেন, তাহা এই স্বত্রে বোঝা করিয়া জন্মের লক্ষণ বুঝিতে হইবে—এই তাৎপর্য্যে এই স্বত্রের প্রথমে বলিয়াছেন, “যথোক্তোপপন্নঃ”। ভাষ্যকারও ঐ “যথোক্তোপপন্নঃ” এই কথার উল্লেখ পূর্বক তাহার অর্থ ব্যাখ্যার

জন্ম মহাবির পূর্বস্বত্রোক্ত চারিটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পরে এই স্বত্রোক্ত “ছল-জাতিনিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্বঃ” এই অতিরিক্ত কথাটির উল্লেখ করিয়া স্বত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, জন্মে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করা হয়; সুতরাং এইরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া জন্ম হয়। অর্থাৎ পূর্বস্বত্রোক্ত চারিটি বাক্যের বাহা শব্দলভ্য অর্থ, তদ্বিশিষ্ট হইয়া বাহা ছল, জাতি ও সর্ববিধ নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্বের যোগা, এমন কথাই জন্ম। বাদ এরূপ নহে, সুতরাং বাদ ইহাতে জন্ম বিশিষ্ট।

উদ্যোতকর মহাবির-স্বত্রের ‘যথোক্তোপপন্নঃ’ এই কথা অবলম্বন করিয়া পূর্বপক্ষ ধরিয়াছেন যে, পূর্বস্বত্রে বাদলক্ষণে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এই স্বত্রে জন্মলক্ষণে তাহা বলা বাইতে পারে না। পূর্বস্বত্রে দুইটি কথার দ্বারা বাদবিচারে নিগ্রহস্থানবিশেষের নিয়ম করা হইয়াছে, জন্মে তাহার নিয়ম নাই। জন্মে সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায়। এবং জন্মে ছল ও জাতির দ্বারাও সাধন ও উপালম্ব করা যায়। কিন্তু পূর্বস্বত্রোক্ত “প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্বঃ” এই কথার তাৎপর্যার্থ ইহার বিরুদ্ধ। ফলকথা, পূর্বস্বত্রোক্ত কথাগুলি যে তাৎপর্যে বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই স্বত্রে ঐ সকল কথার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। তবে মহাবির এই স্বত্রে যথোক্তোপপন্নঃ, এই কথা কিরূপে বলিয়াছেন? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্বস্বত্রোক্ত প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্বঃ ইত্যাদি বাক্যের বাহা শব্দলভ্য অর্থ, তাহা জন্মে অসম্ভব নহে। পূর্বস্বত্রে ঐ সকল কথার দ্বারা যে সকল অর্থ সূচিত হইয়াছে, তাহা জন্মলক্ষণের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু ঐ সকল অর্থলভ্য অর্থ এখানে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং শব্দলভ্য অর্থমাত্রই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই মহাবির তাৎপর্য। উদ্যোতকর কথাদেব দুইটি স্বত্র উদ্ধৃত করিয়া স্ববি-স্বত্রে যে এরূপ তাৎপর্যে কথা বলা অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়, ইহা দেখাইয়া তাহার উত্তরপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে যদি কেহ সন্তুষ্ট না হন, ইহাই মনে করিয়া উদ্যোতকর শেষে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা স্বত্রে “যথোক্তোপপন্নঃ” এই বাক্যটি মধ্যপদলোপী সমাস। যেমন গোযুক্ত রথ, এই অর্থে “গোরথ” এই প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকরের অতিপ্রায় এই যে, পূর্বস্বত্রে যথোক্ত পদার্থগুলির মধ্যে জন্মে বাহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত বা সম্ভব, জন্ম তাহার দ্বারা উপপন্ন কি না যুক্ত, ইহাই যথোক্তোপপন্ন এই কথার দ্বারা মহাবির বলিয়াছেন। মধ্যপদলোপী সমাসে একটি “উপপন্ন” শব্দের লোপ হইয়াছে। তবে ভাষ্যকার পূর্বস্বত্রের বাদ-লক্ষণের ঐ সকল কথা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া এই স্বত্রের যথোক্তোপপন্ন এই কথার ব্যাখ্যা করিলেন কেন? তিনি ত উহার মধ্যে বাহা উপপন্ন, তাহাই জন্মলক্ষণে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা বলেন নাই? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যথাক্রমে পূর্বস্বত্রের পাঠ জ্ঞানই ঐ স্থলে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। ঐ স্বত্রপাঠের মধ্যে জন্মে বাহা উপপন্ন হয়, তাহাই জন্মে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। তাৎপর্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, জন্মলক্ষণের অহুকূল যে পাঠক্রম, তাহাই ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন, উহা ইহাতে পদার্থস্বরূপ অর্থাৎ শব্দলভ্য অর্থই বুঝিতে হইবে। উহার দ্বারা

পূর্বসূত্রের দ্বারা অর্থলভ্য অর্থ এখানে বুদ্ধিতে হইবে না, তাহা উহা দ্বারা এখানে বুঝা যায় না।
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত মধ্যপদলোপী সমাস পক্ষ আশ্রয় করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
ভাষ্যকার ঐরূপ কোন কথা না বলায় উদ্যোতকরের প্রথম পক্ষই তাঁহার অভিপ্রেত মনে হয়।
মধ্যপদলোপী সমাসই মহাবির অভিপ্রেত থাকিলে তিনি “উক্তোপপন্নঃ” এইরূপ কথাই বলেন নাই
কেন? যথা শব্দের প্রয়োগ কেন? ইহাও চিন্তনীয়। মধ্যপদলোপী সমাসে সূত্রস্থ “উপপন্ন” শব্দটি
কোন অর্থে প্রযুক্ত, ইহাও চিন্তনীয়। সূত্রীগণ সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিপ্রায় চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, সূত্রে যে
ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সংগত হয় না।
কেন না, ছল প্রভৃতির দ্বারা কেবল উপালম্ব বা প্রতিষেধই হইয়া থাকে এবং তাহাই হইতে
পারে। উহাদিগের সামান্য লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণেও তাহাই বলা হইয়াছে। ফলকথা, পরপক্ষ-
সাধনের খণ্ডন করিতেই উহাদিগের প্রয়োগ করা হয়, উহাদিগের দ্বারা পদার্থ সাধন বা পক্ষ
স্থাপন হইবে কিরূপে? তবে যদি পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিয়াই পরস্পরায় উহারা স্বপক্ষের
সাধক হয়, এই কথা বলিতে হয়, তাহা হইলেও সূত্রে সাধন শব্দ প্রয়োগ করিবার কোনই
প্রয়োজন নাই; ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালম্ব, এইরূপ কথা বলিলেই তাহা বুঝা যায়।

এতদন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করিতে ছল, জাতি ও
নিগ্রহস্থান অঙ্গ হইয়া থাকে। উহারা সাধনেও অঙ্গ হয়। কারণ, স্বপক্ষ রক্ষার জন্য অনেক
সময়ে উহাদিগের আশ্রয় করিতে হয়। মহর্ষি নিজেও তদনিশ্চয় সংরক্ষণের জন্য ছলাদিযুক্ত
জ্ঞান ও বিতণ্ডার আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। সূত্রায় ছল প্রভৃতি যখন পরপক্ষ স্থাপনের ব্যাঘাত
জন্মাইয়া স্বপক্ষ স্থাপনকে রক্ষা করে, তখন স্বপক্ষস্থাপনরূপ সাধনেও ইহারা অঙ্গ। ইহারা স্বতন্ত্র
ভাবে পদার্থ সাধন করিতে না পারিলেও ঐ ভাবে পদার্থ সাধন করে এবং প্রমাণের দ্বারা যখন
পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করা হয়, তখন ইহারা প্রমাণের সহকারী হয়। ফলকথা, অল্পে পূর্বোক্ত
প্রকারে সাধন ও উপালম্বের অঙ্গীভূত ছল প্রভৃতির গ্রহণ করা হইয়াছে। উহারা স্বতন্ত্রভাবে
পদার্থ সাধন করে না, তাহা বলাও হয় নাই। তবে উহারা স্বতন্ত্র ভাবে উপালম্ব করিতে পারে।
উদ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারের কথা গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে, ছল, জাতি
প্রভৃতি যখন অসচ্ছত্র, তখন তাহা কোনরূপেই সাধন বা উপালম্বের অঙ্গ হইতে পারে না।
জিগীষাপরতত্ত্বাবশতঃ পরপক্ষ স্থাপনকে ব্যাহত করিব, এই বুদ্ধিতেই ছল প্রভৃতির প্রয়োগ
করিয়া থাকে এবং ছল প্রভৃতির দ্বারা মন জন্মাইয়া অনেক সময়ে জয়লাভ করে। বস্তুতঃ
উহাদিগের দ্বারা কোন পক্ষের সাধন বা খণ্ডন হয় না, প্রমাণ ও তর্ক বাতীত তাহা আর
কিছুর দ্বারা হইতেও পারে না। তবে ছল প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে তাহা বাদ হইবে না,
ইহা জানাইতেই মহর্ষি এই সূত্রে ছল প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, মহর্ষিসূত্রে ছল, জাতি প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালম্বের
কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। এবং ছলাদিযুক্ত জ্ঞান ও বিতণ্ডার দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় রক্ষা হয়, ইহাও

মহর্ষি নিজে বলিয়াছেন। সুতরাং ছল প্রভৃতি কোনরূপে সাধন ও উপালন্তের অঙ্গই হয় না, এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অবশ্য উহারা অসচ্ছত্রই বটে, অসচ্ছত্রগুলির বাস্তব পক্ষে কোন সাধন বা উপালন্তের ক্ষমতা নাই, ইহাও সত্য, কিন্তু মহর্ষি যে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালন্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা কি উভয় পক্ষেই হইয়া থাকে? এক পক্ষ প্রমাণভাস ও তর্কভাসকে প্রমাণ ও তর্করূপে গ্রহণ করিয়াই যখন সাধন ও উপালন্তে প্রবৃত্ত হন এবং তাহার দ্বারা বস্তুতঃ সাধন ও উপালন্ত না হইলেও যখন মহর্ষি তাহা বলিয়াছেন, তখন সেই ভাবে ছল প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালন্তের কথাও বলিতে পারেন। জল্পবিচারে এক পক্ষ প্রমাণভাস বলিয়া জানিয়াও তাহাকে প্রমাণ বলিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। কিন্তু বাদে কোন বাদীই তাহা করিতে পারেন না, অপ্রমাণকে নিজে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়া তাহার প্রয়োগ করিতে পারেন না; কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি বাদে অনধিকারী। তাহা হইলে এখন মূল কথা এই যে, যাহা বস্তুতঃ প্রমাণ ও তর্ক নহে, বস্তুতঃ যাহার সাধন ও যখনে ক্ষমতাই নাই, এক পক্ষ যখন তাহার দ্বারাও সাধন ও উপালন্ত করেন, নচেৎ বিচারই হইতে পারে না; মহর্ষির প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালন্ত, এই কথাও নিতান্ত অসংগত হইয়া পড়ে, তখন ছল প্রভৃতিতে ভাষ্যকার যে ভাবে সাধন ও উপালন্তের অঙ্গ বলিয়াছেন, তাহা অসংগত হইবে কেন? যে কোনরূপেই যদি উহারা স্বপক্ষ সাধনের সহায়তা করিল, তাহা হইলে উহারা একেবারে সাধনের রাজ্য হইতে নির্দাসিত হইবে কেন? সাধন ও উপালন্ত ইহাদিগের দ্বারা বস্তুতঃই হয় কি না, তাহা দেখিতে হইলে প্রমাণভাসের দ্বারাও তাহা হয় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পরন্তু ভাষ্যকার ইহাদিগকে প্রকৃত প্রমাণের সহকারীও দেখাইয়াছেন। সেখানে সহকারিরূপে ইহারা বস্তুতঃই সাধন ও উপালন্তের অঙ্গ হয়। প্রমাণভাস কোন দিনই তাহা হইতে পারে না, তবে সাধন ও উপালন্ত হইয়াছে বলিয়া অনেক সময়ে অনেক স্থলে প্রতিপন্ন করিতে পারো। সেই ভাবের সাধন ও উপালন্তও যদি বাধা হইয়া এখানে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ছলাদির দ্বারাও তাহা হয়। ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে ছলাদিও তাহার অঙ্গ হইতে পারে। স্থগীর্ণ এ কথাগুলিও ভাবিয়া বিচার করিবেন।

পরবর্তী কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক এই হুজে সাধন ও উপালন্ত, এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া সাধনের উপালন্ত—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই ভাষ্যোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান করিতে গিয়াছেন।

এই জল্পবিচারে সভার অপেক্ষা আছে। কারণ, ইহা বিতণ্ডার দ্বার জিগীষুর বিচার; ইহাতে পক্ষপাতিত্বাদি-দোষ-শূন্য উভয় পক্ষের স্বীকৃত স্থপতিত মধ্যস্থ আবশ্যক। বিখনাথ বলিয়া গিয়াছেন যে, যে জনসমূহের মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং কোনও উপযুক্ত ব্যক্তি বা ঐরূপ ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ থাকেন এবং আরও সভা পুরুষ থাকেন, সেই জনসমূহের নাম সভা। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে জল্প-বিচার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ (১) বাদী প্রমাণের উল্লেখ পূর্বক তাঁহার স্বপক্ষস্থাপন করিবেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বপক্ষে পক্ষাবয়ব স্বায় প্রয়োগ করিয়া তাঁহার হেতুর নির্দোষত্ব প্রদর্শন করিবেন অর্থাৎ সামান্ততঃ তাঁহার হেতু হেতুভাঙ্গন নহে এবং বিশেষতঃ তাঁহার হেতু বিরুদ্ধ নহে, ব্যভিচারী নহে, ইত্যাদি প্রকারে সম্ভাব্যমান দোষের নিরাকরণ করিবেন। তাহার পরে (২) প্রতিবাদী বাদীর কথাগুলি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্ত বাদীর কথার অমূল্যবাদ করিয়া হেতুভাঙ্গন ভিন্ন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন; তাহার উদ্ভাবন সম্ভব না হইলে হেতুভাঙ্গনের উদ্ভাবন-পূর্বক বাদীর সাধনে দোষ প্রদর্শন করিয়া শেষে স্বপক্ষের স্থাপনা করিবেন। পরে (৩) বাদীও ঐ প্রকারে প্রতিবাদী বাহা বলিয়াছেন, তাহার অমূল্যবাদ করিবেন। কারণ, তিনি প্রতিবাদীর কথা বুঝিয়াছেন কি না, তাহা পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে; না বুঝিয়া দোষ প্রদর্শন করিলে পরে তাহা ঠিকে না, পরন্তু তাহাতে প্রকৃত কার্য্যে অনেক সময়নাশ হয় এবং না বুঝিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে গাইয়াই বিচারে প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতক এবং সভাগণের বিরক্তিকর বহু অনর্থ উপস্থিত করা হয়। সুতরাং বাদীও প্রতিবাদীর স্বায় প্রতিবাদীর কথার অমূল্যবাদ করিয়া, তিনি প্রতিবাদীর কথা বুঝিয়াছেন, ইহা অগ্রে প্রতিপন্ন করিবেন। পরে তাঁহার স্বপক্ষ-সাধনে প্রতিবাদী-প্রদর্শিত দোষগুলির উদ্ধার করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডন করিবেন, অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষস্থাপনায় প্রথমতঃ অজ্ঞবিদ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে হেতুভাঙ্গনের উদ্ভাবন করিবেন। এই প্রণালী অমূল্যদ্বারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি স্বমতে দোষের উদ্ধার বা পরমতে দোষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন। বিচারকালে যিনি এই প্রণালীর কোনরূপ উল্লঙ্ঘন করেন অথবা অসময়ে অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতে হয়, তদুত্তর সময়ে দোষ প্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত বা পরাজিত হন। তিনি যথার্থরূপে স্বপক্ষ সমর্থন করিলেও ঐ দোষে সেখানে নিগৃহীত বা পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন। সভাপতি ও মহাস্থ সেই পরাজয়ের ঘোষণা করিবেন। বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণ বিচারের যে নিয়ম বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনেক ভাবনা উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা বিচারের যে অধিকারী নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও ভাবনা বাড়িয়া যায়। তাঁহারা যে সত্যের অন্বেষণের জন্তই কেবল ভাবিতেন, কুতর্ক, কলহ-কোলাহলে মত্ত হইয়া নৈরাসিকের বর্ধমান অপবাদের বোঝা বহন করিতেন না, বাহাতে বিচারকালে কোনরূপে নীতি লঙ্ঘন না হয়, সত্যের পাছে পাছে দাওয়া হয়, চরিত্রের মালিন্য আরও বাড়িয়া না যায়, নিয়মের বন্ধনে চিত্ত, বাক্য, বুদ্ধি সংযত হয়, তাহা বুঝিতেন ও ভাবিতেন, ইহা তাঁহাদিগের কথাগুলি ভাবিলে জ্বলিতে পারা যায় না। এখন তাঁহারাও নাই, তাঁহাদিগের নিয়মামূল্যদ্বারে বিচারকদিগকে পরিচালিত করিবার উপযুক্ত নেতাও নাই। নেতা থাকিলে বা উপযুক্ত ক্ষমতাসালী নিরপেক্ষ মহাস্থ থাকিলে এখনকার প্রায় সকল বিচারকই পদে পদে নিগৃহীত হইতেন। এখন সকলেই বিচারক; কিন্তু বিচারের শাস্ত্রোক্ত নিয়মাদি অনেকেরই জ্ঞানেন না, জানিলেও মানেন না ॥ ২ ॥

সূত্র । সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ॥ ৩ ॥৪৪॥

অনুবাদ । সেই জল্প, প্রতিপক্ষের স্থাপনামূল্য হইয়া বিতণ্ডা হয় ।

ভাষ্য । স জল্পো বিতণ্ডা ভবতি, কিংবিশেষণঃ ? প্রতিপক্ষস্থাপনয়া হীনঃ । যৌ তৌ সমানাধিকরণৌ বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষ-বিত্যুক্তং, তয়োরেকতরং বৈতণ্ডিকৌ ন স্থাপয়তীতি, পরপক্ষপ্রতিষেধ-নৈব প্রবর্তত ইতি । অস্তু তর্হি সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা ?—যদৈ খলু তৎপরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণং বাক্যং স বৈতণ্ডিকস্ত পক্ষঃ, ন ত্বসৌ কক্ষিধর্থং প্রতিজ্ঞায় স্থাপয়তীতি, তস্মাদযথান্যাসমেবাস্ত্বিতি ।

অনুবাদ । সেই অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত জল্প—বিতণ্ডা হয় । (প্রশ্ন) কি বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া ? অর্থাৎ জল্প হইতে বিতণ্ডার যখন ভেদ আছে, তখন জল্পকেই বিতণ্ডা বলা যায় না ; তাহা বলিতে হইলে কোন বিশেষণ অবশ্যই বলিতে হইবে, যাহার দ্বারা বিতণ্ডাতে জল্পের ভেদ বুঝা যায় ; সুতরাং প্রশ্ন এই যে, কোন বিশেষণযুক্ত হইয়া জল্প বিতণ্ডা হইবে ? (উত্তর) প্রতিপক্ষের স্থাপনামূল্য হইয়া । সমানাধিকরণ অর্থাৎ একই আধারে বিভিন্নবাদীর স্বীকৃত সেই যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে, সেই দুইটির একটিকে অর্থাৎ যেটি প্রতিবাদী বৈতণ্ডিকের পক্ষ, কিন্তু বাদীর প্রতিপক্ষ, সেই ধর্মটিকে বৈতণ্ডিক সংস্থাপন করেন না অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা সাধন করেন না । পরপক্ষ-প্রতিষেধের দ্বারাই অর্থাৎ স্বপক্ষস্থাপনকারী বাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডনের দ্বারাই প্রবৃত্ত হন (অর্থাৎ আত্মপক্ষের স্থাপনা না করিয়া কেবল পরপক্ষ স্থাপনকেই খণ্ডন করিব, তাহার হেতুর দোষ প্রদর্শন করিব, এই বুদ্ধিতেই বৈতণ্ডিকের বিচার-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে) ।

(পূর্বপক্ষ) তাহা হইলে “সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা” এইরূপই সূত্র হউক ? অর্থাৎ বৈতণ্ডিক যখন কোন পক্ষ স্থাপন করেন না, তখন তাঁহার কোন পক্ষই নাই, ইহা বলিতে হইবে । কারণ, যাহার স্থাপন হয় না, তাহা পক্ষ হইতে পারে না । সুতরাং সূত্রে “প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন” না বলিয়া “প্রতিপক্ষহীন” এই কথা বলিলেই চলে এবং সূত্রকে স্বলক্ষ্য করিবার জন্য ঐরূপ বলাই উচিত ।

(উত্তর) সেই যে পরপক্ষপ্রতিষেধরূপ অর্থাৎ পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনরূপ বাক্য, তাহা বৈতণ্ডিকের পক্ষ, অর্থাৎ উহার দ্বারা তাঁহার পক্ষ সিদ্ধি হইবে মনে

করিয়াই বৈতণ্ডিক স্বপক্ষস্থাপন না করিয়া ঐ পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন, সুতরাং তাঁহার ঐ বাক্যই সেখানে তাঁহার পক্ষসিদ্ধির অভিমত উপায় বলিয়া পক্ষ। বৈতণ্ডিক কোন পদার্থকে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না, অতএব (সূত্র) যথাপাঠই থাকিবে, অর্থাৎ “সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা” এইরূপ যে সূত্র মহর্ষির উপহৃত আছে, তাহাই থাকিবে। বৈতণ্ডিকের যখন পক্ষ থাকে, তখন “সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা” এইরূপ সূত্র মহর্ষি বলিতে পারেন না এবং সেই জন্তই তাহা বলেন নাই।

টিপ্পনী। বাদীর পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিবাদীর নিজের পক্ষই এখানে প্রতিপক্ষ। বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী যদি তাহার স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনেরই খণ্ডন করেন এবং তাহা যদি জন্মের অন্ত্যস্ত সকল লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বিচার বিতণ্ডা হইবে। যদিও বাদীর পক্ষও প্রতিবাদীর পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিপক্ষ-শব্দবাচ্য, কিন্তু বাদী যদি প্রথম কোন পক্ষ স্থাপনই না করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী কিসের খণ্ডন করিবেন? তাঁহার খণ্ডনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং এখানে প্রতিপক্ষ বলিতে প্রতিবাদীর পক্ষই বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত জন্ম প্রতিপক্ষ-স্থাপনানুষ্ঠান হইলে বিতণ্ডা হয়, মহর্ষির এই কথার দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত জন্মে উভয় পক্ষের স্থাপনা থাকা চাই, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি পূর্বসূত্রে ইহা না বলিলেও এই সূত্রের দ্বারা তাহা সূচনা করিয়াছেন। এই সূত্রে ‘প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন’ এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তিনি জন্ম হইতে বিতণ্ডার বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত জন্মকেই প্রকাশ করিয়া বিতণ্ডার জন্মের অন্ত্যস্ত লক্ষণ থাকা চাই, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রতিপক্ষ-স্থাপনা-হীনস্বরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট জন্মকেই বিতণ্ডা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে বিতণ্ডা যে বস্তুতঃ জন্মবিশেষ, ইহা বুঝিতে হইবে না। কারণ, বিতণ্ডায় জন্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ নাই। প্রতিপক্ষের স্থাপনা ভিন্ন বিতণ্ডায় জন্মের আর সমস্ত লক্ষণই থাকা চাই, ইহা বলিবার জন্তই মহর্ষি ঐরূপ সূত্র বলিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, সূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত জন্মের একদেশই গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ জন্মলক্ষণে যে ‘উভয়পক্ষ-স্থাপনানুষ্ঠান’ এই কথাটি বলিতে হইবে, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জন্মের অন্য অংশকে ধরা হইয়াছে। কারণ, উভয়পক্ষ-স্থাপনানুষ্ঠানকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলা যায় না, উহা অযোগ্য বাক্য হয়।

তৎ-শব্দের দ্বারা ঐরূপ একদেশ গ্রহণ হইতে পারিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ এখানে ঐ কথার কোনই উল্লেখ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা সুধীগণের চিন্তা করা উচিত। মহর্ষি পূর্বসূত্রে জন্মলক্ষণে ‘উভয়পক্ষস্থাপনানুষ্ঠান’ এইরূপ কথা বলেন নাই। এই সূত্রে বিতণ্ডাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলায় জন্ম যে উভয় পক্ষের স্থাপনানুষ্ঠান, ইহা সূচিত হইয়াছে। পূর্বসূত্রে জন্মকে বৈরূপ বলিয়াছেন, এই সূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা যদি তাহাই মাত্র বুদ্ধি হয়, যদি এই সূত্রের দ্বারা সূচিত নিরূপ লক্ষণাক্রান্ত জন্মই তাঁহার বুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মহর্ষি তাহাকে

প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলিতে পারেন। কারণ, পূর্বসূত্রে জল্পকে বেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা উভয় পক্ষস্থাপনাবৃত্তও হইতে পারে, প্রতিপক্ষস্থাপনাত্মকও হইতে পারে। মহর্ষি উক্তি-কৌশলে পরসূত্রে দ্বারাই জল্পের নিরূপিত লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। পূর্বসূত্রে কোন বাক্যের দ্বারা জল্পকে উভয়পক্ষ-স্থাপনাবৃত্ত বলিলে পরসূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা তাহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলিতে পারেন না। যাহাকে উভয়পক্ষ-স্থাপনাবৃত্ত বলিলেন, তাহাকেই আবার পরসূত্রেই প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলিবেন কিরূপে? সুতরাং মহর্ষি উক্তি-কৌশলে বাক্যসংক্ষেপ করিবার জন্য পরসূত্রেই জল্পের নিরূপিত লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। ফলকথা, এই সূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্র-কথিত সেই সেই ধর্মাবিশিষ্টকেই যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলা যায়। নিরূপিত জল্পলক্ষণাত্মক পদার্থকে গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাত্মক বলা যায় না। মহর্ষি তৎ-শব্দের দ্বারা এখানে কাহাকে বুঝিত করিয়াছেন, স্মরণীয় তাহা ভাবিয়া দেখুন। শ্রুতবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকটে বৈতণ্ডিক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে প্রতিপক্ষহীন বিচারকেই বিতণ্ডা বলিতেন। তাঁহাদিগের কোন পক্ষ না থাকায় বৈতণ্ডিকের কোন পক্ষই নাই, এইরূপ কথা তাঁহারা বলিতেন। এ কথা প্রথম সূত্রভাষ্যে বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিকের কোন পক্ষই নাই, প্রতিপক্ষহীন বিচারই বিতণ্ডা, এই মত ভাষ্যকারের পূর্ব হইতেই সম্প্রদায়বিশেষে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদ্যোতকরও ঐ মতকে উল্লেখ করিয়া ইহা কোন সম্প্রদায় বলেন—এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। পূর্বোক্ত মতবাদী সম্প্রদায়বিশেষ মহর্ষি গোতমোক্ত বিতণ্ডা-সূত্রে স্থাপনা শব্দ নিরর্থক, এইরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেন। সেই জন্যই ভাষ্যকার এখানে সেই কথার উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া সূত্রোক্ত স্থাপনা শব্দের সার্থকতা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য এই যে, বৈতণ্ডিকের পক্ষ আছে, তাহাকেই বলে প্রতিপক্ষ; সুতরাং প্রতিপক্ষহীন বিচারকে বিতণ্ডা বলা যায় না। প্রতিপক্ষহীন কোন বিচারই হইতে পারে না। বৈতণ্ডিকের অন্তর্নিহিত পক্ষকে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না। পরপক্ষ-স্থাপনার খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই বৈতণ্ডিক কেবল পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন। ফলকথা, বিতণ্ডা প্রতিপক্ষের স্থাপনাত্মক, কিন্তু প্রতিপক্ষহীন নহে; সুতরাং মহর্ষি বেরূপ সূত্র বলিয়াছেন, তাহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ থাকায় “সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা” এইরূপ সূত্র বলা যায় না, তাই মহর্ষি তাহা বলেন নাই।

ভাষ্যকার এখানে বৈতণ্ডিকের পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনরূপ বাক্যকে বৈতণ্ডিকের পক্ষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিকের সেই বাক্যই তাহার পক্ষ নহে। ভাষ্যকার সেই বাক্যে পক্ষ শব্দের গোণ প্রয়োগ করিয়াই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, বৈতণ্ডিক তাহার অন্তর্নিহিত স্বপক্ষ সিদ্ধির জন্যই পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডন করেন, নচেৎ তিনি কখনই তাহা করিতে যাইতেন না। বৈতণ্ডিক তাহার বাক্যকেই স্বপক্ষের সাধক বা জ্ঞাপক

মনে করেন এবং তাহার ঐ বাক্যের দ্বারা ই বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ আছে, ইহা অসম্মান করা যায়। এ জন্ত বৈতণ্ডিকের সেই বাক্যকেই তাহার পক্ষ বলা হইয়াছে। অর্থবিশেষ জ্ঞাপনের জন্ত এইরূপ গোপ প্রয়োগ অনেক স্থানেই দেখা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে “যদৈ ধনু” এই স্থলে ‘বৈ’ শব্দের দ্বারা পূর্বপক্ষের অযুক্ততা সূচিত হইয়াছে। ধনু শব্দটি হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে হেতু বৈতণ্ডিকের পক্ষ আছে, অতএব পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ অযুক্ত। বিতণ্ডা নথ্যে অজ্ঞাত কথা প্রথম স্থত্বে ভাষ্যে বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাত্ হেতুবদাভাস-
মানাঃ। ত ইমে।

সূত্র। সব্যভিচার-বিরুদ্ধ প্রকরণ-সমসাধ্যসম-
কালাতীত হেতুভাষাঃ ॥৪॥৪৫॥

অনুবাদ। হেতুর লক্ষণ না থাকায় অহেতু অর্থাৎ প্রকৃত হেতু নহে, হেতুর সামান্য অর্থাৎ কোন সামান্য ধর্ম বা সাদৃশ্য থাকায় হেতুর স্থায় প্রকাশমান অর্থাৎ যাহা এইরূপ পদার্থ, তাহা হেতুভাষ।

সেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত এই হেতুভাষ (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম, (৫) কালাতীত—অর্থাৎ এই পাঁচ নামে পাঁচ প্রকার।

বিবৃতি। অসম্মান করিতে হইলে হেতু আবশ্যক। যেখানে যে পদার্থকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেই পদার্থ যদি বস্তুতঃ হেতু হয়, প্রকৃত হেতু হয়, তবেই সেখানে অসম্মান খাটি হইতে পারে। যে পদার্থে হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকে অর্থাৎ যে সকল ধর্ম থাকিলে তাহাকে হেতু বলা যায়, তাহা থাকে, তাহাই প্রকৃত হেতু, তাহাই সাধ্যের সাধন। যাহা বস্তুতঃ সাধ্যের সাধন, তাহাই বস্তুতঃ হেতু। যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহা সাধ্যসাধন নহে, তাহা হেতু নহে। তবে তাহা হেতুরূপে গ্রহণ করিলে হেতুর কোন সামান্য ধর্ম বা সাদৃশ্যবস্তুতঃ হেতুর স্থায় প্রতীয়মান হয়; এ জন্ত অনেক সময়ে তাহাকে হেতু বলিয়া ভ্রম হয়, সুতরাং তাহার নাম হেতুভাষ। পরবর্তী কালে ইহাকে চুই হেতুও বলা হইয়াছে। এই হেতুভাষ বা চুই হেতু মহর্ষি গোতম পঁচটি নামে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম (১) সব্যভিচার। সব্যভিচার বলিলে বুঝা যায়, ব্যভিচার সহিত অর্থাৎ ব্যভিচারযুক্ত বা ব্যভিচারী। ব্যভিচার বলিতে কোন নিয়মবিশেষ না থাকা। বি—বিশেষতঃ, অভি—উভয়তঃ, চার—গতি (স্বত্ব)। অর্থাৎ যাহার গতি বা স্বত্ব কোন বিশেষ উভয় স্থানে আছে, তাহা ব্যভিচারী।

কোন পদার্থে যে পদার্থকে সাধন বা অনুমান করিতে হইবে, সেই অনুমানের পদার্থটিকে সাধ্য বলা যায়। তাহা সেই সাধ্যযুক্ত স্থান এবং সেই সাধ্যশূন্য স্থান, এই উভয় স্থানেই থাকে, তাহা ঐ সাধ্যের ব্যভিচারী পদার্থ; তাহা দেখানে সাধ্যসাধন হয় না। এ জন্য তাহা দেখানে প্রকৃত হেতু নহে, তাহা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। যেমন যদি কেহ হস্তীর অনুমানে অশ্বকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেখানে অশ্ব সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। কারণ, অশ্ব হস্তিযুক্ত স্থানেও থাকে এবং হস্তিশূন্য স্থানেও থাকে। অশ্ব থাকিলেই দেখানে হস্তী থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সুতরাং অশ্ব হস্তিরূপ সাধ্যের সাধন হয় না, উহা ঐ স্থলে হেত্বাভাস। আবার অশ্বের অনুমানে পূর্বোক্ত প্রকারে হস্তীও সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। হস্তীও অশ্বের সাধন হয় না। আবার কেহ যদি দাতৃত্বের অনুমানে ধনিত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, অথবা ধনিত্বের অনুমানে দাতৃত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ উভয় স্থলেই উহা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হইবে। কারণ, ধনী মাত্রই দাতা নহে এবং দাতা মাত্রই ধনী নহে। ধনিত্ব দাতা ও অদাতা—উভয়েই আছে এবং দাতৃত্বও ধনী ও দরিদ্র—উভয়েই আছে।

আবার শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসক যদি বলেন—শব্দ নিত্য। কারণ, শব্দ স্পর্শশূন্য; শীত, উষ্ণ প্রভৃতি কোন স্পর্শ শব্দে নাই; স্পর্শশূন্য পদার্থ হইলেই তাহা নিত্য পদার্থই হয়, যেমন আত্মা এবং স্পর্শযুক্ত পদার্থ হইলেই তাহা অনিত্য হয়, যেমন ফল, জল প্রভৃতি। শব্দ যখন স্পর্শশূন্য, তখন শব্দ নিত্য পদার্থ। এখানে মীমাংসকের গৃহীত স্পর্শশূন্যতা শব্দের নিত্যত্বানুমানে হেতু হয় না। কারণ, ঐ স্পর্শশূন্যতা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত আত্মা প্রভৃতি পদার্থেও আছে, আবার অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত বুদ্ধি, স্মৃতি, দ্রুত প্রভৃতি পদার্থেও আছে। স্পর্শশূন্য হইলেই তাহা নিত্য পদার্থ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই; সুতরাং ঐ স্থলে স্পর্শশূন্যতা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস।

দ্বিতীয়টির নাম (২) বিরুদ্ধ। তাহা সাধ্য পদার্থকে বিশেষরূপে রুদ্ধ করে, ব্যাহত করে, অর্থাৎ সাধ্যযুক্ত কোন স্থানেই না থাকিয়া কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, তাহা সাধ্যের বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। ইহা সাধ্যের সাধন না হইয়া সাধ্যের অভাবেরই সাধন হয়, সুতরাং স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষরূপ সাধ্যকেই ব্যাহত করে। যেমন যদি কেহ বলেন,— এই জগৎ একেবারে বিনষ্ট হয় না, ইহার অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র। কেন না, এই জগৎ নিত্য পদার্থ নহে, ইহা চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে অবস্থারই হউক, এই জগৎ থাকে, ইহার একেবারে নাশও হয় না। এখানে ফলতঃ জগৎ নিত্য, ইহাই বলা হইল। কারণ, ইহার নাশ নাই, এমন ভাব পদার্থ নিত্যই হয়; কিন্তু এখানে পূর্বে যে অনিত্যত্ব হেতু বলা হইয়াছে, তাহা এই নিত্যত্ব সাধ্যের বিরুদ্ধ। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একাধারে কখনই থাকিতে পারে না, সুতরাং ঐ অনিত্যত্ব হেতু, জগতের নিত্যত্বরূপ সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষকে ব্যাহত করিবে। যে অনিত্যত্ব হেতু কোন কালে জগতের নাস্তিত্বই সাধন করে, তাহা জগতের সদাভাব বা সর্বকালে বিদ্যমানতারূপ নিত্যত্বের অনুমানে কখনই কোন গণকে হেতু হইতে

পারে না। কারণ, যে অনিত্যকে পূর্বে সাধকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সাধক না হইয়া বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষ নিত্যত্বের বাধকই হয়; সুতরাং ঐ স্থলে অনিত্যত্ব জগতের সদাতনত্বের অল্পমানে বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস। যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, এমন পদার্থই সদাতন, এই সিদ্ধান্ত যিনি স্বীকার করেন, তিনি 'এই পৃথিবী জন্ত পদার্থ অর্থাৎ ইহার উৎপত্তি হইয়াছে; কারণ, ইহা সদাতন,' এইরূপে পৃথিবীতে জন্তত্বের অল্পমানে যদি সদাতনত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ স্থলে উহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস হইবে। কারণ, সদাতনত্ব জন্তত্বের বিরুদ্ধ; যাহার উৎপত্তি নাই, তাহাই ত সদাতন বলিয়া স্বীকৃত। পৃথিবীকে সদাতন বলিয়াও জন্ত বলিলে ঐ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়। স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইলে তাহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস হইবে।

তৃতীয়টির নাম (৩) প্রকরণ-সম। বাদী ও প্রতিবাদী যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের প্রকরণ বা প্রস্তাব করেন, তাহাই এখানে প্রকরণ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ যাহাকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহাই এখানে প্রকরণ। যেমন শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব। যাহা হইতে এই প্রকরণ সথকে চিন্তা জন্মে অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে সংশয় জন্মে, এমন পদার্থ হেতুরূপে গ্রহণ করিলে ঐ পদার্থ প্রকরণ-সম নামক হেতুভাস। যেমন একজন বলিলেন,—শব্দ অনিত্য। কারণ, শব্দে নিত্য পদার্থের কোন ধর্মের উপলব্ধি হইতেছে না। নিত্য ধর্মের উপলব্ধি না হইলে সে পদার্থ অনিত্যই হয়, যেমন বজ্রাদি। তখন অপর বাদী এই হেতুর আর কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। শব্দে কোন নিত্য ধর্মের উপলব্ধি তাঁহারও তখন হইতেছে না, কিন্তু তিনিও তখন বাদীর জায় বলিয়া বলিলেন,—শব্দ নিত্য; কারণ, শব্দে কোন অনিত্য ধর্ম অর্থাৎ অনিত্য পদার্থের ধর্ম উপলব্ধি হইতেছে না। তখন পূর্ববাদী এই হেতুতেও কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না; শব্দে অনিত্য ধর্মের উপলব্ধি তাঁহারও নাই, সুতরাং সেখানে কাহারও কোন পক্ষের অল্পমান হইতে পারিল না। পরন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ একটা সংশয়ই সেখানে জন্মিল। কারণ, বিশেষের অল্পপল্লি সংশয়ের একটা কারণ, তাহা উভয় পক্ষেই আছে। শব্দে নিত্যধর্মের উপলব্ধি অথবা অনিত্য-ধর্মের উপলব্ধি থাকিলে কখনই ঐরূপ সংশয় হইতে পারিত না। সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর ঐ বিশেষ ধর্মের অল্পপল্লি, যাহা সেখানে হেতুরূপে গৃহীত, তাহা সেখানে প্রকরণ-সম নামক হেতুভাস। যাহা প্রকরণের জায় অনিশ্চায়ক, পরন্তু উভয় প্রকরণেই তুল্য, তাহা প্রকরণ বিষয়ে সংশয়েরই উৎপাদক, তাহা প্রকরণের নির্ণয়ের জন্ত প্রযুক্ত হইলে প্রকরণ-সম হইবে। পূর্বোক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর দুই হেতুই দৃষ্ট; দুই হেতুই প্রকরণ-সম। ঐরূপ সংশয়োৎপাদক পদার্থ অল্পমানে হেতু হইতে পারে না।

চতুর্থটির নাম (৪) সাধ্যসম। যাহা অসিদ্ধ, তাহাই সাধ্য হয়। উভয়বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধ পদার্থ সাধ্য হয় না। অল্পমানে এই সাধ্য ভিন্ন আর সমস্ত পদার্থই সিদ্ধ হওয়া চাই। হেতু সিদ্ধ পদার্থ না হইলে সাধ্যের সাধক হইতে পারে না। যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে পরকে কিরূপে

সাধন করিবে? যদি কোন স্থানে প্রযুক্ত হেতু সিদ্ধ না হয়, প্রতিবাদী ঐ হেতু না মানেন, তাহা হইলে ঐ হেতু সেখানে সাধন করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং ঐ হেতু সেখানে সাধ্যের তুল্য, উহা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধ্যসাধন হইতে পারে না; সুতরাং উহা প্রকৃত হেতু নহে, উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। যেমন মীমাংসকগণ অনুমান করিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকার জব্য পদার্থ; কারণ, তাহার গতি আছে। কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে তাহার পশ্চাদ্ভাবী ছায়াও সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। বাহা গমন করে, তাহা অবশ্যই জব্য পদার্থ। জব্য ভিন্ন আর কোনও পদার্থের গতি নাই। নৈয়ায়িক ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকারের গতি সিদ্ধ পদার্থ নহে। গমনকারী পুরুষ আলোকের আবরণ অর্থাৎ আচ্ছাদক হয়, এ জন্ত তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া পড়ে। ঐ স্থানে তখন আলোকের অভাব সর্বসম্মত। যখন পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হয়, তখন তাহার পশ্চাদ্ভাবী আলোকভাবও উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে উপলব্ধি হয়; এই জন্ত পুরুষের ছায় ছায়াও ক্রমে তাহার পাছে পাছে গমন করিতেছে, এক্রপ ভ্রম হয়। সুতরাং ছায়ার গতি আছে, ইহা স্বীকার করি না। ছায়া আলোকের অসন্নিধি মাত্র। ছায়ার গতি যদি প্রমাণসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে অবশ্য ছায়া জব্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। ছায়ার গতি অসিদ্ধ, সুতরাং উহা সাধ্যের তুল্য। ছায়ার জব্যস্বভূমানে উহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, উহা প্রকৃত হেতু নহে।

পঞ্চমটির নাম (৫) কালাতীত। যে হেতু কালের অতিক্রমযুক্ত, তাহা কালাতীত নামক হেত্বাভাস। যেমন মীমাংসকগণ বলিয়াছেন যে, শব্দ তাহার শ্রবণের পূর্বেও থাকে, পরেও থাকে, উহা রূপের ছায় হির পদার্থ। কারণ, শব্দ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, অর্থাৎ শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগজন্ত। ভেরী ও দণ্ডের সংযোগে এবং কাঠ ও কুঠারের সংযোগে শব্দের উৎপত্তি হয় না, শব্দের অভিব্যক্তিই হয়। বাহার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সংযোগ-জন্ত, তাহাকেই বলে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য। বাহা সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, তাহা অভিব্যক্তির পূর্ব হইতেই থাকে এবং তাহার পরেও থাকে, যেমন রূপ। অন্ধকারে রূপ দেখা যায় না, এ জন্ত বাহার রূপ দেখিব, তাহাতে আলোক সংযোগ আবশ্যক। আলোক সংযোগের পরেই রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। সেখানে রূপ পূর্ব হইতেই আছে এবং পরেও থাকিবে। রূপ আলোক-সংযোগ-ব্যঙ্গ্য। সুতরাং বাহা সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, তাহা পূর্ব হইতেই থাকে, ইহা যখন রূপে দেখিতেছি, তখন শব্দও পূর্ব হইতেই থাকে, ইহা অনুমান করিতে পারি। ভাষ্যকার বাস্তবায়ন বলিয়াছেন যে, তাহা পার না। কারণ, তোমার ঐ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য হেতু ঐ স্থলে কালাতীত। কেন না, রূপের প্রত্যক্ষ আলোক সংযোগের সমকালেই হয়। আলোক-সংযোগ নিবৃত্ত হইলে আর হয় না। সুতরাং রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্ত, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগ-জন্ত হইতে পারে না। কারণ, কাঠ ও কুঠারের সংযোগকালেই দূরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, অনেক পরেই তাহার শব্দ শ্রবণ হয়। দূরস্থ শ্রোতা দূরস্থ শব্দ শ্রবণ করে না, ক্রমে তাহার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই সে শ্রবণ করে। তখন পূর্বজাত সেই কাঠ-কুঠার-সংযোগ থাকে না।

কল কথা, ঐ সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই শব্দ শ্রবণ হয়, সূত্ররাং শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগ-জ্ঞাত বলা যায় না, শব্দকেই সংযোগ-জ্ঞাত বলিতে হইবে। তাহা হইলে-শব্দকে রূপের জ্ঞায় সংযোগ-ব্যাপ্য বলা যায় না। শব্দের অভিব্যক্তি কাঠ ও কুঠারের সংযোগ-কালকে অতিক্রম করে, এ জ্ঞাত সংযোগ-ব্যাপ্য মীমাংসকের পূর্বোক্ত অল্পমানে কালাতীত নামক হেত্বাভাস। অথবা যে ধর্ম্মাতে কোন ধর্ম্মের অল্পমান করিতে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইবে, সেই ধর্ম্মাতে যদি সেই সাধ্য ধর্ম্ম বা অল্পমের ধর্ম্মটি নাই, ইহা বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে আর সেখানে সাধ্য সন্দেহের কাল থাকে না। সাধ্য সন্দেহের কাল অতীত হইলে অর্থাৎ বলবৎ প্রমাণের দ্বারা অল্পমানের আশ্রয়ে সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় স্থলে সেই সাধ্যের অল্পমানে হেতুরূপে প্রযুক্ত পদার্থ কালাতীত নামক হেত্বাভাস। যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, কেহ অগ্নিতে অল্পক্ষতার অল্পমান করিতে যে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা কালাতীত নামক হেত্বাভাস হইবে।

টিপ্পনী। বাদ, জর ও বিতণ্ডায় হেত্বাভাসের জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। এ জ্ঞাত মহর্ষি তাহার পরেই হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়া তাহার নিরূপণ করিয়াছেন। অল্পমানের হেতু নির্দোষ না হইলে অল্পমান খাঁটি হয় না। অনেক সময়েই দুষ্ট হেতুর দ্বারা অল্পমান করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে হয়। সূত্ররাং কোন্ হেতু সৎ এবং কোন্ হেতু অসৎ অর্থাৎ দুষ্ট, তাহা বুঝা নিতান্ত প্রয়োজন। ফলতঃ অল্পমানের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ে এবং জর ও বিতণ্ডায় জয়লাভে হেত্বাভাস জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। যে হেতুতে ব্যভিচারাদি কোন দোষ নাই, তাহাই সৎ হেতু। যাহাতে ব্যভিচারাদি কোন দোষ আছে, তাহাই অসৎ হেতু বা দুষ্ট হেতু। ইহা বস্তুতঃ হেতু না হইলেও হেতুরূপে গৃহীত হয় এবং হেতুসদৃশ, এ জ্ঞাত ইহাতেও হেতু শব্দের গোণ প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। মহর্ষি গোতম পূর্বোক্ত অসৎ হেতু বা দুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলিয়াছেন। “হেতুবদান্তাসক্তে” অর্থাৎ বাহ্য হেতু নহে, কিন্তু হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাই মহর্ষি হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষি যেখানে পৃথক্ করিয়া সামান্য লক্ষণসূত্র বলেন নাই, কেবল বিভাগ-সূত্রের দ্বারা বিভাগ করিয়াছেন, সেখানে তাহার বিভাগসূত্রের দ্বারাই সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এ কথা প্রমাণ-বিভাগ-সূত্রের (তৃতীয় সূত্রের) পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতিও তাহাই বলিয়াছেন। সামান্য লক্ষণ ব্যতীত বিভাগ হয় না। বিশেষ জ্ঞানের জ্ঞাত যে বিভাগ, তাহা সামান্য জ্ঞান সম্পাদন না করিয়া করা যায় না। সূত্ররাং মহর্ষি এই বিভাগ-সূত্রেই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা অবশ্যই করিয়াছেন। “হেতোরভাসাঃ” অর্থাৎ হেতুর দোষ, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে রঘুনাথ প্রভৃতি কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক হেতুর দোষগুলিকেও হেত্বাভাস বলিয়া তাহার সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ, এই পঞ্চবিধ হেতুর দোষকে পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়া তদ্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশের হেত্বাভাস-সামান্য লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম সব্যভিচার অর্থাৎ ব্যভিচাররূপ দোষযুক্ত,

বিকল্প অর্থাৎ বিরোধরূপ দোষযুক্ত ইত্যাদি পঞ্চবিধ দৃষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলিয়াছেন। এই সব্যভিচার প্রভৃতির বিশেষ লক্ষণ-স্বত্রেও ইহা সুব্যক্ত আছে। আভাস শব্দের দোষ অর্থও মুখ্য নহে। এই সমস্ত কারণে হেতুর দোষগুলিকে হেত্বাভাস নামে ব্যাখ্যা করা সমুচিত বলিয়া মনে হয় না। তদ্বর্চিস্তামণিকার গল্পেশও কিন্তু শেষে হেত্বাভাসের বিভাগ-বাক্যে সব্যভিচার প্রভৃতি দৃষ্ট হেতুরই বিভাগ করিয়াছেন। রঘুনাথের দীপ্তিতর টীকাকার গদাধর প্রভৃতি সেখানে গল্পেশের অন্তরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিলেও গল্পেশ দৃষ্ট হেতুরই সামান্য লক্ষণ বলিয়া তাহারই বিভাগ করিয়াছেন, ইহাই সহজে মনে আসে। গল্পেশের হেত্বাভাসের লক্ষণ তিনটির দৃষ্ট হেতুর লক্ষণ পক্ষেও ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকে তাহাও করিয়াছেন। দীপ্তিতরকার রঘুনাথ সে ব্যাখ্যাও বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, এখন হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ কি বুঝা যায়, তাহা বুঝিতে হইবে। হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা যাহা হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান হয়, এমন পদার্থকে বুঝা যায়। হেতুর জ্ঞায় অর্থাৎ হেতুসদৃশ, এই কথা বলিলে তাহা হেতু নহে—অহেতু, ইহা বুঝা যায়। যাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই, তাহাই অহেতু। হেত্বাভাস পদার্থ যখন অহেতু, তখন তাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই। তাই ভাব্যকার মহর্ষি-স্বত্রেই হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা সৃচিত হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, হেতুর লক্ষণ না থাকায় অহেতু। যে পদার্থকে সেখানে হেতুরূপে গ্রহণ করা না হয় অথবা যাহাতে হেতুর কোনরূপ লক্ষণ নাই, এমন পদার্থ সেখানে হেত্বাভাস নহে; কিন্তু কেবল অহেতু পদার্থকে হেত্বাভাস বলিলে সেখানে সেই পদার্থ এবং সর্বত্র ঐক্য অসংখ্য পদার্থ হেত্বাভাস হইয়া পড়ে। এই জন্ত ভাব্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, হেতুর সামান্য ধর্ম বা সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান, অর্থাৎ যে পদার্থ হেতু নহে, কিন্তু হেতুর কোন সামান্য ধর্ম থাকায় হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান হয়, তাহাই হেত্বাভাস। বস্তুতঃ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাও ইহাই বুঝা যায়।

হেত্বাভাসে হেতুর সামান্য ধর্ম কি আছে? যাহার জন্ত উহা হেতুর জ্ঞায় প্রতীয়মান হয়? এতদ্বস্ত্রে উদ্যোতকর প্রথম বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের অনন্তর প্রয়োগই সামান্য ধর্ম। প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে যেমন প্রকৃত হেতুর প্রয়োগ হয়, তজপ হেত্বাভাস বা দৃষ্ট হেতুরও প্রয়োগ হয়। পরে আবার বলিয়াছেন যে, যে সকল ধর্ম থাকিলে তাহা প্রকৃত হেতু হয়, তাহার কোন না কোন ধর্ম হেত্বাভাসেও থাকে, অর্থাৎ ত্রিবিধ বা দ্বিবিধ হেতুর কোন ধর্ম দৃষ্ট হেতুতেও থাকে। সাধকত্ব ও অসাধকত্বই যথাক্রমে হেতু ও হেত্বাভাসের বিশেষ ধর্ম। হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকাই তাহার সাধকত্ব এবং সমস্ত লক্ষণ না থাকা বা কোন লক্ষণ থাকাই হেত্বাভাসের অসাধকত্ব।

এখন হেতুর সমস্ত লক্ষণ কি, তাহা বলিতে হইবে। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণের পরিভাষানুসারে যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, ঐ ধর্ম্মীর নাম পক্ষ এবং ঐ অনুমের ধর্ম্মটির নাম সাধ্য। যেমন পক্ষত-ধর্ম্মীতে বহি-ধর্ম্মের অনুমান করা হইলে পক্ষত পক্ষ, বহি সাধ্য। এই

(১) পক্ষস্ব অর্থাৎ পক্ষে থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যাহা পক্ষে নাই, তাহা হেতু হইতে পারে না। পর্ততে যদি ধুম থাকে, তাহা হইলেই সেখানে বহির অহুমান উহা বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে হেতু হইতে পারে। যে পদার্থ পূর্বোক্ত সাধ্যযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্টবাদের নিশ্চিত, তাহার নাম সপক্ষ; যেমন পর্ততে বহির অহুমান পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষ; কারণ, সেখানে বহি আছে, ইহা সর্বসম্মত। এই (২) সপক্ষস্ব অর্থাৎ সপক্ষে থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। পূর্বোক্ত বহির অহুমান ধুমহেতু পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষে আছে, সুতরাং উহাতে সপক্ষস্ব আছে। যেখানে সাধ্যযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্টবাদের নিশ্চিত কোন পদার্থ নাই, অর্থাৎ যেখানে সপক্ষ নাই, সেখানে সপক্ষস্ব হেতুর লক্ষণ হইবে না। যেখানে সপক্ষ আছে, সেখানেই হেতুতে সপক্ষস্ব আছে কি না, দেখিতে হইবে এবং সেখানেই সপক্ষস্ব হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যে পদার্থ সাধ্যশূন্য বলিয়া নির্দিষ্টবাদের নিশ্চিত, তাহার নাম বিপক্ষ। এই (৩) বিপক্ষে অসত্তা অর্থাৎ বিপক্ষে না থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যেমন পর্ততে বহির অহুমান নদ-নদী প্রভৃতি বিপক্ষ। কারণ, তাহা বহিশূন্য বলিয়া নিশ্চিত। বহিশূন্য বলিয়া নির্দিষ্টবাদের নিশ্চিত পদার্থ আরও প্রচুর আছে; সেখানে ধুম নাই, থাকিতেই পারে না^১, সুতরাং ঐ স্থলে ধুম হেতুতে বিপক্ষে অসত্তা আছে। যেখানে বিপক্ষই নাই অর্থাৎ সাধ্যশূন্য বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থই নাই, সেখানে বিপক্ষে অসত্তা হেতুর লক্ষণ হইবে না, সেখানে উহা বলাই বাইবে না, সেখানে ঐটিকে ছাড়িয়া দিয়া অসত্তা ধর্মগুলিকেই হেতুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

যেখানে সাধ্যশূন্য পদার্থকেই পক্ষ করিয়া সেই সাধ্য সাধনে হেতুপ্রয়োগ করা হয়, তাহার নাম বাধিত হেতু; উহা হেতুর পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও হেতু হয় না; কারণ, উহা সাধ্য-সাধন হয় না। যেখানে সাধ্য নাই বলিয়াই বলবৎ প্রমাণে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেখানে আর কোন হেতুই সাধ্যসাধন করিতে পারে না, সুতরাং ঐরূপ পদার্থে সেখানে হেতুর কোন লক্ষণ নাই, ইহা বলিতেই হইবে। এ জন্ত বলা হইয়াছে, (৪) অবাদিত হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যে হেতু পূর্বোক্ত প্রকারে বাধিত, তাহাতে অবাদিত হইতে থাকে না, এ জন্ত তাহা হেতু নহে। আবার যেখানে কোন হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অহুমান করিতে গেলে, ঐ সাধ্যের অভাবের অহুমান আর একটি পৃথক হেতু উপস্থিত হয় এবং উভয় পক্ষের উভয় হেতুই তুল্যবল হওয়ার কেহ কাহাকে বাধা দিতে না পারে, সেখানে ঐ সাধ্য ও সাধ্যাতাব বিষয়ে একটা সংশয় উপস্থিত হয়, সেখানে ঐ উভয় হেতুকেই বলা হইয়াছে ‘সংপ্রতিপক্ষ’ বা ‘সংপ্রতিপক্ষিত’। সেখানে দুই হেতুই পরস্পর প্রতিপক্ষ, সুতরাং যাহার প্রতিপক্ষ সং—কি না বিদ্যমান, তাহাকে সংপ্রতিপক্ষ বলা যায়। ঐ দুই হেতুর কোনটিই সাধ্যসাধন করিতে না পারায় উহাকে হেতু বলা যায় না, সুতরাং অবশ্যই উহাতে হেতুর কোন লক্ষণ নাই বলিতে হইবে। তাই বলা

১। বহির অহুমান ধুমরূপে ধুম বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে হেতু। বহিশূন্য কোন স্থানেই ঐ বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে ধুম থাকে না। সামান্তরঃ সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধুমই বহির অহুমান হেতু। ২ অঃ, ১ আঃ, ৩০ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে (৫) 'অসংপ্রতিপক্ষত্ব' হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম। যে দুইটি হেতু সংপ্রতিপক্ষ, তাহাতে অসংপ্রতিপক্ষত্ব থাকে না, এ জ্ঞাত তাহা হেতু নহে। হেতু সদৃশ বলিয়াই কিন্তু অহেতুতেও হেতু শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

এখন বুঝা গেল, (১) পক্ষসত্ত্ব, (২) সপক্ষসত্ত্ব, (৩) বিপক্ষে অসত্ত্ব, (৪) অবাবিত্ত্ব, (৫) অসংপ্রতিপক্ষত্ব—এই পাঁচটি ধর্মই হেতুর লক্ষণ। এই পাঁচটি ধর্ম থাকিলেই তাহাকে সাধ্যের গমক বা সাধক বলা হইয়াছে। এবং ঐ পাঁচটি ধর্মকেই হেতুর "গমকতোপয়িক রূপ" বলা হইয়াছে। গমকতার কলিতার্থ অহুমাণকতা; ঔপয়িক বলিতে উপায় বা প্রয়োজক। হেতু যে অহুমাণক হয়, সেই অহুমাণকতার প্রয়োজকই ঐ পাঁচটি ধর্ম। অবশ্য যেখানে সপক্ষ নাই, সেখানে সপক্ষসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া এবং যেখানে বিপক্ষ নাই, সেখানে বিপক্ষে অসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট পূর্কোক্ত চারিটি ধর্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্কোক্ত পাঁচটি ধর্ম এবং স্থলবিশেষে চারিটি ধর্মকেই হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী প্রায় সকল নৈয়ায়িকের মতেই অম্বরী, ব্যতিরেকী ও অম্বরব্যতিরেকী নামে হেতু ত্রিবিধ। এ সকল কথা অবয়ব-প্রকরণে হেতুবাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। পূর্কোক্ত প্রকারে ত্রিবিধ হেতুবাদী নৈয়ায়িকদিগের মতে অম্বরব্যতিরেকী হেতুহলে পূর্কোক্ত পাঁচটি ধর্মই হেতুতে থাকা আবশ্যক, নচেৎ তাহা হেতু হয় না। এবং অম্বরী বা কেবল্যম্বরী হেতুহলে বিপক্ষে অসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া আর চারিটি ধর্ম থাকা আবশ্যক। এবং ব্যতিরেকী বা কেবল্যব্যতিরেকী হেতু হলে সপক্ষসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া আর চারিটি ধর্ম থাকা আবশ্যক। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও তর্কামৃত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্কোক্ত পক্ষসত্ত্ব প্রভৃতি পাঁচটি ধর্মের এক একটির অভাব লইয়াই হেত্বাভাস পক্ষবিধ হইয়াছে। কারণ, সম্ভবস্থলে ইহাদিগের কোন একটি ধর্ম না থাকিলেও তাহা হেতু হয় না। ঐ পাঁচটি ধর্মই গোতম মতে হেতুর "গমকতোপয়িক রূপ" অর্থাৎ অহুমাণকতার প্রয়োজক, সাধকতার প্রয়োজক। মহর্ষি গোতম কর্তৃক: এ সকল কথা কিছু না বলিলেও তিনি বাহা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে। সূত্রে সকল কথার বিশদ প্রকাশ থাকে না, তাহা থাকিতেও পারে না; সূত্রে অনেক তত্ত্বের সূচনাই থাকে, তাই উহার নাম সূত্র। মহর্ষি হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিতে সাধ্যসাধন পদার্থকেই হেতুপদার্থ বলিয়া সূচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে উদাহরণবিশেষের সাধন্য এবং উদাহরণবিশেষের বৈধন্য বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানদ্বারা মহর্ষি-সম্মত ত্রিবিধ হেতুপদার্থও পূর্কোক্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে যে, কিরূপ পদার্থ হইলে তাহা সাধ্যসাধন পদার্থ হইয়া হেতু পদার্থ হইতে পারে। পূর্কোক্ত যুক্তির দ্বারা বুঝা যায়, পক্ষসত্ত্ব প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম অথবা স্থলবিশেষে চারিটি ধর্ম থাকিলেই তাহা সাধ্যসাধন হয় এবং মহর্ষি যে পক্ষবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন, তাহার মূল চিন্তা করিলেও তাহার মতে বাহা হেত্বাভাসে থাকে না, এমন পাঁচটি ধর্মই হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এই সব চিন্তা করিয়াই পূর্কোক্ত পক্ষ ধর্মকেই গোতম মতে হেতুর লক্ষণ বলিয়া

হির করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক শব্দের দ্বারা গোতম মতেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে যে পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা প্রাচীন উদ্যোতকের প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণই প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা সে দিনের নব্য জ্ঞানের কল্যাণিগেরই আবিষ্কৃত নহে। উদ্যোতকের জ্ঞানবৃত্তিক ইহাতে পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ অনেক কথা লইয়াছেন। ভাষ্যকারও সূত্রকারের জ্ঞান অনেক কথার সূচনাই করিয়াছেন। পূর্বোক্ত পক্ষ ধর্মই যে হেতুর লক্ষণ, ইহা তিনি না বলিলেও পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। যাহারা পূর্বোক্ত পক্ষ ধর্মকে হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা বলা হইল। এ সকল কথা না বলিলেও যে সকল ধর্ম থাকিলে সে পদার্থ হেত্বাভাস হয় না, তাহা সাধ্যসাধন হয়, সেই সকল ধর্মই যে হেতুর লক্ষণ, তাহা সকলকেই বলিতে হইবে। সেই ধর্মগুলি যিনি যেরূপ বিবেচনা করিয়া হির করিবেন এবং যে ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবেন, তাহাই হেতুর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহা পূর্বোক্ত পক্ষ ধর্মই হউক, আর তাহার কম বা বেশী অন্ত ধর্মই হউক, তাহাতে কলের কোন হানি নাই। এ জন্ত অনেকে অন্তান্ত প্রকারেও হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তবে পূর্বোক্ত পক্ষ ধর্মের এক একটির অভাব লইয়াই হেত্বাভাস পক্ষবিধ হইয়াছে, ইহা অধিকাংশের মত। তাহা হইলে বুঝা গেল, বাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহাই অসাধক; তাহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে হেত্বাভাস হইবে, ইহাই হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, বাহা হেতু নহে অর্থাৎ বাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই অথচ বাহা হেতুর জ্ঞান প্রতীয়মান হয়, তাহাই হেত্বাভাস। তাহা হইলে উহার দ্বারা হেতুর লক্ষণশূন্য হইয়া হেতুর জ্ঞান প্রতীয়মানই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ বুঝা যায়। ভাষ্যকারও প্রথমতঃ তাহাই বলিয়া এই বিভাগ-সূত্রটির অবতারণা করিয়াছেন। উদ্যোতকের কথায় বুঝা যায় যে, হেতুর সমস্ত লক্ষণ হেত্বাভাসে থাকিবে না, কিন্তু কোন লক্ষণ থাকিবে; এই জন্তই হেত্বাভাস অসাধক হইয়াও হেতুর জ্ঞান প্রতীয়মান হয় এবং ঐ ভাবই তাহার হেত্বাভাস বা অসাধকত্ব। কিন্তু বাহাতে হেতুর কোন লক্ষণই নাই অর্থাৎ বাহা একত্র পক্ষবিধ হেত্বাভাসই হয়, এমন হেত্বাভাসও নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন। তবে ভাষ্যকারও উদ্যোতকের ব্যাখ্যানুসারে প্রকরণ-সন বা সংপ্রতিপক্ষ সেখানে হইবে না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এই কথা বলিয়া প্রথমতঃ পূর্বোক্ত পক্ষসত্ত্ব প্রভৃতি পক্ষধর্মশূন্যতাই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, পূর্বোক্ত পক্ষধর্মই হেতুর লক্ষণ। পরে বলিয়াছেন যে, যখন কোন স্থলে সপক্ষ থাকে না এবং কোন স্থলে বিপক্ষ থাকে না, তখন পূর্বোক্ত পক্ষধর্ম সর্বত্র প্রসিদ্ধ না হওয়ায় ঐ পক্ষধর্মশূন্যতাকে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ বলা যায় না। যেখানে কোন পদার্থেই ঐ পক্ষধর্ম সিদ্ধ নাই, সেখানে ঐ পক্ষধর্মশূন্যতাও একটা পদার্থ হইতে পারে না; সূত্রাং সেখানে হেত্বাভাস কেহই হইতে পারে না। সূত্রাং উহা হেত্বাভাসের লক্ষণ হয় না। পূর্বোক্ত পক্ষ-ধর্মের মধ্যে সম্ভবস্থলে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষ সত্ত্ব এবং বিপক্ষের অসত্ত্ব, এই তিনটি ধর্ম থাকিবে না,

ইহা হেতুভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায় এবং অব্যবহিত্য ও অসংপ্রতিপক্ষ থাকিবে না, ইহাও হেতুভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের (সম্ভবত্ব) কোন একটি ধর্ম না থাকিলেও তাহা হেতু হয় না, তাহা অহেতু। হেতুভাস শব্দের দ্বারা যখন হেতুলক্ষণশূন্য পদার্থই বুঝা যায়, তখন তাহার দ্বারা পূর্বোক্ত ধর্মত্রয়ের অভাব বুঝা যায়। তাহা হইলে উহার দ্বারা ফলে অহুমিত্তির কারণ যে জ্ঞান, তাহার বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে পারা যায় এবং তাহাই বুঝিতে হইবে। কোন হেতুতে পূর্বোক্ত ধর্মত্রয় নাই, ইহা বুঝিলে সেখানে অহুমিত্তির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত ধর্মত্রয়শূন্য, এই কথার দ্বারা অহুমিত্তির কারণ জ্ঞানের বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে হয়। এইরূপ কোন হেতুকে বাধিত বা সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া বুঝিলে সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই অহুমিত্তির প্রতিবন্ধক হয়। তাহা হইলে পূর্বোক্ত অব্যবহিত্য ও অসংপ্রতিপক্ষের অভাব যে বাধিতত্ব ও সংপ্রতিপক্ষত্ব, তাহার দ্বারা ফলে অহুমিত্তি বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে হেতুভাস শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল যে, যাহা জ্ঞানমান হইয়া অহুমিত্তি অথবা তাহার কারণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান অথবা পরামর্শের বিরোধী, সেই পদার্থই হেতুভাস অর্থাৎ যাহা বুঝিলে অহুমিত্তি জন্মে না অথবা সেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে না অথবা পরামর্শ জন্মে না, সেই পদার্থগুলি হেতুর দোষ। সম্বন্ধবিশেষে ঐ দোষ যে পদার্থে থাকে, তাহা হেতুভাস বা চূড় হেতু। ইহাই বৃত্তিকারের চরম ব্যাখ্যার স্থল তাৎপর্য।

তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এক উক্তিহেতু হেতুভাসের সামান্য লক্ষণ বুঝাইতে যাইয়া প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরবর্তী নৈয়ায়িক বিখ্যাত ও রত্ননাথের কথা লইয়াই এখানে হেতুভাসের সামান্য লক্ষণের চরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যার বিস্তার করেন নাই। তাঁহারা লক্ষণ বিষয়ে কিছু সূচনাই করিয়া গিয়াছেন, পদার্থ বিষয়ে বাহ্যতে একটি ধারণা জন্মিতে পারে, তাহাই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে পদার্থ নির্বাচন করিবার জন্ত পরে যাহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বঙ্গের স্মার্যবীর আচার্যগণ স্মার্য বিষয়ে অদ্ভুত লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। মনে হয়, প্রাচীন স্মার্যচার্যগণ সর্বত্র এক উক্তিহেতু হেতুভাসের একটি সামান্য লক্ষণ আবশ্যক মনে করেন নাই এবং উহা অসম্ভব মনে করিয়াও ঐ বিষয়ে কোন চিন্তা করেন নাই। যেখানে পূর্বোক্ত পক্ষধর্ম সিদ্ধই নাই, সেখানে যে চারিটি ধর্ম প্রসিদ্ধ আছে অথবা যাহাই সেখানে হেতুর লক্ষণ বলা যাইবে, তাহার অভাবই সেখানে হেতুভাসের লক্ষণ হইবে। সর্বত্র হেতুভাসের একটি লক্ষণ নাই বা হইল, আর তাহা হইবেই বা কিরূপে? অগুনানের পক্ষ, সাধ্য ও হেতু সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন। এক উক্তিহেতু একটা লক্ষণ বলিতে পারিলেও ফলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্নই হইবে। আর এক উক্তিহেতুই বা তাহা সর্বস্থলের জন্ত নিষ্কটরূপে কি করিয়া বলা যাইবে? দীর্ঘতিকা রত্ননাথও ত তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনিও হেতুভাসের সামান্য লক্ষণে কতকগুলি ভিন্ন কল্পের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনিও শেষে বাদৃশ পক্ষ, বাদৃশ সাধ্য ও বাদৃশ হেতু হলে যতগুলি হেতুভাস সম্ভব হয়, তাবৎ পদার্থের অন্ততমই হেতুর

সৌম্যরূপ হেত্বাভাসের একটি লক্ষণ বলিয়া সেই কল্পের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সেখানে টীকাকার গদাধরও মতান্তরে সেই কল্পেই রঘুনাথের নির্ভর, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এবং সেই কল্পটাই যে কোন স্থলবিশেষের জন্ত গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ স্থলবিশেষে যে হেত্বাভাসের লক্ষণ অগত্যা ঐরূপই বলিতে হইবে, ইহাও গদাধরের বিচারে সেখানে পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুতরাং সর্বত্র হেত্বাভাসের একটি লক্ষণই ব্যাখ্যাত হইয়াছে কোথায়? গদাধর যাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন নাই, কেবল সকল লক্ষণের দোষ ব্যাখ্যা করিয়াই তিনি তাহার বুদ্ধিমত্তার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আশাহরূপ নির্দোষ ব্যাখ্যা করিতে আর কাহারই বা শক্তি আছে? একটা ব্যাখ্যা করিলেই বা তাহার নির্দোষত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করা যায় কৈ? নব্য জ্ঞানের অধ্যাপকগণ গদাধরের হেত্বাভাস বিচারে স্মরণ করিলে সর্বত্র হেত্বাভাসের একটি সামান্য লক্ষণ নির্দোষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, তাহা স্মরণ করিতে পারিবেন। ফলকথা, প্রাচীন জ্ঞানচর্চাগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে হেত্বাভাসের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণই বলিতেন; এ জন্ত তাহারা হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যায় নব্যগণের জ্ঞান কোন গুরুতর চিন্তা করিতে যান নাই। যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই অথচ যাহা হেতুর জ্ঞান প্রতীয়মান হয়, কোন কারণে যাহাকে হেতু বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাই হেত্বাভাস, এইরূপ বলিলেই হেত্বাভাসের সামান্য জ্ঞান হইবে এবং বিশেষ লক্ষণ বলিলে বিশেষ জ্ঞান হইবে। বিশেষলক্ষণের দ্বারাও তাহাকে হেত্বাভাস বলিয়া বুঝা যাইবে, ইহাই প্রাচীনদিগের মনের কথা বলিয়া মনে হয়।

পরবর্তী বিশেষ লক্ষণসূত্রগুলিতেই সব্যভিচার প্রভৃতি পাঁচটি নাম এবং তাহাদিগের লক্ষণ ব্যক্ত আছে। তবে আবার এই সূত্রটির প্রয়োজন কি? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাস বহু প্রকার আছে, সেগুলি সমস্তই এই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। এই পঞ্চবিধ ভিন্ন আর কোন হেত্বাভাস নাই, এই বিশেষ নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তই মর্হর্ষি এই বিভাগ-সূত্রটি বলিয়াছেন। হেত্বাভাস যে কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা উদ্যোতকর দেখাইয়াছেন এবং তাহার উদাহরণ ও সংখ্যার বর্ণনা করিয়াছেন। শেষে গিয়া তাহা অসংখ্যই হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। তেষাং।

সূত্র। অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥৫॥৪৩॥

অনুবাদ। সেই অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে যাহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ঐকান্তিক নহে, সাধ্য ও সাধ্যের অভাব, এই দুই পক্ষের কোন পক্ষেই নিয়ত নহে অর্থাৎ যাহা সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে, এমন পদার্থ সব্যভিচার (সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস)।

ভাষ্য। ব্যভিচার একত্রাব্যবস্থিতিঃ। সহ ব্যভিচারেণ বর্ততে ইতি সব্যভিচারঃ। নিদর্শনঃ—নিত্যঃ শব্দোহস্পর্শদ্বাং স্পর্শবান্

কুস্তোহনিত্যো দৃষ্টো ন চ তথা স্পর্শবান্ শব্দস্তস্মাদস্পর্শত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইতি । দৃষ্টান্তে স্পর্শবস্ত্বনিত্যত্বঞ্চ ধর্মো ন সাধ্যসাধনভূতো গৃহ্যেতে, স্পর্শবাংচাণুনিত্যশ্চেতি । আত্মাদৌ চ দৃষ্টান্তে 'উদাহরণসাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতু'রিত্যস্পর্শত্বাদিত্যে হেতুর্নিত্যত্বং ব্যভিচারতি অস্পর্শা বুদ্ধিরনিত্য। চেতি । এবং দ্বিবিধেহপি দৃষ্টান্তে ব্যভিচারাং সাধ্যসাধন-ভাবো নাস্তীতি লক্ষণাভাবাদহেতুরিত্যে । নিত্যত্বমেকোহন্তঃ, অনিত্যত্ব-মেকোহন্তঃ, একস্মিন্নন্তে বিদ্যত ইতি ঐকান্তিকঃ, বিপর্যয়াদনৈকান্তিকঃ, উভয়াস্তব্যাপকত্বাদিত্যে ।

অনুবাদ । ব্যভিচার বলিতে কোন এক পক্ষে ব্যবস্থিতি না থাকা অর্থাৎ নিয়ম না থাকা । ব্যভিচারের সহিত বর্তমান থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারবিশিষ্ট, এই অর্থে সব্যভিচার, অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত সব্যভিচার শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—ব্যভিচারী । সুতরাং বুঝা যায়, ব্যভিচারিহই সব্যভিচার নামক হেতুভাসের লক্ষণ । নিদর্শন—অর্থাৎ এই সব্যভিচারের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি । (প্রতিজ্ঞা) শব্দ নিত্য, (হেতু) স্পর্শশূন্যতা জ্ঞাপক, (উদাহরণ) স্পর্শবিশিষ্ট কুস্ত অনিত্য দেখা যায়, (উপনয়) শব্দ সেই প্রকার (কুস্তের তায়) স্পর্শবিশিষ্ট নহে, (নিগমন) সেই স্পর্শশূন্যতা হেতুক শব্দ নিত্য । (এই স্থলে) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত কুস্তে স্পর্শ এবং অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্মকে সাধ্যসাধনভূত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না অর্থাৎ স্পর্শ হেতু, অনিত্যত্ব তাহার সাধ্য ; যেখানে যেখানে স্পর্শ থাকে, সে সমস্তই অনিত্য, ইহা পূর্বেবক্ত দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না । (কারণ) পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট, অথচ নিত্য, অর্থাৎ পরমাণুতে স্পর্শ থাকিলেও তাহা যখন অনিত্য নহে, তখন স্পর্শ অনিত্যত্বের সাধন হয় না । আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তেও অর্থাৎ বাহ্য বাহ্য স্পর্শশূন্য, তাহা নিত্য, যেমন আত্মা প্রভৃতি, এইরূপে গৃহীত আত্মা প্রভৃতি সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত স্থলেও 'উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু' (১ অং, ৩৪ সূত্র) এই সূত্রানুসারে 'অস্পর্শত্বাং' এই বাক্য প্রতিপাদ্য হেতু অর্থাৎ স্পর্শশূন্যতারূপ হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী হইতেছে ; (কারণ) বুদ্ধি স্পর্শশূন্য অথচ অনিত্য, (অর্থাৎ স্পর্শশূন্য হইলেই যে সে পদার্থ নিত্য হইবে, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি ঐ দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না । কারণ, বুদ্ধি পদার্থে উহার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে) । এইরূপে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারবশতঃ সাধ্য-সাধনত্ব নাই অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে শব্দে নিত্যত্বের অনুমান

করিতে যে স্পর্শশূন্যতাকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে নিত্য সাধের সাধনই নাই। এ জন্ত লক্ষণের অভাব বশতঃ অর্থাৎ হেতুর লক্ষণ না থাকায় (উহা) অহেতু।

নিত্য একটি পক্ষ, অনিত্য একটি পক্ষ। একই পক্ষে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ একই পক্ষে নিয়মবদ্ধ, এই অর্থে 'ঐকান্তিক'। বৈপরীত্যবশতঃ অর্থাৎ এই ঐকান্তিকের বিপরীত হইলে অনৈকান্তিক। কারণ, (তাহাতে) উভয় পক্ষের ব্যাপকই আছে অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতি সাধ্য ও সাধ্যাভাবরূপ যে দুইটি পক্ষ বা ধর্মবিশেষ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের আশ্রয়েই বাহা থাকে, কোন একটি মাত্রের আশ্রয়ে থাকে না, এ জন্ত তাহা ঐকান্তিক নহে—অনৈকান্তিক।

টিপ্পনী। হুজ্জে অনৈকান্তিক এবং সব্যভিচার শব্দ একার্থবোধক পর্যায় শব্দ। যাহাকে অনৈকান্তিক বলে, তাহাকেই সব্যভিচার বলে। সুতরাং অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা সব্যভিচারের লক্ষণ প্রকাশ করা যায় কিরূপে? বুকের লক্ষণ বলিতে কি 'মহীকৃষ্ণকে বুক বলে' এইরূপ কথা বলা যায়? আর তাহা বলিলেই কি বলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? তাৎপর্যটাকার এ জন্ত বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া মহর্ষি এই হুজ্জে দুইটি শব্দকেই লক্ষ্য ও লক্ষণবোধকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু সব্যভিচার বলিলে বুঝে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—সব্যভিচারকেই অনৈকান্তিক বলে। যে ব্যক্তি সব্যভিচার শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু অনৈকান্তিক বলিলে বুঝে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—অনৈকান্তিককে সব্যভিচার বলে। সুতরাং বোদ্ধার ভেদে এই হুজ্জের দুইটি শব্দই লক্ষ্যনির্দেশ এবং লক্ষণনির্দেশ। এই জন্ত ভাষ্যকারও প্রথমে সব্যভিচার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, উহার দ্বারাই সব্যভিচার নামক হেত্বভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি সব্যভিচার শব্দটিকেই প্রথমতঃ লক্ষণ-বোধকরূপে গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারাই লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে সব্যভিচারের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সর্বশেষে তিনি হুজ্জের অনৈকান্তিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ অনৈকান্তিক শব্দও এক পক্ষে লক্ষণ-বোধক, এ জন্ত ঐ শব্দটির যৌগিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যকার উহার দ্বারাও শেষে সব্যভিচার নামক হেত্বভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ যাহার নাম সব্যভিচার, তাহার নামই অনৈকান্তিক।

তাৎপর্যটাকার এইরূপ বলিলেও প্রথমতঃ মহর্ষি পঞ্চবিধ হেত্বভাসের নাম কীৰ্ত্তন করিতে সব্যভিচার শব্দই বলিয়াছেন। সুতরাং এই হুজ্জে সব্যভিচার শব্দকেই তিনি লক্ষ্য নির্দেশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই কিন্তু মনে হয়। ভাষ্যকার নিজে সব্যভিচার শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াও সব্যভিচার নামক হেত্বভাসের লক্ষণ বুঝাইতে পারেন এবং উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারেন। পরে হুজ্জকারের অনৈকান্তিক শব্দের যৌগিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া হুজ্জোক্ত লক্ষণেরও ব্যাখ্যা করিতে পারেন। হুজ্জকারও লক্ষণহুজ্জ লক্ষ্যবোধক শব্দটিকে পরেই উল্লেখ করিয়াছেন,

এ কথাগুলিও ভাবিতে হইবে। তবে একার্থবোধক পৰ্য্যায় শব্দের দ্বারা লক্ষ্য ও লক্ষণ বলিলে যদি দোষ হয়, তাহা তাৎপৰ্য্যটীকাকারের পক্ষেও হইবে না কেন? যে ব্যক্তি সব্যভিচার শব্দের অর্থ অথবা অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ জানে, সে ত সব্যভিচার নামক হেতুভাঙ্গ কাহাকে বলে, তাহা জানেই; তাহাকে আর উহা বলিবার প্রয়োজনই বা কি? কোন শব্দবিশেষ না জানিলে পদার্থের অজ্ঞতা হয় না। মহৰ্ষি গোতম যাহাকে সব্যভিচার বলিয়াছেন, তাহাকে অন্য কোন শব্দের দ্বারা জানিলেও তাহার জ্ঞান সম্পন্ন হয়। স্মরণ্য মনে হয় যে, মহৰ্ষি পূৰ্ব্বেই সব্যভিচার শব্দের দ্বারা যে এক প্রকার হেতুভাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, সব্যভিচার শব্দের প্রতিপাদ্য সেই হেতুভাঙ্গের স্বরূপ বলিবার জ্ঞানই এই সূত্রটি বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়, যাহা অনৈকান্তিক, তাহাই সব্যভিচার অর্থাৎ পূৰ্ব্বেই সব্যভিচার শব্দের প্রতিপাদ্য হেতুভাঙ্গ। বিভিন্ন ধৰ্ম্মপ্রকারে একার্থবোধক শব্দের দ্বারাও লক্ষণ বলা যায়, তাহাতে পুনৰুক্তি-দোষ হয় না। ব্যাখ্যার সিদ্ধান্ত-লক্ষণ ব্যাখ্যার দীৰ্ঘিতিটীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারও এক কথা বলিয়া গিয়াছেন।^১

ভাষ্যকার প্রথমতঃ সব্যভিচার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াই সব্যভিচার নামক হেতুভাঙ্গের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। কারণ, তাহাও বুঝান যায় এবং এখানে তাহাও বুঝাইতে হয়। শব্দে নিত্যত্বের অনুমানে অস্পর্শকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা সব্যভিচার হেতুভাঙ্গ। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইবার জন্ত ঐ স্থলে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং যাহাতে অস্পর্শ নাই অর্থাৎ যাহাতে স্পর্শ আছে, তাহা অনিত্য, যেমন কুন্ত—এইরূপে কুন্তকে বৈধৰ্ম্ম্যদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বৈধৰ্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য এবং তদনুসারে পরে বৈধৰ্ম্ম্যোপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাৎপৰ্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের উদাহরণ-বাক্যের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন যে, অনিত্য কুন্ত স্পর্শবিশিষ্ট দেখা যায়, ইহাই ভাষ্যার্থ বুঝিতে হইবে। কারণ, বৈধৰ্ম্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে যেখানে যেখানে সাধ্য নাই, সেই সমস্ত স্থানে হেতু নাই, ইহাই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকার কিন্তু বৈধৰ্ম্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেখানে সাধ্য নাই, এইরূপ কথাই পূৰ্বে বলিয়া আসিয়াছেন; তিনি এখানেও তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিশেষ মতটি পরবর্তী সকলেই উপেক্ষা করিলেও উহা যে তাঁহার মত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাৎপৰ্য্যটীকাকারও পূৰ্বে ভাষ্যকারের ঐ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ভাষ্য ব্যাখ্যায় তাঁহার নিজ মতানুসারে অন্য-রূপে ভাষ্য-সন্দর্ভের যোজনা কেন করিয়াছেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। ভাষ্যকারের মতানুসারে ঐরূপ যোজনা নিষ্ফল ও ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, পরে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেও যেখানে যেখানে অস্পর্শ হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই নিত্যত্ব নাই, যথা কুন্ত—এইরূপ অর্থই ঐ স্থলে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার ঐ ভাবেই বৈধৰ্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (নিগমনসূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

প্রদর্শিত স্থলে ভাষ্যকার শেষে আত্মা প্রভৃতি সাধৰ্ম্ম্যদৃষ্টান্তেও ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধৰ্ম্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে হেতুর নাম সাধৰ্ম্ম্য হেতু। ভাষ্যকার মহৰ্ষিপ্রোক্ত সাধৰ্ম্ম্যহেতুবাক্যের লক্ষণ-

১। তেন ব্যাখ্যাপ্রবন্ধি তদ্বিশদ্যনান্যিকরনোক্ত্য ন পৌনরুক্ত্যং।—সিদ্ধান্ত-লক্ষণ-বীথি, জাযদীপ্তি।

সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া তদনুসারে এখানে বাদী ‘অস্পর্শত্বাৎ’ এইরূপ সাধন্যাহেতুবাক্য প্রয়োগ করিলেও ঐ অস্পর্শ পদার্থ নিত্যত্বের ব্যতিচারী, ইহা দেখাইয়াছেন। কলকথা, ঐ স্থলে অস্পর্শ পদার্থ সাধন্যাহেতুরূপেই গৃহীত হউক, আর বৈধর্ম্যাহেতুরূপেই গৃহীত হউক, উহা ঐ স্থলে বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যতিচারী বলিয়া উহাতে সাধ্যসাধনত্ব নাই, সুতরাং উহাতে হেতুর লক্ষণ না থাকার উহা ঐ স্থলে অহেতু, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যকার যে সাধ্যসাধনত্বকেই হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিতেন, ইহা এখানে তাঁহার কথায় পাওয়া যায়। এবং সাধ্যের ব্যতিচারী হইলে ঐ সাধ্যসাধনত্ব থাকে না, ইহাও এখানে তাঁহার কথায় পাওয়া যায়। মহাবীর হেতুবাক্যের লক্ষণসূত্রেও সাধ্যসাধনত্বই হেতুপদার্থের লক্ষণ, ইহা স্মৃতিত হইয়াছে। যে যে ধর্ম থাকিলে ঐ সাধ্যসাধনত্ব থাকে, সেই সেই ধর্মগুলি চিন্তা করিয়া তাহারই উল্লেখ করতঃ পরবর্তী জ্ঞানচাৰ্য্যগণ হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হেতুভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যায় সেই সকল কথা বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত স্থলে অস্পর্শত্ব অনৈকান্তিক হইলেই সূত্রানুসারে সব্যতিচার হইতে পারে। এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে সূত্রোক্ত অনৈকান্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া নিত্যত্বের অনুমানে অস্পর্শত্ব অনৈকান্তিক, ইহাও বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, নিত্যত্ব একটি ‘অন্ত’, অনিত্যত্ব একটি অস্ত। এখানে ‘অন্ত’ শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। তार्কিকরক্ষাকার বরদরাজ হেতুভাস প্রস্তাবে অনেকান্ত শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,— “একত্রান্তো নিশ্চয়ো ব্যবহৃতির্নির্ভীতিঃ”। সেখানে টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, অন্ত শব্দ নিশ্চয়বাচক, সুতরাং উহার দ্বারা ব্যবহৃত বা নিয়মরূপ লাক্ষণিক অর্থই এখানে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, কোন এক পক্ষে বাহার অন্ত অর্থাৎ নিয়ম নাই, তাহাই অনেকান্ত। অনেকান্ত, অনৈকান্ত এবং অনৈকান্তিক—এই ত্রিবিধ প্রয়োগই ঐ অর্থে দেখা যায়। মহাবীর গৌতম এবং ভাষ্যকারও অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা অনেকান্ত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। তार्কিক-রক্ষাকার ও মল্লিনাথের ব্যাখ্যানুসারে এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত অন্ত শব্দের ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, ভাষ্যকার এখানে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্মকেই অন্ত বলিয়াছেন। উদ্যোতকরও তাহাই বলিয়াছেন। অন্ত শব্দের নিশ্চয় অর্থ থাকিলেও এখানে সেই অর্থ অথবা নিয়ম অর্থ সম্ভব হয় না। উদ্যোতকর লিখিয়াছেন,— “একদ্বিরস্তে নিয়ত ঐকান্তিকঃ”। অর্থাৎ কোন একটিনাত্র অন্তে বাহা নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ, তাহাই ঐকান্তিক। কলকথা, ভাষ্যকার ও উদ্যোতকর এখানে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মদ্বয়কেই অন্ত বলিয়াছেন। অন্ত শব্দের ‘ধর্ম’ অর্থ অভিধানেও পাওয়া যায়। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়কে অথবা কোন পদার্থ এবং তাহার অভাবরূপ দুইটি ধর্মকেই দার্শনিক ভাষায় প্রাচীনগণ অন্ত শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করিতেন। জৈন দার্শনিক দিগম্বর সম্প্রদায় অনেকান্তবাদী নামে প্রসিদ্ধ। তাহার বস্তুমাত্রকেই অনেকান্ত বলিতেন। সকল পদার্থেই কথঞ্চিৎ অন্তিত্ব, নান্তিত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম থাকে, ইহা তাহাদিগের সিদ্ধান্ত। এ জন্ত তাহাদিগের মত “জ্ঞানবাদ” নামেও প্রসিদ্ধ। জ্ঞানদীপিকা নামক জৈন জ্ঞানগ্রন্থের শেষে এই অনেকান্ত-বাদের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহাতে

“অনেকে অস্তা ধর্ম্মাঃ” এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। সুতরাং ভাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে প্রাচীন কালে অস্ত বলা হইত, ইহা বুঝা যায়। প্রকৃত স্থলে ভাব্যকারও সেই অর্থেই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে অস্ত বলিয়াছেন। অস্পর্শত্ব পদার্থ নিত্য পদার্থেও আছে এবং অনিত্য পদার্থেও আছে; সুতরাং অস্পর্শত্ব নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি অস্তে অর্থাৎ দুইটি পক্ষেই আছে। ভাব্যকার বলিয়াছেন—“উভয়াস্তব্যাপকত্বাৎ”। ঐ কথা দ্বারা উভয় অস্তের আধারেই আছে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। উভয় অস্তের সকল আধারেই আছে, ইহা ভাব্যকারের বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা এখানে অসম্ভব। তাৎপর্য্যটীকারকারও বার্তিকের ব্যাখ্যায় অনৈকান্তিকের চরম ব্যাখ্যা বলিয়াছেন,—“উভয়পক্ষগামী”। সুতরাং তিনিও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ পক্ষকেই অনৈকান্তিক শব্দের অন্তর্গত অস্ত শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

মূলকথা, যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মরূপ এক পক্ষেই নিয়মবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কেবল সাধ্যধর্ম্মযুক্ত স্থানেই থাকে, সাধ্যধর্ম্মশূন্য কোন স্থানেই থাকে না, সেই পদার্থই সাধ্যধর্ম্মের ঐকান্তিক, তাহাই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য। যে পদার্থ ইহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা সাধ্যধর্ম্মের আধারেও থাকে, সাধ্যধর্ম্মশূন্য স্থানেও থাকে, তাহাই ভাব্যকারের মতে অনৈকান্তিক, তাহাই সব্যভিচার বা ব্যভিচারী। যে পদার্থ কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, সাধ্যধর্ম্মযুক্ত স্থানে থাকে না, তাহা বিরুদ্ধ। তাহাকে ভাব্যকার সব্যভিচার বলেন নাই। মহর্ষি হৃত্রেও অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা ভাব্যকারের ব্যাখ্যামুসারে তাহা বুঝা যায় না। মহর্ষি বিরুদ্ধ নামক পৃথক্ হেতুভাসও বলিয়াছেন। পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িক বিরুদ্ধ হেতুকে সব্যভিচারও বলিয়াছেন। ভাব্যকার সব্যভিচারের কোন প্রকার-ভেদ বলেন নাই।

হেতুকে সব্যভিচার বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার নিশ্চয় হইলে, তাহাতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মিতে পারে না; সুতরাং সেখানে ঐ হেতু সাব্যের সাধন হয় না; তাই উহাতে সেখানে সাধ্যসাধনত্বরূপ হেতুলক্ষণ না থাকায় উহা হেতুভাস। মহর্ষি এই যুক্তি অনুসারে সব্যভিচারকে হেতুভাস বলায় তাঁহার মতে হেতুতে সাধ্যধর্ম্মের অব্যভিচারই ব্যাপ্তি, ইহা বুঝা যায় এবং এই হৃত্রের দ্বারা ঐ অব্যভিচার বা ঐকান্তিকত্বকেই তিনি ব্যাপ্তিপদার্থরূপে হৃচনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। মহর্ষি গোতম প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে যে হেতু-বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তিনি ব্যাপ্তি পদার্থের হৃচনা করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের কথা সেখানেই বলা হইয়াছে। মহর্ষি জ্ঞানহৃত্রে অন্তত্বও অব্যভিচার শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। (২অ°, ২আ°, ১৫।১৭ হৃত্র দ্রষ্টব্য)। সেখানে তাঁহার কথিত হেতুতে ব্যভিচার নাই, ব্যাপ্তিই আছে, ইহা দেখাইতেই অব্যভিচার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার “ব্যভিচারাদহেতুঃ” (৪অ°, ১আ°, ৫হৃত্র) এই হৃত্রের দ্বারা ব্যভিচার থাকিলে যে হেতু হয় না, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাহা হইলে হেতুতে অব্যভিচার থাকা আবশ্যক, ইহা বুঝা যায়। ঐ অব্যভিচার পদার্থ যদি ব্যভিচারের অভাবই মহর্ষির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও উহাকেই তিনি ব্যাপ্তি বলিয়াছেন

অর্থাৎ এই অব্যভিচার কথার দ্বারাই তিনি ব্যাপ্তিলক্ষণ সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। ব্যভিচারের অভাবরূপ অব্যভিচারই যে ব্যাপ্তি পদার্থ, ইহা পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িকও বলিয়াছেন। যদিও গদ্যেশ এবং তদ্ব্যবহারী নৈয়ায়িকগণ অব্যভিচারিত্বরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণ গ্রহণ করেন নাই, তাহাপি তাঁহারা ব্যাপ্তির যে নিরূপিত স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাই যদি মহর্ষিহুত্রোক্ত অব্যভিচার পদার্থ হয় অর্থাৎ মহর্ষি যদি তাহাকেই অব্যভিচার শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়া থাকেন, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে আর তাহাদিগেরই বা আপত্তি কি? গদ্যেশ অনৌপাদিকরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের বৈরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরিস্কার করিয়াছেন, অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তিলক্ষণেরও ঐরূপ ব্যাখ্যা করা যাইবে না কেন? মহর্ষিহুত্রোক্ত অব্যভিচার শব্দকে পারিভাষিক বলিলেও উহার ঐরূপ একটা ব্যাখ্যা করা যায়। পরন্তু গদ্যেশ ব্যাপ্তির বহুবিধ লক্ষণ বলিলেও শেষে ব্যাপ্ত্যনুগম গ্রহে তাঁহার কথিত কোন এক প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই লাঘববশতঃ অহুমিতির হেতু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেখানে তিনি ব্যভিচারের অভাবকে অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তি না বলিলেও যাহাকে অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তি বলিয়াছেন, মহর্ষিহুত্রোক্ত অব্যভিচার শব্দের দ্বারা তাহাও বুঝা যাইতে পারে, তাহাও সূচিত হইতে পারে। পরন্তু গদ্যেশের মত স্বীকার না করিয়া কোন নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সাধ্যশূন্য স্থানে অবর্ত্তমানতারূপ ব্যাপ্তিকেই অর্থাৎ ব্যভিচারের অভাবরূপ ব্যাপ্তিকেই লাঘববশতঃ সর্বত্র অহুমিতির প্রয়োজক বলিয়াছেন। ব্যাপ্ত্যানুগমের টীকায় মণ্ডানাথ তর্কবাগীশ এবং কেবলাধ্বন্যহুমান-দীপ্তির শেষে রঘুনাথ শিরোমণি ঐ মতের উল্লেখপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি অব্যভিচার শব্দের দ্বারা ঐ মতেরও সূচনা করিতে পারেন। ফলকথা, জ্ঞানসূত্রে ব্যাপ্তির কোন কথা নাই, ব্যাপ্তিবাদ নব্য নৈয়ায়িকদিগেরই উদ্ভাবিত, এইরূপ মত প্রকাশ নিতান্তই অজ্ঞতার ফল। যে মহর্ষি পঞ্চাবর জ্ঞানবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, হেতুভাস নিরূপণ করিয়াছেন, সব্যভিচার হেতু সাধ্যসাধন নহে, উহা হেতুভাস, অব্যভিচার হেতুই সাধ্যসাধন, ইহা বলিয়াছেন, হেতু পদার্থে সাধ্য পদার্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্ত উদাহরণ-বাক্যকে তৃতীয় অবয়বরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ব্যাপ্তি পদার্থ জানিতেন না বা জানিতেন না, অথবা জ্ঞানসূত্রে তাহার কিছুমাত্র সূচনা করেন নাই, ইহার জ্ঞান অদ্বৈত কথা আর কি হইতে পারে? মহর্ষি গোতম পঞ্চমাধ্যায়ে ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্যা ও বৈধর্ম্যা অবলম্বন করিয়া বা অন্তরূপে যত প্রকার অসম্বন্ধের হইতে পারে, সেগুলিকে জাতি নামে পরিভাষিত করিয়া তাহাদিগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন এবং সেগুলি অসম্বন্ধের কেন, তাহাও সেখানে বলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি ঐগুলি পড়িয়া গোতমের ব্যাপ্তিবিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার সর্বাগ্রে গুরু-শ্রদ্ধা করিয়া জ্ঞানশাস্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। মূলকথা, বুঝিতে হইবে যে, অহুমানের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়ই ব্যাপ্তি পদার্থ জানিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি পদার্থের প্রকাশ করিতেন। যে ব্যাপ্তি অহুমানের প্রধান অঙ্গ, সূত্রাং বাহা অনাদিসিদ্ধ, তাহা কি ঋষিগণের অজ্ঞাত বা অম্লক থাকিতে পারে? সাংখ্যসূত্রে পঞ্চশিখাচার্যের ব্যাপ্তি-

নিম্নে মতের উল্লেখ আছে। ৫ অং। ৩২। পঞ্চশিখ অতি প্রাচীন সাংখ্যচার্য। মহাভারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও তাঁহার নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে ব্যাপ্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাপ্তি পদার্থ তাঁহার পূর্বাচার্যগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাংখ্যগুরু কপিলও ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়াছেন। সাংখ্যের ব্যাপ্তিলক্ষণ-সূত্রে ব্যাপ্তি শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়^১। আবার অস্ত্র সূত্রে ব্যাপ্তি অর্থে সম্বন্ধ ও প্রতিবন্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়^২। ব্যাপ্তি শব্দ না দেখিলেই যে সেই শাস্ত্রে বা গ্রন্থে ব্যাপ্তি নাই, ব্যাপ্তি জানিতেন না বা ব্যাপ্তি বলেন নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইহা নিতান্তই অজ্ঞতার কল। প্রাচীন কালে ব্যাপ্তি অর্থে অব্যভিচার, অবিনাভাব, প্রতিবন্ধ, সম্বন্ধ, সময়, নিয়ম প্রভৃতি বহু শব্দের প্রয়োগ হইত। বৌদ্ধ ছায় ও জৈন ভাষ্যের গ্রন্থেও ব্যাপ্তি অর্থে অনেক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং ব্যাপ্তি শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও ব্যাপ্তি অর্থে অস্ত্রান্ত্র শব্দের ছায় ব্যাপ্তি শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যে ব্যাপ্তি অর্থে 'সময়' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কন্দলীকার ত্রীধর উহার ব্যাখ্যায় ব্যাপ্তি-বোধক অবিনাভাব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তিনি ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব ও অব্যভিচার শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ 'অবিনাত' শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (প্রশস্তপাদভাষ্যে অহুমান নিরূপণ দ্রষ্টব্য)। কণাদ-সূত্রে "প্রসক্তি" শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি পদার্থ সূচিত হইয়াছে^৩।

বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব বলিতেন, গবেষণ প্রভৃতি ঐ অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের খণ্ডন করিলেও তাহাতে ব্যাপ্তি পদার্থ খণ্ডিত হয় নাই। ব্যাপ্তির বাহ্য নির্দেশ লক্ষণ হইবে, তাহাকেও কেহ অবিনাভাব শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন। পারিতোষিক শব্দ প্রয়োগে সকলেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। সূত্রাং প্রশস্তপাদ ও কন্দলীকার ত্রীধর অবিনাভাবকেও ব্যাপ্তি বলিতে পারেন। ভাষ্যকার বাস্তবায়নও ব্যাপ্তি বুঝাইতেই অবিনাভাববৃত্তি অর্থাৎ অবিনাভাবসম্বন্ধ বলিয়াছেন (২।২।২ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ঐ অবিনাভাবসম্বন্ধই ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। উহাকেই ভাষ্যকার অহুমান লক্ষণ-সূত্র (৫) ভাষ্যে বলিয়াছেন—লিপ্ত ও লিপ্তীর সম্বন্ধ। সূত্রাং ভাষ্যকার ব্যাপ্তির কোন কথা বলেন নাই, ইহাও সত্য কবী নহে। ঐ লিপ্ত ও লিপ্তীর সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনগণ সংক্ষেপে উহা বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়া ঐ লিপ্ত ও লিপ্তীর সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল সম্বন্ধ শব্দের দ্বারাও অনেক প্রাচীন আচার্য্য ব্যাপ্তি পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাস্তবায়নও তাহা করিয়াছেন

১। নিম্নতর্কসাধিতানুভবোক্তরূপ বা ব্যাপ্তিঃ। ৫।২২।

২। প্রতিবন্ধবৃত্তঃ প্রতিবন্ধজাননমুদ্যানং। ১।১০০।

সম্বন্ধভাবানুদ্যানং। ৫।১১।

৩। প্রসক্তিপূর্বকস্বাক্ষরোক্ত। অ।১।১০।

(২।১।৫১ সূত্রভাষ্য ১) শব্দ-ভাষ্যে অনুমানলক্ষণে “জ্ঞাতসম্বন্ধস্ত” এই কথার দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের জ্ঞানই বলা হইয়াছে। সেখানে পার্থসারথিমিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কি? অত্র সম্প্রদায় বে সকল সম্বন্ধ বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না; তাহা বলিলে দোষ হয়। তাই ভট্টকুমারিল প্লোকবার্তিকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, — “সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাহত্র লিঙ্গ-ধর্মস্ত লিঙ্গিনা।”—অনুমানপরিচ্ছেদ, ৪। ভাষ্যকার বাৎস্তানোল্ল লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধও ঐ ব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে। পার্থসারথিমিশ্র কুমারিলের ব্যাপ্তি পদার্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—নিয়ম। বস্তুতঃ নিয়ম শব্দও ব্যাপ্তি অর্থে প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও ব্যাপ্তি শব্দের জায় ব্যাপ্তি অর্থে নিয়ম শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (গঙ্গেশের ব্যাপ্তিসিদ্ধান্ত-লক্ষণ-দীপ্তি দ্রষ্টব্য)। জায়সূত্রেও ব্যাপ্তি অর্থে নিয়ম শব্দের প্রয়োগ আছে (৩২।১।৬৮।১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সেই সকল স্থলে ইহা আরও পরিষ্কৃত হইবে।

কলকথা, ব্যাপ্তি অনুমানের প্রধান অঙ্গ। ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত কোন মতেই অনুমিতি হইতে পারে না। অনুমান বুঝিতে হইলে প্রথমেই ব্যাপ্তি বুঝা আবশ্যক। সূত্রগ্রন্থ অনুমানতত্ত্বের উপদেশক সকল আচার্য্যই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। ঋষিগণ হইতে অনুমানবাদী সকল আচার্য্যই শিষ্যদিগকে ব্যাপ্তির বিস্তৃত উপদেশ করিয়াছেন। ঋষিগণ সূত্রগ্রন্থে সংক্ষেপে তাহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। পরে ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্রমে তাহারই বিস্তৃতি হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগের সূচিত্তিত ও শিষ্যদিগকে উপদিষ্ট তত্ত্বগুলি সুবিস্তৃত গ্রন্থের দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং বহু বিচারের ফলে ক্রমে ঐ সকল তত্ত্ব বহু মতভেদ হইয়াছে; তাহা অবশ্যই হইবে। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিলেও লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির চরম কারণবস্তুতঃ প্রধান অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। কেহ ঐ পরামর্শরূপ জ্ঞানবিষয় হেতুকেই অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ পরামর্শ গ্রন্থে ঐ সকল মত খণ্ডন করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমানপ্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু অনুমানচিন্তামণির প্রথমে গঙ্গেশ লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমিতির কারণ, এই কথা বলিয়াছেন। গঙ্গেশের পরগ্রন্থ দেখিয়া ঐ লিঙ্গপরামর্শ শব্দের দ্বারা লিঙ্গে অর্থাৎ হেতুতে পরামর্শ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান—এইরূপ অর্থ বুঝা হয় বটে, কিন্তু গঙ্গেশ ব্যাপ্তিজ্ঞান না বলিয়া লিঙ্গপরামর্শ শব্দ প্রয়োগ কেন করিয়াছেন, তাহা চিন্তনীয়। গঙ্গেশ প্রথমে কি উদ্যোতকরের মতানুসারেই ঐ কথা বলিয়াছেন? পরে পূর্বপক্ষনিরাসক বিচারের ফলে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? চরম কারণ কারণ হইতে পারে না, এই মতই সংগত মনে করিয়াছেন? অথবা তিনি ব্যাপ্তিজ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ শব্দের দ্বারাও উল্লেখ করিতেন? শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়াই ঐ বিরোধ ভঞ্জন করা হইয়া থাকে। কিন্তু নৈয়ায়িক গ্রন্থকারগণ যে কোন কোন স্থলে মতান্তর আশ্রয় করিয়াও বিরুদ্ধবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও ত দেখা যায়। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেও তাহা পাওয়া যাইবে। টীকাকার মধুরানাথ প্রভৃতিও ত কোন কোন স্থলে “ইদঞ্চ প্রাচীনমতানুসারেণ, ইদমাপাততঃ” ইত্যাদি কথাও

লিখিয়াছেন।^১ ফলকথা, অত্র প্রকারে ঐ বিরোধ ভঞ্জন করা যায় কি না, স্ববীৰ্ণ চিন্তা করিবেন। অহুমান-স্বত্র-ভাষ্যে এই তাৎপৰ্য্যই উহা চিন্তনীয় বলিয়াছি। সেখানে গদ্যেশের চরম সিদ্ধান্তের অপলাপ করি নাই। এইরূপ কেহ কেহ মনকেই অহুমিত্তির করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরামর্শদীপিত্তে রঘুনাথ শিরোমণি ঐ মতের আপত্তি নিরাস করিয়া সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, পরবর্তী কালে বহু ধীমান ব্যক্তির বহু বিচারের ফলে অহুমান বিষয়ে ঐরূপ অবাস্তব বহু মতভেদ হইলেও অহুমানাপ ব্যাপ্তি প্রকৃতি মূল পদার্থ বিষয়ে কোন বিবাদ হয় নাই। উহা স্থচিরকাল হইতেই ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে। নচেৎ অহুমানতত্ত্বের আলোচনাই হইতে পারে না।

এখন প্রকৃত বিষয়ে অবশিষ্ট বক্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি। পরবর্তী স্মারচাৰ্য্যগণ এই সব্যভিচার নামক হেত্বভাসকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। (১) “সাধারণ” সব্যভিচার, (২) “অসাধারণ” সব্যভিচার, (৩) “অনুপসংহারী” সব্যভিচার। ঐহারা সব্যভিচারের এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ সাধ্য ও সাধ্যাভাবের কোন একটি পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই ঐকান্তিক। সেই ঐকান্তিকের বিপরীত হইলেই তাহা অনৈকান্তিক, ইহাই অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং যে ভাবেই হউক, যে হেতু পূর্বোক্ত কোন একটি পক্ষেই নিয়ত নহে, তাহাকে অনৈকান্তিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে যে হেতু সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে, তাহা সাধারণ অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার। কারণ, ইহা সাধ্যযুক্ত এবং সাধ্যশূন্য, এই উভয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম। বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হইলে ঐ সাধারণ ধর্মের জ্ঞানবশতঃ ঐরূপ স্থলে সাধ্যসংশয় হয়। ভাষ্যকার এই সাধারণ সব্যভিচারেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে হেতু সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে না, কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, তাহাকেও সাধারণ সব্যভিচার বলিয়াছেন। যেমন গোত্বের অহুমান করিতে অশ্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাও ঐ মতে সাধারণ সব্যভিচার হইবে। প্রাচীন মতে কিন্তু ইহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বভাস হইবে।

যে হেতু সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত স্থানেও থাকে না, সাধ্যশূন্য বলিয়া নিশ্চিত কোন স্থানেও থাকে না, তাহা অসাধারণ সব্যভিচার। যেমন শব্দে নিত্যত্বের অহুমানে শব্দত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা অসাধারণ সব্যভিচার হইবে। কারণ, শব্দত্ব শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না। শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, তাহা অহুমানের পূর্বে অনিশ্চিত। সুতরাং শব্দত্ব নিত্য বলিয়া নিশ্চিত আত্মাদি পদার্থে এবং অনিত্য বলিয়া নিশ্চিত ঘটাদি পদার্থে না থাকায় উহা নিত্যত্ব অথবা অনিত্যত্বের কোন একটি পক্ষে তখন নিয়ত বলা যায় না। তাহা হইলে ঐ স্থলে শব্দত্বকে অনৈকান্তিক বলা যায়। ঐকান্তিক না হইলে তাহাকে তখন অনৈকান্তিকই বলিতে হইবে। পূর্বোক্ত স্থলে শব্দত্ব অসাধারণ অনৈকান্তিক। বিশেষ ধর্মনিশ্চয় না হইলে ঐ শব্দত্বরূপ অসাধারণ ধর্মজ্ঞান ঐ স্থলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মায়। ঐ স্থলে

১। ব্যাপ্তিগ্রহোপাধ্বনাধুনা, বিশেষব্যাপ্তি মাধুনা প্রকৃতি ঐহা।

শব্দে নিত্যত্বের অল্পমিতি জন্মে না। (সংশয়-সূত্র-টীকায় দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী অনেক নব্য নৈয়ায়িকের মতে কেবল সাধ্যযুক্ত স্থানে না থাকিলেই সেই হেতু ঐ অসাধারণ সব্যভিচার হইবে। পূৰ্ব্বোক্ত স্থলে শব্দই নিত্যরূপে সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থে না থাকায় অসাধারণ সব্যভিচার হইবে।

যে ধর্ম সর্বত্র থাকে, তাহার অভাবই নাই, তাহাকে কেবলান্বয়ী ধর্ম বলে। যে ধর্মীতে অল্পমান করিতে হইবে, সেই ধর্মী যদি কোন কেবলান্বয়ী ধর্মযুক্তরূপে সেখানে ধর্মী হয়, তাহা হইলে সেই স্থলীয় যে কোন হেতু অল্পপদংহারী নামক সব্যভিচার হইবে। যেমন কেহ বলিলেন,—সমস্তই নিত্য, যেহেতু সমস্ত পদার্থই কোন না কোন শব্দের বাচ্য। এখানে সমস্তরূপে কেবলান্বয়ী ধর্মযুক্তরূপে সমস্ত পদার্থই অল্পমানের ধর্মী হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত পদার্থেই নিত্য সাধ্যের সন্দেহ রহিয়াছে। কোন স্থানেই ঐ স্থলীয় হেতুতে নিত্য সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় না থাকায় ঐ হেতু ব্যভিচারী। বাহ্য সাধ্য ও তাহার অভাবরূপ কোন একটি পক্ষে নিরমবদ্ধ নহে, তাহাই যখন অনৈকান্তিক, তখন পূর্বোক্ত স্থলে সমস্ত পদার্থে নিত্য সাধনে প্রযুক্ত হেতুও অনৈকান্তিক। উহার নাম অল্পপদংহারী। পরবর্তী অনেক নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে পূর্বোক্ত কেবলান্বয়ী ধর্ম সাধ্যরূপে অথবা হেতুরূপে গ্রহণ করিলে সেখানে ঐ হেতু অল্পপদংহারী সব্যভিচার হইবে। এই সকল বিষয়ে পরবর্তিগণ ভূরি চর্চা করায় অনেক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল মতের বিশদ আলোচনা দেখিতে হইলে এবং এ বিষয়ে অজ্ঞাত মতভেদ জানিতে হইলে গঙ্গেশের তত্ত্ব-চিন্তামণি এবং রঘুনাথের দীপ্তি এবং জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে কেবল প্রসিদ্ধ মতভেদগুলিই উল্লিখিত হইল। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণানুসারে কিন্তু অনৈকান্তিকের পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিভাগ পাওয়া যায় না ॥ ৫ ॥

সূত্র । সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥৩॥৪৭॥

অনুবাদ । সিদ্ধান্তরূপে কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক, তাহা বিরুদ্ধ, (বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস)।

ভাষ্য । তৎ বিরুদ্ধকীতি তদ্বিরোধী । অভ্যুপেত্য সিদ্ধান্তং ব্যাহন্তীতি । যথা—সোহয়ং বিকারো ব্যক্তেরপৈতি নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ, ন নিত্যো বিকার উপপদ্যতে, অপেতোহপি বিকারোহস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ, সোহয়ং নিত্যত্বপ্রতিষেধাদিতিহেতুর্ব্যক্তেরপেতোহপি বিকারোহস্তীত্যনেন অসিদ্ধান্তেন বিরুদ্ধ্যতে । কথং ? ব্যক্তিরাত্মলাভঃ, অপায়ঃ প্রচ্যুতিঃ, যদ্যাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতো বিকারোহস্তি নিত্যত্বপ্রতিষেধো নোপপদ্যতে,

যদ্যন্তেরপেতস্তাপি বিকারস্বাস্তিত্বং তৎ খলু নিত্যত্বমিতি, নিত্যত্বপ্রতিষেধো নাম বিকারস্বাত্ত্বলাভাৎ প্রচ্যুতেরূপপত্তিঃ । যদাত্ত্বলাভাৎ প্রচ্যবতে তদনিত্যং দৃষ্টং, যদস্তি ন তদাত্ত্বলাভাৎ প্রচ্যবতে । অস্তিত্বকাত্ত্বলাভাৎ প্রচ্যুতিরিতি বিরুদ্ধাবেত্তৌ ধর্মৌ ন সহ সম্ভবত ইতি । সোহয়ং হেতুর্বাং সিদ্ধান্তমাস্তিত্য প্রবর্ততে তমেব ব্যাহস্তীতি ।

অনুবাদ । তাহাকে ব্যাহত করে, এই অর্থে 'তদ্বিরোধী' । বিশদার্থ এই যে, স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করে, অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক বা বাধক হয়, তাহাই বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস ।

(উদাহরণ) যেমন সেই এই বিকার (সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত) ব্যক্তি হইতে (আত্মলাভ হইতে) অর্থাৎ ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম হইতে প্রচ্যুত হয় অর্থাৎ চিরকাল ঐ সকল বিকার পদার্থের ঐ ত্রিবিধ পরিণাম থাকে না ; কারণ, নিত্যত্ব নাই (অর্থাৎ) বিকার নিত্য বলিয়া উপপন্ন হয় না । প্রচ্যুত হইয়াও অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিকার-পদার্থ আত্মলাভ বা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও থাকে ; কারণ, বিনাশ নাই অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিকার পদার্থগুলির বিনাশ না থাকায় উহারা আত্মলাভ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও উহাদিগের অস্তিত্ব থাকে । সেই এই (অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে পাতঞ্জল সিদ্ধান্তবাদীর গৃহীত) নিত্যত্বের অভাবরূপ হেতু, আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার থাকে—এই নিজ সিদ্ধান্তের সহিত বিরুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতু ঐ নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হইয়াছে ।

(প্রশ্নপূর্বক ইহা বুঝাইতেছেন) । (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? (উত্তর) ব্যক্তি বলিতে আত্মলাভ, অপায় বলিতে প্রচ্যুতি । যদি আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার থাকে, (তাহা হইলে) নিত্যত্বের নিষেধ উপপন্ন হয় না । (কারণ) আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকারের যে অস্তিত্ব, তাহাই ত (তাহার) নিত্যত্ব । নিত্যত্বের নিষেধ বলিতে বিকারের আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতির উপপত্তি, অর্থাৎ আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি হওয়াই বিকারের অনিত্যত্ব । বাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা অনিত্য দেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যে বস্তুর আত্মলাভ হইতে ভ্রংশ ঘটে, তাহা অনিত্য বলিয়াই নিশ্চিত । বাহা থাকে অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব চিরকালই থাকিবে, তাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয় না । অস্তিত্ব এবং আত্ম-

লাভ হইতে প্রচ্যুতি, এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম মিলিত হইয়া থাকে না অর্থাৎ একাধারে থাকে না। সেই এই হেতু অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিত্যস্বাভাবরূপ হেতু, যে সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বিকারের অস্তিত্ব বা সদাতনরূপ যে সিদ্ধান্তকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত) হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তকেই অর্থাৎ বিকার-পদার্থগুলির চিরকাল অস্তিত্বরূপ সেই নিত্য সিদ্ধান্তকেই ব্যাহত করিয়াছে।

টিপ্পনী। স্বত্রোক্ত সিদ্ধান্ত শব্দের দ্বারা এখানে প্রকৃত সিদ্ধান্তই বুঝিতে হইবে না। যে বাদী বাহ্য সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন, সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তই বুঝিতে হইবে। ফলকথা, সিদ্ধান্তের স্বীকারই এখানে স্বত্রকারের বিবক্ষিত। স্বত্রকার এই জ্ঞাত 'সিদ্ধান্ত-বিরোধী' এই কথা না বলিয়া সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া 'তবিরোধী' এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। অচেতন হেতু পদার্থ কোন সিদ্ধান্ত স্বীকারের কর্ত্তা না হইলেও, হেতুবাদী ব্যক্তি সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, সেই কর্ত্তব্যই তাহার প্রযুক্ত হেতুতে বিবক্ষা করিয়া মহর্ষি ঐরূপ স্বত্র বলিয়াছেন। উদ্যোতকর মহর্ষি-স্বত্রের ফলিতার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ বলিয়াছেন যে, বাহ্য স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী, তাহা বিরুদ্ধ। ঐ কথার দ্বারা বাহ্য স্বীকৃত পদার্থকে বাবিত করে অর্থাৎ স্বীকৃত পদার্থের অভাবেরই সাধন হয় এবং বাহ্য স্বীকৃত পদার্থের বিবক্ষা হয়, এই দুই প্রকার অর্থই উদ্যোতকরের বিবক্ষিত। তিনি বলিয়াছেন যে, এইরূপ স্বত্রার্থ হইলে আরও যে সকল বিরুদ্ধ হেতুভাস আছে, সেগুলিও এই স্বত্রের দ্বারা বলা হয়। এইরূপ স্বত্রার্থ না বলিলে অনেক হেতুভাস বলা হয় না, তাহাতে মহর্ষির হেতুভাস নিরূপণের ন্যূনতা থাকে। বাহ্য স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে পদার্থ স্বরূপতাই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, অথবা যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের হেতুই হয় না, অর্থাৎ বাহ্যতে স্বীকৃত সিদ্ধান্তরূপ সাধ্যপদের সাধনহই নাই; তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে উদ্যোতকর এইরূপে ভাষ্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় পূর্বপক্ষ এই যে, তাহা হইলে আর সব্যভিচার প্রভৃতি চতুর্নিধ হেতুভাস বলিবার প্রয়োজন কি? মহর্ষি-স্বত্রোক্ত বিরুদ্ধ নামক হেতুভাসের যে লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হইল, এই লক্ষণ সব্যভিচার প্রভৃতি সমস্ত হেতুভাসেই আছে; কারণ, হেতুভাস মাত্রই বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্তের অর্থাৎ সাধ্যপদের সাধনস্থ থাকে না, ঐরূপে সকল হেতুভাসই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। উদ্যোতকর এতজ্ঞতরে বলিয়াছেন যে, হেতুভাস মাত্রই এই স্বত্রোক্ত বিরুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত, অতরাং হেতুভাস মাত্রই বিরুদ্ধ, ইহা সত্য অর্থাৎ এই বিরুদ্ধরূপে হেতুভাসগুলি একই, ইহা সত্য। কিন্তু সব্যভিচার প্রভৃতি হেতুভাসে যে অন্য প্রকারে ভেদ আছে, সেই ভেদ ধরিয়াই হেতুভাসকে পঞ্চবিধ বলা হইয়াছে। যেমন প্রদেবরূপে সকল পদার্থ এক হইলেও অন্য প্রকারে ভেদ ধরিয়া প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ বলা হইয়াছে। ফলকথা, উদ্যোতকরের ব্যাখ্যাত্মসারে হেতুভাস মাত্রই বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ-সব্যভিচার বিরুদ্ধ-সাধ্যসম ইত্যাদি প্রকার নামে বিরুদ্ধবিশেষই স্বত্রোক্ত

অনৈকান্তিক প্রভৃতি শব্দের ব্যাচ। অর্থাৎ অনৈকান্তিক প্রভৃতি হেতুভাসে (১) বিরুদ্ধ এবং অনৈকান্তিক প্রভৃতির (২) কোন একটি, এই দুই ধর্মই আছে, এই জন্ত ঐগুলিতে বিরুদ্ধ নামেরও ব্যবহার হইবে। কিন্তু যে সকল হেতুভাসে অনৈকান্তিক বা সম্বন্ধিচার প্রভৃতি চারিটি ধর্মের কোন ধর্ম নাই, তাহাতে কেবল বিরুদ্ধ নামেরই ব্যবহার হইবে অর্থাৎ সেই সকল হেতুভাস কেবল বিরুদ্ধই হইবে। এই জন্তই পৃথক্ করিয়া মহাবি বিরুদ্ধ নামক হেতুভাসেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্যোতকর বেক্রপ বলিয়াছেন, ভাষ্যকারেরও তাহাই মত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, ভাষ্যকার বাদলক্ষণস্থলে 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই কথার প্রয়োজন বর্ণনায় মহাবির এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা বাদবিচারে হেতুভাসের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে। হেতুভাসনামাত্রই এই স্বত্রোক্ত বিরুদ্ধ-লক্ষণাক্রান্ত না হইলে ভাষ্যকার সেখানে এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছেন কেন ? (বাদস্থ-ভাষ্য-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার এই স্বত্রোক্ত বিরুদ্ধ নামক হেতুভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে এখানে যোগস্থ-ভাষ্যপ্রদর্শিত কোন অল্পমানকে^১ আশ্রয় করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যোক্ত বিকার শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। ঐগুলি সাংখ্যপরম্পরায় সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মূলপ্রকৃতির বিকৃতি। মূল প্রকৃতি কাহারও বিকৃতি নহে। মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই বিকৃতি; এ জন্ত উহাদিগকে বিকারও বলা হয়। ঐ বিকার পদার্থের যে ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম, এই ত্রিবিধ পরিণাম হয়, ভাষ্যকার ঐ ত্রিবিধ পরিণামকেই উহাদিগের "ব্যক্তি" বলিয়াছেন।

যোগস্থ এবং তাহার ভাষ্য বিকারের পরিণাম ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। পূর্বধর্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্মীভবের আবির্ভাবের নাম ধর্মপরিণাম। যেমন মৃত্তিকা পিওরূপে থাকিয়া ঘটরূপে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার পিওভাবে নিবৃত্তি হইয়া ঘটভাবে আবির্ভাব হইলে ধর্মপরিণাম হয়। এক লক্ষণের তিরোভাবে পরে অন্য লক্ষণের আবির্ভাব লক্ষণপরিণাম। যেমন ঘটের আবির্ভাবের পরে বে লক্ষণ থাকে, ঘটের পাক হইলে তখন ঐ লক্ষণের তিরোভাব হইয়া অন্তরূপ লক্ষণের আবির্ভাব হয়। এইরূপ কোন অবস্থাবিশেষের তিরোভাব হইয়া অন্য অবস্থার আবির্ভাব হইলে তাহাকে অবস্থাপরিণাম বলে। যেমন ঘটের নূতন অবস্থার তিরোভাব হইয়া পুরাতন অবস্থা হয় ইত্যাদি।

১। যোগস্থভাষ্যে এইরূপ একটি সম্বন্ধ দেখা যায়,—“এতৎ ত্বৈলোকাং ব্যাক্তেরূপৈতি, কস্মাৎ? নিত্য-প্রতিবেদ্যং, অপ্ততন্যান্তি বিনাশপ্রতিবেদ্যং।” (যোগস্থ, বিতৃতিপাঠ, ১৩ পৃষ্ঠার ভাষ্য)। উদ্যোতকর স্মারিবার্ত্তিকে এখানে এই সম্বন্ধটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকরের উদ্ধৃত পাঠে ‘কস্মাৎ’ এই কথাটি নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি যোগস্থভাষ্যের নাম করিয়া ঐ কথার উল্লেখ না করিলেও ভাষ্যকার যে যোগস্থ-ভাষ্য-প্রদর্শিত ঐ অল্পমানকেই লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যা দেখিলেও তাহাই মনে আসে।

প্রলয়কালে বিকারের এই ত্রিবিধ পরিণাম থাকে না। কারণ, তখন সমস্ত বিকার পদার্থই প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন প্রকৃতিরই কেবল সদৃশ পরিণাম থাকে। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত বিকার পদার্থের পূর্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণামকেই তাহাদিগের আত্মলাভ বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্য-টীকাকারের ব্যাখ্যানসারে বুঝা যায়। ভাষ্যকার “ব্যক্তি” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—আত্মলাভ। ব্যক্তি বলিতে অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব। সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সংকার্যাবাদীর মতে বস্তুর আবির্ভাবই বস্তুর আত্মলাভ, অর্থাৎ স্বরূপ লাভ। এবং প্রতি ফণেই জড় বস্তুর পূর্বোক্ত কোন প্রকার পরিণাম হইতেছে। প্রলয়কালে বিকার পদার্থ প্রকৃতিতে লীন হওয়ায় তাহাদিগের কোন প্রকার পরিণাম থাকে না। তখন তাহারা সর্বপ্রকার পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহার হেতু বলা হইয়াছে—নিত্যত্বের অভাব। ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে,—বিকার পদার্থ নিত্য বলিয়া উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, বিকার পদার্থগুলি যখন মূল প্রকৃতির জায় নিত্য নহে, তখন চিরকালই তাহাদিগের পরিণাম থাকিতে পারে না, তাহারা যখন প্রকৃতিতে লীন হইয়া মূল প্রকৃতিরূপে থাকিবে, তখন পূর্বোক্তপ্রকার ত্রিবিধ পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু তাহারা তখন পরিণামভ্রষ্ট হইলেও অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেলেও থাকিবে। তাহাদিগের অস্তিত্ব চিরকালই আছে। ইহার হেতু বলিয়াছেন—বিনাশের অভাব অর্থাৎ বিকার-পদার্থগুলির যখন একেবারে বিনাশ নাই, তখন উহার পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও থাকে।

ভাষ্যকার পূর্বোক্ত অহুমান উল্লেখ পূর্বক এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্বে যে নিত্যত্বের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা বিকারের সর্বকালে অস্তিত্বরূপ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হওয়ায় বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্বে বলা হইয়াছে, বিকারের নিত্যত্ব নাই, পরে বলা হইয়াছে, বিকারের বিনাশ নাই; সুতরাং বিকার সর্বদাই থাকে, এই সর্বদা অস্তিত্বই বিকারের নিত্যত্ব। পূর্বোক্ত নিত্যত্বাভাবরূপ হেতু, এই নিত্যত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। ফলতঃ পূর্বোক্ত এবং পরোক্ত ঐ দুইটি বাক্য পরস্পর বাধিত। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যেখানে দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মান্তে সাধ্যধর্ম্ম নাই, ইহা নিশ্চিত থাকে, সেখানেই সেই সাধ্যধর্ম্মের অনুমানে প্রযুক্ত হেতুকে ‘কালাত্যাগপদিষ্ট’ বা বাধিত বলে। যেমন ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞাশ্রুতে যে পদার্থ হেতুরূপে গৃহীত হইবে, তাহা কালাত্যাগপদিষ্ট বা বাধিত হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণের সর্ববিধ সুরাপানই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ থাকায় ঐ স্থলে সুরাতে ব্রাহ্মণ-বর্জ্য পান-ক্রিয়ার অভাবই নিশ্চিত আছে। পূর্বোক্ত স্থলে দুইটি বাক্যই পরস্পর বিরুদ্ধ এবং তুল্যবল বলিয়া একটি অপরাটিকে বাধা দিতে পারে না। এ জন্ত ঐ স্থলে কালাত্যাগপদিষ্ট বা বাধিত নামক হেতুভাষ্য হইবে না। ঐ স্থলে বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্যই হইবে।

উদ্যোতকর পরে এই স্থানের ব্যাখ্যান্তর বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং হেতুবাক্যের বিরোধ হইলেই সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেতুভাষ্য হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের এই দ্বিতীয় কন্মের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, “সেই এই বিকার আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়,” এই

প্রতিজ্ঞা “নিত্যত্বের অভাবজ্ঞাপক,” এই হেতুবাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণ, পরে বলা হইয়াছে যে, বিকার আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও থাকে। যেহেতু বিকারের একেবারে বিনাশ নাই, এই শেযোক্ত কথার দ্বারা ‘বিকার নিত্য’ ইহাই পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার অর্থ বুঝা গিয়াছে অর্থাৎ শেযোক্ত ঐ কথার দ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার ঐ অর্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিকারের নিত্যত্বই ঐ প্রতিজ্ঞার প্রতিপাদ্য হইলে তাহাতে নিত্যত্বাভাবরূপ হেতু থাকিতে পারে না; সুতরাং ঐ হলে প্রতিজ্ঞার্থ এবং হেতু পদার্থ বিরুদ্ধ হওয়ায় বিরুদ্ধ নামক হেতুভাঙ্গ হইয়াছে। ভাষ্যে “সদিস্তাস্তেন বিরুদ্ধতঃ” এই স্থলে সদিস্তাস্ত বলিতে স্বপক্ষ। তাৎপর্যটীকাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থে ভাষ্য সঙ্গম। অর্থাৎ উদ্যোতকরের শেযোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে সহজেই ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যা হয়। এই কল্পে আপত্তি এই যে, মহর্ষি প্রতিজ্ঞা-বিরোধ নামে এক প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধই তাহার অর্থ। মহর্ষি সেই প্রতিজ্ঞা-বিরোধকেই আবার বিরুদ্ধ নামক হেতুভাঙ্গ বলিবেন কিরূপে? উদ্যোতকর এতদ্বারা বলিয়াছেন যে, যেখানে ঐ বিরোধটি প্রতিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া হইবে, সেখানে উহা “প্রতিজ্ঞা-বিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। আর যেখানে ঐ বিরোধ হেতুকে আশ্রয় করিয়া হইবে, সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেতুভাঙ্গ হইবে। অর্থাৎ মহর্ষি ঐ বিরোধের আশ্রয়ভেদ বিবক্ষা করিয়াই প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ হইলে নিগ্রহস্থানও বলিয়াছেন এবং হেতুভাঙ্গও বলিয়াছেন। (৫ অং, ২ অং, ৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)। পূর্বোক্ত উদাহরণহলে যোগসূত্র-ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, বিকারের ঐকান্তিক নিত্যতা নাই এবং একেবারে যে উহাদিগের বিনাশ, তাহাও হয় না। এ অল্প উহার সর্বথা অনিত্যও নহে। সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে নিত্য পদার্থ বিবিধ; কূটস্থ নিত্য এবং পরিণামী নিত্য। যে পদার্থের কোনরূপ পরিণাম নাই, বাহ্য চিরকাল একপ্রকারই আছে ও থাকিবে, তাহাকেই বলে কূটস্থ নিত্য, তাহাই ঐকান্তিক নিত্য; যেমন চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। আর যে পদার্থের সর্বদাই কোন প্রকার পরিণাম থাকে, কোন সময়েই বাহার অল্প পদার্থে লয়ের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে বলে পরিণামী নিত্য; যেমন মূলপ্রকৃতি। মহৎ প্রভৃতি বিকারপদার্থগুলির যখন আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে, তখন তাহাদিগকে ঐকান্তিক নিত্য বলা যায় না। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের টীকায় পূর্বোক্ত স্থলে ভাষ্যকারের তাৎপর্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের জ্ঞান জগতের ঐকান্তিক নিত্যতা নাই এবং একেবারে যে সর্বদা অনিত্যতা, তাহাও নাই অর্থাৎ প্রলয়েও প্রকৃতিরূপে জগৎ থাকে, তখন জগৎ অলীক নহে। পরিণামবাদী সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি সংকার্যবাদীর মতে জগতের এই ভাবে কথঞ্চিৎ নিত্যতা এবং কথঞ্চিৎ অনিত্যতা বিরুদ্ধ নহে, কিন্তু মহর্ষি গোতম অসং-কার্যপক্ষই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্তে বাহার কোন দিন একেবারে বিনাশ হইবে না, তাহা নিত্য। বাহ্য চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাকে অনিত্যও বলিব, আবার নিত্যও বলিব, ইহা গোতম মতে সম্ভব নহে। সুতরাং বিকারকে অনিত্য বলিয়া শেষে আবার

নিত্য বলিতে গেলে, উহা বিরুদ্ধবাদ হইবে। ভাবাকার গোতম সিদ্ধান্তানুসারেই যোগস্বত্রের ব্যাখ্যাত্মক অহুমানের হেতুকে বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, যে ধর্ম্মীতে কোন পদার্থের অহুমান করা হয়, ঐ ধর্ম্মী সিদ্ধ পদার্থই থাকে। প্রতিজ্ঞাবাক্যে ঐ ধর্ম্মরূপ সিদ্ধ পদার্থের অন্তে সাধ্য পদার্থটি বলা হয়, এ জন্ত সাধ্যধর্ম্মকেই এই স্বত্রে সিদ্ধান্ত শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মকে উদ্দেশ্য করিয়া (অর্থাৎ তাহার সাধনের জন্ত) প্রযুক্ত হেতু যদি ঐ সাধ্যধর্ম্মের বিরোধী হয় অর্থাৎ যদি সাধ্যধর্ম্মের অভাবেরই সাধক হয়, তাহা হইলে উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন জলে বহির সাধনে জলকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে এবং কোন পদার্থে গোত্র ধর্ম্মের অহুমান করিতে অশ্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, ঐ জলছ এবং অশ্ব পদার্থ বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। ফলকথা, যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের সাধন না হইয়া তাহার অভাবেরই সাধন হয় অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের সহিত কোন স্থানেই মিলিত হইয়া থাকে না, সেই পদার্থ সেই সাধ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া সেই স্থলে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। প্রকরণসম বা সংপ্রতিপক্ষিত হেতু স্থলে বাদীর প্রযুক্ত হেতুই তাহার সাধ্যধর্ম্মের অভাব সাধক হয় না, প্রতিবাদীর প্রযুক্ত অথ হেতুই বাদীর সাধ্যধর্ম্মের অভাবের সাধকরূপে প্রযুক্ত হয়, সুতরাং বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস সংপ্রতিপক্ষিত হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন। নব্য নৈয়ায়িকগণও পূর্বোক্ত প্রকার বিরুদ্ধ হেতুকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন। বিরুদ্ধ হেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য, তাহাকে ঐ ভাবে বুঝিলে সাধ্যাভাবেরই সেখানে অহুমিতি হইয়া পড়ে; সুতরাং বাদীর সাধ্যানুমিতির বাধা হয়, এই জন্তই নব্যগণ ঐরূপ বিরুদ্ধ হেতুকে হেত্বাভাস বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

সূত্র। যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্ঠঃ প্রকরণসমঃ ॥৭॥৪৮॥

অনুবাদ। যে পদার্থ-হেতুক প্রকরণের চিন্তা জন্মে অর্থাৎ সংশয়ের বিষয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত একটা চিন্তা বা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, সেই পদার্থ, নির্ণয়ের জন্ত প্রযুক্ত হইলে প্রকরণসম অর্থাৎ প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস হয়।

ভাষ্য। বিমর্শার্থিষ্ঠানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবুভাবনবসিতৌ প্রকরণং,— তস্তা চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রাঙনির্ণয়াদবং সমীক্ষণং, সা জিজ্ঞাসা যৎকৃতা, স নির্ণয়ার্থঃ প্রযুক্ত উভয়পক্ষসাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্ত্তমানঃ প্রকরণসমৌ নির্ণয় ন প্রকল্পতে। প্রজ্ঞাপনত্বনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানু-পলঙ্কেরিত্যানুপলভ্যমাননিত্যধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং স্থালাদি। যত্র সমানো

ধর্মঃ সংশয়কারণং হেতুহেনোপাদীয়তে স সংশয়সমঃ সব্যভিচার এব ।
 যাতু বিমর্শস্ত বিশেষাপেক্ষিতা উভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিঃ, সা প্রকরণং
 প্রবর্তয়তি । যথা শব্দে নিত্যধর্মো নোপলভ্যতে, এবমনিত্যধর্মোহপি,
 সেয়মুভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিঃ প্রকরণচিন্তাং প্রবর্তয়তি । কথম্ ?
 বিপর্যয়ে হি প্রকরণনিবৃত্তেঃ, যদি নিত্যধর্মঃ শব্দে গৃহ্যেত, ন স্যাৎ
 প্রকরণং, যদি বা অনিত্যধর্মো গৃহ্যেত, এবমপি নিবর্তেত প্রকরণং,—
 সোহয়ং হেতুরুভৌ পক্ষৌ প্রবর্তয়ম্মতরস্ত নির্ণয়ান ন প্রকল্পতে ।

অনুবাদ । সংশয়ের বিষয় অথচ অনির্গত, এমন পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ উভয়
 ধর্মকে প্রকরণ বলে । সেই প্রকরণের চিন্তা কি না সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ব কাল
 পর্যন্ত যে আলোচনা, সেই জিজ্ঞাসা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত চিন্তারূপ জিজ্ঞাসা যৎকৃত,
 অর্থাৎ যে পদার্থপ্রযুক্ত, সেই পদার্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইলে উভয় পক্ষে
 সমানতাবশতঃ প্রকরণকে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অতিক্রম না করায়
 প্রকরণসম হইয়া নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না ।

প্রজ্ঞাপন কিন্তু অর্থাৎ এই প্রকরণসমের উদাহরণ কিন্তু—(প্রতিজ্ঞা) শব্দ
 অনিত্য, (হেতু) নিত্য ধর্মের অনুপলব্ধি জ্ঞাপক, (উদাহরণ) বাহাতে নিত্যধর্মের
 উপলব্ধি হয় না, এমন স্থানী প্রভৃতি অনিত্য দেখা যায় (অর্থাৎ এইরূপ স্থাপনায়
 যে নিত্যধর্মের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা প্রকরণসম নামক
 হেতুভাস) । যে স্থলে সমান ধর্মরূপ সংশয়ের প্রযোজক (পদার্থটি) হেতু বলিয়া
 গৃহীত হইবে, তাহা অর্থাৎ হেতু বলিয়া গৃহীত সেই সমানধর্ম সংশয়সম হওয়ার
 সব্যভিচারই হইবে, অর্থাৎ তাহা প্রকরণসম হইবে না । বাহা কিন্তু সংশয়ের
 বিশেষাপেক্ষিতা এবং উভয় পক্ষে বিশেষেব অনুপলব্ধি, তাহা প্রকরণকে প্রবৃত্ত
 করে । বিশদার্থ এই যে, যেমন শব্দে নিত্যধর্ম উপলব্ধ হইতেছে না, এইরূপ অনিত্য
 ধর্মও উপলব্ধ হইতেছে না, সেই এই উভয় পক্ষে বিশেষের অনুপলব্ধি, প্রকরণ-
 চিন্তাকে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সম্বন্ধে আলোচনারূপ জিজ্ঞাসাকে
 প্রবৃত্ত করে, (উপস্থিত করে) । (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উভয় পক্ষে
 বিশেষের অনুপলব্ধি প্রকরণচিন্তার প্রবর্তক হয় কেন ? (উত্তর) যেহেতু বিপর্যয়
 হইলে প্রকরণের নিবৃত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি নিত্যধর্ম শব্দে উপলব্ধ হইত,
 তাহা হইলে প্রকরণ অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্যরূপ দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষ

থাকিত না। অথবা যদি শব্দে অনিত্যধর্ম উপলব্ধ হইত, এইরূপ হইলেও প্রকরণ নিবৃত্ত হইত। সেই এই হেতু অর্থাৎ শব্দে নিত্যধর্মের অনুপলব্ধি এবং অনিত্যধর্মের অনুপলব্ধি উভয় পক্ষকে অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্য, এই দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে প্রবৃত্ত করতঃ অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, কি নিত্য, এইরূপ একটা চিন্তা বা জিজ্ঞাসা উপস্থিত করে বলিয়া একতরের অর্থাৎ শব্দে অনিত্য অথবা নিত্যের নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না।

টিপ্পনী। এইবার ক্রমান্বয়ে প্রকরণদ্বয় নামক হেতুভাসের নিরূপণ করিয়াছেন। প্রকরণ শব্দের অর্থ এখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। শব্দে নিত্যের সংশয় হইলে নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে নিত্য ও অনিত্য, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে। যিনি নিত্য সাধন করিতে যান, তাহার সম্বন্ধে নিত্য পক্ষ, অনিত্য প্রতিপক্ষ। আবার বিপরীতক্রমে অনিত্য পক্ষ, নিত্য প্রতিপক্ষ। বাদীর ভেদে আবার দুইটিই পক্ষ, সুতরাং ঐ দুইটিকে পক্ষ শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কনকথা, (প্রক্রিয়তে সাধ্যাত্মেনাবিক্রিয়তে) যাহা সাধ্যরূপে প্রকৃত বা অবিকৃত হয়, তাহাই এখানে প্রকরণ। কেহ শব্দে নিত্যকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ অনিত্যকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সেখানে ঐ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম প্রকরণ। উহা বিমর্শের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সংশয়ের বিষয় হইয়া যে পর্য্যন্ত ‘অনবসিত’ অর্থাৎ অনির্ণীত, সে পর্য্যন্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। সংশয়ের পরে একতর নির্ণয় হইয়া গেলে তখন আর ঐ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে না। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা নির্ণীত ধর্মকে বুঝায় না। বাদী ও প্রতিবাদীর নির্ণয় থাকিলেও মধ্যস্থের সংশয় হওয়ায় ঐ দুইটি ধর্ম সংশয়ের বিষয় হয়। বাদবিচারে মধ্যস্থ না থাকিলেও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিবার জন্য একটা সংশয় করিয়া লইতে হয়। নির্ণয় মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক না হইলেও বিচার সংশয়পূর্ব্বক, এ জন্য মহবি সর্ব্বাঙ্গে সংশয়ের পরীক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে একথা পরিষ্কৃত হইবে। স্বত্রের প্রকরণ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া ভাব্যকার শেষে চিন্তা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকরণের যে আলোচনা, তাহাই প্রকরণচিন্তা। ভাব্যোক্ত সমীক্ষণ শব্দের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন, আলোচন; আবার তাহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—জিজ্ঞাসা। ভাব্যকারও শেষে জিজ্ঞাসা বলিয়াই স্বত্রোক্ত চিন্তার বিবৃতি করিয়াছেন। এই জিজ্ঞাসা কিসের জন্য হয়? তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন—তত্ত্বের অনুপলব্ধিবশতঃ হয়। শব্দে নিত্য-ধর্মের উপলব্ধি হইলে নিত্যের নিশ্চয় হইয়া যায় এবং অনিত্য-ধর্মের উপলব্ধি হইলে অনিত্যের নিশ্চয় হইয়া যায়। কিন্তু যদি নিত্যধর্মেরও উপলব্ধি না হয় এবং অনিত্যধর্মেরও উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় হয়; সুতরাং শব্দের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়,—ইহাই এই স্থলে প্রকরণচিন্তা। নিত্য ধর্মের অনুপলব্ধিবশতঃ এবং অনিত্য ধর্মের অনুপলব্ধিবশতঃই ঐ জিজ্ঞাসা জন্মে; সুতরাং শব্দে অনিত্যত্বানুমান ঐ নিত্য-

ধর্মের অমুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা প্রকরণসম নামক হেতুভাস হইবে। উহা উভয় পক্ষেই সমান বলিয়া নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ কোন প্রকরণকে অতিক্রম করে না। এ জন্ত প্রকরণসম নামে কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণ যেমন নিশ্চায়ক নহে, তদ্রূপ উভয় পক্ষের বিশেষের অমুপলব্ধিও নিশ্চায়ক নহে। এ জন্ত ঐ বিশেষামুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহাকে প্রকরণসম নামক হেতুভাস বলা হইয়াছে। যাহা প্রকরণের তুল্য, তাহাকে প্রকরণসম বলা যায়।

তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ইহা প্রকরণসম শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র। কারণ, উভয় পক্ষে সমান বলিয়া সংশয়ের প্রয়োজক হইলেই যদি তাহা প্রকরণসম নামক হেতুভাস হয়, তাহা হইলে সব্যভিচার নামক হেতুভাসও প্রকরণসম হইয়া পড়ে। তবে প্রকরণসম শব্দের প্রকৃতার্থ কি? তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সংপ্রতিপক্ষ হেতুকেই প্রকরণসম বলে। পরবর্তী স্মার্ত্যচাৰ্য্যগণ এই প্রকরণসমকে সংপ্রতিপক্ষ এবং সংপ্রতিপক্ষিত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যে হেতুর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী অস্ত্র হেতু সং অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বাদী তাঁহার সাধ্যসাধনের জন্ত যে হেতুকে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্যের অভাব সাধনের জন্ত যদি অস্ত্র কোন হেতু গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ হেতুদ্বয়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ; এই জন্ত ঐ দুই হেতুকেই সংপ্রতিপক্ষ বলা হয়। কিন্তু যদি ঐ দুইটি হেতুর কোন হেতু দুর্বল হয় অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী যদি কোন হেতুর অস্ত্ররূপ দোষ দেখাইতে পারেন, অথবা অস্ত্ররূপ দোষের সংশয়ও জন্মাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই হেতু, অপর প্রবল হেতুটির প্রতিপক্ষ না হওয়ার, সেখানে সংপ্রতিপক্ষ হইবে না। যেখানে উভয় পক্ষের দুইটি বিরুদ্ধ হেতুই তুল্যবল বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না, কেবল সাধ্য ও তাহার অভাব বিষয়ে সংশয়ই জন্মায়, সেখানেই ঐ দুই হেতুই সংপ্রতিপক্ষ হয়। এই সংপ্রতিপক্ষের উদাহরণ নব্যগণ বৈরাগ্য^১ বলিয়াছেন, ভাব্যকার-প্রদর্শিত উদাহরণ তাহা হইতে বিশিষ্ট। ভাব্যকার “প্রজ্ঞাপনস্ত” এই স্থলে তু শব্দের দ্বারা বৌদ্ধাদি-সম্মত উদাহরণ সংগত নহে, ইহা স্মৃচনা করিয়াছেন। যাহার দ্বারা প্রজ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টি বুকাইরা দেওয়া হয়, এই অর্থে প্রজ্ঞাপন শব্দের দ্বারা এখানে উদাহরণ বুঝিতে হইবে। শব্দে অনিত্যত্বের অল্পমানে নিত্যধর্মের অমুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তখন প্রতিবাদী যদি শব্দে নিত্যত্বের অল্পমান করিতে অনিত্য-ধর্মের অমুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষের ঐ দুই হেতুই প্রকরণসম বা সংপ্রতিপক্ষ হইবে (বিরতি স্রষ্টব্য)। ফলকথা, ভাব্যকার প্রভৃতির মতে যে কোন পদার্থ প্রকরণসম হইতে পারে না। উভয় পক্ষের বিশেষ ধর্মের অমুপলব্ধিই হেতুরূপে গৃহীত হইলে তাহাই সূত্রোক্ত প্রকরণ-চিন্তার প্রবর্তক বা নিষ্পাদক হওয়ায় প্রকরণসম বা সং-

১। বাদী বলিলেন,—“শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণদ্বাং শব্দদ্বয়ং”। প্রতিবাদী বলিলেন,—“শব্দোহনিত্যঃ কার্য্যদ্বাং ঘটদ্বয়ং”। এইরূপ স্থলে সংপ্রতিপক্ষের উদাহরণ বুঝা যাইতে পারে।

প্রতিপক্ষ হইবে। অন্য কোন পদার্থ হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা স্বত্রোক্ত প্রকরণ-চিন্তার প্রবর্তক হয় না, ইহাই ভাষ্যকার প্রকৃতি প্রাচীনগণের সিদ্ধান্ত।

পূর্বোক্ত অনৈকান্তিক হইতে এই প্রকরণসমের ভেদ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যেখানে কোন সমান ধর্ম সংশয়ের প্রয়োজক হয় এবং তাহাকেই হেতুরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহা সবাভিচারই হইবে। তাৎপর্য্যতীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, এখানে নিত্য-ধর্মের অল্পপল্লি, উভয়বাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থে নাই এবং অনিত্য-ধর্মের অল্পপল্লিও উভয়বাদিসিদ্ধ অনিত্য পদার্থে নাই, সুতরাং ঐ নিত্যধর্মের অল্পপল্লি এবং অনিত্য-ধর্মের অল্পপল্লি, হেতুরূপে গৃহীত হইলে সবাভিচার হইতে পারে না। ঐ দুইটি পরস্পর সংপ্রতিপক্ষ হওয়াতেই প্রকরণসম বা সংপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস হইবে। বস্তুতঃ বাহ্য উভয়বাদিসম্মত নিত্য পদার্থেও আছে এবং ঐরূপ অনিত্য পদার্থেও আছে, এমন পদার্থই নিত্যের অল্পমানে সবাভিচার হইবে। মহাবি-কথিত সবাভিচার-লক্ষণ ঐ স্থলে ঐরূপ পদার্থেই থাকে। যেমন শব্দে নিত্যস্বল্পমানে অস্পর্শক। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা নব্যসম্মত অসাধারণ ও অল্পসংস্কারকে তিনি সবাভিচার বলেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রাচীন মতে এই সংপ্রতিপক্ষতা অনিত্য দোষ। অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কোন পক্ষের লিপ্য-পরামর্শের কোন অংশে ভ্রমই নিশ্চয় না হইবে, সেই পর্য্যন্তই উভয় পক্ষের গৃহীত বিরুদ্ধ হেতুদ্বয় সংপ্রতিপক্ষ থাকিবে। একই আধারে নিত্যের ব্যাপ্য ধর্ম এবং অনিত্যের ব্যাপ্য ধর্ম বস্তুতঃ কিছুতেই থাকিতে পারে না, সুতরাং ঐরূপ ভাবে ঐ স্থলে উভয়বাদীর লিপ্যপরামর্শ-দ্বয়ের কোন একটিকে কোন অংশে নিশ্চয়ই ভ্রম বলিতে হইবে। যে সময়ে সেই ভ্রমই নিশ্চয় হইবে, তখন আর সেখানে সংপ্রতিপক্ষ হইবে না। এই ভাবে প্রাচীন মতে নির্দোষ হেতুস্থলেও বিরুদ্ধ হেতুর ভ্রম পরামর্শ হইলে ঐ ভ্রমই নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত সংপ্রতিপক্ষ হইবে। তদ-চিন্তামণিকার হেত্বাভাস সামান্য-লক্ষণ ব্যাখ্যা-প্রস্তাবে বাহ্য বলিয়াছেন, তাহাতেও সংপ্রতিপক্ষতার অনিত্য-দোষই বুঝা যায়। কিন্তু নব্য নৈরাসিক রঘুনাথ হেতুর দোষমাত্রকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করায় তিনি গল্পেশের গ্রন্থের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রঘুনাথ প্রকৃতি নব্য নৈরাসিক-গণের মতে যে ধর্ম্মীতে কোন সাধ্যের সাধন করিতে বাদী কোন একটি হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্য ধর্ম্ম যদি বস্তুতঃ থাকে, সেখানে সংপ্রতিপক্ষ হয়। যেমন জলে বহির অভাবের ব্যাপ্য জলধর্ম্ম থাকায় জলে বহির অল্পমানে সংপ্রতিপক্ষ হয়। এইরূপ দোষ নিত্যদোষ। কারণ, বহির অভাবের ব্যাপ্যধর্ম্মটি জলে সর্বদাই আছে। রত্ন-কোষকার সংপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় পক্ষেই সংশয়াকার অল্পমিতি জন্মে, এই মত বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। গল্পেশ ঐ মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন ৭।

সূত্র। সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ ॥৮॥৪৯॥

অনুবাদ। সাধ্যত্ববশতঃ অর্থাৎ অসিদ্ধত্ব নিবন্ধন সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট

পদার্থ সাধ্যসম (সাধ্যসম নামক হেতুভাস) অর্থাৎ যে পদার্থ অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্য পদার্থের সদৃশ, তাহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সাধ্যসম নামক হেতুভাস হয় ।

ভাষ্য । দ্রব্যং ছায়েতি সাধ্যং, গতিমত্বাদিতিহেতুঃ সাধ্যেনাবিশিষ্টঃ সাধনীয়ত্বাৎ সাধ্যসমঃ । অয়মপ্যসিদ্ধত্বাৎ সাধ্যবৎ প্রজ্ঞাপয়িতব্যঃ, সাধ্যং তাবদেতৎ—কিং পুরুষবচ্ছায়াহপি গচ্ছতি ? আহো স্বিদাবরকদ্রব্যে সংসর্পতি আবরণমন্তানাদসম্মিধিসন্তানোহয়ং তেজসো গৃহ্যত ইতি । সর্পতা খলু দ্রব্যেণ যো যন্তেজোভাগ আত্রিয়তে তস্মৈ তস্তাসম্মিধিরেবাবিচ্ছিন্নো গৃহ্যত ইতি, আবরণস্ত প্রাপ্তিপ্ৰতিষেধঃ ।

অনুবাদ । ছায়া দ্রব্য, ইহা সাধ্য অর্থাৎ ছায়ার দ্রব্য অথবা দ্রব্যবিশিষ্ট ছায়া মীমাংসকদিগের সাধ্য । ‘গতিমত্বাৎ’ এই বাক্য-প্রতিপাদ্য হেতু অর্থাৎ ছায়ার দ্রব্য সাধনে মীমাংসকদিগের গৃহীত গতিমত্ব বা গমনক্রিয়ারূপ হেতু সাধনীয়ত্ব-বশতঃ অর্থাৎ ছায়াতে ঐ গতিমত্ব অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সাধ্যসম অর্থাৎ সাধ্যসম নামক হেতুভাস । (সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট কেন, তাহা বলিতেছেন) ইহাও অর্থাৎ হেতুরূপে গৃহীত গতিমত্ব বা গমনক্রিয়াও অসিদ্ধত্ববশতঃ অর্থাৎ ছায়াতে সিদ্ধ নয় বলিয়া সাধ্যের ছায়া অর্থাৎ ছায়াতে দ্রব্যত্বের ছায়া প্রজ্ঞাপনীয় (সাধনীয়) । (ছায়াতে গতিক্রিয়া অসিদ্ধ কেন, তাহা বলিতেছেন) ইহা সাধ্য অর্থাৎ ইহা সাধন করিতে হইবে, পুরুষের ছায়া ছায়াও কি গমন করে ? অথবা আবরক দ্রব্য গমন করিতে থাকিলে অর্থাৎ আলোকের আচ্ছাদক পুরুষ যখন গমন করে, তখন আবরণের সমষ্টিবশতঃ ইহা আলোকের অসম্মিধির সমষ্টি অর্থাৎ আলোকসম্মিধানের অভাব-সমষ্টি উপলব্ধ হয় । বিশদার্থ এই যে, গমন করিতেছে যে দ্রব্য, তৎকর্তৃক অর্থাৎ গমনবিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক যে যে আলোকাংশ আবৃত হয়, সেই সেই আলোকাংশের অবিচ্ছিন্ন অসম্মিধানই উপলব্ধ হয় । আবরণ কিন্তু প্রাপ্তির অভাব অর্থাৎ আলোকের সম্বন্ধের অভাবই আলোকের আবরণ ।

টিপ্পনী । হুত্রে সাধ্যবিশিষ্ট এই কথা দ্বারা সাধ্যসম নামক হেতুভাসের লক্ষণ স্থচনা হইয়াছে । ইহাকেই পরবর্তী ছায়াচার্য্যগণ অসিদ্ধ নামে উল্লেখ করিয়াছেন । বাহা সাধ্যের ছায়া সিদ্ধ পদার্থ নহে অর্থাৎ অসিদ্ধ, তাহাকে সাধ্য সাধনের জন্ত হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সাধ্যসম নামক অথবা অসিদ্ধ নামক হেতুভাস । তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে,

এই অসিদ্ধ (১) স্বরূপাসিদ্ধ, (২) একদেশাসিদ্ধ, (৩) আশ্রয়াসিদ্ধ এবং (৪) অন্ত্যাসিদ্ধ—
এই চারি প্রকারে হইয়া থাকে। এই চারি প্রকার অসিদ্ধই অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট।
সুতরাং সাধ্যাবিশিষ্ট, এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার অসিদ্ধই সংগৃহীত হইয়াছে। এবং
অসিদ্ধ শব্দের দ্বারা লক্ষণ না বলিয়া সাধ্যাবিশিষ্ট শব্দের দ্বারা লক্ষণ বলার উদ্দেশ্য এই যে,
অত্যন্ত অসিদ্ধই যে কেবল সাধ্যসম, তাহা নহে, বাহা কোন বাদীর সিদ্ধ, কিন্তু প্রতিবাদীর তাহা
অসিদ্ধ, সুতরাং সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় ঐ পদার্থও হেতুরূপে গৃহীত হইলে সাধ্যসম নামক
হেত্বাভাস হইবে। কিন্তু বাদী ঐ পদার্থের সাধন করিতে পারিলে তখন আর তাহা সাধ্যসম হইবে
না। কারণ, তখন ঐ পদার্থ উভয় মতেই সিদ্ধ হওয়ায় সাধ্য হইতে বিশিষ্ট হইয়া যায়। তখন সে
পদার্থে সাধ্যত্ব থাকে না। সূত্রে “সাধ্যত্বাৎ” এই স্থলে সাধ্যত্ব শব্দের ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে—
অসিদ্ধতা। অসিদ্ধ পদার্থই সাধ্য হইয়া থাকে, সিদ্ধ পদার্থে সাধ্যতা থাকে না, সাধ্য পদার্থেও
সিদ্ধতা থাকে না, সুতরাং সূত্রোক্ত সাধ্যত্ব শব্দের দ্বারা অসিদ্ধতাই ফলিতার্থ বুঝা যাইতে পারে।
তাহা হইলে অত্যন্ত অসিদ্ধ পদার্থও অসিদ্ধতাবশতঃ সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সাধ্যসম হইতে
পারিবে। কোন পদার্থের সর্বদা অসিদ্ধতা আছে, কোন পদার্থের সাময়িক অসিদ্ধতা আছে;
কিন্তু অসিদ্ধত্বরূপে সর্বপ্রকার অসিদ্ধই সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সর্বপ্রকার অসিদ্ধই সাধ্যসম
হইতে পারিবে অর্থাৎ সূত্রোক্ত এই সাধ্যসমের লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্যেই আছে। তবে হেত্বাভাসের
সামান্য লক্ষণ না থাকিলে তাহা কোন বিশেষ হেত্বাভাসও হইবে না। কারণ, বিশেষ লক্ষণ সামান্য
লক্ষণ-সাপেক্ষ।

ভাষ্যকার এই সাধ্যসমের উদাহরণ প্রদর্শনের সহিতই স্বত্বার্থ বর্ণন করিয়াছেন। নীমাংসক
সম্প্রদায় ছায়া বা অন্ধকারকে দ্রব্যপদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধনে
তাহারা গতিমত্ব বা গমন-ক্রিয়াকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদিগের কথা এই যে, কোন
মনুষ্য গমন করিতে থাকিলে তখন তাহার পাছে পাছে ছায়াও গমন করে, ইহা দেখা যায়;
সুতরাং ছায়া বা অন্ধকারে গতিক্রিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। গতিক্রিয়া থাকিলে তাহা দ্রব্য পদার্থই হয়,
দ্রব্য ভিন্ন আর কোন পদার্থে গতিক্রিয়া থাকে না, ইহা সর্ববাদিসম্মত। বিশেষতঃ নৈয়ায়িকগণের
ইহা সমর্থিত সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে ঐ গতিক্রিয়াকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধন
করা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ নহে, উহা কতকগুলি আলোকের
অভাববিশেষ। গতিক্রিয়া থাকিলে তাহা দ্রব্য পদার্থই হয় বটে, কিন্তু ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ
নহে। ভাষ্যে “সাধনীয়ত্বাৎ” এই কথাটি সূত্রের “সাধ্যত্বাৎ” এই কথার ব্যাখ্যা নহে। ছায়াতে গতি-
ক্রিয়া সাধনীয় অর্থাৎ অসিদ্ধ, ইহাই ঐ কথার দ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যকার নীমাংসকের
গৃহীত গতিক্রিয়ারূপ হেতুকে ছায়াতে অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট বলিয়া বুঝাইয়াছেন।
ছায়াতে দ্রব্যত্বরূপ সাধ্য পদার্থকে অথবা দ্রব্যত্বরূপে ছায়াকে নীমাংসক যেন সাধন করিবেন,
তদ্রূপ ছায়াতে গতিক্রিয়াও সাধন করিতে হইবে। ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ না হইলে

উহা হেতু হইতে পারে না, উহাতে হেতুর লক্ষণ থাকে না, সুতরাং ঐ স্থলে উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস।

ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ নয় কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য চলিয়া যাইতে থাকিলে তখন সেই মনুষ্যের ছায় ছায়াও গমন করে কি না, ইহা সাধ্য; ছায়া পুরুষের ছায় তাহার পাছে পাছে গমন করে, ইহা সাধন করিতে হইবে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কারণ, আমরা উহা স্বীকার করি না। কারণ, কোন মনুষ্য গমন করিতে থাকিলে সেই স্থানীয় যে সকল তৈজসিক অংশ ঐ মনুষ্য কর্তৃক আবৃত হয়, সেই সকল তৈজসিক অংশের অর্থাৎ আলোকের অভাবগুলিই ঐ স্থানে অবিচ্ছিন্নরূপে অমুভূত হয়, ইহা বলিতে পারি। যে স্থানের সহিত ঐ তৈজসিক অংশগুলির বা আলোকগুলির প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ হইত, সেই স্থান দিয়া মনুষ্য গমন করে বলিয়া সেই স্থানে সেই আলোকগুলির সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই সেখানে আলোকের আবরণ। ফলতঃ উহা সেখানে কতকগুলি আলোক-সম্বন্ধের অভাব। ঐ সম্বন্ধের অভাববশতঃই সেখানে কতকগুলি আলোকের অভাবই অমুভূত হয় অর্থাৎ কতকগুলি আলোকের অবিচ্ছিন্ন অভাবসমষ্টিই ছায়া বা অন্ধকার, উহা ভাব পদার্থ নহে। তাহা হইলে উহাতে গতিক্রিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, অভাব পদার্থে গতিক্রিয়া সর্বমতেই অসিদ্ধ। সুতরাং ছায়া বা অন্ধকারের গতিক্রিয়া অসিদ্ধ বলিয়া উহা পূর্বোক্ত স্থলে হেতু হয় না, উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। (বিরূতি দৃষ্টব্য)। ভাবো সন্তান শব্দের অর্থ সমষ্টি। আবরণ শব্দের অর্থ সম্বন্ধের অভাব। গমনকারী ব্যক্তি কর্তৃক আবৃত আলোকসমূহের বতগুলি সম্বন্ধাভাব, তৎপ্রযুক্ত ঐ আলোকগুলির অভাবসমূহ অমুভূত হয়। ঐ আলোকসমূহের অসন্নিধি বা অভাব অবিচ্ছিন্নভাবে অমুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে স্থান পর্য্যন্ত ছায়া দেখা যায়, সেই স্থানের সর্বত্রই পূর্বোক্ত প্রকার আলোকের অসন্নিধি বা অভাব অমুভূত হয়, ইহাই ভাষ্যকারের অর্থার্থ।

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার-প্রদর্শিত সাধ্যসমের উদাহরণটি স্বরূপাসিদ্ধ, আশ্রয়সিদ্ধ এবং অস্ত্রথানিচ্ছের সাধারণ উদাহরণ, উদ্যোতকর তাহা বুঝাইয়াছেন। যেমন ছায়াতে দ্রব্যস্ব সাধ্য, তরূপ গতিক্রিয়াও সাধ্য অর্থাৎ ছায়াতে গতিক্রিয়া স্বরূপতঃই অসিদ্ধ, তাই উহা স্বরূপাসিদ্ধ সাধ্যসম। মীমাংসক যদি বলেন যে, ছায়াকে যখন দেশান্তরে দেখি, তখন তাহার গতিক্রিয়া আছে, এক স্থানে দৃষ্ট পদার্থের অস্ত্রত্ব দর্শন তাহার গতি ব্যতীত হয় না,—এত-দ্রষ্টারে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও ঐ হেতু আশ্রয়সিদ্ধ। কারণ, ছায়া দ্রব্য হইলেই তাহার দেশান্তরে দর্শন বলা যাইতে পারে। ছায়ার দ্রব্যস্ব যখন সিদ্ধ হয় নাই, তখন ঐ কথা বলা যাইতে পারে না। যিনি ছায়াকে দ্রব্যরূপে মানিয়া লইয়া তাহার দেশান্তর-দর্শনের দ্বারা তাহার গতিক্রিয়ার অস্ত্রত্ব করিবেন, তাহার পক্ষে ঐ হেতু আশ্রয়সিদ্ধ। কারণ, দ্রব্যরূপ ছায়া সিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া দেশান্তরে দর্শনকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে ঐ হেতু আশ্রয়সিদ্ধ হইবে। আর যদি ছায়ার দেশান্তরে দর্শন স্বীকারই করা যায়,

তাহা হইলেও ঐ দেশান্তরে দর্শনরূপ হেতু অন্তর্ধানিক। কারণ, ছায়াকে আলোকবিশেষের অভাববিশেষ বলিলেও তাহার দেশান্তরে দর্শন হইতে পারে। যাহা অন্ত প্রকারেও অর্থাৎ ছায়া দ্রব্য না হইলেও সিদ্ধ হইতে পারে, সেই দেশান্তরে দর্শন হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ছায়াতে গতিক্রিয়ার অনুমান করা যায় না। ঐ হেতু ঐ স্থলে অন্তর্ধানিক বলিয়া সাধ্যসম নামক হেতুভাস। উদ্যোতকর পূর্বোক্ত প্রকারে সাধ্যসম বা অসিদ্ধকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তাৎপর্য-টীকাকার যে একদেশাসিদ্ধ নামেও এক প্রকার অসিদ্ধ বলিয়াছেন, উদ্যোতকরের মতে তাহা স্বরূপাসিদ্ধের অন্তর্গত।

নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সাধ্যসমের নাম বলিয়াছেন “অসিদ্ধ”। এবং আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ এবং ব্যাপ্যাসিদ্ধ—এই নামত্রেয় ঐ অসিদ্ধকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করিতে হেতু প্রয়োগ হইবে, ঐ ধর্ম্মীকে আশ্রয় বলে। নব্যগণ ঐ ধর্ম্মীকে পঞ্চ বলিয়াছেন এবং আশ্রয়ও বলিয়াছেন। ঐ আশ্রয় অসিদ্ধ হইলে ঐ হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। যেমন আকাশ-কুন্তলে কেহ গন্ধের অনুমান করিতে গেলে তাহার প্রযুক্ত হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ এবং স্বর্ণময় আকাশ শব্দের কারণ, এইরূপে কেহ অনুমান করিতে গেলে আকাশে স্বর্ণময়রূপ বিশেষণ না থাকায় ঐ আশ্রয় অসিদ্ধ। স্ততরাং ঐ স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই আশ্রয়াসিদ্ধ। যে হেতুর দ্বারা অনুমান করিতে হইবে, ঐ হেতু পদার্থ-পূর্বোক্ত ধর্ম্মী বা পক্ষে না থাকিলে তাহা স্বরূপাসিদ্ধ। যেমন জলে বহির অনুমানে ধূমকে হেতু বলিলে এবং শব্দে নিত্যত্বের অনুমানে চাক্ষুষত্বকে হেতু বলিলে ঐ ধূম জলে না থাকায় এবং চাক্ষুষত্ব শব্দে না থাকায় উহা স্বরূপাসিদ্ধ হইবে। কোন স্থলে হেতু পদার্থ-পূর্বোক্ত ধর্ম্মীতে সন্নিবিষ্ট হইলেও তাহা স্বরূপাসিদ্ধ হইবে। তাহাকে বলে সন্নিবিষ্টাসিদ্ধ। যেখানে সাধ্য পদার্থ অথবা হেতু পদার্থ অপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সাধ্যবর্মে প্রযুক্ত বিশেষণটি সাধ্যধর্ম্মে নাই অথবা হেতু পদার্থে প্রযুক্ত বিশেষণটি হেতু পদার্থে নাই, সেখানে ঐ হেতুর নাম ব্যাপ্যাসিদ্ধ। যেমন পর্ত্ততে স্বর্ণময় বহির অনুমান করিতে গেলে স্বর্ণময়ত্ব বিশেষণটি বহিতে না থাকায় ঐ স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই ব্যাপ্যাসিদ্ধ হইবে। এবং পর্ত্ততে বহির অনুমানে স্বর্ণময় ধূমকে হেতু বলিলেও পূর্বোক্ত প্রকারে ব্যাপ্যাসিদ্ধ হইবে। এবং পর্ত্ততে বহির অনুমানে নীল ধূমকে হেতু বলিলেও অনেকের মতে ঐ হেতু ব্যাপ্যাসিদ্ধ হইবে। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, পর্ত্ততে বহির অনুমানে ধূম হেতুতে নীলত্ব বিশেষণ ব্যর্থ। কেবল ধূমকে সধকবিশেষে হেতু বলিলেই চলিতে পারে। পরন্তু ধূমরূপেই ধূমে বহির ব্যাপ্তি আছে, ধূমে ব্যর্থ বিশেষণের প্রয়োগ করিলে সেইরূপে তাহাতে ব্যাপ্যত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় ঐরূপ স্থলে ঐ হেতু ব্যাপ্যাসিদ্ধ হইবে। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ইহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, হেতু পদার্থে কোন ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে তাহাতে হেতুর কোন দোষ হইতে পারে না। সেইরূপ স্থলে হেতুবাদী ব্যক্তিগণই দোষ হইবে। ঐরূপ হেতু-বাদীই “অসিদ্ধ” নামক নিগ্রহস্থান-প্রযুক্ত সেখানে নিগৃহীত হইবেন। ফলকথা, বহির অনুমানে নীল ধূমকে হেতু বলিলে ব্যর্থ বিশেষণ প্রযুক্ত উহা কোন হেতুভাস হইবে না, ইহাই রঘুনাথের

সিদ্ধান্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ নব্য মতানুসারে সূত্র-ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পঞ্চধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু যদি কোন অংশে কোন প্রকারে অনিচ্ছ হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, ইহাই সূত্রার্থ। সূত্রে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পঞ্চধর্ম—এই কথাটির অধ্যাহার না করিলে সূত্রের দ্বারা কেবল স্বরূপানিচ্ছেরই লক্ষণ পাওয়া যায়, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথা ॥ ৮ ॥

সূত্র। কালাত্যয়াপদিফঃ কালাতীতঃ ॥৯॥৫০॥

অনুবাদ। যে পদার্থ কালাত্যয়ে প্রযুক্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মাতে বলবৎ প্রবানের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব নির্ণয় হওয়ায় সাধ্য সংশয়ের কাল অতীত হইলে বাহা ঐ সাধ্যসাধনের জন্ম হেতুরূপে গৃহীত, সেই পদার্থ কালাতীত (কালাতীত নামক হেত্বাভাস)।

ভাষ্য। কালাত্যয়েন যুক্তো যস্যার্থকদেশোহপদিষ্ঠ্যমানস্ত স কালাত্যয়াপদিফঃ কালাতীত উচ্যতে। নিদর্শনম্—নিত্যঃ শব্দঃ সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ রূপবৎ, প্রাগুক্তঞ্চ ব্যক্তেরবস্থিতং রূপং প্রদীপ-ঘটসংযোগেন ব্যজ্যতে, তথা চ শব্দোহপ্যবস্থিতো ভেরী-দণ্ডসংযোগেন ব্যজ্যতে দারুপরশুসংযোগেন বা, তস্মাৎ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইত্যয়মহেতুঃ কালাত্যয়াপদেশাৎ। ব্যঞ্জকস্ত সংযোগস্ত কালং ন ব্যঙ্গ্যস্ত রূপস্ত ব্যক্তি-রত্যেতি। সতি প্রদীপসংযোগে রূপস্ত গ্রহণং ভবতি, নিবৃত্তে সংযোগে রূপং ন গৃহ্যতে নিবৃত্তে দারুপরশুসংযোগে দূরস্থেন শব্দঃ শ্রু্যতে বিভাগ-কালে, সেয়ং শব্দস্ত ব্যক্তিঃ সংযোগকালমত্যেতীতি ন সংযোগনির্ম্মিতা ভবতি। কস্মাৎ? কারণাভাবাক্তি কার্য্যভাব ইতি। এবমুদাহরণসাধ্যর্মা-স্তাভাবাদসাধনময়ং হেতুর্হেত্বাভাস ইতি।

অবয়ববিপর্য্যাস-বচনস্ত ন সূত্রার্থঃ। কস্মাৎ? “যস্য যেনার্থসম্বন্ধো দূরস্থস্তাপি তস্ত সঃ। অর্থতো হ্যসমর্থানামানন্তর্য্যামকারণং” ইত্যেতদ্ব-চনাদ্বিপর্য্যাসেনোক্তো হেতুরুদাহরণসাধ্যর্মাৎ তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুলক্ষণং ন জহাতি, অজহন্ধেতুলক্ষণং ন হেত্বাভাসো ভবতীতি। অবয়ব-বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালমিতি নিগ্রহস্থানমুক্তং, তদেবেদং পুন-রুচ্যত ইতি অন্তস্তম সূত্রার্থঃ।

অনুবাদ। অপদিষ্টমান অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত্যমান যে পদার্থের অর্থৈক-
দেশ অর্থাৎ হেতু পদার্থের বিশেষণ কালাত্যয় যুক্ত হয় অর্থাৎ কালবিশেষকে
অতিক্রম করে, সেই পদার্থ কালাত্যয়ে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত) হওয়ায় কালাতীত নামে
কথিত হয় অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থকেই কালাতীত নামক হেতুভাস বলে।

নিদর্শন অর্থাৎ ইহার উদাহরণ (বলিতেছি)। (প্রতিজ্ঞা) শব্দ নিত্য অর্থাৎ
শব্দ তাহার শ্রবণের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, (হেতু) সংযোগ-ব্যঙ্গ্য
জ্ঞাপক। (উদাহরণ) যেমন রূপ। অভিব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বে এবং
পরে বিদ্যমান রূপ (ঘটের রূপ) প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগের দ্বারা ব্যক্ত হয়
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়। (উপনয়) শব্দও সেই প্রকার অর্থাৎ ঘটরূপের ন্যায় পূর্ব
হইতেই বিদ্যমান থাকিয়া ভেরী ও দণ্ডের সংযোগের দ্বারা অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের
সংযোগের দ্বারা ব্যক্ত হয় অর্থাৎ শ্রুত হয়। (নিগমন) সেই সংযোগ-ব্যঙ্গ্য-
হেতুক শব্দ নিত্য (পূর্ব হইতেই অবস্থিত)। ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংযোগ-ব্যঙ্গ্য
অহেতু (হেতু নহে, হেতুভাস)। কারণ, কালাত্যয়যুক্ত প্রয়োগ হইয়াছে।
(সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন) ব্যঙ্গ্য রূপের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রদীপের সহিত
ঘটের সংযোগজ্ঞ্য যে রূপপ্রত্যক্ষ হয়, ঐ রূপপ্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ্যক সংযোগের (প্রদীপের
সহিত ঘটের সংযোগের) কালকে অতিক্রম করে না। (কারণ) প্রদীপের সংযোগ
বিদ্যমান থাকিলেই রূপ প্রত্যক্ষ হয়, সংযোগ নিবৃত্ত হইলে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না
অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ঘটের সহিত প্রদীপের সংযোগ থাকে, সেই পর্য্যন্তই ঘটের রূপের
প্রত্যক্ষ হয়, (কিন্তু) কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হইলে বিভাগের সময়ে
অর্থাৎ যখন কাষ্ঠ হইতে কুঠারের বিভাগ হয়, সেই কাষ্ঠ হইতে কুঠারের উত্তোলন-
কালে দূরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করে। সেই এই শব্দের অভিব্যক্তি (শ্রবণ) অর্থাৎ
যাহা কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগকালে জন্মে না, বিভাগ-কালেই জন্মে, তাহা
সংযোগের কালকে (কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ-কালকে) অতিক্রম করে;
এই হেতু (উহা) সংযোগজ্ঞ্য হয় না অর্থাৎ ঐ শব্দ শ্রবণ ঐ স্থলে কাষ্ঠের সহিত
কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ-জ্ঞ্য, ইহা বলা যায় না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ কাষ্ঠের
সহিত কুঠারের সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই শব্দ শ্রবণ হয়, তাহাতে ঐ শব্দ-শ্রবণ
ঐ সংযোগ-জ্ঞ্য হইবে না কেন? (উত্তর) যেহেতু কারণের অভাব প্রযুক্ত
কার্যের অভাব হইয়া থাকে (অর্থাৎ যদি ঐ স্থলে কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগ ঐ শব্দ
শ্রবণের কারণ হইত, তাহা হইলে ঐ সংযোগের অভাবে ঐ শব্দ শ্রবণরূপ কার্য

হইতে পারিত না। যাহা কারণ, তাহা কার্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকিবে এবং তাহার অভাবে কখনই কার্য হইবে না। প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ নিবৃত্ত হইলে ঘটের রূপ দর্শন তখন হয় না, সুতরাং সেখানে ঘটরূপ প্রত্যক্ষ ঐ সংযোগ-জন্ম, সুতরাং ঘটের রূপ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য; কিন্তু শব্দের প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্ম নহে, সুতরাং শব্দকে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য বলা যায় না)। এইরূপ হইলে উদাহরণের সাধর্ম্য না থাকায় অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনুমানে দৃষ্টান্ত যে ঘটের রূপ, তাহার সাধর্ম্য যে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, তাহা ঐ অনুমানে সাধর্ম্যে যে শব্দ, তাহাতে না থাকায় এই হেতু অর্থাৎ পূর্বোক্তানুমানে হেতুরূপে গৃহীত সংযোগ-ব্যঙ্গ্য সাধন না হওয়ায় (হেতু-লক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায়) হেত্বাভাস।

অবয়বের বিপরীতক্রমে উল্লেখ কিন্তু সূত্রার্থ নহে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া শেষে হেতুবাক্য বলিলে ঐ হেতু কালাত্যয়ে প্রযুক্ত হওয়ায় কালাতীত হইবে, ইহা কিন্তু সূত্রার্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যে বাক্যের সহিত যে বাক্যের অর্থ সম্বন্ধ অর্থাৎ অর্থের কি না সামর্থ্যের সহিত সম্বন্ধ আছে, সেই বাক্য দূরস্থ হইলেও তাহার সেই অর্থ সম্বন্ধ থাকে। যে হেতু অর্থতঃ অসমর্থ বাক্যগুলির অর্থাৎ যে বাক্যগুলির পরস্পর মিলিত হইয়া বাক্যার্থ-বোধে সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের আনন্তর্য্য অর্থাৎ নিকটবর্তিতা (বাক্যার্থবোধে) কারণ নহে, অর্থাৎ বাক্যগুলি মিলিত হইয়া বাক্যার্থবোধে সমর্থ হইলে তাহারা যথাস্থানে কথিত না হইয়া বিপরীতক্রমে কথিত হইলেও বাক্যার্থবোধ জন্মায়। বাক্যার্থবোধে সামর্থ্য থাকিলে তাহা দূরস্থ বাক্যও থাকে, এই বচন প্রযুক্ত বিপরীতক্রমে কথিত হেতু অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া হেতুবাক্যের দ্বারা যে হেতু-পদার্থ বলা হয়, তাহা উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত এবং উদাহরণের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হওয়ায় হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না। হেতুর লক্ষণ ত্যাগ না করিলেও তাহা হেত্বাভাস হয় না। (পরন্তু) অবয়বের বিপরীতক্রমে বচন অপ্রাপ্তকাল (৫ অং, ২ অং, ১১ সূত্র) এই সূত্রের দ্বারা (মহর্ষি) নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। ইহা তাহাই পুনরায় বলা হয়, এ জন্ম তাহা সূত্রার্থ নহে। অর্থাৎ অবয়বের যদি ক্রম ভঙ্গ করিয়া প্রয়োগ হয়, তাহাকে মহর্ষি পরে অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, এই সূত্রের যদি ঐরূপই অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে মহর্ষির পুনরুক্তি-দোষও হইয়া পড়ে; সুতরাং এ জন্মও বুঝা যায়, এই সূত্রের ঐরূপ অর্থ নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পঞ্চম হেতুভাসকে বলিয়াছেন—কালাতীত। অনেক পুস্তকে হেতুভাসের বিভাগসূত্রে (২ অং ৪ সূত্রে) ‘অতীত কাল’ এইরূপ নাম দেখা যায়। বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতি কেহ কেহ এ জন্ত এই সূত্রে কালাতীত শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অতীতকাল এবং কালাতীত, এই দুইটি সমানার্থক শব্দ বলিয়া মহর্ষি এই সূত্রে কালাতীত শব্দের দ্বারা অতীত কাল নামক হেতুভাসকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বদ্ব্যপ্তঃ মহর্ষি পূর্বেও কালাতীত শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিভাগসূত্রে অতীত কাল, এইরূপ নাম বলিয়া তাহার লক্ষণ-সূত্রে কালাতীত নামে লক্ষ্য নির্দেশ করিবেন কেন? অর্থ এক হইলেও ঐ নাম দুইটি বখন পৃথক্, তখন মহর্ষি বিভাগ-সূত্রে যে নাম বলিয়াছেন, লক্ষণ-সূত্রেও সেই নামই বলিয়াছেন, ইহাই সম্ভব; কারণ, সেইরূপ বলাই উচিত। বাচস্পতি মিশ্রের স্মারসূচীনিবদ্ধ প্রভৃতি অনেক পুস্তকে বিভাগ-সূত্রেও ‘কালাতীত’ এইরূপ পাঠই আছে। বৃত্তিত স্মারবার্ত্তিকে উদ্ধৃত সূত্রে ঐ স্থলে ‘অতীতকাল’ পাঠ থাকিলেও উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি গোতম কালাত্যাপাদিষ্ট, এই কথার দ্বারা এই সূত্রে কালাতীত নামক পঞ্চম হেতুভাসের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। সাধ্য-সন্দেহের কালই হেতু প্রয়োগের কাল। নির্ণীত পদার্থে স্মারপ্রয়োগ হয় না, এ কথা ভাব্যকারও প্রথম সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মাতে কোন ধর্ম্মের অহুমান করিতে হেতু প্রয়োগ করা হয়, সেই ধর্ম্মাতে যদি ঐ অহুমের ধর্ম্মটি নাই, ইহা দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে আর সেখানে ঐ সাধ্যধর্ম্ম আছে কি না, এইরূপ সংশয়ও হয় না। জলে বহি নাই, ইহা নির্ণীত হইলে আর কি সেখানে বহির সংশয় হইতে পারে? ফলকথা, যে পর্য্যন্ত সাধ্যধর্ম্মাতে সাধ্যধর্ম্মের সংশয় আছে, সেই পর্য্যন্তই তাহাতে সাধ্যধর্ম্মের অহুমানের জন্ত হেতু প্রয়োগ করিলে, ঐ হেতুতে আর কোন দোষ না থাকিলে, উহা হেতু হইতে পারে, উহা সেখানে সাধ্য সাধন করিতে পারে। কিন্তু যেখানে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মাতে অহুমের ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে যে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলেই তাহা সাধ্য-সন্দেহের কালকে অতিক্রম করার অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হওয়ার সাধ্যধর্ম্মের সংশয়ের কাল চলিয়া গেলে প্রযুক্ত হয়, এ জন্ত উহা কালাত্যয়ে অপাদিষ্ট (প্রযুক্ত); সতরাং তাহা কালাতীত নামক হেতুভাস। এইরূপ স্থলে অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মাতে সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে আর কোন পদার্থই সেখানে সেই সাধ্যের সাধন হইতে পারে না, এ জন্ত ঐরূপ স্থলে হেতুরূপে প্রযুক্ত পদার্থ মাত্রই হেতুভাস। ভাব্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে যে স্মারভাসের কথা বলিয়াছেন, সেই স্মারভাস স্থলীয় হেতুই ইহার উদাহরণ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অহুমান স্থলে প্রযুক্ত হেতুই এই সূত্রোক্ত কালাতীত নামক হেতুভাস। পরবর্ত্তী স্মারচার্য্যগণ ইহাকেই বাদিত নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

তাৎপর্য়টীকাকার এই ভাবে সূত্রার্থ বর্ণন ও উদাহরণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই এই সূত্রের প্রকৃতার্থ এবং ভাব্যকারেরও ইহাই মনোগত অর্থ। ভাব্যকার পূর্বে স্মারভাসের কথা বলিয়াই তাঁহার নিজ মতানুসারে এই কালাতীত নামক হেতুভাসের উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এ জন্ত এখানে নিজ মতে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করেন নাই। অস্ত্র ব্যাখ্যাকারগণ

এই স্বরের বেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বেরূপ উদাহরণ বলিতেন, ভাব্যকার এখানে সেই উদাহরণেরই উল্লেখ করিয়া এই কালাতীত নামক হেত্বাভাস বিষয়ে মতান্তর বিজ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রথমতঃ হেত্বার্থ ব্যাখ্যায় ভাব্যকার কৌশলে একই ভাবায় পরমতের ব্যাখ্যায় স্বায় নিজ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে হেতুর অর্থেকদেশ অর্থাৎ একদেশরূপ পদার্থ, ফলিতার্থ এই যে, যে হেতুর বিশেষণ-পদার্থ কালাত্যয়যুক্ত হইবে, সেই হেতু কালাতীত; এইরূপে পরমতানুসারে ঐ ভাব্যের ব্যাখ্যা হইবে। এই পরমতানুসারেই ভাব্যকার শব্দের নিত্যত্বানুসারে নীমাংসকের গৃহীত সংযোগব্যঙ্গ্য হেতুকে কালাতীত হেত্বাভাস বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সংযোগব্যঙ্গ্য হেতুর একদেশ অর্থাৎ বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা ঐ স্থলে কালাত্যয়যুক্ত হওয়ায় ঐ হেতু কালাতীত হেত্বাভাস হইয়াছে। রূপের প্রত্যক্ষ রূপযুক্ত বস্তুতে আলোক-সংযোগ আবশ্যক। কারণ, অন্ধকারে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং রূপ প্রত্যক্ষ সংযোগজ্ঞ, তাহা হইলে রূপকে সংযোগব্যঙ্গ্য বলা যায়। বাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ কোন সংযোগজ্ঞ, তাহাকে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য পদার্থ বলে। কিন্তু রূপ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য হইলেও শব্দ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য নহে। কারণ, যে সংযোগ-জ্ঞ শব্দ জন্মে, সেই সংযোগের নিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং শব্দের প্রত্যক্ষ সংযোগজ্ঞ না হওয়ায় শব্দ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য নহে। শব্দের প্রত্যক্ষ শব্দজনক সংযোগের কালকে অতিক্রম করার সংযোগ-ব্যঙ্গ্যরূপ হেতুর একদেশ বা বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা ঐ স্থলে কালাত্যয়যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্কোক্ত অনুসারে সংযোগব্যঙ্গ্য হেতু কালাতীত নামক হেত্বাভাস (বিবৃতি স্রষ্টব্য)। সংযোগব্যঙ্গ্য হইলেই সে পদার্থ নিত্য হয় না। আলোক-সংযোগের সাহায্যে যে ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, সেই সংযোগ-ব্যঙ্গ্য ঘটাদি পদার্থে নিত্যত্ব নাই, তবে নিত্যত্বের অনুসারে সংযোগ-ব্যঙ্গ্যকে হেতু বলা হইয়াছে কিরূপে? এতদ্বত্তরে উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে 'শব্দ নিত্য' এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ এই যে, শব্দ পূর্ণ হইতেই অবস্থিত। বাহ্য পূর্ণ থাকে না, তাহা সংযোগব্যঙ্গ্য নহে। শব্দ যখন সংযোগব্যঙ্গ্য, তখন শব্দ স্থির পদার্থ, শব্দ ঘটাদির রূপের স্বায় প্রত্যক্ষের পূর্ণ হইতেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই পূর্কোক্ত প্রতিজ্ঞাবাদীর তাৎপর্য। ঐরূপে শব্দের স্থির সাধন করিয়া নীমাংসক শব্দের নিত্য সাধনের জ্ঞ জ্ঞ হেতুর প্রয়োগ করিয়াছেন (দ্বিতীয়াধ্যায়ে শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা-প্রকরণ স্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ পূর্কোক্ত স্থলে যখন ঘটাদির রূপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দের স্থিরত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতারূপ নিত্যতা ঘটাদির রূপে নাই। এবং সংযোগ-ব্যঙ্গ্য বলিতেও সংযোগজ্ঞ প্রত্যক্ষবিষয় বুঝা যায়। সংযোগের দ্বারা বাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে সংযোগব্যঙ্গ্য শব্দের প্রতিপাদ্য নহে। কারণ, নীমাংসক মতে শব্দও যদি ঐরূপ সংযোগব্যঙ্গ্য বলা যায়, তাহা হইলেও ঘটাদি রূপের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব সংযোগজ্ঞ নহে। সামান্ত্রিকতঃ সংযোগজ্ঞ বলিলে জ্ঞ জ্ঞানের উৎপত্তি আত্মনাসংযোগ-জ্ঞ, কিন্তু ঐ জ্ঞ জ্ঞান নিত্য বা স্থির পদার্থ নহে। ফলকথা, বাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ-বিশেষ-জ্ঞ, তাহাকেই সংযোগ-

ব্যঙ্গ্য-বলিয়া রূপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শব্দের স্থির সাধন করিতে পূর্বোক্ত প্রকার সংযোগ-ব্যঙ্গ্যকে হেতু বলা হইয়াছে। ঐ হেতুতে যে ঐ স্থলে আর কোন দোষ নাই, তাহা নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য সাধ্যসন নামক হেতুভাগই হইয়াছে; উহার জন্ত আর পৃথক্ করিয়া কালাতীত নামক হেতুভাগ বলা নিম্নপ্রয়োজন। বাহারি কালাতীত হেতুভাগের ঐ উদাহরণ বলিয়াছেন, তাহাদিগের বাধ্যার এই দোষ স্থল, সকলেই উহা বুঝিয়া লইতে পারিবে, ইহাই মনে করিয়া ভাষ্যকার ঐ দোষের উদ্ধাবন করেন নাই; তিনি কেবল তাহাদিগের ঐ উদাহরণটিকেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বেক্রপ করনা করিয়াছেন, ভাষ্যকারের কথার কিন্তু তাহা মনে আসে না। তবে ভাষ্যকারের নিজের মতকে নির্দোষ রাধিবার জন্ত গত্যস্তর না থাকায় তাৎপর্য্যটীকাকার সম্ভবতঃ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ অনুসারেই ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের মূল কথা এই যে, ভাষ্যকার এখানে একই ভাষায় নিজের মতে এবং পরের মতে স্বত্বার্থ বর্ণন করিয়া পরের মতেই উদাহরণ বলিয়া গিয়াছেন। প্রথম স্বজ-ভাষ্যে হেতুভাগের কথা বলাতে ভাষ্যকারের নিজ সম্মত কালাতীত হেতুভাগের উদাহরণ বলাই হইয়াছে, আর তাহার পুনরুক্তি করেন নাই। ভাষ্যকারের নিজ মত অনুসারে স্বত্বার্থবোধক ভাষ্যের ব্যাখ্যা এই যে, অপরিগ্ৰহমান যে পদার্থের অর্থৈকদেশ অর্থাৎ প্রযুক্ত্যমান হেতু পদার্থের অর্থ কি না—সাধনীয় যে ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্ম (সাধ্যধর্ম্ম), তাহার একদেশ অর্থাৎ বিশেষণরূপ একাংশ যে সাধ্যধর্ম্ম, তাহা যদি কালাতারযুক্ত হয় অর্থাৎ কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সেই ধর্ম্মাতে সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হওয়ার সাধ্য সন্দেহের কালকে অতিক্রম করে, তাহা হইলে প্রযুক্ত্যমান সেই হেতু সাধ্য সন্দেহের কাল অতীত হইলে প্রযুক্ত হওয়ার কালাতীত নামক হেতুভাগ হয়।

তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক মহর্ষি গোতমের এই স্বত্বের ব্যাখ্যা করিতেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরেই হেতুবাক্য প্রয়োগের কাল। সেই কালকে অতিক্রম করিয়া যদি পরে অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্যের পরে হেতু প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু কালাতীত নামক হেতুভাগ হয়। সেই বৌদ্ধ নৈয়ায়িক এইরূপ স্বত্বার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এই ব্যাখ্যানুসারে কালাতীত নামক কোন হেতুভাগ স্বীকার করা নিম্নপ্রয়োজন, কালাতীত নামক কোন হেতুভাগ নাই, ইহাই সমর্থন করিয়া মহর্ষি-মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করিয়াই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের ব্যাখ্যাত ঐ দোষের পরিহার করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই স্বত্বের ঐরূপ অর্থ নহে। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া, তাহার পরে যদি কেহ হেতু প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণ প্রয়োগকর্তার দোষ হইতে পারে। ঐরূপ স্থলে প্রযুক্ত হেতুতে যদি হেতুর লক্ষণ থাকে অর্থাৎ উহা যদি উদাহরণের সাধ্যধর্ম্ম অথবা উদাহরণের বৈধর্ম্ম্য হইয়া সাধ্যসাধন হয়, তাহা হইলে হেতুভাগ হইতে পারে না। বাহ্যতে হেতুপদার্থের সমস্ত লক্ষণ থাকে, তাহা কখনই হেতুভাগ হয় না। প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য মিলিত হইয়া যে বাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, তাহাতেও হেতুবাক্যটি প্রতিজ্ঞাবাক্যের দূরত্ব

হইলেও কোন হানি নাই। ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্ত-সমর্থনের জন্ত এখানে যে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ কারিকাটি কোন্ গ্রন্থের, তাহা বিশেষ অনুসন্धानেও পাই নাই। নানাগ্রন্থদর্শী অনুসন্ধিৎসু অনেক মনোবীণা উহার সংবাদ পান নাই, জানিয়াছি। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই কারিকায় অর্থনন্দক শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“অর্থেন সামর্থ্যেন যথাক্ষেপনমর্থকঃ।” তিনি এই কারিকা সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই। তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারের উদ্ধৃত কারিকায় ‘অর্থনন্দক’র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—সামর্থ্য-সম্বন্ধ। যে বাক্য অত্র বাক্যের সহিত মিলিত হইয়া অর্থাৎ একবাক্যতা লাভ করিয়া বাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা আবশ্যক। উহাকে বাক্যের সামর্থ্যও বলা হয় (নিগমন-স্বত্ব-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ঐ সামর্থ্য-সম্বন্ধ বা আকাঙ্ক্ষা দূরত্ব বাক্যও থাকে, উহা না থাকিলে নিকটত্ব বাক্যও মিলিত হইয়া শব্দ বোধ জন্মাইতে পারে না, ইহাই ঐ কারিকার তাৎপর্যার্থ। ইহা প্রাচীন মত। এই মত সর্বদক্ষত নহে। মনে হয়, এই জন্তই ভাষ্যকার শেষে অত্র একটি বুক্তির উপস্থাপন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষ কথার তাৎপর্য এই যে, মহর্ষি পঞ্চমাধ্যয়ে বাহ্য অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, এই স্বত্রের দ্বারা তাহাই হেতুভাসের মধ্যে বলিবেন কিরূপে ? ঐ ভাবে ঐরূপ পুনরাবৃত্তি মহর্ষি কখনই করিতে পারেন না। সুতরাং উহা মহর্ষি-স্বত্রের অর্থ নহে।

মহর্ষি-স্বত্রের অর্থ তাৎপর্যটীকাকার দ্বৈরূপ বলিয়াছেন, তাহাই অনুবাদে গৃহীত হইয়াছে। উদ্যোক্তকরও ভাষ্যানুসারে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উহা যে মতান্তরে ব্যাখ্যা বা মতান্তর জ্ঞাপন, তাহা কিছুতেই মনে হয় না। তবে উদ্যোক্তকরের পর হইতেই মহর্ষি গোতমোক্ত কালাতীত নামক হেতুভাস বাবিত এবং বাবিতসাধ্যক ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য কালাতীত প্রভৃতি নামের ব্যবহারও পরবর্তী গ্রন্থে স্থলবিশেষে দেখা যায়। বিশ্বনাথ ভাষ্যপরিচ্ছেদে কালাত্যাপদিষ্ট নামেরও ব্যবহার করিয়াছেন। মূলকথা; যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমানের জন্ত হেতু প্রয়োগ করা হইবে, সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যবস্তুটি নাই, ইহা যেখানে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত, সেই স্থলীর হেতুকেই উদ্যোক্তকরের পরবর্তী আচার্য্যগণ স্পষ্ট ভাষায় মহর্ষি গোতমোক্ত পঞ্চম হেতুভাস বলিয়া অর্থাৎ কালাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।^১ প্রথম স্বত্রভাষ্যে ভাষ্যকার যে ত্রায়্যভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন, সেখানেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রায়্যভাস স্থলেই এই কালাতীত নামক হেতুভাস থাকে। এ জন্ত মহর্ষি ত্রায়্যভাস নাম করিয়া কোন কথা আর বলেন নাই। হেতুভাস বলাতেই ত্রায়্যভাস বলা হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাভাস, দৃষ্টান্তভাস প্রভৃতিও তাহাতেই বলা হইয়াছে। পরবর্তী কোন কোন ত্রায়্যিকদেশী ‘অন্যবসিত’ নামে বর্ত্ত হেতুভাস স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু

১। কালাতীতো বলবতা প্রমাণেন প্রাবচিতঃ।—তর্কিকরক্ষা, ১৩০।

২। ন স্বত্রিতং ক্রিমিত্তি চেদুদ্যোক্তভাসলক্ষণং।

অন্তর্ভাষ্যে বর্ত্তন্তয়াং হেতুভাসেব শব্দঃ।—ই।

তাহাও গৌতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বভাসেই অন্তর্ভূত হওয়ায় মহর্ষি বর্ষ কোন হেত্বভাস বলেন নাই। যে হেতুতে ব্যভিচার সংশয়-নিরাসক অল্পকূল তর্ক নাই, তাহাকে অপ্রযোজক বলে। যে হেতুতে ঐক্য অল্পকূল তর্ক আছে, তাহাকে প্রযোজক বলে। কেহ কেহ পূর্বোক্ত অপ্রযোজক নামে হেত্বভাস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ উহাকে 'ব্যাপ্যাসঙ্গিক' বলিয়া ঐ নামে কোন অতিরিক্ত হেত্বভাস স্বীকার অনাবশ্যক বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও ঐ মত ধণ্ডন করিয়া অপ্রযোজক নামে পৃথক কোন হেত্বভাস নাই, উহা গৌতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বভাসেই অন্তর্ভূত, ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

মহর্ষি কণাদ হেতুকে বলিয়াছেন—অপদেশ, হেত্বভাসকে বলিয়াছেন—অনপদেশ। তাঁহার মতে (১) অপ্রসিদ্ধ, (২) অসং, (৩) সন্দিগ্ধ, এই নামত্রয়ে^১ হেত্বভাস ত্রিবিধ। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ অনব্যবসিত নামক এক প্রকার হেত্বভাস বলিলেও উহা কণাদসূত্রের অপ্রসিদ্ধ অথবা সন্দিগ্ধ, এই কণার দ্বারাই সংগৃহীত বলিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, কণাদসূত্রের বৃত্তিকার সূত্রস্থ “চ” শব্দের দ্বারা গৌতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বভাসই কণাদের সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে। কারণ, কণাদ যে হেত্বভাসত্রয়বাদী, এ বিষয়ে প্রাচীন প্রবাদ^২ আছে। বস্তুতঃ গৌতমোক্ত প্রকরণম ও কালাতীত নামক হেত্বভাসকে কণাদ হেত্বভাস-মধ্যে গণ্য করেন নাই, ইহাই প্রচলিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের মূল যুক্তি এই যে, যে হেতু সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত, তাহা কখনও অহেতু অর্থাৎ হেতুলক্ষণশূন্য হয় না। পক্ষসদ্ব, সপক্ষসদ্ব এবং বিপক্ষে অসদ্ব—এই তিনটি দৃষ্টই কণাদের মতে হেতুর সাধকতার প্রযোজক। ঐ লক্ষণাক্রান্ত হেতু স্থলে যদি অস্ত্র কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ অনুমিতি না হয় অথবা হইলেও তাহা ভ্রম হয়, তাহাতে ঐ হেতুর কোন দোষ বলা যায় না। হেতুর সম্পূর্ণ লক্ষণ যাহাতে আছে, তাহাকে অহেতু কিছুতেই বলা যায় না। ঐরূপ হেতু স্থলে অনুমিতির অস্ত্র প্রতিবন্ধক যদি উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐ হেতু কখনই দৃষ্ট বা হেত্বভাস হইতে পারে না। যে স্থলে অনুমিতির যে কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে, সেই স্থলীয় হেতু মাত্রকে দৃষ্ট হেতু বলিলে হেত্বভাস আরও নানাপ্রকার হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান হেতু যদি বাধিত অথবা সংপ্রতিপদিত হয়, তাহা হইলেও

১। বস্তুকুলতর্কোহন্তি স এব ত্রয় প্রযোজকঃ।

ওদভাবেহস্তথানিদ্ধিশুস্তাঃ স হি নিবারণকঃ।

অত্রৈব প্রযোজকত্ব ত্র্যব্যাপ্যাসিদ্ধের সিদ্ধতা।—তর্কি স্মরণ্য।

২। অপ্রসিদ্ধে'হনপবেশে'হসম্ভবসিদ্ধিশ্চানপবেশঃ।—কণাদ-সূত্র, ১৩.১১৩।

ভাষ্য সূত্রেও কোন স্থলে হেত্বভাস বলিতে অনপবেশ বলা হইয়াছে। ২২।৩৩।

৩। বিরুদ্ধাসিদ্ধ-সন্দিগ্ধবলিষ্ঠং কাণ্ডগোহত্রীৎ। এই মোক্ষার্জি প্রশস্তপাদভাষ্যে দেখা যায়। কন্যলীকার উহা প্রশস্তপাদ-বাক্য পরিব্রাজি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ বাক্যটি আরও অতি প্রাচীন প্রবাদ, এইরূপও প্রবাদ শুনা যায়।

ঐ হেতু দুই হইবে না। কারণ, হেতুর প্রকৃত লক্ষণ তাহাতে আছেই, সুতরাং ঐ হেতু হেত্বাভাসের মধ্যে গণ্য নহে, ইহাই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যুক্তি।

তায়্যার্গ্য মহর্ষি গোতমের অভিপ্রায় মনে হয় এই যে, যে হেতুহলে অহুমিতি হইলে যথার্থ অহুমিতিই হয়, তাহাকেই হেতু বলা উচিত। যে হেতু সাধ্যবশ্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবশ্মীতে বর্তমান হইলেও কোন স্থলে সাধ্যবশ্মীতে বস্তুতঃ সাধ্যবশ্ম না থাকায় যথার্থ অহুমিতির প্রয়োজক হইতেই পারিবে না, সেখানে অহুমিতি হইলেও ভ্রম অহুমিতি হইবে, সেই হেতু বাণিত। এবং যে হেতুর তুল্যবল প্রতিপক্ষ অল্প হেতু প্রযুক্ত হওয়ায় সেখানে সাধ্য-সংশয়ই জন্মিবে, অহুমিতি জন্মিতেই পারিবে না, তাহা সংপ্রতিপক্ষিত হেতু। এই বামিত ও সংপ্রতিপক্ষিত হেতু বধন কোথায়ও কখনও যথার্থ অহুমিতির প্রয়োজক হয় না, তখন ঐরূপ হেতুকে প্রকৃত হেতু বলা যায় না। কারণ, সাধ্যসাধনস্থই হেতুর লক্ষণ; তাহা ঐরূপ হেতুতে না থাকায় উহা অহেতু, উহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে হেত্বাভাসই হইবে। মূলকথা হইল যে, হেত্বাভাস শব্দের মধ্যে যে হেতু শব্দ আছে, বৈশেষিক মতে তাহার অর্থ সাধ্যবশ্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবশ্মীতে বর্তমান হেতু, আর তায়মতে উহার অর্থ সাধ্যসাধন বা যথার্থ অহুমিতির প্রয়োজক হেতু। ইহা হইতেই বৈশেষিক ও তায়্যে হেত্বাভাস ত্রিবিধ এবং পঞ্চবিধ, এই দুই মতের স্মৃতি হইয়াছে। (২ আ°, ৪ সূত্র-টিপ্পনীতে তায়দর্শন হেতুর লক্ষণ ত্রৈলোক্য) ॥ ৯ ॥

ভাষ্য। অথ ছলম্

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ হেত্বাভাস নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) ছল (নিরূপণ করিয়াছেন)।

সূত্র। বচনবিষাতোহর্থবিকম্পোপপত্ত্যা ছলং ॥১০॥৫১॥

অনুবাদ। বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ-কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে।

ভাষ্য। ন সামান্যলক্ষণে ছলং শক্যমুদাহর্তুং বিভাগে তদাহরণানি।

অনুবাদ। সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ দেওয়া যায় না। বিভাগে কিন্তু অর্থাৎ ছলের বিশেষ লক্ষণেই উদাহরণগুলি বলিব।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে হেত্বাভাসের পরেই ছলের নাম বলা হইয়াছে। সুতরাং তদন্তরান্নে মহর্ষি হেত্বাভাসের পরেই তাহার উদ্দিষ্ট ছল পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার “অথ ছলং” এই কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রে ‘অর্থবিকল্প’ বলিতে বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনা। ঐ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাদীর বাক্যের বিঘাত করাই ছল। অর্থাৎ যে অর্থ বাদীর তাৎপর্য্যবিষয় নহে, বাদীর বাক্যের সেই অর্থ কল্পনা করিয়া বাদীর প্রযুক্ত

হেতুতে যে দোষ প্রদর্শন, তাহাই ছল। এই ছল বাক্যবিশেষ। বিরুদ্ধার্থ করনাই ছলবাদীর উপপত্তি বা যুক্তি, উহা ছাড়া তাহার আর কোন উপপত্তি নাই। সুতরাং বাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ বা বাদীর তাৎপর্য্যবিবরণীভূত অর্থ ছাড়া বাদীর বাক্যের আর একটা অর্থও ব্যাখ্যা করিতে পারা চাই, নচেৎ ছল হইতে পারিবে না। এই অর্থাস্তর-করনা কেবল কোন শব্দবিশেষকে ধরিয়াই যে হইবে, এমন কথা নহে; যে দিক্ দিয়াই হউক, বাদীর তাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য তাৎপর্য্যের করনা করিয়া বাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিলেই তাহা ছল হইবে। এই ছলের উদাহরণ বিশেষ-লক্ষণে বলা হইয়াছে। কারণ, সেই বিশেষ ছল ভিন্ন ছলের উদাহরণ প্রদর্শন অসম্ভব। ছলের উদাহরণ দেখাইতে হইলেই কোন একটি বিশেষ ছলের উদাহরণকেই উল্লেখ করিতে হইবে। সেই বিশেষ ছলের লক্ষণ না বলিলেও তাহার উদাহরণ দেখান যাইবে না। এ জন্ত ছলের বিশেষ লক্ষণগুলিতেই অর্থাৎ সেই বিশেষ লক্ষণ-স্বত্রত্রয়ের ভাষ্যেই ছলের উদাহরণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যে “বিভাগে তু” এই স্থলে বিভাগ শব্দের দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন,—“বিভজ্যত ইতি বিভাগো বিশেষলক্ষণম্” ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। বিভাগশ্চ।

সূত্র। তৎ ত্রিবিধং বাকুছলং সামান্যচ্ছলমুপ-
চারচ্ছলঞ্চ ॥ ১১॥৫২ ॥

অনুবাদ। বিভাগ অর্থাৎ ছলের বিভাগ-সূত্র। সেই ছল তিন প্রকার,—
(১) বাকুছল, (২) সামান্যচ্ছল এবং (৩) উপচারচ্ছল।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ছলের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়া এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি ছলের বিভাগ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ নামের দ্বারা বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলির উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নাম কীর্তনকে বিভাগ বলে। উহা উদ্দেশ্যেরই অন্তর্ভূত। উহা না করিলে বিশেষ লক্ষণ বলা যায় না, এ জন্ত উহা করিতে হয়। পরন্তু নিয়মের জন্তও উহা করা হয়। ছল বহু প্রকার হইতে পারিলেও এই সূত্রোক্ত তিন প্রকারের মধ্যেই সমস্ত ছল আছে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার ছল আর নাই, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তও মহর্ষি ছলের এই বিভাগসূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যে বিভাগ শব্দের দ্বারা এখানে বিভাগসূত্র বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন,—“বিভজ্যতেহেনেনেতি বিভাগঃ সূত্রমুচ্যতে”।

এই সূত্রের শেষে একটি ‘ইতি’ শব্দ অনেক পুস্তকেই দেখা যায়। মুদ্রিত ভাষ্যবার্ত্তিকও উহা দেখা যায়। কিন্তু এখানে ‘ইতি’ শব্দের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও তাহার ভাষ্যসূচীনিবন্ধে ইতিশব্দান্ত সূত্র গ্রহণ করেন নাই। “তৎ ত্রিবিধং” এই অংশও অনেকে ভাষ্যকারের কথা বলিয়া সূত্রে গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ উহা সূত্রের অন্তর্গত। অহুমান-সূত্রে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন আছে (পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য) ॥১১॥

ঐ হেতু দৃষ্ট হইবে না। কারণ, হেতুর প্রকৃত লক্ষণ তাহাতে আছেই, সুতরাং ঐ হেতু হেতুভাসের মধ্যে গণ্য নহে, ইহাই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যুক্তি।

জ্ঞানার্চ্য মহর্ষি গোতমের অভিপ্রায় মনে হয় এই যে, যে হেতুহলে অনুমিতি হইলে যথার্থ অনুমিতিই হয়, তাহাকেই হেতু বলা উচিত। যে হেতু সাধ্যবর্ণের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবর্ণীতে বর্তমান হইলেও কোন স্থলে সাধ্যবর্ণীতে বস্তুতঃ সাধ্যবর্ণ না থাকায় যথার্থ অনুমিতির প্রয়োজক হইতেই পারিবে না, সেখানে অনুমিতি হইলেও ভ্রম অনুমিতি হইবে, সেই হেতু বাণিত। এবং যে হেতুর তুল্যবল প্রতিপক্ষ অন্য হেতু প্রযুক্ত হওয়ায় সেখানে সাধ্য-সংশয়ই জন্মিবে, অনুমিতি জন্মিতেই পারিবে না, তাহা সংপ্রতিপক্ষিত হেতু। এই বাণিত ও সংপ্রতিপক্ষিত হেতু যখন কোথাও কখনও যথার্থ অনুমিতির প্রয়োজক হয় না, তখন ঐরূপ হেতুকে প্রকৃত হেতু বলা যায় না। কারণ, সাধ্যসাধনই হেতুর লক্ষণ; তাহা ঐরূপ হেতুতে না থাকায় উহা অহেতু, উহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে হেতুভাসই হইবে। মূলকথা হইল যে, হেতুভাস শব্দের মধ্যে যে হেতু শব্দ আছে, বৈশেষিক মতে তাহার অর্থ সাধ্যবর্ণের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবর্ণীতে বর্তমান হেতু, আর জ্ঞানমতে উহার অর্থ সাধ্যসাধন বা যথার্থ অনুমিতির প্রয়োজক হেতু। ইহা হইতেই বৈশেষিক ও জ্ঞানে হেতুভাস ত্রিবিধ এবং পঞ্চবিধ, এই দুই মতের সৃষ্টি হইরাছে। (২ অ°, ৪ সূত্র-টিপ্পনীতে জ্ঞানমত হেতুর লক্ষণ দ্রষ্টব্য) ॥ ৯ ॥

ভাষ্য। অথ ছলম্

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ হেতুভাস নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) ছল (নিরূপণ করিয়াছেন)।

সূত্র। বচনবিধাতোর্থবিকম্পোপপত্ত্যা ছলং ॥১০॥৫১॥

অনুবাদ। বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থকল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে।

ভাষ্য। ন সামান্যলক্ষণে ছলং শক্যমুদাহর্তুং বিভাগে উদাহরণানি।

অনুবাদ। সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ দেওয়া যায় না। বিভাগে কিন্তু অর্থাৎ ছলের বিশেষ লক্ষণেই উদাহরণগুলি বলিব।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে হেতুভাসের পরেই ছলের নাম বলা হইরাছে। সুতরাং তদন্তসারে মহর্ষি হেতুভাসের পরেই তাহার উদ্ভিষ্ট ছল পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার “অথ ছলং” এই কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রে ‘অর্থবিকল্প’ বাক্যে বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনা। ঐ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাদীর বাক্যের বিঘাত করাই ছল। অর্থাৎ যে অর্থ বাদীর তাৎপর্য্যবিষয় নহে, বাদীর বাক্যের সেই অর্থ কল্পনা করিয়া বাদীর প্রযুক্ত

হেতুতে যে দোষ প্রদর্শন, তাহাই ছল। এই ছল বাক্যবিশেষ। বিরুদ্ধার্থ করনাই ছলবাদীর উপপত্তি বা যুক্তি, উহা ছাড়া তাহার আর কোন উপপত্তি নাই। সূত্ররূপ বাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ বা বাদীর তাৎপর্যবিপরীত অর্থ ছাড়া বাদীর বাক্যের আর একটা অর্থও ব্যাখ্যা করিতে পারা চাই, নচেৎ ছল হইতে পারিবে না। এই অর্থান্তর-করনা কেবল কোন শব্দবিশেষকে ধরিয়াই যে হইবে, এমন কথা নহে; যে দিক্ দিয়াই হউক, বাদীর তাৎপর্য ভিন্ন অল্প তাৎপর্যের করনা করিয়া বাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিলেই তাহা ছল হইবে। এই ছলের উদাহরণ বিশেষ-লক্ষণে বলা হইয়াছে। কারণ, সেই বিশেষ ছল ভিন্ন ছলের উদাহরণ প্রদর্শন অসম্ভব। ছলের উদাহরণ দেখাইতে হইলেই কোন একটি বিশেষ ছলের উদাহরণকেই উল্লেখ করিতে হইবে। সেই বিশেষ ছলের লক্ষণ না বলিলেও তাহার উদাহরণ দেখান যাইবে না। এ জ্ঞাত ছলের বিশেষ লক্ষণগুলিতেই অর্থাৎ সেই বিশেষ লক্ষণ-সূত্রত্রয়ের ভাষ্যেই ছলের উদাহরণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যে “বিভাগে তু” এই স্থলে বিভাগ শব্দের দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন,—“বিভজ্যত ইতি বিভাগো বিশেষলক্ষণম্” ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। বিভাগশ্চ।

সূত্র। তৎ ত্রিবিধং বাকুছলং সামান্যচ্ছলমুপ-
চারচ্ছলঞ্চ ॥ ১১॥৫২ ॥

অনুবাদ। বিভাগ অর্থাৎ ছলের বিভাগ-সূত্র। সেই ছল তিন প্রকার,—
(১) বাকুছল, (২) সামান্যচ্ছল এবং (৩) উপচারচ্ছল।

টীকণী। পূর্বসূত্রের দ্বারা ছলের সামান্য লক্ষণ হুচনা করিয়া এই সূত্রের দ্বারা মর্হণি ছলের বিভাগ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ নামের দ্বারা বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলির উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নাম কৌতুককে বিভাগ বলে। উহা উদ্দেশ্যেরই অন্তর্ভূত। উহা না করিলে বিশেষ লক্ষণ বলা যায় না, এ জ্ঞাত উহা করিতে হয়। পরন্তু নিয়মের জ্ঞাতও উহা করা হয়। ছল বহু প্রকার হইতে পারিলেও এই সূত্রোক্ত তিন প্রকারের মধ্যেই সমস্ত ছল আছে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার ছল আর নাই, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জ্ঞাতও মর্হণি ছলের এই বিভাগসূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যে বিভাগ শব্দের দ্বারা এখানে বিভাগসূত্র বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন,—“বিভজ্যতেহেনেনেতি বিভাগঃ সূত্রমুচ্যতে”।

এই সূত্রের শেষে একটি ‘ইতি’ শব্দ অনেক পুস্তকেই দেখা যায়। মুদ্রিত ভাষ্যবার্ত্তিকেরও উহা দেখা যায়। কিন্তু এখানে ‘ইতি’ শব্দের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রঃ তাঁহার ভাষ্যহট্টনিবন্ধে ইতিশব্দান্ত সূত্র গ্রহণ করেন নাই। “তৎ ত্রিবিধং” এই অংশও অনেকে ভাষ্যকারের কথা বলিয়া সূত্রে গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ উহা সূত্রের অন্তর্গত। অহুমান-সূত্রে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন আছে (পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য) ॥ ১১ ॥

ভাষ্য । তেষাং

সূত্র । অবিশেষাভিহিতার্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থা-
ন্তরকম্পনা বাক্চ্ছলম্ ॥ ১২ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ । সেই ত্রিবিধ ছলের মধ্যে অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ দ্বিবিধ অর্থের বোধক সমান শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ বিষয়ে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনা অর্থাৎ ঐরূপ অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা যে দোষ প্রদর্শন, তাহা বাক্চ্ছল ।

ভাষ্য । নবকম্পলোহয়ং মাণবক ইতি প্রয়োগঃ । অত্র নবঃ কম্পলোহ-
স্তেতি বক্তুরভিপ্রায়ঃ । বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে । তত্রায়ং ছলবাদী
বক্তুরভিপ্রায়াদবিবক্ষিতমন্তমর্থং নবকম্পলা অস্তেতি তাবদভিহিতং
ভবতেতি কল্পয়তি । কল্পয়িত্বা চাসম্ভবেন প্রতিষেধতি, একোহস্মৈ কম্পলঃ
কুতো নবকম্পলা ইতি । তদ্বাদং সামান্যশব্দে বাচি ছলং বাক্চ্ছলমিতি ।

অনুবাদ । ‘এই বালক নবকম্পলবিশিষ্ট’ এইরূপ প্রয়োগ হইল । এই প্রয়োগে
এই বালকের নূতন কম্পল, ইহাই বক্তার অভিপ্রায় অর্থাৎ অভিপ্রেত । বিগ্রহে
অর্থাৎ ‘নবকম্পল’ এই বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যেই বিশেষ আছে, সমাসে বিশেষ
নাই । সেই প্রয়োগে এই ছলবাদী বক্তার অভিপ্রেত ভিন্ন – কি না অবিবক্ষিত অর্থাৎ
বক্তা যে অর্থ বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, এমন অর্থ ‘এই’ বালকের নয়খানা কম্পল,
ইহা আপনি বলিয়াছেন’, এইরূপে কল্পনা করে । কল্পনা কবিয়া অসম্ভব হেতুক
প্রতিষেধও করে । (সে প্রতিষেধ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) এই বালকের
একখানা কম্পল, নয়খানা কম্পল কোথায় ? সেই এই সামান্য শব্দ অর্থাৎ উভয়
অর্থেই সমান শব্দরূপ বাক্যানিমিত্তক ছল বাক্চ্ছল ।

টিপ্পনী । মহাধিকথিত ত্রিবিধ ছলের মধ্যে প্রথম বাক্চ্ছল । বাক্যানিমিত্তক যে ছল
অর্থাৎ উভয় অর্থে বাক্যটি সমান হওয়ায় এবং সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করাতেই ছল করিতে
পারায় বাক্য যে ছলের নিমিত্ত, সেই ছলকে বাক্চ্ছল বলে । ইহাই বাক্চ্ছল শব্দের বুৎপত্তি-
লভ্য অর্থ । ভাষ্যে “বাচি ছলং” এই কথার দ্বারা শেষে বাক্চ্ছল শব্দের এই বুৎপত্তি প্রদর্শিত
হইয়াছে । ঐ স্থলে ‘বাচি’ এখানে নিমিত্তার্থে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । সূত্রে ‘অবিশেষা-
ভিহিত’ এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত উভয়ার্থে সমান শব্দকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । উদ্যোত-
কর ঐ কথার দ্বারা সমান বাক্য বা সমান পদই বুঝিতে বলিয়াছেন । তাহা হইলে যে বাক্য
বা যে পদ নির্দিষ্টভাবে অভিহিত অর্থাৎ উভয় অর্থেই সমানরূপে উচ্চারিত, তাহাই সূত্রে বলা

হইয়াছে “অবিশেষাভিহিত”। ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থবিষয়ে যে অর্থাভ্রের
কল্পনা, তাহা বাক্‌ছল। সূত্রে ‘অ’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ
শব্দে অর্থান্তর করণা নহে, ঐরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার একটি অর্থ আর একটি অর্থের
কল্পনা অর্থাৎ যে অর্থটি বক্তার তাৎপর্য্যবিষয় নহে, সেই অর্থকে বক্তার তাৎপর্য্যবিষয় বলিয়া
কল্পনা। সূত্রে “বক্তুরভিপ্রায়াং” এই কথা থাকায় এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। উদ্যোতকর সূত্রে
অর্থ শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন। সূত্রে অভিপ্রায় শব্দের অর্থ এখানে
‘অভিপ্রের্ত’। অভিপ্রায় শব্দের ‘ইচ্ছা’ অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রে কোনরূপ উপপত্তি (বক্তুরভিপ্রায়াং
উপেক্ষা অবিজ্ঞায় ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া) করিতে পারিলেও ভাষ্যে অভিপ্রায় শব্দের অভিপ্রের্ত
অর্থই স্পষ্টরূপে মনে হয়। বক্তার অভিপ্রের্ত হইতে অল্প, অর্থাৎ বক্তার অনভিপ্রের্ত অর্থ।
তাহারই বিবরণ অবিকল্পিত অর্থাৎ বক্তা যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, এমন অর্থ।

এখন এই বাক্‌ছলের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। কোন বালক একখানা নূতন কঞ্চল গায়ে
দিয়া আসিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া কোন বাদী বলিলেন,—“নবকঞ্চলোহয়ং মাণবকঃ” অর্থাৎ
এই বালক নূতন কঞ্চলবিশিষ্ট। এখানে ‘নবকঞ্চল’ এইটি বহুব্রীহি সমাস। “নবঃ কঞ্চলোহয়ং”
এইরূপ ব্যাসবাক্যে উহার দ্বারা বুঝা যায়, এই ব্যক্তির নূতন কঞ্চল আছে। “নব কঞ্চলা অস্ত্র”
এইরূপ ব্যাসবাক্যে উহার দ্বারা বুঝা যায়, এই ব্যক্তির নবখানা কঞ্চল আছে। বিবিধ ব্যাসবাক্যেই
নবকঞ্চল এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হয়, সূত্ররাং সমাসে কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ উভয় অর্থেই
‘নবকঞ্চল’ এইটি সমান শব্দ, ব্যাসবাক্যেই কেবল বিশেষ আছে। এবং এক পক্ষে নব শব্দ,
অস্ত্র পক্ষে নবন্ শব্দ। নব শব্দের অর্থ নূতন, নবন্ শব্দের অর্থ নব সংখ্যক, কিন্তু উভয় পক্ষেই
‘নবকঞ্চল’ এই বাক্যটি সমান। “নবকঞ্চল” বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থবিষয়ের মধ্যে ‘নূতন কঞ্চলবিশিষ্ট’
এইরূপ অর্থই বক্তার অভিপ্রের্ত এবং সেখানে ঐরূপ অর্থই সম্ভব, বিত্তীয় অর্থটি সম্ভবও নহে।
কিন্তু ছলবাদী প্রতিবাদী বলিয়া বলিলেন—কে, এই বালকের নবখানা কঞ্চল কোথায়? ইহার ত
একখানা ছাড়া আর কঞ্চল দেখি না। প্রতিবাদী ঐরূপ অর্থান্তর করণা করিয়া অসম্ভবের
দ্বারা এখানে বাদীর কথার প্রতিবেশ করিলেন। এই ছল ঐ স্থলে ‘নবকঞ্চল’ এই বাক্যানিমিত্তক।
বাদী নব কঞ্চল না বলিয়া যদি ‘নূতন কঞ্চল’ এইরূপ কথা বলিতেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী ঐ
ছল করিতে পারিতেন না, বিরুদ্ধার্থ করণরূপ উপপত্তি ঘটিত না, সূত্ররাং ঐরূপ ছল বাক্‌ছল।
যখন কোন বাদী অগ্রমানের দ্বারা অপরকে বুঝাইতে যাইবেন,—“নেপালাদাগতোহয়ং নবকঞ্চলস্বাং,
আচ্যোহয়ং নবকঞ্চলস্বাং” অর্থাৎ এই ব্যক্তি নেপাল দেশ হইতে আসিয়াছে অথবা এই ব্যক্তি ধনী,
কারণ, এই ব্যক্তি নবকঞ্চলবিশিষ্ট, এতাদৃশ নবকঞ্চল নেপাল ভিন্ন আর কোথাও মিলে না এবং
দরিদ্র লোকেও ক্রয় করিতে পারে না। এইরূপ স্থাপনার ছলকারী প্রতিবাদী যদি বলেন, এই
ব্যক্তির নবখানা কঞ্চল নাই, তাহা হইলে তিনি বাদীর হেতুকে সাধ্যদম বা অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস
বলিলেন। অর্থাৎ তোমার প্রযুক্ত হেতু এই ব্যক্তিতে নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহাই তোমার প্রকৃত
বক্তব্য। সূত্ররাং ঐরূপ অর্থান্তর করণার দ্বারা বাদীর হেতুর দোষ প্রদর্শনই ঐ স্থলে ছলের

প্ৰকৃত উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ তাহাতে বাদীৰ হেতুৰ অসিদ্ধত্ব প্ৰদৰ্শন হয় না। কাৰণ, বাদীৰ হেতু নূতন কথনবিশিষ্ট, তাহা সেই ব্যক্তিগতে আছেই। বাদীৰ বিবক্ষিত হেতুতে দোষ প্ৰদৰ্শন না হওয়ায় ঐ ছল সচ্ছত্ৰ নহে, ঐ জ্ঞানই উহা অসচ্ছত্ৰ। বাদীৰ হেতুতে যদি অত্ৰ কোন দোষও থাকে, তথাপি ছলকাৰী যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। কাৰণ, ছলকাৰী অত্ৰ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, বাদীৰ অভিপ্ৰেত অৰ্থে দোষ দেখাইতে পাবেন নাই।

পৰবৰ্তী স্তায়াচাৰ্য্যগণ এইৰূপে নবকথনত্ব হেতু গ্ৰহণ কৰিয়াই বাক্ছল্যেৰ পূৰ্ণোক্ত প্ৰকাৰ উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছেন। ভাষ্যকাৰ নবকথনত্বকে সাধ্যাধৰ্মৰূপে গ্ৰহণ কৰিয়াই উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছেন, সেৱেপেও ছল হইতে পারে। নবকথনত্ব সাধন কৰিতে যে হেতু প্ৰয়োগ কৰা হইবে, সেই হেতু বাধিত, উহা সাধ্যাধৰ্মশূন্য ধৰ্ম্মাৰ্থে থাকায় হেত্বাভাৱ, ইহাই দেখানে ছল-বাদীৰ শেষ বক্তব্য হইবে। ফলকথা, যে দিকেই হউক, পূৰ্ণোক্ত প্ৰকাৰ অৰ্ণাস্ত্ৰ কৰনাৰ দ্বাৰা বাদীৰ হেতুতে যে কোনৰূপ দোষ প্ৰদৰ্শনই বাক্ছল্যেৰ উদ্দেশ্য। এইৰূপ “গোৰ্কিবাণী” এইৰূপ প্ৰয়োগ কৰিলে যদি কেহ বলেন,—বাণেৰ শূন্য কোথাৰ ? বাণেৰ শূন্য নাই; স্তত্ৰাং বাণে শূন্য সাধন কৰিতে তুমি যে হেতু প্ৰয়োগ কৰিবে, তাহা বাধিত হইবে। গো শব্দেৰ অনেক অৰ্থ অভিধানে কথিত হইয়াছে। স্তায়মতে স্লিষ্ট শব্দেৰ সবগুলি অৰ্থই মুখ্য। গো শব্দেৰ গো অৰ্থেৰ স্তায় বাণ অৰ্থও মুখ্য। বাদী গো অৰ্থে এখানে গো শব্দেৰ প্ৰয়োগ কৰিয়াছেন, কিন্তু প্ৰতিবাদী ‘বাণ’ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰিয়া পূৰ্ণোক্ত প্ৰকাৰ কথা বলিলে তাহা বাক্ছল্য হইবে। এবং বিবাণ শব্দেৰ পশুশূদ্র এবং হস্তিদন্ত এই উভয় অৰ্থই অভিধানে অভিহিত আছে। (পশুশূদ্রভনস্তয়ো-ৰ্কিবাণং ইত্যমরঃ)। কোন বাদী “গজো বিবাণী” এইৰূপ প্ৰয়োগ কৰিলে যদি কেহ বিবাণ শব্দেৰ শূন্য অৰ্থ গ্ৰহণ কৰিয়া বলেন, হস্তীৰ শূন্য কোথাৰ ? হস্তীৰ শূন্য নাই, তাহা হইলেও বাক্ছল্য হইবে। বাদী ঐ স্থলে হস্তিদন্ত অৰ্থেই বিবাণ শব্দেৰ প্ৰয়োগ কৰিয়াছেন, স্তত্ৰাং বাদীৰ অভিপ্ৰেত অৰ্থে কোন দোষ নাই। এইৰূপ কোন বাদী বলিলেন,—“খেতো ধাবতি”। খেত শব্দেৰ দ্বাৰা খেতৰূপ-বিশিষ্ট অৰ্থই এখানে বাদীৰ অভিপ্ৰেত। পূৰ্ণোক্ত বাদীৰ বাক্য শ্ৰবণ কৰিয়া প্ৰতিবাদী বাদীৰ ‘খেতঃ’ এই কথাৰ মধ্যে ‘খা ইতঃ’ এইৰূপে সন্ধি বিশ্লেষ কৰিয়া যদি বলেন, এই স্থান দিয়া ত কুৰুৰ বাহিতেছে না, কুৰুৰ কোথাৰ ? তাহা হইলে এখানেও বাক্ছল্য হইবে। খন্ শব্দেৰ কুৰুৰ অৰ্থ প্ৰসিদ্ধই আছে। খন্ শব্দেৰ প্ৰথম অৰ্ধ একবচনে পুংলিঙ্গে ‘খা’ এইৰূপ পদ হয়, স্তত্ৰাং ‘খা ইতো ধাবতি’ এইৰূপে পূৰ্ণোক্ত বাদিবাক্যেৰ ব্যাখ্যা কৰিয়া প্ৰতিবাদী ঐৰূপ ছল কৰিতে পাবেন, কিন্তু বাদীৰ অভিপ্ৰেত অৰ্থে দোষ না হওয়ায় উহা সচ্ছত্ৰ হইবে না। সৰ্ব্বত্ৰই বাদীৰ অভিপ্ৰেত অৰ্থে দোষ প্ৰদৰ্শন না হওয়ায় ছল মাত্ৰই অসচ্ছত্ৰ। বাদীৰ অভিপ্ৰেত অৰ্থ বুঝিয়াই হউক আৰু মা বুঝিয়াই হউক, পূৰ্ণোক্ত প্ৰকাৰে অৰ্ণাস্ত্ৰ কৰনাৰ দ্বাৰা দোষোদ্ভাবন কৰিলে ছল কৰা হয়। অত্ৰা ছলেও তাহা হইতে পারে, অৰ্ণাং বাদীৰ অভিপ্ৰেত অৰ্থ বুঝিয়াও ছল কৰা বাহিতে পারে, উদ্যোতকৰ ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। এই বাক্ছল্যেৰ বৈচিত্ৰ্য্যটো গ্ৰহণ কৰিয়াই আলঙ্কাৰিকগণ শ্লেষবক্ৰোক্তি নামে অলঙ্কাৰ গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। যেন “কে যুগং স্থল এব সম্প্ৰতি বয়ং” ইত্যাদি

কবিতায় প্রসঙ্গ হইয়াছে—“কে যুগং” অর্থাৎ তোমরা কে ? উত্তরবাদী ‘ক’ শব্দের সপ্তমীর একবচনে ‘কে’ এই পদ ধরিয়া এবং ‘ক’ শব্দের জল অর্থ অভিধানে অভিহিত থাকায়, ঐ জল অর্থ গ্রহণ করিয়া ‘কে যুগং’ এই প্রশ্ন-বাক্যের ‘জলে যুগং’ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ বাদীর অভিপ্রেত অর্থ হইতে অন্য অর্থের কল্পনা করিয়া প্রতিবাদ করিলেন—“হল এব সম্প্রতি যুগং” অর্থাৎ আমরা জলে কোথায় ? আমরা সম্প্রতি হলেই আছি । এই বক্রোক্তি কাব্যে বাগ্‌বৈচিত্র্য সম্পাদন করায় শব্দালঙ্কার মধ্যে গণ্য হইয়াছে । মনে হয়, গোতমোক্ত বাক্যই এই বক্রোক্তি অলঙ্কার উদ্ভাবন করাইয়াছে ।

ভাষ্য । অস্ত্র প্রত্যবস্থানং—সামান্যশব্দস্থানেকার্থত্বেহন্তর্য্যভিধান-কল্পনায়াং বিশেষবচনং । নবকম্বল ইত্যনেকার্থস্ত্র্য্যভিধানং, নবঃ কম্বলোহস্ত্র নবকম্বলা অস্ত্রোতি । এতন্নিহ্ন প্রযুক্তে যেয়ং কল্পনা, নব-কম্বলা অস্ত্রেত্যেতদভবতাহভিহিতং তচ্চ ন সম্ভবতীতি । এতস্ত্র্য্যমন্তর্য্য-ভিধানকল্পনায়াং বিশেষো বক্তব্যঃ, যস্মাদৃবিশেষোহর্থবিশেষেষু বিজ্ঞায়-তেহয়মর্থোহেননাভিহিত ইতি । স চ বিশেষো নাস্তি, তস্মান্মিথ্যাভিযোগ-মাত্রমেতদ্বিতি ।

প্রসিদ্ধশ্চ লোকে শব্দার্থসম্বন্ধোহভিধানাভিধেয়নিয়মনিয়োগঃ, অস্ত্রা-ভিধানস্ত্র্যয়মর্থোহভিধেয় ইতি, সমানঃ সামান্যশব্দস্ত্র, বিশেষো বিশিষ্টশব্দস্ত্র, প্রযুক্তপূর্বাশ্চেষ্মে শব্দা অর্থে প্রযুক্ত্যন্তে নাপ্র-যুক্তপূর্বাঃ, প্রয়োগশ্চার্থসম্প্রত্যয়ার্থঃ, অর্থপ্রত্যয়ান্ন ব্যবহার ইতি । তত্রৈবমর্থগত্যর্থো শব্দপ্রয়োগে সামর্থ্যাৎ সামান্যশব্দস্ত্র প্রয়োগ-নিয়মঃ । অজ্ঞাং গ্রামং নয়, সর্পিরাহর, ভ্রাক্ষণং ভোজয়েতি । সামান্যশব্দাঃ সন্তোহর্থাবয়বেষু প্রযুক্ত্যন্তে সামর্থ্যাৎ, যত্রার্থক্রিয়াচোদনা সম্ভবতি তত্র প্রবর্তন্তে নর্থসামান্যে, ক্রিয়াচোদনাসম্ভবাৎ । এবময়ং সামান্যশব্দো নবকম্বল ইতি, যোহর্থঃ সম্ভবতি নবঃ কম্বলোহস্ত্রোতি তত্র প্রবর্ততে, যন্ত ন সম্ভবতি নবকম্বলা অস্ত্রোতি তত্র ন প্রবর্ততে । সোহয়মনুপপাদ্যমানার্থ-কল্পনয়া পরবাক্যোপালম্বো ন কল্পত ইতি ।

অনুবাদ । এই বাক্যের প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ বা খণ্ডন (বলিতেছি) অর্থাৎ ইহা যে সঙ্গত নহে, তাহা বাদী যেরূপে বুকাইবেন, তাহা বলিতেছি । সামান্য শব্দের অনেকার্থতা থাকিলে অর্থাৎ কোন একটি সামান্য শব্দের যদি একাধিক

মুখ্যার্থ থাকে, তবে সেখানে একতর অর্থের অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ অর্থের কখন কল্পনা করিলে বিশেষ বলিতে হয়। বিশদার্থ এই যে, নবকম্বল শব্দের দ্বারা একাধিক অর্থের কখন হয়, (সে কি কি অর্থ, তাহা বলিতেছেন) ইহার নূতন কম্বল আছে (এবং) ইহার নয়খানা কম্বল আছে। এই নবকম্বল শব্দ প্রয়োগ করিলে ইহার নয়খানা কম্বল আছে, ইহা আপনি বলিয়াছেন, এই যে কল্পনা—তাহা সম্ভব হয় না। (কারণ) এই একতর অর্থের কখন কল্পনা করিলে অর্থাৎ ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এই অর্থবিশেষই নবকম্বল শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা কল্পনা করিলে বিশেষ বলিতে হইবে। যে বিশেষ বশতঃ অর্থবিশেষগুলির মধ্যে এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ অভিহিত হইয়াছে, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ অর্থবিশেষ বুঝা যায়, সে বিশেষ কিন্তু নাই, অর্থাৎ এখানে নবকম্বল শব্দের দ্বারা ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এই অর্থই বুঝিতে হইবে, এই বিষয়ে কোন বিশেষ অর্থাৎ প্রকরণ প্রভৃতি নিয়ামক নাই, সূত্রাং ইহা মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। (তাৎপর্য্য এই যে, যখন নবকম্বল শব্দের দ্বারা মুখ্যরূপেই দুইটি অর্থের বোধ হয় এবং তন্মধ্যে এখানে ইহার নূতন কম্বল আছে, এই অর্থই সম্ভব, তখন ঐ সম্ভব অর্থ গ্রহণ না করিয়া ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এইরূপ অসম্ভব অর্থটির গ্রহণ করা এবং বাদী ঐরূপই বলিয়াছেন বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অশুচিত)।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধই আছে। (সে সম্বন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন) অভিধান ও অভিধেয়ের অর্থাৎ শব্দ এবং তাহার বাচ্য অর্থের যে নিয়ম, তদ্বিষয়ে নিয়োগ, অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থই বুঝিতে হইবে, এইরূপ সঙ্কেত। (অভিধান ও অভিধেয়ের নিয়ম কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) এই শব্দের এই অর্থই অভিধেয় (বাচ্য), অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম বিষয়ে যে শব্দ-সংকেত, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ। (এই সম্বন্ধ) সামান্য শব্দের সমান অর্থাৎ সামান্য, বিশিষ্ট শব্দের বিশেষ। (শব্দ ও অর্থের এইরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে কি ? এ জন্ম বলিতেছেন) প্রযুক্তপূর্ব্ব এই সকল শব্দই অর্থে (সেই সেই বাচ্য অর্থে) প্রযুক্ত হইতেছে, অপ্রযুক্তপূর্ব্ব এই সকল শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে না অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধানুসারে পূর্ব্ব হইতেই এই সকল শব্দের সেই সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, এই সকল শব্দের পূর্ব্ব কখনও প্রয়োগ হয় নাই, এমন নহে। (তাহাতেই বা কি ? এ জন্ম বলিতেছেন) অর্থ বোধের জন্মই প্রয়োগ হইতেছে এবং অর্থবোধ বশতঃই ব্যবহার হইতেছে। (এ বাবৎ বাহা

বলিলেন, প্রকৃত স্থলে তাহার যোজনা করিতেছেন) অর্থবোধার্থ অর্থাৎ অর্থবোধই বাহার প্রয়োজন, এমন সেই এই প্রকার শব্দ প্রয়োগে সামান্য শব্দের সামর্থ্য বশতঃ প্রয়োগের নিয়ম-আছে। (উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক পূর্বোক্ত কথা বুঝাইতেছেন) 'ছাগীকে গ্রামে লইয়া যাও', 'দুত আহরণ কর', 'ত্রাক্ষণকে ভোজন করাও'। সামান্য শব্দ হইয়াও অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যে অজা, সর্পিষ্ এবং ত্রাক্ষণ শব্দ যথাক্রমে সামান্যতঃ ছাগী মাত্র, দুত মাত্র এবং ত্রাক্ষণ মাত্রের বোধক হইয়াও সামর্থ্য বশতঃ ঐ সকল অর্থের অংশবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যে ঐ তিনটি শব্দ যথাক্রমে ছাগীবিশেষ, দুতবিশেষ এবং ত্রাক্ষণবিশেষই বুঝাইতেছে। (সামর্থ্য কি, তাহা বলিতেছেন) যে অর্থে প্রয়োজন নির্বাহের উপদেশ সম্ভব হয়, সেই অর্থে (শব্দগুলি) প্রবৃত্ত হয়, অর্থসামান্যে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ, (অর্থসামান্যে) প্রয়োজন নির্বাহের উপদেশ সম্ভব হয় না। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে ছাগী মাত্রকে গ্রামে লওয়া, দুতমাত্রকে আহরণ করা এবং ত্রাক্ষণ মাত্রকে ভোজন করান অসম্ভব, সুতরাং ঐরূপ উপদেশ বা আদেশ সম্ভব নহে, এ জ্ঞাত ঐ স্থলে অজা শব্দ ছাগীবিশেষ অর্থে, সর্পিষ্ শব্দ দুতবিশেষ অর্থে এবং ত্রাক্ষণ শব্দ ত্রাক্ষণবিশেষ অর্থেই প্রযুক্ত হয়, বুঝিতে হইবে)।

এইরূপ 'নবকম্বল' এইটি সামান্য শব্দ; 'ইহার নূতন কম্বল আছে' এইরূপ যে অর্থ (এখানে) সম্ভব হয়, সেই অর্থে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সেই অর্থই বুঝায়। ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এইরূপ যে অর্থ কিন্তু সম্ভব হয় না, সেই অর্থে প্রবৃত্ত হয় না অর্থাৎ তাহা বুঝায় না, ঐ স্থলে ঐরূপ অসম্ভব অর্থে উহার প্রয়োগ হয় না। (সুতরাং) অনুপপাদ্যমান অর্থাৎ বাহ্য উপপন্ন হয় না, বাহ্য অসম্ভব, এমন অর্থের কল্পনার দ্বারা সেই এই অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার পরবাক্য-প্রতিষেধ যুক্তিযুক্ত হয় না।

টিপ্পনা। প্রতিবাদী পূর্বোক্ত প্রকার ছল করিলে, বাদী উহা যে অসম্ভব, উহা একটা নিখ্যা অল্পযোগ বা অভিযোগ মাত্র, ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইবেন; তাহাকেই বলে ছলের প্রত্যবস্থান। প্রতিকূল ভাবে অবস্থানই প্রত্যবস্থান। ছলবাদী বাহ্য বলিয়াছেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না, তাহার করণা অযুক্ত, ইহা বুঝাইলেই তাহার ছলের প্রতিকূল ভাবে অবস্থান হয়। ফলতঃ প্রতিবাদ পূর্বক কাহারও প্রতিষেধ করা বা খণ্ডন করাকেই প্রত্যবস্থান বলে এবং বস্তুতঃ প্রতিষেধ না হইলেও তাহাকে প্রত্যবস্থান বলা হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার এখানে শিষ্য-হিতের জন্ত তাহার পূর্বপ্রদর্শিত বাক্যগুলির কিরূপে প্রতিষেধ

করিতে হইবে, তাহা বলিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ সংক্ষেপে একটি সম্বন্ধের দ্বারা বক্তব্যটি বলিয়া পরে নিজেই তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহাকেই বলে স্বপদবর্ণন, ভাব্যগ্রন্থের উহা একটি লক্ষণ। বহু স্থলে কেবল স্বপদবর্ণন থাকিতেই ভাব্যনির্দীহ হইয়া থাকে।

ভাব্যকারের প্রথম কথার মর্ম্ম এই যে, যে সকল অনেকার্গ-বোধক সামান্য শব্দ আছে, যেমন গো শব্দ, হরি শব্দ এবং নবকঞ্চল প্রভৃতি বাক্যরূপ শব্দ, ইহাদিগের দ্বারা কোন একটি বিশেষ অর্থ বুঝিতে হইলে দেশ, কাল, প্রকরণ, ঐচ্ছিত্য প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ামক বুঝা আবশ্যক, নচেৎ প্রকৃত স্থলে কোন অর্থ বক্তার অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত, তাহা বুঝা যায় না। নবকঞ্চল এইরূপ বহুব্রীহি সমাসসিদ্ধ বাক্যের দ্বারা যে ছুইটি অর্থ বুঝা যায়, তাহার মধ্যে বাদীর কোন অর্থ বিবক্ষিত, তাহা বুঝিতে হইলে কোন অর্থ দেখানে সম্ভব, তাহা চিন্তা করিতে হইবে এবং কোন একটি অর্থবিশেষের ব্যাখ্যা করিতে গেলেও কেন সেই অর্থবিশেষের ব্যাখ্যা করিতেছি, কোন বিশেষ বা নিয়ামক দেখিয়া সেই বিশেষ অর্থটিই বাদীর বিবক্ষিত বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তাহা বলিতে হইবে, তাহা না বলিলে লোকে সে কল্পনা শুনিবে কেন? যেজাহ্নবীর একটা ব্যাখ্যা করিয়া কাহারও কথার দোষ ধরিলে তাহাই বা টিকিবে কেন? সুতরাং পূর্নোক্ত স্থলে ছলবাদী বাদীর অনেকার্গপ্রতিপাদক ‘নবকঞ্চল’ এই সামান্য শব্দ শ্রবণ করিয়া যে বাদীকে বলিলেন—আপনি এই ব্যক্তির নরখানা কঞ্চল আছে বলিয়াছেন, তাহার এই কল্পনা করিতে তিনি ঐ স্থলে ঐ অর্থ বুঝিবার পক্ষে কোন বিশেষ বা নিয়ামক পাইয়াছেন, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাহা যখন তিনি বলিতে পারেন না, সেই বিশেষ এখানে যখন কিছুই নাই, তখন তাহার এই কল্পনা অসম্ভব। কোন বিশেষ না থাকিলে অনেকার্গ-প্রতিপাদক বাক্য বা শব্দের কোন একটি বিশেষ অর্থের কখন কল্পনা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বাদীর কথিত বালকের গাত্রে যদি পুরাতন কঞ্চল থাকিত অথবা অল্প কোন এমন বিশেষ বা নিয়ামক দেখানে থাকিত, তাহার দ্বারা বাদী সেই বালক নূতন কঞ্চলবিশিষ্ট, এ কথা বলিতে পারেন না, তাহা হইলে প্রতিবাদী ঐরূপ কল্পনা করিতে পারিতেন। তাহা যখন নাই, তখন ছলবাদীর ঐ কল্পনা বা ঐরূপ কথা মিথ্যা অল্পযোগ বা অভিযোগ মাত্র, উহা নিরর্থক দোষারোপ বা নিরর্থক প্রশ্ন। অনেক ভাব্য-পুস্তকে “মিথ্যা নিয়োগমাত্রঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কোন পুস্তকে “মিথ্যাভিযোগমাত্রঃ” এইরূপ পাঠ আছে। মিথ্যাল্পযোগ স্থলে মিথ্যানিয়োগ, এইরূপ কথাও প্রমাদবশতঃ মুদ্রিত বা লিপিত হইতে পারে। মূলে “মিথ্যাভিযোগমাত্রঃ” এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে, ঐরূপ পাঠ কোন পুস্তকেও দেখা যায়। “মিথ্যানিয়োগমাত্রঃ” এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। সুদীর্ঘ ইহার বিচার করিবেন।

ভাব্যকারের পূর্বকথার আপত্তি হইতে পারে যে, বাদী ‘নবকঞ্চল’ এইরূপ অনেকার্গপ্রতিপাদক সাধারণ শব্দেরই বা কেন প্রশ্ন করেন? বাদী যদি ‘নূতন কঞ্চল’ এইরূপ অসাধারণ বা বিশেষ শব্দের দ্বারা তাহার বিশেষ অর্থটি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ত প্রতিবাদী ঠিক বুঝিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলেও পূর্নোক্ত প্রকারে অর্পাস্তর কল্পনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং

এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ছলকারীরই অপরাধ কেন ? ঐরূপ বাক্যবন্ধা বাদীরই অপরাধ নয় কেন ? এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন, —“প্রসিদ্ধ” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের ঐ কথাগুলির তাৎপর্য এই যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ লোক-প্রসিদ্ধ পদার্থ। যিনি উহা জানেন না, তিনি বিচারে অধিকারীই নহেন। যিনি লোক-প্রসিদ্ধ পদার্থেও অজ্ঞ, তাহার সহিত কোন বিচারই হইতে পারে না। বাচক শব্দকে (অভিধীয়তেহেনেন এইরূপ বুৎপত্তিতে) অভিধান বলে। এবং তাহার বাচ্য অর্পকে অভিধেয় বলে। এই শব্দের এই পদার্থটি অথবা এই পদার্থগুলি অভিধেয়, এইরূপ নিয়ম আছে। সকল অর্থই সকল শব্দের অভিধেয় বা বাচ্য নহে। এই নিয়ম বিষয়ে যে নিয়োগ অর্থাৎ এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ অথবা এই অর্থগুলি বুঝিতে হইবে, এইরূপ যে সম্বন্ধ, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকেই শব্দের শক্তি বলে। (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমান্তিকের শেষভাগ দ্রষ্টব্য)। এই সংকেতানুসারেই শব্দগুলি স্ব স্ব বাচ্য অর্থে পূর্ণ হইতেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এই সংকেতও সামান্য ও বিশেষ, এই দুই প্রকার আছে। নানার্থবোধক সামান্য শব্দ হইলে তাহার সংকেত সামান্য। বিশিষ্টার্থ-বোধক বিশেষ শব্দ হইলে তাহার সংকেত বিশেষ। এই সংকেতানুসারেই শব্দগুলি স্ব স্ব বাচ্য অর্থে স্মৃতিরকাল হইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। অর্থবোধের জন্তই এই শব্দ প্রয়োগ হইতেছে এবং অর্থবোধ প্রযুক্তই ব্যবহার চলিতেছে। স্মৃতিরূপ পূর্ব পূর্ব প্রয়োগ ও বৃদ্ধ-ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা শব্দ ও অর্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধ লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা হির থাকতেই লোকে সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থের প্রকাশ করিতেছে এবং অজ্ঞ লোকেও সেই শব্দ শুনিয়া সেই অর্থ বুঝিতেছে এবং সেই পদার্থের ব্যবহার করিতেছে। স্মৃতিরূপ বসন অর্থবোধের জন্তই শব্দ প্রয়োগ হইতেছে, তখন এই শব্দ প্রয়োগে সামর্থ্যবশতঃই সামান্য শব্দের প্রয়োগ নিয়ম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দ নিখিল ব্রাহ্মণের বাচক। ব্রাহ্মণ-সমষ্টিই ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও, এইরূপ বাক্যে ব্রাহ্মণ—এইরূপ সামান্য শব্দের যে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, ঐ প্রয়োগ নিখিল ব্রাহ্মণ অর্থে হইতেছে না, সামর্থ্যবশতঃ কতিপয় ব্রাহ্মণ বা কোনও ব্রাহ্মণ অর্থেই হইতেছে। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ যে ব্রাহ্মণ-সমষ্টি, তাহার অবয়ব অর্থাৎ অংশ বা ব্যক্তি ব্রাহ্মণেই ঐরূপ সামান্য ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ হইতেছে; যিনি বোদ্ধা, তিনি সেখানে তাহাই বুঝিয়া থাকেন। ভাষ্যকার সামর্থ্যবশতঃ সামান্য শব্দের প্রয়োগ নিয়ম আছে বলিয়াছেন। এই সামর্থ্য কি, তাহা দেখাইতে হয়। তাই শেষে বলিয়াছেন যে, যে অর্থে অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব হয়, সামান্য শব্দ সেই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। অর্থ বলিতে প্রয়োজন, ক্রিয়া বলিতে নির্বাহ বা সম্পাদন। বস্তুরাজই কোন না কোন প্রয়োজন নির্বাহ করে। এ জন্ত দার্শনিক ভাষায় বস্তুরাজকেই বলা হয়—অর্থক্রিয়াকারী। যাহা অর্থক্রিয়াকারী নহে, তাহা বস্তু নহে, তাহা অলীক। ঐ অর্থক্রিয়া বা কোন প্রয়োজন নির্বাহের জন্ত যে উপদেশ-বাক্য বা প্রবর্তক বাক্য, তাহাই অর্থক্রিয়া-চোদনা। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও, ছাগীকে গ্রামে লইয়া যাও, দ্রুত আহরণ কর ইত্যাদি বাক্যগুলি কোন প্রয়োজন নির্বাহের জন্ত উপদেশ-বাক্য বা প্রবর্তক বাক্য। সমস্ত ছাগী, সমস্ত দ্রুত এবং

সমস্ত ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় না। সুতরাং যে ছাগী, যে ঘৃত এবং যে ব্রাহ্মণ অর্থে ঐরূপ উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় অর্থাৎ প্রয়োজন নির্বাহের জন্য যে ছাগী প্রভৃতি তাৎপর্যে ঐরূপ উপদেশ-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই ছাগী প্রভৃতিই পূর্বোক্ত প্রয়োগে অজ্ঞা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয়, বোকা ব্যক্তি তাহাই বুঝিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত প্রয়োগে অজ্ঞা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ছাগীবিশেষ প্রভৃতি বুঝিলেও লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহা ভাষ্যকারের কথার দ্বারা এখানে বুঝা যায় অর্থাৎ বক্তার তাৎপর্য বুঝিয়াই ঐরূপ বিশেষ অর্থ বুঝা যায়। যেখানে যে অর্থে সামান্য শব্দের সামর্থ্য আছে, তাহা বুঝিয়াই বক্তার তাৎপর্য বুঝিতে হয়। সামান্য শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ বুঝিলে লক্ষণার আশ্রয় করা হয়; কারণ, বিশেষ-রূপে বিশেষ অর্থে সামান্য শব্দের শক্তি নাই, ইহা নব্য নৈয়ায়িকগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত হইলেও বক্তার তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া সামান্যরূপে বিশেষ অর্থও লক্ষণা ব্যতিরেকে সামান্য শব্দের দ্বারা স্থলবিশেষে বুঝা যায়, ইহা নব্য নৈয়ায়িকও বলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চমূলী, সপ্তশতী ইত্যাদি প্রয়োগই তাহার দৃষ্টান্ত। পঞ্চমূলী বলিতে যে কোন পাঁচটি মূল বুঝায় না, মূলপঞ্চকবিশেষই বুঝাইয়া থাকে। সপ্তশতী বলিতে যে কোন গ্রন্থের যে কোন স্থানের সাত শত শ্লোক বুঝায় না, মার্কণ্ডেয় পুরাণের নবী-মাহাত্ম্যের তদাদি তদন্ত সাত শত শ্লোকই বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং এ সব স্থলে সামান্য শব্দের বিশেষার্থই গ্রহণ করিতে হয়। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার এখানে তাৎপর্যানুসারেই বিশেষার্থ গ্রহণের কথা বলিয়া গিয়াছেন^১। লক্ষণার আশ্রয় করিলে ঐ দুই স্থলে দ্বিগুণমান হইতে না পারায় ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। দ্বিগুণমানে লাক্ষণিক অর্থের বোধ হয় না, এ জন্য ত্রিকটু, সপ্তবি প্রভৃতি প্রয়োগে লক্ষণার আশ্রয় করিয়া কর্মধারয় সমাগই হইয়া থাকে, ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের সিদ্ধান্ত। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকার দ্বিগুণমান-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ফল কথা, ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, লক্ষণা ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণস্বরূপে ব্রাহ্মণ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণবিশেষ বুঝা যায়। এইরূপ অজ্ঞাত সামান্য শব্দের দ্বারাও সামর্থ্যবশতঃ ঐরূপ বুঝা যায় এবং বুঝিতে হয়। ব্রাহ্মণ শব্দ প্রভৃতি সামান্য শব্দ হইলেও সর্বত্র তাহার অর্থসামান্যে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, অর্থসামান্যে পূর্বোক্ত অর্থক্রিয়ার উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় না। অর্থক্রিয়ার জন্য উপদেশ-বাক্য বলিলে তাহার মধ্যে সামান্য শব্দগুলি বখাসম্ভব ঐরূপ বিশেষ অর্থই বুঝাইবে। এ পর্যন্ত বাহা বলা হইল, তাহার মূল তাৎপর্য এই যে, শব্দগুলি সংকেতানুসারেই পূর্ব হইতেই সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে এবং অর্থবোধের জন্যই শব্দ প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে এবং শব্দের অর্থবোধ প্রযুক্তই ব্যবহার চলিতেছে। শব্দের মধ্যে যেগুলি সামান্য শব্দ, তাহার যেখানে যে অর্থ সম্ভব, সেই বিশেষ অর্থই সেখানে বুঝিতে হয়, সেইরূপ অর্থই সেখানে তাহার প্রয়োগ হয়। নবকথন—এইটি সামান্য শব্দ। ইহার যে অর্থ সেখানে সম্ভব, সেই অর্থই

১। পঞ্চমূলীতানো তু মূলপঞ্চকেষ্টনৈব মূলবিশেষেভ্যঃ তাৎপর্যং ন তু বিশেষরূপেণাপি ইত্যাহি।—(শব্দশক্তি-প্রকাশিকা)।

বুঝিতে হইবে। সামান্য শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন সংকেত থাকিলে দেশ, কাল, প্রকরণ, ঐচ্ছিক্য প্রভৃতির দ্বারা সেখানে কোন বিশেষ অর্থই বুঝিতে হইবে। সংকেতানুসারে সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিলে তজ্জন্ত বাদী অপরাধী হইতে পারেন না। বাদী বিশেষ শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, তিনি নানার্থ সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বাদীর অপরাধ বলা যায় না। কারণ, বাদী সংকেতানুসারেই সামান্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সামান্য শব্দে ঐরূপ সংকেত থাকে কেন? এই বলিয়া সংকেতকে অপরাধী বলিতে পার, বল; কিন্তু বাদীকে অপরাধী বলিতে পার না। বাদীকে ঐরূপ সামান্য শব্দ প্রয়োগের জন্ত অপরাধী বলিলে, ছলকারী প্রতিবাদীকেও ঐ ভাবে অপরাধী হইতে হইবে। কারণ, তাহার উচ্চারিত বাক্যগুলির মধ্যেও সামান্য শব্দ পাওয়া যাইবে অথবা যে কোনরূপে তাঁহার কথ্যেও কোনরূপ ছল করা যাইবে; তিনি সংকেতানুসারেই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইত্যাদি বলিয়া আর তখন নিজের নিরপরাধতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, বাদী সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার যে বিশেষ অর্থটি যেখানে উপপন্ন হয় না, সেই অর্থের কল্পনা করিয়া বাদীর বাক্যের প্রতিবেদন করা অযুক্ত, ঐরূপ করিলে তজ্জন্ত ছলকারী প্রতিবাদীই অপরাধী। বাদীর ঐ স্থলে কোনই অপরাধ নাই। ছলকারী যদি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়াও ছল করেন, তাহা হইলে উহা সত্য বুঝিয়াও সত্য গোপন, অথবা কলটতামূলক সত্য অপলাপ। আর যদি বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিয়া ছল করা হয়, তাহা হইলে ছলকারীর অজ্ঞতারূপ দোষ অপরিহার্য। পরন্তু বাদীর বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিলে বাদীর নিকটে প্রমাণ করিয়া তাহা বুঝা উচিত। ছলকারী বুঝিতে পারেন নাই এবং প্রমাণ করিয়াও বুঝিয়া লন নাই, এই ক্ষেত্রে বাদীর অপরাধ কি? কলকথা, যে ভাবেই ছল করা হউক, সেখানে ছলকারী প্রতিবাদীই অপরাধী, বাদীর ঐ স্থলে কোনই অপরাধ নাই।

এই শব্দ এই অর্থের বাচক অথবা এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপ সংকেত ভিন্ন ভাষ্যমতে শব্দ ও অর্থের কোন সন্ধ দ্বীকৃত হয় নাই। ভাষ্যকার এখানে শব্দ-সংকেতের কথা বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে “নবকথল”-বাক্যরূপ শব্দেরও সংকেত তিনি স্বীকার করিতেন, ইহা মনে আসে। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ বাক্যে শক্তি স্বীকার না করিলেও প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝিবার হেতু পাওয়া যায়। যথাস্থানে এ কথার আলোচনা পাওয়া যাইবে। (দ্বিতীয়ভাষ্যের প্রথমমুহুরের শেষভাগ ও দ্বিতীয় আহিকের শেষভাগ জটব্য)।

প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকগুলিতে ‘অর্থক্রিয়াদেশনা’ এইরূপ পাঠ আছে। দেশনা বলিতেও উপদেশ-বাক্য বুঝা যায়। তাৎপর্যটাকাঙ্কায় ‘অর্থক্রিয়াদেশনা’ এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্যই প্রকৃত পাঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কর্মপ্রবর্তক বাক্যকে প্রাচীনগণ ‘চোদনা’ বলিয়াছেন^১। শব্দ স্বামীর চোদনা শব্দের ব্যাখ্যায় ‘ভট্ট কুমারিল শব্দমাত্রই চোদনা শব্দের গোণার্থ, ইহা বলিয়াছেন ॥১২॥

১। দেশনা লোকনাথানাং সঙ্ঘাশ্রয়শাস্ত্রাঃ। ইত্যাদি (বোধিত্তবিসংগ)।

২। চোদনেতি ক্রিয়াঃ প্রবর্তকং ঘটনমাত্রঃ। (শব্দভাষ্য) ২ পুং।

৩। চোদনেতি ভট্টমাত্র শব্দমাত্রবিশেষঃ। ইত্যাদি।—দীনান্দাধিতীয়হুজ্জতাব্যাক্তিকের ৭ শ্লোক।

সূত্র । সম্ভবতোহর্থস্ফাতিসামান্যযোগাদমভূতার্থ-
কম্পনা সামান্যচ্ছলম্ ॥১৩॥৫৪॥

অনুবাদ । সম্ভাব্যমান পদার্থের অর্থাৎ ইহা হইতে পারে, ইহা সম্ভব, এইরূপ তাৎপর্যে কথিত পদার্থের অতি সামান্য ধর্মের যোগবশতঃ অর্থাৎ যে সামান্য ধর্মটি ঐ সম্ভাব্যমান পদার্থকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্রও থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্মের সম্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্মটিতে যে পদার্থ অসম্ভব, বক্তা যাহা বলেনও নাই, সেই পদার্থের যে আরোপ, ফলিতার্থ এই যে, ঐরূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনার দ্বারা যে বাক্যব্যাঘাত বা প্রতিষেধ, তাহা সামান্যচ্ছল ।

ভাষ্য । ‘অহো খল্বসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্ন’ ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ ‘সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্প’দिति । অস্ম্য বচনস্ত বিঘাতোহর্থবিকল্পো-
পপত্ত্যাহসম্ভূতার্থকল্পনয়া ক্রিয়তে । যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবতি
ব্রাত্যোহপি সম্ভবেৎ, ব্রাত্যোহপি ব্রাহ্মণঃ সোহপ্যস্ত বিদ্যাচরণসম্পন্ন
ইতি । যদ্বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চাত্যোতি চ তদতিসামান্যম্ । যথা
ব্রাহ্মণস্তং বিদ্যাচরণসম্পদং কচিদাপ্নোতি কচিদত্যোতি । সামান্যনিমিত্তং
ছলং সামান্যচ্ছলমিতি ।

অনুবাদ । আহা, এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন, এই কথা (কেহ) বলিলে
কেহ অর্থাৎ দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি বলিলেন,—ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব ।
(এখানে) অসম্ভূত অর্থের কল্পনারূপ অর্থবিকল্পোপপত্তির দ্বারা অর্থাৎ (ছলের সামান্য
লক্ষণসূত্রোক্ত) বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা এই
বাক্যের অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বিতীয়বাদীর বাক্যের বিঘাত (ছলকারী কোন তৃতীয় ব্যক্তি)
করে । (সে কিরূপে, তাহা বলিতেছেন) । যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পৎ
সম্ভব হয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও অর্থাৎ যাহার উপনয়নের কাল গিয়াছে, তবুও উপনয়ন
হয় নাই, বেদাধ্যয়ন হয় নাই, এমন ব্রাহ্মণেও সম্ভব হউক ? বিশদার্থ এই যে,
ব্রাত্য ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, তিনিও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন ? যাহা বিবক্ষিত পদার্থকে
প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, তাহা অর্থাৎ সেই ধর্মকে অতিসামান্য বলে ।
যেমন ব্রাহ্মণই বিদ্যাচরণসম্পৎকে কোন স্থলে (বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে) প্রাপ্ত হয়,

কোনও স্থলে (ব্রাত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণে) অতিক্রম করে, (অর্থাৎ প্রকৃত স্থলে ব্রাহ্মণত্ব ধর্মই বিদ্যাচরণসম্পদের অতি সামান্য ধর্ম, উহা বক্তা বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে বলেন নাই এবং উহাতে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব সম্ভবও নহে, কিন্তু ছলকারী ঐ ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব কল্পনা করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণত্ব ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও আছে, সেখানে বিদ্যাচরণসম্পদ নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু হইতে পারে না, ইহাই ছলকারীর বক্তব্য)। সামান্যনিমিত্তক অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্মনিমিত্তক ছল (এ জন্য) সামান্য ছল, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্মনিমিত্তক ছল বলিয়াই ইহার নাম সামান্যছল।

টিপ্পনী। বাক্ছলের লক্ষণ বলিয়া মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত সামান্যছলের লক্ষণ বলিয়াছেন। সামান্যছল পূর্বোক্ত বাক্ছলের জায় শব্দের অর্গস্থত্ব কল্পনা করিয়া হয় না। সামান্যধর্ম-নিমিত্তক ছল বলিয়াই ইহার নাম সামান্যছল। সামান্য ধর্ম বলিতে যে কোনরূপ সামান্য ধর্ম এখানে বুঝিতে হইবে না। এই জন্ত সূত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন,—‘অতিসামান্যযোগাৎ।’ ভাব্যবার বলিয়াছেন যে, যে ধর্মটি বক্তার বিবক্ষিত অর্গকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহাকে অতিক্রমও করে, এমন ধর্মই সূত্রোক্ত অতিসামান্য ধর্ম। যেমন কোন ব্যক্তি কোন একজন বেদাধ্যয়নশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন। বেদবিদ্যার অধ্যয়নাদিরূপ আচরণই ব্রাহ্মণের সম্পৎ। উপনিষৎ ঐরূপ ব্রাহ্মণকে ‘অনুচান’ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত বিদ্যাচরণসম্পৎ সকল ব্রাহ্মণেই থাকে না। যিনি উপনীত হইয়া বেদবিদ্যার অধ্যয়নাদি করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাহাতেই ঐ সম্পৎ থাকে। শিশু ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাত্য ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণসম্ভান বলিয়া ব্রাহ্মণ। দেহগত ব্রাহ্মণত্ব জাতি তাহাদিগেরও আছে, কিন্তু ঐ সকল ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ নাই। ঐ সকল ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবই নহে। পূর্বোক্ত প্রকার ব্রাহ্মণ-বিশেষেই উহা সম্ভব। সুতরাং পূর্বোক্ত বাক্যস্থলে ব্রাহ্মণবিশেষের বিদ্যাচরণসম্পত্তিই সূত্রোক্ত ‘সম্ভবৎ’ পদার্থ এবং উহাই পূর্ববক্তার বিবক্ষিত এবং পূর্ববক্তার ঐ বাক্যটি প্রশংসার্থ। ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার জন্ত ঐ বাক্যের সমর্থন করিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব। অর্থাৎ ইনি যখন ব্রাহ্মণ, তখন ইহার বিদ্যাচরণসম্পৎ থাকাই সম্ভব। এই বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইবেন, ইহা বলা দ্বিতীয় বক্তার উদ্দেশ্য নহে, দ্বিতীয় বক্তা তাহা বলেন নাই। কিন্তু ঐ স্থলে তৃতীয় কোন বক্তা দ্বিতীয় বক্তার তাৎপর্য বুঝিয়াই হটক আর না বুঝিয়াই হটক, ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে ধরিয়া দোষপ্রদর্শন করিলেন,—যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাত্য ব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হটক? তৃতীয় বক্তার কথা এই যে, ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু

বলিয়াছ, তাহা বলিতে পার না। ত্রাত্য ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব আছে, কিন্তু সেখানে বিদ্যাচরণ-সম্পত্তি নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব জাতি বিদ্যাচরণসম্পদের ব্যভিচারী। বলিয়া উহা তাহার সাধন হয় না। এখানে ব্রাহ্মণত্ব ধর্মটি বিদ্যাচরণসম্পত্তিকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে অর্থাৎ বিদ্যাচরণসম্পন্ন ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব থাকে, ত্রাত্য ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব থাকে, এ জন্ত উহা বক্তার বিবক্ষিত এবং সম্ভবপদার্থ যে বিদ্যাচরণসম্পত্তি, তাহার পক্ষে অতি সামান্য ধর্ম। ত্রাত্য ব্রাহ্মণে উহার দোষ বা সম্বন্ধ থাকিতে তৃতীয় বক্তা অসম্ভব অর্থ করনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, এ জন্ত তৃতীয় বক্তার ঐ দোষ প্রদর্শন সামান্যত্ব চলিইয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব ধর্মের বিদ্যাচরণ-সম্পদের হেতুত্ব অসম্ভব পদার্থ, অর্থাৎ উহা সম্ভব নহে। তৃতীয় বক্তা ঐ অসম্ভব হেতুত্বের করনা বা আরোপ করিয়া ত্রাত্য ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বরূপ অতি সামান্য ধর্ম আছে বলিয়া এখানে চল করিয়াছেন।

ভাষ্য। অস্য চ প্রত্যবস্থানং। অবিবক্ষিতহেতুকম্য বিষয়ানুবাদঃ, প্রশংসার্থত্বাদ্বাক্যম্য, তদত্রাসম্ভূতার্থকল্পনানুপপত্তিঃ যথাসম্ভবন্ত্যগ্নিন্ ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অনিরাকৃতমবিবক্ষিতঞ্চ বীজজন্ম, প্রবৃত্তিবিষয়স্ত ক্ষেত্রং প্রশস্যতে। মোহয়ং ক্ষেত্রানুবাদো নাগ্নিন্ শালয়ো বিধীয়ন্ত ইতি। বীজান্তু শালিনির্বৃত্তিঃ সত্যী ন বিবক্ষিতা। এবং সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যা-চরণসম্পদিতি, সম্পদ্বিষয়ো ব্রাহ্মণত্বং ন সম্পদ্বৈতুঃ, ন চাত্র হেতুর্বি-বক্ষিতঃ,—বিষয়ানুবাদস্তয়ং, প্রশংসার্থত্বাদ্বাক্যম্য। সতি ব্রাহ্মণত্বে সম্পদ্বৈতুঃ সমর্থ ইতি। বিষয়ঞ্চ প্রশংসতাবাক্যেন যথাহেতুতঃ ফল-নিবৃত্তিন প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি বচনবিঘাতোহসম্ভূতার্থকল্পনয়া নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। এই সামান্যত্ব চলেরও প্রত্যবস্থান অর্থাৎ সমাধান বা উত্তর (বলিতেছি)। যিনি হেতুবিবক্ষা করেন নাই অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা তাহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা বলেন নাই, সেই দ্বিতীয় বক্তার (ঐ বাক্যটি) বিষয়ের অনুবাদ। কারণ, (ঐ) বাক্যটি প্রশংসার্থ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার জন্তই দ্বিতীয় বক্তা ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে অসম্ভব পদার্থের কল্পনার দ্বারা (দ্বিতীয় বক্তার সেই বাক্যের ব্যাঘাতের) উপপত্তি হয় না। [একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখপূর্বক পূর্বোক্ত ভাষ্যের বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন]। যেমন এই ক্ষেত্রে শালি (কলম প্রভৃতি দ্রব্যবিশেষ) সম্ভব। (এই বাক্যের দ্বারা) বীজ হইতে শালির উৎপত্তি নিরাকৃত হয় নাই, বিবক্ষিতও হয় নাই,

অর্থাৎ যিনি ঐরূপ কথা বলেন, তিনি এই ক্ষেত্রে বীজরোপণ না করিলেও শালি জন্মে, ইহা বলেন না এবং বীজাদি কারণের দ্বারা এই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, এইরূপ কথাও তিনি বলেন না, ঐরূপ বলা সেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্র ঐ বাক্যের দ্বারা প্রশংসিত হয়, অর্থাৎ ঐ স্থলে কেবল ক্ষেত্রকে প্রশংসা করাই বক্তার উদ্দেশ্য। বিশদার্থ এই যে, সেই এইটি (পূর্বোক্ত বাক্যটি) ক্ষেত্রের অনুবাদ। এই বাক্যে (ক্ষেত্রে) শালি বিহিত হয় না অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা বক্তা বীজ ব্যতীতও সেই ক্ষেত্রে শালির বিধান করেন না এবং বীজ হইতে শালির যে উৎপত্তি হয়, তাহাও (ঐ বক্তার) বিবক্ষিত নহে, অর্থাৎ বীজ রোপণ করিলে সেই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, ইহা বলাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

এইরূপ ভ্রান্তিতে বিদ্যাচরণসম্পদ সম্ভব, এই স্থলে ভ্রান্তিগ্রস্ত বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়, বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু নহে, এই বাক্যে হেতু বিবক্ষিতও নহে, অর্থাৎ ভ্রান্তিগ্রস্তকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা বক্তার উদ্দেশ্যও নহে, বক্তা তাহা বলেনও নাই, কিন্তু এই বাক্যটি বিষয়ের অনুবাদ; কারণ, বাক্যটি প্রশংসার্থ।

[ভ্রান্তিগ্রস্ত বিষয়ের প্রকৃতস্থলে প্রশংসা কি, তাহা বলিতেছেন]। ভ্রান্তিগ্রস্ত থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু (অধ্যয়ন, ব্রাহ্মচর্যাदि) সমর্থ হয় অর্থাৎ বিদ্যাচরণসম্পদ জন্মাইতে সামর্থ্যশালী হয়। বিষয়ের প্রশংসাকারী বাক্যের দ্বারা যথাহেতু হইতে ফলের উৎপত্তি নিষেধ করা হয় না, (অর্থাৎ যে প্রকার হেতুর দ্বারাই যে ফল জন্মে, সেই প্রকার হেতুর দ্বারাই সেই ফল জন্মিবে। অধ্যয়ন প্রভৃতি বিদ্যাচরণসম্পদের যেগুলি হেতু, তদ্ব্যতীত ভ্রান্তিগ্রস্ত বিদ্যাচরণসম্পদ হইতে পাবেন না। কেহ কোন বাক্যের দ্বারা ভ্রান্তিগ্রস্তের প্রশংসা করিলে তাহাতে ভ্রান্তিগ্রস্তই বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ভ্রান্তিগ্রস্তের বিদ্যাচরণসম্পদ হইতে অধ্যয়নাদি কারণ আবশ্যক নাই, এ কথা বলা হয় না। কেবল ভ্রান্তিগ্রস্তের প্রশংসা করাই হয়)। সুতরাং এইরূপ হইলে অসম্ভব পদার্থের অর্থাৎ ভ্রান্তিগ্রস্ত জাতিতে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু যাহা অসম্ভব, যাহা ঐ স্থলে দ্বিতীয় বক্তার বিবক্ষিতও নহে, তাহার কল্পনার অর্থাৎ আরোপের দ্বারা (দ্বিতীয় বক্তার) বাক্যব্যাঘাত উপপন্ন হয় না।

১। বিষয় শব্দের বেশ অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়। এ সমস্ত হান বা অধার বুঝাইতেও প্রাচীনতম বিষয় শব্দের প্রয়োগ করিতেন। ভ্রান্তিগ্রস্ত বিদ্যাচরণের বিষয়, এই কথা বলিলে বিদ্যাচরণের স্থান বুঝাইতে পারে। ভ্রান্তিগ্রস্ত বিদ্যাচরণের স্থান, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য। ভ্রান্তিগ্রস্তই ভ্রান্তিগ্রস্তকে বিদ্যাচরণের বিষয় বা স্থান করিয়াছে, তাই ভ্রান্তিগ্রস্তকে বিষয় বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষিপ্রোক্ত সামান্য ছলের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে তাহারও সমাধান বা প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমাধানের তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম বক্তা ব্রাহ্মণবিশেষের প্রশংসার জন্য যে বাক্য বলিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা সেই বাক্যের অসম্মোদন করিতে ব্রাহ্মণবৈর প্রশংসাই করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ইহা তিনি বলেন নাই। সুতরাং তৃতীয় বক্তা ব্রাহ্মণকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিপ্রেত অর্থে কোন দোষ না হওয়ায় উহা অসঙ্গত। দ্বিতীয় বক্তা যদি ব্রাহ্মণকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তৃতীয় বক্তার প্রদর্শিত পূর্বোক্ত প্রকার দোষ হইত। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তার তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে; ব্রাহ্মণবৈর প্রশংসা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণের থাকিলে তিনি বেদবিদ্যার অধিকারী এবং যে কর্মফলে ব্রাহ্মণের লাভ হয়, সেই কর্মফল ব্রাহ্মণকে বিদ্যার আচরণে প্রবৃত্ত করে এবং ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি শাস্ত্রানুসারে বিদ্যার আচরণ করিতে বাধ্য, ব্রাহ্মণের চিরাচরিত আচারও ঐরূপ, সুতরাং ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদ সম্ভব, এইরূপ তাৎপর্য্যে তাহা বলা হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণই বিদ্যাচরণসম্পদের কারণ, অধ্যয়নাদি না করিলেও ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, ইহা বলা হয় না। অধ্যয়নাদি ব্যতীত ব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইতে পারেন না। বিদ্যাচরণ-বর্জিত ব্রাহ্মণও চিরকালই আছেন। অত্রিসংহিতায় দশবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায়। সর্ববিধ ব্রাহ্মণেরই দেহগত ব্রাহ্মণের জাতি আছে, কিন্তু অধ্যয়নাদি কারণের অভাবে বিদ্যাচরণসম্পত্তি সকল ব্রাহ্মণের নাই, তাহা থাকিতেই পারে না। পূর্বোক্ত স্থলে দ্বিতীয় বক্তা ব্রাহ্মণকেই ঐ বিদ্যাচরণসম্পত্তির কারণ বলেন নাই। তিনি বিদ্যাচরণসম্পত্তি লাভে অধ্যয়নাদি কারণের অপলাপ করিয়া, যেহেতু ইনি ব্রাহ্মণ, অতএব অবশ্যই ইনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, ইহা বলেন নাই, তিনি ব্রাহ্মণবৈর প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ববক্তা যে ব্রাহ্মণবৈর উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা তাহার প্রশংসার জন্য সেই ব্রাহ্মণবৈর পুনরুল্লেখ করিয়া উহার অসম্মোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তার বাক্যটি ব্রাহ্মণবৈর প্রশংসার্থ, এ জন্য উহা ব্রাহ্মণরূপ বিষয়ের অসম্মোদন। সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকে অসম্মোদন বলে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বলেন - এই ক্ষেত্রে শালি উৎপন্ন করিবে; তখন দ্বিতীয় বক্তা যদি বলেন যে, এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে বীজাদি কারণ ব্যতীতই শালি উৎপন্ন হয়, এ কথা বলা হয় না। বীজাদি কারণের দ্বারা শালি উৎপন্ন হয়, ইহা বলাও তাহার উদ্দেশ্য নহে; ক্ষেত্রের প্রশংসাই তাহার উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব অর্থাৎ এই ক্ষেত্র শালি জন্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র, এইমাত্র বলাই তাহার উদ্দেশ্য। তাহার ঐ বাক্যটি প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্রের অসম্মোদন। ঐ বাক্যে শালি বিহিত হয় নাই, সুতরাং উহা বিধায়ক বাক্য নহে। পূর্বে কোন বক্তা সেই ক্ষেত্রে শালি বিধায়ক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা পূর্ববাদী; উক্ত ক্ষেত্রের প্রশংসার্থ সেই ক্ষেত্রের অসম্মোদন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক বলিয়াছেন যে, এইরূপ ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদ সম্ভব; এই বাক্যও ব্রাহ্মণরূপ বিষয়ের অসম্মোদন ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়, কিন্তু হেতু নহে; হেতু বলা বক্তার উদ্দেশ্যও নহে। ব্রাহ্মণের

ধাকিলে বিদ্যাচরণসম্পত্তির হেতুগুলি সমর্থ হয়, তাই ব্রাহ্মণ্য বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়। বিষয় শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার এখানে বাহা ধাকিলে অর্থাৎ বাহার আধারে প্রকৃত-কার্যের কারণগুলি সমর্থ বা সামর্থ্যশালী অর্থাৎ সফল হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐরূপ বিষয় পদার্থ প্রকৃত কার্যে হেতু নহে, ইহাই ভাষ্যকারের কথা। পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ছল অনেক সময়েই হইয়া থাকে। বক্তার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ঐরূপ প্রতিবাদ হয় এবং ভাষ্যোক্তরূপে আবার তাহার প্রতিবাদ হয়। লৌকিক বিষয়েও যে কত বাদ-প্রতিবাদ ঐ ভাবে হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল চিন্তা করুন ॥১৩॥

সূত্র । ধর্মবিকল্পনির্দেশেইর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্ ॥১৪॥৫৫॥

অনুবাদ । ধর্মবিকল্পের নির্দেশ হইলে অর্থাৎ শব্দের ধর্ম যে যথার্থ প্রয়োগ, তাহার যে বিকল্প অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ মুখ্য, তাহা হইতে ভিন্নার্থে প্রয়োগ, তাহার নির্দেশ হইলে, ফলিতার্থ এই যে, লাক্ষণিক বা গোণ অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, অর্থসদ্ভাবের দ্বারা যে প্রতিষেধ, অর্থাৎ মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া যে দোষ প্রদর্শন, তাহা উপচারছল।

ভাষ্য । অভিধানস্ত ধর্মো যথার্থপ্রয়োগঃ । ধর্মবিকল্পোহন্যত্র দৃষ্ট-
স্ত্রান্যত্র প্রয়োগঃ । তস্ত নির্দেশে ধর্মবিকল্পনির্দেশে । যথা—মঞ্চাঃ
ক্রোশন্তীতি অর্থসদ্ভাবেন প্রতিষেধঃ, মঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রোশন্তি ।
কা পুনরত্রার্থবিকল্পোপপত্তিঃ ? অন্যথা প্রযুক্তস্ত্রান্যথাইর্থকল্পনং, ভক্ত্যা
প্রয়োগে প্রাধান্যেন কল্পনং । উপচারবিষয়ং ছলমুপচারচ্ছলং । উপচারো
নীতার্থঃ, সহচরণাদিনিমিত্তেনাতদ্ভাবে তদ্বদভিধানমুপচার ইতি ।

অনুবাদ । অভিধানের অর্থাৎ শব্দের ধর্ম যথার্থ প্রয়োগ। ধর্মের বিকল্প বলিতে (এখানে) অন্য অর্থে দৃষ্ট শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ, অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থে সামান্যতঃ প্রয়োগ দেখা যায়, কোন বিশেষবশতঃ তাহা হইতে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগই এই সূত্রোক্ত ধর্মবিকল্প। তাহার নির্দেশে (এই অর্থে সূত্রে বলা হইয়াছে) ধর্মবিকল্প-নির্দেশে। (উদাহরণ) যেমন মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এই স্থলে অর্থাৎ কেহ ঐ বাক্য বলিলে অর্থসদ্ভাবের দ্বারা অর্থাৎ মঞ্চ শব্দের সদর্থ বা মুখ্য অর্থ অবলম্বন করিয়া নিষেধ করা হয়। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) মঞ্চস্থিত পুরুষগণ রোদন করিতেছে, কিন্তু মঞ্চ (কাষ্ঠের আসনবিশেষ) রোদন

করিতেছে না। (প্রশ্ন) এই স্থলে অর্থবিকল্পরূপ উপপত্তি কি? অর্থাৎ চল্লের সামান্য লক্ষণে যে অর্থ-বিকল্পরূপ উপপত্তি বলা হইয়াছে, বাহা চল্ল মাত্রেই আবশ্যক, তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণে কি আছে? (উত্তর) অন্যপ্রকারে প্রযুক্ত শব্দের অন্য প্রকার অর্থকল্পনা। বিশদার্থ এই যে, লক্ষণার দ্বারা প্রয়োগ হইলে প্রধানের দ্বারা অর্থাৎ শক্তির দ্বারা কল্পনা (অর্থাস্তর কল্পনা)। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে মধ্যস্থিত পুরুষ বুঝাইতে মধ্য শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু চল্লকারী প্রতিবাদী মধ্য শব্দের মুখ্য অর্থ যে মধ্য, তাহা অবলম্বন করিয়া নিষেধ করিয়াছেন যে, মধ্য রোদন করিতেছে না, মধ্যস্থ পুরুষগণই রোদন করিতেছে। তাহা হইলে মধ্য শব্দের অর্থ বিকল্প বা অর্থাস্তর কল্পনা-রূপ উপপত্তির দ্বারাই এখানে চল্ল হইয়াছে। উপচার-বিষয়ক চল্ল—উপচার-চল্ল। অর্থাৎ লাক্ষণিক বা গোণ প্রয়োগরূপ উপচারকে বিষয় করিয়া (আশ্রয় করিয়া) পূর্বোক্ত প্রকার চল্ল করা হয়; এ জন্য ইহার নাম উপচারচল্ল। উপচার ‘নীতার্থ’, অর্থাৎ সাহচর্য্য প্রভৃতি কোন নিমিত্ত কর্তৃক যেখানে কোন শব্দ মুখ্য অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহাই উপচার। তদভাবে না থাকিলেও সাহচর্য্য প্রভৃতি (কোন) নিমিত্তবশতঃ তদ্বৎকথন উপচার। (অর্থাৎ যে অর্থে যে শব্দের বাচ্যতা নাই, সাহচর্য্য প্রভৃতি কোন নিমিত্তবশতঃ সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থের কথনই উপচার, ইহা মহর্ষি গোতম নিজেই বলিয়াছেন)।

টীকনী। সূত্রে প্রথমেই যে ধর্ম্ম শব্দটি আছে, উহার দ্বারা শব্দের ধর্ম্মই মহর্ষির বিবক্ষিত। বাহার দ্বারা কোন অর্থ অতিহিত হয়, এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা ভাবের-প্রথমে ‘অভিধান’ বলিতে শব্দ বুঝিতে হইবে। যে শব্দটি যে অর্থে সামান্যতঃ প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগই তাহার যথার্থ প্রয়োগ, উহা শব্দের ধর্ম্ম। যেমন জল শব্দের জল অর্থে প্রয়োগ, মধ্য শব্দের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসনবিশেষ অর্থে প্রয়োগ, এইগুলি শব্দের যথার্থ প্রয়োগ। শব্দের মুখ্যার্থ হইতে অন্য অর্থে প্রয়োগই এখানে ভাব্যকারের মতে ধর্ম্মবিকল্প। যেমন মধ্য শব্দের ‘মধ্যস্থিত পুরুষ’ অর্থে প্রয়োগ। উহা মধ্য শব্দের মুখ্যার্থ নহে; উহাকে বলে লাক্ষণিক অর্থ। ঐ অর্থেও মধ্য শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাব্যকার এইরূপ ধর্ম্মবিকল্পের নির্দেশকেই সূত্রোক্ত ধর্ম্মবিকল্প-নির্দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শব্দের ধর্ম্ম প্রয়োগ। তাহার বিকল্প বলিতে বৈবিধ্য অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগ বিবিধ;—মুখ্য এবং গোণ। শব্দের সামান্যতঃ মুখ্য প্রয়োগই হয়। কোন বিশেষবশতঃ কোন কোন স্থলে গোণ প্রয়োগও হয়। সেই ধর্ম্ম-বিকল্পপ্রযুক্ত যে নির্দেশ অর্থাৎ বাক্য, তাহাই ধর্ম্ম-বিকল্প-নির্দেশ। বাহার দ্বারা নির্দেশ করা হয়, এই অর্থে সূত্রে নির্দেশ শব্দের দ্বারা বাক্য বুঝিতে হইবে। ভাব্যের প্রচলিত পাঠানুসারে তাৎপর্য্য-

টীকাকারের ব্যাখ্যা ভাব্যব্যাখ্যা বলা যায় না। কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারের কথার উল্লেখ করিয়াই এখানে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রচলিত পাঠই মূলে গৃহীত হইয়াছে। সকল পুস্তকেই ঐরূপ পাঠ দেখা যায়।

প্রকৃত কথা এই যে, অনেক শব্দের অর্থবিশেষে গৌণ বা লাক্ষণিক প্রয়োগ স্মৃতিরকাল হইতেই লোকসিদ্ধ আছে। উহাকে প্রাচীনগণ 'উপচার' বলিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম দ্বিতীয় অব্যায়ের বিতীয় আক্ষিকের ৫৯ সূত্রে সাহচর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি নিমিত্তবশতঃ এই উপচার হয়, এ কথা বলিয়াছেন। যেমন কোন ব্যক্তি মঞ্চস্থ ব্যক্তিদিগের রোদন শুনিয়া বলিলেন,—মঞ্চগণ রোদন করিতেছে। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদ করিলেন যে, মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ ব্যক্তিরাই রোদন করিতেছে। মঞ্চ অচেতন পদার্থ, তাহা রোদন করিতে পারে না। পূর্বোক্ত বাক্যে মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। মঞ্চস্থ ব্যক্তিরা মঞ্চ অবস্থান করায় ঐ স্থানরূপ নিমিত্তবশতঃ মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের উপচার প্রসিদ্ধই আছে (২ অ০, ২ আ০, ৫৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। প্রতিবাদী ঐ উপচারকে বিষয় করিয়া ঐ স্থলে মঞ্চ রোদন করিতেছে না, এই বাক্যের দ্বারা যে নিষেধ করিলেন, তাহা উপচার-ছল। মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ কাঠ-নির্মিত আসনবিশেষ। তাহা অচেতন পদার্থ বলিয়া রোদন করিতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে অর্থ-সদৃশ্যের দ্বারা অর্থাৎ মঞ্চ শব্দের যে অর্থের সদৃশ্য বা মুখ্যতা আছে, সেই মুখ্য অর্থ অবলম্বন করিয়াই ঐ স্থলে প্রতিবাদী ঐরূপ নিষেধ করিয়াছেন। উদ্যোতকরের মতে অর্থ-সদৃশ্যের প্রতিষেধই সূত্রোক্ত অর্থ-সদৃশ্য-প্রতিষেধ। মূলকথা, বাদী যে মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়া মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এই কথা বলিয়াছেন, প্রতিবাদী তাহা বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ ধরিয়া, মঞ্চের রোদন অসম্ভব বলিয়া বাদীর বাক্যের যে ব্যাঘাত করিলেন, তাহা উপচার-ছল। ছলমাত্রেরই অর্থবিকল্পরূপ উপগতি চাই, এখানেও তাহা আছে; কারণ, লক্ষণার দ্বারা মঞ্চ শব্দের 'মঞ্চস্থ ব্যক্তি' অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, শক্তির দ্বারা প্রতিবাদী তাহার মুখ্য অর্থের করনা করিয়াছেন। মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ যখন এখানে বাদীর বিবক্ষিত নহে, তখন ঐ মুখ্য অর্থ গ্রহণ এখানে ছলকারীর অর্থান্তর করনাই হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদি এক অর্থে চিরপ্রযুক্ত শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা হইলে সকল শব্দেরই সকল অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে অর্থাৎ সকল অর্থেই সকল শব্দের উপচার হইতে পারে। এই ভুল ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“উপচারো নীতার্থঃ।” তাৎপর্য্য-টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নীতার্থঃ প্রাপিতার্থঃ সহচরণাদিনা নিমিত্তেনেতি”। অর্থাৎ উপচার নিজের ইচ্ছা-মত হয় না। সাহচর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি নিমিত্ত আছে, তাহার মধ্যে কোন নিমিত্ত যেখানে কোন শব্দকে অন্য অর্থ প্রাপ্ত করার, সেখানেই সেই অর্থে সেই শব্দের উপচার বা লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়, সেইরূপ প্রয়োগই উপচার। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ ব্যাখ্যার পরে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, এক অর্থে দৃষ্ট শব্দের যে অন্য অর্থে প্রয়োগ, তাহা সেই শব্দের মুখ্য অর্থের

সহিত গোণ অর্থের কোন সম্বন্ধবিশেষ প্রযুক্তই হয়, সুতরাং যে কোন শব্দের যে কোন অর্থে ঐরূপ উপচার বা লাক্ষণিক প্রয়োগ হইতে পারে না।

বৃত্তিকার বিখ্যাত পদ্ধতি পরবর্তী কেহ কেহ মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়াও উপচার-ছল হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় লাক্ষণিক অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ, তাহাই উপচার-ছল বলিয়া বুঝা যায়। অবশ্য মুখ্য অর্থের দ্বারা গোণ অর্থ ধরিয়াও প্রতিষেধ হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে গোণ অর্থ গ্রাহ্য নহে। সুতরাং মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের গোণ অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধকে ভাষ্যকার উপচার-ছল বলেন নাই। মহর্ষির স্বজের দ্বারাও সরল ভাবে তাহা বুঝা যায় না। উপচার-ছল, এই নামের দ্বারাও সহজে তাহা বুঝা যায় না। মনে হয়, এই সকল কারণেই ভাষ্যকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

ভাষ্য। অত্র সমাধিঃ, প্রসিদ্ধে প্রয়োগে বক্তুর্যথাভিপ্রায়ঃ শব্দার্থয়ো-
রনুজ্ঞা-প্রতিষেধো বা ন হৃন্দতঃ। প্রধানভূতস্য শব্দস্য ভাক্তস্য চ
গুণভূতস্য প্রয়োগ উভয়োলোকসিদ্ধঃ। সিদ্ধপ্রয়োগে যথা বক্তুরভিপ্রায়-
স্তথা শব্দার্থানুজ্ঞের্যো, প্রতিষেধ্যো বা ন হৃন্দতঃ। যদি বক্তা প্রধান-
শব্দং প্রযুক্তে যথাভূতস্তানুজ্ঞা প্রতিষেধো বা ন হৃন্দতঃ, অথ
গুণভূতং তদা গুণভূতস্য, যত্র তু বক্তা গুণভূতং শব্দং প্রযুক্তে, প্রধান-
ভূতমভিপ্রৈত্য পরঃ প্রতিষেধতি, স্বমনীষয়া প্রতিষেধোহসৌ ভবতি
ন পরোপালম্ব ইতি।

অনুবাদ। এই উপচার-ছল বিষয়ে সমাধান (বলিতেছি)। প্রসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে শব্দ এবং অর্থের অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ হয়, ছলের দ্বারা অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে হয় না। বিশদার্থ এই যে, প্রধানভূত শব্দের অর্থাৎ মুখ্য শব্দের এবং ভাক্ত কি না গুণভূত (অপ্রধান) শব্দের প্রয়োগ উভয় পক্ষে লোকসিদ্ধ, অর্থাৎ মুখ্য ও গোণ এই দ্বিবিধ শব্দের প্রয়োগই যে লোকসিদ্ধ, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত। সিদ্ধ প্রয়োগে অর্থাৎ লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার যে প্রকার অভিপ্রায়, তদনুসারে শব্দ ও অর্থকে অনুজ্ঞা করিবে, অথবা নিষেধ করিবে,—ছলের দ্বারা অর্থাৎ স্বৈচ্ছানুসারে করিবে না। বক্তা যদি প্রধান শব্দ প্রয়োগ করেন, (তাহা হইলে) যথাভূত অর্থাৎ সেখানে ঐ শব্দ এবং তাহার অর্থ যে প্রকার, তাহারই অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ করিতে হইবে, স্বৈচ্ছানুসারে করিতে হইবে না, আর যদি বক্তা গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান বা লাক্ষণিক শব্দ

প্রয়োগ করেন, (তাহা হইলে) গুণভূতের অর্থাৎ সেই অপ্রধান শব্দ ও অর্থের অনুজ্ঞা ও প্রতিবেদ হয় (স্বেচ্ছানুসারে প্রতিবেদ হয় না)। যে স্থলে কিন্তু বক্তা অপ্রধান শব্দ প্রয়োগ করেন, অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী (ঐ শব্দকে) প্রধানভূত মনে করিয়া নিষেধ করেন, এই নিষেধ নিজ বুদ্ধির দ্বারা হয়, (উহার দ্বারা) পরের অর্থাৎ বাদীর উপালম্ব (বাক্য-ব্যাঘাত বা নিগ্রহ) হয় না।

টিপ্পনী। ভাষাকার উপচার-স্থলের সমাধান বলিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, শব্দের মুখ্য প্রয়োগ এবং গৌণ প্রয়োগ লোক-সিদ্ধ। বক্তা যদি মুখ্য শব্দেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই মুখ্য শব্দ এবং তাহার প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার নিষেধের কারণ থাকিলে নিষেধ করা যায় অর্থাৎ তাহাতে কোন দোষ থাকিলে সেই দোষ প্রদর্শন করা যায়, আর তাহা নিষেধ করিবার কোন কারণ না থাকিলে সেই মুখ্য শব্দ এবং তাহার অর্থের অনুজ্ঞাই করিতে হয়। নিজের ইচ্ছানুসারে শব্দ ও অর্থের অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ করা যায় না। আর যদি বক্তা কোন ভাক্ত শব্দের অর্থাৎ অপ্রধান শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে সেই শব্দ ও তাহার প্রতিপাদ্য লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার নিষেধ বা অনুজ্ঞা করিতে হয়। বক্তা কোন স্থলে গৌণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া কোন গৌণ অর্থ প্রকাশ করিলেন, সেখানে বক্তার ঐ শব্দটিকে মুখ্য শব্দ বলিয়া কল্পনা করিয়া এবং তাহার প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ ধরিয়া নিষেধ করিলে তাহা নিজ বুদ্ধির দ্বারা নিজের ইচ্ছানুসারে নিষেধ হয়, ঐ নিষেধে বাদীর বাক্যের বস্ত্তঃ ব্যাঘাত হইতে পারে না, উহাতে বাদীর কথিত পদার্থের কোন নিষেধ হয় না। বাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়ানুসারে তাহাই গ্রহণ করিয়া যদি তাহার নিষেধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই বাদীর উপালম্ব বা পক্ষদুষণ হইতে পারে। পূর্বেক্ত স্থলে বাদী মঞ্চস্থ ব্যক্তি বুঝাইতে মঞ্চ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন; উহা উপচার এবং উহা লোক-সিদ্ধ। প্রতিবাদীও ঐরূপ প্রয়োগের লোক-সিদ্ধতা স্বীকার করিতে বাধ্য। স্ততরাং ঐরূপ লোক-সিদ্ধ গৌণ প্রয়োগ করিতে বাদীর কোন অপরাধ নাই। প্রতিবাদী, বাদীর প্রযুক্ত ঐ গৌণ শব্দকে প্রধান শব্দ ধরিয়া অর্থাৎ মঞ্চ শব্দটি যে অর্থের বাচক, যে অর্থ বুঝাইতে উহা প্রধান শব্দ বা মুখ্য শব্দ, সেই অর্থ ধরিয়া বাদীর অভিপ্রায়কে উপেক্ষা করিয়া নিষেধ করিলেন—মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ ব্যক্তিরাই রোদন করিতেছে। মঞ্চগুলি অচেতন পদার্থ, তাহাদিগের রোদন অসম্ভব, ইহা বাদী জানেন, বাদী সেই মঞ্চের রোদন বলেনও নাই। প্রতিবাদী বাদীর অভিপ্রায় বুঝিয়াও ঐরূপ গৌণ অর্থ ধরিয়া নিষেধ করিলে উহা প্রতিবাদীরই অপরাধ। আর বাদীর বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ নিষেধ করিলেও গৌণ প্রয়োগ বিষয়ে নিজের অনভিজ্ঞতা তাহারই দোষ। পরন্তু বাদীর বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিলে প্রতিবাদীর তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝা উচিত, তাহা না করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে বাদীর প্রযুক্ত গৌণ শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষ প্রদর্শন কখনই উচিত নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, যদি গৌণ প্রয়োগ বলিয়াই উপপত্তি

করা যায়, তাহা হইলে আর কাহারও কোন বাক্যে দোষ থাকিতেই পারে না, সর্বত্রই শব্দের একটা গৌণ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া উপপত্তি করা যায়। এতদ্ব্যতীত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রধান-ভূত শব্দ এবং ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ লোকসিদ্ধ আছে অর্থাৎ লোক-সিদ্ধ গৌণ প্রয়োগই করিতে হইবে, নিম্নরোজনে নূতন কোনরূপ গৌণ প্রয়োগ করা যায় না। পূর্বোক্ত স্থলে মঞ্চ শব্দের মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে গৌণ প্রয়োগ অর্থাৎ মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ লোক-সিদ্ধই আছে, ঐরূপ প্রয়োগ বাদী নূতন করেন নাই। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যদিও ভাষ্য-কারের এখানে ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ লোকসিদ্ধ আছে, এইমাত্রই বক্তব্য, উহা বলিলেই পূর্বোক্ত আপত্তির নিরাস হয়, তাহা হইলেও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্তই প্রধান শব্দের কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রধান শব্দ বা মুখ্য শব্দের প্রয়োগ যেমন লোক-সিদ্ধ, তজ্জপ ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগও লোক-সিদ্ধ। লোক-সিদ্ধ প্রয়োগে বাদীর কোন অপরাধ হইতে পারে না। যেচ্ছা-সারে নূতন করিয়া লাক্ষণিক প্রয়োগ করিলে দোষ বলা যাইতে পারে।

যে অর্থটি যে শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ, সেই অর্থে সেই শব্দকে প্রধান শব্দ ও মুখ্য শব্দ বলে। যে শব্দের মুখ্যার্থের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত অপর একটি অর্থ ঐ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ঐ অর্থে ঐ শব্দকে ভাক্ত শব্দ বলে। ভাক্ত শব্দ গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান। যেমন মঞ্চ শব্দটি মঞ্চ অর্থে মুখ্য শব্দ, মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে ভাক্ত শব্দ। প্রাচীনগণ লক্ষণাকে ভক্তি বলিতেন। ঐ ভক্তি শব্দ হইতেই ভাক্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উদ্যোতকর অন্তর্যাহা বলিয়াছেন, 'তাহাতে বুঝা যায়, ভক্তি বলিতে সাদৃশ্যবিশেষ। "উভয়েন ভজ্যতে" অর্থাৎ উভয় পদার্থ যাহাকে ভজনা বা আশ্রয় করে, এই অর্থে ভক্তি শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য বুঝা যায়। এক পদার্থে সাদৃশ্য থাকে না, সাদৃশ্য উভয়াশ্রিত। তাহা হইলে সাদৃশ্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণা অর্থাৎ যাহাকে গোণী লক্ষণা বলা হইয়াছে, তাহাই ভক্তি শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয় এবং ঐরূপ লক্ষণাবলেই সেই শব্দকে ভাক্ত বলিতে পারা যায়। ভাষ্যকার কিন্তু মঞ্চস্থ পুরুষে লাক্ষণিক মঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়াও এখানে ঐ শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। স্মরণ্য সামান্যতঃ লাক্ষণিক শব্দমাত্রই ভাক্ত, ইহা তাঁহার কথায় বুঝা যায়। "ভাক্তস্ত গুণভূতস্ত" এই স্থলে গুণভূত শব্দের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ স্থলে গুণভূত বলিতে অপ্রধান অর্থাৎ লাক্ষণিক। তাহা "ছন্দতঃ" এই স্থলে ছন্দ শব্দের অর্থ ইচ্ছা বা স্বেচ্ছা। অভিধানে ছন্দ শব্দের অভিপ্রায় অর্থ পাওয়া যায়। তাৎপর্যটীকাকার "ছন্দতঃ" ইহার ব্যাখ্যা বলিয়াছেন ছিগ্না।" ছয়ান্ শব্দের অর্থ কপট। কোন পুস্তকে ঐ স্থলে "ছলতঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায় ৷১৫৷

১। ভক্তির্নাম অতথাত্মতত্ত্ব তথাত্মবিশিষ্টঃ সামান্যতঃ, উভয়েন ভজ্যতে ইতি ভক্তিঃ, যথা বাহীকস্ত মন্যমানস্তঃ সংজ্ঞানুসাধ্য বাহীকো পৌরিত।—ভাষ্যবাস্তবিক, ২১১৭০ পৃষ্ঠা।

সূত্র । বাক্‌ছলমেবোপচারচ্ছলং তদবি- শেষাৎ ॥১৫॥৫৬॥

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) উপচারচ্ছল—বাক্‌ছলই ; কারণ, তাহা হইতে বিশেষ নাই । অর্থাৎ বাক্‌ছলে যেমন অর্থান্তরকল্পনা, উপচারচ্ছলেও তদ্রূপ অর্থান্তর-কল্পনা, সুতরাং উপচারচ্ছল ও বাক্‌ছলে কোন ভেদ না থাকায় ছল বিবিধ, ত্রিবিধ নহে ।

ভাষ্য । ন বাক্‌ছলাদুপচারচ্ছলং ভিদ্যতে, তস্তাপ্যর্থান্তরকল্পনায়া অবিশেষাৎ । ইহাপি স্থানার্থো গুণশব্দঃ প্রধানশব্দঃ স্থানার্থ ইতি কল্পয়িত্বা প্রতিষিধ্যত ইতি ।

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) বাক্‌ছল হইতে উপচারচ্ছল ভিন্ন নহে । কারণ, সেই উপচারচ্ছলের সম্বন্ধেও অর্থান্তর কল্পনার বিশেষ নাই । বিশদার্থ এই যে, এই উপচারচ্ছলেও স্থানীর বোধক অপ্রধান শব্দ (অর্থাৎ মঞ্চস্থ ব্যক্তির বোধক মঞ্চ শব্দটি) স্থানার্থ অর্থাৎ মঞ্চরূপ স্থানের বাচক প্রধান শব্দ, ইহা কল্পনা করিয়া প্রতিষেধ করা হয় ।

টীপনী । মহর্ষি গৌতম গ্রামাণাদি বোড়শ প্রকার পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণ বলিয়া উহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন । উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা, এই তিন প্রকারেই মহর্ষি শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছেন । পরীক্ষা-প্রকরণে সকল পদার্থেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা আবশ্যিক মনে করেন নাই । যে পদার্থে সংশয় হইবে, সেই পদার্থে মহর্ষির প্রদর্শিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে হইবে । এই কথা দ্বিতীয়ায়্যয়ে বলিয়া গিয়াছেন । ছল পদার্থের ত্রিবিধত্ব বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া মহর্ষি এখানেই ছলের পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন । পরীক্ষা-প্রকরণে ছলের পরীক্ষা করিলে প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ছলের পূর্বকথিত অনেক পদার্থ উল্লিখন করিয়া সে পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে ঐ পরীক্ষা-প্রকরণের পূর্বকথার সহিত সংগতি থাকে না । পরন্তু পরীক্ষা-প্রকরণও নিকটবর্তী । মহর্ষির শিষ্যগণও পরীক্ষা-চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তাই মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণেও ছলের লক্ষণের পরে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষা করিয়াছেন । প্রথমতঃ সংশয়, পরে পূর্বপক্ষ, তাহার পরে সিদ্ধান্ত, এই ভাবেই পদার্থের পরীক্ষা হয় । মহর্ষি-কবিত উপচারচ্ছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন কি না ? এইরূপ সংশয়ে মহর্ষি তাহার পরীক্ষার জন্ত প্রথমেই পূর্বপক্ষ স্বত্র বলিয়াছেন । পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, উপচারচ্ছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন । কারণ, উপচারচ্ছলও শব্দের অর্থান্তর কল্পনামূলক, বাক্‌ছলও শব্দের অর্থান্তর কল্পনামূলক । সুতরাং উভয় হলেই যখন শব্দের অর্থান্তর কল্পনার কোন বিশেষ নাই, তখন উপচারচ্ছল বাক্‌ছলের মধ্যেই গণ্য । ফলকথা, ছল

দ্বিবিধ নহে, বাক্‌ছল এবং সামান্‌ছল, এই দুই নামে ছল দ্বিবিধ। ভাষ্যকার তাহার প্রদর্শিত উপচারছলের উদাহরণে বাক্‌ছলের দ্বারা অর্থান্তর করণা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত উপচারছলেও স্থানীর বোধক অপ্রধান শব্দকে স্থানার্থপ্রধান শব্দ বলিয়াই কল্পনা করিয়া নিবেদন করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, মঞ্চ শব্দের মুখ্যার্থ মঞ্চ নামক স্থান। ঐ অর্থে মঞ্চ শব্দটি প্রধান শব্দ। ঐ মঞ্চস্থিত পুরুষগণ স্থানী; কারণ, তাহারা মঞ্চে অবস্থান করিতেছে। মঞ্চ তাহাদিগের স্থান, সুতরাং তাহারা স্থানী। মঞ্চ শব্দ যখন ঐ স্থানী অর্থাৎ মঞ্চস্থ পুরুষকে বুঝাইবে, তখন মঞ্চ শব্দটি ঐ স্থানী অর্থে অপ্রধান শব্দ বা ভুক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দ। বাদী মঞ্চ শব্দটিকে ঐ স্থলে মঞ্চস্থিত পুরুষরূপ স্থানী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন; প্রতিবাদী মঞ্চ শব্দের স্থানরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া নিবেদন করিয়াছেন। সুতরাং বাক্‌ছলের দ্বারা এই উপচারছলেও শব্দের অর্থান্তর কল্পনা রহিয়াছে। তাহা হইলে উপচারছল বাক্‌ছলবিশেষই। উহা বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন কোন প্রকার ছল নহে ॥ ১৫ ॥

সূত্র। ন তদর্থান্তরভাবাৎ ॥ ১৬ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ উপচারছল বাক্‌ছলই নহে; কারণ, উপচারছলে যে অর্থসদৃশ্য প্রতিবেদন হয়, অর্থান্তর কল্পনা হইতে তাহার ভেদ আছে।

ভাষ্য। ন বাক্‌ছলমেবোপচারছলং, তস্যার্থসদৃশ্যপ্রতিবেদন-
অর্থান্তরভাবাৎ। কৃতঃ? অর্থান্তরকল্পনাৎ। অন্যত্বার্থান্তরকল্পনা
অন্যোহর্থসদৃশ্যপ্রতিবেদন ইতি।

অনুবাদ। (উত্তর) উপচারছল বাক্‌ছলই নহে; কারণ, সেই অর্থসদৃশ্য প্রতিবেদনের অর্থাৎ উপচারছলে যে অর্থসদৃশ্য প্রতিবেদন হয়, তাহার অর্থান্তর ভাব অর্থাৎ ভিন্নপদার্থতা বা ভিন্নত্ব আছে। (প্রশ্ন) কি হইতে? অর্থাৎ কি হইতে অর্থসদৃশ্য-প্রতিবেদনের ভেদ আছে? (উত্তর) অর্থান্তরকল্পনা হইতে। বিশদার্থ এই যে, অর্থান্তরকল্পনা ভিন্ন পদার্থ, অর্থসদৃশ্যপ্রতিবেদন ভিন্ন পদার্থ। (ঐ দুইটি একই পদার্থ নহে; সুতরাং উপচারছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন)।

টিপ্পনী। পূর্বসূত্রের দ্বারা যে পূর্বপক্ষ প্রকাশ করা হইয়াছে, এই সূত্রের দ্বারা তাহার নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, উপচারছলে অর্থসদৃশ্য-প্রতিবেদন হয়, আর বাক্‌ছলে তাহা হয় না, কেবল অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা ইদো প্রদর্শন হয়। অর্থসদৃশ্য-প্রতিবেদন, আর অর্থান্তরকল্পনা এক পদার্থ নহে, ঐ দুইটি ভিন্ন পদার্থ; সুতরাং উপচারছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন। উদ্যোতকরের মতে অর্থসদৃশ্যের নিবেদনই সূত্রোক্ত অর্থসদৃশ্য-প্রতিবেদন। অর্থসদৃশ্য বলিতে বস্তুর সত্তা। তাহার নিবেদন বাক্‌ছলে হয়

না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, মঞ্চগুণ রোদন করিতেছে না, এই বাক্যের দ্বারা মঞ্চে রোদনরূপ বস্তুর অস্তিত্বই নিষিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মঞ্চে রোদন পদার্থের সম্বন্ধে অস্বীকার করা হয়, কিন্তু বাক্যে এই বাক্যের নবসংখ্যক কথন নাই, এই কথা দ্বারা তাহার কথনের সম্বন্ধে নিষেধ করা হয় না। বাদী, এই বাক্য নবকথনবিশিষ্ট। এই বাক্যের দ্বারা বাক্যবিশেষে যে নবকথনবিশিষ্ট কথনের বিধান করিয়াছেন, সেই বিদ্যমান কথন সেই বাক্যকে আছে, ইহা স্বীকার করিয়া অর্থাৎ তাহার প্রতিষেধ না করিয়া তাহার বিশেষণ যে নবকথন, তাহারই নিষেধ করা হয়। কিন্তু উপচারহলে (পূর্বোক্ত স্থলে) মঞ্চে বিদ্যমান রোদন পদার্থেরই প্রতিষেধ করা হয়, সুতরাং বাক্য ও উপচারহলে বিশেষ ভেদ আছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও উপচারহল ও বাক্যের পূর্বোক্ত প্রকার ভেদ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের ইহাই মূল তাৎপর্য্য ॥ ১৬ ॥

সূত্র। অবিশেষে বা কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাদেক-ছল-
প্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৫৮॥

অনুবাদ। পঞ্চাস্তরে—বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ যদি বাক্য ও উপচার-
হলের ঐ বিশেষ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে কিঞ্চিৎসাধর্ম্যপ্রযুক্ত এক ছলের
আপত্তি হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে ছল একই হইয়া পড়ে, ছল দ্বিবিধও হইতে
পারে না।

ভাষ্য। ছলস্ত দ্বিত্বমভ্যনুজ্ঞায় ত্রিত্বং প্রতিষিধ্যতে কিঞ্চিৎ
সাধর্ম্যাৎ, যথা চায়ং হেতুস্ত্রিত্বং প্রতিষেধতি তথা দ্বিত্বমপ্যভ্যনুজ্ঞাতং
প্রতিষেধতি, বিদ্যতে হি কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাৎ দ্বয়োরপীতি। অথ দ্বিত্বং
কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাম্ নিবর্ত্ততে ত্রিত্বমপি ন নিবর্ত্ততি।

অনুবাদ। ছলের দ্বিত্ব স্বীকার করিয়া কিঞ্চিৎসাধর্ম্যা বশতঃ ত্রিত্বকে নিষেধ
করা হইতেছে অর্থাৎ বাক্য ও উপচারহলে কিছু সাধর্ম্যা থাকায় ঐ দুইটিকে
এক বলিয়া পূর্বপক্ষবাদী ছলকে দ্বিবিধ বলিতেছেন, ছলের ত্রিত্ব বা ত্রিবিধত্ব খণ্ডন
করিতেছেন। (তাহা হইলে) যেমন এই হেতু অর্থাৎ কিঞ্চিৎসাধর্ম্যরূপ হেতু
(ছলের) ত্রিত্বকে নিষেধ করিতেছে, তদ্রূপ স্বীকৃত ত্রিত্বকেও নিষেধ করিতেছে।
যেহেতু কিঞ্চিৎসাধর্ম্যা দুই ছলেও আছে অর্থাৎ বাক্য ও সামান্যছল নামে যে
দ্বিবিধ ছল স্বীকার করা হইতেছে, তাহাতেও কিঞ্চিৎসাধর্ম্যা থাকায় ছল দ্বিবিধও
হইতে পারে না। আর যদি কিঞ্চিৎসাধর্ম্যা বশতঃ দ্বিত্ব নিবৃত্ত না হয়, (তাহা
হইলে) ত্রিত্বও নিবৃত্ত হইবে না।

টিপ্পনী। আপত্তি হইতে পারে যে, বাক্যে এবং উপচারহলে কোন অংশে বিশেষ

থাকিলেও অর্থাস্তরকল্পনা ঐ উভয় ছিলেই আছে, সুতরাং অর্থাস্তরকল্পনারূপ সাধর্ম্যবশতঃ উপচারছলকে বাক্ছলই বলিব, উহার মধ্যে আর কোন বিশেষ গ্রহণ করিব না। এতদ্বত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যদি অর্থাস্তরকল্পনারূপ কোন একটি সাধর্ম্য লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ছলকেও এক বল, তাহা হইলে ছল দ্বিবিধও বলিতে পার না। তাহা হইলে ছল পদার্থ একই হইয়া পড়ে, ছলের আর কোন প্রকার-ভেদ থাকে না। কারণ, যে কোনরূপে অর্থাস্তরকল্পনা ছল মাত্রেই আছে। অর্থাস্তরকল্পনা ব্যতীত কোনরূপ ছলই হয় না। সামান্য ছলেও পূর্বোক্ত স্থলে ব্রাহ্মণদ্ব-ধর্ম্মে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপ অর্থাস্তর (অর্থাৎ সেখানে যাহা বস্তুর বিবক্ষিত নহে, এমন অর্থ) কল্পনার দ্বারা দোষ প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং অর্থাস্তরকল্পনারূপ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য ছল মাত্রেই থাকায় ছল একই হইয়া পড়ে, ছলের দ্বিবিধত্বও থাকে না।

ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যরূপ যে হেতুকে গ্রহণ করিয়া ছলের দ্বিবিধত্ব নিবেদন করিতেছেন, সেই কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যরূপ হেতুই তাহার স্বীকৃত ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাধক হইতেছে। ফলতঃ পূর্বপক্ষবাদীর গৃহীত হেতুর দ্বারা যখন তাহার নিজ সিদ্ধান্তই ব্যাহত হইতেছে, তখন উহা ঐ স্থলে হেতু হইতে পারে না। যদি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যরূপ হেতু তাহার নিজ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ছলের দ্বিবিধত্বের বাধক না হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাধক হইতে পারে না। মূলকথা, যে যুক্তিতে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য ছলের দ্বিবিধত্বের বাধক বলা হইতেছে, সেই যুক্তিতেই উহাকে ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাধক বলা যাইবে। অন্ততঃ ছলত্ব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য ছলমাত্রেই আছে। সুতরাং ছলকে একই বলিতে হইবে, ছলকে দ্বিবিধও বলা যাইবে না। পরিশেষে তাহাই স্বীকার করিলে অর্থাৎ সাধর্ম্যবশতঃ ছলকে একই বলিলে কোন পদার্থেরই প্রকার-ভেদ বলিতে পারিবে না। কারণ, বস্তু মাত্রেরই বস্তুত্ব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য আছেই, অতএব বস্তু মাত্রেরই প্রকার-ভেদের উচ্ছেদ হইয়া যায়। সুতরাং পদার্থের যে অংশে যে ভেদ আছে, ঐ ভেদ বা বিশেষকে গ্রহণ করিয়াই পদার্থের প্রকার-ভেদ বলিতে হইবে। তাহা হইলে বাক্ছল ও উপচারছলের যে অংশে ভেদ আছে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া ছলকে দ্বিবিধ বলা যাইতে পারে। মহর্ষি গোতম তাহাই বলিয়াছেন। ১৭।

ভাষ্য। ছললক্ষণাদূর্জম।

অনুবাদ। ছলের লক্ষণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন)।

সূত্র। সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ॥১৮॥৫৯॥

অনুবাদ। সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র কোন সাধর্ম্যবিশেষ অথবা বৈধর্ম্য-বিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ—জাতি।

ভাষ্য। প্রযুক্তে হি হেতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে স জাতিঃ। স চ প্রসঙ্গঃ সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানমুপালম্বঃ প্রতিবেদ ইতি। উদাহরণ-সাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যশ্রোদাহরণ-বৈধর্ম্যেণ প্রত্যবস্থানম্। উদাহরণ-বৈধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যশ্রোদাহরণ-সাধর্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং, প্রত্যনৌকভাবাং। জায়মানোহর্থো জাতিরिति।

অনুবাদ। হেতু প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ কোন বাদী কোন সাধ্য সাধনের জন্ত কোন হেতু অথবা হেতুভাস প্রয়োগ করিলে যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা জাতি। সেই প্রসঙ্গ কিন্তু সাধর্ম্যা অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান কি না উপালম্ব, প্রতিবেদ। উদাহরণের সাধর্ম্যা প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ সাধর্ম্যা হেতু স্থলে উদাহরণের বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। উদাহরণের বৈধর্ম্যা প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ বৈধর্ম্যা হেতু স্থলে—উদাহরণের বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। অর্থাৎ এইরূপ প্রত্যবস্থানকে জাতি বলে; কারণ, প্রত্যনৌকভাব অর্থাৎ এইরূপ প্রত্যবস্থানে প্রতিকূল ভাব বা বিরুদ্ধতা আছে। জায়মান পদার্থ জাতি, অর্থাৎ বাদী হেতু অথবা হেতুভাসের প্রয়োগ করিলে পূর্বোক্ত প্রকার প্রত্যবস্থান জন্মে, এই জন্ত উহার নাম জাতি। যাহা জন্মে, তাহাকে জাতি বলা যায়।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে ছল পদার্থের পরেই জাতি নামক পদার্থ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। সূত্রের লক্ষণ-প্রকরণে ছলের পরেই ক্রমপ্রাপ্ত জাতির লক্ষণ বক্তব্য। মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষা করা হইলেও ছলের লক্ষণের পরে অত্র কোন পদার্থের লক্ষণ বলা হয় নাই। যথাক্রমে মহর্ষি ছলের লক্ষণের পরে জাতিরই লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সেই কথা বলিয়াই জাতি-লক্ষণ-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রতিকূল ভাবে অবস্থানকে প্রত্যবস্থান বলে। বাদী কোন সাধ্য সাধনের জন্ত হেতু অথবা হেতুভাস প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ বাদী তাঁহার স্বপক্ষের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন একটি দোষ প্রদর্শন বা আপত্তি করিয়া প্রত্নস্তর করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতিকূল ভাবে দাঁড়াইলেন; তাই প্রত্যবস্থানকে ভাষ্যকার উপালম্ব বলিয়াছেন, শেষে প্রতিবেদ বলিয়া আবার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার নাম উপালম্ব এবং প্রতিবেদ, সূত্রে তাহাকেই প্রত্যবস্থান বলা হইয়াছে। কেবল প্রত্যবস্থান মাত্রকেই জাতি বলা যায় না। তাহা বলিলে ছল নামক পূর্বোক্ত প্রকার অসদ্বস্তর এবং সদ্বস্তরগুলিও জাতির লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; কারণ, সেগুলিও উপালম্ব বা প্রতিবেদ, সূত্রের সেগুলিও প্রত্যবস্থান। এ জন্ত মহর্ষি বলিয়াছেন—“সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং।” অর্থাৎ সাধর্ম্যা অথবা বৈধর্ম্যা মাত্র অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাই জাতি। সাধর্ম্যা অথবা বৈধর্ম্যা প্রযুক্ত কোন প্রকার ছল হয় না। সদ্বস্তরগুলিও কেবল

সাধর্ম্য অথবা কেবল বৈধর্ম্যমাত্র ধরিয়া হয় না, তাহা হইলে সে উত্তর সঙ্গতরই হয় না। পূর্বোক্ত ঐরূপ প্রত্যুত্তরকেই জাতি বলে, উহা অসঙ্গতর। যেমন কোন বাদী বলিলেন—আত্মা নিষ্ক্রিয়, যেহেতু আত্মাতে বিভূত অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্ব আছে, যাহা যাহা সর্বব্যাপী পদার্থ, তাহা নিষ্ক্রিয়, যেমন গগন। এখানে কোন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি নিষ্ক্রিয় গগনের সাধর্ম্য বিভূত থাকাতেই আত্মা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে সক্রিয় ঘটের সাধর্ম্য সংযোগ আত্মাতে আছে বলিয়া আত্মা সক্রিয় হউক। আত্মা সর্বব্যাপী অর্থাৎ আত্মার সহিত সমস্ত মূর্ত পদার্থের সংযোগ আছে, স্মৃতিরূপ ঘট প্রভৃতি ক্রিয়াযুক্ত পদার্থের সহিতও আত্মার সংযোগ আছে, তাহা হইলে ক্রিয়াযুক্ত ঘটের সাধর্ম্য যে সংযোগ, তাহা আত্মাতে থাকায় আত্মা ক্রিয়াযুক্ত হউক। প্রতিবাদী এই কথা বলিয়া বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে দোষ উদ্ভাবন করিলে, ঐ দোষ প্রকৃত দোষ নহে। কারণ, সংযোগ থাকিলেই যে সে পদার্থ সক্রিয় হইবে, এমন নিয়ম নাই। প্রতিবাদী কেবল সংযোগরূপ সাধর্ম্যটি লইয়া ঐরূপ আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার গৃহীত সংযোগরূপ সাধর্ম্যে সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তি নাই। প্রতিবাদী ঐ ব্যাপ্তির কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্যমাত্র অবলম্বনে পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিবেদ করায়, উহা জাতি হইবে। ঐরূপ জাতিকে সাধর্ম্যসমা জাতি বলে। এবং যদি কোন বাদী বলেন যে, শব্দ অনিত্য—যেহেতু শব্দ জন্ম এবং ভাব পদার্থ, যাহা যাহা অনিত্য নহে, তাহা জন্ম ও ভাবপদার্থ নহে। এই স্থলে যদি কোন প্রতিবাদী বলেন যে, শব্দ যদি নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্য জন্ম-ভাবত্ব হেতুক অনিত্য হয়, তাহা হইলে অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্য যে শ্রাব্যতা সেই শ্রাব্যতাহেতুক শব্দ নিত্য হউক। ঘট, শ্রবণেন্দ্রিয়-জন্ম প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, স্মৃতিরূপ শ্রাব্যতা ঘটে না থাকায় উহা ঘটের বৈধর্ম্য। ঘট অনিত্য, ইহা উত্তরবাদীরই সম্মত। স্মৃতিরূপ প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্য যে শ্রাব্যতা, তাহা শব্দে আছে বলিয়া শব্দে নিত্যত্বের আপত্তি করিলে অর্থাৎ ঐ আপত্তির দ্বারা বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে দোষ উদ্ভাবন করিলে, উহা কেবল বৈধর্ম্য মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিবেদ হওয়ায় জাতি হইবে, এইরূপ জাতিকে বৈধর্ম্যসমা জাতি বলে। পূর্বোক্ত স্থলে শ্রাব্যতা-রূপ বৈধর্ম্যে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই, অর্থাৎ শ্রাব্য হইলেই সে পদার্থ নিত্য হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। প্রতিবাদী ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল বৈধর্ম্য মাত্র অবলম্বনে ঐ স্থলে প্রতিবেদ করায় তাঁহার ঐ উত্তর জাতি হইয়াছে। এই জাতি নামক উত্তর অসঙ্গতর। কারণ, যে প্রশ্নালীতে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত প্রকার উত্তর করিয়াছেন, সেই প্রশ্নালীতেই তাহার ঐ উত্তর খণ্ডিত হয়। বাদী প্রতিবাদীর প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন যে, যদি কেবল একটা সাধর্ম্য থাকিলেই ঐ সাধর্ম্যের সহচর দ্বন্দ্বটি সেখানে সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রম্নেয়রূপ অপ্রমাণের সাধর্ম্য থাকায় প্রতিবাদীর উত্তরেও অপ্রমাণত্ব সিদ্ধ হইবে। এইরূপ কোন বৈধর্ম্য থাকাতো প্রতিবাদীর উত্তরেও অপ্রমাণত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ প্রতিবাদী যেমন কোন একটি সাধর্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্যমাত্র অবলম্বন করিয়া বাদীর পক্ষ ব্যাহত করিবেন, সেইরূপ কোন একটি সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষকেও ঐ ভাবে বধন খণ্ডন করা যায়, তখন জাতি নামক উত্তর কখনই সঙ্গতর হইতে পারে না।

এই জন্তই প্রাচীনগণ জাতিকে স্বব্যাপ্যাতক উত্তর বলিয়াছেন। কেহ কেহ স্বব্যাপ্যাতক উত্তরকেই জাতির স্বরূপ বলিয়াছেন^১। এই জাতি চতুর্বিংশতি প্রকার। মহর্ষি গৌতম পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে সেই চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির বিশেষ নাম ও বিশেষ লক্ষণগুলি বলিয়াছেন। সেখানে এই জাতির পরীক্ষাও করিয়াছেন। তাহাতে এই জাতি অসম্ভব কেন, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যথাস্থানে জাতি পদার্থ বিষয়ে সকল কথা সূচ্যক্ত হইবে।

ভাষ্যে হেতু প্রযুক্ত হইলে এইরূপ কথা আছে, কিন্তু তাৎপর্যটাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু অথবা হেতুভাস প্রয়োগ করিলে যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা জাতি। বস্তুতঃ হেতুভাস প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী জাতি নামক অসম্ভব করিতে পারেন। ভাষ্যে প্রসঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার শেষে উহারই ব্যাখ্যায় সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবহান বলিয়াছেন। প্রসঙ্গ শব্দের দ্বারা প্রসক্তি বা আপত্তি বুঝা যায়। সর্বত্রই জাতি নামক উত্তরে একটা আপত্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। ভাষ্যকার সেই তাৎপর্যেও এখানে প্রসঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ আপত্তি-সূচক প্রতিবেদ-বাক্যই জাতি।

উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সূত্রে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য শব্দের দ্বারা যে কোন পদার্থের সহিত সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার যে শেষে উদাহরণ-সাধর্ম্য এবং উদাহরণ-বৈধর্ম্য বলিয়াছেন উহা সূত্রকারের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য শব্দের ব্যাখ্যা নহে। ভাষ্যকার একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্তই এইরূপ কথা শেষে বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন উদাহরণের সহিত সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য, তদ্রূপ যাহা উদাহরণ নহে, তাহার সহিতও সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য। কলিতার্থ এই যে, যে কোন পদার্থের সহিত সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য অবলম্বন করিয়া প্রতিবেদ করিলেই জাতি হইবে। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ সূত্রার্থ না হইলে চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির লক্ষণ বলা হয় না। কারণ, সর্ববিধ জাতিই উদাহরণের সাধর্ম্য অথবা উদাহরণের বৈধর্ম্য প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু জাতিমাত্রই যে কোন পদার্থের সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সূত্রায় তাহা বলা বাইতে পারে। মহর্ষি সর্বপ্রকার জাতির সামান্য লক্ষণ বলিতে তাহাই বলিয়াছেন।

উদ্যোতকর এইরূপ বলিলেও ভাষ্যকারের কথার দ্বারা কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উদাহরণের সাধর্ম্য প্রযুক্ত হেতু প্রয়োগ করিলে উদাহরণের কোন একটি বৈধর্ম্যের দ্বারা এবং উদাহরণের বৈধর্ম্য প্রযুক্ত হেতু প্রয়োগ করিলে উদাহরণের কোন একটি সাধর্ম্যের দ্বারা যে প্রত্যবহান, তাহাই এখানে সূত্রকারের অভিমত। কারণ, এইরূপ প্রতিবেদে বিরুদ্ধ ভাব আছে। ভাষ্যকার শেষে এইরূপ কথার দ্বারা সূত্রেরই তাৎপর্যার্থ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে জাতিমাত্রের লক্ষণ বলা হয় না, ইহা সত্য। বৃত্তিকার বিধনাথ বলিয়াছেন যে, সূত্রকার

১। প্রযুক্ত স্থাপনা(হেতু) দুঃশাস্তকমুত্তরম্।

জাতিমাত্রমাত্রে তু স্বব্যাপ্যাতকমুত্তরম্।—তর্কিকরক্ষা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১৩ কারিকা।

এই সূত্রের দ্বারা জাতির সামান্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বলেন নাই; বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জাতির সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে^১। অর্থাৎ ছল প্রভৃতি ভিন্ন দুখ্যাসমর্থ উত্তর, অথবা স্বব্যাখ্যাতক উত্তর জাতি, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সূত্রাতঃ উহার দ্বারা জাতিমাত্রের সামান্য লক্ষণ বুঝা গিয়াছে। জন ধাতু হইতে জাতি শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। সূত্রাতঃ বাহা জন্মে, তাহাকে জাতি বলা যায়। ভাব্যকার শেষে জায়মান পদার্থ জাতি, এই কথা বলিয়া এই জাতি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা জাতি শব্দের একটা ব্যুৎপত্তি মাত্র। জায়মান পদার্থমাত্রই জাতি নহে; পূর্বোক্ত প্রকার স্বব্যাখ্যাতক উত্তরই জাতি। ঐ অর্থে মহাবীর এই জাতি শব্দটি পারিভাষিক। পঞ্চম অব্যয়ে এই জাতির সম্বন্ধে সমস্ত কথা বিবৃত হইবে। সেখানেই এই জাতির সমস্ত তত্ত্ব পরিষ্কৃত হইবে ॥ ১৮ ॥

সূত্র। বিপ্রতিপত্তির প্রতিপত্তিঃ নিগ্রহ- স্থানম্ ॥ ১৯ ॥ ৬° ॥

অনুবাদ। বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞান এবং অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতা বিশেষ নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ বাহার দ্বারা পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে।

ভাষ্য। বিপরীতা বা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তির্বিপ্রতিপত্তিঃ, বিপ্রতিপদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি, নিগ্রহস্থানং ধনু পরাজয়প্রাপ্তিঃ। অপ্রতিপত্তিত্বারম্ভবিষয়ে অনারম্ভঃ। পরেণ স্থাপিতং বা ন প্রতিষেধতি, প্রতিষেধং বা নোদ্ধরতি। অসমাসাচ্চ নৈতে এব নিগ্রহস্থানে ইতি।

অনুবাদ। বিপরীত অথবা কুৎসিত জ্ঞান বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপদ্যমান ব্যক্তি অর্থাৎ বাহার ঐরূপ বিপ্রতিপত্তি আছে, সেই ব্যক্তি পরাজয় প্রাপ্ত হয়। নিগ্রহস্থানই পরাজয় লাভ। অপ্রতিপত্তি কিন্তু আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) পর কর্তৃক স্থাপিত পক্ষকে প্রতিষেধ করে না অথবা (পরকৃত) প্রতিষেধকে উদ্ধার করে না। সমাস না করায় অর্থাৎ মহাবী এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি, এই দুইটি শব্দের সমাস না করিয়া উল্লেখ করায় (বুঝিতে হইবে যে) এই দুইটিই অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে।

টিপ্পনী। জাতি-লক্ষণের পরে মহাবী এই সূত্রদ্বারা তাহার কথিত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের

১। তেন চ সন্দর্ভেণ দুখ্যাসমর্থং স্বব্যাখ্যাতকং বা বর্ষিতং। তথাচ ছলাদিতিকদুখ্যাসমর্থবৃত্তং স্বব্যাখ্যাতকমুত্তরং বা জাতিগতি সূচিতং, সাংখ্য-সমাদিত্ত্বার্থিঃ পঞ্জাভ্যাসং তদর্থ ইত্যপি বসন্তি—বিধনাৎ বৃত্তি।

লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। স্বত্রে যে বিপ্রতিপত্তি শব্দ আছে, তাহার বাধ্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—বিপরীত জ্ঞান এবং কুংসিত জ্ঞান। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম-বিষয়ক জ্ঞান বিপরীত জ্ঞান, স্থূলবিষয়ক জ্ঞান কুংসিত জ্ঞান। অর্থাৎ যদিও কুংসিত জ্ঞানও বিপরীত জ্ঞানই, বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানবিশেষ ভিন্ন তাহা কুংসিত জ্ঞান হয় না, তাহা হইলেও সূক্ষ্ম বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান জন্মিলে তাহাকে বিপরীত জ্ঞান বলিয়াছেন, আর স্থূল বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান জন্মিলে তাহাকে কুংসিত জ্ঞান বলিয়াছেন। এইরূপ বিষয়ভেদেই ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তিকে বিপরীত জ্ঞান এবং কুংসিত জ্ঞান বলিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকারের ঐ কথার ইহাই তাৎপর্য মনে হয়। পূর্বোক্তপ্রকার বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান হইবে কি প্রকারে? এ জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তিযুক্ত ব্যক্তি পরাজয় লাভ করে অর্থাৎ যাহার পূর্বোক্ত প্রকার বিপ্রতিপত্তি জন্মে, তাহার পরাজয় হয়। পরাজয় হইলেই নিগ্রহ হইল, নিগ্রহস্থান ও পরাজয়লাভ, ফলে একই কথা। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকার বিপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলা যাইতে পারে। এবং আরম্ভ বিষয়ে আরম্ভ না করাই এখানে অপ্রতিপত্তি। বিপর্য ব্যক্তি স্বপক্ষ স্থাপনা করিলে তখন তাহার প্রতিবেশ বা খণ্ডন করিতে হইবে, অথবা প্রতিবেশ করিলে তাহার উদ্ধার করিতে হইবে, তাহা না করাই আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ, ইহা অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতই হয়, এ জন্ত ইহাকে অপ্রতিপত্তি বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই স্বত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি বলিয়াই মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকে যে প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণও বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক এবং কতকগুলি অপ্রতিপত্তিমূলক। এই জন্ত এই স্বত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি শব্দের দ্বারাই মহর্ষি নিগ্রহস্থানগুলির সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাতও বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলা যায় না, এই কথা বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি—ইহার কোন একটির অনুমাপক ধর্ম আছে, তাহাই নিগ্রহস্থান, এই পর্য্যন্তই মহর্ষির তাৎপর্যার্থ। নিগ্রহস্থানের দ্বারা পরাজয় লাভ হয়, এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে নিগ্রহস্থানকেই পরাজয়লাভ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয় লাভের কারণ।

মহর্ষি এই স্বত্রে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি শব্দের সমাস করিয়া ‘বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্তী’ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই কেন? এইরূপ বাক্য বলিলে তাহার শব্দ-লাঘবই হইত। এতজন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই দুইটিই নিগ্রহস্থান নহে, ইহা সূচনা করিবার জন্তই মহর্ষি সমাস করেন নাই। তাৎপর্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন আরও নিগ্রহস্থান আছে। মহর্ষি এই স্বত্রে সমাস না করিয়া

১। বধ্যোত্তরভক্ততরং পরনিষ্ঠা নোদত্তাবহিতুর্মহী প্রতিজ্ঞাঃ হান্যাসে নিগ্রহস্থানস্বানুপপত্তিস্ত তথাপি বিপ্রতিপত্ত্য-প্রতিপত্ত্যান্তরোদায়কং ধর্মবৎ ওক্তং ইত্যাহি।—বিখ্যাত-বৃত্তি।

গ্রন্থগৌরবের দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন নিগ্রহস্থানও এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু ইহার পরবর্তী সূত্রভাষ্যে মহর্ষি গৌতমোক্ত নিগ্রহস্থানের মধ্যে কতকগুলিকে অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়া অবশিষ্টগুলি বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান, এই কথা বলিয়াছেন। এখানে যদি বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন কোন নিগ্রহস্থানও (তাৎপর্যটীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে) সূত্রকারের কথিত বলিয়া ভাষ্যকারের অভিমত হয়, তাহা হইলে পরবর্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার ঐক্লপ কথা কিরূপে বলিয়াছেন, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন।

মহর্ষি এই সূত্রে ঐ স্থলে সমাস না করিয়া বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে, ইহাই সূচনা করিয়াছেন অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি পদার্থই নিগ্রহস্থান নহে, তন্মূলক প্রতিজ্ঞা-হানি প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য বুঝিলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝা হয়; পরবর্তী সূত্রভাষ্যেরও সুসংগতি হয়। বস্তুতঃ মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি নিগ্রহস্থান, বিপ্রতিপত্তি পদার্থ অথবা অপ্রতিপত্তি পদার্থ নহে। উহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি বাহ এবং উহার মধ্যে কতকগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক এবং কতকগুলি অপ্রতিপত্তিমূলক। বিপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকেই ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন এবং অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকে অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি পদার্থই নিগ্রহস্থান নহে, সুতরাং সূত্রকার ও ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। বুদ্ধিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ফলকথা, বাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদী নিগ্রহীত বা পরাজিত হইয়া থাকেন, তাহাই নিগ্রহস্থান। নিগ্রহস্থানের বিশেষ তত্ত্ব পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে পরিষ্কৃত হইবে। ১৯।

ভাষ্য। কিং পুনর্দৃষ্টান্তবজ্জাতিনিগ্রহস্থানয়োরভেদোহথ সিদ্ধান্ত-বদভেদ ইত্যত আহ।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) জাতি ও নিগ্রহস্থানের কি দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা অভেদ ? অথবা সিদ্ধান্ত পদার্থের দ্বারা ভেদ আছে ? এই জন্য বলিয়াছেন—

সূত্র। তদ্বিকম্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থান-বহুত্বম্ ॥২০॥৩১॥

অনুবাদ। সেই সাধর্ম্যা ও বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানেব বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ কল্প আছে বলিয়া এবং বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্প আছে বলিয়া জাতি এবং নিগ্রহস্থানের বহুত্ব আছে অর্থাৎ জাতিও বহুপ্রকার, নিগ্রহস্থানও বহুপ্রকার।

ভাষ্য। তস্য সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিবহুত্বং তয়োশ্চ বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোর্বিকল্পান্নিগ্রহস্থানবহুত্বম্। নানাকল্পে।

বিকল্পঃ, বিবিধো বা কল্পো বিকল্পঃ। তত্রাননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা-
বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা-পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণমিত্যপ্রতিপত্তির্নিগ্রহস্থানং, শেষস্ত
বিপ্রতিপত্তিরিতি।

ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থা উদ্দিষ্টা যথোদ্দেশঃ লক্ষিতা যথালক্ষণং
পরীক্ষ্যন্ত ইতি, ত্রিবিদ্যাহস্ত শাস্ত্রস্ত প্রবৃত্তির্বেদিতব্যেতি।

ইতি বাংসায়নীরে স্তায়ভাষ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

অনুবাদ। সেই সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানের বিকল্পবশতঃ জাতির
বহুত্ব এবং সেই বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ নিগ্রহস্থানের বহুত্ব।
নানা কল্প বিকল্প অথবা বিবিধ কল্প বিকল্প। তন্মধ্যে অর্থাৎ বহুবিধ নিগ্রহস্থানের
মধ্যে অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ,
এইগুলি অর্থাৎ এই সকল নামে যে নিগ্রহস্থান, তাহা অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান।
অবশিষ্ট কিন্তু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থান ভিন্ন আর যে সকল নিগ্রহস্থান আছে,
সেগুলি বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান।

এই প্রমাণাদি পদার্থগুলি অর্থাৎ প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার
পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া উদ্দেশানুসারে লক্ষিত হইল, অর্থাৎ মহর্ষি গোতম তাঁহার
স্তায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের
উদ্দেশ পূর্ব্বক যথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। লক্ষণানুসারে অর্থাৎ
পদার্থের স্বরূপানুসারে পদার্থগুলি পরীক্ষা করিবেন, এইরূপে এই শাস্ত্রের (স্তায়
দর্শনের) তিন প্রকার (উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা) প্রবৃত্তি (উপদেশ-ব্যাপার)
জানিবে।

বাংসায়ন-প্রণীত স্তায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

টীকানী। মহর্ষি গোতম তাঁহার কথিত প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার
পদার্থের লক্ষণ বলিয়া এই লক্ষণ-প্রকরণেই শেষে আবার এই সূত্র বলিয়াছেন কেন? আর
এখানে অস্ত্র সূত্রের প্রয়োজন কি? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির এই সূত্রটির প্রয়োজন
ব্যাপার জন্ত একটি প্রশ্ন করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই
যে, মহর্ষির শিষ্যগণের এইরূপ প্রশ্ন হওয়াতেই মহর্ষি এই সূত্রটি শেষে বলিয়াছিলেন। সেই
প্রশ্ন এই যে, জাতি ও নিগ্রহস্থান নামে যে দুইটি পদার্থের লক্ষণ বলা হইল, ঐ দুইটি পদার্থ কি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	অঙ্ক	শুদ্ধ
৫	কিরূপ	কিরূপে
৯	সমাংসা	সীমাংসা
২১	নির্দেশ	নির্দেশ
	ব্য। বাক্যের	ব্যাসবাক্যের
২৮	দৃষ্টহেতু	দৃষ্টহেতু
	হইতেছে।	হইতেছে,
৩৭	“আত্মিককৌ তর্কবিদ্যা”	আত্মিককৌ তর্কবিদ্যা
৪০	পুরজীর্ণগণের	পুরজীর্ণগণের
৫০	অব্যভিচারী	ব্যভিচারী
৫৭	সং	সংস্থ
	পদার্থ	পদার্থ
৫৮	বষ্টি	ব্যষ্টি
৬১	নিবৃত্তবর্তীতি	নিবৃত্তবর্তীতি
	প্রমাণনি	প্রমাণানি
৬২	প্রবর্তমান	প্রবর্তমান
৭১	পাওয়ায়	পাওয়া যায়।
১০০	মহর্ষি	মহর্ষি
১০৩	প্রমাণসমুচ্চয়	প্রমাণসমুচ্চয়
১০৮	জৈন	জৈন
১৪৪	নির্ভুক্ত, শব্দ	নির্ভুক্ত শব্দ,
১৪৬	সং পদার্থ	সং পদার্থ
১৫৫	অনুমান প্রমাণ	উপমান প্রমাণ
১৬৩	সমস্ত সুখসামনের	সমস্ত সুখ দুঃখ সামনের
২১৫	অ গ্রহণ	অর্থ গ্রহণ
২৩৪	ভেদ থাকিলে	ভেদ না থাকিলে
২৪৮	উৎপত্তিস্বার্থকতা	উৎপত্তিস্বার্থকতা
২৬৭	ব্যাপ্ত্যপদর্শকো	ব্যাপ্ত্যপদর্শকো
২৭৭	বৈদগ্ধ্যোদাহরণ	বৈদগ্ধ্যোদাহরণ
২৯৫	নাবগচ্ছ	নাবগচ্ছ

পৃষ্ঠাঙ্ক	অঙ্ক	শ্লোক
৩০৮	প্রমাণবিষয়ে	প্রমাণবিষয়
৩১৫	হওয়ায়ও	হওয়ায়
৩২৪	বিশেষতা	বিশেষত্ব
৩২৬	নির্ধৃত	নির্ধৃত
৩২৭/৩৩৭	৪২ স্ব.	১ স্ব.
৩৩৩	তহা	তহা
৩৩৭	উপালম্ব	উপালম্ব
৩৩৯/৩৪০	৪৩ স্ব.	২ স্ব.
	বেয়াং	বৈয়াং
৩৪০	বিশেষণলক্ষণ	বিশেষ লক্ষণ
৩৪২	উপলব্ধি হয়	উপলব্ধ হয়
৩৬২	ব্যাপার	ব্যাপ্য
৩৬৪	ইহ	ইহা
৩৭৪	অনিত্যও	অনিত্যও
৩৭৬	বিশেষ্যেয়	বিশেষ্যেয়
৩৮৮	অতিক্রম বরায়	অতিক্রম করায়
৪০৩	সত্যো অপলাপ	সত্যের অপলাপ
৪০৬	সম্মতার্থ	সম্মতার্থ
	নিবৃত্তি ন	নিবৃত্তি



(93) ৯৩

M.E. ad
5 28/1/77

Philosophy - Nyaya

Nyaya - Philosophy

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.